সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দশম বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৬৯

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।
টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক •৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা: ষান্মাসিক ১'৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১'৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

ROHTAS Board
Excels
in the art of
packaged
salesmanship
ROHTAS
LIPTON'S
LIPTON'S
LUX
LUX
LUX
It is a treat to the eye to see a colourful CARTON of Packaged goods across the counter. The largest manufacturer of quality PAPER & BOARD, ROHTAS contribute to this art of selling.
SAHU JAIN INDUSTRIES
Selling Agents:
Ashoka Marketing Limited.
Manufactured by
ROHTAS INDUSTRIES LTD.
DALMIANAGAR, BIHAR.
Available through a network of stockists.
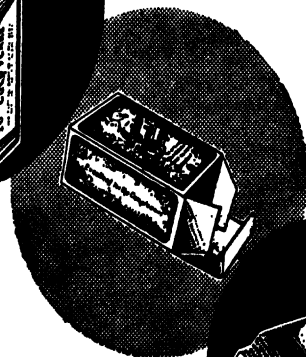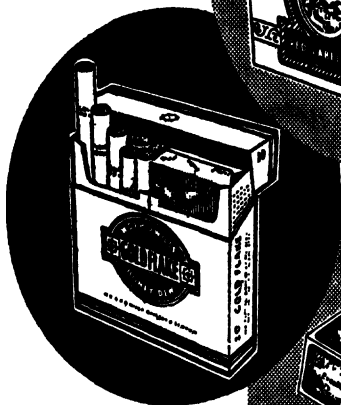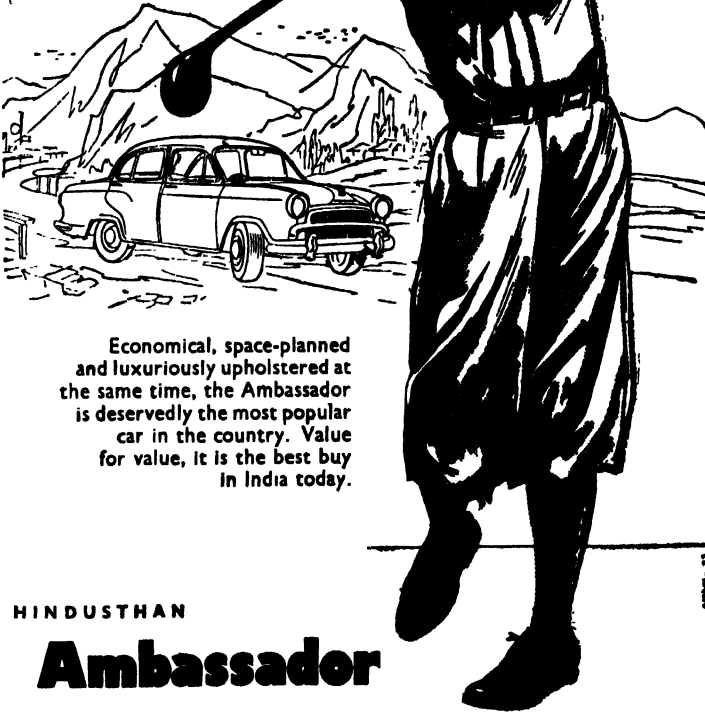
*INDIA AUTOMOBILES (1960) LTD., 12, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) *HINDUSTAN AUTO DISTRIBUTORS, 17, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) *WALFORD TRANSPORT LTD., 71, Park Street, Calcutta (for other Districts of West Bengal).

NORTON
and ADMIRAL
the light running cycles...
thanks to their
superior hub
ASP/HC-162
HIND CYCLES LTD. 250 WORLI BOMBAY-18

লিপটনের
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
কম দামে
সেরা চা
LLG-2 BEN

SADHANA AUSADHALAYA

দশম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট ঃ সত্যজিৎ রায়

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

গরমে চলুন হালকা পায়ে
পা হাওয়ায় খেলবে
চলবে যেন আছে কি নেই
তবেই না গরমে
আরামে চলা। তার মানে
চপ্পলে চলা।
পা বেশি ঢাকবে না
এমন চপ্পল।
হাটবে হালকা এমন চপ্পল।
ভাঙবে না, মচকাবে না,
থাকবে ছিমছাম,
এক কথায় বাটার চপ্পল।
কাঞ্চন
৩·৫০
কেতকী
৬·৫০
তরুণ
৫·২৫
মীনা
৪·৭৫
বিক্রম
৫·৯৫
Bata
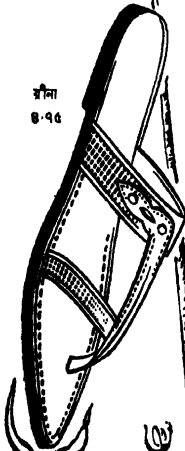
যে পক্ষের পরাজয়

সোমেন্দ্রনাথ বসু

যে দেশে বাস করি সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই কি আমাদের দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তার বাইরে যে বিরাট পৃথিবী পড়ে আছে, যেখানে ইতিহাসের উত্থান পতনে কত জাত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, কত জাত ইতিহাসের পাতা থেকে অবজ্ঞা আর অনাদরের লাঞ্ছনা মাথায় করে সরে যাচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎসুক জিজ্ঞাসা ছুটছে। ন্যায় অন্যায়ের যে মানদণ্ড দিয়ে ঘরে বসে বসে ছোটখাটো ঘটনা মাপি, মাঝে মাঝে বাইরে বেরুতে হয় সেটা নিয়ে। মাৎস্যন্যায় শুধু বাংলাদেশে গোপালের রাজ্যকালের পূর্বেই ছিলনা, সে আছে সারা পৃথিবীতে। রাজার হস্ত দুর্বল কাঙালের ধন চুরি করছে এ কাহিনী শুধু দুই বিঘার মধ্যেই বন্ধ নেই, সারা জগতে ঐ একই অন্যায় নীতির রথ চলেছে। ঘরে যে বন্ধ হয়েছে সে অম্লানবদনে ভাবে বাইরের জগতে কি হলো না হলো তা নিয়ে কেন বনের মোষ তাড়াই। কিন্তু বাইরে যে বেরোয় জগতের কোন দেশকে অনাত্মীয় মনে করার মত মন যার ছোট নয় সে তো চুপ করে থাকে না। তাকে সাড়া দিতে হয় নইলে তার চৈতন্যের গভীরলোকে বিবেকের দংশন তাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

স্পেন দেশে বিপ্লব হয়েছিল, গণতান্ত্রিকেরা রাজশক্তিকে হারিয়েছিল। দূর ভারতবর্ষে অশিক্ষার কালোআকাশে আচ্ছন্ন দেশে একটি আলোরশিখা তখন সবে জ্বলেছে—রাজা রামমোহন। স্পেনের গণশক্তির জয়কে তাঁর নিজের জয় বলে মনে হলো। বন্ধুদের আহ্বান করলেন—আয়োজন করলেন ভোজসভায় বললেন—এসো আনন্দ করি, সাধারণ মানুষ জিতেছে ওখানে। কে জানে কোথা থেকে এই চেতনা তিনি পেয়েছিলেন; প্রতিভার ব্যবহার আমাদের বোঝবার ক্ষমতার সীমার মধ্য দিয়ে চলেনা সবসময়ে।

ঐ ধারাতেই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর কর্ণ বলছে কুন্তীকে **'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।'** কী আশ্চর্য এই কর্ণের চরিত্র। মহাভারতের কবি কর্ণকে প্রবল শক্তিশালী বীর্যবান মহান চরিত্র করে এঁকেছেন। সেই বীর্যের আর একটি ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন; সে বীর্য বাহুবলের নয়, বিজয়ী পক্ষের নেতৃত্বলাভের আহ্বান প্রত্যাখ্যানের।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার মধ্যে শুনেছি ঐ সুর, বিশ্বকবির বীণা রুদ্রসুরে বেজেছে পরাজিতের গৌরব ঘোষণায়। কিপলিঙের যুদ্ধবাদ নয়, নোগুচির জাতীয়তা নয়; গভীরে মনুষ্যত্বের মর্যাদার যে গভীর আবেদন আছে, সুর বেজেছে সেখানে। তিনি কবি,—জার্মানীর হাতে বিধ্বস্ত বেলজিয়ামের, সোভিয়েট বিমানে আক্রান্ত ফিনল্যান্ডের, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতায় অকালচূর্ণ চেকোশ্লোভেকিয়ার, জাপানের হাতে ক্ষতবিক্ষত চীনের, ইউরোপের হাতে মার খাওয়া আফ্রিকার কবি তিনি। তিনি পরাজিতের কবি। কর্ণ আরো বলেছিলেন 'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই নিজেকে নিষ্ফলের হতাশের দলের লোক বলে জানতেন না। তিনি জানতেন ইতিহাসের অনিবার্য গতিতে

রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তাঁর ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

শক্তিশালীর প্রতাপকে কখনই রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেন নি। তিনি পরাজিতের নিষ্ফলতাকে ইতিহাসের শেষ কথা বলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো ছায়া পৃথিবীতে দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে তখন সেই আসন্ন বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন "যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি। লোভ যে সম্পদ আহরণ করে আনে তাকে মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ঐশ্বর্য বলে জ্ঞান করে এসেছে, এবং অহংকৃত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায়। লোভের ভান্ডারকে রক্ষা করবার জন্য জগৎজুড়ে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন চললো। সেই ঐশ্বর্য আজ ভেঙেচুরে তার ভগ্নাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।"

অত্যাচারিত পরাজিত জাতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিষয়বস্তু হলো, বোধহয় প্রথম বলাকায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ডঙ্কা যখন বেজে উঠলো তখন বেলজিয়ম নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলো। নিরপেক্ষ দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য পাঠানো চলেনা। জার্মানীর লক্ষ্য ফ্রান্স, সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়মের বন্দরগুলিও বটে। বেলজিয়াম জার্মাণীকে সৈন্য পাঠাতে দেবেনা তার দেশের উপর দিয়ে। তাই সে রইলো নিরপেক্ষ। কিন্তু জার্মানী তখন মনস্থির করেছে যুদ্ধ করবেই। একদিন সে আক্রমণ করে বসলো বেলজিয়াম। ইংলন্ড ও ফ্রান্স তখন বেলজিয়ামের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেনা। নিতান্ত ক্ষুদ্র দেশ সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষ, জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐ তিনলক্ষ সৈন্য প্রাণপণ শক্তিতে লড়াই সুরু করলো। ইউরোপের ইতিহাসে বলা হচ্ছে :—

"The army of Belgium, under the command of King Albert, lined the Yser, and, partly protected by inundation, withheld until the end of the war a narrow

strip of Belgian territory from the invaders. The Belgian army, albeit small and severely depleted by casualties, rendered an essential service." (Fischer)

বেলজিয়ামের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে ইংলন্ড বিচলিত হলো। লর্ড এসকুইথের মন্ত্রিসভা বেলজিয়ামের উপর জার্মাণ আক্রমণের প্রসঙ্গ আলোচনা করে ইংলন্ডকে যুদ্ধে নামাবার ব্যবস্থা করলেন।

"The unprovoked violation of an innocent country whose neutrality Prussia had solemnly guranteed settled the mind of the Asquith Cabinet, dispersed the doubts of the Labour Party in parliament, and satisfied the people that the war was justly undertaken." (Fischer)

অন্যান্য দেশেও বেলজিয়ামের এই সাহসী প্রতিরোধের জয়গান শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথও চুপ করে থাকতে পারলেন না। একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন—"বেলজিয়ামের কীর্তি মনে খুব লেগেছে—সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম—হয়ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে" (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪)

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এই সময় রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি ছিলেন। রামগড় পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ গেছেন তখন গরমের ছুটিতে। আসন্ন যুদ্ধের কালো ছায়া কবির মনের দিগন্তেও অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। এণ্ড্রুজ লিখছেন ঃ—

"At the beginning of the European war this strain had become almost unbearable owing both to the world tragedy of the war itself and the suffering of Belgium which the poet felt most acutely. He wrote and published simultaneously in India and England three poems which expressed the inner conflict going on in his own mind. The first of these were called The Boatman and he told me, when he had written it, that the woman in the silent courtyard, "who sits in the dust and waits", represented Belgium. The most famous of the three poems was the Trumpet. The third poem was named the Oarsmen. Its outlook is beyond the war; for it reveals the daring venture of faith that would be needed by humanity if the old world with its dead things were to be left behind and the vast unchartered and tempestuous seas were to be sayed leading to a world that was new." (Letters to a friend)

ওর্সম্যান কবিতাটির বাংলা বলাকার ৫নং কবিতা। কলকাতায় লিখেছিলেন ৫ই ভাদ্র ১৩২১। এই কবিতাটির মধ্যে যে প্রতীক্ষারত নারী কে সে? দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ লিখছেন "নীরব প্রাঙ্গণে ধুলায় বসে প্রতীক্ষা করছে যে নারী সেই বেলজিয়াম" ঝড়ের রাতে বেলজিয়ামের দুর্যোগের দিনে তার নেয়ে আসছে তার কাছে। আকাশের অবস্থা—

কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে;

সেই যে নেয়ে আমারই জন্য আসছে, কি আনবে সে? ইতিহাসের দেবতা বেলজিয়মের দুঃখের দিনে কি আনবেন —

নহে নহে নাইকো মাণিক, নাই রতনের ভার
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,

বৈষয়িক লাভ তো হবেই না, মরবে লক্ষ লক্ষ লোক, জ্বলে পুড়ে ছাই হবে নানা গ্রাম, জয়ধ্বনি তো উঠবে না তবে কেন এই সংগ্রাম। এর উত্তরে সেই প্রতীক্ষারতা কি বলবে,

বাজবে নাকো তূরীভেরী, জানবে নাকো কেহ —
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ।

'পাপের মার্জনা' নামে একটি ভাষণ দিলেন ৯ই ভাদ্র। সকলের দুঃখকে নিজের করে নিলেন। বললেন যে পাপের বোঝা জমে উঠেছে তাকে লাঘব করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বেলজিয়াম আহত হয়েছে, কিন্তু এ আঘাত তো শুধু তাকে বাজেনি এ আঘাত আমাদের সকলকেই বাজছে "যেখানে পাপ, সেখানে কেন শাস্তি হয়না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে মানুষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই—সমস্ত মানুষ যে এক। সেই-জন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে।" এই পাপের মার্জনা ভাষণটির সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে বলাকার ৩৭নং কবিতা (ঝড়ের খেয়া)। এখানেও কবি যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর সঞ্চিত পাপের কথায় বলছেন —

এ আমার এ তোমার পাপ ......
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।

এই কবিতার শেষ অংশে আছে বলিষ্ঠ আশাবাদ। পাপ মরবে, অহংকার নিজের ভারেই নুয়ে পড়বে। তারই জন্যে দলে দলে লোক ছুটছে, তারই জন্যে প্রবল মৃত্যুর সামনেও মানুষ অকম্পিত বুকে দাঁড়াচ্ছে।

মনে রাখতে হবে যে এই কবিতাগুলির ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি পাঠিয়েছিলেন বিদেশে। বেলজিয়ামের পক্ষে তাঁর সহানুভূতি প্রমাণ কর্চ্ছে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জাগ্রত সচেতন চিত্ত শুধু তত্ত্বকথা বলেই শান্ত হয়নি।

১৯৩৮ সাল, জাপান আক্রমণ করেছে চীন। প্রতিদিন নিত্যনতুন নিষ্ঠুরতার কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে সংবাদপত্রে; গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে যাচ্ছে, নীলআকাশ থেকে জাপানী বিমান অনর্গল জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ফেলছে, হাহাকারে আর ক্রন্দনে তার প্রতিধ্বনি সেই আকাশেই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

১৯১৬ সালে কবি গিয়েছিলেন জাপানে। কি অকুণ্ঠ প্রশংসা সেদিন করেছিলেন। জাপানী শিল্পীদের মারফৎ বহুপূর্ব থেকেই জাপানী সৌন্দর্যসাধনার পরিচয় তিনি পেয়ে আসছিলেন। বৌদ্ধধর্মের শান্তির সাধনা ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের সাধনাকে এখানে একটি নম্র মূর্তিতে তিনি মিলিত হতে দেখেছিলেন। তিনি নিঃসংশয়চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন—"এমনতরো সর্বজনীন

রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।"

জাপানী ভদ্রলোকদের কাছে শুনেছিলেন "বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই।" এই কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ না পেয়ে তিনি লিখেছিলেন "জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেই জন্য এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে আঘাত করে না।"

দুদিন থাকবার পরই দেখলেন, জাপানের যুদ্ধস্পৃহা তখনই প্রবল হয়ে উঠছে, রাজ্য-বিস্তারের যে খেলা পাশ্চাত্য রাজনীতির মূলে সেই খেলাতেই জাপান মেতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই পররাজ্যলোভী জাপানী বিস্তারবাদের তীব্র প্রতিবাদ করলেন দুটি প্রবন্ধে। একটি The Spirit of Japan' আর একটি The Nation. এই প্রবন্ধ দুটি শুধু তৎকালীন জাপানী শাসকদের লোভ ও যুদ্ধোন্মত্ততাকেই আঘাত করলো না এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের শেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে মানুষের ইতিহাসে তার বিষময় ফলের কথা তুলে ধরলেন। জাপান কবির কথাকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করে নি। সংবাদপত্রে প্রচার করে দেওয়া হলো যে কবি 'পরাজিত জাতির গুরু'। কবি বুঝলেন যে ঐ বিশেষণের দ্বারা জাপানের মানুষের মন থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। উন্মত্ত যুদ্ধবাদীর এই হীন আঘাতে ব্যথিত কবি একটি কবিতায় পরাজিতের গান লিখলেন। (Song of the Defeated)

My master has bid me,
while I stand at the roadside,
to sing the song of Defeat,
for that is the bride whom He woos in secret;

She has put on the dark veil,
hiding her face from the crowd,
but the jewel glows on her breast in the dark;

She is silent, with her eyes downcast;

She has left her home behind her;
from her home has come
that wailing in the wind.

But the stars are singing
the love song of the eternal
to a face
sweet with shame and suffering.

The door has opened in the lonely chamber,
the call has sounded,
and the heart of the darkness
throbs with awe
because of the coming tryst.

সেই জাপান কুৎসিৎ হিংস্র ভঙ্গীতে চীনকে আক্রমণ করলো। কবি যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেও নবজাগরণের নানা চিহ্ন দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। আজ চীনের এই আকস্মিক দুর্যোগে তিনি চুপ করে বসে রইলেন না—প্রথমে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে একটি চিঠিতে লিখলেন যে জাপান পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে উন্মত্ত হয়ে প্রাচ্য জাগরণের বিপুল সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে আর ব্যর্থ করেছে বুদ্ধের শিক্ষা। তার আপাতঃ সাফল্য তাকে ধুলায় টেনে নামাবে।

Japan has cynically refused its own great possibility, its noble heritage of 'Bushido' and has offered a most painful disillusionment to us in an unholy adventure through which even some apparent success of hers is sure to bend down to the dust, loaded with a fatal burden of failure."

এই চিঠি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। জাপানের কবি নোগুচির চোখে পড়লে তিনি উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' এই ধ্বনি তুলে নোগুচি বোঝাতে চাইলেন যে এশিয়া মহাদেশে একটি নতুন জগৎ গড়ে তুলতে হলে এই যুদ্ধ অনিবার্য। আত্মদানের ব্রত নিয়ে জাপানী তরুণ সৈনিকেরা যুদ্ধ করছে, তাদের তো প্রশংসাই করা উচিত।

"Believe me, it is war of 'Asia for Asia'. With a crusader's determination and with a sense of sacrifice that belongs to a martyr, our young soldiers go to the front."

নোগুচির এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখলেন তা চিরকালের যুদ্ধবাদীদের প্রতি কবির প্রদীপ্ত সতর্কবাণী হয়ে থাকবে। কবি সেই চিঠিতে কয়েকটি কথা জোর দিয়ে বললেন—প্রথমতঃ এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া এ তত্ত্ব তিনি মানলেন না, দ্বিতীয়তঃ শিল্পী ও চিন্তাশীল মনীষীদের আশ্চর্য নীরবতার উল্লেখ করলেন, তৃতীয়তঃ চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অপরাজেয় শক্তির উল্লেখ করলেন। সম্পূর্ণ পত্রটি উদ্ধার করতে পারছিনা স্থানাভাববশতঃ কিন্তু উপরের তিনটি কথার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করা ভাল —

When you speak, therefore, of 'the inevitable means, terrible it is though, for establishing a new great world for Asiatic continent' signifying I suppose the bombing on Chinese women and children and the desecration of ancient temples and Universities as a means of saving China for Asia—you are ascribing to humanity a way of life which is not even inevitable among the animals and would certainly not apply to the East inspite of her occasional aberrations. You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls.

দ্বিতীয়তঃ তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন সেই সব ইনটেল্‌লেকচুয়াল-দের কথা যারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন —

"What is not amusing is that artists and thinkers should echo such remarkable sentiments that translate military swagger into spiritual bravado. In the West, even in the critical days of war madness, there is never any dearth of great

spirits who can raise their voice above the din of battle, and defy their own war-mongers in the name of humanity."

শুধু জাপানী চিন্তাশীল ব্যক্তি বা কবি ও শিল্পীদের কথা বলেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না। বিশ্বজোড়া ভীরুতার তীব্র ভর্ৎসনাও তাঁর কন্ঠে শোনা গেল "unfortunately the rest of the world is almost cowardly in any adequate expression of its judgement owing to ugly possibilities that it may be hatching for its own future."
অবশেষে চীনের দুর্জয় শক্তির প্রতি আস্থা রেখে বল্লেন— 'no temporary defeats can ever crush her fully roused spirits'.

নোগুচি এর উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথ আবার তার উত্তর দেন। এবারের চিঠিতে তাঁর ক্ষুব্ধতা বেশ রূঢ় ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে জাপানের সম্বন্ধে আর গর্বভরে লোকের কাছে বলতে পারছেন না সেকথা উল্লেখ করে বল্লেন, "I can no longer point out with pride the example of a great Japan." জাপানের জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জানিয়েও তিনি কঠোর ভাষায় বলেছেন "Wishing your people whom I love, not success but remorse".

১৯৩৮ সালের ৮ই জানুয়ারী লিখলেন বুদ্ধভক্তি। সে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে নবজাতকে। খবরের কাগজে পড়লেন 'জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল।' হায়, যে বুদ্ধের শান্তিবচনকে জাপান তার জীবনব্যাপী সাধনার মূল-মন্ত্র করেছে বলে মনে করেছিলেন সেই জাপানে বুদ্ধের এই অপমানে ব্যথিত কবি বললেন 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ মারছে বুদ্ধকে।' বুদ্ধের এই অপমানে, ভক্তদের হাতে তার এই লাঞ্ছনায় তিনি কতদূর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত তা সেই কবিতার তীক্ষ্ন ভাষা ও ব্যঙ্গেই প্রমাণ —

গর্জিয়া প্রার্থনা করে—
আর্ত রোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি আঘাত
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

এ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, ভারতবর্ষের নন; সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতা তাঁর ভাষায় প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতেই আর একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটলো যার ফলে কবির লেখনী আবার মুখর হয়ে উঠলো। ১৯৩৮ সাল। হিটলার প্রবল হয়ে উঠেছে, তার বিশ্বগ্রাসের পরি-কল্পনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলে জার্মাণ অধিবাসীদের সংখ্যা

অল্প ছিলনা। তারা নাৎসি উৎসাহে সুদেতান অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দাবী করে বসলো। সুবিধাবাদের সহজ পথে প্রবল শত্রুকে খুসী করবার জন্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর হাতে সুদেতান তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দিল। জার্মানীতে তিনি নিজে রাজার মত সম্মান পেয়েছিলেন সেই জার্মানী আজ উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পরিচালনায় আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছে। আর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ছোট ছোট দেশগুলির স্বার্থ স্বচ্ছন্দে বলি দিচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার অধ্যাপক লেসনীকে তিনি লিখলেন ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৮ সালে সে চিঠি তাঁর উদার মানবতাবোধের বলিষ্ঠ প্রমাণ। —

"I feel so keenly about the suffering of your people as if I was one of them. For what has happened in your country is not a mere local misfortune which may at the best claim our sympathy, it is a tragic revealation that the destiny of all those principles of humanity for which the peoples of the West turned martyrs for three centuries in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when even the bullies stand by each other.

I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this, humiliated to see all the values, which have given whatever worth modern civilization has, betrayed one by one, and helpless that we are powerless to prevent it. Our country is itself a victim of these wrongs. My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor even the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity".

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কবি জানালেন তাঁর লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার কথা। তিনি লিখছেন যে এই কবিতায় — "my outraged sentiment has found its expression. You may use it as you like".

কয়েকমাস পরে আর একটি চিঠি লিখলেন, তাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সাফল্য কামনা করলেন। ইউরোপ প্রত্যাগত নেহরুর কাছ থেকে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন, আর লেসনীকে লিখলেন ঃ—

"Let me only hope, your brave people will not lose heart and you will not fail to rebuild once again your own future".

'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা বহুল প্রচারিত। মুানিকের চুক্তির অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লেখা। বিশ্বের আকাশের সমস্ত নীলিমা হরণ করা আসন্ন দুর্যোগের কালো ছায়ায় পীড়িত ব্যথিত কবি শুধু বুকের ব্যথাই প্রকাশ করলেন না। নবজাগরণের সুনিশ্চিত আশ্বাসবাণীও আমাদের তিনি শোনালেন।

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভূরীভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য নামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন।

কিন্তু এই ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন, মানুষের নবজাগরণের ক্ষমতায় আস্থা রেখেঃ—

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।'

যুদ্ধ সমাপ্তির আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ একথাগুলি শুনতে পায়নি। জেনেছে যুদ্ধের পর।

এর কিছুদিন পরে কবিকে কানাডার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখতে হলো। কানাডাকে উদ্দেশ্য করে লেখা সেই কবিতাটি 'আহ্বান' নামে নবজাতকে স্থান পায়। এ কবিতা লেখার সময় কবির মনে নিশ্চয়ই বন্ধু পরিত্যক্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা মনে ছিল। তিনি কানাডাকে মুক্তিযুদ্ধের বীর বলে আহ্বান করে সতর্ক কর্চ্ছেন —

মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে করো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলির পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।

অবশেষে কবি আর একবার ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন যে, ফিনল্যাণ্ডের মত একটি ছোট দেশের উপরে সোভিয়েট আক্রমণ সুরু করলো। সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁর গভীর আশায় কি সেদিন প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। 'সানাই' কাব্যের অপঘাত কবিতায় তারই সাক্ষ্য। একটি স্নিগ্ধ দিনের সমস্ত স্বপ্ন একমুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। যখন ভাঁটিফুলে মৃদুগন্ধে চৈত্রের নেশা ছড়ায়, জারুলের শাখায় ডাকে কোকিল—

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যান্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কবিতাকে মনে না করে পারি না। সেটি হলো আফ্রিকা। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশটিতে পশ্চিমী সভ্যতা যে জঘন্য ব্যবসার খেলা খেলতে সুরু করেছে তার শেষ আজও হয়নি। বহির্বিশ্বের সভ্যতার স্রোতে তারা ব্যাঘাতের কারণ হয়নি। শুধু লোভ, শুধু মুনাফার আকর্ষণেই এই বিরাট বিস্তৃত ভূখণ্ডে কী বর্বরতার অনুষ্ঠান দিনের পর দিন হয়ে চলেছে। কবি চুপ করে থাকেন নি। ধর্ষিত মানবতার প্রতি তাঁর সমবেদনা তীব্র ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে এই কাব্যে মূর্ত হয়েছে। আফ্রিকার উপর এই নির্যাতনকে তার ইতিহাসের একটি অপমানিত অধ্যায় বলে কবি মনে করেছেন,

পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু মায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

আজকের পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস, হিংস্রতার মদ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে উপচে পড়ছে, এরই মধ্যে কবি সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী এনেছেন ওই অপমানিতা মানবীর কাছে——'ক্ষমা করো'।

২০· ৯· ১৯৩৯ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে কবি বলছেন—"দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্য শক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগলো জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুৎসিত অপমান বার বার স্বীকার করলো যা তার প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্য শক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসিনীয়াকে ইটালীর হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মানীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইনটারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে।"

এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের দিক থেকেই এই সমস্যাগুলিকে বিচার করেছেন—সেখানে কোন পক্ষের শক্তি বা দুর্বলতা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। আজ যখন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রবল উদ্ধত হয়ে উঠছে তখন প্রতিবাদের ধ্বনি জাগে কই। যে আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন যে বুদ্ধিবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শক্তিমানের পায়ে মাথা খুঁড়বে—তাই আজ সত্য হয়েছে। আফ্রিকার ধর্ষণ আজও চলেছে, মধ্য এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া, তিব্বত, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী আজও বিধ্বস্ত লাঞ্ছিত—আজ রবীন্দ্রনাথের মতন প্রবল কণ্ঠের অভাব। যাঁরা শুধু রবীন্দ্রনাথকে কোমলতার কবি বলে জানেন এই সব রচনাগুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গদ্যছন্দের কবিতা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রকৃতিজগৎ থেকে গদ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে তাঁর 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ২৫ সংখ্যক কবিতায়। বর্ণনাটি মোটামুটি এইরূপঃ

পাঁচিলের এধারে ছিল চীনের টবে ফুলের গাছ সাজানো, আর পাঁচিলের গায়ে গায়ে ছিল বন্দীকরা লতা। এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা। তাই হাওয়ায় একটু দোলাদুলি করলেও কখনও দুরন্তভাবে নেচে ওঠেনা। কবির সেই বাগানটাকে দেখে মনে হয় মোগল বাদশার জেনানা। এই গেল একদিক। অন্যদিকে পাঁচিলের ওপারে ছিল একটা সুদীর্ঘ য়ুকলিপ্‌টাস গাছ। পাশেই দুটি তিনটি সোনার্কুরি—প্রচুর পল্লবে সমাকীর্ণ। কবি অনেকদিন ধরে এই দৃশ্য দেখেছেন। একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা। কবি দেখলেন সৌন্দর্যের মর্যাদা আপন মুক্তিতে। আরও দেখলেন—'ওরা ব্রাত্য, আচার মুক্ত, ওরা সহজ। সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে, বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি। ওদের আছে শাখার দোলন দীর্ঘলয়ে; পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের; মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো।' এই দৃশ্য থেকে কবি পেলেন গদ্য ছন্দের ইশারা। তিনি বলেছেন —

> 'আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত;
> বললেন, 'টবের কবিতাকে
> রোপণ করব মাটিতে,
> ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
> বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে।'

এই হল ইতিবৃত্ত। অতঃপর শুরু হল 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের পালা। ১৩৩৯ (১৯৩২) সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত এই কাব্যখানির কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭; দ্বিতীয় সংস্করণে হল পঞ্চাশ। পুনশ্চ সাধারণত গদ্য কাব্য রূপে পরিচিত হলেও এর কয়েকটি কবিতা যে পদ্যছন্দে রচিত সেকথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। এই জাতীয় কবিতা প্রথম সংস্করণে ছিল ৯টি, দ্বিতীয় সংস্করণে হল ১৫টি। 'বলাকার ছন্দ' বলতে যেমন উক্ত গ্রন্থের বিশেষ কতগুলি কবিতার ছন্দকেই বোঝায়, 'পুনশ্চর ছন্দ' সম্পর্কেও সেই কথাটি প্রযোজ্য। কোমল গান্ধার, বিশ্বলোক (পুরোপুরি নয়, অনেকাংশে), শালিখ, অস্থানে, ঘরছাড়া, মৃত্যু, স্ফূর্তি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন—মূল 'পুনশ্চ' গ্রন্থে এই ৯টি এবং 'পরিশেষে' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু — এই ৬টি পদ্যছন্দে রচিত। পদ্যছন্দে রচিত এই কবিতাগুলিকে পুনশ্চ গ্রন্থে স্থান দেওয়ার কৈফিয়ৎস্বরূপ কবি বলেছেন যে, এগুলিতে পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, মনে, মোর প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয়না, সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দেওয়া হয়নি।

ছন্দোবিদ্ পাঠককে বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, কেবল বিশেষ ভাষারীতি গ্রহণ বা বর্জনের দ্বারা কোনো কবিতা পদ্য অথবা গদ্য হয়ে ওঠেনা। পদ্য ও গদ্যের ছন্দ স্বতন্ত্র। আমরা কবিতা বা কাব্যরসের কথা বলছিনা, ছন্দের কথা বলছি। বাংলায় পদ্য ও গদ্য উভয়রীতির ছন্দের উপকরণ পর্ব ও পর্বাঙ্গ। কিন্তু তাদের প্রয়োগে পার্থক্য আছে। পদ্য ও গদ্য ছন্দের

পার্থক্য সম্পর্কে প্রবীণ ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়— "পদ্যে এক একটি চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্বগুলি সাধারণত সমান হয়। যে স্থলে পর পর পর্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সেস্থলে কোনো সুস্পষ্ট আদর্শের অনুকরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য। পর পর পর্বগুলি প্রমাণ না হওয়া কিংবা কোনো নক্সার অনুসরণে পর্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫ম সং পৃঃ ২২৩)।

উদ্ধৃত অংশে কেবল পর্বের কথাই বলা হয়েছে। পর্বের অন্তর্গত পর্বাঙ্গের দিক থেকে পদ্য ও গদ্য ছন্দে যে বৈষম্য, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত অংশটি স্মরণীয়—"পদ্যের পর্বের সহিত গদ্যের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে। কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাজান যায়।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫ম সং পৃঃ ২২০)

গদ্য ও পদ্য ছন্দের এই সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্র ধরেই যেমন পদ্য ছন্দের গদ্যান্বয় করা যায়, তেমনি গদ্যছন্দও পদ্য-ছন্দে পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষের মুখের কথায় গদ্যরীতি অগ্রজ হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে পদ্যছন্দের অনুজ। অর্থাৎ কবি-কণ্ঠে গদ্য স্বভাবতই "অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনে" ধরা দিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পদ্যের বেশে দেখা দিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষের আকারটাই যেমন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, তেমনি কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে গদ্য পদ্যের রূপটাই বড়ো কথা নয়। পদ্যেও নীরস কথার বর্ণনা আছে, আবার গদ্যেও কবি-কল্পনার রেশ পাওয়া যায়। সুতরাং গদ্যকাব্য বা গদ্য কবিতার আন্দোলনটা অর্বাচীন হলেও ব্যাপারটা কিছু অর্বাচীন নয়। বাণ-ভট্টের কাদম্বরীকে অন্যতম প্রমাণ রূপে দাখিল করা চলে। পৃথিবীর অন্যত্র আরও প্রমাণ রয়েছে। তা সত্বেও প্রাচীনকাল থেকেই পদ্যছন্দের সঙ্গে কাব্য-কবিতার এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় যার ফলে কখনো কখনো পদ্য কথাটাকে কাব্যের প্রতিশব্দরূপেও ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও শৈথিল্য লক্ষণীয়। একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি : "গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানিনা।....যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করিনে।" (সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৩১) উল্লিখিত অংশে পদ্য কথাটি সর্বত্র কাব্যের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এটা কি নিছক শৈথিল্য? অথবা এটা কাব্যের পক্ষে পদ্যছন্দের অত্যাবশ্যকতার নিদর্শন? অন্যের কথা দূরে থাক, বাংলা কাব্যে গদ্যছন্দের আচার্য রবীন্দ্রনাথকে গদ্যকাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গেই স্বীকার করতে হয়েছে :

(ক) অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবলভাবে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্য বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব। (সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ২২)

(খ) ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—একথা স্বীকার করতে হবে। (সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ২৫)

ছন্দটা ঐকান্তিকভাবে কাব্য না হলেও কাব্যসৃষ্টির সহায়ক। সহায়ক দুদিক থেকে।

প্রথমত, ছন্দের আছে দোলা দেবার শক্তি। দ্বিতীয়ত, কাব্যপাঠক ছন্দের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত। তাই যদি হয়, তাহলে কবিতারচনায় পদ্য ছন্দকে বর্জন করে গদ্যরীতিগ্রহণের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা কোথায়? এ সম্পর্কে কবির মুখ্য বক্তব্য হল এই যে, তিনি এমন অনেক গদ্য কাব্য লিখেছেন যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতেন না। কিন্তু কেন পারতেন না সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অনুমান করা যায়, পদ্যছন্দের "অতিনিরূপিত বন্ধন"ই ছিল প্রধান অন্তরায়।

প্রথম বন্ধন—মিল। মিলের অসুবিধার কথা মধুসূদন অনেক আগেই বলে গেছেন তাঁর "মিত্রাক্ষর" নামক কবিতায়। মিলের রাজা রবীন্দ্রনাথকেও অবশ্য মাঝে মাঝে বেগ পেতে হয়েছিল মিলের জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক "শেষ সপ্তক"-এর ৩৭ নং কবিতার এই পংক্তি দুটি ঃ দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে

দুঃখেরই দহনে

উল্লিখিত পংক্তিদ্বয়ের সামিল পদ্যরূপ দিতে গিয়ে কবি প্রথম চরণে লিখলেন –

দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরই দহনে

ভাবের দিক থেকে পরবর্তী চরণে দেওয়ার মতো যে অংশটুকু বাকি রয়েছে তা হল "দিনে দিনে"। কিন্তু এই সমশব্দদ্বয়ে পদ্যছন্দের প্রয়োজন মিটলেও মিলের প্রয়োজন মেটে না। কবিকে তাই মিলের খাতিরে এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করতে হল যা বাংলায় অচলিত ও উদ্ভট। তাতে মিলের মানরক্ষা হল বটে, কিন্তু রচনার মাধুর্য কিছুমাত্র রইল না। কবির চরণ দুটি এই ঃ

দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরই দহনে

অহনে অহনে। "দিনে দিনে"র প্রতিশব্দরূপে "অহনে অহনে" ভয়াবহ।

মিলের অসুবিধা আছে মানি। কিন্তু সেই অসুবিধাই পদ্যছন্দ বর্জনের যুক্তিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না, কারণ মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস পদ্যছন্দের কোনো অপরিহার্য অঙ্গ নয়। মধুসূদন বা গিরিশ ঘোষের কথা বাদ দিলেও আমরা মিলহীন পদ্যছন্দের উদাহরণরূপে রবীন্দ্রনাথের "নিষ্ফল কামনা" (রচনাকাল ১৮৮৭) এবং "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের অগোচর, আগন্তুক, জরতী, প্রাণ ইত্যাদি কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারি।

তাহলে কি পদ্যছন্দের পর্ববন্ধনই কাব্যসৃষ্টির অন্তরায় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কাব্যের সাহায্যেই আমরা এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে চাই।

পদ্যছন্দের মধ্যে গদ্যছন্দের অনুপ্রবেশ হলে তা যেমন ছন্দের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ, এর বিপরীত কথাটাও তেমনি সত্য। গদ্য কাব্যের লেখক সতর্ক থাকবেন তাঁর রচনায় যেন পদ্য-ছন্দের আমেজ না থাকে। পদ্য ও গদ্য এই দুই ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যছন্দ ঐক্য-প্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্য প্রধান। গদ্যছন্দের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে অমূল্যবাবু বলেছেন– "পর পর পর্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট মাত্রা সাধারণত সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্বের মোট মাত্রা সমান, সেক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বাঙ্গ সন্নিবেশের দিক দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্তত যুক্তাক্ষর ব্যবহারের দিক হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দ্বারা সমান মাত্রার ও একই সঙ্কেতের দুইটি পর্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য রক্ষা হইয়া থাকে।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫ম সং পৃঃ ২২৪)

উল্লিখিত লক্ষণদৃষ্টে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা পাঠে অগ্রসর হলে প্রায়ই মনে হবে আমরা বোধ করি, পদ্য-কবিতা পাঠ করছি। দৃষ্টান্ত ঃ—

(১) "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা কোপাই। একটি অংশ তুলে দিচ্ছি, পাঠক দেখবেন একে ৬ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান বলা যায় কিনা।

রেষারেষি নেই। তরলে শ্যামলে। হাততালি দিয়ে। সহজ নাচে ॥
ছিপছিপে ওর। দেহটি ॥ বর্ষায় ওর। অঙ্গে অঙ্গে। লাগে মাৎলামি।
বেঁকে বেঁকে চলে। ছায়ায় আলোয়। মহুয়া মাতাল। গাঁয়ের মেয়ের। মতো ॥

(২) তৃতীয় কবিতা "নূতন কাল" থেকে যে অংশটি দেওয়া হচ্ছে তাকে ছড়ার ছন্দ বলতে কোনো বাধা নেই — এই বেদনা। মনে নিয়ে। নেমেছি এই। কালে ॥
এমন সময়। পিছন ফিরে। দেখি তুমি। নেই ॥

(৩) "ফাঁক" কবিতার নিম্নলিখিত অংশে ৬ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান -
(তখন) যেমন খুশির। ব্রজধামে ছিল।
বালগোপালের। লীলা ॥

উল্লিখিত উদাহরণগুলি গদ্যছন্দের কবিতা থেকে গৃহীত। এছাড়া "পুনশ্চ" গ্রন্থে আগাগোড়া বা প্রায় আগাগোড়া পদ্যছন্দে রচিত কবিতাও অনেক আছে যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

গদ্য ছন্দের কবিতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হবে শেষ সপ্তকের কবিতাগুলি থেকে। "শেষ সপ্তক" প্রকাশিত হয় "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের আড়াই বছর পরে ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে। "পুনশ্চ" রচনার সময়ে কবিচিত্তের উপর সুদীর্ঘকাল সঞ্চিত পদ্যছন্দের সংস্কার প্রবল ছিল বলে সেখানে গদ্যছন্দ রচনায় অনেক অসতর্কতার পরিচয় রয়ে গেছে। শেষ সপ্তকে কবি অনেক সতর্ক হয়েছেন। গদ্যছন্দের মাঝে মাঝে পদ্য ছন্দ হামেশাই ঢুকে পড়ে তার বিশুদ্ধতা বড়ো একটা ক্ষুণ্ণ করেনি। কিন্তু অন্যদিক থেকে গদ্য ছন্দের বিষম পরাভব ঘটেছে, সে পরাভব হল শিল্প-সৌন্দর্যের। কবি বলেছেন "আমি অনেক গদ্য কাব্য লিখেছি যার বিষয় বস্তু অপর কোনোরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না।" (সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৩১) শেষ সপ্তক থেকে নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করব।

প্রথমত, পুনশ্চ গ্রন্থের ন্যায় শেষ সপ্তকেও গদ্যছন্দের মাঝে মাঝে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট আভাস। যেমন ৫নং কবিতায় - (তার) কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে। স্বাক্ষর পায়। রেখে ॥
স্পষ্টই এখানে ৬ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। কিন্তু এমন নিখুঁত উদাহরণ শেষসপ্তকে অনেক কম, কারণ আগেই বলেছি কবি অনেক সতর্ক হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কতগুলি ক্ষেত্রে সামান্য অদলবদল করলেই চমৎকার পদ্যছন্দ পাওয়া যায় যা গদ্যছন্দ থেকে অধিকতর রসবাহী। উদাহরণ

(১) শেষ সপ্তকের ৩নং কবিতার আরম্ভ অংশ এইরূপ ঃ

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াসার আবরণ দিল সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচিপাতা……

অতি সামান্য পরিবর্তনে এই অংশটি ৫ মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে পরিণত করা যায় এইভাবে ঃ

ফুরিয়ে গেল। পৌষালির। দিন ॥
কৌতূহলী। ভোরের আলো।

সরিয়ে দিল। হিমের আব। রণ ॥
হঠাৎ দেখি। শিশিরে ভেজা। বাতাবিগাছে।
ধরেছে কচি। পাতা ॥

অথবা ছড়ার ছন্দে পরিণত করা যায় এইভাবে ঃ--

ফুরিয়ে গেল। পউষ মাসের। দিন ॥
কৌতূহলী। ভোরের আলো।
সরিয়ে দিল। হিমের আব। রণ ॥
হঠাৎ দেখি। শিশির-ভেজা। বাতাবিতে।
ধরল কচি।পাতা ॥

(২) ২নং কবিতার দুটি পংক্তি এইরূপ ঃ

বৃষ্টিধারা মুখর নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে

প্রথম চরণের পক্ষে তানপ্রধান হয়ে ওঠবার বাধা খুবই সামান্য, কারণ ওখানে দ্বিতীয় পর্বে আছে ৬ মাত্রা—নির্জন প্রবাসে। প্রথম পর্বের প্রয়োজনীয় ৮ মাত্রার স্থলে আছে ৭ মাত্রা—বৃষ্টি ধারা মুখর। এটিকে অনায়াসে ৮ মাত্রা করা যায়—বৃষ্টিধারা মুখরিত। দ্বিতীয় চরণকে ১৪ মাত্রার পরিবর্তে ১৮ মাত্রায় পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। 'সন্ধ্যাযূথীর।করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে' এই অংশটিকে 'সন্ধ্যাবেলা যূথিকার। সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে' (৮।১০) এইভাবে পাওয়া যায়। তাহলে উল্লিখিত গদ্যছন্দের চরণ দুটি তানপ্রধান ছন্দে দাঁড়াল এইভাবে ঃ

বৃষ্টিধারা মুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে

তৃতীয়, কতগুলি দৃষ্টান্ত থেকে এমনও মনে হতে পারে যে, ছান্দসিক কবি প্রথমে পদ্য-ছন্দ রচনা করে পরে কিছু কিছু শব্দের হেরফের ঘটিয়ে গদ্যছন্দ তৈরী করেছেন। অর্থাৎ পদ্য-ছন্দ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত; গদ্যছন্দ কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। ফলে শিল্পগুণে গদ্যকবিতাগুলি তাদের পূর্বতন পদ্যরূপের ঊর্ধে উঠতে পারেনি। যেমন --

(১)। শেষসপ্তকের ৪নং কবিতায় আছে --

সরে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা করে।

এই অংশকে মনে হবে নিম্নলিখিত সমিল পদ্যছন্দের (তানপ্রধানের) বিকৃত রূপ —

সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনাকে উপহাস করে।

(২) ৫নং কবিতায় আছে --

বলেছে যেমন বলে । গোধূলির অস্ফুট তারা ॥
বলেছে যেমন বলে । নিশান্তের অরুণ আভাস ॥

ছন্দোবোধ সম্পন্ন পাঠকের মনে হতে পারে প্রথম চরণের শেষ শব্দ 'তারা' বোধ করি তারকা'র মুদ্রণপ্রমাদ।

(৩) উল্লিখিত কবিতার আরও দুটি পংক্তি দেখুন —

নিষ্কর্মা প্রহরগুলো । নিঃশব্দ চরণে ॥
কিছুদান রেখে গেছে । আমার দেহলিতে ॥

একটি সুন্দর অমিল পয়ারের শ্লোককে গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে মাত্র একটি শব্দ পাল্‌টিয়ে—'দুয়ারে'র পরিবর্তে "দেহলিতে" বসিয়ে।

(৪) অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে

এই সুন্দর পদ্যছন্দটি শেষ সপ্তকের ৪নং কবিতায় বিকৃত হয়েছে এই ভাবে —

অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির মহাসাগরে

(৫) মরু বক্ষে তৃণ রাজি। দিল পেতে শ্যাম আস্তরণ ॥
নেমে এল তারপরে। সুন্দরের করুণ চরণ ॥

আঠারো মাত্রার এই সুন্দর সমিল পয়ার ছন্দের শ্লোকটির অন্বয় পরিবর্তন ঘটিয়ে একে নিম্নলিখিতরূপে গদ্যছন্দ করা হয়েছে —

মরুবক্ষে তৃণ রাজি শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে
সুন্দরের করুণ চরণ নেমে এল তার পরে।

(শেষসপ্তক ৩৭ নং কবিতা)

রবীন্দ্র-প্রদর্শিত নিয়মের অনুসরণে যদি কেউ তাঁর বাংলা দেশের শরৎ-বর্ণনা-বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ কবিতার অংশবিশেষকে এইভাবে গদ্য কবিতার ছন্দে রূপান্তরিত করে —

জলভার বইতে পারেনা নদী, তোমার কানন সভাতে ডাকছে দোয়েল,
ধান আর ধরে নাকো মাঠে মাঠে, গাইছে কোয়েল।

তাহলে বাঙালি কোনো কাব্যরসিক পাঠক কি সেই দুষ্কৃতিকারীকে ক্ষমা করবেন?

পঞ্চমত, রবীন্দ্রনাথ যদি একই কবিতার গদ্য ও পদ্য এই দুই রূপ না রেখে যেতেন, তাহলে আমাদের ছন্দপুরুষ গদ্যকবিতাপাঠে অতৃপ্তি বোধ করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এক্ষেত্রে কবিই আমাদের স্পর্ধিত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা পাঠের সময়ে মনে হয় যেন একটি সুসজ্জিত সুগ্রথিত মূল্যবান অলঙ্কারকে ভেঙেচুরে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে তার প্রকৃত স্বরূপ যাতে ধরা না পড়ে সেই জন্যে মাঝে মাঝে কতগুলি উপাদান সরিয়ে ফেলে কতকগুলিকে স্থানচ্যুত করে সেখানে কোনো নিকৃষ্ট উপাদান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু কার্যকর্তার অসতর্কতার ফলে মূল অলংকারের কয়েকটি অংশ যেমনটি তেমন রয়ে গেছে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য শেষসপ্তকের ২৭নং কবিতাটি ধরা যাক। কবিতাটির একটি প্রতিরূপ আছে অমিল মুক্তক ছড়ার ছন্দে —নাম 'ঘটভরা'। তার প্রথম তিনটি চরণ এই—

আমার এই। ছোটো কলস। খানি ॥
সারা সকাল। পেতে রাখি।
ঝর্ণা ধারার। নীচে ॥

এরপরে যখন গদ্যছন্দে পড়ি—

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনা ধারার নীচে

তখন তাকে মনে হয় আসলের ব্যঙ্গ। যেন কোনো অপটু লেখনী কবির নকল করতে গিয়ে আনাড়িভাবে কিছু অদলবদল করে দিয়েছে। 'এক নিমেষেই। ঘটভরে যায়' লিখলে পদ্যছন্দের আভাস আসে, অতএব লেখা হল 'এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে।' পদ্যছন্দ আর রইল না। ঐ একই কবিতার অন্যত্র আছে —

জলের শব্দ । যায় পেরিয়ে ।
বেগ্‌নি রঙের । বনের সীমা । না ॥

কবিকৃত এই পদ্যছন্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দে পাই —

জলের ধ্বনি
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে ।

শেষের 'যায় পেরিয়ে' অংশের পরিবর্তে "পেরিয়ে যায়" লিখলে নির্ভুল প্রোজ অর্ডার হত ! কিন্তু এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও আলোচ্য কবিতাটির অনেক জায়গায় অতি স্বাভাবিকভাবেই পদ্যছন্দের আমেজ এসেছে। এ যেন সেই ছেঁড়া হারের অটুট অংশটুকু।—

সারা সকাল । বেলা ॥
শেওলা-ঢাকা । পিছল পাথর । টাতে······
উপচে-পড়া । জলের চলে । ছুটির খেলা ।
আমার খেলা । এই সঙ্গেই । ছলকে ওঠে ।
মনের ভিতর । থেকে ॥
সবুজ বনের । মিনে-করা ।
উপত্যকার । নীল আকাশের । পেয়ালা······

গদ্যছন্দের কবিতার সমর্থনে কবির প্রধান বক্তব্য – "আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুমনা।" কিন্তু কবি নিজেই তাঁর বক্তব্যকে দুর্বল করে দিয়েছেন গদ্যকাব্যের বিষয়বস্তুকে পদ্যকাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। একটি উদাহরণ নিচ্ছি। শেষসপ্তকের ২নং কবিতা। কবিতাটিতে বলা হয়েছে একটি সামান্য স্মৃতির কথা। একদিন কোনো এক তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে প্রিয়জনের একটুকরো হাসি কবির যৌবনকে বিহ্বল করে তুলেছিল। এই সামান্য ঘটনার মুহূর্ত স্মৃতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন ক্ষণে মনে পড়ে সেই মুহূর্তের কথা। কখনো শীতের মধ্যাহ্নে, যখন গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে কবির বেলা যায় কেটে। আবার কখনো-বা সেই মুহূর্তটি মনে পড়ে সঙ্গ-হারা সায়াহ্নের অন্ধকারে। শেষ স্তবকের গদ্যছন্দের রূপটি এই (পাঠক লক্ষ্য করবেন, নিম্নরেখ অংশগুলিতে তানপ্রধান ছন্দের সুস্পষ্ট আমেজ) —

তারপরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়—উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে
যখন গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন **সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে**
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

এর সঙ্গে তুলনা করুন পদ্যছন্দের রূপটিকে —

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পূরবী।

গদ্যছন্দের চিত্র দুটি (মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন) পদ্যছন্দেও বজায় আছে। এমনকি বিশেষ প্রয়োজনীয় পদসমষ্টিগুলিও অব্যাহত আছে ঃ—

অকারণে; শীতের মধ্যাহ্নে; গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠ; সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকার; সূর্যাস্ত। কেবল একটি ক্ষেত্রে গদ্যছন্দের একটি মনোরম চিত্রকল্প (ধ্বনিহীন বীণার বেদনা)

মিলের খাতিরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে। পদ্যছন্দে আবার চারিটি নতুন চরণও যুক্ত হয়েছে, ভাবের দিক থেকে যা সৌন্দর্যসৃষ্টির সহায়ক। কিন্তু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির যোগ-বিয়োগ নয়, আমাদের প্রধান লক্ষ্য কাব্যরস; এবং সেদিক থেকে পদ্যরূপটিই নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর।

কাব্য ও ছন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন, তার থেকে গুটিকয়েক উক্তি একসঙ্গে সঙ্কলিত করা হল —

"যেটা যথার্থ কাব্য, সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।......ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল আছে রসে......সন্ন্যাস ধর্মের [অর্থাৎ কাব্যের] মুখ্যতত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে [অর্থাৎ ছন্দে] নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায় [অর্থাৎ রসে]।......কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। অশ্বরোহী সৈন্যও সৈন্য [অর্থাৎ পদ্যকাব্যও কাব্য], আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য [অর্থাৎ গদ্যকাব্য ও কাব্য]।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা একমত। এবং সেই মতৈক্যের ভিত্তিতেই আমাদের জিজ্ঞাসা—কবি পুনশ্চ, শেষসপ্তক, শ্যামলী ও পত্রপুটের রচনাগুলিকে পদ্যের মতো লাইন বেঁধে সাজালেন কেন। গদ্য নিজের শ্রীছন্দ বজায় রেখেই কি কাব্য রস দিতে পারেনা? যদি পারে তবে তাকে পদ্যের বেশে সাজাবার দরকার কী? রবীন্দ্রনাথ গেরুয়ার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন, অথচ গদ্যকাব্যের রচনাগুলিকে গেরুয়া পরাতে কুন্ঠিত হননি। কবি বলেছেন—অশ্বারোহী সৈন্য ও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্য ও সৈন্য। অথচ তিনি গদ্যরূপী পদাতিক সৈন্যকে পদ্যের ঘোড়ায় চড়াবার জন্য উৎসাহী।

গদ্য ছন্দের কবিতা নিয়ে যখন মনের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলছে, তখন হঠাৎ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একটি অংশে। লেখিকা গদ্য কবিতা নিয়ে কবির সঙ্গে অনেক তর্ক করেছেন এরূপ উল্লেখ আছে। একদিন তর্ক-প্রসঙ্গে কবি বললেন— 'নিয়ে এসো পুনশ্চ। তোমায় "কিনু গোয়ালার গলি"টা [অর্থাৎ 'বাঁশি' কবিতাটি] শোনাই।' কবি কবিতাটা পড়ে বললেন—"সেই লোনা ধরা সাঁতা-পড়া দেওয়ালের মাঝখানে কাঁঠালের ভুতি আমের খোসা ছড়ানো ডাস্টবিনের পাশে পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানীর জীবনযাত্রা চলছে। সেই জীবনের মধ্যেই স্বপ্নজাগে, পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর পরে যে অপেক্ষা করে আছে, কিনু গোয়ালার গলির সীমানায় তার আবির্ভাব আর অন্য কোনো ছন্দেই চলত না, গদ্য ছন্দ ছাড়া।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ [১৩৬৪] পৃঃ ২৩৮)

গদ্যছন্দ ছাড়া অন্য কোনো ছন্দে চলত কিনা সে স্বতন্ত্র কথা। আমাদের জিজ্ঞাসা — 'কিনু গোয়ালার গলি' [অর্থাৎ 'বাঁশি' কবিতাটি] কি আদৌ গদ্য ছন্দে লিখিত? এই প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা উল্লেখ করেছি, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে এমন কতগুলি কবিতা আছে যাতে মিল নেই বটে, কিন্তু পদ্য ছন্দ আছে। পরিশেষ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত কবিতাগুলিও সেই শ্রেণীর। তার একটি হচ্ছে 'কিনু গোয়ালার গলি'। অথচ রবীন্দ্রনাথ এটিকে বলেছেন গদ্যছন্দের রচনা। কোথাও কিছু গোলযোগ ঘটেছে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কবির আর একটি উক্তি স্মরণীয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে বলেছেন—"গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও মেটেনি, তাই কিছুতেই মন ঠিক হয় না।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৩২) কবি কি তাহলে অমিল মুক্তক তানপ্রধান ছন্দে রচিত "কিনু গোয়ালার গলি"কে গদ্য কবিতা বলেছেন মনের এই সন্দিগ্ধ অবস্থায়? জানিনা।

বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনকার পাঠকসমাজে যে বিষয়ে কোন কৌতূহল সঞ্চারিত হয় না, কিছুকাল আগে তাই নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠেছিল। যে-গদ্য অধুনা আমাদের মনের ধাত্রী, যাতে রসসাহিত্য ও জ্ঞানসাহিত্য—উভয়ই অবলীলাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে, এক সময় তার জনকত্ব নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সাধারণভাবে যাঁরা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের জনকত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; যাঁরা আর একটু বেশী জানতেন, তাঁরা রামমোহনকে সমস্ত গৌরবের অগ্রভাগ দিতে চাইতেন। "এইরূপ জনক-বিভ্রম অথবা বহুজনকত্বের কারণ ইহাই অনুমান করা যায় যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইতে আধুনিক প্রসার পর্যন্ত ইতিহাস সমগ্রভাবে এতদিন দেখা হয় নাই; খণ্ডশঃ দেখিতে গিয়া কখনও কেরী, কখনও রামরাম, কখনও রামমোহন প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।"১ বাংলা গদ্য উনিশ শতকের অভিনব পদার্থ নয়, তা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই জানেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাষাণ চত্বরে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়নি, বা উক্ত কলেজের পণ্ডিত-মুনশীরা "অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে" ২ এই গদ্যের জাতকর্ম করেন নি। অন্ততঃ ষোড়শ শতক থেকেই দৈনন্দিন কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাব-নিকাশ, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র—সব বাংলা গদ্যেই চলত। তিন-চার শতকের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য খুব যে দুর্বোধ্য বা অন্বয়হীন বিশৃঙ্খল বাক্‌পুঞ্জে পরিণত হয়েছিল, তা নয়। উনিশ শতকের পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতির উপর নির্ভর ক'রে বাংলা গদ্যের সাধুরীতির আদল সারা দেশেই প্রচলিত ছিল। এই জন্য একদা বাংলা গদ্যের জনকত্ব নিয়ে যে কৌতুকজনক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আধুনিক পাঠকের কাছে পরিহাস বলেই মনে হবে।

অবশ্য নানা উপাদান বিচার করে আজ একথা বলতে বাধা নেই, বাংলা গদ্যের একজনকত্বই হোক, আর বহুজনকত্বই হোক, এর শ্রীছন্দ ও সহজ অন্বয়ের যথার্থরূপটি প্রথম ধরেছিলেন একজন বিরলপ্রতিভার সেকেলে পণ্ডিত, ইনি বিদ্যাসাগরের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ঐ মেদিনীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায়)।

গদ্য কেবল গদ্‌ ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন নয়, তারও একটা বিশেষ রূপরীতি আছে—যা মূলতঃ চিন্তাবাহী, যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য পার্বতী পরমেশ্বরের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করছে। গদ্যের উৎপত্তি জিহ্বাগ্রে হলেও অধিষ্ঠান মস্তিষ্কে। গদ্যের সাধনা তাই দুরূহ। গদ্যকে কবিপ্রতিভার নিকষ পাথর বলা হয়েছে—কথাটি নিতান্ত অযথার্থ নয়। বুদ্ধি যেখানে মূল উপাদান, মনন যেখানে স্বভাবধর্ম, পরম্পর চিন্তাবিন্যাস যার প্রধান কর্তব্য, তাকে লেখক-প্রতিভার নিকষ পাথর বলা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাঙলাদেশের প্রথম গদ্যশিল্পী, নিকষ পাথরে অম্লান স্বর্ণরেখা।

মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয়॥

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে (১৭৬২—১৮১৯ খ্রীঃ অঃ) কেউ কেউ অবাঙালী এবং ওড়িয়া বলেছেন। যে মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে আশ্চর্য প্রতিভাধর বলে প্রণাম করেছেন, তিনিও তাঁকে

'এ নেটিভ অব্ ওড়িষ্যা' বলেছেন। তাঁর পর থেকে অনেকেই এ কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। 'দি লাইফ্ অব্ উইলিয়াম কেরী' গ্রন্থের রচয়িতা জর্জ স্মিথও বলেছেন যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ও ওড়িয়া উভয় ভাষাতেই অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি নাকি ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন এবং ওড়িয়া ভাষাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু এই ওড়িয়া বাইবেলের অনুবাদ মৃত্যুঞ্জয় করেন নি। ইনি হলেন, পুরুষরাম নামক একজন ওড়িয়া পণ্ডিত। ইনি ওড়িয়া ভাষায় 'নিউ টেস্টামেণ্ট' অনুবাদ করলে কেরী সাহেব মূল গ্রীকের সঙ্গে এর তুলনা ক'রে সংশোধন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ১৮০৪ সালের ২০এ সেপ্টেম্বরের কার্যবিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া নন, তিনি মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তখন মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি। এই ভুলটি প্রথমে ধরিয়ে দেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার; ১২৯৫ সালের 'নবজীবনে'র মাঘ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, "১৭৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে একভাগ বাঙ্গলা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণে মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যাজাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খণের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনীপুর, বিদ্যাশিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে।" অক্ষয়চন্দ্র এ সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলেন কলিকাতা নিবাসী বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। বিহারীলাল মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র। মৃত্যুঞ্জয় মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন বলে ওড়িয়াও জানতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই কলকাতায় কেটেছে।

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন—বিলেত থেকে আমদানি করা আহেলা সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্যই এই কলেজের স্থাপনা। এর সংস্কৃত-বাংলা-মারাঠী বিভাগের ভার পেয়েছিলেন শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়াম কেরী। সহকারীদের বেছে নেবার ভারও তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তখন কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৮০৫ সালে সংস্কৃত বিভাগে, আর একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। কেরী তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করে লেখেন :

"I take the liberty to recommend Mritoonjoya Vidyalunkuru who till the present time has been first Pandit in the Bengalee language, to be the Sangskrit Pandit under the new arrangement. He is one of the best Sangskrit scholars with whom I am acquainted". ('Proceedings of the College of Fort William').

সে যুগে এবং তার পরেও তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বাঙলাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কেরী মার্শম্যান দুজনেই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে অতিশয় ভক্তি করতেন। তাঁকে ডঃ জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

১. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

২. 'প্রবোধচন্দ্রিকার' শেষাংশ

"He bore a strong resemblence to our great lexicographer, not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour". ('The Life and Times of Cary, Marshman and Ward', Vol. I).

সে যুগে যাঁরাই মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরাই তাঁর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও উদারতার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর যেমন বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজে অতিশয় মান্য হয়েছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ও কিয়দংশে সেই রকম খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি আদৌ ইংরেজী জানতেন না, এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশীয় পণ্ডিতের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা মৃত্যুঞ্জয়কে উপস্থাপিত করতে পারি। বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের মতো ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার থাকলে আমরা রামমোহনের পূর্বেই একজন বিচিত্র প্রতিভাধর বাঙালীকে পেতাম।

১৮০১ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১৬ সালের দিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জজপণ্ডিতের পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টের গৌরবজনক জজপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। সুপ্রীম কোর্টে তখন দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকত। বিচারপতিরা বিদেশী, এ দেশের আচার, রীতিনীতি ও ব্যবহার বিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তাঁদের সাহায্য করবার জন্য ভারতীয় ব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী দেশীয় পণ্ডিত নিযুক্ত হতেন। তাঁকে বলা হত জজ-পণ্ডিত। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে জজপণ্ডিতের পদ লাভ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস্ ম্যাকন্‌টেনের অধীনে কাজ ক'রে তিনি নিজের যোগ্যতা সুপ্রমাণ করেন। ১৮১৬ সালের শেষাংশ থেকে ১৮১৮ সালের শেষের দিন পর্যন্ত—মোট দু-বছর তিনি এই পদে পরম গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দু-বছরে তিনি ধর্মাধিকরণে বহু ধনীকে এ্যাকুইটি মামলায় সর্বস্বান্ত হতে দেখেছিলেন। সে যুগে "সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা-করণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল। বিশেষতঃ সুপ্রিম কোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে উহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন, আমারদের বোধহয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন না" (সমাচার দর্পণ, ১৮২৯, ৩১ আগস্ট)। মামলাপ্রিয় বাঙালীর এ সুনাম বোধহয় এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মৃত্যুঞ্জয় এই দু-বছরে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ধনীসমাজ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।" প্রবীণ বয়সে তিনি কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ-সভায় তিনি অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটিরও তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮১৮ সালের শেষ ভাগে তিনি চার মাসের ছুটি নিয়ে তীর্থদর্শনমানসে কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সাতান্ন বৎসর বয়সে মুরশিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিত হয়েছিলেন, তখনই রামমোহন কলকাতায় এসে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের বেদান্ত প্রচার ও অনুবাদ ভাল চোখে দেখেন নি; কাজেই উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে মনান্তর ঘটেছিল। অবশ্য রামমোহন 'ভট্টাচার্যে'র অনেক মত না মানলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই পুরাতনপন্থী পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তাঁর কোন কোন মত মেনেও নিয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় যে নিজের বাসায় ছাত্র রেখে বেদান্তাদি পড়াতেন, এ খবর রামমোহনই দিয়েছেন ('কবিতাকারের সহিত বিচার' দ্রষ্টব্য)। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিরোধকল্পে ১৮২৯ সালে গৃহীত সরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে পুস্তিকা লেখেন, তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সতীদাহ নিরোধক অভিমতকে নিজ পক্ষের যুক্তি হিসাবে উত্থাপন করেছিলেন। সে যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' তাঁকে "পাণ্ডিত্য বিষয়ে অদ্বিতীয়" আখ্যা দিয়েছিলেন। ইংরাজী-বাংলা অভিধানের প্রসিদ্ধ সংকলক দেওয়ান রামকমল সেন তাঁকে বলেছিলেন 'দি মোষ্ট এমিনেন্ট' এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেছিলেন "কলোসাস্ অব লিটারেচর।" —এ কথা কিছু অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের ছায়াতলে পড়ে গেছেন; উপরন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় রামমোহনপন্থী, হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-শিষ্য 'ইয়ং-বেঙ্গল'গণ এবং ধর্মসভার রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে যে মতানৈক্যের ধূলি ঝড় উঠেছিল, তার ফলে অনেকেই এই অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিটির পরিচয় ভুলে গেছেন। অথচ তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' অনেক দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল; তাঁর পৌত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ সালে 'রাজাবলির' ৫ম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন—এতে মনে হয় তাঁর গ্রন্থ অনেক দিন জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছিল। কিন্তু নবজীবনের প্রবলস্রোতে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সংস্কৃত সাহিত্য-অলংকার-ন্যায়-দর্শন-মীমাংসায় ভূয়োদর্শী বাঙালী পণ্ডিত লোকস্মৃতির বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এবার আমরা তাঁর গদ্য গ্রন্থাদির কিছু পরিচয় নেব।

মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থ-পরিচয়

মৃত্যুঞ্জয় সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁরা সামান্য লিখে সুগভীর ছাপ রেখে যান; অথচ পরবর্তীকালে সে ছাপ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ১৮০২ সাল থেকে ১৮১৩—মোট ন' বছরের মধ্যে চারখানি গ্রন্থ লিখে এবং ১৮১৭ সালে আর একখানি গ্রন্থ বেনামে প্রচার করেই তাঁর সাহিত্য-জীবনে ছেদ পড়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতী করার সময়ে উইলিয়াম কেরীর অনুরোধে তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রথম গ্রন্থেই একটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় দেন। মনে রাখতে হবে তখনও রামমোহনের বাংলা গদ্যে আবির্ভাব হয় নি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীর দল তখন বাংলা গদ্যের রীতি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। উনিশ শতকের পূর্বে নানা কার্যে গদ্যের ব্যবহার থাকলেও, সাহিত্যে গদ্যবন্ধের প্রয়োগ উনিশ শতকের পূর্বে বড় একটা ব্যবহৃত হত না। কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদের বাংলা শেখাবার জন্য মূলতঃ অনুবাদমূলক ও কাহিনীকেন্দ্রিক পুস্তিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন—যাতে বিদেশীরা বাংলা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং কিছু কিছু লিখতেও পারে। কেরী সাহেব অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ভাষার যে শিল্পবোধ, সে সম্বন্ধে তিনি ততটা অবহিত ছিলেন না— বিদেশীর পক্ষে সেরকম অভিজ্ঞতা লাভ ততটা সহজসাধ্য নয়। কেরী ও শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

কর্মচারীরা—যাঁরা কিছু কিছু বাংলা চর্চা করতেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা গদ্যকে হয় ধর্মপ্রচারে, আর না হয় রাজকার্যে ব্যবহার। ভাষাকে শিল্প ক'রে তোলার দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। এ'দের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়েই ভাষার যথার্থ প্রাণরস, শিল্পরূপ, গদ্যের অন্বয়, বাক্-বিন্যাসপদ্ধতি, ইডিয়মের যথাযথ প্রয়োগ—এক কথায় গদ্যের রূপ ও রীতির প্রথম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচখানি :

১। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
২। হিতোপদেশ (১৮০৮)
৩। রাজাবলি (১৮০৮)
৪। প্রবোধচন্দ্রিকা (রচিত —১৮১৩, প্রকাশিত—১৮৩৩)
৫। বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'তে তাঁর নাম ছিল না। রামমোহনের "বেদান্তগ্রন্থ" ও "বেদান্তসারে" মুদ্রিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় নিজ নাম গোপন করে এই পুস্তিকা লিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর রচিত বা তাঁর সাহায্যে রচিত আরও দু-খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৫৫ সালে লঙ সাহেব যে "ডেসক্রেপটিভ ক্যাটালগ" সঙ্কলন করেন, তাতে তিনি মৃত্যুঞ্জয় অনুদিত 'দায়রত্নাবলী'র (উত্তরাধিকার বিধি) কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থ নাকি ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর কোন মুদ্রিত কপি বা অন্যকোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বলে আর এক খানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুদের আচারব্যবহার সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় রচনা করেছিলেন, এবং তা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তার মূল বিষয় ছিল— "A view of the Manners and Customs of the Hindoos, as they exist at the present time." এই গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যাচ্ছে না। আর একখানি গ্রন্থ রচনায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। তাঁর পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের নামে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ' নামক সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদে পিতাপুত্র উভয়েই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মনে হয় এর অনেকটাই মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদ।

॥ বত্রিশ সিংহাসন ॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন, শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ছাপাখানায় তা কেরীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। কেরী সাহেব বুঝেছিলেন, হৃদয়গ্রাহী গল্প আখ্যান না হলে সিভিলিয়ান সাহেবরা বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। তাই কলেজের পণ্ডিত মুনশীরা তাঁর নির্দেশে সংস্কৃত, ইংরেজী, ফার্সী, হিন্দুস্থানীতে রচিত গল্প উপাখ্যানকেই প্রথমে অনুবাদ করতে শুরু করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' একদা কিছু জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ ১৮১৮ সালের মধ্যে "বত্রিশ সিংহাসন"-এর চারটি সংস্করণ হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮১৬ সালের সংস্করণ 'লন্দন নগরে চাপা' হয়েছিল। ১৮৩৪ সালেও আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে আর কোন মুদ্রণ হয়েছিল কিনা জানা যাচ্ছে না।

১৮১৩ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুনশীরা অনেকগুলি অনুবাদ করেছিলেন। গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের "ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুনশীর "তোতা ইতিহাস" (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' ((১৮০৮), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "হিতোপদেশ" (১৮০৮), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) প্রভৃতি পুস্তিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কেরী গ্রন্থ নির্বাচনে কিরকম

বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আখ্যান—আখ্যায়িকা এবং দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে কাহিনী লিখবার জন্য তিনি এই সমস্ত পণ্ডিত-মনীশীদের অনুপ্রেরণা দিতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের "বত্রিশ সিংহাসন"-এর অব্যবহিত পূর্বে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) মুদ্রিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা' ১৮০২ সালে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছিল ১৮০১ সালের জুলাই আগস্ট মাসে। কেরীর "ডায়ালোগ" বা "কথোপকথন" ১৮০১ সালের দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এই 'কথোপকথন' পুরোপুরি কেরীর রচনা কিনা তাতে রীতিমতো সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত রামরাম বসু ও কেরীর পুস্তিকায় বিশেষ কোন 'রীতি' অনুসৃত হয় নি। রামরামের প্রথম গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর ভাষার অনভ্যস্ত জড়তা, ফারসী আরবী শব্দের বাহুল্য এবং অন্বয়ের বিশৃংখলা এমন বিচিত্র যে, এতে বিশেষ কোন রীতিই অনুসৃত হয়নি। অবশ্য তাঁর "লিপিমালা"র ভাষায় অন্বয় মোটামুটি সাধুভাষার অনুগামী। কেরীর "কথোপকথনে" চলিত বাকরীতির ধারা ও বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে। এর নাটকীয়তা বাদ দিলে এরীতিকে কিছুতেই শিষ্ট রীতি বলা যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ "বত্রিশ সিংহাসনে" সর্ব-প্রথম একটা ক্লাসিক সাধুরীতির স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে "দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা"র কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়;-কে এর রচনাকার তা জানা যায় না। যথারীতি কালিদাসের স্কন্ধে এর ভার অর্পিত হয়েছে। একদা সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরণের আদিরসাশ্রিত ও অদ্ভুত ঘটনাসংবলিত আখ্যায়িকা খুব প্রচলিত ছিল। পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎ কথা, দশকুমার চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকেও হিতোপদেশ, বত্রিশপুত্তলিকা প্রভৃতি সংস্কৃত উপকথার অনুবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সে জনপ্রিয়তা গোটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিদ্যাসাগরও প্রথম যে গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, তা হল "বেতাল পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭); অবশ্য তারও আগে তিনি "বাসুদেব চরিত" রচনা করে-ছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনের' আরম্ভেই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণদেশের ধারা রাজ্যের যজ্ঞদত্ত নামে এক কৃষকের ক্ষেত্রে মাটির নীচ থেকে একটি রত্ন সিংহাসন পাওয়া গেল—"প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন।" ধারা নগরীর অধীশ্বর ভোজরাজ সেই সিংহাসনটি মহা সমারোহে নিজ রাজধানীতে এনে তাতে উপবেশনের উপক্রম করতেই একটি পুত্তলিকা কথা কয়ে উঠল, "হে রাজন, শুন, যে রাজা গুণবান, অত্যন্ত ধনবান, অতিশয় দাতা, অত্যন্ত দয়ালু অতিবড় শূর, সাত্ত্বিক স্বভাব, সদা উৎসাহশীল, প্রবল প্রতাপ হন, সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য—অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নয়।" রাজা ভোজ বললেন যে, তিনিও অতি বড় দাতা, জ্ঞানী ও গুণী; তখন সেই পুত্তলিকা রাজাকে ব্যঙ্গ করে বলল, "বড়লোক সেই, যাহার গুণ অন্যে বর্ণন করে, আপনার গুণ আপনি বর্ণন করনেতে কিছু ফল নাহি, পরন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে।" ভোজরাজ পুত্তলিকার স্পষ্টবাদিতায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললেন, "হে পুত্তলিকে, এ সিংহাসন কাহার ও কিরূপে হইয়াছে, বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন, মহারাজ, সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।" এরপর গল্প আরম্ভ হল। এক একটি পুতুলের গল্প শেষ হয়। আর তারা ক্রমে ক্রমে সিংহাসনের মালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের অদ্ভুত জ্ঞানবুদ্ধির প্রশংসা করে বলে, "হে ভোজরাজ, যে রাজা এতাদৃশ ধর্মভীরু, সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত।" ভোজরাজের সে গুণ নেই, অতএব তিনি "এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।"

সর্বশেষ পুত্তলিকা (৩২শ) শেষ গল্পে বিক্রমাদিত্যের সদাশয় ধর্মভীরু চরিত্র বর্ণনা করে অন্যান্য পুত্তলিকার সঙ্গে বলল, "হে ভোজরাজ, শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোষ্টম্ভে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ, তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম, এ সকল গুণ যার থাকে, সেই উত্তম রাজা, এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য রাজা বসিলে তাহার অমঙ্গল সমূহ হয়। অতএব তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম।"

এ বত্রিশ পুতুল যুক্ত সিংহাসন ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের গুণপণাগুনে তাঁকে দান করেছিলেন। এই দিব্য সিংহাসনে যে বসবে, সেই মহৎ ধীশক্তিসম্পন্ন হবে, শ্রেষ্ঠ রাজগুণের অধিকারী হবে। বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসনে উপবেশন করে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে শাসন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ সিংহাসনটিকে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। ভোজরাজা বহুকাল পরে সেই সিংহাসনকে মাটি খুঁড়ে খুঁজে বার করেন, এবং তাতে বসতে গিয়ে লজ্জা ও বিড়ম্বনা ভোগ করেন। যাইহোক বত্রিশটি পুতুল নিজেদের কাহিনী ও বিক্রমাদিত্যের অপূর্ব-চরিত্রকথা বলে মুনিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সিংহাসন সহ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ কাহিনী এদেশে বহুকাল ধরে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় এর অনুবাদে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর তুল্য অধিকার ছিল বলেই কেরী তাঁকে এই ভার দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, "বেতাল পঞ্চবিংশতি" বা "হিতোপদেশে"র মতো এতে আদিরসের উগ্রতা অত্যন্ত অল্প, স্ত্রীলোকের চরিত্রহীনতা, লম্পটের কদাচার প্রভৃতি এতে খুব সংক্ষেপে ও স্বল্পপরিসরে নামমাত্র উল্লিখিত হয়েছে। একটা সুস্থ ও সুনীতিযুক্ত জীবনাদর্শ গল্পগুলির ফলশ্রুতি। কিন্তু 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অধিকতর চিত্তাকর্ষী, জাতিধর্মের চাপে মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসনের গল্পগুলি কৌতূহলজনক হলেও বিস্ময়রসে কিঞ্চিৎ ন্যূন, তা স্বীকার করতে হবে। তবে এ দোষ মূল গ্রন্থের, অনুবাদকের নয়, সংস্কৃত ভাষায় পরম প্রাজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় এই অনুবাদে যে রীতিটি ব্যবহার করেছেন, তাই হচ্ছে সাধুবাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুনশীদের অনেকেই এ রীতি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি, রামমোহনের গদ্যরীতিও এতটা সহজ ও সাবলীল নয়। পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে যে সাধুরীতি শিষ্টসমাজ ও সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল "বত্রিশ সিংহাসনে" মৃত্যুঞ্জয় তার প্রথম সূচনা করেন—এই জন্য এই অনুবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ হিতোপদেশ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হিতোপদেশ ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণুশর্মার নামে প্রচারিত হিতোপদেশের অন্তর্গত চারটি আখ্যানকে (মিত্র লাভ, সুহৃদ ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি) মৃতুঞ্জয় সাধুবাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এই ধরণের গল্পের চাহিদার জন্য তাঁর পূর্বেই কলেজের অন্যতম পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মা হিতোপদেশের (১৮০২) প্রথম অনুবাদ করেন। ১৮০৮ সালে কলেজের আর এক পণ্ডিত হিতোপদেশের আর একখানি অনুবাদ প্রকাশ করে গ্রন্থটি যে কতদূর জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশে বহুপূর্ব থেকে সংস্কৃত হিতোপদেশ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। খৃীঃ নবম শতকের দিকে নারায়ণ নামক এক বাঙালী লেখক বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের গল্পকে একটু আধটু রদ বদল করে এবং অপেক্ষাকৃত সরল সংস্কৃতে হিতোপদেশ প্রচার করেন। এ উপদেশ মালার উদ্দেশ্য, জড়বুদ্ধি রাজপুত্রদের সংসার, নীতি ও জীবন সম্বন্ধে গল্পের মারফতে উপদেশ দান। গোলোকনাথের রচনাটি সরল হলেও সাহিত্যধর্মী নয়, উপরন্তু এতে মূল কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বোধহয় কেরী সাহেব যোগ্যতর পাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর হিতোপদেশের বিস্তারিতভাবে অনুবাদের

গুরুভার অর্পণ করেছিলেন। এর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সাহিত্যগুণে প্রশংসনীয়। কিন্তু "বত্রিশ সিংহাসনের চেয়ে বাক্‌বিন্যাস একটু বেশী সংস্কৃতানুসারী।

> অনন্তর রাজা কহিলেন, ভো ভো পণ্ডিতেরা, আমার কথা শ্রবণ করুন। আছে কেহ এমন পণ্ডিত যে, নিত্যবিপথগামী অবিদিতশাস্ত্র আমার পুত্রেরদের এখন নীতিশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা পুনর্জন্ম করাইতে সমর্থ হয়? *

এ ভঙ্গী সংস্কৃত ধরণের পণ্ডিতী বাংলা। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় হিতোপদেশের গোড়ার দিকে ভাষাতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি ব্যবহার করলেও পরে সাধু বাংলা রীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

এই নীতিকথা সম্পর্কিত গ্রন্থে উগ্র আদিরস, দুর্নীতি, স্ত্রীলোকের অসতীত্ব ও পুরুষের চাতুরীর বর্ণনা আছে — মূল সংস্কৃতভাষায় লেখাটিতেই এই দোষ প্রকট হয়েছে। অবক্ষয়ী সমাজের পটভূমিকায় এই ধরণের রচনা সম্ভব। প্রাচীনকালের ভারতীয় সমাজে এই ধরণের গল্পগ্রন্থের খুব চাহিদা হয়েছিল, ভারতের বাইরেও হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের বহুল প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় অনুবাদের সময় আপত্তিকর গল্পগুলিকেও বাদ দেন নি।

> আর নির্জন স্থান থাকে না, এবং অবকাশ কাল থাকে না, এবং প্রার্থনা কর্তা মনুষ্য থাকে না। হে নারদ, সে নিমিত্ত স্ত্রীরদিগের সতীত্ব হয়। যেমন গরু সকল বনেতে নূতন ২ ঘাস প্রার্থনা করে, সেইরূপ নূতন ২ পুরুষ প্রার্থনা করে।......এবং স্ত্রী ঘৃতকলসের তুল্যা, পুরুষ তপ্তাঙ্গারের তুল্য। এই হেতুক বিজ্ঞ লোক ঘৃত ও আগুন একত্রে রাখিবে না। নারীদের সতীত্ব হওনের কারণ লজ্জা নয়, বিনীতিত্বও নয়, কর্মনৈপুণ্য নয়, ভীরুতা নয়—কেবল প্রার্থনার অভাবই কারণ। অপর, বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করে, যৌবনাবস্থাতে ভর্তা রক্ষা করে, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রেরা রক্ষা করে—যেহেতুক স্ত্রীকর্তৃত্বকে কখন অর্হে না।

এর ভাষা স্বচ্ছন্দ নয়, তাৎপর্য কুৎসিত। অবশ্য এর পরে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা থেকে সংস্কৃতগন্ধী জড়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো বিচক্ষণ ভাষাশিল্পী কেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাষার পশ্চাদগামিতার পরিচয় দিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় কেরীর নির্দেশে এই অনুবাদকার্যে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশে মূলকে বিশেষ অনুসরণ করা হয়নি, গল্পটি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষাকে রীতিমতো আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করে ফেলেছেন। গোলোক নাথ যেখানে লিখেছেন—"কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন," মৃত্যুঞ্জয় সেখানে লিখলেন, "কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন।" এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মুখের বাকরীতির অধিকতর অনুগত, দ্বিতীয়টি পুঁথির ভাষার কৃত্রিম গুরুভার বহন করেছে।

॥ রাজাবলি ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় গ্রন্থটি হিতোপদেশের অল্প পরে একই বৎসরে (১৮০৮) প্রকাশিত হয়। এটি অনুবাদ বা আখ্যান নয়—"কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।" গ্রন্থটির পুষ্পিকায় 'রাজাবলি'র স্থলে লেখক 'রাজতরঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।* বোধহয় তিনি প্রথম দিকে গ্রন্থটিকে

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে আধুনিক পাঠকের বুঝবার সুবিধার জন্য বিরামচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। সে যুগের গ্রন্থে ইংরেজী মতের বিরামচিহ্নের বড় একটা প্রয়োগ ছিল না।

* "পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্মা কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।"

'রাজতরঙ্গিণীর' আদর্শে 'রাজতরঙ্গ' নামে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেরীর নির্দেশে বা অন্য কোন কারণে টাইট্‌ল পেজে "রাজাবলি" নাম মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতীয়ের লেখা আধুনিক কালের কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে ঠিক ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেনি। পৌরাণিক যুগ, হিন্দুযুগ, মুসলমান যুগ (পাঠান ও মুঘল) এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত—এ ইতিহাসের কালসীমা বিস্তৃত। মৃত্যুঞ্জয় কিছুমাত্র ইংরেজী জানতেন না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "He was himself wholly unacquainted with the English Language." ৩ "রাজাবলি" রচনায় মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে ইংরেজ লেখকেরা ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছিলেন। সুতরাং ইংরেজী অনভিজ্ঞ এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতটি যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হলেন, তখন উপাদান হিসেবে পুরাতন গালগল্প ও পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন যথার্থ তথ্য অতি অল্পই পেলেন। মুসলমান যুগ ও আধুনিক কালের ঘটনাকে আলোচনায় গ্রহণ করে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পৌরাণিক ও প্রাচীন সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন—এ কম প্রশংসার ব্যাপার নয়। হিন্দুযুগের বর্ণনায় তিনি অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত পৌরাণিক ট্র্যাডিশন ও লোকশ্রুতিকে পুরানো রীতি অনুযায়ী গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন, হিন্দুযুগের বর্ণনায় তিনি বিক্রমাদিত্য, ভর্তৃহরি, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি রাজাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সবটাই যে ইতিহাসসম্মত—এমন কথা বলা যায় না। বল্লাল সেনের ডোমকন্যা সংগ্রহের গল্পটি তিনি সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ মিতবাক—সম্ভবতঃ মিনহাজউদ্দিনের 'তবকৎ-ই-নাসিরী' তখনও পাঠকসমাজে প্রচারলাভ করেনি। জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের বৃত্তান্তকে তিনি ইতিহাসের আকারে বিবৃত না করে আখ্যানের ধারা অনুসরণ করেছেন। তারপর পাঠান ও মুঘলের বর্ণনাতেও তিনি পৃথক ও বিশদভাবে এই দুই জাতির শাসনপ্রণালী ও ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে তিনি যা বলেছেন, তা অপ্রচুর হলেও অনৈতিহাসিক নয়ঃ

"এই বাঙ্গালাতে পূর্বে আদিশূর রাজার বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। তারপর বল্লাল সেনের বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। পরে হোসেন শাহের বংশেরা এই বাঙ্গালায় বাদশাহী করিয়াছেন। ইঁহারা কেহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। তারপর আকবর শাহ বাদশাহের আমল অবধি এই বাঙ্গালা দিল্লীস্থ বাদশাহেরদের অধিকৃত হইল এবং তদবধি বাঙ্গালা দেশের জিন্নতুল বিলায়ৎ নাম হইল, এবং আকবর শাহ বাদশাহ বাঙ্গালাকে এক সুবা করিয়া তাহার সুবেদার আপন সাক্ষাৎ হইতে মোকরর করিলেন।"

পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজের পরিণামও খুব সংক্ষেপে নিঃস্পৃহভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

"পরদিবস রাজমহলের নিকট পঁহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিছু খাদ্যসামগ্রীর নিমিত্তে একজন চাকরকে নৌকা হইতে নামাইয়াছিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল। সে পূর্বে মুরশিদাবাদে একজন মর্দ আদমি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছিলেন। এই অপমানে সেই ব্যক্তি সর্ব-পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল। সেই ফকীর নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে কিছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল যে, তুমি এইখানে থাক। আমি বাজার হইতে সামগ্রী আনিয়া অর্ধদণ্ডের মধ্যে রুটি করিয়া দিই।

৩. "He was himself wholly unacquainted with the English Language". ('Calcutta Review', July, 1845.

নবাব সিরাজদ্দোলার চাকর তৎকালোপযুক্ত সেকথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকীর সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব সিরাজদ্দোলা যে পলাইতেছেন একথা প্রকাশ করিল।"

লেখক সিরাজদ্দোলার দুঃশীল চরিত্রকে নিন্দা করলেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, যারা সিরাজের সঙ্গে 'নিমখারামি' করেছিল, সকলেই ঈশ্বরের কাছে যথোচিত শাস্তি পেয়েছিল। মীরণ "রাজমহল মোকামে নবাব সিরাজদ্দোলার সঙ্গে নিমখারামী করার ফলস্বরূপ বজ্রাঘাতে মরিলেন।" মিরজাফরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেলেন না, বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ "গলৎকুষ্ঠরোগে অতিশয় ব্যামোহ পাইয়া মরিলেন।" মৃত্যুঞ্জয় লার্ড ক্লীব (ক্লাইভ), হেস্টিংস প্রভৃতি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বড় সাহেব'দের প্রশংসার ত্রুটি করেন নি, "নবাবেরদেরও তাঁহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ" 'কম্পানি বাহাদুরের' আগমন হয়েছে—একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আমরা সেই আশাবায়ুতে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কেরী সাহেব সম্ভবতঃ দেশীয় ইতিহাসের বিষয়ে পুস্তিকা লিখতে কলেজের পণ্ডিত মহাশয়দের অনুরোধ করেছিলেন। তার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের আগে দুখানি ইতিহাসাশ্রিত রূপকথা রচিত হয়। একটি—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), অপরটি—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫), এই দুখানি পুস্তিকাতেও ইতিহাসের উপাদান আছে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'কে অবশ্য পুরোপুরি ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসের চেতনা বলতে যা বোঝায়, তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য একমাত্র এই গ্রন্থেই আছে। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের লেখা ভারতের হিন্দু-মুসলমান যুগ থেকে হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত সুদূর-বিস্তারী ঐতিহাসিক কালের বিবরণ আধুনিক পাঠকের নিকট নিশ্চয় বিশেষ কৌতূহলজনক মনে হবে।

আর একটি কথা—রামরাম বসুর প্রথম গ্রন্থ প্রতাপাদিত্য চরিত্রে আরবী ও ফারসী শব্দের অযথা বাহুল্য ছিল, কিন্তু কেরী বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের দৌরাত্ম্য একেবারে পছন্দ করতেন না। মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রাহ্মণপণ্ডিত সুলভ সংস্কৃত ভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ছিল, তাই তিনি ভাষায় যথাসম্ভব যাবনিক সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা "রাজাবলি"তে মুসলমান শাসন বর্ণনা করার সময় তিনি অসংখ্য ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটির উদাহরণ : মোকরর, খেতাব, ওগয়রহ, উমদা, কয়েদ, সুবে, নেয়াবৎ, তজবীজ, তাজতক্ত, দাদনি, ওজর, দরমাহি, বিরাদর, হাবেলি, চুগল, খেদমত, গুজারি, জিম্বা, কিল্লা, পেসকোস, ফতে, আন্দিজ, প্রভৃতি। এ সমস্ত ইসলামি শব্দের প্রতি তাঁর যে কোনরূপ শুচিবাতিক ছিল না এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধারযোগ্য।

॥ "বেদান্তচন্দ্রিকা" ॥ ১৮১৭ সালে নাম গোপন করে মৃত্যুঞ্জয় এই প্রতিবাদ পুস্তিকা রচনা করেন রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫) প্রকাশের প্রায় দুবছর পরে। হিন্দু পৌরাণিক ধর্মকে শাস্ত্রসম্মত বলে এবং বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে বেদান্তের অবিরোধী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিনি ইংরেজী অনুবাদসহ এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বলাই বাহুল্য ইংরেজী অনুবাদ তাঁর নয়। মুদ্রিত গ্রন্থে কোন বাংলা আখ্যাপত্র ছিল না। 'An Apology for The Present System of Hindoo Worship—written in the Bengalee language,

and accompanied by an English translation— এই ইংরেজী আখ্যাপত্রসহ ইংরেজী-বাংলা পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ শেষে 'ইতি বেদান্ত চন্দ্রিকা সমাপ্তা' এই উল্লেখ আছে বলে পুস্তিকাটি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে পরিচিত হয়েছে। ১৮১৯-২০ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তালিকায় এই পুস্তিকার বিবরণ এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

Vedanta-Chondrica .... on the Vedant System; (in defence of Hindoo Idolatry, against the observation of Rammohan Roy) .... Mrityonjoy Bidyaloncar. এই গ্রন্থটির নাম যে 'বেদান্তচন্দ্রিকা', রচনাকার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহনের একেশ্বর-বাদী 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও "বেদান্তসারে'র প্রতিবাদকল্পে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৪৫ সালের জুলাই মাসে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে বেদান্তিজম্‌, হোয়াট্‌, ইজ্‌ ইট্‌? নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল এবং এই পুস্তিকাকে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বলা হয়েছে। রামমোহন এই পুস্তিকার প্রতিবাদে ১৮১৭ সালের মে মাসে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাজকর্ম করার জন্য তাঁকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে লেখেন, "আপনি রাজসংক্রান্ত কর্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহাদের রাজসংক্রান্ত কর্ম নাই, তাঁহাদের কি দিনপাত হয় না?" তখন মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম কোর্টের জজপণ্ডিত। রামমোহন ছদ্মবেশী লেখককে ধরে ফেলেছেন—এই ব্যঙ্গের তাই হচ্ছে তাৎপর্য। সে যুগে সকলেই 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ছদ্মবেশী লেখককে চিনতেন।

১৮১৫ সালে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। "বেদান্ত সূত্রে'র ব্যাখ্যাই এর মূল অবলম্বন। এই একই বৎসরে রামমোহন আরও সংক্ষেপে 'বেদান্ত সার' প্রকাশ করে একেশ্বর-প্রতিপাদক বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রুতির "আত্মৈ বেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যং কিঞ্চিৎ সমুপাসিত ধীরঃ"—এই উক্তি অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"এই যে আত্মা, কেবল তাহার উপাসনা করিবেক। কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য না হয়" ('বেদান্তসার')। দুখানি গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রচলিত হিন্দু সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয় এই 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রচার করেন। এতে কিন্তু তিনি বেদান্তের ব্রহ্মোপাসনাকে অস্বীকার করেন নি, আবার অধিকারীভেদে সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মের পৌরাণিক দেবতত্ত্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়—উভয়ের যুক্তিই প্রণিধানযোগ্য। তবে মৃত্যুঞ্জয় ভাষার মধ্যে অনেক সময় শিষ্টাচার-বিরোধী শাণিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, রামমোহনের মতো "অগ্রাহ্যনামা রাগান্ধ তত্ত্বজ্ঞানি-মানিরদের" হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ অতিশয় অকর্তব্য, তাই সমাজ, সম্প্রদায় ও আনুষ্ঠানিক সদাচারের পক্ষ থেকে তিনি রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে নানা ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। ভাষাতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত আন্বীক্ষিকী বাগ্‌বিন্যাসের রীতি অবলম্বিত হলেও, বহুস্থলে সরস পরিহাস (একটু স্থূল হওয়া সত্ত্বেও) বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। বেদান্ত আলোচনায় লঘু হাস্যপরিহাস আমদানি করায় রামমোহন যথার্থ বলেছিলেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু-ভাষা এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়।" শাস্ত্রালোচনায় লঘু রসের আমদানি ঔচিত্যের হানি করে কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা না করেও বলা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের এই পুস্তিকার অনেক স্থলে উতরোল হাস্যপরিহাস আছে, ভাষার মধ্যে তরল সহজবোধ্যতা আছে—যদিও মাঝে মাঝে তিনি সংস্কৃত ধরণের বাগ্‌বিন্যাস ক'রে ভাষাকে একটু স্থাবর করে ফেলেছেন। 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' অশ্বচিকিৎসার নিয়ম মানুষের চিকিৎসায় প্রয়োগজনিত হাস্যকর বিভ্রান্তি প্রভৃতি ছোট ছোট আখ্যায়িকায় তিনি স্থূল হাস্যপরিহাসের সাহায্যে রামমোহনের মতামত নস্যাৎ করবার চেষ্টা

করেছিলেন। এতে রামমোহন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষোভ এই জন্য যে, শাস্ত্রালোচনায় দুর্বাক্য প্রয়োগ কুরুচির পরিচায়ক। আধুনিক কালের কোন কোন লেখক রামমোহনের পথ অবলম্বন ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ের রুচির নিন্দা করেছেন।৪ একথা অবশ্য যথার্থ। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষারীতি যে রামমোহনের গ্রন্থ দুখানির ভাষার চেয়ে কোন কোন দিক থেকে অধিকতর সুখপাঠ্য, তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

"ঐ বিদ্যা প্রথমত নারায়ণ সূর্যদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সূর্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এতদ্রূপ গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমাগত ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্য-লোকে পূর্বে প্রচলিত ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল কর্মকাণ্ড বাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। পরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগারম্ভে কৃষ্ণরূপী ঐ পরমেশ্বর অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা অতি সহজ, সাবলীল গতি, এবং অবাধিত-অন্বয়ী। অবশ্য এই পুস্তিকার উপসংহারে দেশভাষায় মোক্ষ বিদ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন, তা নিশ্চয় অধুনিক পাঠকের মনঃপূত হবে না :

"আর যেমন মণি পথে-ঘাটে পড়িয়া থাকে না, কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন, তেমনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না, কিন্তু সুপক্ক বদরী-ফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধবী স্ত্রীর হৃদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্‌মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রতেই পরাঙ্‌মুখ হন।"

অবশ্য কৌতুকের বিষয়, মৃত্যুঞ্জয়ের এই "নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক-ভাষা" 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসনে'ও ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ৫ এই 'লৌকিক ভাষা'ই গৃহীত হয়েছিল। সেকালের শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো বোধহয় তিনি মনে করতেন, মোক্ষবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে অধিকারী ভেদ আছে, অদীক্ষিত ও অনধিকারীর নিকটে এই বেদগুহ্য তত্ত্বকথা সর্বথা গোপ্য। রামমোহন বাংলা ভাষায় তার অবতারণা ক'রে "হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান" বিতরণ করছেন দেখে তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—তাই এই উগ্র অশোভন আক্রমণ।

॥ প্রবোধ চন্দ্রিকা ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাশক্তি ও সাহিত্যবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'। তাঁর অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা অল্পকালের মধ্যে লোকচক্ষু থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেলেও এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত থাকার জন্য এর গৌরব ও প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বোপরি এর ভূমিকায় মার্শম্যান যেরকম স্তুতিবাদ করেছিলেন, এ পর্যন্ত কোন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রতিকালের কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে সে রকম নির্জলা প্রশংসাবাণী ব্যবহার করেন নি। কিন্তু পরের যুগে অনেকেই মৃত্যুঞ্জয়কে অত্যন্ত নিন্দা করেছেন শুধু এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদ্ধার ক'রে। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞান, বিদ্যা, রসবোধ, মৌলিক চিন্তা, ভাষা-সাহিত্য-নীতি-ন্যায়-ব্যবহার দর্শন এবং

৪. ডঃ সুশীল কুমার দে-র মত—"It is marked by a deplorable tone of violence and personal rancour." (Hist. of the Bengali Lit. in the 19th century, p. 203, foot note).

৫. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—ব্রজেন্দ্র, পৃঃ ৪৭-৪৮।

সর্বোপরি পরিহাসরসিকতা বিচার করলে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'কে বিদ্যাসাগরের পূর্বে রচিত গদ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে। এমন কি এর রচনাসমূৎকর্ষ রামমোহনকেও ম্লান করে দেবে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মার্শম্যান বলেছিলেন, "Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauty, may justly consider himself master of the language".

একথা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মৃত্যুঞ্জয় ৪ স্তবকে এবং ২১টি কুসুমে (অধ্যায়) এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৩ সালের দিকে বোধহয় 'প্রবোধচন্দ্রিকা' সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তারপর নানা সময়ে এ গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের আদর্শে এ গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে—বিক্রমাদিত্যের পুত্র রাজা বৈজপাল তাঁর চঞ্চলমতি পুত্র শ্রীধরাধরের শিক্ষার জন্য আচার্য প্রভাকর নামে এক পরম পণ্ডিত শিক্ষককে নিযুক্ত করেন। প্রভাকর ছাত্রকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। সেই অধ্যাপনার বিষয় বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রধান কলেবর। বর্ণ, ভাষা, গদ্য, কাব্যের স্বরূপ, বাক্যের লক্ষণ, নানা হিতকর নীতিকথা, খল-চরিত্র, দুশ্চরিত্র, স্ত্রীচরিত্র, বেণরাজার কাহিনী নানা শ্রেণীউপশ্রেণী ও বর্ণসংকরের উৎপত্তি ইত্যাদি নানা বিষয় এতে সবিস্তারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখক নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের পাঠনা। বিদেশীদের কৌতূহল আকৃষ্ট হতে পারে, মৃত্যুঞ্জয় সেই রকম বিষয়ের অবতারণা করে-ছিলেন। প্রয়োজন স্থলে তিনি সংস্কৃত শ্লোকাদির অনুবাদ করে দিয়েছেন, কোথাও-বা পুরাতন বর্ণনায় আধুনিক বাস্তব দৃশ্য যোগ করে দিয়েছেন। এতে অক্ষর, ভাষা ও বাক্যের বৈয়াকরণ ও দার্শনিক আলোচনা আছে প্রচুর, সে যুগের "অভিনব যুবক সাহেবজাত" সিভিলিয়ানদের কেমন লাগত জানিনা, কিন্তু এ যুগের সাধারণ পাঠকের কাছে এ অত্যন্ত নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। ন্যায়, নীতিকথা, বেদান্ত ও অলঙ্কার—এগুলির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল, এই সমস্ত রচনায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য তিনি আধুনিক ধরণের পণ্ডিত ছিলেন না, সুতরাং এর মধ্যে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা রয়েছে। অন্ততঃ প্রথম 'স্তবকে'র পাঁচটি 'কুসুম' সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু চিত্তবিক্ষেপজনক মনে হতে পারে। বিশেষতঃ "In the technical or philosophical portion again the style sometime assumes a peculiar stiffness and learned tone."৬ একথা অযৌক্তিক নয়। তবে একথাও স্মরণীয় যে 'টেকনিক্যাল' ও পারিভাষিক ব্যাপার সাধারণের কাছে দুরূহ ও শুষ্ক মনে হবেই। যেখানে মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়শাস্ত্র এবং শব্দের অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা-স্ফোট প্রভৃতি বৈয়াকরণ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, তা সাধারণ কেন, পণ্ডিত লোকের কাছেও দুরূহ মনে হবে। অবশ্য এমন কতকগুলি আখ্যান ও নীতির গল্প সংযোজিত হয়েছে, যাতে সকলেরই প্রীতি সঞ্চারিত হবে—যেমন, অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়, লাজাবন্ধ ন্যায়, কোচবিহারের শত্রুমর্দন রাজার গল্প, কাশ্মীর তরঙ্গিণীর কাহিনী, কালিদাস ও ভোজরাজের উপাখ্যান, অষ্টবক্র মুনির গল্প, ঘৃতভোজনে অন্ধ ব্রাহ্মণের দুর্গতির গল্প,—এবং আরও অনেক গল্প। এই গল্প-গুলিতে তিনি সরস পরিহাস-কৌতুক ও বিচক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন সংস্কৃত

৬. Dr. De—Op. Cit. p. 220.

নীতিকাহিনীর আদর্শে তিনি এই আখ্যান গুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। নাটকীয়তা, সরস পরিহাস, বাস্তবতা প্রভৃতি বিচার করলে এই গল্পগুলি এখনও অতিশয় রমণীয় ও কৌতূহল-জনক মনে হবে। এক কৃষক ধূর্ত শিয়ালকে জব্দ করতে গিয়ে কীভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিল, তার সরস আখ্যান (তৃতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম) লেখক চমৎকার সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ধূর্তশিরোমণি শিয়াল কৃষকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরের কাহিনী—

"চাষা বাপরে ২, মলামরে ২, ওলো মাগি, দৌড়লো ২, চক্ষু গেল ২, এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয় মর্দন করিতে ২ শৃগাল অমনি ঝটিতি ধড়পড় করিয়া উঠিয়া চাষার পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চখে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল। চাষা হাবা হইয়া ইস্ উস্ করিতে থাকিল"। এর কৌতুকরস স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক, যদিও আধুনিক রুচির কাছে কিছু গ্রাম্য মনে হবে। এই 'ভাল্‌গারিটি' সম্বন্ধে মার্শম্যান যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his view of original humour." কিংবা সেই 'দশম ন্যায়'-এর গল্পটি। দশজন লোক নদী পার হচ্ছিল, পার হয়ে গুণতি করতে গিয়ে প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ গুণতে লাগল, ফলে প্রত্যেকেই দশজনের স্থলে ন'জনকে গুণে পেল। তারা প্রত্যেকেই মনে করল, আর একজন নিশ্চয় খোয়া গেছে।

> অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, 'ওহে দশম, কোথা আছ, শীঘ্র আইস। আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি। তোমাকে পাইলে সুখী হই। অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস।'

কিন্তু দশম ব্যক্তির সাড়া পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তারা প্রত্যেকেই আত্মবিস্মৃতির বশে নিজেকে বাদ দিয়ে গুণেছে। তখন তারা এই সিদ্ধান্ত করল :

> বুঝি আমারদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল, সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি। শ্যালা বড় দুষ্ট। যদি পাই তাহার বাপের বিয়া দেখাইব।

লেখক একটা গূঢ় তত্ত্বকথাই বলতে চেয়েছেন—মানুষ কতটা আত্মবিস্মৃত যে, সে জগৎ-ব্যাপারে নিজেকেও ভুলে বসে থাকে, বোধহয় এই রকম একটা তত্ত্ববাদ এই 'ন্যায়ের ফাঁকি'র উদ্দেশ্য। কিন্তু লেখার সরসতার ফলে গম্ভীর তত্ত্বকথাও কৌতুকরসে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মৃ ত্যু ঞ্জ য়ে র গ দ্য রী তি ॥

বাংলা গদ্য ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে আর কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম গদ্যশিল্পী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এমন একটা কুসংস্কার জন্মে গেছে, যে, এই 'ভাষাচতুর' গদ্যশিল্পীকে দুর্বোধ্য ভাষার লেখক.বলে অনর্থক তাঁর পরিবাদ করে এসেছি। মার্শম্যান তাঁর গদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour.'৭

একথা অনেকের কাছেই অত্যুক্তি মনে হয়েছিল। কেরী ও মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে বাধ্য ছাত্রের মতো ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। অনেকে ভাববেন—এই প্রশংসাবাণী বোধহয় সেই কৃতজ্ঞতাপ্রসূত।৮ এই ভ্রান্ত ধারণার বশে রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—

সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার ত্রুটি ধরেছেন। রামগতি নিজে একজন সংস্কৃত-ব্যবসায়ী হয়ে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এ মন্তব্য করতে বিরত হন নি, "তিনি যে সময়ের লোক, এবং যেরূপ শিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে উহা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর ভাষা বহির্গত হইবে, এরূপ আশা করা একপ্রকার অসঙ্গত।" এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র একটি বাক্য "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যপংক্তিটি শুধু দুরূহ নয়, হাস্যকরও বটে। কিন্তু এটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয়। তিনি 'মধ্যম প্রাণাক্ষরবহুলা বাণী'র দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এটি রচনা করেছিলেন। উপরন্তু এটি তাঁর নিজস্ব রচনা নয়, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে'র একটি পংক্তির অনুবাদ ঃ　　কোকিলকলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ।

উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ কণোক্ষিতঃ ॥

অনুবাদটি সুখপাঠ্য হয়নি, তা অবশ্য স্বীকার্য। লেখক ব্যাকরণ ও শব্দ শাসন আলোচনা করতে গিয়ে এই রকম নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন অল্পপ্রাণাক্ষর শিলষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত—"ভ্রমদ্ভ্রমরালিঙ্গিত মালতীমালা লোলালিকুলকলিতা;" অপ্রসিদ্ধ অপবাক্য—"অনর্জুনাব্জন্মে সদৃক্ষাঙ্ক বলক্ষগুতে লক্ষ্মীকার;" বিশেষণযুক্ত উদার বাক্য—"নীলোৎপল ক্রীড়াসরোরুহ হেমাঙ্গ পীনপয়োধর-সুধাংশুমুখী মদঘূর্ণিতলোচনা মদনমদালসবিলাসিনী স্তনভরনমিতাঙ্গী গুরুনিতম্বভারমন্থরা মলয়নন্দনগন্ধবাহ　কোকিলকলকূজিত　বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃত দিঙমুখ।" বলা বাহুল্য মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম বাক্‌রীতি দৃষ্টান্ত হিসেবেই উদ্ধৃত করেছেন। তাই দুরূহ-অন্বয়, পদবন্ধহীন অসমঞ্জস বাংলা গদ্য রচনার পুরোপুরি দোষটা মৃত্যুঞ্জয়ের স্কন্ধে আরোপ করা যায় না। আমাদের তো মনে হয়, মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে রীতিমতো চিন্তা করেছিলেন, নানা ধরণের বাক্‌রীতি নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। ঠিক এই রকম রীতিসচেতন গদ্য লেখবার কোন চেষ্টা রামমোহনের রচনায় দেখা যায় না, বিদ্যাসাগরের পূর্বে প্রায় কারো ভাষাতেই এ ধরণের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠেনি।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতিকে মোটামুটি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। (১). বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি, বিন্যাসপদ্ধতি ও অন্বয়, (২) সাধু, পরিচ্ছন্ন ও বিবৃতি-ধর্মী গদ্য (৩) চলিত, বাস্তব ও নাটকীয় সংলাপপদ্ধতি।

॥ "সংস্কৃত ঘেঁষা বাক্‌রীতি"॥ সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনে পরম পারঙ্গম মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু কিছু রচনায় ও বাকরীতিতে সংস্কৃত গদ্যের বিন্যাসপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। শব্দযোজনা, পদান্বয়, সমাসসন্ধির দ্বারা সংহত বাক্যাংশ, পুরাতন ধরণের শব্দ-প্রয়োগ, শব্দের অভিধেয়ার্থকে ছেড়ে অন্বিতার্থের দিকে অধিকতর আকর্ষণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই রীতির লক্ষণ। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

> যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘটিত মসীলিখিত বর্ণাপূরিতাবস্থাত্রয়ে ঐ এক মহাপটের স্ত্রীপুরুষাদি বিচিত্র নানাকারতা প্রাপ্ত হয়। ও ঐ অবস্থাত্রয় লোপে, শুদ্ধৈকমহাপটস্বরূপাবস্থান হয়। তন্ন্যায় এক ভূমব্রহ্মের একদেশে ঘটজনানুকূল মৃত্তিকাচৈক্কণ্য-শক্তির ন্যায় স্বশক্তি ও সূক্ষ্ম তৎকার্য ও স্থূল তৎকার্য সাকল্যরূপ ত্রিতয় সম্বন্ধকৃতাবস্থাত্রয় ভেদে

৭. The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I.

৮. "Mr. Carey sat under his instruction two or three hours daily when in Calcutta."—Ibid.

> মহাপটস্থলাভিষিক্ত ঐ এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণগর্ব্ভ ও বিরাট ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেবদেবী ও আর আর চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন। ('বেদান্ত চন্দ্রিকা)

আর একটি দৃষ্টান্ত :

> অতএব অস্মাদি ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রবর্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্বোক্তক্রম হট্টস্থ পুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মাদাদি ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি, সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলাদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

এখানে বাক্যগঠন দীর্ঘ, সমাসসন্ধি অনাবশ্যক, শব্দযোজনায় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের পাণ্ডিত্য অতিপ্রকটিত—বাংলা ভাষায় এ রীতি অনভ্যস্ত ও অস্বাভাবিক। মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম রীতির ব্যবহার জানতেন, নানা পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু এই দুরূহ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি যে বাংলা ভাষায় চলতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। কেননা পরিণত ও পরবর্তী রচনাতেও তিনি এই উৎকট রীতি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। অবশ্য এর জড়তা ও দুরূহ শব্দবিন্যাস নিশ্চয়ই আপত্তিকর। তবে দেড়শ বছর আগে এ ভাষা একজন সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের লেখনী থেকে বেরিয়েছিল, এজন্য তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার্য। কিন্তু এখনও কি আমরা ভাষাগত দুরূহতার প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি? আজকাল নবীন লেখক-সম্প্রদায় যেরকম জটিল-কুটিল-বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তাতে মনে হয়—'পরা', 'পশ্যন্তি' 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' বাকরীতির মধ্যে অধুনাতন কোন কোন লেখক শেষোক্ত 'বৈখরী' রীতিকে মহানন্দে শিরধার্য করেছেন। সাম্প্রতিক গদ্য রচনার একটু নমুনা দেওয়া যাকঃ

"প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে সম্প্রতি তারুণ্যের উন্মাদনা বিবশ অনিকেত; উন্মুক্তির প্রত্যক্ষ উপায় যেহেতু অবর্তমান, বাধ্যত অবদমন কখনো বিকৃত আপজাত্যে চীৎকৃত কখনো অসহায় নিরুদ্বেগে তমসালীন স্ফুরিত বিষাদ। সামাজিক সুস্থিতি তারুণ্যের স্বভাবী বিদ্রোহের স্বপ্নকে প্রতিহত করে এবং অধুনা সমাজ যেহেতু ক্রম-অপসৃয়মান জরাগ্রস্ত পরিশ্রম যৌবনের সফল প্রয়াস, প্রকল্পনা বিদ্যুতি বিরোধের অপনয়নে নিঃসঙ্গ পর্বতের সামর্থ্য অথবা মহীরুহের শব্দিত একাকী।" ('সম্প্রতি', ১ম বর্ষ, ২য় সংকলন, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮)

এর পাশে মৃত্যুঞ্জয়ের 'অস্মদাদি' নিতান্তই হামাগুড়ি- দেওয়া অপোগণ্ড বলে মনে হবে। যাইহোক সংস্কৃতগন্ধী বাকরীতিই যদি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র ভাষা হত, তাহলে তাঁকে আমরা সহজেই বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে চিরনির্বাসন দিতে পারতাম। এ রকম কৃত্রিম ভাষা ছেড়ে দিলেও, তাঁর পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা বাস্তবিক প্রশংসারযোগ্য। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি সুচিন্তিত ও যুক্তি গ্রাহ্য—"ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার) মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার) মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।....নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গালা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন-না, তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক—অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ।"

॥"সহজ সাধুভাষা॥" মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ ভাষা হচ্ছে স্বাভাবিক সাধু বাংলা গদ্য। যে রীতিটি

বিদ্যাসাগরের হাতে পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে, এতদিন ধরে যে ভাষাতে বাঙালীর জীবন, মনন ও সাধনা ধীর গতিতে বয়ে চলেছে, মৃত্যুঞ্জয় সেই সাধুভাষাকেই যথার্থতঃ প্রথম সার্থক-ভাবে ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর প্রাচীন সাহিত্য, মুখের বাক্‌রীতি ও পুঁথিপত্রে যে ধরণের সাধুভাষা পশ্চিমবঙ্গীয় বাচনভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় তার প্রথম আকার অবধারণ করেন। একটি দৃষ্টান্ত :

> এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এ রাজ্য অরাজক কেন? মন্ত্রীরা কহিলেন, রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন; আমরা রাজ্যরক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি, রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ('বত্রিশ সিংহাসন')

এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ আপন ভাষা। তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই ধরণের পরিমিত বাক্য গ্রহণ করেছে, পরবর্তীকালে এই সাধুরীতি বাঙলাদেশের একমাত্র সাহিত্যের ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাধু-গদ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী চলিত ভাষার শক্তিসামর্থ্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্তু উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ—প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই সাধুরীতিই বাঙলার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় এই রীতিটিকে বিশেষভাবে অনুশীলন ও ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'রাজাবলি' ও 'বত্রিশ সিংহাসনে'র মূল কাঠামো এই রীতিকেই অনুসরণ করেছে। 'হিতোপদেশে'র ভাষা অবশ্য কিঞ্চিৎ গুরুভার এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষায় শাস্ত্রবাক্যানুসরণের চিহ্ন আছে। কিন্তু 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' তিনি নানা রকম রীতির ব্যবহার করেছেন। তাঁর হাল্কা চালের সংলাপী ধরণের সাধু-রীতিও অতীব উপভোগ্য :

> অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই, তোমার নাম কি? সে কহিল, আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণমাত্র হী হী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল, না ভাই, আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

এখানে লক্ষণীয় ভাষার ঠাটটি মোটামুটি সাধুভাষার অনুরূপ হলেও চলতি ইডিয়ম ও বাক্-রীতি ভাষাকে নাটকীয় ও আখ্যানধর্মী করে তুলেছে। বস্তুতঃ নাটকীয় সংলাপ, বাস্তব চরিত্র-চিত্র, একটু স্থূল ধরণের পরিহাস—এবং সর্বোপরি কল্পনার বস্তুতদেকাত্ম ভাব (objectivity) বিচিত্র আকার ধারণ করেছে।

॥ "চলিত রীতি" ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত মাঝে মাঝে অত্যন্ত চলিত গ্রাম্য বাস্তবধর্মী নাটকীয় সংলাপের মতো যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন, তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। অবশ্য তাঁর ভাষাভঙ্গিমা মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় বাস্তব-রীতিকে অনুসরণ করেছে বলে আধুনিককালের পাঠক তাতে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করতে পারেন। তাঁর মতো পণ্ডিত ও ভূয়োদর্শী ব্যক্তির মনেও একটি কৌতুকপূর্ণ লঘুচপল মানুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত। তখন তিনি রুচির শুচিতা ভুলে, নিজ পদমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অট্টহাস্যের কলরোলে মেতে উঠতেন। এ সেই উনিশশতকী হিউমার, যা রুচির শালীনতা, সামাজিকতা ও ভব্যতার বড় একটা পরোয়া করত না। তাঁর এই ধরণের পরিহাস ও কৌতুকরস আধুনিক রুচিকে আঘাত করতে পারে আশঙ্কা ক'রে আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত নিরীহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এক ধূর্ত শিয়াল বাঘের অনুপস্থিতির সুযোগে ভীরু বাঘিনীর কাছে গিয়ে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করেছে :

ওলো লক্ষ্মীছাড়া মাগী, তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড় বেটা কমনে গেল? …দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায়-একমাস হইলো আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি, দেখাই পাওয়া যায় না। আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয়, বসিয়া আছি—তাহার খোঁজ-খবর নাই। নিশ্চিন্তে নাভিতে তেল দিয়া আমার দন্ত মাংস ভোজনে মাগুকে চিক্‌ণা করিয়া পিন্ডীশূর গেহনর্দী বেটা বসিয়া আছে। আন্ মাগী, আজি বেবাক সকল মাংস লইব, তবেই উঠিব। (প্রবোধচন্দ্রিকা)

দৈবগতিকে বাঘ গাছের ডালে গলা আটকে মারা পড়ল। শিয়াল নিশ্চিন্ত হয়ে সগর্বে বাঘিনীর কাছে এসে বড়াই করতে লাগল :

ওলো লো মাগী, কেমন, এখন হইল? যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে তা ভুঁয়ে পড়েনা। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয়, দেখসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।…যা দেখ গিয়া, তোর মহাবলাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দারাম জাজ্বল্যমান বসিয়াছেন।…যা না দেখ গিয়া, তাহাকে ঘুষড়িয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি। বাবাজী চক্ষু তড়ঙ্গিয়া দাঁত বিদ্‌ড়িয়া পড়িয়া আছেন, বাহাদুরি ঘুষড়িয়া গিয়াছে। ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপের গল্পের জীবজন্তু যেন মানুষের ভূমিকা অভিনয় করেছে। এর নাটকীয়তা, কৌতুক, অসঙ্গতিজনিত হাস্যপরিহাস পরবর্তীকালের দীনবন্ধুর নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয়। চলতি, গ্রাম্য, অভব্য শব্দকে এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর পরেই বা কজন ব্যবহার করতে পেরেছেন?

তাঁর এই জাতীয় রচনার আর একটা বৈশিষ্ট্য কথকতাসুলভ দীর্ঘ বাগ্‌বিস্তার সাধুভাষাতেও তাঁর এই মুদ্রাদোষ ছিল। দু-একটি উদাহরণই যেখানে যথেষ্ট হত, সেখানে তিনি দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন। এখানে আমরা একটি সাধুভাষা, আর একটি চলতি ভাষার উদাহরণ দিচ্ছি :

১। যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা—আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র ২ রথী, অযুত ২ গজারূঢ়, লক্ষ ২ অশ্বারূঢ়, নিযুক্ত ২ উষ্ট্রারূঢ়, কোটি ২ অশ্বতরারূঢ়, অর্বুদ ২ ধনুষ্ক, বৃন্দ ২ অগ্নিযন্ত্র, খর্ব ২ খড়্গচর্মধারী, শত ২ কশ, তূণ, বাণ, ধনু, ঢাল, তরোয়ার, খড়্গ, বরশা, কাটার টাঙ্গি, বন্দুক, কামান, নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পুরিয়া চালান করিলেন।

২। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জনী অর্থাৎ খেঙরা, কেহ চর্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জন তর্জন ভর্ৎসন করত, 'রে রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার, স্ববংশ-পাংশুল, রণকাতর, যুদ্ধপরাঙমুখ, নির্লজ্জ খট্বারূঢ় ব্যলীক, নিঃসাহস, সহিস কুড়িয়া বেটা, তোর নিমিত্ত আমাদের ভীম মা ভাই স্ত্রী-পুত্র খুড়া খুড়ী জ্যেঠা জ্যেঠী ঝি-জামাই, মামা-মামী, পিসা-পিসী মাসুয়া-মাসী, শ্বশুর-শাশুরী, বেহায়ী-বেহানী, শ্যালা-শ্যালী ভাইজ-ভাইবহু, ভাদ্রড়াভাই, তাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্মম নিঃস্নেহ

হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালনধর্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন।'

এ সমস্ত বর্ণনা বিগত যুগের কথকতার রীতি অনুসরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, কিছুটা কৌতুকরসের দিকেও লেখকের লক্ষ্য ছিল। বাঙলাদেশের বাক্‌রীতি ও ইডিয়মকে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করে, চলতি শব্দের গ্রাম্যতাকে ঘৃণা না করে এই পরম প্রাজ্ঞ পণ্ডিত রচনায় একটি প্রশংসনীয় ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই', 'ফলে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরের মার গলায় গলগণ্ড', 'আমানি খাইতে দাঁত ভাঙ্গিল সিঁদুর পরিব কিসে' প্রভৃতি বাংলা কৌতুক প্রবচনগুলিকে তিনি সুন্দর ব্যবহার করেছেন, নানা রীতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, মূলতঃ সাধুভাষায় কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবহার করলেও, চলতি-ইতর গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যরীতিকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়ে তিনি কৌতুক-পরিহাসপ্রিয়তার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যই তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে চিরদিন শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়॥

১৮১৭ সালের দিকে কলিকাতায় সতীদাহ প্রথা নিয়ে কিছু কিছু আন্দোলন চলছিল। ঐ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারক সহগমন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান জানবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করেন। মৃত্যুঞ্জয় অনুরুদ্ধ হয়ে সংস্কৃতে একটি প্রতিবেদন পত্র রচনা করেন, তাতে তিনি সহগমনের চেয়ে বৈধব্য জীবনকে অধিকতর সমর্থন করেছিলেন। বেদান্ত প্রচার বিষয়ে তাঁর ঘোরতর প্রতিবাদী রামমোহনও একখানি পুস্তিকায় ('Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India')

মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতকে প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জয় এই উদার মত ব্যক্ত করেন। রামমোহনের সহমরণবিরোধী গ্রন্থ তার পরের বছর (১৮১৮) প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত রচিত প্রতিবেদনখানি পাওয়া যায় নি, কিন্তু তাঁর অভিমতের সারমর্ম ১৮১৯ সালের 'Friend of India'-র অক্টোবর সংখ্যায় ইংরেজীতে সংক্ষেপে মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিবৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের জজপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় প্রধান বিচারকের নির্দেশে বহু লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং প্রায় ৩০ খানি অতিপ্রামাণিক স্মৃতিসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র বিচার করে সহগমন সম্বন্ধে অভিমত দিয়েছিলেন। মনু, হারীত, বিষ্ণুমুনি প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, হয় সহগমন, আর না হয় বৈধব্য—শাস্ত্রে এই দুই ব্যাপারের সমর্থন আছে। কিন্তু স্বামীর চিতার সঙ্গে স্ত্রীকে বেঁধে জোর করে পোড়ানো তাঁর মতে অত্যন্ত অন্যায়—নারী হত্যার সামিল। এর জন্য তিনি 'সুধীকৌমুদী' 'নির্ণয়সিন্ধু'র মত উদ্ধৃত করেন। তারপর তিনি বলেন, শাস্ত্রে সহগমনের উল্লেখ থাকলেও এযুগে নির্মম বিধি কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি উপসংহারে যা বলেছিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম : অনেক গ্রন্থ পাঠ করে আমার মতামত হচ্ছে এই—মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর অনুগমন অতীব অকর্তব্য, স্বামীহীনা স্ত্রীলোকের সজ্জীবন ও বৈধব্যযাপনই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শাস্ত্রে সহগমনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখ থাকলেও বৈধব্যকে সব শাস্ত্রই মান্য করেছে।

এই আশ্চর্য ঋজু মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে রামমোহনের প্রতিস্পর্ধী, শাস্ত্রজ্ঞ, পুরাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল মৃত্যুঞ্জয় সতীদাহ বিষয়ে রামমোহনের পূর্বেই অতিশয় উদার মতের পরিচয় দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য, স্মরণযোগ্য।

বে দা ন্ত ও মৃ ত্যু ঞ্জ য়॥

অনেকের ধারণা এদেশে রামমোহনই সর্বপ্রথম বেদান্তের চর্চা শুরু করেন। একথা ঠিক নয়। উনিশ শতকের আগে থেকে এদেশে রীতিমতো বেদান্তের অনুশীলন হত। উপনিষদ ও বেদান্ত বাঙলাদেশে ষোড়শ শতক বা তারপরেও পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এ বিষয়ে ১৩৬৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'সমকালীন'-এ 'বাংলা গদ্যে রামমোহন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে একটু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে এই প্রসঙ্গে দু-এক কথা বলা যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন'-এর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৬৮) আমার উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ঐ প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন এমন কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক থেকেই বাঙলার শিষ্ট-সমাজে বেদান্তের অনুশীলন চলে আসছে। চৈতন্যের প্রধান ভক্তদের অনেকেই প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে তাঁরা চৈতন্যের প্রভাবে ভক্ত হয়েছিলেন। অদ্বৈত, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর সকলেই চৈতন্য প্রভাবের পূর্বে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। এ ছাড়া মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদীরা ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং রামমোহন পূর্বধারারই অনুবর্তন করেছেন—অবশ্য মাতৃভাষায়। এ বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রথমতঃ রামমোহনের পূর্ববর্তী বাঙালী বৈদান্তিকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের সামনে বেদান্তের শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত কাকে বলে জানত না।" এ সম্বন্ধে মনে হয় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সম্যক্ অনুসন্ধান করেন নি। চৈতন্যযুগে বা তার আগে শিষ্ট সমাজে বেদান্ত চর্চা তো ছিলই, এমনকি সাধারণ শিক্ষিত সমাজও বেদান্তের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যকে তীক্ষ্ন সমালোচনা করে বেদান্তসূত্রের ভক্তিপন্থী দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ সমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই বেদান্তচর্চা জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর রচনার নানাস্থানে বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করেছেন—যথাসাধ্য তার ব্যাখ্যাও করেছেন। সুতরাং রামমোহনের পূর্বে বেদান্তের মূল কথা-গুলি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল না তা নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তের ছিটেফোঁটা সাধারণ সমাজে যতটা জানা সম্ভব ততটাই প্রচলিত ছিল। কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে অনক্ষর লোক-সমাজে বেদান্ততত্ত্ব যে প্রচারিত হয়নি, তাও জোর করে বলা যায় না। তবে পূর্বতন বৈদান্তিক ও রামমোহনের মধ্যে আরও বড় রকমের পার্থক্য আছে যেটি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ততটা লক্ষ্য করেন নি। পূর্বতন বৈদান্তিকেরা পুরাণ ও বেদান্তকে অবিরোধে গ্রহণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে, পৌরাণিক দেবতত্ত্ব এবং বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব—উভয়ই হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য। ধর্মাচরণে যে নিম্নাধিকারী, কাম্যকর্মে তার অধিকার। কিন্তু যিনি অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করেছেন, শুধু তিনিই বেদগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। অর্থাৎ বেদান্ত পুরাণবিরোধী নয়, উভয়ের মধ্যে কার্যকারণাত্মক যোগাযোগ না থাকলেও বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদের কিছু প্রভাব আছে। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে পুরাণ ও বেদান্তের নিত্য-বিরোধী সম্পর্ক। রামমোহন বেদান্তে শুধু একেশ্বরবাদ দেখেছিলেন, পুরাণে বহু দেববাদ আছে বলে সমগ্র পৌরাণিক ধারাকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তাঁর মতে পুরাণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বেদান্তই একমাত্র শরণ্য। ইতিপূর্বে বাঙলাদেশে এভাবে কেউ পৌরাণিক ধর্ম, আচার ও আদর্শের

বিরুদ্ধে এতটা প্রচণ্ড উক্তি করেন নি। মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে পুরীতে এবং প্রকাশানন্দের সঙ্গে কাশীধামে বেদান্তের ভাষা ও অর্থ নিয়ে বিতর্কে শঙ্করাচার্যের নামে প্রচারিত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও মুমুক্ষা—উভয়কেই প্রত্যবায় বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ অর্থ নিঃশ্রেয়স্ ভক্তি। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মত ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে রফা করেন নি, তাই তদানীন্তন সমাজে এতটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি সম্বন্ধে বলেছেন, "আসলে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের পত্রটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মত জানবার চেষ্টা করা বৃথা। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৩) পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, এই ছিল বড়লাট সকাশে রামমোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন হিন্দু দর্শনের প্রায় সমস্ত বিভাগের, এমন কি বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি।" এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমহার্স্টকে পত্র দিয়েছিলেন, তা ঠিক বটে, কিন্তু যে বেদান্তের ওপর রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকেও আক্রমণ করলেন—এর দ্বারা রামমোহনের চিত্তলোকে অন্তর্লীন একটা স্ববিরোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি? ধর্মাচার বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন 'কাল্ট্' সৃষ্টি করতে উন্মুখ হন নি, জীবনে ও আচরণে অতিশয় তীক্ষ্ণ 'প্র্যাগম্যাটিক' রামমোহন ধর্মের পরিবর্তন ও ঐক্যসাধনার জন্য রাজনীতি ও সমাজনীতিকেই অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি স্পষ্টতঃই বলেছিলেন যে, রাজনীতি ও সমাজ-নীতির জন্যও অন্ততঃ হিন্দু-সমাজ-ধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন :

> It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.

পূর্বতন বেদান্তবাদী ও আধুনিক রামমোহনের সঙ্গে এইখানেই প্রভেদ। রামমোহন বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, এর মূল কারণ মানুষের ভৌমজীবনের কল্যাণ সাধন, ইহত্রের সুখসংবিধান—পরত্র তাঁর অন্বেষার বাইরে। কাজেই বেদান্ততত্ত্ব তাঁর মস্তিষ্কজীবী সত্য, বেদান্তের নির্গুণ নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের কথা বললেও রামমোহন ধর্মচর্চার জন্য গিরিদরী-বনভূমিতে গিয়ে সুকঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন বোধ করেন নি, আবার আবেগপ্রবণ ব্যক্তির মতো ঈশ্বরের লীলারসে ডুবে মর্তসত্তা বিস্মৃত হওয়াও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বেদান্ত-উপনিষদের কথা পুনঃ পুনঃ বললেও তিনি শঙ্করাচার্য নন, রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব-বল্লভাচার্য নন; এককথায় তিনি মধ্যযুগীয় সাধক ছিলেন না, পূর্বতন যুগের নিষ্ফল ব্রহ্মবাদীও ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের হিউম্যানিস্ট্। তাঁর প্রধান অবলম্বন 'l'uomo Universale' —মানবসত্তার সমগ্রতা, বিশ্বমানবতা।

এবার মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তানুশীলন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, রামমোহনের বেদান্ত সংক্রান্ত দুখানা গ্রন্থ (বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫; বেদান্তসার, ১৮১৫) প্রকাশের পর কলকাতায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছিল, তখন কেউ কেউ পুরাতন-পন্থী পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী উদ্যত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' (১৮১৭) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২০) বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। কাশীনাথের পুস্তিকা রামমোহনের ব্যক্তিগত কুৎসাতেই পূর্ণ, শাস্ত্রবিচার ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের প্রতি অনুচিত পরিহাসবাক্য নিক্ষেপ করলেও মূলতঃ তিনি বেদান্ত ও পৌরাণিক ধর্মের তত্ত্বকথাকে রীতিমতো শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে আলোচনা করেছেন। তিনি রামমোহনের প্রতিবাদী হলেও বেদান্তের পরিবাদ করেন নি। রামমোহনের উক্তি থেকেই ('কবিতাকারের সহিত বিচার'--১৮২০) দেখা যাচ্ছে যে, ১৮২০ সালে শহরের পণ্ডিত-অধ্যাপক এবং মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য উপনিষদের পুঁথি ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য ছিল। ওয়ার্ডের গ্রন্থে ৯ আছে যে, ১৮১৭ সালেই বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে বেদান্তাদি অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তিনি যে রামমোহনের দেখাদেখি বেদান্ত অনুশীলন করেছিলেন তা নয়। ১৮০২ খৃীঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসনে' স্পষ্টতঃ বেদান্তের প্রতিধ্বনি আছে :

> তিনি এক পরমেশ্বর। তাঁহার স্বরূপ এই—সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, কার্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ-ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন অথচ সর্বত্রগ, এবং পাণিহীন সর্বগ্রাহী, নেত্রহীন সর্বদর্শী, শ্রোত্রহীন সর্বশ্রোতা। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না; সর্বত্রস্থিত, কিন্তু সকলেরি দুর্লভ। তাঁহার কেহ আধার নয়, তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ।

মৃত্যুঞ্জয়ের এ গ্রন্থ রচনার প্রায় সমকালে রামরাম বসুর 'লিপিমালা'র (১৮০২) ভূমিকায় বলা হয়েছে—"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।" তখন রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়নি। 'লিপিমালা' ও 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশিত হবার বছর দুই পরে রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক ফরাসী গ্রন্থ 'তুহ্ফাতুল মুঅহাদীন' প্রকাশিত হয়। কাজেই রামমোহনের বাংলা-ভাষায় বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করলেন, তা ঠিক নয়। তবে তিনি এই তত্ত্ব নিয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন—এইখানে তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব।

মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদান্তকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মসংস্কার (অর্থাৎ পৌরাণিক আদর্শ) ত্যাগ করেন নি। তাঁর পুস্তিকায় প্রথমেই তিনি রামমোহনকে আক্রমণ করে বলেছেন, "বকধর্তদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র অনাস্থা না হয়"—কেবল এই জন্যই তিনি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি প্রথমে বেদের সকাম উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তারপর 'অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ' অর্থাৎ বেদান্ততত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—"তোমরা যদি সাংসারিক সুখাভিলাষী হও তবে বিহিত কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষদারূপ মহাবৃক্ষাগ্রারোহণ কদাচিৎ করিও না।" স্ব স্ব দেবতার বিহিত পূজার পর অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণান্বিত হলে তবেই মোক্ষপদ পাওয়া যায়। যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠতে গেলে আগে মূল থেকে শুরু করতে হয়, তেমনি ধীরে ধীরে কাম্যকর্মের সোপান ধরে ধরে পরমপদে আরোহণ করতে হয়। তাঁর মতে, "জ্ঞানার্থ নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দৈকরম পরমাত্মা ও তজ্জ্ঞানানুকূলোপাসনার্থে সগুণ ব্রহ্ম এই দুইতে বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য.. ..অচিন্ত্যানন্ত শক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তিনি স্বশক্তি প্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে

৯. 'A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos'—Vol. IV.

উপাস্য হন।” ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ রূপানুশীলনই যথার্থ বেদান্তধর্মের প্রতিপাদ্য, এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তবিষয়ক সিদ্ধান্ত। এককথায় পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজে উত্তর-বৌদ্ধ যুগ থেকে যে ধরণের দেবোপাসনা প্রণালী চলে আসছিল, মৃতুঞ্জয় সেই পন্থানুবর্তী ছিলেন। তিনি বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বকে পুরুষার্থের চূড়ান্ত ও পারমার্থিক পরিণাম বলে মানলেও পৌরাণিক সংস্কারকেই সেই উচ্চতম পদবী আরোহণের অতিপ্রয়োজনীয় সোপান বলে মনে করতেন। রামমোহন এই দিক থেকে নঙর্থক মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে বেদান্ত-উপনিষদ-আশ্রয়ী একেশ্বরবাদই যথার্থ আর্যধর্ম, পরবর্তীকালের স্বার্থগৃধ্নু ব্রাহ্মণসমাজের একদেশদর্শী সংকীর্ণতা ও পৌরাণিক সংস্কারের অবক্ষয়ী হীনাদর্শের জন্য এই পরম কাম্য ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্টসমাজে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। তাকে পুনরুদ্ধার করে হিন্দুসমাজের শ্রেণীজাতি সম্প্রদায়গত অলাতচক্র ভেঙে দিয়ে এক এবং অদ্বিতীয় যে পরমদৈবত, তাকেই একমাত্র উপাস্যরূপে প্রমাণ, প্রচার ও গ্রহণের জন্য রামমোহন একান্তভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মনে করতেন, “উপাস্য সগুণব্রহ্ম বস্তুতঃ নিরাকার হউন, তথাপি অনির্বচনীয় স্ব-শক্তির আবেশ প্রযুক্ত যোগীরদের যোগ বলেতে নানাকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্তমান হইয়াছেন।” ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ নিরুপাধিক, না সাকার সগুণ সোপাধিক—এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বলেন যে, যেকোন ব্যক্তির নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করলেই হল। তাঁর মতে, “আর শুন, ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু। ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয়। কেবল শাস্ত্রেতে ব্রহ্ম জানা যান। কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা, সেও কেবল শাস্ত্রীয়।......যার যে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে, তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয়।” গীতার ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহং’ ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঈশ্বরোপাসনা অনীশ্বরবাদী ব্যতিরেকে সর্ববাদিসম্মত।” এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত নিয়ে দীর্ঘ দিন বিতর্ক চলতে পারে, বহুকাল ধরেই চলে আসছে, এবং সম্ভবতঃ আরও অনেককাল ধরে চলবে। এ সম্বন্ধে কোন এক পক্ষের মতামতকে চূড়ান্ত বলে রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যে রামমোহনের তুলনায় নিতান্ত নির্বুদ্ধি মূঢ় টুলো পণ্ডিত ছিলেন না, এর জন্যই এত কথা বলতে হল।

যাঁরা অতীতকে গতায়ু বলে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পৈত্রিক ও কৌলিক চিহ্ন বজায় রাখতে সংকুচিত হননা, তাঁরা এই পণ্ডিত মানুষটিকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্ আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন পল্লীঅঞ্চলের (কাউন্টি) গ্লেনাগিয়ারী নামক স্থানে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীয়ারসনের পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুদ্রণ শিল্পী (রাজকীয় মুদ্রক)। সেন্ট বীস্ ও শ্রিউয়িসবেরীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া গ্রীয়ারসন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি গণিত অধ্যয়নের সঙ্গে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ট্রিনিটি কলেজের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক রবার্ট য়্যাট্‌কিনসন্ এই মেধাবী ছাত্রটিকে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। ইহাঁর এই প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রভাবের ফলে ভারতীয় ভাষা চর্চাই পরবর্তী জীবনে গ্রীয়ারসনকে খ্যাতি প্রতিপত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত করিয়াছিল এইজন্য গ্রীয়ারসন তাঁহার এই শিক্ষাগুরুকে আজীবন স্মরণে রাখিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনে অধ্যয়ন করিতে করিতেই গ্রীয়ারসন্ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেন। ইহার পর আর ও দুই বৎসর ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষায় সবিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভেন্টরূপে গ্রীয়ারসনকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৩-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসন্ রঙ্গপুর, পাটনা, গয়া,, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনমাসের ছুটিতে তিনি ইংল্যান্ড যান এবং পূর্বপরিচিতা লুসি এলিজাবেথ জিন নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া একটি তরুণীকে বিবাহ করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার পদে উন্নীত হন, ইহার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিহার অঞ্চলে অহিফেন বিভাগের অধ্যক্ষের কর্ম করেন।

ভারতে আগমনের চারিবৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ প্রস্তুতি অন্তে গ্রীয়ারসন্ লেখনী চালনা আরম্ভ করেন। ভারতে আসিয়া সরকারী কার্যসম্পাদনের পর অবসর কালটুকু তাঁহার ভারতবিদ্যা চর্চাতেই অতিবাহিত হইত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (প্রথমখন্ড, তৃতীয় সংখ্যা) তিনি উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর অঞ্চলের কতকগুলি লোক-কথা সংগ্রহ, রঙ্গপুরের আঞ্চলিক ভাষার গতি প্রকৃতির আলোচনা সহ প্রকাশ করেন (১)। লোক কথা সংগ্রহও আঞ্চলিক ভাষার আলোচনায় আমাদের দেশে এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। পরের বৎসর এই পত্রিকাতেই (১৮৭৮, ২য় খন্ড, ৩য় সংখ্যা) তিনি মানিকচন্দ্রের গান সংগ্রহ করিয়া দেবনাগরী হরফে উহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন (২)।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ রচিত মৈথিলী ব্যাকরণ ও এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদগুলি তাঁহার জন্মভূমিতে বর্তমানে যে ভাবে প্রচলিত আছে সেইভাবেই উদ্ধৃতও আলোচিত হয় (৩)। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেবনাগরী লিপির (কায়েথী) রূপ সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক সরকারী নির্দেশে রচিত হয়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (৪)। বিহারে কর্মরত থাকার সময় এই প্রদেশের উপভাষা (ডায়া-

লেক্ট) গুলির প্রতি গ্রীয়ারসনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সম্যগ্রূপে এইগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। সরকারী কার্যে গ্রীয়ারসন্ যখন গ্রামাঞ্চলে যাইতেন তখন গ্রামবাসিদের সহিত তিনি অত্যান্ত সহৃদয় ব্যবহার করিতেন। এই জন্য গ্রামবাসিরা এই সৌম্যদর্শন শ্বেতকায় রাজ-পুরুষকে ভয় না করিয়া পিতার ন্যায় ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। ইহাদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগগুলি গ্রীয়ারসন্ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন এবং সাধ্যমত তাহার প্রতিকার করিতেন। গ্রীয়ারসন্ পল্লীবাসিদের আমোদ প্রমোদের আসরে ও অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন। গ্রাম-জীবন ও গ্রামবাসিদের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে গ্রীয়ারসনের আঞ্চলিক ভাষা চর্চার পথ সুগম হইয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার রচনাগুলি পূর্বসূরিদের রচনার চর্বিতচর্বণ না হইয়া মৌলিকতার দ্বারা সমৃদ্ধ হইত। এই চর্চার ফলে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীয়ারসন্ রচিত বিহারের সাতটি উপভাষার ব্যাকরণ ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (৫)। ইহাতে তিনি দেখান যে বিহার অঞ্চলের মূল ভাষা-মৈথিলী, ভোজপুরী ও মগহী, বাকীগুলি এই তিনটি মূল ভাষার সহিত সম্পৃক্ত উপভাষা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ বিহারের কৃষকজীবন সম্বন্ধে ছয়শত পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ পুস্তক ড্রয়িং ও ফটো সহ প্রকাশ করেন (৬)। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক এই পুস্তকটিতে বিহারের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রই শুধু উদ্ঘাটিত হয় নাই, নানা বিচিত্র শব্দ সম্ভার ও নিত্যনৈমিত্তিক আচার আচরণের কথাও ইহাতে যথাযথরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের দিক হইতে বিহার সম্বন্ধে এই পুস্তকটি অতি মূল্যবান বিবেচিত হওয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে (১৯২৬) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিহারের ভাষা ও উপভাষাগুলি অনুশীলন করিতে করিতে গ্রীয়ারসন্ ভারতের অন্যান্য ভাষা ও উপভাষাগুলির ও চর্চা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে বহু বিচিত্র ভাষাভাষী ভারতবর্ষের ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিকরূপে সমীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সার উইলিয়ম জোন্স্, উইলিয়ম কেরী, হজ্সন, হান্টার, কল্ডওয়েল, জন বীমস্, হোয়ের্ণল, কাষ্ট প্রভৃতি ভারতের এক বা একাধিক ভাষার উপর গবেষণা করিয়াছিলেন কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার তুলনায় এই সব গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী পরিমাণে নগণ্য। একক চেষ্টায় এই কাজ সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই এই বহু ব্যয় ও সময়সাধ্য কাজ সম্ভব।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের অধিবেশন ইউরোপের ভিয়েনা নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীয়ারসন্ এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত প্রতিনিধি মণ্ডলীকে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেন। অতঃপর প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রমুখ-ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুল্যার্ এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ভারতবর্ষের ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভারত গভর্ণ-

---

(১) Notes on the Rangpur Dialect, 1877.

(২) The Song of Manikchandra, 1878.

(৩) An introduction to the Maithili language with a grammar, chrestomathy and vocabulary, 1881.

(৪) A hand book of Kayathi character, Calcutta 1881. Reprinted in 1899.

(৫) Seven Grammars of the dialects and sub-dialects of the Bihari language in 8 parts (1883-'87).

(৬) Bihar Peasant Life, Calcutta 1885.

মেন্টকে অনুরোধ করা হউক। মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ভেবর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বুল্যার্, ভেবর ও গ্রীয়ারসন্ ব্যতীত এই প্রস্তাব গ্রহণে যাঁহারা আনুকূল্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ কাষ্ট, বেণ্ডেল, কাউয়েল, হোয়ের্ণল রুষ্ট্, সেনার, ম্যাক্সমুল্লার ও মনিয়র উইলিয়মস্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্তদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহারা পত্র যোগে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের অনুরোধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার ভারতের ভাষা সমূহ সমীক্ষার কাজ সরকারী ভাবে সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। এই প্রস্তাবটি কি উপায়ে কার্যে পরিণত করা যায় এবিষয়ে দীর্ঘ চারিবৎসর কাল ধরিয়া ভারতগভর্ণমেন্টের সহিত গ্রীয়ারসনের পরামর্শ চলিতে থাকে। কার্য প্রণালী সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত গ্রীয়ারসনের মতৈক্য স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেন্ট গ্রীয়ারসনের উপর এই কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাঁহার নূতন পদবী হয় "সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া।" বিপুল উদ্যম লইয়া গ্রীয়ারসন্ তাঁহার উপর ন্যস্ত এই কাজের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। উপাদান সংগ্রহের কাজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সরকারী ও বেসরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত করা হয়। কর্মিদের নিকট বাইবেলের একটি সরল কাহিনী, কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ (ফ্রেজেস্) পাঠান হয়। তাঁহাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁহারা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় প্রচলিত প্রতিটি ভাষা ও উপভাষাভাষী যত অধিক সংখ্যক সম্ভব ব্যক্তির নিকট গিয়া নির্দিষ্ট সরল আখ্যান এবং শব্দ ও বাক্যাংশগুলির মর্মার্থ বুঝাইয়া বলিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যাইবেন সেই ব্যক্তি নিজের মুখের ভাষা অথবা উপভাষায় উহা বিবৃত করিলে ঐ বিবৃতি ঐ ভাষা বা উপভাষায় যথাযথভাবে লিপিবন্ধ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ঐ ব্যক্তিটির নিকট হইতে তাহার নিজের ভাষায় কথিত যে কোন একটি কাহিনী বা ঘটনা ও লিপিবন্ধ করিতে হইবে। এইভাবে একটি বিশেষ ব্যক্তির নিকট তিনটি উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। ভারতে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি গ্রামের লোকের মধ্যেও কথ্য ভাষার ভেদ আছে, একই গ্রামের দুইটি পল্লীর লোকের মধ্যেও কথ্যভাষায় ভেদ লক্ষিত হয়, আবার একই গ্রামের মধ্যে বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানুযায়ী কথ্যভাষার বিভিন্নতা ধরা যায়, এমন কি একই গৃহে বাসকারী পুরুষেরা এমন কতকগুলি কথ্যভাষার শব্দ ব্যবহার করে যাহা বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেনা, আবার এই স্ত্রীলোকেরাই এমন দুএকটি শব্দ ব্যবহার করে যাহা বাড়ীর পুরুষেরা ব্যবহার করে না। এই সব কারণে একই এলাকার বিভিন্ন বর্ণ ও সামাজিক অবস্থার স্ত্রী ও পুরুষদের নিকট যত অধিক সংখ্যক সংখ্যায় সম্ভব পূর্বোল্লিখিত মত তিনটি উপাদান সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। সমীক্ষাভুক্ত প্রতিটি অঞ্চলে একই প্রকার কার্য প্রণালী অবলম্বিত হয়। এই সব তথ্যাবলী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসনের নিকট প্রত্যহ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। গ্রীয়ারসন্ অতঃপর এই বিবরণগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লিপি, ভূগোল, ইতিহাস, বিগত জনগণনা রিপোর্ট, ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে কোন গবেষণা হইয়া থাকিলে সেই তথ্য, বিবরণে সংগৃহীত শব্দাবলীর ধ্বনিতত্ব, বাক্যাবলীর গঠন পদ্ধতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সহ রিপোর্ট রচনা আরম্ভ করেন।

ভারত গভর্ণমেন্ট্ অথবা গ্রীয়ারসন্ কেহই আশা করেন নাই যে ভারতের ন্যায় একটি উপ-মহাদেশের সকল ভাষা ও উপভাষা সমীক্ষার কাজ দুই চারি বৎসরে সমাপ্ত হইবে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এদিকে গ্রীয়ারসনের অবসর গ্রহণকাল আসন্ন হইয়া আসিলে ইহা স্থির হয় যে

অবসর গ্রহণের পর ও গ্রীয়ারসন্ এই রিপোর্ট রচনার কাজ করিয়া যাইবেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রীয়ারসন্ ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন করেন ও তথায় সারে অঞ্চলের ক্যাম্বারলে নামক স্থানে গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া গ্রীয়ারসন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় ভাষা চর্চা রূপ নূতন কর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। লিঙগুয়িষ্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার সুপারিনটেনডেন্ট রূপে সংগৃহীত উপাদান গুলির উপর ভিত্তি করিয়া রিপোর্ট রচনাই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই রিপোর্টের ২০টি সুবৃহৎ সংখ্যা মোট ৮,০০০ পৃষ্ঠা সহ প্রকাশিত হয় (৭)। এই রিপোর্টের প্রথম কয়েকটি খন্ড রচনায় নরওয়ে দেশীয় ভারতবিদ্যাবিদ্ ডাঃ স্টেন্ কনৌউ গ্রীয়ারসনকে সাহায্য করেন, রিপোর্টের বাকী প্রায় ⅞ ভাগ গ্রীয়ারসন্ একক ভাবেই রচনা করেন। রিপোর্টগুলি প্রণিধান করিয়া দেখা যাইবে যে এই রিপোর্টগুলিতে দুইটি অশ্রেণীভুক্ত (আন ক্লাসিফায়েড) ভাষাসহ ভারতের এই চারিটি মূল পৃথক ভাষা গোষ্ঠীর আলোচনা আছে— (১) অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী (২) সিনো-টিবেটান ভাষা গোষ্ঠী (৩) আর্যভাষা গোষ্ঠী এবং (৪) দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী। এই মূলভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ১৭৯ টি শাখা ভাষা গ্রীয়ারসন্ শ্রেণীবন্ধ করেন, এইগুলির প্রত্যেকটি হইতে পৃথক লক্ষণাক্রান্ত ভাষা। এই ১৭৯টি ভাষাসহ এই সব ভাষার অন্তর্ভুক্ত ৫৪৪টি উপভাষা ও গ্রীয়ারসন পৃথক ভাবে শ্রেণীবন্ধ করেন। এই সব ভাষাগুলির প্রত্যেকটির ধ্বনি বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণ, লিপি প্রভৃতির আলোচনায় গ্রীয়ারসনের পান্ডিত্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

ভারতের ন্যায় এক বিরাট উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি ভাষার উপর লিখিত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টির প্রতি ও সতর্ক মনোযোগ যুক্ত এই গ্রন্থের প্রতিটি খন্ড এই ভাষা গুলি সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের আকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি, ধ্বনি বিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিচারসম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে গ্রীয়ারসন্ রচিত এই রিপোর্টগুলি বর্তমানে অপরিহার্য।

(৭) Reports on the Linguistic Survey of India (1903-'28):
Vol. I. (PI) Introduction, (PII) Comparative Vocabulary of Indian Languages, (PIII) Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages.
Vol. II. Mon khemer and Tai families.
Vol. III. (i) Tibeto—Burman Languages of Tibet and Northern Assam, (ii) Bodo, Naga and Kachin groups of Tibeto Burman Languages.
Vol. IV. Munda and Dravidian Languages.
Vol. V. Indo Aryan Languages. Eastern Group (i) Bengali and Assamese (ii) Bihari and Oriya.
Vol. VI. Indo-Aryan Languages. Mediate Group, Eastern Hindi.
Vol. VII. Indo-Aryan Languages, Southern Group, Marathi.
Vol. VIII. Indo-Aryan Languages. North Western Group (i) Sindhi and Lahnda (ii) Dardi or Pisacha Languages including Kashmiri.
Vol. IX. Indo-Aryan Languages, Central Group (i) Western Hindi and Panjabi (ii) Rajasthani and Gujrati (iii) Bhil Languages of Khandesh etc. (v) Pahari Languages.
Vol. X. Iranian Form. Pustu, Ormuri, Balochi, Ghalcha Languages.
Vol. XI. Gypsy Languages.

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সমীক্ষার শেষ রিপোর্ট প্রকাশ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় গ্রীয়ারসন্ সপ্তসপ্ততি বর্ষবয়স্ক হইয়াছিলেন। ভারত ব্যতীত জগতের কোন বহুভাষী দেশেই এইরূপ কাজ আর হয় নাই। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য এই বৎসরই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট গ্রীয়ারসন্‌কে অতি উচ্চ সম্মানসূচক "অর্ডার অফ মেরিট" উপাধি দান করেন। ইতিপূর্বেই তিনি সি, আই, ই (১৮৯৪) ও কে-সি-এস্' আই (১৯১২) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

লিঙ্গুয়িষ্টিক্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের ভাষাতত্ত্ব সমিতি (লিঙ্গুয়িষ্টিক্ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া) ভারতের ও ভারতের বাহিরের পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত একটি স্মারকগ্রন্থ গ্রীয়ারসনকে উৎসর্গ করেন (মে, ১৯৩১)। এই সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, মৈথিলী, বাঙ্গলা, পাঞ্জাবী অসমীয়া, সাঁওতালী, তেলেগু, উড়িয়া, তামিল, মলয়ালম, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রীয়ারসনের প্রশস্তি বাচক কবিতা ও অভিনন্দন বাণী ও প্রেরিত হয়। সংস্কৃত ও পালিভাষার অভিনন্দন পত্রদুইটি রচনা করেন যথাক্রমে পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ) ও স্বনামখ্যাত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (শান্তিনিকেতন)। এই উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা ভাষায় রবীন্দ্রযুগের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি মোহিতলাল মজুমদার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করেন। পরে এই স্মারক প্রবন্ধাবলী লিঙ্গুয়িষ্টিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার মুখপত্রের দ্বিতীয় ও পঞ্চমখণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় (১৯৩২)।

শ্রীযুক্ত স্যর জ্যরজ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের উদ্দেশ্যে —ঃ

ভারত ভাষা বাচস্পতি

সাতসমুদ্দুর তেরোনদী পার হয়ে সেই শ্বেতদ্বীপেই শেষে
তোমার হৃদয়-পদ্মখানি খুঁজে নিলে ভারত-সরস্বতী।—
হিম সায়রের মরাল-গলে পরিয়ে আগে মালায় গাঁথা মোতি,
ধব্‌ধবে তার পালক দিয়ে মরুচে বীণার মুছিয়ে নিলে হেসে।
সূর্য যখন এই আকাশে অস্ত গিয়ে উঠল তোমার দেশে,
সন্ধে বেলার সাবিত্রী কি সঙ্গে ছিল? আর্যকুলের সতী
চিনলে তোমায়, তুমিই বুঝি আর জনমে ছিলে বাচস্পতি?
এবার এলে ভাষা-সরিৎ -শতবেনীর শঙ্খ ধারীর বেশে।

আজকে তোমায় স্মরণ করি, বরণ করি—প্রণাম করি মোরা
নূতন ঋষি দ্বৈপায়নে, ভাষা-মহাভারত রচয়িতা!
সত্যবতী-সুত যে তুমি, তোমার তপে বাণী শুচিস্মিতা
অষ্টাদশ পর্ব ঘিরে পরিয়ে দিলে একই পুঁথির ডোরা!
এমনি প্রেমেই ধন্য হবে তোমার জাতির শাসন ভারতজোড়া,
তোমার আসন বুকের মাঝে,—তুমি মোদের চিরদিনের মিতা।

মোহিতলাল মজুমদার

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বাসকালে গ্রীয়ারসন ছুটি লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে যান। এই সময় আর্যভাষা গোষ্ঠীর সহিত সাদৃশ্য এবং উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্যযুক্ত কাশ্মীরীভাষা তাঁহার কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তিনি উৎসাহ সহকারে কাশ্মীরী ভাষার চর্চা করিতে থাকেন। এই চর্চার ফলে তিনি কাশ্মীরীভাষা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ একটি ব্যাকরণ ও একটি অভিধান প্রকাশ করেন (৮, ৯)। গ্রীয়ারসন্ কাশ্মীরী ভাষাসম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে আদিতে আর্যভাষা গোষ্ঠীভুক্ত কাশ্মীরী ও ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ডার্ডিক শ্রেণীভুক্ত অন্য ভাষাগুলি আর্য ও ইরানীয় এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী স্তর। গ্রীয়ারসন্ রচিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কাশ্মীরী অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের ৮২ বৎসর বয়সে এই পুস্তকের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। (১০) এই অভিধান সমাপ্তির স্মারক হিসাবে একজন ইটালীয় ভাস্কর নির্মিত গ্রীয়ারসনের একটি আবক্ষ মূর্তি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে স্থাপিত হয়।

কাশ্মীরী ও (গ্রীয়ারসন কর্তৃক) 'ডার্ডিক' নামে অভিহিত ভাষাগুলির সহিত ইউরোপের জিপ্‌সীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত "রোমানি" ভাষার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউরোপের এই ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠীর সহিত অতীত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইউরোপের ও ভারতের পত্রিকাদিতে গ্রীয়ারসন্ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ ইউরোপের জিপ্‌সীলোর সোসাইটির" অধিনায়ক (প্রেসিডেন্ট) পদে বৃত হন।

ভারত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ রূপেই গ্রীয়ারসন্ জীবনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহাকে শুধু ভাষাতত্ত্বাভিজ্ঞ বলিয়া চিহ্নিত করিলে তাঁহার মহত্ত্বকে খর্ব করা হয়। ভারতবিদ্যার নানা বিভাগেই গ্রীয়ারসন্ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া যান। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা (কলিকাতা ও লণ্ডন) ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী ও ইউরোপের বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান গুলির পত্রিকায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)। অশোক লিপি, বিক্রম সংবৎ, ভোজ (রাজ), রাজগৃহের বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধগয়ার লিপিমালা, মিথিলার মধ্যযুগীয় রাজগণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার লিখিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ঐতিহাসিকদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। লোকগীতি সংগ্রহেও গ্রীয়ারসন্ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, বহু বিহারী, ভোজপুরী ও পাঞ্জাবী লোকগীতি সংগ্রহ করিয়া তিনি এই গুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করেন। এইভাবে এইগুলি বিলুপ্তির কবল হইতে রক্ষা পায় (১২)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যা মহাসম্মেলনে গ্রীয়ারসন্ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ তুলসীদাসের ভাষা

(৮) Essays on Kashmiri Grammar, 1895, Reprinted in 1899. The Pisacha Language of North Western India, London, 1906.

(৯) A manual of Kashmiri Language, Comprising Grammar etc. in 2 vols. 1911.

(১০) A dictionary of Kashmiri Language, Calcutta, 1916-32.

(১১) Curiosities of Indian Literature, Bankipur, 1895.

(১২) (a) Folk Lore from Eastern Gorakhpur, J.A.S.B., 1883, (b) Some Bihari Folk Songs, J.R.A.S., 1884, (c) Alha's Marriage, Bhojpuri Epic—I.A., 1885, (d) Two Punjabi Love Songs, IA, 1906 etc.

সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠ করেন (১৩)। ইহার পর কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাই-টির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে ভারতের আধুনিকভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একটি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য রচনা প্রকাশিত হয় (১৪)। এই সুদীর্ঘ নিবন্ধে বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীরূপে বিধৃত উত্তর ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির (ভোজপুরী, মৈথিল, অবধী, ব্রজভাষা প্রভৃতির) গতিপ্রকৃতি বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রীয়ারসন্ মধ্যযুগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত কয়েকখানি পুস্তক ও সম্পাদন করেন। টিকা, টিপ্পনি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদ সহ সম্পাদিত এই পুস্তকগুলি সাধারণ পাঠক ও গবেষক উভয়ের পক্ষেই সমান উপাদেয় (১৫)। লিপ্‌জিগ হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত জেড্-ডি-এম্-জি (সংক্ষেপে) পত্রিকায় গ্রীয়ারসন আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতের ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এই রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১৬) ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত "ইম্পিরীয়্যাল গেজেটিয়ার" পুস্তকের ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় দুইটি দীর্ঘ অধ্যায় গ্রীয়ারসন কর্তৃক রচিত হয় (১৭)। এই দুইটি অধ্যায় কিছুকাল পরে অক্সফোর্ড হইতে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮)। এডিনবরা হইতে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ রিলিজন য়্যান্ড এথিক্স, এডিনবরা, ১৯০৮-১৯২৬) ও সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানি-কার ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি নিবন্ধ গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক রচিত হয়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের ৮৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত—স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টেল ষ্টাডিজ—"ইণ্ডিয়ান য়্যান্ড ইরানিয়ান ষ্টাডিজ" নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী প্রাচ্য বিদ্যাসম্বন্ধে এই গ্রন্থে রচনা দান করিয়া গ্রীয়ারসনের প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন (বুলেটিন অফ দি লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টেল ষ্টাডিজ, ৮ম খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৯৩৬)। এই পুস্তকে গ্রীয়ারসন্ রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহা বৃহদাকারের ২২টি পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল। তালিকাটি মুদ্রিত হওয়ার পর গ্রীয়ারসন এইটি দেখিয়া মন্তব্য করেন যে তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে, ইহা সঙ্কলিত হইবার পর তাঁহার আরও রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই গ্রীয়ারসনের রচনার বিপুলতা অনুমিত হইতে পারে।

বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি হিসাবে গ্রীয়ারসন ডাবলিন, অক্সফোর্ড পাটনা ও হালে (জার্মানী)

(১৩) The Mideaval Vernacular Literature of Hindusthan with special reference to Tulsidas.

(১৪) The Modern Vernacular Literature of Hindusthan J.A.S.B., 1889.

(১৫) (a) The Padmawati of Malik Md. Jaisi Ed. & Translated in coll. Sudharkar Dwivedi Vol. I with Text, Commentary and notes (1896)—1911), Calcutta.
(b) Twenty one Vaisnaba Hymns—Edited and Translated, J.A.S.B., 1884.
(c) The Satsaiya of Bihary—Ed. with introduction and notes, Calcutta, 1896.
(d) The Bhasa—Bhusan of Jaswant Singh, Ed. & Translated J.A., 1894.
(e) Purusha Pariksha By Vidyapari. Eng. Trans. London, 1935.

(১৬) On the Phonology of Modern Indo-Aryan Vernaculars, Z.D.M.G., 1895.

(১৭) Imperial Gazetteer of India, New Edition, 1907-9. [Vol. I, Chap. VII, Vol. II, Chap. X.].

(১৮) The ethnology, languages, literature and religions of India, Oxford, 1912.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেট্ লাভ করেন। পৃথিবীর বহু বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ প্রাচ্যবিদ্যাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীয়ারসনকে সম্মানিত সদস্য তালিকাভুক্ত করিয়া নিজেদিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ভারতে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত গ্রীয়ারসনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির পত্রিকাতেই তাঁহার অধিকাংশ রচনা পত্রস্থ হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি এই সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক ও ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সম্মানিত ফেলো বলিয়া পরিগণিত হন।

ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ড বাসকালে গ্রীয়ারসন্ ভারতের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করেন নাই—ভারতের বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান ও গবেষকেরা তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা আবশ্যক হইলেই পাইতেন। অস্মদ্দেশীয় ভাষাচার্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রীয়ারসনের সবিশেষ স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রেরা ইংল্যাণ্ডে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে গ্রীয়ারসন্ অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও এই সব ছাত্রদের তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যমণি হইয়াও গ্রীয়ারসন্ অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এমনই ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার সম্মুখে আসিলে তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়া পড়িত। সত্তরবর্ষকাল অনলসভাবে ভারতবিদ্যা চর্চার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ একনবতিবর্ষ বয়সে গ্রীয়ারসন্ তাঁহার ক্যাম্বারলেস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। গ্রীয়ারসনের স্মৃতি ভারতবাসির হৃদয়ে ভাস্বর হইয়া থাকিবে। কবি মোহিতলালের ভাষায় গ্রীয়ারসন্ অবশ্যই ভারতবাসির মিতা।"

মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা

ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ইংরেজের তিনটি জিনিষ আমরা পরম আগ্রহে আঁকড়ে ধরেছি। সেই তিনটি হল : ইংরেজচালিত সংবাদপত্র ষ্টেটসম্যান, ইংরেজী মাধ্যম সমন্বিত শিক্ষায়তন তথা কেম্ব্রিজী পরীক্ষা এবং ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল ফার্মের চাকরি। অবাঙালী উচ্চমধ্যবিত্তের এই কটি প্রসঙ্গে আগে থেকেই প্রচুর দুর্বলতা ছিল, ছিল নকল ইংরেজ হবার শখ, বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় একশ বছর আগেই যে শখের চূড়ান্ত করে ক্ষান্ত দিয়েছিল, পূর্ণপরিতৃপ্তিজাত বৈরাগ্যে 'এহো বাহ্য' বলে ঝেড়ে ফেলেছিল।

আজ আবার অনেক বাঙালী নতুন করে ইংরেজীয়ানার নামে গদোগদো হচ্ছে; বিশেষ করে স্বাধীনতা প্রসাদাৎ নিম্নত্ব থেকে উচ্চত্বে হঠাৎ প্রোমোশন পাওয়া মধ্যবিত্তের দল।

মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরির প্রতি মোহ সহজবোধ্য, কারণ সে চাকরির সর্তাবলী তুলনায় অনেক ভালো। অপর দুটির প্রতি আগ্রহও ওই মার্কেণ্টাইলইজম। তবে ইদানীং আন্তর্জাতিকতার নামে ইংরেজীভাষার সম্পর্কে যে অসহনীয় কাঙালপণা দেখতে পাচ্ছি তার, মৌলিক উৎস যে দশ বছরের দাসবৃত্তিজাত মনোভাব, তাও কি অস্বীকার করা যায়! সে কাঙালপনা শুধু বাঙালী ইন্টেলেকচুয়াল সমাজেই নিবদ্ধ নয়। দিল্লীর সব সমাজ, ডি-এম-কে-র ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড তথা স্বতন্ত্র নেতা এবং কংগ্রেসী সরকারের হোমরা-চোমরা, সবারই মধ্যে সেই লোপ পেয়ে যাওয়া ব্যারিস্টার, আই-সি-এস সমাজের ইঙ্গপ্রেম আজ প্রবল জোয়ার তুলেছে। খদ্দরী মন্ত্রীরা যখন বুনিয়াদী শিক্ষার জয়গানে মাঠ-ময়দান পরিষদ ভবন কাঁপাচ্ছেন, তাঁদের নিজেদের ছেলে-মেয়েরা তখন ইংরেজী স্কুলে কেম্ব্রিজী পরীক্ষার জন্য ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ইংরেজীকে মাতৃভাষার হিসেবে রপ্ত করছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে আমন্ত্রিত হয়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ঘোষণা করেছেন। ইংরেজী নবীশেরা তাতে এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন যে সাধারণ শালীনতাটুকুও বিস্মৃত হয়েছিলেন উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী। দ্বিতীয় দিবসের ভাষণে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, পূর্বদিনের বক্তার বক্তব্যের সূত্র ধরে মতান্তর প্রকাশে তাঁর অধিকার কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বক্তৃতা দেবার জন্য ডেকে এনে অতিথি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশিত মতামত সেই অনুষ্ঠানেই খণ্ডন করেছেন উপাচার্য স্বয়ং, বিশেষ করে বক্তার অনুপস্থিতিতে। এতে যে সম্মানিত অতিথির প্রতি সাধারণ ভদ্রতাটুকু রক্ষিত হয়নি, এমন অনেকেই অনুভব করেছেন। উপাচার্য মহাশয় যদি আচার্য বসুর মতে একমত না হতে পারেন, তবে তা প্রকাশের জন্য অন্য কোন উপলক্ষ্য গ্রহণ করলেই সমীচীন হত। পরে অবশ্য উত্তেজনা প্রশমিত হতে তিনি দু-ভাষার ওকালতী করে বিবৃতি দিয়েছেন, 'মাতৃভাষার যে কোন বিকল্প নেই', বসু মহাশয়ের সেই মত

স্বীকার করে নিয়েছেন, দুই বক্তৃতার বিষয়বস্তুতে অনিচ্ছাকৃত সংঘাতে অতিথি বক্তার প্রতি প্রদর্শিত অসম্মানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মূল বিরোধ থেকেই গেছে।

গত পনের বছর যিনি ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে বসবাস করেছেন, মেলামেশা করেছেন উচ্চতম কূটনৈতিক মহলে, হ্যারোবিয়ান তথা "ফ্যাশানেব্‌ল্‌ ইন্টারন্যাশানালিস্ট" (সংজ্ঞাটি শরৎ বসু কর্তৃক প্রদত্ত) জওহরলাল নেহরুর সেই সহোদরা বিজয়লক্ষ্মী যে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন, তাতো স্বাভাবিক। ইংরেজ বিচারপতির সুবিধার জন্য, ইংরেজী ভাষাকে আইনত মাধ্যম ঘোষণা করে ইংরেজী না-জানা লক্ষ লক্ষ বিচারপ্রার্থির অসুবিধা সৃষ্টি করেছে এবং দোভাষী ও অনুবাদকদের খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়েছে যেই বিচার-ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় লালিত ও সার্থকতাপ্রাপ্ত সুরজিৎ লাহিড়ীও যে ইংরেজী ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ পোষণ করবেন, তাতেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।

তবে শিক্ষা সম্পর্কে মতামত প্রকাশে আচার্য বসু যে ওই দুজনের তুলনায় অনেক বেশি অধিকারী, এ কথাই বা অস্বীকার করি কেমন করে! ইন্টারন্যাশনাল কন্টাক্ট রক্ষায় ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন কতখানি, সে বিষয়ে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিশ্চয়ই সত্যেন বসুকে শেখাতে পারেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের (টেকনলজির) ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানে মাতৃভাষার ব্যবহার কতখানি সম্ভব এবং সমীচিন, মাতৃভাষায় অর্জিত শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে কতখানি কার্যকর— সে সম্বন্ধে মত প্রকাশে আচার্য বসুর সমান যোগ্যতা সারা ভারতে আর কারো আছে কিনা সন্দেহ। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরও নেই; কারণ বর্তমান ভারতের অধিকাংশ উপাচার্যই জীবনের অন্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রধান হয়ে বসেছেন। সে বসা অনধিকার বা অনভিপ্রেত এমন কথা বলবো না। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় এবং শিক্ষণ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মে ছাত্রসমাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা সারা জীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের মতামত নিশ্চয় অধিকতর গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য।

যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার যাইহোক না কেন, নিজস্ব স্বাধীন মতামতের এবং তা প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে। বিশেষ পদাধিকারে যিনি শিক্ষণ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক, তাঁকে সুচিন্তিত অভিমত স্পষ্ট ব্যক্ত করতেই হবে। লাহিড়ী মহাশয় যে সত্যেনবাবুর মতামতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা নিয়ে যথোচিত চিন্তা করেছেন, দুই বক্তৃতার সময়ের ব্যবধানে এমন অনুমান করা চলে না। সমাবর্তন উৎসবের কর্মব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে সমাহিত চিন্তার অবকাশই বা ছিল কোথায়!

আচার্য বসু সেদিন সমাবর্তন ভাষণে যা বলেছেন, তা নতুন কথা নয়। তিনি নিজে একথা আগে বহুবার বলেছেন। আর শিক্ষার বাহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছে বহুভাষণে ও নিবন্ধে। আন্তর্জাতিকতার প্রথম মন্ত্র যাঁর দ্বারা উদ্গীত হয়েছিল, যাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেহেরুকে পর্যন্ত পথ দেখিয়েছে, যাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি ভাঙিয়ে জাতি হিসেবে আমরা এবং ব্যক্তি হিসেবে তাঁর উত্তরসাধক-সাজা অনেকেই অনেক কিছু কামিয়ে নিচ্ছে, সেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চতম শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সে নীতি প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বিশ্বভারতীয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় তা নিষ্ঠাসহকারে প্রয়োগ করেছিলেন, সার্থক জ্ঞান করেছিলেন তাঁর সেই পরীক্ষাকে।

কারেক্ট ইংরেজী, শুধু ব্যাকরণগত নয়, উচ্চারণগত, আজও যে কি পরিমাণ দম্ভের বিষয়, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। বিদেশীরা বক্তব্য বোঝাবার জন্য, বাঙ্‌লা বা হিন্দি ব্যবহার করতে ব্যাকরণ ভুল হলে লজ্জায় মরে যায় না, উচ্চারণে সঠিক অ্যাকসেন্ট-এর চেয়ে শ্রোতার পক্ষে সুবোধ্য

করার দিকে লক্ষ্য রাখে, অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুদিক দিয়েই ব্যর্থ হয় তারা। কিন্তু কোন বাঙালী যদি ইংরেজী বলতে ব্যাকরণ ভুল করে সমগ্র জাতির যেন মাথা কাটা যায়, আর উচ্চারণে যার কিছুটা দক্ষতা আছে, সে আজো এমন সম্মান দাবি করে যা কোনদিন প্রখ্যাত ইংরেজী অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্য, কুঞ্জ নাগ বা প্রফুল্ল ঘোষ পান নি। কারণ তাঁরা সজীব বিশ্বভাষা ইংরেজী উচ্চারণ করতেন সঠিক অ্যাকসেন্ট সত্ত্বেও বাঙলীজিহ্বার সহজ ভঙ্গীতে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি নানান দেশে বাসা বাঁধতে গিয়ে যেভাবে ইংলণ্ডের ভাষা কিছুটা করে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তা পেয়েছে, ইংরেজীকে সেই ধরণের বাঙালী বৈশিষ্ট্য দিতে তাঁরা সংকোচ বোধ করেন নি কোন দিন।

তবু তাঁদের মতন আরও বহু পণ্ডিত ইংরেজী ভাষাকে এত ভালোবেসেছিলেন যে, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখবার উপদেশ দিয়েছিলেন তরুণ শিক্ষার্থি-সমাজকে। আচার্য বসু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বঙ্কিমের আমলে ইংরেজী ভাষা আমাদের উপর চেপে বসলো এই জন্য যে, তখন পর্যন্ত হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এ উদ্বুদ্ধ আমাদের চিন্তানায়কেরা বার্ক হিউম প্রভৃতির প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হয়ে ইংরেজী ভাষায় নিবন্ধ ভাবধারাকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম উপায়ন জ্ঞান করেছেন। তখন পর্যন্ত ইংরেজের সবই ছিল আমাদের চোখে ভালো এবং ভালো মানেই ছিল ইংরেজের। বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বঙ্কিমের বাংলা প্রীতিই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল ইংরেজী ভালোর কিছু কিছু বাংলায় লিপিবদ্ধ করে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে এবং বাঙালীর জাতীয়-কল্যাণে ইংরেজী ভাষা বাদ দিয়ে বাঙ্‌লা ভাষাতেই যে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে আজগুবি মনে করতো সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী।

অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ রায় বাঙ্‌লা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার পথ দেখিয়ে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রমাণ করেছেন বাঙলাভাষা বর্তমান জীবনের যে কোন বিষয় আলোচনার উপযুক্ত মাধ্যম। এ সব প্রমাণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন আজকের ইংরেজীনবীশেরা। তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরাই একজন সতীর্থ রচিত যন্ত্রবিদ্যার বই 'ফিটিং শিক্ষা' চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, এবং তা বটতলা বা কামারপুকুর থেকে প্রকাশিত নয়।

ইংলিশ লিটারেচারের অতুল বৈভব কেউ অস্বীকার করে না। ইতিহাস আমাদের ইংল্যাণ্ডের সংগে গাঁটছড়া বেঁধে না দিলে ইংলিশ লিটারেচার আমাদের আলমারিতে উঠ্‌তো না, অন্তত মূল; যেমন ওঠেনি রুশ, জার্মান, ফরাসী সাহিত্য—ঐশ্বর্যে যারা এতটুকুও কমতি যায় না।

ইংরেজী সাহিত্য আমাদের আলমারিতে উঠেছে, কারো কারো হয়তো হ্যাণ্ডবুকেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু জাতির অন্তরে তার আবেদন কতটুকু? ভাষার ব্যবধান প্রাণের সংগে সংযোগ দৃঢ় হতে বাধা দিয়েছে। কারণ পরভাষার সাহিত্য সমাজের উপরতলা ছুঁইয়ে অভ্যন্তরে ঢুকতে পারে না কোনমতে। অথচ প্রকৃত সাহিত্যের রস সর্বমানবের হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য। জাতিগত ব্যবধান বর্জন না করলে তা আবার সাহিত্য কিসে! আজ এদেশের সাহিত্য রসিকেরা রুশ-জার্মান-ফরাসী-নরওয়েজীয়ান সাহিত্যের রসাস্বাদন করেন ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। ইংরেজী আমাদের শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত না থাকলে ইংরেজী সাহিত্য তথা অন্যান্য ভাষার বিদেশী সাহিত্য সবই আমরা বাঙ্‌লা অনুবাদে পড়তাম। অনুবাদে রসক্ষুণ্ণ হয় জেনেও আমরা ইংরেজী অনুবাদের স্বাদ জোলো বিবেচনা করি না। বাঙ্‌লা ভাষায় সুতর্জমা হলে তাও বিস্বাদ লাগার কথা নয়। বিদেশী সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর বাঙ্‌লা তর্জমা যে বেশী হয়নি,

তার কারণ, বর্তমান যুগে বাংলা তর্জমা যাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়, তারা ইংরেজী না জানা সমাজ, বিদ্বৎসমাজে যারা ওই একমাত্র অপরাধে মূর্খ ও রসাস্বাদানের অযোগ্য বলে অবজ্ঞাত।

দুধের সাধ ঘোলে মেটে না, মূলের স্বাদ জোটে না অনুবাদে। এই সত্যে অবহিত হয়ে বর্তমানে প্রকৃত রসিক অনেকেই কেবলমাত্র সাহিত্য পাঠের আগ্রহে ফ্রেঞ্চ-জার্মান-রুশ-স্প্যানিশ ভাষা শেখেন। ইংরেজী ভাষা আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয় না হলে বহু সাহিত্য রসপিপাসু চেষ্টা করে ইংরেজী ভাষাও শিখতেন।

ইংরেজী ভাবধারা সমাজে চারিয়ে দিতে হলে সবাইকে ইংরেজী শিখতে হবে, একথা সত্য নয়। ফার্স্ট বুক-এর ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত আশুতোষ দেবের অর্থপুস্তকসহযোগে পড়া থাকলে ভারতের চাষীরা বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব রপ্ত করবে, মুক্ত হবে সব কুসংস্কার থেকে, চাষের উন্নততম প্রণালী সাগ্রহে গ্রহণ করবে এবং জমির ফলন বাড়াবে,—এমন ধারণা একদিন চালু ছিল। যত সব ভালো ভালো মিস্ত্রি দেশময় এতদিন নানা টেকনিক্যাল কাজ করে আসছে, তাদের ইংরেজী বিদ্যার দৌড়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড়জোর ওই ঘোড়ার পাতার বেশি নয়।

শুধু ভারতে এবং বাংলাদেশই নয়, পশ্চিম ইয়োরোপ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই আধুনিক চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হয়েছে ইংরেজ-জার্মান-ফরাসী-ডাচদের কাছ থেকে, নয়তো মার্কিন মুলুক থেকে। দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলির মাতৃভাষা স্প্যানিশ, তারাও আধুনিকতার দীক্ষা নিয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অথচ শিক্ষার প্রয়োজনে কেউই শিক্ষকের ভাষা গলাধঃকরণ করেনি। যে একটি মাত্র এশিয়ান দেশ পশ্চিম ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ওয়ার টেকনলজীতে সমানে পাল্লা দিয়েছে, সে জাতটি জাপান। যে দেশের জনগণ সেই আঠার শতক থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান ও টেকনলজী গুলে খেয়ে তার মেটাবলিজম্-এর জোরে পশ্চিম ইয়োরোপেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছে। ওদের কেউ যদি বা কিছু ইংরেজী শেখে তাহলেও বি-বি-সি-সম্মত উচ্চারণ করতে গলদঘর্ম হয়ে মরে না, নিজের মতন করে বলতে লজ্জায় বোবা বনে যায় না। এই প্রসঙ্গে কবি ইয়োনে নোগুচি আমার সাক্ষাৎ প্রমাণ, ইংরেজী কবিতা রচনায় যাঁর দক্ষতা সুবিদিত; অথচ ইংরেজী উচ্চারণে ছিল জাপানী ছাপ। মধ্যযুগীয় রুশদের জার পিটার পশ্চিম ইয়োরোপ চষে খেয়ে যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সওদা নিয়ে দেশে এসে ছড়িয়েছিলেন, ইংরেজী বা ডাচ ভাষার মাধ্যমে মোটেই নয়।

ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায় ও দক্ষিণের উপকূল অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার যে এত প্রসার ও কদর তার প্রমাণ এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কর্তৃত্ব আমাদের ছিল না, সে কাজ করেছিল ইংরেজ শাসক, ইংরেজ মিশনারী, ইংরেজচালিত সংবাদপত্র। আমাদের দেশবাসিরা ওদের নির্দেশে অথবা ওদের প্রেরণায় ওদের নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল মাত্র।

দেশ স্বাধীন হবার আগে জাতীয় সংগ্রামের সব নায়কের মুখেই শুনেছি মাতৃভাষার প্রশস্তি, সর্বকর্মে মাতৃভাষার প্রশস্তি, সর্বকর্মে মাতৃভাষা প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি। ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম ভাইসরয় ও গভর্নরদের মোগলাই জৌলুশের নিন্দা এবং স্বাধীন ভারতে সেই জৌলুশ ও বিলাস বর্জনের প্রতিশ্রুতি। নাঙ্গা ফকিরের আদর্শের সঙ্গে দরিদ্র ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির গগনস্পর্শী জাঁকজমকের অসামঞ্জস্যের মত, গান্ধীজি প্রচারিত উচ্চতম দেশকর্মির বেতনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের বেতনহারের আকাশ-পাতাল পার্থক্যের মত, আজ স্বাধীন ভারতে মাথা তুলেছে উগ্র ইংরেজীপনা।

বিকৃত উচ্চারণে নিজের বাঙালী নামকে অ্যাংলিসাইড করে নিয়ে ইটালিশজ্ঞ ইংরেজীতে

যাঁরা কথা বলেন, আমাদের বহু রাষ্ট্রপুরুষের মতে (বিশেষ করে এ-আই-আর-এর মতে) এবং তাঁদের নিজেদের মতে আজও তাঁরা নেটিভদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব। আর আমাদের মত যারা লোরেটো বয়েজ-এ প্রাথমিক শিক্ষা, সেণ্ট জভিয়ার্সে কলেজী শিক্ষা এবং মাস কয়েক ইংল্যান্ডবাসের রেসিডেন্শিয়াল শিক্ষা লাভ করেনি, সেই সব ডেম্পিকেবল্ বাঙালীরা তাঁদের কৃপার পাত্র।

স্বাধীন ভারতের সরকারী উদ্যোগে যে কটি পাবলিক স্কুল তৈরি হচ্ছে, মায় সদ্য-বিজ্ঞাপিত পাঁচ-ছয়টি সৈনিক স্কুলে পর্যন্ত সর্বত্রই শিক্ষা ও ভর্তির মাধ্যম ইংরেজী ভাষা। তার উপর ওই সব স্কুলে ছাত্রদের তৈরি করিয়ে দেওয়া হবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকাল-বোর্ড চালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। অর্থাৎ বছরে দু-আড়াই হাজার টাকা যে ছেলের শিক্ষার জন্য খরচ করার ক্ষমতা আছে অভিভাবকের, আর আছে নিদারুণ কড়াকড়ি ও প্রবল কম্পিটিশান সত্ত্বেও ভর্তি করার মত প্রভাব, সেই সব ছেলে আপনার আমার ছেলের মত স্টেট সেকেন্ডারি বোর্ড চালিত পরীক্ষা দেবে না, তারা দেবে কেম্ব্রিজ। সোশ্যালিষ্ট প্যাটার্ণ প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর আমাদের কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার যে লক্ষ্য সহজেই ধরা পড়ে, তা'হল দুটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব! একশ্রেণী হবে একজিকিউটিভ, আর দ্বিতীয় শ্রেণী, আপনার বংশধরেরা, তাদের ভবিতব্য একজিকিউটেড হওয়া।

এহেন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকতার ধুয়া তুলে ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে রক্ষা করার সার্থকতা কি? যদি বলি, প্রথমজীবনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা ওই দ্বিতীয় শ্রেণীকে উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও যোগ্যতার মাপকাঠিতে খাটো করে রাখা, ভাষার চাপে। কথাটা অবশ্য মনঃপূত হবে না অনেকেরই।

ইংরেজী শেখার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং সমাজের সর্বস্তরের জন্য প্রধান প্রধান বিদেশী ভাষাগুলি শিক্ষার অধিকতর সুযোগ ও বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি আমি বর্তমানে যে কোন স্বাধীন জাতির পক্ষে অপরিহার্য মনে করি। আমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় ইংরেজী ভাষা আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ইংরেজী জ্ঞানে, রচনায় ও ভাষণে আমরা ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিয়েছি; স্বভাবতই বিদেশীভাষা শিখবার সময় আমাদের অধিকাংশ ইংরেজীর দিকে ঝুঁকবে। তাই বলে লেখাপড়া শিখতে হলে ইংরেজীর মাধ্যমেই শিখতে হবে, ইংরেজী ভাষার বোঝা যে বইতে পারলো না, বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারদেশে সে হরিজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, ইংরেজ যুগের এই উত্তরাধিকারের জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে আজও এত অনিচ্ছা, এত আপত্তি কেন?

যে আন্তর্জাতিকতার ওজুহাতে ইংরেজী ভাষার পক্ষে সব সময় আওড়ানো হয় সেই, আন্তর্জাতিকতার সুযোগ ও আগ্রহ যে কোন দেশেই শতকরা জনকয়েকের মাত্র থাকে এবং যাদের থাকে ভাষা শিক্ষার সুযোগও হয়ে যায় তাদের, অন্তত উদ্যমসহকারে করে নেয় তারা। প্যারিসের পথে ডিকশনারি হাতে ধরে ফরাসী ভাষার কথা বোঝা ও বোঝানোর প্রচেণ্টা, কোন বড় শহরেই আজ আর দুর্লভ দৃশ্য নয়। অথচ মুষ্টিমেয় আন্তর্জাতিক অভিলাষীর জন্য ইংরেজী মুখস্ত করিয়ে চোয়াল ব্যথা করানো হবে, বিজাতীয় ভাষালব্ধ প্রাণরসহীন জ্ঞান মাথায় ঢুকিয়ে মগজে শুকনো কাগজের খশখশানি জাগাতে হবে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের, যাদের মুখে আন্তর্জাতিকতার উচ্চাকাঙখা শুনলে হেসে উঠবেন ভাগ্যবানেরা! জনকয়েক ভাগ্যবানের আন্তর্জাতিকতার বেদিতে বলি হবে সমগ্র জাতির উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানাহরণের আকাঙ্ক্ষা—এই আমাদের শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন-কানুন সর্বনেশে।

উপাচার্য লাহিড়ী, বলেছেন ভাষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন নাকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বহু পাঠ্য এবং পঠনীয় পুস্তকে ভাষার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়, তারপর সেই অধীত বিষয় পুনর্লিখনে প্রকাশ পায় বদহজম। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে, অনার্স ও এম· এ-র পর্যায়ে কিছু সমীক্ষা করলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে।

হবে নাই বা কেন? যে কোন বিষয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জ্ঞানলাভ হল মাতৃভাষায়। তারপর ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির ব্যবস্থা না করেই ছাত্রটিকে হঠাৎ ফেলে দেওয়া হল অনার্স কোর্সে, একেবারেই ইংরেজী ভাষায় অথই পাথারে হাবুডুবু। এই অবস্থায় বিষয় শিক্ষা যে কি পরিমাণ কঠিন হয়, সে যুগের বি-এ, এম-এ-দের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ইংরেজী জ্ঞানের জোরে ইংরেজ রাজত্বের সুফল হিসেবে বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং প্রভাব অর্জনের সুযোগটুকু যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ইংরেজীকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার দাবিতে আন্দোলন এবং সম্মেলন করতেও লজ্জা পাননি।

অথচ দুনিয়ার দিকে একবার চোখ মেলে তাকালে অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানচক্ষু যে খুলে যায়, তার প্রমাণ বুদ্ধদেব বসু। ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলনে রাজাজীর ডেপুটি হয়ে একদা কলকাতায় সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জাপান বেড়াতে গিয়ে সেদেশে মাতৃভাষার সমারোহ দেখে এসে এদেশে মাতৃভাষার অবহেলা এবং ইংরেজী বাতিকগ্রস্ততার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি ইদানীং প্রকাশিত একাধিক বলিষ্ঠ প্রবন্ধে। তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে জাপানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ফল মাতৃভাষায় নিবন্ধ হওয়ার ফলে, বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার চুম্বক পাঠ করে সেই সেই দেশের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মূল পাঠের আগ্রহে জাপানী ভাষা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। আরো বলেছেন যে জাপানে এসে যে সব অগণিত বিদেশী নানাকর্মে বসবাস করে, জাপানীদের সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রয়োজনে জাপানী ভাষা শিখতে বাধ্য হয় তারা। পক্ষান্তরে এদেশে বাণিজ্যের জন্য আগত ইয়োরোপীয়রা বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে আমাদের ভাষা শিখতো, সে পর্বের অবসান হয়ে গেল যেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। আজ কেবল ইংরেজের রাজভাষা বা আমেরিকানদের মহাজনী ভাষা নয় প্রতিটি বিদেশী এদেশে তার মাতৃ-ভাষায় বাৎচিৎ করে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা বাধ্য হচ্ছি বিদেশীভাষা শিখতে বিদেশীদেরই সুবিধার জন্য, তাদের মেহনৎ বাঁচাবার জন্য।

রাষ্ট্রভাষা তো রবীন্দ্রনাথের মতে দেউড়ির ভাষা। সদর দরজার দাঁড়ে বসানো কাকাতুয়ার মত পড়িয়ে নিয়ে যে কোন ভাষাতেই দেউড়িতে পাহারা দিতে বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা হল অন্তরে মিশে যাওয়ার বস্তু, সেখানে অন্তরের ও অন্তঃপুরের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুতেই প্রকৃত সুফল লাভ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের (টেকনলজী) উচ্চতম শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক বাংলায় রচনা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সত্যেন বসুর মত উড়িয়ে দেবার নয়। আর ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই যে আজও রচিত হয়নি, তার একমাত্র কারণ হল সেই বাঙ্‌লা বই-এর কোন প্রয়োজন নেই; তাই দেশীয় পণ্ডিতেরাও ইংরেজীতে বই লেখাই সমীচিন মনে করেন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করলে ওই সব বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা হবে এবং দেশবিদেশের প্রখ্যাত গ্রন্থগুলি নানান ভাষা থেকে বাঙ্‌লায় অনূদিত হবে, বাঙ্‌লাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থের দুর্বলতা

ও দুর্লভতার কারণ তো চাহিদার অভাব। নইলে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক সম্পর্কে যে সব নিত্য-নতুন বই বেরুচ্ছে, বাঙ্‌লা ভাষায় অনার্স ও এম-এ পড়ার ব্যবস্থা না থাকলে কোন দিন তা হত না।

প্লেটোর রিপাব্লিক্‌, অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর পলিটিক্স, রুসো-র সোশ্যাল কনট্রাক্ট, মিন-এর রচনাবলী, মার্কস্‌-এরযুগান্তকারী গ্রন্থ—এই সব অবশ্যপাঠ দেশকালজয়ী পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করার কোন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, কি সরকারি তরফ থেকে। বে-সরকারি প্রকাশকের কি দায় পড়েছে! এ সব দিকে যে কোন তরফে কোন প্রচেষ্টাই হয়নি, তাতে এইটুকু প্রমাণ হয় যে, বাঙ্‌লা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার যোগ্য মাধ্যম করে তোলার কোন পরিকল্পনা নেই কারো, এমনকি সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও। তার বদলে বাংলাকে উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তকাবলী গজিয়ে না ওঠার অজুহাতে ইংরেজীর ল্যাজে বেঁধে চলুক আমাদের শিক্ষা; বিদেশী মুদ্রার অভাবে গ্রন্থের আমদানি সঙ্কুচিত থাক, তবু যেন মেড-ইন-ইণ্ডিয়া ভালো বই-এর প্রচলনে ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রকাশকদের রপ্তানি ব্যবসার ক্ষতি না হয়। যে সংস্কৃতি দফ্‌তর নাচিয়েদের নাচিয়ে বেড়াবার জন্য আর রবীন্দ্র-শত-বর্ষের নামে বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টারদের বড়লোক করে দেবার জন্য কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান টেক্‌নলজির গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষায় এবং রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে প্রকাশ প্রচেষ্টায় তারা যদি সেই অঙ্কের সামান্য ভগ্নাংশও ব্যয় করতো, দফ্‌তরের তারিফ করতে পারতাম।

ইংরেজী মাধ্যমের মোহ বাজে লোককে পেয়ে বসবে, তা আর বিচিত্র কি! রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীতে দেশবিদেশের শিক্ষার্থিদের ডেকে এনে বলেছিলেন, এখানে পড়তে হলে সবই পড়তে হবে বাঙ্‌লায়। সেখানে থেকে কত চীনা, কত মাদ্রাজী, কত ইংরেজ-জার্মান বাঙলা ভাষা ভাষণে ও পঠনে রপ্ত হয়ে গেল। অথচ আজ ভারতের আন্তর্জাতিক নবদম্ভ পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে প্রকৃত ভারতীয় জনৈক বাঙালী রবীন্দ্র-দম্ভীরই নেতৃত্বে বিদেশীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রবর্তিত হয়েছে বিশ্বভারতীতে। বাঙলা ভাষার মাথা মুড়োন হয়েছে, এখন ঘোল ঢেলে বিদায় করাই যা বাকী।

বাঙলা ভাষার পক্ষে ভাবপ্রবণ ওকালতী করছি না আমি। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। সেই প্রয়োজনে প্রত্যেক অঞ্চলের মাতৃভাষার উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হবে।

আন্তর্জাতিকতার স্নবারির মত অপর যে বাহবা দিয়ে ইংরেজী গেলাবার অটুট সংকল্প সমর্থন করা হচ্ছে, তা হল সর্বভারতীয় ঐক্য। হিন্দি যদি রাষ্ট্রভাষা হয়ে দেউড়ি আগলে বসে থাকে, অনৈক্যের প্রবেশ খরদৃষ্টিতে রোধ করতে পারবে, পরস্পরে বার্তাচিতে অসুবিধা হবে না। আর হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হবে শুনলে যাঁরা আঁৎকে ওঠেন, তাঁদের জানাতে চাই যে বর্তমানে বহু বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাভাবে সংযোগরক্ষাকারী নেপাল-এর রাষ্ট্রীয় কর্মে নেপালীই একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা। হিন্দিভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রকর্মে অহিন্দি অঞ্চলের লোকেরা হঠে যাবে, এই হীনমন্য ধারণা সমর্থন যোগ্য নয়।

ঐক্য যদি চাই, কোন কিছুই অন্তরায় হবে না। ইংরেজী হিন্দী বা আর যে কোন গাঁট-ছড়াই বাঁধা হোক না কেন, ঐক্যানুভূতি না থাকলে নকল ভাষার ঐক্য সত্ত্বেও সুকুমার রায়ের "নারদ-নারদ" লাগা ঠেকানো যাবে না তাতে। আজ সারা দুনিয়া মিলে গেছে পোশাকে, খাদ্যে মিলে উঠছে, মিলছে নাচের তালে, গানের ঢঙে, ফিল্মস্টারদের গ্ল্যামারে, মিলছে ইউ-এন-ও-র বৈঠকে, অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে, সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রে, শিল্পের দুর্বোধ্যতায়,

বিজ্ঞাপনের সরসতায়, যন্ত্রবিজ্ঞানের সর্বাত্মক পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তিতে। সারা দুনিয়া ক্রমশ একরূপ নিচ্ছে। কিন্তু একীকরণের এই মহাযজ্ঞে মাতৃভাষাকে বলি দেবার উগ্র উন্মত্ততা ভারতের মত আর কোথাও নেই।

এই মুহূর্তে ইংরেজী বর্জন করে শিক্ষা, ব্যবসা ও রাষ্ট্রকর্মে মাতৃভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিন্দির রাতারাতি প্রবর্তন সম্ভব নয়। নয় যে তার কারণ, স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী এই পনের বছরে কোন প্রস্তুতি করিনি আমরা। আর প্রস্তুতি যে করিনি তার কারণ আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি, দুশো বছরের রাজভাষা-প্রীতির জগদ্দল পাষাণ তাদের মস্তিষ্ককে চেপে রেখেছে।

স্বীয় মাতৃভাষা প্রসঙ্গে অ্যাগ্রেসিভ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের বশবর্তী হয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের কিছুটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইংরেজী-প্রিয় বাঙালীর অ্যাকাডেমিক দৃষ্টির ঘোলাটে ভাব আজও সংশোধনের বাইরে। যত যুক্তির ঝড়ই তুলুন, তাদের মাগজিক দম্ভের দুর্ভেদ্য দুর্গের পরিখার জলে সামান্যতম কাঁপনও জাগবে না তাতে। বর্তমান বাঙালীর আত্মপ্রসাদের মূলস্তম্ভ দুটি : বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি আর ইংরেজী সাহিত্যে তাদের দীর্ঘকালের ব্যুৎপত্তি। দ্বিতীয়টি হারাবার ভয়ে প্রথমটির আরও বৃদ্ধির চিন্তা তাদের মাথায় ঢোকে না।

রাষ্ট্রকর্মে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়ে থাকলেও উচ্চ-শিক্ষায় মাতৃভাষা প্রবর্তনের চিন্তা পর্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায়নি। সে চিন্তা যদি থাকতো, প্ল্যান করে জ্ঞানবিজ্ঞান-টেকনলজীর বই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা হত, সরকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতর দ্বয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রযোজনায়। বই-এর যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি না হতে প্রাইভেট সেক্টর সে কাজে হাত দেবে না।

বাঙলায় এম-এ পড়া প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ, 'কবে হবে' প্রশ্ন করে বছরের পর বছর নিরাশ হয়েছিলেন গবেষণারত ও গ্রন্থ-রচনায় নিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। শেষে একদিন আশুতোষ বললেন, এতদিনে বই তৈরি হল, এবার শুরু করে দাও।

একদিন, সুদূর ভবিষ্যতেও, শুরু হতে হলে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা মত প্রস্তুতি আরম্ভের প্রয়োজন অবিলম্বে। মাতৃভাষায় দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান টেকনলজীর বই-এর ছড়াছড়ি হবে, ইংরেজী ভাষার আঘাতে বুদ্ধি ও শক্তি ক্ষয় না করেও দেশের লোক প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারবে এবং সে শিক্ষা সত্বার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে, আক্ষরিক জ্ঞান বা ইংরেজী বর্ণমালার লিখন-পঠন দিয়ে শিক্ষিতের পরিসংখ্যান হবে না। তারপরও কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি মাত্রই প্রয়াসী হবেন এক বা একাধিক বিদেশীভাষা শিক্ষা করে ব্যাপকতর রসাস্বাদনে, আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে সার্থকতা লাভে। অন্যান্য বহিরাগত ভাষাগুলির মত ইংরেজী ভাষাও তার ঐতিহাসিক চিহ্ন রেখে যাবে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বহু স্থায়ী শব্দ সরবরাহ করে। আজ যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের অপ্রচলিত বাঙলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের বাতিক দেখতে পাওয়া যায়, তার কোন প্রয়োজন থাকবে না সেদিন *

রাখাল ভট্টাচার্য

*এই আলোচনায় পাঠকদের বিভিন্ন মতামতকে আমরা সাগ্রহে পত্রস্থ করবো।— সম্পাদক

জিনো সিভিরেনি

বিংশ শতাব্দী শিল্পইতিহাসে একটি বিশেষ সৃষ্টিকাল। আধুনিক জীবনে নানা মূল্যায়নের পথে মানুষ বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ প্রতি পদক্ষেপে পাচ্ছে। সেই বিচিত্র সমস্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা মানুষের মনোজগতের দুর্গম প্রান্তদেশ আবিষ্কারে বহুদূর পর্য্যন্ত পক্ষবিস্তারে অকথিত অকল্পিত সত্য নির্ণয়ে উদ্বেলিত হচ্ছে। গতিশীল সমাজের লক্ষণ মানুষের জানা জগতের বিধৃত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আবরণ সরিয়ে অন্য কোন রহস্যময় নব সৌন্দর্য্য তন্ময়তাকে আবিষ্কার করা। সেই আবিষ্কার করার পথে বাস্তব ও কল্পলোকের কত বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা শিল্পীর চির আবিষ্কারী মনের কাছে তাদের অপরিমেয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সন্ধান এনে দিয়েছে। এই শতাব্দী একটি বিচিত্র সময়। বস্তুবাদের উপাসনা আর বস্তুবাদের অন্তর সত্ত্বার আবিষ্কার প্রয়াস এই দুই বিপরীতধর্মী মানসিকতা এই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। ইয়োরোপ তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর বস্তুর অপরিমেয় ক্ষমতা এবং তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসার শিল্পে নতুন নানা বস্তু কেন্দ্রিক চিন্তা সমন্বিত মতবাদের স্ফূরণ ঘটালো। কিন্তু বস্তুর বিশ্বগ্রাসী প্রসার দেখে নতুন এক শিল্পী দল বস্তুর বহিরাবরণ সরিয়ে অন্তরবাসী নতুন সত্ত্বা আবিষ্কারে তৎপর হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ইতালীয় শিল্পী জিনো সিভিরেনি প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি। সিভিরেনি বস্তুরূপের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার মধ্যে যে বস্তুমান তার বাইরে যে অপ্রত্যক্ষ অরূপ তত্ত্ব অসীম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে নন্দিত, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যকে গতির ছন্দে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। মানুষ বস্তুর অন্তর্লীন সত্ত্বাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে বস্তুমানের উপাসনার মধ্যেই। প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যভান্ডার সেই উপাসনা সার্থক করতে অকৃপণ হাতে শিল্পীর মনের কাছে মেলেছে তাদের রূপগত বিভিন্ন ভঙ্গিমা। কিন্তু সেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যকেই বস্তুরূপের অন্তর্লীন ছন্দময় গতির সৌন্দর্য্য বলে শিল্পীর মন যখন মেনে নিল না তখন সেই প্রবাহিত গতির আনন্দকে শিল্পী বিধৃত করতে চাইলেন অন্য রহস্যময় বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মাধ্যমে। সিভিরেনি আধুনিক জীবনে বস্তুর উপাসনা আন্তরিকভাবে ত্যাগ করতে চেয়েছেন বস্তুর অন্তর্লীন গতির প্রবাহকে তার ছন্দগত রূপকে অন্য কোন সৌন্দর্য্য তন্ময়তার মধ্যে। বস্তুর উপাসনা তার বাহ্যিক রূপ বিকাশকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু বস্তুর গুণসত্য বিশ্বজনীন অন্তর সত্ত্বার সঙ্গে সংযুক্ত এবং বস্তুমান নিরপেক্ষ। এই বিশ্বজনীন অন্তর সত্ত্বা সর্বদাই গতিময়। এই গতির আনন্দকে সিভিরেনি বস্তুমধ্যে প্রবাহিত বিশ্বজনীন ছন্দমধ্যে অনুভব করতে চাইলেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট চিত্রে রূপগত অর্থকে জড়বাদের ঊর্দ্ধে চেতন বাদের ছন্দময় আনন্দের গতির তির্যক রেখার বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রূপ দিতে চাইলেন।

বস্তুমানের বাহ্যিক প্রকাশের যে সত্য সেই সত্যরূপকে প্রতিচ্ছায়াবাদ প্রকাশ করেছিল। বাহ্যিক প্রকাশই বস্তুর অন্তর্গত অরূপ তত্ত্বের সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই সিভিরেনি প্রতিচ্ছায়াবাদকে বস্তুর চূড়ান্ত প্রকাশ বলে ধরলেন না। প্রতিচ্ছায়াবাদ তখনই সার্থক যখন বস্তুর গুণসত্য

গতির আনন্দকে প্রকাশ করবে। বস্তুর বাহ্যিক রূপ স্বীকারের মধ্যে কোন সার্থক শিল্প চেতনা নেই। গতির ছন্দময় ভাব চিত্রসৃষ্টিতে বস্তুমানের সীমিত প্রকাশের মধ্যে আবদ্ধ। বস্তুর গুণ সত্য প্রকাশে সেই গতি আনন্দলোক সৃষ্টি করে। গতিযুক্ত গাড়ীর গতিই হলো প্রধান। গতিযুক্ত গাড়ীর চিত্রসৃষ্টিতে বাহ্যিক রূপটাই প্রকাশ পাবে—সেখানে গতি যে বস্তুর প্রাণ তাকে আর ধরা যাবে না। বস্তুর বাহ্যিক গুণান্বিত রূপ বিকাশ অপেক্ষা বস্তু সত্বার অব্যক্ত গুণ সত্য গতিধর্মীতাই শিল্প চেতনায় প্রযুক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিপুল বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্বার বিরাট প্রবাহই শিল্পে উপজীব্য এবং কাব্যিক আপাত সত্য বস্তুরূপ প্রকাশ সেখানে মূল্যহীন।

বস্তুর বাহ্যিক রূপ বিকাশ আমাদের চেতনাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই রূপাবরণ সরিয়ে বস্তুর সত্যরূপ আমরা কিছুতেই অনুভব করতে পারিনি। বস্তুর এই-বাহ্যিক-রূপ বিকাশ যা সত্যরূপ প্রত্যক্ষ করতে বাধাস্বরূপ সেই বহিরাবরণের কথিত এবং গৃহীত বিভিন্ন মূল্যবোধকে আগেই বিস্মৃত হওয়া প্রয়োজন। কেননা এতে করে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছন্দিত সত্বার মূল্যবোধকে শিল্পচেতনায় নতুন ভাবে অনুভব করতে পারব।

রিয়ালিটি শব্দটি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা এবং বস্তুমান নিরপেক্ষ একটি সত্য প্রকাশ সম্ভবপর। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংযুক্তি বস্তুর গুণ সত্য মধ্যে, রিয়ালিটির প্রকাশ করে। রিয়ালিটির সাহায্য নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত চেতনা বিকাশকে তার বিচিত্র বৈশিষ্টকে আবেগময়তা দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, কারণ তখনই অনুভব করা যায় একটি সর্বজনীন গতির উপস্থিতি বিশ্বপ্রকৃতিকে যা সর্বদাই প্রাণময়তা দিয়েছে।

উপলব্ধিগত সত্যের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু স্মৃতির কার্যকারিতা রিয়ালিটির অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেয়, সেখানে স্মৃতি বস্তু নিরপেক্ষ। চৌক কোন বস্তু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি স্মৃতি সাহায্যে রূপ বৈচিত্রে বাহিত হয় আবার সেই একই রূপ বৈচিত্র বিচিত্রভাবে গোলাকার কোন বস্তু সংযোগে অনুভূত হয়, যদি-উভয়ক্ষেত্রে রং-এর প্রয়োগ হয় নীল। সেখানে স্মৃতি বস্তুমান অপেক্ষা বস্তুরগুণ-সত্য সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত। সেই কারণে অনুভূতিটি আমাদের কাছে প্রাধান্য পায়--অনুভূতি বস্তুমান সংযোগ রহিত হয়ে অব্যক্ত গুণসত্যকেই প্রকাশ করে। চৌক কিংবা গোলাকার এই বাহ্যিক সত্য স্মৃতি বহন করে না। স্মৃতি শুধু অনুভূতিকেই তার পক্ষবিস্তারে সাহায্য করে তা নয় সেখানে চেতনায় স্মৃতি সোজাসুজি সত্য সম্পর্কিত বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়। স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ স্মৃতি বাহিত আবেগময়তাই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে শিল্পক্ষেত্রে স্মৃতি বাহিত সেই আবেগময়তা তার যদিদষ্ট স্থান কাল পাত্র প্রকাশে তৎপর হয়। এতে করে যদিও বস্তুমানের আংশিক প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় কিন্তু তাতে করে এক ধরণের নির্জীব সীমিত বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই বিশেষ সময়ের বিশেষ বস্তুমানই বস্তুর গুণ সত্য নয়—এতে সস্তা আবেগধর্মিতা আছে কিন্তু শিল্প চেতনায় সৌন্দর্যসৃষ্টির নিষ্কাম বোধের প্রকাশ হয় না। সেখানে শিল্পী জীবনধর্মের স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা থেকে বহুদূরে আংশিক সত্য সন্ধানে ব্যর্থ। বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক সত্য পরিবেশনে শিল্পী নিষ্কাম বোধের সাহায্যে সর্বত্র প্রবাহিত একটি প্রাণের সুরকেই প্রধান করে তুলবেন।

আমাদের মধ্যে আবেগের জন্ম হয় বস্তু রূপের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ থেকে—আর সেখানে স্মৃতিও-এই—অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ থেকে খণ্ডিত নয়। স্মৃতি নিঃসৃত আবেগের মধ্যে আমরা অনুভব করি বিভিন্ন বস্তু ও জীবের মধ্যে অন্তর্লীন এক দৃশতঃ অপ্রত্যক্ষ গতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে। বস্তুর কোন বিশেষ খণ্ড সত্য দ্বারা সেই প্রবাহের খণ্ডিত রূপ প্রকাশ অসার্থক।

কারণ খণ্ডিত কোন বস্তুরূপের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টা বস্তুমানকেই তার-খণ্ডিত সময়ের প্রবাহের মধ্যে প্রকাশ করবে—কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মূল সেই বস্তুসমষ্টির অন্তর্লীন গুণ সত্য—সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ চেতনায় প্রকাশ করতে বিশেষ সময়ে আংশিক সত্য খণ্ডিত বস্তুপিণ্ডকে অস্বীকার করাই শ্রেয়।

বাহ্য গতি ভঙ্গিমায় কত বিভিন্ন রূপ প্রকাশ আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাহ্য গতি ভঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মধ্যে একটি মূলগত প্রবাহই আছে—শিল্পী জ্ঞান চেতনায় তাকেই প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন। নৃত্যরত রমণীর দেহছন্দ মাধুর্যেভরা এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তীর্যক বক্র রেখায় রেখায়িত। আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিম গোলাকার রেখায় উড্ডীন ব্যোমযানের রেখাগত বিন্যাসের সঙ্গে নৃত্যছন্দে রমণীর দেহের লাবণ্য বিক্ষেপে সংযোজিত বর্তুলগতিশীল ভঙ্গীর মধ্যে কোন মিল নেই। নৃত্যরতা নর্তকীর দেহছন্দ বক্র গোলাকার ছন্দভুক্তিতে এক অদৃশ্য গতিশীল ঊর্ধ্বমুখ রেখার বিন্যাস সৃষ্টি করে— যে গতিশীল রেখার বিচিত্র স্মৃতি আমাদের উদ্দাম প্রসারিত আবেগকে নর্ত্তকীর নৃত্যরত দেহগত খণ্ড খণ্ড ছন্দ থেকে মুক্ত করে আর এক গতিশীল রেখার বিদ্যুতমালার মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেখানে দেহগত আকারকে প্রাধান্য দেয় না—তার দেহ লাবণ্য অপ্রয়োজনীয়—একমাত্র নৃত্যের গতিশীলতা উদ্ভুত এক বিচিত্র রেখার লীলা সৌন্দর্য্য আমাদের তন্ময় করে। স্মৃতি শুধু সেই সৌরভই বহন করে যে সৌরভ ছন্দিত দেহের বিভিন্ন খণ্ড মুহূর্তে সৃষ্ট। কিন্তু দেহলীলার বিক্ষেপে, ছন্দের তীর্যক, বঙ্কিম, রেখার প্রসারিত প্রতিটি মুহূর্তে একটি গতিশীল রহস্যময় সৌন্দর্য্যে সেই খণ্ড সময়গুলি বিলুপ্ত। সেইজন্যে নৃত্যরতা নর্ত্তকীর গতিশীলতা এক ঊর্ধ্বমুখী বক্র ভঙ্গিমায় প্রাধান্য পায়। এই গতিশীল ঊর্ধ্বমুখী রেখার সঙ্গে অদৃশ্য রেখায় উড্ডীন ব্যোমযানের গতিপথের এক সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যে যে একটি গতিশীলতা আছে সেই গতিশীল বৈচিত্র সচল রেখায় আমাদের বস্তুমান নিরপেক্ষ একটি অবিভাজ্য সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করে। নর্ত্তকীর দেহছন্দগত বস্তুমান এবং ব্যোমযানের গতি-সম্বলিত বস্তুপ্রকাশ এই দুয়ের মধ্যে দৃশতঃ পার্থক্য আছে। কিন্তু বস্তু গুণ সত্য হিসাবে যে তীর্যক রেখার আবেষ্টনী উভয়ের মধ্যে অদৃশ্যভাবে গঠিত—সেই রেখার লীলা বৈচিত্র্য উভয় ক্ষেত্রে এক এবং অবিভাজ্য। এই রেখার যে গতি সেই গতির সত্য উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এই গতির আবেগ বস্তু নিরপেক্ষ স্মৃতি বাহিত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় এবং গতিবাদের এই চেতনাই প্রধান উপজীব্য। বস্তুমান নানা সময়ে নানা বৈচিত্রে শব্দ গন্ধ গতি আলো এবং উষ্ণতার প্রকাশ করে। সেই শব্দ গন্ধ গতি আলো এবং উষ্ণতা অন্য কোন বিশেষ শব্দ সমষ্টিতে অথবা অন্য কোন প্রকাশিত বস্তুর রূপ বন্ধনে একই আবেগধর্মিতায় প্রকাশিত হতে পারে। শিল্পচেতনা উদ্দীপিত সত্যরূপ উভয়ের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন গুণাবলী সমন্বিত একটি প্রাণময়তাকে প্রকাশ করতে সমর্থ। এই বিশেষ গুণান্বিত বস্তুসত্য একে নিউ রিয়ালিটি আখ্যায় আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সিভিরেনি বস্তুর গুণসত্য অন্বেষণে বস্তুমানকে সর্বতোভাবে বর্জন করেছিলেন। বিশেষ বিশেষ বস্তুমান বিশেষ সময়ে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুমানের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে একটি সরলীকৃত বস্তুগুণসত্যকে প্রকাশ করতে অন্যকোন তৃতীয় দৃশ্যতঃ অদৃশ্য বস্তু নিরপেক্ষ একটি রেখা এবং রং সমন্বিত ফর্মের উদ্ভাবন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

সঙ্গীতে বিভিন্ন পর্দার ধ্বনিগত সংযোগে একটি সুরসৃষ্টি হয়। সেই সুরের সৃষ্টিতে ধ্বনিগুলির অবদান থাকলেও একক ও অনন্য সুরের প্রকাশই ধ্বনি মণ্ডলীর সহজ সত্য। সেখানে ধ্বনি সমষ্টির গুণসত্য সৃষ্ট সুরটি। নিঃসৃত বিশেষ একক কোন ধ্বনিই একাকী সত্য

হয়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন ধ্বনির সত্য এই সৃষ্ট সুরের মধ্যে নিবিষ্ট। সুরটিকে বলা যেতে পারে কোন তৃতীয় সত্ত্বা যার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং অন্য ধ্বনি মণ্ডলী লীন হয়েছে।

বস্তুমানের বিভিন্ন মিলের মধ্যে তার বিচিত্র অমিলের মধ্যে বস্তুমানের নানা প্রক্ষেপিত আরোপিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের যে প্রধান প্রকাশ গতিশীল ছন্দে নন্দিত, সেই বলিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত গুণসত্য সমন্বিত গতিকে সতত সর্বত্র একই প্রাণময়তার মধ্যে বিকশিত করছে। অনুভূতির সার্থক প্রকাশ সেখানে, যেখানে জীবনের প্রকাশকে কতরূপে কত ভঙ্গীমায় অকল্পিত রহস্যময় সৌন্দর্যতত্ত্বের ইঙ্গিতে বাঙ্গময় করবে। গতিবাদ সম্বন্ধীয় চিত্রে ফর্ম সম্পর্কে সিভিরেনির মতামত:

(ক) রেখার বিচিত্র বন্ধনে নানা আকৃতির মধ্যে গতির বিভিন্ন ভঙ্গী সর্বদাই স্মৃতি ও অনুভূতির আবেগে উদ্বেলিত প্রসারিত এবং জীবন্ত। বিভিন্ন রেখা গতিময় হওয়ার জন্যে অন্য গতিশীল রেখাতেও প্রসারিত আবেগ সর্বদাই রেখার বন্ধনীগত বস্তুমানকে অব্যক্ত রূপাদর্শে সঞ্চালিত করছে।

(খ) বস্তুমান সমন্বিত আকৃতিগুলি থেকেই অন্তর্গত গুণ সত্যকে তার নিষ্কাম পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন গঠনপদ্ধতির মধ্যে পরিবেশন করাই শ্রেয়।

(গ) কৌণিক, সোজাসুজি, সমকোণগত, বর্তুল বিভিন্ন রেখা বিভিন্ন বিচিত্রমুখী গতিশীলতায় স্পেসের সম্প্রসারিত অভিনব ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হবে।

(ঘ) শুধুমাত্র একটি সরলরেখা সর্বদাই মৃত গতিহীন। গতিবাদী চিত্রে যেখানে বক্র, কৌণিক, গোলাকার রেখাগুলি উষ্ণ এবং জীবন্ত সেখানে শুধুমাত্র সরলরেখার অবতারণা বর্জনীয়। একটি সরলরেখা বা সমান্তরাল রেখা উভয়ই স্থিতিশীল, কিন্তু এই সরলরেখা তখনই জীবন্ত যখনই কোন বক্র গতিশীল রেখা সেখানে সংযোজিত হবে।

জিনো সিভিরেনি রোমে ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে তাঁর গতিবাদ সম্পর্কে অভিনব তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। বস্তুবাদের বাহ্যিক রূপপ্রেরণার ঊর্ধ্বে যে গুণসত্যময় প্রাণময় গতিশীলতা আছে, সেই প্রাণময়তার নিয়ত প্রকাশকে সিভিরেনি অদ্ভুত এক বিচিত্র সৌন্দর্য তন্ময়তার মধ্যে প্রতিফলিত করেছিলেন।

উইলিয়াম হোগার্থ ১৬৯৭—১৭৬৪

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শিল্পী উইলিয়াম হোগার্থ শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লবী ব্যক্তিবিশেষ। সমাজের উন্নতি স্তরে যাঁদের বাস, সেই উচ্চ বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতাই শিল্পক্ষেত্রে প্রধান এবং তাঁদের বিচারই শিল্পীকে পরিচিত করত বলে শিল্পীরাও সমাজের এই স্তরের ব্যক্তিবর্গের পোষকতাকেই শ্রেয় ভাবতেন। সমাজের অল্প বিত্তদের, অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ, কোন উপায়ই ছিল না যাতে তাঁদের চিত্রপ্রীতি চিত্র ক্রয়ের মধ্যে মুক্তি পায়। এই সামাজিক অবস্থায় শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম অধিক অর্থ এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে সর্বদাই উচ্চ বিত্তদের হাতে তুলে দিতেন। হোগার্থ উচ্চ বিত্তদের আশ্রিত নিরাপত্তা ত্যাগ করে নিম্নবিত্ত, স্বল্পবিত্ত, সাধারণের মধ্যে নিজের চিত্রের চাহিদা বাড়িয়ে তুললেন। সাধারণ দিক থেকে শিল্পীর এই ধরণের আচরণ সকলের সমালোচনা এবং উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টির বাইরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে শিল্পীর

এই ধরণের বিপ্লবী চিন্তা পরবর্তী বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চিত্র আন্দোলনকে মুক্তি দিয়ে হোগার্থ সমসাময়িক অনেক শিল্পী এবং উচ্চবিত্ত ব্যক্তিবর্গের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনমনীয় দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে ওই সমস্ত নিন্দাবাচক ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হয়। সেই সময়ের শিল্পী হলবিন্ কিংবা ভ্যান ডাইকের মত নিজেকে অনায়াসে তিনি ওপর মহলে যথেষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। ছবির দাম অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে এনে তিনি সাধারণের মধ্যেই নিজের ছবির চাহিদা বাড়িয়ে তুললেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই কাজ যে কি প্রচণ্ডভাবে শিল্পীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল তা বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলনের সামাজিক পটভূমি বিচার করলেই বোঝা যাবে। আসল চিত্রপটের এনগ্রেভিং তখনকার দিনে খুব সুলভ ছিল না। কিন্তু হোগার্থ অনেক আসল চিত্রকর্ম এবং প্রচুর এনগ্রেভিং করা ছবি অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে, শিলিং হিসাবে নামমাত্র মূল্যে সাধারণ্যে বিক্রয় করতে সুরু করেন। যাতে করে তাঁর ছবি কিংবা ছবির এনগ্রেভিং অন্য লোকের হাতে অন্যায়-ভাবে ব্যবহৃত না হয় তার জন্যে তিনি ছবির কপি রাইট বিষয়ক আইনের জন্য যথেষ্ট আন্দোলন করেন এবং পরে এই বিষয়ে সফলকামও হয়েছিলেন। উচ্চবিত্তদের নাক উঁচু মনোভাবের আওতায় শিল্পীরা জীবন ধারণের যে গ্লানি দিনের পর দিন জমিয়ে তুলেছিলেন তার বিনাশ-সাধন হোগার্থই প্রথম সুরু করেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সম্মানজনকভাবে জীবন ধারণের প্রয়াসের মূলমন্ত্র হোগার্থ ওই সামাজিক অবস্থায় প্রত্যয় করেছিলেন বলেই যথার্থভাবে তিনি সমস্ত শিল্পীর নমস্য।

নিখিল বিশ্বাস

সাহিত্য সংবাদ

মাত্র ছয়টি উপন্যাস যাঁর সাহিত্য জীবনের পাথেয়, যাঁর নাম আজ বহুযুগ পরেও বিদগ্ধসমাজে সশ্রদ্ধ বিতর্কের অন্যতম আশ্রয়, যে নাম সাহিত্য-পাঠকের মনে কেবলমাত্র শমীশাখার স্নিগ্ধ ছায়ার কুহেলি সৃষ্টি করেই অচিরে অন্তর্ধান করে না, তুষের ধিকি ধিকি আগুন জেলে মানুষের রসবোধের সহজাত প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করে তোলে সে নামের পুনঃ স্মরণের মধ্যে কোনও পুনরাবৃত্তি আছে বলে বোধ হয় না। ইংরাজদের অতি প্রিয় সেই নাম যাঁকে তারা ইংরাজি সাহিত্যের 'ভোরের পাখী' বলে আদর করে ডাকে আমেরিকানরা বলে—ডিয়ার জেন।

জেন অস্টেন যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগ ছিল এলিজাবেথীয় শৌর্যের ভগ্নদশার স্বাক্ষর এবং ইংরাজ জাতির অধঃপতনের কলঙ্কিত ইতিহাস। যখন তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন হয়ে অসন্তোষের ধূমাগ্নি সৃষ্টি করে চলেছেন তখন হ্যাম্পশায়ারে ষ্টিভেনটন সহরের রেভারেণ্ড জর্জ অস্টেনের গৃহে এক শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যেত আর শোনা যেত বালিকা কাসান্দ্রা এলিজাবেথের ঘুমপাড়ানি গান। কাসান্দ্রা এবং জেন, অস্টেন পরিবারের এই দুই কন্যার মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি এত বেশী ছিল যে তাদের মা পরিহাসচ্ছলে বলতেন কাসান্দ্রা যদি তার মাথাটা ইচ্ছে করে কেটে ফেলে তা'হলে জেনও সেই পথই অবলম্বন করবে এবং সেই একই অস্ত্র দিয়ে, অন্য অস্ত্র হলে চলবে না। অতি সাধারণ গৃহস্থের কন্যা জেন কোন দিন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন নি, দক্ষিণ ইংলণ্ডের মিষ্টি মেয়ে গৃহস্থালি কাজের অবসরে লেখাপড়ার চর্চা করে মানসিক উন্নতির পথ অন্বেষণ করতেন। স্টিভেনটনের পড়শীরা তখন কি কেউ কল্পনায় আনতে পেরেছিল যে ধীরমতি ক্ষীণাঙ্গী ও স্বল্পবাক জেন লেখনী-ধারণ করে পৃথিবীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির বেদীতে নিজের নাম উৎকীর্ণকরে চিরজীবী হয়ে আপামর জনসাধারণের মনে আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে? কাসান্দ্রা সম্ভবত' কিঞ্চিৎ অনুমান করেছিলেন, কারণ অস্টেন পরিবারে লেখাপড়ার জন্য একটি মাত্র ডেস্ক ছিল এবং সেই ডেস্ক নিয়ে ছেলেবেলায় জেনের সঙ্গে সে বিবাদ করত, কিন্তু কয়েকটা বৎসর পার হবার পর কিশোরী জেন যখন ডেস্কে বসে পাতার পর পাতা গল্পের মত কিছু লিখত তখন কাসান্দ্রা পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকত। জেনের সেই ডেস্ক আজও সংরক্ষিত আছে।

জেনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ইতিহাস যাঁরা আমাদের দান করতে পারতেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা কিছুই অক্ষরাবদ্ধ করে যাননি, তাই আমাদের অন্ধকারে হাতড়াতে হয় যদি কিছু মেলে কারণ কাসান্দ্রাকে লেখা জেনের মাত্র চুরানব্বইটি পত্রই আমাদের একমাত্র আলোক-বর্তিকা যার ক্ষীণ আলোয় জেনের জীবনবেদ অধ্যয়নের চেয়ে আমরা কল্পনাই বেশী করতে পারি।

"প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস" উপন্যাসটি জেন মাত্র একুশ বৎসর বয়সে শেষ করেন, কিন্তু তাঁকে আরও সতের বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল কারণ নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থার দরুন ছাপা-

খানায় জেনের এই উপন্যাস ছাপাবার কোন পথই ছিল না এবং সতের বৎসর পরে অর্থাৎ জেনের যখন আটত্রিশ বৎসর বয়স প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস রাহুমুক্ত হল, ছাপাখানার মালিকেরা উপন্যাসটি ছাপতে রাজী হল এক সর্তে যে টাইটেল-পেজে লেখিকার নাম থাকবে না, সম্মতি দেওয়া ছাড়া জেনের আর কি উপায়ই বা ছিল অথচ প্রথম উপন্যাস "সেন্স এ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি" পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস' আজও বিতর্কের ঝটিকাবর্ত, কেউ বলেন অপূর্ব অন্যজন হয়ত এই উপন্যাসে আনন্দের অনুভূতি স্পর্শ করেছেন মাত্র আবার অপরজন হয়ত বিদ্রোহের নির্দেশ খুঁজে পেয়েছেন। স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেছেন যে তিনি বার বার গ্রন্থটি পাঠ করেছেন এবং অবাক হয়ে ভেবেছেন যে এত অল্প বয়সে জেন যেরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় অপূর্ব। স্কট স্বীকার করেছেন—শৌর্য-বীর্যমণ্ডিত উপরওলার চরিত্র আমি সামলাতে পারি কিন্তু জেন যে সব চরিত্র অঙ্কিত করেছেন সেই সব সাধারণ মানুষ যারা আমাদের খুবই পরিচিত অথচ সাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে আমাদের কালে যাদের কল্পনা করা যায় না, কিন্তু জেন তাদের জীবিত করেছেন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অনন্তকালের জন্য এবং সেই মমতাময় চিত্রণ কাজে এক নূতন পথের ইঙ্গিত বহন করে আনে। জেনের অকালমৃত্যু আমার কাছে এমত শোকাবহ যে যেন আমার কোনও আত্মীয়া আমায় অকালে ছেড়ে চলে গেছে। অন্যপক্ষে বিরুদ্ধমতও আছে, দার্শনিক এমার্সন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন জেনের উপন্যাসগুলির এত সমাদর কেন এ তাঁর বোধগম্য নয়, বিশেষতঃ প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস তাঁর কাছে অশ্লীল বলেই মনে হয়েছে।

বয়সের তুলনায় জেনের মানসিক গতি ছিল দুর্বার এবং পরিণত মনের পরিচায়ক। সে যুগে অল্পবয়সী মেয়েরা সাধারণতঃ মাথায় ক্যাপ পরত না, কিন্তু জেন মধ্যবয়সী মেয়েদের মত ক্যাপ পরতেন এবং নিজেই চমৎকার ক্যাপ তৈরী করতেন, কাসান্দ্রাকে ১৭৯৮ সালের এক পত্রে জেন জানাচ্ছেন যে তিনটি নূতন ক্যাপ তিনি তৈরী করেছেন এবং মাথার চুল ছোট করে ছেটেছেন কারণ বিনুনী করবার সময়ের বড় অভাব। তার জীবনের কয়েকটা মুহূর্তের হৃদয়গ্রাহী চিত্র হয়ত আমরা তার চিঠিপত্রের মধ্যে খুঁজে পাই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের কথা আমাদের কে শোনাবে? যাঁরা তা পারতেন তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করে পৃথিবীর মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

জেনের অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধে পূর্বসূরীদের নীরবতা কিন্তু মানুষের কৌতূহলী চেতনার উপর বারংবার আঘাত হেনেছে যার ফলে মানুষের অনুসন্ধিৎসা কবন্ধের মত সম্ভাব্য সকল নথিপত্রে হাতড়িয়ে জেন সম্বন্ধে নূতন কিছু আবিষ্কারের নেশায় আজও তারা মত্ত।

বিদগ্ধ-সমাজে যে প্রশ্নটি বার বার চাঞ্চল্য জাগায় তার কোনও সদুত্তর কিন্তু আজও পুরোপুরি মেলেনি। জেনের উপন্যাস বিতর্কের বস্তু হলেও পণ্ডিতদের অবসর-চিন্তার প্রবাহ সম্ভবতঃ একই খাতে নিঃশব্দে বয়ে যায় যখন তাঁরা ভাবেন—জেনের নিঃসঙ্গ জীবনে কি কোনদিন প্রেম এসেছিল? এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে, কয়েকজন নিজস্ব মত সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে সেই মতগুলি অসার না হলেও দুর্বল এবং দৃঢ়ভিত্তিক নয় বলেই মনে হয়।

স্যার ফ্রান্সিস ওয়েল ১৮৮৬ সালে তাঁর স্মৃতিচারণের একস্থলে জেনের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৮০২ সালে অস্টেন পরিবার অর্থাৎ রেভারেণ্ড অস্টেন, কাসান্দ্রা ও জেন একবার ইউরোপে দেশভ্রমণে গিয়েছিলেন, সুইজারল্যাণ্ডে

বসবাসকালে জেন বৃটিশ নৌবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কয়েক দিন আলাপ করেন কিন্তু বিদায়গ্রহণের পর কর্মচারীটি অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। স্যার ওয়েলের এই কাহিনীর অন্যতম সংবাদদাত্রী হলে কুমারী উরসুলা মেয়ো, যাঁর কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যে সংবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল সে সংবাদ বর্জন করাই শ্রেয়, কিন্তু স্যার ওয়েলের কাহিনী তুচ্ছ করাও সহজসাধ্য নয় কারণ তিনি কোনও সাধারণ নাগরিক ছিলেন না, তিনি অক্সফোর্ডের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই কাহিনীর একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হল অস্টেন পরিবারের বিদেশ ভ্রমণের বৎসরটি অর্থাৎ ১৮০২ সাল। এই বৎসর অ্যামিয়ার সন্ধি অনুযায়ী ব্রিটিশ প্রজাগণ ইউরোপে অবাধ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন ১৮০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত। অনুমান করা যেতে পারে অস্টেন পরিবার এই সময়ের মধ্যে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এ কথা বলা যায় অস্টেন পরিবারের চিঠিপত্রে, স্মৃতিকথায় অথবা পরবর্তীকালে রচিত জেনের কোনও জীবনীতে এই বিদেশ ভ্রমণের কিছুমাত্র উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ রেভারেণ্ড অস্টেনের অর্থসংগতি বিশেষ সচ্ছল ছিল না বিশেষতঃ বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তৃতীয়তঃ জেনের মা এই দেশ-ভ্রমণে অনুপস্থিত ছিলেন, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি বৃদ্ধ রেভারেণ্ড একাত্তর বৎসর বয়সে স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, যার সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। এই কাহিনী যদি সত্য হয় তা'হলে জেনের যে চুরানব্বইটি চিঠির আজ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে তার একটিতেও সেই ভ্রমণের কোনও উল্লেখ নেই সুতরাং আমরা একথাই কি ভাবব যে জেনের ভগ্নহৃদয়ের স্পর্শ যে সকল চিঠির মধ্যে ছিল কাসান্দ্রা সেগুলি নষ্ট করেছিলেন? যাইহোক স্যার ওয়েলের সংবাদ বিশ্বাস করা যেমন শক্ত, তুচ্ছ করে এড়িয়ে যাওয়াও তেমন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

জেনের হৃদয়বৃত্তির দ্বিতীয় কাহিনী সম্বন্ধে ডক্টর চ্যাপম্যান বলেছেন কাহিনীটি পরস্পর বিরোধী। তৃতীয় কাহিনীর বর্ণনায় কিছু সারবত্তা থাকার সম্ভাবনা বেশী কারণ জেনের আত্মীয়া ফ্যানি ক্যাথরিণ লেফ্রয় "টেম্পল বার" গ্রন্থে বলেছেন, জেন যখন ১৭৯৭ ও ১৮০০ সালের মধ্যে সাউথডিভনে বসবাস করেন তখন একজন যুবক পাদ্রীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অস্টেন পরিবার পুনরায় যখন স্টিভেনটনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, কথা ছিল যুবক পাদ্রী সেখানে রেভারেণ্ড অস্টেনের কাছে জেনের পাণি-প্রার্থনা করবেন, কিন্তু জেনের জীবনে সেই সুদিন আর ফিরে আসেনি কারণ পরে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যুবকটি পরলোক গমন করেছেন। আপাততঃ জেনের অন্তরঙ্গ জীবনের কাহিনীর যা সন্ধান পাওয়া গেছে তার কোনটিরও ভিত্তি সুদৃঢ় নয়, কিন্তু তুচ্ছ করবার শক্তিও আমাদের নেই সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে যদি কোন গুণীজন জেনের জীবনের বিয়াল্লিশটি বসন্তের কোনও এক মোহময় অন্তরঙ্গ সন্ধ্যার কাহিনী পরিবেশন করতে সক্ষম হন।

এ পৃথিবীর বুক থেকে জেন বহুকাল পূর্বে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আজও মানুষ অবসর পেলেই লণ্ডন থেকে সত্তর মাইল দূরে উইনচেস্টার গীর্জার সমাধিক্ষেত্রে টিউলিপের গুচ্ছ হাতে নিয়ে জেনের সমাধিস্থলে মৌন দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর হয়ত কোনও এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিউলিপের গুচ্ছটি সমাধির পর ধীরে ধীরে রাখে। কেউ হয়ত নিঃশব্দে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে জেনের এপিটাপ স্পর্শ করে।

সাংবাদিক জেমস বেনেটকে সমাধিস্থলের পাদ্রী একদা প্রশ্ন করেছিল—উইনচেস্টার গীর্জায় এত দর্শনীয় বস্তু রয়েছে তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ দর্শক এই ছোট সমাধির কাছে নীরবে

দাঁড়িয়ে থাকে কেন? কি এমন মাধুর্য জেনের রচনায় আছে যা সকলকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে? বেনেট সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন— She wrote honestly.

•

নূতন গ্রন্থ

প্রচলিত সাহিত্যরীতি উপেক্ষা করে যাঁরা সাহিত্য-সাধনা করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন বিদ্রোহী সাহিত্যিক আজও জীবিত আছেন তন্মধ্যে আপটন সিনক্লেয়ার সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ। ১৯০৬ সালে তাঁর উপন্যাস "দি জাঙ্গল" সাহিত্যের নবদিগন্তে যে ঝড় তুলেছিল তা আজও প্রবাহমান এবং সুখের কথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তিনি শক্তিমান সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা কেবলমাত্র পাঠককেই চমৎকৃত করত না তদানীন্তন শ্যেনচক্ষু সমালোচকরাও তাঁর এই অভিনবত্বের প্রশস্তি গেয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। আজ তিনি বয়োবৃদ্ধ কিন্তু এখনও তাঁর হৃদয়ে রসের ফল্গুধারা যে লুক্কায়িত আছে তার পরিচয় আমরা পুনরায় পেলাম তাঁর "মাই লাইফ টাইম ইন লেটার্স" গ্রন্থে। গ্রন্থটি কয়েকটি সুনির্বাচিত পত্রের সংকলন। কিন্তু পত্রগুলির অভিনবত্বের বিচার করলে দেখা যাবে আপটন সিনক্লেয়ার চুরাশী বৎসর বয়সেও পাঠক ও সমালোচকদের যুগপৎ চমৎকৃত করে দুর্লভ রসবোধের পরিচয় দেবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেন নি।

আপটনের সংগ্রহে প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারটি পত্র সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যদেশের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় ছিল। এই পত্রগুলির প্রেরক যাঁরা তাঁদের মধ্যে যেমন বহু গুণীজন আছেন তেমনি আপামর জনসাধারণও আছেন আর এইখানেই আপটনের বিশেষত্ব এই যে কোনও পত্র তিনি নষ্ট করেন নি প্রত্যেকটি তাঁর সংগ্রহে সযত্নে সংরক্ষিত।

এই বিপুল সংখ্যক পত্র-সংগ্রহের মধ্যে মাত্র তিন শতটি পত্র তাঁর "মাই লাইফটাইম ইন লেটার্স" গ্রন্থে সংকলিত করেছেন এবং পত্রগুলি এক ক্রান্তিকালের পরিচয় বহন করছে। সংকলনটি প্রকাশনের পক্ষে আপটনের একমাত্র যুক্তি হল কোনও বিষয়বস্তু অথবা বিশেষকালের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রলেখকের সুচিন্তিত মতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা। প্রায় সকল পত্রগুলিই ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রেরিত। কয়েকটির লেখক আমৃত্যু আপটনের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এমন প্রমাণও আছে। যে সকল মনীষীর পত্র এই সংকলনে আছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে যেমন--রবীন্দ্রনাথ, বার্নাড শ, টমাস মান, রোমাঁ রোলাঁ, ইউজেন ও'নীল, সিনক্লেয়ার লুইস, কোনান ডয়েল, ডি· এইচ. লরেন্স, ভান আইক ব্রুকস, জ্যাক লন্ডন, শেরউড এ্যান্ডারসন, এইচ. এল· মেনকেন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস, থিওডোর ড্রিইজার এবং ব্রান্দেস প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিতারথী, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, ধুরন্ধর রাজনীতিক উইনস্টন চার্চিল, প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট। প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক ম্যাক্সিম গর্কী, ডেবস এবং কার্ল কটস্কি ও আছেন। মহাত্মা গান্ধীর পত্র এবং মনস্তাত্ত্বিক হ্যাভলক এলিস ও উইলিয়ম ম্যাকডুগালের পত্রগুলি মনোজ্ঞ। অপ্রকৃতিস্থ·কবি এজরা পাউন্ড যাঁর পরিণাম স্মরণ করে আমরা দুঃখ অনুভব করি তাঁর পত্রও আছে। যদিও পত্রগুলির কয়েকটি আপটনের কোনও গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্রমাত্র, কিন্তু বার্নাড শ অথবা ডাচ ঔপন্যাসিক ফ্রিডরিখ ভান ইডেনের পত্রগুলির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের উত্তাপ অনুভব করা যায়। মেনকেন যেমন আপটনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির নিখুঁত সমালোচনা করেছেন তেমনি আপটনের প্রতি লেখক ও মানুষ হিসাবে পত্রগুলিতে মেনকেনের যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তা অনুকরণযোগ্য।

পত্রসংকলনটি পাঠকের কাছে বিচিত্র রস পরিবেশনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে উপস্থিত হয়েছে

সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এই পরিণত বয়সে আপটন পত্রনির্বাচনের বিষয়ে যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ এবং তাঁর চিন্তাশীলতা যা তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের আঙিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তার চমকপ্রদ ইঙ্গিত তাঁর এই গ্রন্থটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুনরায় লাভ করে তাঁর কাছ থেকে আরও নূতন কিছু লাভের সম্ভাবনায় আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আপটনের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও অন্যান্য নথিপত্র যার ওজন প্রায় আট টনের মত এখন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে গবেষণার জন্য সংরক্ষিত আছে সম্ভবতঃ আমেরিকার অন্য কোনও সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যসাধনার পরিচয় লাভ এমন বিপুলভাবে করা যায় যা আপটনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে আর এই সম্ভাবনার কারণ যা আমরা অনুমান করতে পারি তা হল আপটনের মানবতা ও সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ যার নিদর্শন বর্তমান কালের চিন্তাজগতে ক্রমশঃ দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে।

My Lifetime in Letters. By upton Sinclair, Columbia, Mo: University of Missouri Press [1960] XXI, $6.50.

নিকোলাই গোগোল ঃ নবোকভ।

ভ্লাদিমীর নবোকভ আজ বিশ্বসাহিত্যের নবদিগন্তের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিছুদিন পূর্বে সাহিত্যপাঠকের মনে তাঁর লোলিতা উপন্যাস কি আলোড়ন তুলেছিল তার পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন সম্ভবত নেই।

কিন্তু আজকের নবোকভ আর ১৯৪৫ সালের নবোকভ কি এক? সে প্রশ্নের কিঞ্চিৎ সমাধান হয়ত তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লাভ করা যাবে। নবোকভ এই রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিকোলাই গোগোলের সাহিত্যকর্মের নবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। গোগোল সম্বন্ধে নবোকভ যে মমতাপূর্ণ অভিমত পেশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন গোগোলের সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর জোড়াতালি দেওয়া রাশিয়ান জীবনের যে ছবি আমরা পাই তা যে কোনও উচ্চমানের শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকলার সমতুল। প্রকৃতপক্ষে নবোকভ, গোগোলকে বর্তমান রাশিয়ার কঠোর বাস্তবাদের ধোঁয়াভরা সাহিত্য-আঙিনা থেকে ছিনিয়ে এনে ইজম্‌শূন্য আলোময় দিগন্তে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন যার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গোগোলের সাহিত্যকর্মের প্রতি যদি আকর্ষণের মাত্রা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায় তার মূলে থাকবে নবোকভের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সম্ভবতঃ গোগোলের প্রতি নবোকভের এই মমতার কারণ বোধকরি সেই বিশেষ সাহিত্য-রীতি যা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া লেখক ও পাঠকসমাজের কাছে পরিত্যজ্য ছিল কিন্তু সেই সাহিত্যরীতি যে মৃত নয় তার স্পষ্ট প্রমাণ নবোকভের সাহিত্যখ্যাতি, গোগোল যে গদ্যরীতির সাধনা করেছিলেন তার সুযোগ্য শিষ্য নবোকভ পৃথিবীর সাহিত্যরস পিপাসুদের মনে আজো সেই সুরের গুঞ্জন তুলে চলেছেন যা ভোরের সানাইয়ের মতই মিষ্টি।

অজিত দাস

কাব্যপরিক্রমা ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী ১৯৬১। মূল্য ২·২৫।

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিয়কুমার সেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১। বিশ্বভারতী। মূল্য ৫·০০।

রবি-কথা ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। দাম ৩·৫০

কবি প্রণাম ॥ সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। মূল্য ৫·০০।

রবীন্দ্রসমালোচনা সাহিত্যের প্রথম যুগের একটি উজ্জ্বলতম গ্রন্থ 'কাব্য পরিক্রমা'। অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির নিকট সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁকে কবির মন বুঝতে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছিল। তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনা এমন একটা মান নির্ণয় করেছে যা পরবর্তী বহু রবীন্দ্র সমালোচকের আদর্শ হয়ে আছে। কাব্য পরিক্রমার নূতন করে আলোচনা আজ অবান্তর। ১৩২২ সাল থেকে ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত—এই চুয়াল্লিশ বছর এই গ্রন্থ পাঠকদের আনন্দ জুগিয়ে আসছে কারণ এ শুধু বুদ্ধির সমালোচনা নয় বা অনার্স পাঠ্য ব্যবসাদারী নয়। রবীন্দ্র সমালোচনায় এ গ্রন্থ আজ ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে।

'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ'ও দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখক অমিয়কুমার সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী কীটস প্রভৃতির তুলনা করেছেন কিন্তু তা এতই সংক্ষিপ্ত যে তার থেকে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পোঁছানোর চেষ্টা করা সংগত নয়।। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে মানুষের সাফল্যের মহিমাটুকুই য়ুরোপীয় সাহিত্যে ধরা আছে এ কথা যথেষ্ট বিচারের অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্ধৃতি সত্ত্বেও বলবো যে এই মন্তব্যকে মূল সূত্র ধরে পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করা খুব সমীচীন হয়নি। শেলী ও কীটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য যেটুকু সেটুকুও আরও বিস্তৃত হলে ভাল হতো।

লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি এক একটি করে আলোচনা করেছেন—তাদের ভিতরে কবির প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সবগুলি অবশ্য সমান ভাল হওয়া সম্ভব নয়। শেষ সপ্তক ও বীথিকার আলোচনা যত হৃদয়গ্রাহী পুনশ্চ কাব্যের আলোচনা সেই পরিমাণেই বিবর্ণ।

এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অনুভূতির ধারা ও তার বিবর্তনের ইতিহাসটি বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ও জটিল প্রতিভার এই সরল ও সহজ ব্যাখ্যা, স্থানে স্থানে অতি সারল্যের দোষ দুষ্ট হলেও, চিত্তাকর্ষক ও সেই কারণেই প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রজীবনীর প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রজীবন-কথা' নামে একটি গ্রন্থ বিশ্বভারতীর হাতে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষিপ্ত এই জাতীয়

একটি সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। এবার তিনি আর ও সংক্ষিপ্ত একটি কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। ভূমিকায় জানিয়েছেন যে বেতারে পড়বার জন্যে লেখা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবি জীবনাংশগুলি সংকলিত করেই রবি-কথার জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট গৌরব-সমুজ্জল জীবন যত আলোচিত হয় ততই ভাল। সেদিক থেকে অন্যান্য জীবনগুলির সঙ্গে এই গ্রন্থটিকেও সাদর সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। এ গ্রন্থ সহজপাঠ্য, সরল স্বচ্ছ ভাষায় গল্পের স্রোতের মধ্যে পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুখপাঠ্যতা এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গুণ। তাছাড়া শৈশব যারা সদ্য পেরিয়েছে তাদের হাতে এ বই দেবার মত। লেখক বহু জায়গায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল ছোটদের বইতে এত উদ্ধৃতি কেন? পরে মনে হল, ভালই হয়েছে, যারা সবে কৈশোরে পা বাড়িয়েছে তারা এই জীবনী পড়তে পড়তে কবির নিজের কথাও পড়বে। যদি কিছু কঠিন লাগে তো লাগুক। নিজেরা ভাবতে শিখবে। রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তা তাদের মনে চিন্তার তরঙ্গ জাগিয়ে তুলবে।

পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রজীবনীর যা দেয় তা যদি কেউ এই গ্রন্থে আশা করেন তবে সেটা নিতান্তই ভুল হবে—অবিচার হবে লেখকের প্রতি। শিশু না হোক কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবেই এর মূল্য—সে মূল্য একে দিতেই হবে।

'কবি প্রণাম' শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি কবিতা সংকলন। বাংলাদেশের বহু কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁদের ব্যাপ্তি প্রায় ষাট বৎসর বিস্তৃত। যা মহান, যা শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে প্লাবিত করে বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করে তার প্রতি প্রণাম জানানো কবিদের কাজ। মুগ্ধ বিস্ময়কে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে তাঁরা নিজেদের তৃপ্ত অন্তরকে ভাষা দেন।

রবীন্দ্রনাথ তেমনি একজন স্রষ্টা যাঁর বিপুলতার সীমা পরিসীমা আমরা পাইনে। বিরাট সূর্য যেমন যুগ যুগ ধরে কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে, তেমনি বিরাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের বিষয়বস্তু হয়েছেন এবং আরও পরবর্তী কবিদের হবেন এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

কবিতা বিশ্লেষণ নয়, অনুভূতির শুদ্ধতম প্রকাশ। এই সংকলনে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা অতি গতানুগতিক, যার মধ্যে সত্যকার অনুভূতির ছোঁওয়া নেই, যা স্কুলপাঠ্য পত্রিকার শোভা হতে পারতো। সেগুলিকে যদি ঐতিহাসিক ধারা রক্ষার জন্য স্থান দেওয়া হয়ে থাকে তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু কবিতা হিসাবে সেগুলি নিতান্ত নগণ্য।

আর কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলিতে কবির দৃষ্টির মধ্য দিয়ে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে পাই—যে কবিতায় কবির অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার পরিধি ব্যাপ্ত করে। যেমন বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জাতিবিস্মর-কবিতাটি সম্পূর্ণ পড়ে পাঠক যখন শেষ পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করে,

> শুধু জানিল না
> সেই জাতি বিস্মর,
> অঙ্গার আজি তিল-উত্তমা
> লভি শুধু তারই বর।

তখন কবির বিপুল বিরাটত্ব অনেক বিশেষণ সমন্বিত বাক্যের ব্যাপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়। মনীশ ঘটকের কবিতার প্রথম স্তবক ম্যাথু আর্ণল্ডের সেক্সপীয়র বন্দনাকে মনে আনে। এ কবিতায় ভাণ নেই, কঠিন বাক্যসমাবেশও বলতে পারিনা এ কবিতা চেষ্টাকল্পিত—এর বন্দনার আবেদন সবল ও তীব্র।

'বন্দনা'র কবিতাগুলির প্রধান সুর হলো ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়ে চকিত ভীত মানুষের আশ্বাস লাভ আর প্রতিভার মহত্বে অগাধ বিস্ময়। পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়া, নানা সভ্যতার ওঠা-নামা, দানবের নির্লজ্জ মূঢ়তা এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশা ঃ—

প্রাণকে হারাতে বসেছি, বিচ্ছিন্ন সুর
তাই, আজ তোমাকে স্মরণ করি, রবীন্দ্র ঠাকুর !
(শুদ্ধসত্ত্ব বসু)

আরবার মমুর্ষুর ভিড়
সভ্যতা দেউলে হয়—জমে ওঠা শত শতাব্দীর।
তবু শুনি শুনি সেই সুমহান স্বর :
উপল বন্ধুর পথে
যুগে যুগে আসে তীর্থঙ্কর।
(আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

পৃথিবী ভাঙার দিনে
পড়ুক যেখানে যত মালিন্যের দাগ
হে হৃদয়—দেখ—দেখ
কি উজ্জ্বল তবু এ বৈশাখ!
(গোবিন্দ চক্রবর্তী)

এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আশ্বাসে দৃপ্ত হয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের তরুণ হৃদয়—

যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

'সঙ্গীত' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে সুরের গুরু হিসাবে কবিতা প্রণাম জানিয়েছেন। এ কবিতা-গুলির উপরেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। নাম না বলে দিলে কবির অনুকরণ যে কতদূর তা বোঝা যায়। যেমন

তরুণ মনে লাগলো সুরের দোলা
অকাজের কাজ রইলো ঘরে তোলা
গানের মধু পান করে তার
রাত্রি দিবস কাটে।

শেষ অংশ 'বিলাপ'। এই অংশের বহু কবিতা নিতান্তই পদ্য—কবিরই বহু পংক্তির পুন-র্বিন্যাস। দৃষ্টি জোর করে আকর্ষণ করে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা। কবির শেষ যাত্রাকে কেন্দ্র করে একটি বলিষ্ঠ রচনা, পাঠকের মনে এর ছোঁওয়া লাগেই। আর মন ছুঁয়ে যায় পরিমল গোস্বামীর কবিতা। কবির মৃত্যুর পর সমস্যাজর্জর ভারতের কথা বলে পরিমল গোস্বামী বলছেন—

র‍্যাথবোনেরা বিদায় বেলায় দিল ঠেলে পাঁকের তলায়
তোমার স্বদেশ যেমন তুমি বলেছিলে ক্ষোভে।
সেদিন হতে খণ্ডিত দেশ, শান্তি উধাও, কবি
তুমি যেমন এঁকেছিলে ফুটলনাসে ছবি।

তেমনি উল্লেখযোগ্য বলাইচাঁদের দীর্ঘ ও জীবনানন্দের সংক্ষিপ্ত কবিতাটি।

যিনি এই কবিতাগুলি সংকলন করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বহু প্রবন্ধ সংকলন

বেরিয়েছে কিন্তু কবিতা সংকলন বেশী বেরোয়নি। বন্ধুর মধ্য দিয়ে কবিকে জানবার যেমন চেষ্টা হয়েছে তেমনি সুরু হলো অন্যের অনুভূতির আয়নায় তাঁকে দেখবার চেষ্টা, 'কবি প্রণাম' সেই বিচারে সার্থক প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটির বহিরঙ্গ সজ্জার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রশংসাও না করে পারি না।

মঞ্জুলা বসু

রবীন্দ্রায়ণ।। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত॥ বাক্-সাহিত্য—কলিকাতা ৯। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য কুড়ি টাকা।

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব বাংলা বই বেরিয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় সওয়াশ'। "রবীন্দ্রায়ণ" যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্যে এ বইটি স্থায়ী আসন লাভ করবে। এর বিষয় গৌরব, মুদ্রণপারিপাট্য এবং সর্বোপরি নিপুণ সম্পাদনা রুচিশীল বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা সংকলিত হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে আছে রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা। পরলোকগত অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধটি "রবীন্দ্রায়ণের" ভূমিকার কাজ করত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি এটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সম্পূর্ণ হলে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে নতুন কথা শোনা যেত। কলকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের পরিবেশ রবীন্দ্র-সাহিত্যে কত সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-নাথের চিন্তাধারায় উপনিষদের প্রভাব সম্বন্ধে উদ্ধৃতি সহযোগে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত। "রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস" লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে যে অযৌক্তিক ঘোষণার প্রয়াস সম্প্রতি দেখা গেছে সেই পট-ভূমিকায় এই রচনাটির বিশেষ মূল্য আছে। "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার" এবং "রবীন্দ্র-নাথের শব্দ" নতুন ধরণের আলোচনা; লিখেছেন সুকুমার সেন ও বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁদের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে বিচার করেছেন ভবতোষ দত্ত। অমলেন্দু বসুর "রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। সুনীলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ "আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব" কোথাও কোথাও বিতর্ক-মূলক। রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়ারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং এই প্রভাবের মধ্যেই সন্ধ্যাসংগীতের জন্মরহস্য ধরা পড়ে,—লেখকের এই দাবি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেছেন সোমনাথ মৈত্র। অজিত দত্ত রবীন্দ্র-নাথের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কানাই সামন্ত করেছেন দামিনী চরিত্রের বিশ্লেষণ। রবীন্দ্র-নাথের গল্পে প্রকৃতির যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিনয়েন্দ্র-মোহন চৌধুরী। শিশু-সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে লীলা মজুমদারের রচনাটি বিস্তারিত হলে ভালো হত।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে পর পর তিনটি প্রবন্ধ আছে।

লিখেছেন ঃ নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও পৃথ্বীশ নিয়োগী। নীহাররঞ্জন রায়ের রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য রচনা করেননি গোপাল হালদার তা বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা" শীর্ষক রচনায়। পল্লীর উন্নতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভবতোষ দত্ত "আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কবির আগ্রহের পরিচয় পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। বাংলার লোকসংস্কৃতি কবি কি ভাবে গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে বিনয় ঘোষের প্রবন্ধে। দিলীপ-কুমার বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত, শচীন সেন, শঙ্খ ঘোষ যথাক্রমে লিখেছেন "রবীন্দ্র-নাথের ইতিহাস-চিন্তা" "রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন," "রাষ্ট্র বনাম সমাজ", এবং "রবীন্দ্র-নাথের পত্রধারা।" হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূল কথা" এবং পরিমল গোস্বামীর "রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান" এই সংকলনের দুটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রফুল্লকুমার দাস, রাজ্যেশ্বর মিত্র এবং পরলোকগত বিমলচন্দ্র সিংহ। কবির দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। কবির সংগে যোগাযোগের একটি সুখপাঠ্য স্মৃতিচিত্র লিখেছেন সাহানা দেবী। হিরণকুমার সান্যাল সংক্ষেপে সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন দ্বারকানাথ থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর বাড়ির তিন পুরুষের।

প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন যে সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল তা সূচীপত্র দেখ-লেই উপলব্ধি করা যায়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ছেপে বের করবার সহজ পথ তিনি গ্রহণ করেননি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত কয়েকজন লেখকের রচনা "রবীন্দ্রায়ণে" পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আজকাল নামী লেখকদের বূহ্য ভেদ করে নবীন লেখকের স্থান পাওয়া—বিশেষ করে এজাতীয় সংকলনে—খুব কঠিন। সম্পাদক যে লেখকের খ্যাতির উপরেই নির্ভর করেননি, রচ-নার গুণ বিচারই যে তাঁর নিকট প্রাধান্য লাভ করেছে, তাঁর প্রমাণ পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় কথা, সম্পাদক বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রুচির লেখকদের একত্রিত করতে পেরেছেন। এটা সম্পাদকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সমকালীনের আকারের দুই খণ্ডের কাপড়ে বাঁধাই বই; পরিচ্ছন্ন ছাপা। রবীন্দ্রনাথ ও অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি, ফটোগ্রাফ ও প্রতিলিপির সংখ্যা তেত্রিশ। সেই তুলনায় বইয়ের দাম বেশী নয়। সম্পাদকের সংগে প্রকাশকের অকুন্ঠ সহযোগিতার ফলেই এমন সুন্দর একটি বই আমরা পেয়েছি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

বিশ্বপথিক বাঙালী ॥ বিমলচন্দ্র সিংহ ৫·০০
বাংলার নবযুগ ॥ মোহিতলাল মজুমদার ৬·০০
গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য ॥ শান্তিদেব ঘোষ ৩·০০
ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস ॥ সুবোধ ঘোষ ৫·০০
শরৎচন্দ্র ও তারপর ॥ কাজী আবদুল ওদুদ ৪·০০
রবীন্দ্র প্রতিভা ॥ কানাই সামন্ত ১·০০
রবি-কথা ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩·৫০
ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ॥ নিরঞ্জন চক্রবর্তী ৮·০০
স্মৃতিচারণ ॥ দিলীপকুমার রায় ১২·০০
ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ॥ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ২·৫০
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ॥ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১২·০০
পুরাতনী ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ৫·০০
অবনীন্দ্র-চরিতম্ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ৫·০০
ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ॥ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৫·৫০
অলংকার চন্দ্রিকা ॥ শ্যামাপদ চক্রবর্তী ৫·৫০
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ॥ উমা দেবী ৬·০০
শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ॥ হুমায়ুন কবীর ১·৫০
বাংলা কাব্যে শিব ॥ ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ১০·০০
ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী ॥ নরেন্দ্র বাগল জ্যোতিঃ শাস্ত্রী ১০·০০
কলকাতার পথঘাট ॥ প্রাণতোষ ঘটক ৩·০০
বাদশাহী আমল ॥ বিনয় ঘোষ ৬·০০

কা ব্য গ্র ন্থ

সাগর থেকে ফেরা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩·০০
সুনির্বাচিত কবিতা ॥ মোহিতলাল মজুমদার ৪·০০
স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৪·০০
সনেট পঞ্চাশৎ ও অনান্য কবিতা ॥ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ৫·০০
কবি-প্রণাম ॥ বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ৫·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭

এ্যাসকো
সাবানে
কাচাই
সহজ

ASCO
SPECIAL
HOUSEHOLD SOAP
TABLET
ASCO BAR
ASCO
বার ও ট্যাবলেট
এক টুকরো এ্যাসকো সাবানে
কম সময়ে অনেক বেশী
কাপড়চোপড় পরিষ্কার হয়
প্রচুর ফেনা হয়
জামাকাপড় টেকেও বেশী।
এশিয়াটিক সোপ কোং — কলিকাতা

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 May '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দশম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।
টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১˙৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১˙৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

রেডিয়েন্ট প্রসেস

দশম বর্ষ। ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতা ঃ মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের মুঠিতে

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সংবাদপত্রের বিবরণীতে পড়লুম—শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তা'হলে একাই সমস্ত কুসংস্কার ভেঙে দিতে পারতেন। চমকে দেবার মত কথাটা। কারণ বাংলা দেশে স্বামীজীর পরিচয় এখন দাঁড়িয়েছে—(১) হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক; (২) হিন্দু জাতীয়তার অন্যতম প্রবর্তক; এবং (৩) স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালের গণেশ দেবতা। আধুনিক ছোকরাদের কেউ কেউ পিতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায় চোখ পাকিয়ে এমনও বলছে—চিকাগোয় বিবেকানন্দের বক্তৃতা-সাফল্য জাতীয় জীবনের একটি দুর্মর (দূর—মর!) কুসংস্কার। প্রার্থনা করি, বাংলা দেশের তেজী তরুণ কণ্ঠ চিকাগোয় বিবেকানন্দের সাফল্য অপেক্ষা অধিকতর বচন-সাফল্য অর্জন করুক, তেমন সত্যই কিছু ঘটলে, অন্তরীক্ষে বিবেকানন্দ যদি কোথাও থাকেন, 'আমার তরুণ সিংহদলের' তেজোবীর্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন, এবং, এই সব 'অমুসলমান' ব্যক্তিরা 'হিন্দু' বিবেকানন্দকে যতই সমালোচনা করুক, যদি তাদের বিদ্রোহের মধ্যে সত্যকারের মনুষ্যত্বের অঙ্কুরমাত্রও থাকে, তা'হলে উল্লাসে অধীর হয়ে বিবেকানন্দ বলবেনই—সাবাস্, ঐ তো মহীরুহের সম্ভাবনা! এ কথা তিনি বলবেনই, কারণ—'তুমি কোন পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া যাত্রা করিতেছ তাহা আমার বিচার্য নয়।'—

তাঁর আগ্রহ একটিমাত্র ব্যাপারে 'তুমি সত্যই যাত্রা করিয়াছ।'

উপনিষদকে আকণ্ঠ পান করে পৃথিবীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ মহত্তর অহংকারে বলেছিলেন,—শঙ্করাচার্য এ কথা বলুন আর নাই বলুন 'আমি বিবেকানন্দ' বলছি। সমুদ্রস্তনিত

কণ্ঠ আকাশ স্পর্শ করে মাটিতে নেমে এসেছিল,– উপনিষদ থেকে আমি দুটো জিনিস শিখেছি— মুক্তি ও শক্তি। যা কিছু এই মুক্তি ও শক্তির বিরোধিতা করে বিবেকানন্দের কাছে তাই হোল কুসংস্কার। তাঁর ধারণায়, আত্মার একত্ববোধ ছাড়া যথার্থ স্বাধীনতাবোধ আসতে পারে না। যে নিজেকে অন্যের সঙ্গে সম-আত্মা না ভাবতে পারে সে অপরকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। কাপুরুষ ও অত্যাচারী তাই তাঁর কাছে একই শব্দের এ-পিঠ ও-পিঠ। বিবেকানন্দ তাই ডাক দিয়ে বললেন, সর্ববিধ কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেল, অসাম্য একটা কুসংস্কার, দূর কর তাকে 'Cleanse yourself of the primal sin of inequality' গ্রন্থের ও শাস্ত্রের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বললেন, "সর্বোপরি 'এটা পুস্তকে আছে'—এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হও।" 'পুস্তক-পূজা' তাঁর কাছে 'জঘন্যতম পৌত্তলিকতা'। কুসংস্কার কিভাবে ধর্মকে গ্রাস করে আছে তার কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ এর জন্য দায়ী যে সব "rascals of priests" আছে তাদের সম্বন্ধে বললেন, তারা কথায় কথায় বেদ আওড়ায়, কিন্তু গত চারশো পুরুষে বেদের একটা পাতাও উল্টে দেখেছে কিনা সন্দেহ। বদমাস পুরুতগুলোকে লাথি মেরে সমুদ্রে ফেলে দেবার নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন, যদি কোনো কিছু মানুষকে দুর্বল করে, তাদের নিপাত কর। কোনো ভগবানও মানুষকে দুর্বল করবার চেষ্টা করলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে শয়তানকে বরণ করতেও বিবেকানন্দ প্রস্তুত ছিলেন। মিল্টনের শয়তানকেই প্যারাডাইজ লস্ট কাব্যে 'একমাত্র ভদ্রমানুষ'-রূপে তিনি দেখেছিলেন।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা বা রচনার যে কোনো অংশ খুললেই মানুষের প্রতি তাঁর অসীম নির্ভরতা এবং দুর্বলকর যে কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে তাঁর পুরুষের ঘৃণার চেহারা দেখা যাবে। তিনি কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, কুসংস্কারের পুরনো ভাড়াটে তাড়িয়ে সেলামিসহ নতুন কুসংস্কারকে ঢোকাতে রাজি ছিলেন না। নতুন কুসংস্কার প্রগতির সুপারিশ নিয়ে আসে, তার পরেই যত রকম দৌরাত্ম্য সম্ভব সুরু করে দেয়। এই জন্য বিবেকানন্দ যেখানে অনুভব করেছেন যে, সংস্কারকদের সংস্কারেচ্ছার পিছনে আছে অপরের প্রতি অনুগ্রহ এবং নিজের প্রতি সভক্তি নমস্কার,—সেখানে তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সব কৌতূহলী কর্তব্য-বুদ্ধদের হাত থেকে কুসংস্কার-শুদ্ধই দেশ বা জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। কালো লোকের চামড়া ছাড়িয়ে যেমন তাদের সাদা সাহেব করা যায় না তেমনি শুধু দেবতার সংখ্যা ছেঁটে দিলেই মানুষ বেশী ধার্মিক হয়ে পড়বে, এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। যে বিবেকানন্দের কাছে একেশ্বরবাদ পর্যন্ত 'dualistic superstition', তিনিই যখন বহুদেববাদে বিশ্বাসের মধ্যেও গভীরতম ধার্মিকতা দেখেছেন, সেখানে প্রণাম জানাতে দ্বিধা করেন নি। অথচ যেখানে তা হয়নি, বহু দেবতায় বিশ্বাস যেখানে ভিখারীর বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে ফেরা, সেখানে বিবেকানন্দ ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

"তোমরা পৃথিবীর সব দেবতার কাছে কান্নাকাটি করেছ, দুঃখ ঘুচেছে কি? ভারতের জনসাধারণ তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছে, কিন্তু মরেছে কুকুরের মত। সে সময়ে দেবতারা ছিল কোথায়? তোমরা সফল হলেই তোমাদের দেবতারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে ও-সব পদার্থে তোমাদের দরকার কি? ঐ সব কুসংস্কারের কাছে হাঁটুগাড়া কি তোমাদের আত্মার উপযুক্ত কাজ?"

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্যকে এইভাবে উপস্থাপিত করার কারণ—সামান্য কয়েক দিন আগে চোখের সামনে তার কী না ভয়াবহ চেহারা দেখা গেল! কানাঘুষায়, পরে খবরের কাগজের মারফৎ লোকে জানল, আকাশের গোটা আস্টেক গ্রহ নাকি পরস্পরের প্রতি টানে, কিংবা কোনো বাবা গ্রহকে সম্মান জানাবার জন্য, এক সময়ে এক লাইন হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের

সেই নিরীহ চেষ্টা পৃথিবীতে প্রলয় এনে অতি নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলবে। গুজবটা আবার বৈজ্ঞানিক গুজব। যারা চোদ্দপুরুষে বিজ্ঞান মুণ্ডযুক্ত কি কন্দকাটা জানে না তারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে চেঁচাতে লাগল বৈজ্ঞানিক প্রলয়! বিজ্ঞানীরা যতই আশ্বস্ত করে বলুন, ভয়ের কিছু নেই, টিকির বিদ্যুৎ চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ! প্রলয়ের পৌষ মাস। ভয়টা তামাম দুনিয়ার মধ্যে জেঁকে বসল ভারতে, ভারতে আবার তাদের মধ্যে বেশী, যারা পনের বছরের স্বাধীনতা চুষে মেদবৃদ্ধি করে ফেলেছে। বাঁচার উপায় তাহলে? মাভৈঃ মাভৈঃ, আগুনে ঘি ঢালো পুরোহিতের হাতে দক্ষিণা দিয়ে। প্রলয়ের যদি বৈজ্ঞানিক কারণ থাকে তাহলে আগুনে ঘি (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনস্পতি) ঢাললে প্রলয় থামবে কি করে সে প্রশ্ন উঠল না। কোনো কোনো দুষ্ট বাঙালীর মনে অবশ্য একটা নতুন প্রশ্ন জেগেছিল, বেশী ঘি বা বনস্পতি খেয়ে অগ্নিদেবের আবার নির্ঘাত অগ্নিমান্দ্য হবে, সে ক্ষেত্রে যদি তাঁর মাংসপোড়া খেতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তার ব্যবস্থা হবে কি করে? উত্তর সেই দুষ্ট মাথাতেই খেলেছিল, প্রয়োজন হয় অর্জুন-ক্রুশ্চেভ কিংবা অর্জুন-কেনেডি বিবেক-কৃষ্ণের পরামর্শ নিয়ে পৃথিবীর দুশো কোটি মানুষ জন্তুকে অ্যাটম বোমায় পোড়াবেন এবং তাতেই অগ্নির অরুচি সেরে যাবে।

অষ্টগ্রহের দেশব্যাপী মূঢ়তার বিরুদ্ধে আমরা সুস্থ মানুষের কণ্ঠ শুনতে চাইছিলুম। অশিক্ষার ভোট-প্রার্থী বামপন্থী নেতাদের আওয়াজ এ ব্যাপারে লক্ষণীয়ভাবে নীরব ছিল, অন্তত জনসাধারণের কানে পৌঁছবার মত শ্লোগানযুক্ত ছিল না। পণ্ডিত জহরলালকে ধন্যবাদ, তিনি খোলাখুলি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; জানাতে পেরেছিলেন এই জন্য যে, ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁর বাণী ভগবৎ-বাণী, যা শুনবার, মানবার নয়, যা যত কটু ততই দেবলীলায় অলৌকিক মধুর। শেষ পর্যন্ত সুস্থ মানুষের স্বর শুনতে পেলুম জনৈক পুরাতন হিন্দুর গলায়, যাঁর হিন্দু-উদর রক্তহীন আধুনিক প্রগতিশীলভাবে শুধুই ছিবড়া বলে ছুঁড়ে ফেলে না দিলে যে কোনো এক গর্তে পুরে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত।

ভূমিকা অনেক হোল। আসল বস্তুটি উপস্থিত করা যাক। স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-না-হওয়া একটি বক্তৃতাকে অনুবাদ করে দিচ্ছি, পাঠক দেখতে পাবেন ভারতের বাঁচার পথ সেখানে।

দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত শক্তিশালী এক রাজবংশ ছিল। জন্মগণনা করে বিভিন্ন সময়ের প্রধান ব্যক্তিদের কোষ্ঠী রাখার পদ্ধতি তারা প্রবর্তন করেছিল। ঐ কোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ-বাণীর সঙ্গে পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলীকে তারা মিলিয়ে দেখত। হাজারখানেক বছর এই রকম করে চলবার পরে কতকগুলি ব্যাপারের ঐক্য তারা দেখতে পেল; ঐ ঐক্যগুলির সাধারণীকরণ করে বিরাট বিরাট বইয়ে সেগুলি সংগ্রহ করে ফেলা হোল। রাজবংশ শেষ হয়ে গেলেও জ্যোতিষীদের বংশ রয়ে গেল, আর রয়ে গেল সেই বইটি, তাদের হাতে। কে জানে এইভাবেই জ্যোতিষের জন্ম হয়েছে কিনা?

হিন্দুদের যে সব কুসংস্কার মেরেছে, তার একটি হোল জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ।

কিছু কিছু জ্যোতিষীকে চমৎকার ভবিষ্যৎবাণী করতে আমি দেখেছি। কিন্তু ঐ সব ভবিষ্যৎবাণী কেবল নক্ষত্র বা ঐ জাতীয় ব্যাপার থেকে করা হয়েছে, এমন বিশ্বাসের কারণ আমি পাইনি। বহুক্ষেত্রে সেটা নিছক অপরের মনকে বুঝবার ক্ষমতা। কখনো যে অপূর্ব ভবিষ্যৎবাণী করা হয় না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নির্ভেজাল জঞ্জাল।

লণ্ডনে এক ছোকরা আমার কাছে প্রায়ই আসত আর জিজ্ঞাসা করত, "আসছে বছরে আমার বরাতে কী আছে?" আমি তার প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল, "আমার সব টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি এখন খুবই গরীব।" অনেকের কাছে টাকাই একমাত্র ভগবান। দুর্বল লোকগুলো যখন সব নষ্ট করে ফেলে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন যত উদ্ভট উপায়ে টাকা করবার ধান্ধায় থাকে আর জ্যোতিষ বা ঐ ধাঁচের জিনিসের আশ্রয় নেয়। "কাপুরুষ আর মূর্খরাই অদৃষ্টের কথা বলে" সংস্কৃত প্রবচনে আছে। কিন্তু যে শক্তিশালী, সেই উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারে--"আমার অদৃষ্ট আমার হাতে।" বয়সে বুড়িয়ে যাবার সংগে সংগে লোকে অদৃষ্টের কথা বলতে থাকে। ছোকরারা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেঁসে না। গ্রহের আওতার মধ্যে আমরা হয়তো আছি, কিন্তু তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বুদ্ধ বলেছেন, "যাঁরা নক্ষত্রগণনা বা অন্য মিথ্যা চালাকির উপর জীবনধারণ করে, তাদের সব সময় এড়িয়ে চলবে।" এ কথা বলবার মত অধিকার তাঁর আছে, কারণ তাঁর চেয়ে বড় হিন্দু এ পর্যন্ত জন্মায়নি। তারকারা আসুক, ক্ষতি কি তাতে? যদি কোনো তারকা আমার জীবনে নাড়া দেয়, তার দাম কানাকড়িও নয়। জ্যোতিষ এবং ঐ ধরনের রহস্যময় ব্যাপারে বিশ্বাস দুর্বলচিত্তের লক্ষণ; সুতরাং যখনই তারা আমাদের মনে গেড়ে বসতে চাইবে, তখনই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখানো। তখন দরকার উত্তম খাদ্য আর উপযুক্ত বিশ্রাম।

কোনো ঘটনার কারণ তার ভিতরে খুঁজে না পেলে বাইরে তার কারণ সন্ধানের মত আহাম্মকি আর কিছু নেই। বিশ্বের মধ্যেই যদি তার সৃষ্টির ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে বাইরে তার ব্যাখ্যা খুঁজবার মত বোকামি দেখাবার কারণ কি? মানুষের জীবনের মধ্যে এমন কোনো কিছু কি তোমরা কখনো দেখেছ যাকে মানুষের নিজস্ব ক্ষমতায় বিচার করে ব্যাখ্যা করা যায় না? তাই যদি হয় তা'হলে ব্যাখ্যার জন্য তারকা বা জগতের অন্য কিছুর কাছে যাও কেন? আমার নিজের কর্ম আমার বর্তমান অবস্থার যথোপযুক্ত কারণ। যীশুখৃষ্টের কথা যদি ধর--একই ব্যাপার। আমরা জানি তাঁর পিতা একজন ছুতার মাত্র ছিলেন। [অর্থাৎ যীশু নিজেই নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন]। তাঁর শক্তির ব্যাখ্যা করতে অন্য কারো কাছে যেতে হবে না। তিনি তাঁর নিজ অতীতেরই সৃষ্টি, যে অতীত যীশুর আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। বুদ্ধের অতীত অগণ্য প্রাণী-জন্মের মধ্যে বিস্তৃত। কিভাবে ঐ সব জন্মের মধ্য দিয়ে অবশেষে বুদ্ধত্বে উত্তীর্ণ হলেন। তার বিবরণ বুদ্ধ বলে গেছেন। সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে কারণ খুঁজবার জন্য নক্ষত্রের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। তাদের কিছু প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ওসবে কান দিয়ে নিজেদের ভয়গ্রস্ত করার বদলে আমাদের কর্তব্য হোল, ঐ সবকে একেবারে তুচ্ছ করা। আমার সমস্ত প্রভাবের প্রথম ও প্রধান কথা এই আমি সকলের সামনে রাখছি; যে বস্তু দুর্বলতা আনে--আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক দুর্বলতা, তাকে পায়ের ডগা দিয়েও ছোঁবে না। ধর্ম হোল মানুষের ভিতরকার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ। অনন্ত শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে মানুষের ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে,--সেই কুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়ছে। সেটা ক্রমেই ছড়াবে, আরো ছড়াবে, দেহের পর দেহ তার ধারণের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়বে, সেই শক্তি ক্রমেই এ দেহকে ছুঁড়ে ফেলে উন্নততর দেহকে গ্রহণ করবে। এরই নাম মানুষের ইতিহাস ধর্মের, সভ্যতার, প্রগতির ইতিহাস। সেই সুবিশাল শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের শৃঙ্খল ছিঁড়ে পড়ছে। সর্বত্র এই শক্তির বিকাশ। বাকি জ্যোতিষীদের ভাবনা, তাদের মধ্যে কণামাত্র সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাদের একদম এড়িয়ে চল।

একজন জ্যোতিষীর একটি পুরনো গল্প আছে। জ্যোতিষীটি এক রাজাকে গিয়ে বলেছিল,—'ছ মাসের মধ্যে আপনি মারা যাবেন। ভীত রাজা জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন, ভয়ে তখনি তাঁর প্রাণ যায় আর কি! তাঁর মন্ত্রী কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই জ্যোতিষীরা একেবারেই নির্বোধ হয়।' রাজার তাতে বিশ্বাস হোল না। তখন, ঐ জ্যোতিষীরা যে সত্যই নির্বোধ হয় তা দেখাবার জন্য জ্যোতিষীটিকে প্রাসাদে পুনরায় আমন্ত্রণ করতে হোল। জ্যোতিষী এলে মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, আপনার গণনা তাহলে নির্ভুল? জ্যোতিষী বলল, ভুল থাকার কথা নয়; তবে মন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সে আবার গোড়া থেকে গণনা করল ও জানাল গণনা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিহীন। রাজার মুখ একেবারে রক্তশূন্য। মন্ত্রী জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করলেন,—"আপনি কতদিন বাঁচবেন মনে হয়?" উত্তর হোল—"এখনো বার বছর।" মন্ত্রী তখনি তরবারিতে জ্যোতিষীর মুণ্ডচ্ছেদ করে রাজাকে বললেন,—কী মিথ্যাবাদী দেখছেন? এর প্রাণ তো এই মুহূর্তে চলে গেল।"

যদি দেশ আর জাতিকে বাঁচাতে চাও এই সব জিনিস থেকে দূরে থাক। কোনো জিনিস যে ভাল তার প্রমাণ, তা আমাদের শক্তি দেয়। এই ভালর মধ্যেই আছে জীবন, বিপরীত হোল মন্দ অর্থাৎ মৃত্যু। জ্যোতিষে বিশ্বাসাদির মত কুসংস্কার ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে আর যুক্তি-বিচারে অসমর্থ মেয়েরা সেগুলোকে বিশ্বাস করে নিচ্ছে।* মেয়েরা যে এমন করছে তার কারণ তারা মুক্তির জন্য সচেষ্ট অথচ এখনও পর্যন্ত মননজীবনে প্রতিষ্ঠিত নয়। একটা উপন্যাসের উপরে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র কবিতা মুখস্থ করে তারা বলতে, গোটা ব্রাউনিংকে জেনে ফেলেছি। কেউ-বা গোটা তিনেক বক্তৃতা শোনার পরে স্থির করে ফেলেছে সে পৃথিবীর সব কিছুই জানে। অসুবিধা এই, তারা নারীর স্বাভাবিক গোঁড়ামিকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাদের হাতে পয়সা প্রচুর, আর মনন-বিদ্যা সামান্য। অবশ্য এই মধ্যবর্তী পরিবর্তনস্তর যখন তারা অতিক্রম করে যাবে, তখন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তারা কতকগুলো বচনবাগীশের হাতের পুতুল। দুঃখিত হয়ো না, আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু আমাকে সত্য বলতেই হবে। তোমরা, মেয়েরা, কি দেখছো না এই সব জিনিস তোমাদের কিভাবে আক্রমণ করে? অপর-দিকে তোমরা, (পুরুষেরা) কি দেখছ না এই সকল মেয়েরা কতখানি ঐকান্তিক? বস্তুর অন্তরগত দিব্যতা কখনো মরে না? এই দিব্যকে আহ্বান করাই সাধনা।

যতই দিন যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে আমার ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে—মানব-দিব্যস্বভাব। নারী বা পুরুষ যত নারকীয় চরিত্রেরই হোক ভিতরকার ঈশ্বরত্বের মৃত্যু নেই। শুধু তারা জানে না সে ঈশ্বরত্বের সন্ধান কি করে করতে হয়,—তারা সত্যের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। আর কতকগুলো মন্দ লোক সর্বপ্রকার বুজরুকি দিয়ে তাদের প্রতারিত করার চেষ্টায় আছে। কোনো লোক যদি কারো টাকা ঠকিয়ে নেয় তাহলে তুমি বল—পাজি, বদমাস! সে ক্ষেত্রে যদি কেউ ধর্মে ঠকায় তার অপরাধের পরিমাণ কি? জঘন্য। সত্য যদি বলপ্রদ হয়, কুসংস্কার ঘোচায়, তবেই তা সত্য। দার্শনিকদের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে কুসংস্কারের উপরে তোলা। এই পৃথিবী, এই শরীর, এই মন—কুসংস্কারের পুঞ্জ। তুমি অনন্ত আত্মা। তুমি কতকগুলো মিটমিটে তারকার ফাঁদে পড়বে? লজ্জা। দিব্যাত্মা তোমরা,—ঐ মিটমিটে তারকারা যে তোমার থেকেই এসেছে।

এক সময়ে হিমালয়ে ঘুরছিলুম আমি। দীর্ঘপথ সামনে। গরীব সন্ন্যাসী আমরা, কে

* বক্তৃতাটি পাশ্চাত্যে দেওয়া।

আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে, সব পথটাই তাই পায়ে হাঁটতে হবে। এক বৃদ্ধ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কয়েকশো মাইলেই চড়াই আর উৎরাইয়ের পথ পড়ে আছে—তার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ সাধুটি বললেন, কি করে আমি এই পথ পেরোব, আমি আর হাঁটতে পারছি না; আমার বুক ভেঙে যাবে।' আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।' তিনি তাকালেন। আমি বললাম, "আপনার পায়ের তলায় পড়ে আছে এই যে পথ একে আপনি অতিক্রম করে এসেছেন; সামনে যে পথকে দেখছেন, তা একই পথ, শীঘ্রই তা আপনার পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকবে।"

সর্বোচ্চ বস্তু তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য তারকা। যা কিছু সমস্তই তোমাদের পায়ের তলায়। তারকাদের মুঠো করে ধরে তোমরা গ্রাস করে ফেলতে পার, যদি তোমরা চাও, তোমাদের স্বরূপের এমনই শক্তি। শক্তিশালী হও, সকল কুসংস্কারের পারে যাও। আর মুক্ত হও।

একটি 'অমূলক আশঙ্কা' প্রসঙ্গে

অমিয়কুমার মজুমদার

'সমকালীন' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "শিক্ষায় সাহিত্য" প্রবন্ধটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। টেক্‌নলজি ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার আমাদের মনুষ্যত্বের আশু বিলুপ্তি ঘটাবে এ আশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেছেন। শিক্ষাবিভাগের নানা ত্রুটি আছে একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ অবহেলার নয়, এ কারণেই যে পৃথিবীর সর্বত্র যখন এই বিদ্যা দ্রুতবেগে অনুশীলন করা হচ্ছে তখন আমাদের পেছিয়ে থাকবার কোন সংগত যুক্তি নেই। কারণ নিজের রুজি-রোজগারের জন্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্বজনস্বীকৃত। প্রবন্ধকার একই আশংকা বিলম্বিত লয়ে প্রকাশ করেছেন—কিন্তু মনে হয় এ অমূলক। যন্ত্রকে তিনি অসুর বলেছেন, ময়দানবও আখ্যা দিয়েছেন। কথাটা মিথ্যে নয়। যন্ত্রের মধ্যে কবিতা থাকে না, কারু বা চারু-শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায় না, কারখানা বা গবেষণাগার দেখে কোন কবির কাব্যপ্রতিভার কেন্দ্র উত্তেজিত হয় না; তবুও বলবো এর মধ্যেও আছে এক বিশেষ ধরণের ছন্দোবন্ধতা। গানের সুর যন্ত্রে নেই সেহেতু তাকে অসুর বলতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু এরই ঔরস থেকে ছন্দোবদ্ধ নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাও আশাকরি কারো অজানা নেই।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনায়কেরা টেকনলজির দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন দেখে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করলে তাঁর কথার দশ আনা সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার লাভ হলে শিল্প-কলা-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন একঘরে এবং কোণঠাসা হয়ে থাকবে এ কথাও মেনে নেওয়া চলে না। প্রথমেই ইংরেজী ভাষার উৎসভূমির কথা বলা যাক্। প্রবন্ধকার ইংরেজী শিক্ষা ও ভাষা-প্রসারের সমর্থক সে কথা প্রবন্ধের আদি-পর্বেই ইংগিতে বলতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই ইংরেজীর দেশ টেকনলজি ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের লীলাভূমি তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেখানেও দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষান্তে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। নানা ফ্যাক্টরীতে, কারখানাতে, কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানে। আমি নিজে সে দেশে গিয়ে দেখেছি যে, সেখানকার সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীভাষা খুব জোরালোভাবে জানে না—বরং আমাদের দেশে ইংরেজীর পরে বেশী দৃষ্টি দেবার প্রথা ছিল কলাবিভাগে এখনও দেওয়া হচ্ছে। কল-কারখানা, গবেষণাগারে ছেয়ে গেছে ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, হাঙ্গেরী, আমেরিকা। কিন্তু সেখানে কি সুকুমার সাহিত্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে? আমরা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবকে—ইংলণ্ডের বুকে রেঁনেসা নিয়ে এসেছিল। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে প্রাক্ এলিজাবেথিয়ান যুগের সাহিত্য ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল ভিক্টোরীয় যুগে। এর মূলে টেকনলজির প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি তাঁরা—এ কথা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয় ভালোভাবে জানেন। শিল্প-বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিরূপে গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ, সৃষ্টি হয়েছে নতুন সাহিত্য, বলিষ্ঠতর চিন্তাধারার প্লাবন এসেছিল ইংলণ্ডের বুকে এবং সেই নবলব্ধ অনুভূতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। টেকনলজির প্রসারের সংগে সংগে বিস্তৃত হয়েছে সাহিত্যের

ক্ষেত্র। প্রয়োগ বিজ্ঞানের উৎসভূমি ইংলণ্ডকে বলা চলতে পারে, তাই বলে সেখানে কি সাহিত্য-চর্চার স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেছে?

'এফিশিয়েন্ট' যন্ত্রধর্মী কারিগরে দেশ ছেয়ে গেলে গোটা জাতি জাহান্নামে যাবে একথা কি ক'রে মেনে নেওয়া যায়? একই সংগে মেনে নেওয়া চলে না 'যন্ত্রধর্মী কারিগরদের' তিনি সাহিত্যবোধ বর্জিত বুদ্ধিমান বলে যে কটাক্ষ করেছেন তাকে। প্রযুক্তি বিদ্যার ছাত্রদের সাহিত্য-বোধ থাকবে না একথা তিনি কি করে ভাবতে পারলেন জানিনে। বিদেশেও এমন অনেক কবি-সাহিত্যিকের নাম জানা যায় যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন কারিগরী বিদ্যাকে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাঁরই কাছে জিজ্ঞাসা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষালাভ না করলে অর্থাৎ ভাষা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ না করতে পারলে কি সাহিত্যবোধ সঞ্চারিত হ'তে পারে না? যদি তাই হয় তাহলে সবিনয়ে বলবো যে আমাদের দেশের কেন বিদেশেরও বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক কলেজের চৌকাঠও মাড়ান নি অথচ তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি অমরত্ব লাভ করেছে বিশ্বে। সাহিত্যবোধ কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থার বকযন্ত্রে কি গড়ে ওঠে?

ভারতের প্রাচীন কালের কথাই ধরা যাক। যেমন কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, বাণভট্ট প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক সর্বত্র সমাদর লাভ করেছেন, এককালে শিল্প-কলা-সাহিত্যের বিচিত্র গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হতো, তেমনি প্রযুক্তি বিদ্যারও অনুশীলন করা হতো ব্যাপকভাবে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কথা বিশদভাবে জানতে পারি। প্রাচীন ভারতে কণাদ, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, ধন্বন্তরী প্রভৃতি মনীষীরাও কম সমাদর পান নি। এঁরা সকলেই প্রয়োগ বিজ্ঞানেরই সেবক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্থির চিত্তে বিচার ক'রে দেখলে জানা যায় যে দেশে প্রয়োজন আছে উভয়েরই। এবং একই দেশে দু'টি বিদ্যা আপাতদৃষ্টে বিরোধী হলেও একই জলবায়ুতে বেঁচে থাকতে পারে। টেকনলজি মানুষকে দেয় নিরাপত্তার আশ্বাস, স্বাচ্ছন্দ্যের ইংগিত এবং আরামের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যায় সেখানে টেকনলজি কি দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য একথা সত্য যে মানুষের আশার যেমন সীমা নেই, তেমনই প্রয়োগ-বিজ্ঞানেরও শেষ বলে কিছু নেই। মানুষের মনের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে টেকনলজির। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উদ্ভূত হয়েছে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার। এককালে এমন অবস্থা ছিল যখন তাঁতীর বাড়ীর কাপড়ে লোকের মন উঠত, প্রয়োজন হতো না চর্মপাদুকার, লোভনীয় খাদ্য সামগ্রীর, বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদের, নিদাঘতাপে উত্তপ্ত হয়ে মানুষ যেত গাছতলায়, ভেবেছে ঘরের মধ্যে হাওয়া পাওয়া যায় কি ক'রে! ভ্রমণের আনন্দ সে অনুভব করতে পারতো না, সামান্য রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হোত, সাধারণ মানুষ পেতনা আরামের ছিঁটে ফোঁটাও। কারণ আরামের উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে যে পরিমাণ পুঁজি থাকা দরকার তা অধিকাংশ লোকেরই ছিল না। তাবলে স্বাচ্ছন্দ্যে বোধ বা আরাম পাবার স্পৃহা তার মরে নি। তা যদি হতো তাহলে টেকনলজির সৃষ্টি হতো না, কারণ যে সমাজ থেকে এসেছেন কবি, সাহিত্যিক, সেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই জন্ম নিয়েছেন টেকনলজিস্টরা।

সাহিত্যচর্চার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটিয়ে যে দেশের জনসাধারণের মুখে উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন তুলে দেওয়া যায় না তা স্বীকার করেছেন প্রতিটি দেশের কর্ণধারেরা। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মনী, রাশিয়া, চীন- প্রত্যেকটি দেশ যখন নিজেকে গড়ে তুলবার কাছে ব্যস্ত ছিল তখন প্রাধান্য দিয়েছে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের। প্রয়োগ বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাঁরা দেশের তিন চতুর্থাংশ

সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত করেছেন। সাহিত্যের প্রতি এই তথাকথিত বিমাতৃ সুলভ ব্যবহারেও কিন্তু তা অবলুপ্ত হয়ে যায় নি সে সব দেশ থেকে। প্রতি দেশে, প্রতি যুগে এমন কিছু সংখ্যক মানুষ থাকবেই যাঁরা টেকনলজির নিশ্চিত নিরাপত্তায় আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হবেন। দেশগড়বার গোড়ার দিকে মানুষের বিক্ষিপ্ততা কিছু থাকবেই তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একথাও সত্য যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দেশ যখন অন্যদেশের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যে পাল্লা দিতে পারবে তখন দেশেরই কিছু সংখ্যক লোকের মনে উল্টো হাওয়া বইবে—কর্মমুখর দিনের অবসানে সাহিত্য, কারুশিল্প ও চারুশিল্পের তরীতে পাল দিয়ে বিচরণ করে আনন্দ অনুভব করবে। অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমেরিকা ও রাশিয়াতেও তো সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। ভারত সম্বন্ধেও ভীত হবার কারণ ঘটে নি।

ঊনবিংশ শতকী সাহিত্য-কলা শিক্ষায় পারঙ্গম ভারতবর্ষকেই ইংরেজ শ্রদ্ধা করেছে-একথা সর্বাংশে সত্য নয়। ঊনিশ শতকেই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মহেন্দ্রলাল সরকার, নীলরতন সরকার, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং আরো বহু বিজ্ঞানী যাঁরা বিদেশে ভারতের মান বাড়িয়েছেন। এদের পরবর্তী যুগে আছেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, সি, ভি, রমণ; মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, কে· এস· কৃষ্ণাণ, প্রশান্ত মহলানবীশ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। যদি বলা যায় এঁদের প্রতিভার সম্মান দেখিয়েছে ইংরেজ এবং এজন্যেই শ্রদ্ধা করেছে এদেশকে তাহলে কি অত্যুক্তি করা হবে? আমাদের দেশের প্রাচীনকালের ব্যবহারিক বিজ্ঞান কি সমাদৃত হয় নি বিদেশে? তার থেকে কি নতুন গবেষণা হয় নি সে দেশে? তাঁরা কি সম্মান দেখান নি চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুনকে? এই সব প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের নির্দেশিত পথ ধরে কি তাঁরা নতুন জ্ঞান লাভ করেন নি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীন ভারতের সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে পাশ্চাত্যে, আমাদের ত্যাগের দর্শন কতটা প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে পাশ্চাত্যের ভোগ বাসনায় ভরা কোটি কোটি মানুষকে?

প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের প্রসংগও যখন টেনেছেন তখন বলি বিশ্বভারতীর পাশেই কি গড়ে ওঠেনি শ্রীনিকেতন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয়েরই কি প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নি? বিবেকানন্দের কথাও প্রবন্ধে একবার বলা হয়েছে। দেখা যাক টেকনলজির ব্যাপক প্রসারের জন্য তিনি কি বলেছেন। আমাদের দেশে অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতকের অনেকটা কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার কথা ভাবাই হয়নি। তখন সাহিত্য, শিল্প নিয়েই সবাই মশগুল। কিন্তু সে সময়ে ভারতের 'বিরাট উন্নতি' হয়নি তা বলা বাহুল্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে, তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার কর।" দেশের লোকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে তার সমাধানের পথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমাদের চাই কি জানিস স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সংগে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ান, চাই শিল্প শিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়ে, লোকে চাকরী না করে দু'পয়সা করে খেতে পারে।"

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শেষপর্যন্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অবহেলিত হচ্ছে ব'লে ধুয়া তুলেছেন। একথা কতদূর সত্যি তা ভাববার মতো। ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরই ঔরসজাত সন্তান মাত্র। মনে হয় বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ এভাবে শ্রেণীভেদ না করাই ভাল। যেখানেই টেকনলজি সেখানেই মূল বিজ্ঞান। তথাকথিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সূত্র বা তথ্য মানুষের কোন

২

কাজেই আসে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার উপযুক্ত প্রয়োগ সাধিত হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তার সমস্ত সত্তা নিয়ে বিকশিত হয় ফলিত-বিজ্ঞানের মধ্যে। এতেই তার সার্থকতা। যেমন সাহিত্য-বোধের প্রকাশ সাহিত্য সৃষ্টিতেই।

পদার্থ বিদ্যার নানা তত্ত্ব ও তথ্য সকলের জানা আছে কিন্তু তার প্রয়োগ সাধিত না হলে মানুষের আকর্ষণই হ্রাস পেত মূল তথ্যকে জানবার। প্রতিটি শিল্প সংস্থায় পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে বেসিক রিসার্চ সেন্টার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অবহেলিত হচ্ছে এ ধারণা অসত্য বলেই মনে করি। নতুন নতুন সায়েন্স কলেজ আমাদের দেশে গড়ে উঠছে না সত্য কিন্তু ফলিত-বিজ্ঞান কেন্দ্রেই মধ্যমণি রূপে লালিত হচ্ছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। পৃথিবীর সর্বত্রই তাই। আমাদের দেশে শিল্প সংস্থার অপ্রাচুর্য ছিল, সেহেতু অধিকাংশ বিষয়েই অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হতো, এ অভাব মেটাবার জন্য সরকার বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন এর প্রতি, এতে ক্ষোভের কি কারণ থাকতে পারে? দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে প্রথমাবস্থাতে টেকনলজি এবং প্রয়োগ-বিজ্ঞানের প্রতি নজর বেশী করেই দিতে হবে।

প্রবন্ধকার নিশ্চয় জানেন যে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার বহু কেন্দ্র, উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। এখানে প্রয়োজন আছে পদার্থবিদের, রাসায়নিকের, ইঞ্জিনীয়রের, ডাক্তারের। অথচ এই কেন্দ্র থেকে প্রস্তুত হবে বিদ্যুৎ এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। দুয়েরই ব্যবহার আমাদের অজ্ঞাত নয়। কাজেই বিজ্ঞানের উভয় তরফের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকলেই সমভাবে আদৃত হবেন, প্রত্যেকেরই প্রয়োজন সমান। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী গবেষণা ক'রে নতুন পন্থা বের করবেন, নতুন তথ্য বের করবেন, তারই প্রয়োগ করবেন প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কর্মীরা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য ভারত সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করছেন এবং ভারতের সর্বত্র গড়ে উঠছে বিজ্ঞান মন্দির। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ভারতসরকারের বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে বিবিধ পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাহলেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ংগম করতে পারবেন। তবে পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ হয় না একথা মেনে নিলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যে কোনঠাসা হয়ে নেই এবং তার স্থান যে "যাদুঘরে" হবে না একথা সজোরে বলা যেতে পারে।

সিলভ্যাঁ লেভি

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ প্যারী নগরীতে এক ইহুদী পরিবারে সিলভ্যাঁ লেভি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল লুই লেভি, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্চশিক্ষার মহাবিদ্যালয় ইকোল দ্য হোট্স এটিউডস (নামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) হইতে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে সিলভ্যাঁ লেভি স্নাতকত্ব লাভ করেন। এখানে তিনি ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ পণ্ডিত আবেল বের্গেইনের নিকট সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। আবেল বের্গেইন প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্যের গবেষক ছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন (কোচিন চায়না, কাম্বোডিয়া, চম্পা আনাম, টঙ্কিন) হইতে ফ্রান্সে আনীত সংস্কৃত পুঁথি ও অনুশাসনাবলী অধ্যয়ন করিয়া তিনি বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে ও আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন এবং উপযুক্ত শিষ্য লেভির কৌতূহল এই দিকে আকৃষ্ট করেন। স্নাতকত্ব লাভের পর লেভি বের্গেইনের অধীনে তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণার ফল স্বরূপ কাশ্মীর দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত বৃহৎ কথা মঞ্জরী নামক পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১)। পরের বৎসর এই পত্রিকাতেই তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বৃহৎ-কথামঞ্জরী সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লেভি "ইকোল দ্য হোটস এটিউড্স"* মহাবিদ্যালয়ে বের্গেইনের সহকারী রূপে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণকালে বের্গেইন এক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গুরুর মৃত্যুতে লেভি নিদারুণ মর্মবেদনা প্রাপ্ত হন—অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়ে। অচির কালের মধ্যেই লেভি এই মানসিক অবসাদ কাটাইয়া উঠেন, গুরুর প্রদর্শিত পথে গুরুর অভীষ্ট ভারত বিদ্যাচর্চা দ্বারাই তিনি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে মনস্থ করেন। বের্গেইনের মৃত্যুর পর তিনিই "হোট্স এটিউড্স" মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থমালায় সর্বদর্শন সংগ্রহ বিশেষতঃ পাশুপত ও শৈব দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করেন (৩)। একটি ফরাসী বিশ্বকোষের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি নিবন্ধ ও এই সময় রচিত হয় (৪)।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নাটকসম্বন্ধে গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনা করিয়া লেভি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট" লাভ করেন (৫)। ইহার প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে হোরেস্ হেমান্ উইলসন এই বিষয়ে (থিয়েটার অফ্ দি হিন্ডুস্) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই। লেভি তাঁহার পুস্তকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, নাট্যকারদের সঠিক আবির্ভাব কাল প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। উইন্ডিশ নামীয় জনৈক জার্মান পণ্ডিতের মত এই ছিল যে গ্রীকপ্রভাবের ফলে ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, লেভি তাঁহার পুস্তকে এই মতটি খণ্ডন করেন। লেভির পুস্তক প্রকাশের পর সাম্প্র-

তিককালে ভারতীয় নাট্যকলা সম্বন্ধে একাধিক পণ্ডিতের পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ইহা দ্বারা লেভির পুস্তকের মর্যাদা ও উপাদেয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লেভি প্যারীর এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রথম সর্গ সংস্কৃত মূল ফরাসী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন (৬)। ইতিপূর্বে বুর্ণুফ ব্যতীত অশ্বঘোষের রচনা আর কাহার ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। লেভির ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ কাব্যটি অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। যখন তিনি জানিতে পারেন যে ইংরাজ পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল বুদ্ধচরিত সম্পাদন কার্যে হাত দিয়াছেন তখন তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। উত্তরকালে অশ্বঘোষ ও তাঁহার অপর কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে লেভি প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৭) ফলে অশ্বঘোষ সম্বন্ধে লেভি একজন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত হন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লেভি কলেজ-দ্য-ফ্রান্সের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই অধ্যাপক পদটির সৃষ্টি হয়। ইহার প্রথম অধিকারী ছিলেন ইউরোপের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ এ, এল, ডি চেজি। চেজির পর মহামনীষী বুর্ণুফ এই পদ অলঙ্কৃত করেন। চেজি ও বুর্ণুফের আসন লাভের গৌরব লেভি যখন অর্জন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল মাত্র একত্রিশ বৎসর।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লেভি বৈদিক যজ্ঞতত্ত্বসম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৮)। ইহার পর লেভি বৈদিকসাহিত্য হইতে ক্রমশঃ বৌদ্ধসাহিত্য ও ভারতসভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কলেজ দ্য ফ্রাঁসে ছাত্রদের বেদান্ত, উত্তর রামচরিত অথবা প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার অবসরে তিনি সংস্কৃত, পালি প্রাকৃতের সহিত তিব্বতীয় ও চীনাভাষা শিক্ষাদানের ও ব্যবস্থা করেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে গবেষকের দৃষ্টি শুধু বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের উপর নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, অতীতে যে সব দেশের মধ্যে ভারত-সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই সেই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য হইতে ভারততত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া লেভি স্বয়ং যত্ন সহকারে তিব্বতীয় ও চীনা ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার বিদ্যায়তনে* এই ভাষা দুইটি অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। চীন-ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত শাভানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে লেভি সত্বর চৈনিক ভাষা ও চীন বিদ্যায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গবেষণার উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত লেভি ভারতবর্ষ, নেপাল, ইন্দোচীন ও জাপান পরিভ্রমণ করেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে লেভি বহু অজ্ঞাত মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার করেন। নেপাল হইতে তিনি যে সব তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দীর্ঘকাল গবেষণান্তে তিনি নেপাল সম্বন্ধে তিনখণ্ডে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নেপালের ভূগোল, ধর্ম, ইতিহাস, লেখমালা নৃতত্ত্ব: সামাজিক তথ্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়। চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতে আহৃত তথ্যাবলী ও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এই পুস্তকটি রচিত হওয়ায় ইহা নেপাল সম্বন্ধে লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ 'আকর' গ্রন্থের গৌরব লাভ করিয়াছে (৯)। ভারততত্ত্ব সম্যক রূপে বুঝিতে হইলে এই পুস্তকটি গবেষকদের নিকট অপরিহার্য।

*Ecole des Hautes Etudes.

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণান্তে তিনি কলেজ দ্যা ফ্রাঁসে স্বপদে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি ফ্রান্সে "হোট্‌স এটিউড্‌সের" সহকারী নিয়ন্ত্রক ছিলেন এইবার তাঁহাকে ইহার নিয়ন্ত্রক (ডিরেক্টর) নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীনে (সাইগন) ফরাসী গভর্ণমেন্টের সহায়তায় দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে ইকোল ফ্রাঁসেস দ্য এক্সটেম ওরিয়াঁ † নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই কার্যে ফরাসী ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনারেল লিওঁ বুর্জোয়াঁ লেভিকে প্রচুর সহায়তা দান করেন। বুর্জোয়াঁ ছিলেন ছাত্রাবস্থায় লেভির সতীর্থ, লেভির ন্যায় ইনিও ছিলেন মনীষী বের্গেইনের অন্তেবাসী। প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের পর লেভি ইকোল দ্য ওরিয়াঁর ও অন্যান্য পত্রিকায় খরোষ্টিলিপি, খরোষ্টি রাষ্ট্র, বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী, বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের চৈনিক পুঁথি, মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, চীন ভারত সম্পর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বর্তমানে ভারতচর্চার ক্ষেত্রে লেভির এই রচনাগুলি মহামূল্যমান সম্পদ হইয়া আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লেভি মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র আসঙ্গ প্রণীত মহাযান সূত্রালঙ্কার নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন।

নেপাল হইতে নিজের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথি এবং তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত পুঁথিগুলির সহিত তুলনামূলক বিচারের পর এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় (১০)। কিছুকাল পর লেভি এই পুস্তক ফরাসী ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন (১১)। বৌদ্ধ যোগাচার দর্শন সম্বন্ধে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় রচনা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হোটস এটিউডসের তরুণ গবেষক লেভি শিষ্য পল পেলিও ঐতিহাসিক গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য মধ্য এশিয়া যাত্রা করেন। দুই বৎসর পর তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুঁথি সহ প্রত্যাবর্তন করেন। বহু বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র লিপিতে লিখিত এই পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্যগ্‌ রূপ চর্চার জন্য লেভির নেতৃত্বে একটি পাঠ-গোষ্ঠি (সেমিনার) স্থাপিত হয়। পল পেলিও দ্বারা সংগৃহীত ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার কালে লেভি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'তুখারিয়' নামক বিস্মৃত একটি ভাষা আবিষ্কার করেন। লেভি এই 'তুখারিয়' ভাষাকে কুচা নামে চিহ্নিত করেন। তাঁহার মতে সুদূর অতীতে পূর্ব তুর্কীস্তানের উত্তর প্রান্তে আলতাই পর্বত মালার দক্ষিণে তেরিম নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কুচা রাষ্ট্র বা জনপদের ইহাই ছিল প্রচলিত ভাষা। লেভি প্রমাণ করেন যে খোটান-কারশাহার সন্নিহিত এই রাজ্য হইতেই এই ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য কুমারজীবের মাতা এই কুচা রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। ভারতীয় পিতার ঔরসে কুমারজীবের জন্ম হয়)। কুচাভাষায় লিখিত কয়েকটি শ্লোক তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ কর্মবিভাগাঙ্গ হইতে অনূদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বহুবর্ষ পরে যবদ্বীপ ভ্রমণ কালে বোরোবুদুর মন্দির গাত্রে এই বিশেষ শ্লোকবর্ণিত বিষয়টি চিত্ররূপে ক্ষোদিত দেখিয়া লেভি অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। এশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতসভ্যতার দিগবলয় প্রসারিত ছিল এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন লেভি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তর পশ্চিম এসিয়ার কুচা রাজ্যে প্রাপ্ত শ্লোকাংশের চিত্ররূপ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপের মন্দির গাত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া লেভি যে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবেন ইহাই স্বাভাবিক।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ কালে প্যারী নগরীতে লেভির সহিত

†Ecole Francaise d' Extreme Orient at Saigon.

পরিচিত হন। লেভির সহিত পরিচয় লাভ করিয়া কবি যে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝা যায়

"He is a great scholar, but philology has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which never acknowledges disillusionment. His students come to love the subject he teaches them, because they love him".

—Letters from abroad, P.13, 1924

১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা ভ্রমণান্তে কবি পুনরায় ফ্রান্সে আসেন। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ষ্ট্রাসবুর্গ নগরীতে লেভির সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ অন্তে সন্ধির সূত্র অনুসারে ষ্ট্রাসবুর্গ নগরী ফ্রান্সের অধীন হয়, এখানে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থাপনার জন্য লেভি এই সময়ে এখানে বাস করিতেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সংকল্প এই সময় কবির ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। লেভির বিদ্যাবত্তা বিশেষতঃ পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর আদর্শের সহিত তাঁহার একাত্মতার কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশ্বভারতীর প্রথম পরিদর্শক অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর) রূপে আমন্ত্রণ জানান। এই সময় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি হইতে বক্তৃতা করার জন্য লেভিকে আহ্বান করা হয়। এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া লেভি বিশ্বভারতীতে যোগদান করিতে মনস্থ করেন।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে কবির আমন্ত্রণে লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। লেভির আগমনের পর বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে (পরে ইহার নাম হয় বিদ্যাভবন) ভারত বিদ্যা ও চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই কার্যে লেভির সহায়তা করেন। লেভির অধ্যাপনাকালে বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ক্লাসে ছাত্রের ন্যায় খাতা পেন্সিল লইয়া বসিতেন এবং লেভির বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার বক্তব্যটুকু সরল বাংলায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিতেন (দ্রঃ রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)।

১৩২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১) শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হয়। বিংশবর্ষ কাল স্বহস্তে পরিচালন করিয়া কবি ঐদিন তাঁহার প্রাণ প্রিয় "বিশ্বভারতী" সর্বসাধারণকে উৎসর্গ করেন। এই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্র স্থিরীকৃত হয়। জগদ্বিখ্যাত মনীষী ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল এই উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন। সস্ত্রীক আচার্য লেভি এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বভারতীতে লেভি অধ্যাপক রূপে যোগদান করাতে কবি যে কি পরিমাণে হৃষ্ঠ হইয়াছিলেন বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কবির এই ভাষণটি হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়ঃ

"আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরম সুহৃদ আচার্য সিলভ্যা লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধ বন্ধন অনেকদিন থেকে স্থাপিত হয়েছে······" (বিশ্বভারতী)।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ওরিয়েন্টেল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ২৮শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেনেট হলে অনুষ্ঠিত হয়। লেভি এই সম্মেলনে মূল সভাপতি রূপে ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লেভিকে ডি, লিট্‌ উপাধিতে ভূষিত করেন। ৮ই আগষ্ট (১৯২২) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া লেভি কলিকাতায় আসেন। শান্তিনিকেতনে লেভির বিদায় সভায় কবি মন্তব্য করেন যে ভারতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের ফলেই লেভি ভারতবিদ্যাকে প্রকৃতরূপে অধিগত করিতে পারিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সময় লেভি দম্পতি ভারতীয়ের ন্যায় বাস করিতেন ফলে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই দম্পতি সকলেরই পরম আপন জন হইয়া যান। মাদামলেভিকে "দিদিমা" বলিলে তিনি বড়ই খুসী হইতেন, ছোট ছেলে মেয়েদের দেখিলেই তিনি তাহাদের আদর করিতেন ও বলিতেন "আমি তোমাদের দিদিমা হই।" শান্তিনিকেতন বাসকালে ধুতিচাদর পরিহিত আচার্য লেভি ও শাড়ী পরিহিতা মাদাম লেভির ছবি "প্রবাসী" "মডার্ণ রিভিউ" এর পুরাতন পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপাচার্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে লেভি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এইগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণেও তিনি এইবার কয়েকটি বক্তৃতা দেন (১৩) এই সময়ে তিনি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "চৈতন্য ও তাঁহার পরিকরবর্গ" নামক ইংরাজী পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট লেভির কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্‌কালে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে কবিগুরুর উপস্থিতিতে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লেভি ভারতের নানাস্থান ও নেপালও ভ্রমণ করেন। এইবারও তিনি নেপাল হইতে বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। অতঃপর লেভি টোকিও ও কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের আহ্বান পাইয়া জাপানে আসেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লেভি জাপান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে 'লিজি ও দ্য অনার' (নাইট) উপাধি দান করেন। এই সময় তিনি ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৪)। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপালে প্রাপ্ত বসুবন্ধু রচিত বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি নামক বৌদ্ধ বিজ্ঞান বাদ সম্পর্কিত পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৫)।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লেভি পুনরায় সস্ত্রীক জাপানে আসেন। এখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে মেজোঁ ফ্রাঙ্কো জাপানেজ নামে একটি গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং দুইবৎসরকাল স্বয়ং এই গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করেন*। গবেষণা পরিচালন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান ব্যতীত এই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি বিশ্বকোষের সম্পাদনা করেন (১৬) এই বিশ্বকোষ সঙ্কলনে ডাঃ তাকাকুসু, তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ডাঃ আনেসাকি, ডাঃ এনু ও অধ্যাপক সুজিয়ামা প্রভৃতি জাপানী পন্ডিতেরাও এই বিশ্বকোষ সঙ্কলনে সহায়তা করেন।

দুই বৎসরকাল জাপানে বাস করিয়া লেভি যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গবেষণার

* Maison Franco Japanise—Tokyo.

উদ্দেশ্যে তিনি বহু উপকরণ ও সংগ্রহ করেন। বালি হইতে তিনি যে সব সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা "স্যান্সক্রিট্ টেক্সট্‌স্ ফ্রম্ বালি" নামে বরোদা হইতে প্রকাশিত হয় (১৭)। যবদ্বীপে মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান রচনা কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্ম জয়ন্তীতে স্মারক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত "গোল্ডেন বুক্ অফ টেগোর" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় (১৮)। যবদ্বীপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুকাল ভারতবর্ষ ও নেপালে অতিবাহিত করেন। এই যাত্রাতেও তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়া কবিগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন।

স্বদেশে ফিরিয়া লেভি পুনরায় ভারতবিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এইবার তাঁহাকে ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াটিকের (এশিয়াটিক সোসাইটির) সভাপতি করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে লেভি ভারত-সভ্যতার সম্বন্ধে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন।† ভারত-বিদ্যার এমন কোন শাখা নাই যাহা লেভির সাধনায় সমৃদ্ধ হয় নাই। একটি স্বল্পায়তন প্রবন্ধের পরিসরে লেভির সমস্ত রচনার পরিচয় দান সম্ভব নহে। লেভি নিজেই শুধু সারাজীবন ভারতবিদ্যার চর্চা করিয়া যান নাই ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে বহু সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলীকেও তিনি ভারতবিদ্যা চর্চায় দীক্ষা দেন. ইঁহাদের মধ্যে লাকোত, ফিনো, পেলিও, পুঁসেন্, রেঁনো, ফুঁশে, জুল ব্লখ ফিলিওজো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ ভি, পরাঞ্জপে, ডাঃ পরশুরাম বৈদ্য, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি লেভির অন্তেবাসী। দেশীয় ও বিদেশীয় এই সব পণ্ডিতদের সাধনায় ভারতবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন শাখাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে। অগণিত কৃতী শিষ্যের গুরু হিসাবেও লেভির আচার্য অভিধা সার্থক হইয়াছে।

প্যারীতে—লেভির গৃহদ্বার ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। ভারতের যে কোন ছাত্রকে যে কোন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য তিনি উন্মুখ থাকিতেন। অনেক সময়ে দেখা যাইত সর্বজনসম্মানিত বৃদ্ধ অধ্যাপক লেভি কোন ভারতাগত ছাত্রকে বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে প্যারী শহরের হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি নিজের শিষ্যমণ্ডলীকে এই সব ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বিশেষতঃ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী ফরাসী ভাষা শিখাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় বিদ্যায় পারঙ্গম লেভি তাঁহার জীবদ্দশায় একজন শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক বলিয়া গণ্য ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, ভারতবিদ্যার প্রচার দ্বারা হিংসা-দ্বেষ দুষ্ট জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে কায়মনোবাক্যে তিনি ইহাই বিশ্বাস করিতেন। সুখের বিষয় লেভির স্বদেশীয় শিষ্যমণ্ডলী ও তাঁহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবিদ্যা চর্চার দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে মৈত্রী বিস্তারের কাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেভি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে ইউরোপের নানা স্থান বিশেষতঃ জার্মানী হইতে ইহুদীরা দলে দলে ফ্রান্সে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রূপে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক এই সব হতভাগ্যদের পুনর্বাসনের

†Institut de Civilisation Indienne (in Paris University).

জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর একটি প্রতিষ্ঠানের সভায় একজন কর্মীর সহিত বাক্যবিনিময় করিতে করিতে আচার্য লেভি অসুস্থ বোধ করিয়া অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। শুধু শিষ্যমণ্ডলী নহে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে লেভির স্মৃতি এখনও অম্লান রহিয়াছে। ভারতবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে আচার্য লেভির স্মৃতি ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

মাদাম লেভি—আচার্যের মৃত্যুর তিন বৎসর পর স্বামীর অনুগামিনী হন। ইঁহাদের দুই পুত্রের মধ্যে একজন আবেল লেভি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নিখোঁজ হইয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র ডানিয়েল লেভি ফরাসী গভর্নমেণ্টের কর্মচারী। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইনি কিছুকাল ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ভারত ভাগ্য বিধাতার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা।
জন গণ পথ পরিচায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।

* * * * *

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়ন অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা
জনগণ দুঃখ ত্রায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

* * * * *

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয় গিরি ভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্যসমীরণ নব জীবন রস ঢালে।
তব করুণা ঘন রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফরাসী বিশ্বকোষের ভারতসম্বন্ধীয় নিবন্ধে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে —লেভি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান তাহা যেন কবিগুরুর কথারই প্রতিধ্বনি ঃ

"The multiplicity of the manifestations of Indian Genius as well as their fundamental Unity gives India the right to figure on the first rank in the history of civilized nations. Her civilization spontaneous and original, unrolls itself in a continuous time across at least thirty centuries without interruption and without deviation. Ceaselessly in contact with foreign elements which threatened to strangle her, she persevered victoriously in absorbing them, assimilating them and enriching herself with them. Thus she has seen the Greeks, the Scythians, the Afghans, the Turco-Mongols pass before her eyes in succession and is regarding with indifference the English man confident to pursue under the accidents of surface, the normal course of her high destiny. [From Greater India. Edited by Dr. Kalidas Nag, p. 401]

কবিগুরু ও কবি-সুহৃৎ ভারতপ্রেমিক আচার্য লেভির আশা যেন বর্তমান ও অনাগত ভারত-সন্তানেরা পূর্ণ করিতে পারে ভারত ভাগ্য বিধাতার নিকট ইহাই প্রার্থনা।

(১) La Brihatkatha Manjari de Kshemendra—Journal Asiatique—Paris, 1885.

(২) La Brihatkatha Manjari et Betalapanchavimsati—J. A., Paris, 1886.

(৩) Deux Chapitres du Sarvadarsan Samgraha—Bibliotheque d' Ecole des Hautes Etudes—Vol. I, 1889.

(৪) Grande Encyclopadie—Articles on Brahmanisme, Brahmoisme, Calendrier, Castes, Hindouisme, Hiouen Tsang, Inde—1889.

(৫) Le Theatre Indien—B.E.H.E., Paris, 1890.

(৬) Le Buddacharita d' Asavaghosa—J.A.

(৭) (i) Asvaghosa: Le Sutralankara et ses sources—J.A., 1908.

(ii) Autour de Asvaghosa—J.A., 1929.

(৮) La doctrine du Sacrifice dans Les Brahmanas B.E.H.E., Paris, 1898.

(৯) Le Nepal (3 Vols.), Paris (1905-1908).

(১০) Mahajana Sutralankara d' Asanga, (Sanskrit Text), Paris, 1907.

(১১) Mahajana Sutralankara (Traduction), Paris, 1911.

(১২) Ancient India—Lectures delivered at Cal. Univ.—Calcutta Review, 1922.

(১৩) Eastern Humanism—Lectures delivered at Dacca University, 1922.

(১৪) (i) Dans l' Inde, 1925.

(ii) Inde et le Monde, 1925.

(iii) Pre Aryan et Pre-Dravidian dans l' Inde J.A., Paris, 1923. [Translated into English as Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Calcutta University].

(১৫) Vijnaptimatrata Siddhi, Vasubandhu, 1926.

(১৬) Hobougirin (Encyclopaedic Dictionary of Buddhism). Ed. by Levi and Takakusu, Japan (1929-1935).

(১৭) Sanskrit Texts from Bali—Gaekwad Oriental Series, Baroda, 1932.

(১৮) Un ancentre du Tagore dans la Mahabharata Javanais—In the Golden Book of Tagore, Ed. by Ramananda Chatterjee, Calcutta, 1931.

হাস্যরসের উপরঞ্জকরূপ

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

হাস্যরসের আস্বাদন অন্যান্য সকল রসের আস্বাদন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা রসও নহে অথচ রসাভাসও নহে। সুতরাং হাস্যরসের আস্বাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? রতি, শোক প্রভৃতি স্থায়িভাবের আস্বাদনের সময়ে আনন্দময় আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয়। তাহার ফলে পরিপূর্ণ আনন্দের উপলব্ধি হয়। কিন্তু রসাস্বাদনের প্রথম অবস্থায় রতি স্থায়িভাব সুখরূপে এবং শোক-দুঃখরূপে অনুভূত হইলেও—আস্বাদনের অন্তিম পর্যায় তাহারা উভয়েই আনন্দরূপে পর্যবসিত হয়। অনুকর্তা কুশীলবগণের মধ্যে স্থায়িভাব জাগ্রত থাকায় সামাজিকের হৃদয়ে স্থায়িভাবেরও উদ্বোধন হইতে পারে। এজন্য নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গাররস ও করুণরসকে যথাক্রমে রতি স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত ও শোক স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু হাস্যরসকে 'হাসস্থায়িভাবাত্মক' অর্থাৎ হাসরূপ স্থায়িভাবের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।১ অভিনব ভারতী টীকায়ও বলা হইয়াছে যে হাস্যরসের স্থলে বিভাবরূপে বিকৃত বেষ, বিকৃত অলংকার প্রভৃতি যে সকল উদ্দীপন উপস্থিত হয় তাহাদেরই আস্বাদন হয় এবং লোকচরিত্রের ভেদানুসারে রসেরও আস্বাদনে ভেদ দেখা যায়।২ হাস্যরসের উপাদানরূপে তিনটি বিষয় বর্তমান,—বিকৃত বেষ-অথবা বিকৃতিসম্পন্ন পুরুষ, (যাহাকে আমরা 'আলম্বন' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছি) বিকৃত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি উদ্দীপন, এবং স্থায়িভাবাশ্রয় ও রসের আস্বাদনকারী সামাজিক। তত্ত্বদৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য সকল অঙ্গ উপস্থিত থাকিলেও, বিভাবের সহিত পরিচয়ের পর মুহূর্ত হইতেই রসাস্বাদ আরম্ভ হইতেছে,—কারণ নায়ক প্রমুখ আলম্বন হাস্যরসে অনুপস্থিত থাকায় একমাত্র বিভাবই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাই দেশকাল প্রভৃতি সীমাকে অতিক্রম করিয়া নৈর্ব্যক্তিকরূপ ধারণ করে। শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে শকুন্তলা, সীতা প্রভৃতি আলম্বন দেশকাল সীমার অতীত একটি প্রতীকরূপে অর্থাৎ বিশ্বজনীন প্রেয়সীরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু হাস্যরসের বিভাব সকল ক্ষেত্রেই নীচপাত্র হওয়ায় তাহারা কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বজনীন প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইতে পারে না। বিভাবের দর্শন হইবার পর সাধারণীকরণ হয়,—সুতরাং রসাস্বাদে বিভাবের প্রভাব আসিয়া পড়ে এবং রসের আস্বাদনেও বিকৃত আচার-ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা উদ্দীপিত স্থায়িভাবের প্রধানতা অনুভূত হয়। অভিনবভারতী টীকায় এজন্য বলা হইয়াছে যে হাস্যরসে বিকৃতবেষ প্রভৃতিরই আস্বাদন হয়। "হাসে তু য আস্বাদ সোঽপি বিকৃতবেষাদীনাম্।" কিন্তু অভিনবভারতী "হাসস্থায়িভাবাত্মক" বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। আলংকারিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে রসের যখন আস্বাদ চলিতে থাকে তখন রসিক সামাজিকের আত্মচৈতন্য স্থায়িভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। উদাহরণরূপে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে জবাফুল নীলপদ্ম প্রভৃতি স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে যেমন রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া যায় রসচর্বণায়ও স্থায়িভাব সেইরূপে রতি, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা চিত্রিত হইয়া যায়। রসচর্বণার উদ্দেশ্য হইল চৈতন্যের আবরণভঙ্গ। রস সকল ক্ষেত্রেই চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রসের স্বরূপ সর্বত্র বিশিষ্ট, ইহা স্থায়িভাববিশিষ্ট চৈতন্যরূপ, অথবা চৈতন্যের আনন্দময় প্রকাশের দ্বারা অভিভূত

স্থায়িভাবরূপ। কিন্তু পরমব্রহ্মের আস্বাদরূপ যে নির্বিকল্প-সমাধি তাহাতে যে আনন্দের আস্বাদন হয় তাহা অন্য বিষয়কে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মেই নিযুক্ত। রসের আস্বাদনে বিভাব প্রভৃতি বিষয়ের সহিত জড়িত চৈতন্যরূপ পরমানন্দই আনন্দের বিষয় হয়। যোগীর ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ বাহ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত ও বিষয়ের প্রভাববিহীন। সহৃদয়ের রসাস্বাদন যদিও অন্তর্মুখী তাহা হইলেও তাহাতে রতি, হাস, শোক প্রভৃতির প্রতিফলন হয়। রসের চর্বণার সময়ে সহৃদয় সামাজিকের আত্মচৈতন্য স্থায়িভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত, রতি, শোক, উৎসাহ প্রভৃতি তাহাতে উপাধিবিশেষ। হাস্যরসের চর্বণায় আনন্দাংশের আবরক হইতেছে 'হাসরূপ' চিত্তবৃত্তি। অর্থাৎ অন্যরসের আস্বাদনের সময়ে বিভাব প্রভৃতির সংযোগে পরিবর্তিত স্থায়িভাবেরই আস্বাদন হয়। স্থায়িভাব সেখানে লৌকিকরূপকে ত্যাগ করিয়া সীমাহীন আনন্দময় রূপ ধারণ করে। কিন্তু হাসস্থায়িভাব তাহার লৌকিকরূপকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে পারে না; তাহাতে আনন্দময় সীমাহীন চৈতন্যের প্রকাশের সহিত বাস্তব জীবনের হাস্যোদ্দীপক কারণগুলির সত্তাও কিছু অংশে জাগ্রত থাকে। স্থায়িভাব হাসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অলৌকিকভাবে প্রতীত না হইলেও লৌকিক ভাব ও অলৌকিক আনন্দের মধ্যবর্তী স্তরে উন্নীত হয়। রসাস্বাদে সাধারণতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় ইহাদের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু হাস্যরসের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিভাব প্রভৃতি যাহারা অন্তঃকরণের ধর্ম তাহারা আনন্দময় আত্মচৈতন্যের উপলব্ধির সময়ে জাগ্রত থাকে। রসাস্বাদে যতক্ষণ বিভাব অনুভাব প্রভৃতির আস্বাদ চলে ততক্ষণ অন্তঃকরণ চৈতন্যের দ্বারা উদ্‌ভাসিত হয়; কিন্তু হাস্যরসপ্রধান কাব্য অথবা নাটক পাঠের সময়ে শব্দের বৈচিত্র্যে অথবা অভিনয়ের আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে দেশকাল প্রভৃতি সীমার অতীত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থার জন্ম হইলেও রসাস্বাদের ফল যে আনন্দময় আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন তাহা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ হাস্যরসের আস্বাদে আনন্দের অনুভব হইলেও সে আনন্দ রজোগুণ ও তমোগুণের অবসান হইতে উত্থিত সত্ত্বগুণজনিত পরমাত্মার আনন্দের অনুভূতি নহে। তাহা হইলে হাস্যরসের রসাস্বাদনের আনন্দ কিরূপ? পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে কোন প্রকারের রসধর্মী কাব্যের আলোচনা অথবা অভিনয়-দর্শন হইতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় তাহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ।" অর্থাৎ আত্মার অজ্ঞানের অপসরণের ফলে যে জ্ঞানময় আনন্দের অনুভূতি তাহাই রস। ইহাতে আত্মার বিজ্ঞানাংশের ও আনন্দাংশের জ্যোতির্ময় প্রকাশ হয়। প্রত্যেক মানুষেরই চৈতন্যের তিনটি অংশ রহিয়াছে সদংশ, চিদংশ ও আনন্দাংশ। সদংশের আবরক অজ্ঞান অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞান, চিদংশের আবরক অজ্ঞান অভানাপাদক অজ্ঞান এবং আনন্দাংশের আবরক অজ্ঞান অনানন্দাপাদক অজ্ঞান। অভানাপাদক অজ্ঞানের ফলে চিত্তের বিজ্ঞান ভাগের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যবধান থাকিয়া যায় ফলে "আমি অমুক বিষয় জানি না" এই প্রকার বোধ হয়। হাস্যরসের ক্ষেত্রে যাহারা আলম্বন বিভাব তাহাদের সম্পর্কে নীচপাত্র হওয়ার জন্য ঘৃণা উপহাস ও অবজ্ঞার ভাব জাগ্রত থাকে। "মৃচ্ছকটিক নাটকের শকার অসম্বন্ধভাষী, আমি উহা হইতে ভিন্ন, শ্রীকান্তের নতুনদা অন্তঃসারহীন বাবু, কিন্তু আমি পাঠক ঐরূপ নহি" এই জাতীয় ভেদজ্ঞান হাস্যরসের বিভাব সম্পর্কে উদিত হইলে তাহা জ্ঞাতা সামাজিকের চিত্তে বিভাব বিষয়ে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এই

১. শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাব প্রভবঃ (পৃঃ৩০০)। "অথকরুণো নাম শোকস্থায়িভাব প্রভবঃ। হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ (গাইকোয়াড সিরিজ পৃঃ ৩১২, পৃঃ ৩৭১ ১ম খণ্ড)

২. "হাসে তু য আস্বাদ সোঽপি বিকৃত বেষাদীনাং, সামাজিকানং প্রতি লোকবৃত্তেন হাসহেতুত্বেতি হাসাত্মক রসনাদ্যচর্বণা চর্বনীয়ত্বাচ্ছস্য"—(পূর্বের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

ব্যবধান কিন্তু অজ্ঞানেরই প্রকারান্তর। কাব্যের ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা অথবা অভিনয়ে আঙ্গিকের সমাবেশের বৈচিত্র্যে এই অজ্ঞানের অপসরণ ঘটে। হাস্যরস প্রধান কাব্য পাঠের সময়ে ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা এবং অভিনয় দর্শনের সময়ে অভিনয়ের নৈপুণ্যে চিত্তের অজ্ঞানজনিত তমোগুণের অপসরণ আরম্ভ হয়। লৌকিক হাস্যের সহিত যে সকল অসৌন্দর্য ও হীনতা সংলগ্ন হইয়া আছে তাহারা ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইতে থাকে। এজন্য হাস্যরসের আলম্বন যে সকল নীচপাত্র (ধূর্ত, বিট, শকার প্রভৃতি) তাহাদিগকে সামাজিক অলৌকিক বিভাবরূপে গ্রহণ করিতে পারে। ব্যঞ্জনা-শক্তির এমনই মহিমা যে তাহার ফলে আলম্বন বিভাবের সম্পর্কে ঘৃণা, উপহাস প্রভৃতি ভাব দূর হইয়া যায়। ফলে সহৃদয় সামাজিক নীচপাত্র বিভাবকেও একপ্রকার অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া সহনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে লৌকিক জীবনের দুস্তর ব্যবধান লোপ হইয়া যায়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার এই মিলনের পথ উন্মুক্ত করে, কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণ রসের স্থলে যেমন "আমিই দুষ্যন্ত, আমিই বিরহী রামচন্দ্র" এইরূপ নিরাসক্ত ঐক্যের বোধ হয় হাস্যরসের ক্ষেত্রে সেইরূপে "আমি নীচপাত্র বিদূষক বা ভাঁড়" এই জাতীয় তাদাত্ম্যজ্ঞান উদিত হয় না। দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী" নাটকে জলধর ও আগড়ভম এই দুইটিই হাস্যরসাত্মক চরিত্র। কিন্তু কোন সহৃদয় সামাজিকই আগড়ভমের চরিত্র দেখিয়া "আমিই আগড়ভম" এই প্রকার আসক্তিহীন ঐক্য অনুভব করিতে পারেন না। এজন্য তাহার চরিত্র উচ্চশ্রেণীর হাস্যের কারক নহে, কিন্তু জলধর চরিত্রে লেখকের সহানুভূতির স্পর্শ এরূপ সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে যে, সে হাস্যাস্পদ হইলেও দর্শক ও পাঠকের কিছু সহানুভূতি তাহার জন্য থাকিয়া যায়। অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির এবং লঘুতাহীন সামাজিকও জলধর চরিত্রকে সহনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে। সামাজিকের হৃদয়ে এই যে ভেদবুদ্ধি ইহাকে আমরা দার্শনিক পরিভাষায় 'অজ্ঞান' নামে অভিহিত করিয়াছি। এই অজ্ঞান অপসারিত না হইলে আনন্দের উন্মেষ হইবে না। কিন্তু 'হাস' স্থায়িভাবের বৈশিষ্ট্যই এই যে ইহা সত্ত্বগুণবর্জিত। সুতরাং স্থায়িভাবের সহিতই অজ্ঞান জড়িত হইয়া আছে। অতএব যাহাতে সত্ত্বগুণের পূর্ণ অভাব তাহাতে সত্ত্বগুণের পরিপূর্ণ উদ্রেক ত' সম্ভব হইবে না। এজন্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন "সত্ত্বাভাবো হি হাস্য।" হাস্যরসের আস্বাদনের সময়ে ব্যঞ্জনা-শক্তির সাহায্যে সদংশের ও চিদংশের আবরণ ভঙ্গ হয়, আনন্দাংশের বিকাশ ঘটে না এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। চিত্তের সদংশের আবরক অজ্ঞানের অপসরণ ঘটিলে সামাজিক আপনার অস্তিত্ব-বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠে। অর্থাৎ "আমি সহৃদয়, আমি অভিনয়দর্শন করিতেছি, আমি কাব্য-পাঠ করিতেছি" এই জাতীয় জ্ঞানের উদয় হয়। তাহার পরে চিদংশের আবরক অজ্ঞানের ফলে "আমি সহৃদয়, বিদূষক প্রভৃতি বিভাব যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমি অনুভব করিতেছি" এই শ্রেণীর সূক্ষ্ম অনুভবের সৃষ্টি হয়। ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে অজ্ঞান অপসৃত হইলে বিভাবের চর্বণা ও তাহা হইতে রসসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু আনন্দাংশের আবরণের অপসারণের ফলে "আমি সুখী" এইরূপে যে পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি তাহা সম্ভব হয় না। নীচপাত্র হইতে সহৃদয়ের ভেদজ্ঞান পরিপূর্ণ অভিন্নতা জ্ঞানের পক্ষে অন্তরায় হয়। মীমাংসক ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় হাস্যরসের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক ত্রুটি দূর করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কোন বিষয়ের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ফল ইহারা যথাক্রমে ভিন্ন। ঘট দেখিলে "অয়ং ঘট—এইটি ঘট" এই জ্ঞান প্রথমে উৎপন্ন হয়। তাহার পর "ঘট-জ্ঞানবান্ অহম্" অর্থাৎ "আমি ঘটজ্ঞানসম্পন্ন" এইরূপ জ্ঞানের ফল উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'সংবিত্তি' বা 'অনুব্যবসায়' বলে। জ্ঞান ও জ্ঞানের ফল ইহারা যে এক সময়েই উৎপন্ন হইবে এমন কোন নিয়ম নাই, এবং জ্ঞানের বিষয় ও ফল ভিন্নই হইবে। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে সহৃদয়ের

জ্ঞানের বিষয় বিভাব অনুভাব প্রভৃতি হইতে বিভাবের চর্বণা (আস্বাদন) জনিত যে অলৌকিক আনন্দরূপ ফল তাহা ভিন্ন এবং তাহারা একই সময়ে উৎপন্ন হয় নাই। বিভাবজ্ঞানের পর জ্ঞানের ফল লাভ সেই সময়ে না হইয়া পরবর্তীকালে উৎপন্ন হইতেছে এবং জ্ঞানের বিষয় ও ফল ইহাদের মধ্যে সামাজিকের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে।৩. অদৃষ্ট কোন কারণের দ্বারা এই প্রতিবন্ধক দূর হইয়া গেলে জ্ঞানের ফল লাভ হইবে। সুতরাং হাস্যরসেও বিভাবের আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের অনুভূতি হইবে না, কিছুকাল ব্যবধানে হইবে। এই জাতীয় ব্যাখ্যায় হাস্যের রসত্ব স্বীকৃত হইলেও হাস্যরসপ্রধান অভিনয় দর্শনের সময়ে যে আনন্দের অনুভূতি হয় না, ভেদজ্ঞান কোন না কোন প্রকারে জাগ্রত হয় ইহা অস্বীকার করা যায় না। আস্বাদনে এইরূপ অনুভূতি হয় বলিয়া হাস্যের উপরঞ্জকত্বই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।৪ অন্যান্য রসের আস্বাদন বিভাব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়, কিন্তু হাস্যে আনন্দের অনুভবে কোন বিলম্ব হইলে তাহার উপরঞ্জকত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনব গুপ্ত একাধিক ক্ষেত্রে হাস্য যে সৌন্দর্যানুভূতির কারক নহে, কেবলমাত্র "উপরঞ্জক রস" একথা উল্লেখ করিয়াছেন। হাস্যকে রসসংজ্ঞায় অভিহিত করা হইলেও হাস্যের আনন্দের অনুভূতি পরব্রহ্মের আস্বাদরূপে পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি নহে। পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের হাস্যকে "হেডোনিক প্লেসার" বলা হইয়াছে "এস্থেটিক্ প্লেসার"-এর মর্যাদা ইহাকে দান করা হয় নাই। হাস্যরস সম্পর্কে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অলংকারশাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যের কোন চরিত্রের সহিত সাধারণীকরণ হইবে তাহা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু আলংকারিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উচ্চপাত্র নায়ক অথবা নায়িকার সহিতই সাধারণীকরণ তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।৫ অপ্রধান চরিত্রের সহিত সাধারণীকরণ কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে, রস প্রথমে নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি প্রধান পাত্রনিষ্ঠ হয়, এবং হাস্যরস ও বীভৎসরস প্রভৃতি যেগুলি অপ্রধান পাত্রনিষ্ঠ তাহারা প্রধান রসের আস্বাদনের পরবর্তীকালে অনুভূত হয়। দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যে প্রধান নায়ক-নায়িকা-বিষয়ক রসের সাধারণীকরণের অব্যবস্থিত পরে অপর কোন অপ্রধান রসের সাধারণীকরণ হয় না, কিন্তু পূর্বে যে সাধারণীকরণ হইয়া গিয়াছে তাহার প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে, এবং এই অবস্থায় বিদূষক প্রভৃতি যে সকল নীচ পাত্র আলম্বন তাহাদের ভেদ জাগ্রত হয়। এজন্য হাস্যের রসানুভূতিতে ভেদ জ্ঞান জাগ্রত থাকে। আলোচ্য সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আমরা বেনেদেত্তো ক্রোচের একটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিতে পারি। ক্রোচে বলিয়াছেন যে স্রষ্টা সৃষ্টি-

৩· জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যন্যঃ ফলমন্যদুদাহৃতম্। প্রত্যক্ষাদেণীলাদির্বিষয়ঃ। ফলং তু প্রকটতা সংবিত্তির্বা (কাব্যপ্রকাশ ২য় উল্লাস)। তথাচ যথা জ্ঞানস্য বিষয়ঃ জ্ঞানাদন্যস্তথা জ্ঞানস্য ফলমপি জ্ঞানাদন্যদ্। ফলফলিনোঃ সমসময়সমুৎ পাদাসংবাদিত সূত্রার্থঃ। (বালবোধিনী টীকা, পৃঃ ৬১)

৪· "যে চাত্রোৎপত্তিহেতব উক্তাস্তে যথাস্বয়ং পুরুষার্থচতুষ্কব্যাপ্তা। তদ্ধি সৌন্দর্য্যাতিশয় জননরূপম্। রঞ্জকা হাসাদয়স্তদনুগামিত্বেন রূপকেষু নিবন্ধনীয়াঃ। হাসাদীনাং তু সাতিশয়ং সকল-লোকসুলভ—বিভাবতয়োপরঞ্জকত্বমিতি ন প্রাধান্যম্। অত এবানুত্তম প্রকৃতিষু বাহুল্যেন হাসাদয়ো ভবন্তি। (অভিনবভারতী—পৃঃ ২৮২, ২৯৮)

৫· প্রায়ঃ শৃঙ্গার উত্তমালম্বন এব, কিন্তু কুচিদধমালম্বনকোহপি। অতএব শৃঙ্গারাভাসস্যা-পাধমমেবালম্বনম্। সঙ্গচ্ছতে চৈবম্ "প্রায় ইত্যনেন শৃঙ্গারাভাসাদাবধমপ্রকৃতিত্বং সূচিতমিতি······ (সাহিত্যদর্পণ, রুচিরা টীকা পৃঃ ২৩৭)"।

কালে সৃজ্যমান বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে 'ট্রু এসথেটিক্ ফিলিংস্ অব্ ক্রিয়েশ্যন্' নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সামাজিক অভিনয় দর্শনের সময়ে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অভিনীয়মান দৃশ্যাবলীর হাসি-কান্নায় যেভাবে অভিভূত হন, তাহা ক্রোচের মতে 'মিক্স্ড ফিলিং' বা মিশ্র অনুভূতির পর্যায়ভুক্ত। হাস্যরসেও বিভাবের স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানের সহিত যে আনন্দের অনুভূতি তাহা মিশ্র আনন্দের অনুভূতি এবং ইহাকে মিক্সড ফিলিং-পর্যায়ভুক্ত বলিলে বিশেষ কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। হাস্যে রস-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীবর্গের চিন্তা শৈলীর মধ্যে যে কিরূপ অপূর্ব ঐক্য রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা মনীষী জর্জ বুলোর পূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গ সমাপন করিতেছি— "Certainly the tendency to underdistance is more felt in comedy even than in tragedy; most types of the former presenting a nondistanced, practical and personal appeal, which precisely implies that their enjoyment is generally hedonic, not aesthetic. In its lower forms comedy consequently is a mere amusement and falls as little under the heading of Art as pamphleteering would be considered as belles-letters, or a burglory as a dramatic performance. It may be spiritualized, polished and refined to the sharpness of a dagger point or the subtlety of foil play, but there still clings to it an atmosphere of amusement pure and simple, sometimes of a rude, often of a cruel kind (Aesthetic. p. 122)".

রবীন্দ্র রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
অখিল	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
অখিল		গৃহপ্রবেশ	সপ্তদশ
অখিলবাবু	গল্পগুচ্ছ	ভাই ফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
অচিরা	তিনসঙ্গী	শেষ কথা	পঞ্চবিংশ
অচ্যুত	হাস্য-কৌতুক	গুরুবাক্য	ষষ্ঠ
অর্চনা	বাঁশরী		চতুর্বিংশ
অছিমদ্দি	গল্পগুচ্ছ	সমস্যাপূরণ	অষ্টাদশ
অজিতকুমার ভট্টাচার্য	ঐ	চোরাই ধন	চতুর্বিংশ
অর্জুন	চিত্রাঙ্গদা		পঞ্চবিংশ ও তৃতীয়
অতীন	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
অদ্বৈতচরণ	গল্পগুচ্ছ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ
অদ্বৈত চরণ চট্টোপাধ্যায়	হাস্য-কৌতুক	আর্য ও অনার্য	ষষ্ঠ
অধর অজুমদার	গল্পগুচ্ছ	মাষ্টারমশায়	দ্বাবিংশ
অনঙ্গমঞ্জরী	ঐ	খাতা	অষ্টাদশ
অনসূয়া	ঐ	ভাইফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
অনাথ	ঐ	শেষের রাত্রি	ত্রয়োবিংশ
অনাথ কলু	ফাল্গুনী		দ্বাদশ
অনাথ বন্ধু	গল্পগুচ্ছ	প্রায়শ্চিত্ত	উনবিংশ
অনিল	ঐ	নামঞ্জুর গল্প	চতুর্বিংশ
অনিলকুমার সরকার	তিনসঙ্গী	শেষকথা	পঞ্চবিংশ
অনিলা	গল্পগুচ্ছ	পয়লানম্বর	ত্রয়োবিংশ
অনুকূল	ঐ	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	ষোড়শ
অনুপম	ঐ	অপরিচিতা	ত্রয়োবিংশ
অন্নদা	ব্যঙ্গ-কৌতুক	বশীকরণ	সপ্তম
অন্নদা	নৌকাডুবি		পঞ্চম
অন্নপূর্ণা	চোখের বালি		তৃতীয়
অন্নপূর্ণা	গল্পগুচ্ছ	অতিথি	বিংশ
অপরাজিতা	ঐ	জয়-পরাজয়	সপ্তদশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
অপর্ণা	বিসর্জন		দ্বিতীয়
অপূর্ব	হাস্য-কৌতুক	গুরুবাক্য	ষষ্ঠ
অপূর্বকৃষ্ণ	গল্পগুচ্ছ	সমাপ্তি	অষ্টাদশ
অবনীশ দত্ত	শেষর কবিতা		দশম
অবিনাশ	গল্পগুচ্ছ	দৃষ্টিদান	একবিংশ
অবিনাশ	গোরা		ষষ্ঠ
অবিনাশ	বৈকুন্ঠের খাতা		চতুর্থ
অবিনাশ	গল্পগুচ্ছ	স্বর্ণমৃগ	সপ্তদশ
অভয়াচরণ	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
অভিজিৎ	মুক্তধারা		চতুর্দশ
অভিরাম বসাক	গল্পগুচ্ছ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
অভীক	তিনসংগী		পঞ্চবিংশ
অম্বা	মুক্তধারা		চতুর্দশ
অমর	মায়ার খেলা		প্রথম
অমর	তিনসংগী	রবিবার	পঞ্চবিংশ
অমরমাণিক্য	মুকুট (নাটক)		অষ্টম ও চতুর্দশ
অমরুরাজ	রাজা ও রাণী		প্রথম
অমল	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
অমল	ডাকঘর		একাদশ
অমিত রায়	কবিতা		দশম
অমিয়া	গল্পগুচ্ছ	নামঞ্জুর গল্প	চতুর্বিংশ
অমূল্য	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
অমূল্যচরণ	গল্পগুচ্ছ	অধ্যাপক	একবিংশ
অম্বা	মুক্তধারা		চতুর্দশ
অম্বিকাচরণ	গুল্পগুচ্ছ	প্রতিহিংসা	বিংশ
অযোধ্যা	ঐ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ
অরুণা	ঐ	চোরাইধন	চতুর্দশ
অরুণ লেখা	ঐ	রাজটিকা	একবিংশ
অশোক	মায়ার খেলা		প্রথম
অশ্লেষা	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয়-প্রহসন	সপ্তম
অক্ষয়	ঐ	বিনি পয়সার ভোজ	ঐ
অক্ষয়	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
অক্ষয়	নৌকাডুবি		পঞ্চম

সাহিত্য সংবাদ

তস্করতা এবং চৌর্যবৃত্তি মানব-মনে কিরূপে এবং কবে অনুপ্রবেশিত হয়েছে তার সঠিক কারণ এবং কাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, তবে এ কথা অনুমান করা যায় যে আদিম মানুষ যতকাল আপন পেশী-শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল ততদিন তাদের মধ্যে অভিপ্রায়মূলক অপরাধপ্রবণতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়নি, কিন্তু যখনই মানুষ চিন্তাশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয়লাভ করেছে, তখনই তাদের মধ্যে হীনতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বলেই মনে হয়। আদিমযুগের কথা বাতিল করে ইতিহাসভুক্ত বর্তমান সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ নক্ল-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনারমাধ্যমে মানব-মনের হীনতারস্বরূপ উদ্ঘাটনকরাই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কয়েক বৎসর পূর্বে এক সাহিত্যিক-জালিয়াতির সংবাদ পাঠ করে কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিক আনন্দলাভ করেছিলাম সেকথা অনস্বীকার্য, কিন্তু সংবাদের বিষয়বস্তু অন্য রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের কালে যে শব্দভেদী বাণ হয়ে আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দেবে তা অনুমান করা তখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই সাহিত্যিক—জালিয়াতির কথা স্মরণে ছিল না, কিন্তু কয়েক দিন পূর্বের সংবাদপত্র লক্ষ্য করে হঠাৎ সেই কাহিনী মনে পড়ে গেল। সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকাশক মহল পশ্চিম বাংলার সাহিত্য-সেবকদের আদ্যশ্রাদ্ধ (বৃষোৎসর্গসহ) উদযাপনে ব্রতী হয়েছেন। সুখের কথা, এমন সম্মান লাভ যে অতিস্বসৌভাগ্যের পরিচায়ক, এ কথা জীবিত সাহিত্যিকগণ নিশ্চয়ই অকপটে স্বীকার করবেন, মৃতদের আত্মার প্রতি শান্তিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকাশকদের এই অপূর্ব দক্ষতায় আমরা চমৎকৃত এবং তাঁদের প্রতি আমার সহানুভূতি বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। এখানে সাহিত্যে চৌর্যবৃত্তির যে বৃত্তান্ত পরিবেশন করা হবে সেটি পাঠ করে তাঁরা যুগপৎ আনন্দ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি খুঁজে পাবেন। প্রস্তাবনাস্বরূপ পাকিস্তানী প্রকাশকদের মহান কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করলেও মুখ্যত নক্ল-সাহিত্যিকের স্বরূপ উদ্ঘাটনই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

অক্সফোর্ডের জনৈক ছাত্রীর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল চারুশিল্প এবং সাহিত্যে চৌর্য-বৃত্তির প্রকোপ। তিনি বলেছেন চারুশিল্পে চৌর্যবৃত্তির যত প্রাধান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার আস্ফালন বহুলাংশে কম কারণ সাহিত্য-তস্করের আয় শিল্প-তস্করের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎকর। শিল্প-তস্করের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রচুর অর্থোপার্জন, কিন্তু সাহিত্য-তস্করের উদ্দেশ্য খ্যাতি অর্জন এবং কিঞ্চিৎ অর্থের সমাগম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী সাহিত্য-জালিয়াৎ হলেন টমাস চ্যাটারটন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যের জালিয়াতি করতে হলে যে সকল গুণের (?) দরকার যেমন, বিশিষ্ট রচনাশৈলী, বাক্যবিন্যাস, ব্যাকরণ এবং শব্দচাতুর্য ইত্যাদি সকল গুণে চ্যাটারটন গুণান্বিত ছিলেন, উপরন্তু তাঁর বিশেষ কাব্য-প্রতিভাও ছিল। এ কথা কল্পনা করাও শক্ত যে মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি "এলিনোর এ্যাণ্ড জুগা" নামক দ্বৈতভাষিক

কাব্য প্রস্তুত করে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবির রচনা বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। হস্তাক্ষর, কাব্যসুষমা এবং লিখন হুবহু সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর অজ্ঞাতনামা কবির মতই ছিল, কিন্তু কাব্যটি তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজে তেমন সাড়া তুলতে সক্ষম হয়নি। প্রাথমিক বিফলতার পর চ্যাটারটন দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর জালিয়াতির ম্যাগনাম ওপাস স্বরূপ এক লোকগাথায় হস্তক্ষেপ করেন। লোকগাথার নায়ক পাদ্রী টমাস রাউলে, চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে নাকি ব্রিস্টলে বসবাস করতেন। চ্যাটারসন এই কল্পিত প্রাচীন লোকগাথা ব্রিস্টলের রেডক্লিফ গীর্জার পুরাণো সিন্দুকে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলেন। জালিয়াতীর চরম নিদর্শন, বিশিষ্ট কাব্যগুণ-সমন্বিত লোকগাথাটি সংগে নিয়ে তিনি প্রকাশকদের দ্বারে হানা দিলেন, কিন্তু বেরসিক প্রকাশকরা তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলেন না। নিরুপায় হয়ে চ্যাটারটন ক্ষমতাবান হোরেস ওয়ালপোলের দ্বারস্থ হয়ে এক পত্রে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানিয়ে ওয়ালপোলের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওয়ালপোল ছিলেন উচ্চস্তরের সাহিত্য-তস্কর, তিনি "দি ক্যাসেল অব ওত্রান্তো" নামক এক কাব্য জাল করে বেশ কিছু উপার্জন করেছিলেন। তিনি চ্যাটারটনের লোকগাথা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশক যোগাড় করে ফেলেছিলেন আর কি, কিন্তু রতনে রতন চেনে, লোকগাথাটি বারম্বার পাঠ করে তাঁর মোহনিদ্রা ভংগ হয় এবং চ্যাটারটনকে সাবধান-বাণী প্রেরণ করে স্বাভাবিক কর্মজীবন গ্রহণের উপদেশ দান করেন। অতঃপর চ্যাটারটন পান্ডুলিপিটি ফেরৎ চান কিন্তু ওয়ালপোল নিরুদ্দেশ, সম্ভবতঃ তখন তিনি নিজেই লোকগাথা-টির আবিষ্কর্তা হয়ে দেশান্তরে প্রকাশনের সন্ধানে ব্যস্ত।

ওয়ালপোলের বিশ্বাসঘাতকতা চ্যাটারটনের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠল। লোকগাথাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল সেটি খাঁটি এবং পাদ্রী টমাস রাউলে তাঁর পরিচিত ব্যক্তি অর্থাৎ চ্যাটারটন উন্মাদ হয়ে গেলেন এবং টমাস রাউলেকে তিনি যে ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব আচার ব্যবহারের দাস হয়ে পড়লেন অর্থাৎ কল্পিত টমাস রাউলের প্রেত চ্যাটারটনের স্কন্ধে ভর করল। ক্রমশঃ চ্যাটারটন উৎকট মানসিক রোগীতে পরিণত হলেন এবং শরীর মন দুইই তখন তাঁর আয়ত্বের বাইরে, অবশেষে টমাস রাউলেকে কেউ শ্রদ্ধা করছে না ভেবে তিনি আর্সেনিক পান করে সকল জ্বালার অবসান ঘটালেন। চ্যাটারটনের বয়স তখন মাত্র সতের বৎসর। অস্বাভাবিক জীবন যাপনের কি অমোঘ পরিণতি! যাঁর হৃদয়ে কাব্যের স্রোত প্রবাহমান তাঁর প্রবৃত্তিতে এমন তঞ্চকতা অনুপ্রবেশিত হল কিভাবে তা মানসিক রোগের চিকিৎসকদের গবেষণার বস্তু কিন্তু আমরা যে একজন সার্থক কবি হারিয়েছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চ্যাটারটনের অকালমৃত্যুতে ওয়ালপোল অনুতপ্ত ও ব্যথিত-চিত্তে স্বীকার করেন যে তাঁর জীবনকালে তিনি কোনও মানুষের মধ্যে এরূপ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য করেননি যা মাত্র সতের বৎসরের উদ্ভিন্ন যুবক টমাস চ্যাটারটনের জীবনে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর মানসিক গতির অধঃপতনের দিকে ধাবমান হওয়ার কারণ হিংসা, নৈরাশ্য কিম্বা অন্য কিছু হীনতা নয়। বস্তুতপক্ষে চ্যাটারটনের একমাত্র আকাংখা ছিল সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বিদগ্ধ-সমাজের প্রশংসা অর্জন করা। চ্যাটারটনের মনের গঠন সাধারণ লোকের মত ছিল না, তিনি তাঁর কালের জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি ভালবেসে-ছিলেন তাঁরই কল্পনাপ্রসূত টমাস রাউলের ব্যক্তিত্বকে এবং চতুর্থ হেনরীর আমলের উচ্চগ্রামের সমাজ-ব্যবস্থাকে যার রেশ অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর-ভাগে হয়ত কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল।

চ্যাটারটনের বিপথগামী কবি প্রতিভার প্রতি পরবর্তী কবিরা যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা

উল্লেখযোগ্য। শেলী তাঁর "আডোনায়েস" কাব্যের মূল সুরটুকু চ্যাটারটনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই গ্রথিত করেছেন এবং কিটস্ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁর "এণ্ডাইমিয়ন" কাব্যে। চ্যাটারটন তাঁর সমাধিলিপি নিজেই লিখেছিলেন। ব্রিস্টলের বেডক্লিফ গীর্জাচত্বরে সমাধিস্থ চ্যাটারটনের স্মৃতিফলকে যে কথা লেখা আছে তা প্রণিধানযোগ্য — 'To the memory of Thomas Chatterton. Reader ! judge not. If thou art a Christian, believe that he shall be judged by a Superior Power. To that Power only is he now answerable'.

নূতন গ্রন্থ

রাডিয়ার্ড কিপলিং বম্বে সহরে ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিশু বয়সেই তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। পাঠ সমাপনান্তে তিনি ১৮৮২ সালে ভারতবর্ষে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর বয়স সতের বৎসর মাত্র এবং ইতিমধ্যে তাঁর "স্কুলবয় লিরিকস্" নামক এক কাব্যসংকলন ১৮৮১ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি রসিকসমাজকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট করে এবং কিপলিং মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই নিজেকে কবিযশপ্রার্থী হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি আমৃত্যু অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন ফসলও ফলেছে প্রচুর। অন্যান্য ইংরাজ সাহিত্যিকদের রচনা ভারতবর্ষের পাঠক সমাজ যেমন সাদরে গ্রহণ করেন কিপলিংকে তারা তেমন সুনজরে দেখেন না কারণটা কি তা ব্যক্ত করা তত সহজ না হলেও একথা অনুমান করা যেতে পারে কিপলিং-সাহিত্যে ভারতবিদ্বেষের যে সূক্ষ্ম ধূম্রজাল বিছান আছে সম্ভবতঃ তার কাঁছে ভারতীয় পাঠকমন সহজে ধরা দিতে চায় না। ১৯০৭ সালে কিপলিং নোবেল লরিয়েট হন এবং ১৯৩৬ সালে পরলোক গমন করেন।

কিপলিং লিখেছেন প্রচুর এবং তাঁর রচনার মধ্যে প্রসাদগুণের পরিমাণ কত তার মূল্যায়ন সম্ভবতঃ এখন সমাপ্ত হয়নি। তাঁর সমগ্র রচনার পরিচয় বহন করে প্রথম গ্রন্থবিবরণী সম্পাদনা করেন মার্টিনডেল এবং ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। মার্টিনডেলের আকর গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হয় বটে কিন্তু তা সুসম্পূর্ণ ছিল না। ১৯২৭ সালে শ্রীমতী লিভিং-স্টোন যে গ্রন্থবিবরণী সম্পাদন করেন তা প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং ১৯৩৮ সালে ওই বিবরণীর একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় ক্রোড়পত্রসহ সমগ্র বিবরণীটি নির্ভুল নয়।

সম্প্রতি টোরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় "রাডিয়ার্ড কিপলিংঃএ বিবলিওগ্রাফিকাল ক্যাটালগ" নামক গ্রন্থ পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটির লেখক জে, এম স্টিউয়ার্ট এবং সম্পাদক এ, ডাবলিউ ইয়েটস। যদিও বর্তমান গ্রন্থবিবরণীটি পূর্বোক্ত বিবরণীগুলিকে ম্লান করে দিতে সক্ষম হয়নি তবু কিপলিংভক্তদের কাছে মূল্যবানরচনা হিসাবে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা আছে।

স্টিউয়ার্টের গ্রন্থে কিপলিং এর রচনা প্রকাশনের এক নূতন ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। কিপলিং এর রচনার সংগে যে সকল চিত্র সে যুগের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত তার হিসাব এবং শিল্পীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা মার্টিনডেল অথবা শ্রীমতী লিভিং স্টোনের বিবরাণীতে ছিল না এবং এই নূতন সংযোজনায় বর্তমান বিবরণীটির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে অপরিহার্য্য হবে বলেই আশা করা যায়।

Rudyard Kipling: A Bibliographical Catalogue. By James McG. Stewart. Edited by A. W. Yets. Pp. xviii + 674. Toronto University Press, 1959;

অজিত দাস

ব্যক্তিপূজা ও সমাজ

বিংশশতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে শুধু অভূতপূর্ব তাই নয় কিছুটা অকল্পনীয়ও বটে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হয়ে, পূর্ব পূর্ব শতকের সামাজিক পরিবর্তনত ঘটিয়েছেই, উপরন্তু বর্তমান পরিবেশও নিত্য পরিবর্তনশীল। এ অবস্থার মূলে যাঁদের অবদান সর্বাধিক, সেই বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁদের অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদি চালিয়ে যান। দীর্ঘ সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুফল কোন একবিশেষ বিজ্ঞানীর কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায়, হয়ত কিছুটা সম্মান তিনি দাবী করতে পারেন এবং সাধারণতঃ তা তাঁকে দেওয়া হয়েও থাকে। কিন্তু তবু তাঁর অবদানের সমষ্টিগত কাঠামো জনগণের দৃষ্টি-অগোচর থাকেনা। বিজ্ঞানভিত্তিক যুগে এমন ঘটা অস্বাভাবিক নয়, বরং তাই হওয়া উচিত। আজকের সভ্যতায় ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির স্থান উচ্চতর এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ তথা সর্বজন-স্বীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় ব্যক্তিপূজা অচল হওয়াই সমীচিন হলেও তা হয়নি। কেন হয়নি সেই বিচার করা যাক।

ব্যক্তিপূজা মানব সমাজের অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। হয়ত বৃক্ষারূঢ় মানুষের ভূমিতে অবতরণ আর ব্যক্তিপূজা সমসাময়িক। এই পূজা দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী বিবর্তিত হয়ে আসছে। একেবারে আদিযুগে যে মানুষ সর্বাধিক শক্তিশালী অর্থাৎ বিরূপ প্রকৃতির সংগে যুদ্ধ করে যে জয়মাল্য অর্জন করতে পারত শক্তিবলে বা বুদ্ধিবলে, তার সমসাময়িকদের কাছ থেকে সেই পেরেছে শ্রদ্ধার্ঘ আদায় করতে। ধন, মান, প্রাণ কিছুই তাকে অদেয় ছিল না। তারপর সভ্যতার বিবর্তন-চক্রে পূজাবিধিরও রূপান্তর ঘটেছে। তবে কোনো অবস্থাতেই শক্তিমানের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার ইতর-বিশেষ ঘটেনি।

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই কথাই বলে যে, যে মানুষ সম্বন্ধে পরবর্তীযুগ উচ্চকিত নিন্দার কলরোলে মুখর, সমসাময়িক কাল তাকে দিয়েছে ভস্ম মিশ্রিত শ্রদ্ধার্ঘ। গুণবীর আটিল্লা, চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুর হত্যা, লুন্ঠন বা ধ্বংসলীলার নায়কত্ব করেও স্বীয় যুগের অবিমিশ্র ঘৃণার উদ্রেক করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক যুগেই, সাধারণ জীবনের কিছু মূল্য মুখে স্বীকার করার ফলে এইসব সমরনায়কদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। সমসাময়িককালের পরাজিত পক্ষই শুধু বিজয়ীদের অমানুষিক অত্যাচার তথা বর্বরতা সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করেছে দেখা যায়, অথচ মজার ব্যাপার হল এরাই সুযোগ ও সুবিধা পেলে প্রতিবাদযোগ্য বর্বরতার পুনরনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হয়নি। কদাচিৎ কখনো বিজয়ী পক্ষ পরাজিত পক্ষের নৃশংসতা, বর্বরতা ইত্যাদির উল্লেখ করলেও, সেটা করেছে নিজেদের নৃশংসতা, বর্বরতার কার্যকারণ উপস্থিত করতে।

অবশ্য সভ্যতার বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে যুগন্ধর চিন্তাশীল বহু মনীষী নিয়তই মানব-চরিত্রের সুন্দর তথা শ্রেয়স্কর দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন, কিন্তু ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, স্বৈরাচার বারবার তাঁদের কুৎসা, লাঞ্ছনা, এমন কি বীভৎস মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য করেছে।

ধর্মনায়ক তথা তাঁদের সুযোগ্য সহযোগীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চূড়ান্ত পরমত-অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সর্বদাই। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্ম আর তরবারী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অংগাংগীভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে একটি জিনিষ সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ব্যক্তি মানুষের জীবনের কোন দামই সমাজের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। রণদেবতার রক্তভৃষা নিবৃত্তির জন্য বধ্য পশুর মতই তাদের সংগে ব্যবহার করা হত। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সংগে সংগে আশাকরা গিয়েছিল যে, মনুষ্য-জীবনের অপেক্ষাকৃত গভীর মূল্য দেওয়া হবে। মূল্য যে দেওয়া হয়নি, তা নয়। বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছেন পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরিয়ে মনুষ্যজীবনকে সুন্দরতর ও মধুরতর করার। একদা যেখানে মৃত্যু আলোকের গতি-অনুসারী ছিল, আজ সেখানে একদা বহু প্রচলিত ও প্রচারিত রোগাদিকে সংগ্রহশালায় খুঁজতে যেতে হয়। দৈনন্দিন জীবনও আজ বিজ্ঞানের সহায়তায় অনেকাংশে সহজতর হয়ে এসেছে।

সে তুলনায় রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যক্তি-মানুষকে যৎসামান্য অধিকার দিয়েছে। অবশ্য সাংবিধানিক বিচারে ব্যক্তির মৌল অধিকার বহু বিভিন্ন কিন্তু প্রশাসনিক নিয়মের বেড়াজালে তার অনেকাংশই নিত্যক্ষুণ্ণ। ফলে, মানুষ আজও রাষ্ট্রশক্তির বা সমাজযন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ব্যক্তিগত বা দলগত প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতা মায় ব্যক্তিসুখস্বাচ্ছন্দ্য নিরন্তর বলি দেওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মন ভোলানোর জন্য বড় বড় কথা বলার কামাই নেই। আর তারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি, দুর্বলের শক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত মানুষের লক্ষপতির প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত শ্রদ্ধা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন এ শ্রদ্ধা মাত্রাতিরিক্ত হয়, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামান্য বৈশিষ্ট্যও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট একটা কিছুতে পরিণত করার অতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায়, তখন তাকে অস্বাভাবিক বললেও সবটা বলা হয় না। তখন সাবধান হবার, এ প্রবণতা রোধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে, একথা বুঝতে হবে।

আমাদের সমাজের আজ এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা! আমাদের আশেপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা চরিত্রগুণে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে সর্বজননমস্য এবং তাঁদের প্রদর্শিত পন্থা অবশ্য অনুসরণযোগ্য; কিন্তু তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আমরা কদাচিতই দেখিয়ে থাকি। যদি কোনো ক্ষেত্রে শ্রদ্ধানিবেদন অরোধ্য হয়ে পড়ে, তখন আমরা কিছুটা যুক্তি করেই তাঁদের পুরুষোত্তম বানিয়ে দিই। তাঁরা যে উত্তম পুরুষ একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু সমাস বন্ধনে আমরা পৌরুষের ওপরও অপৌরুষেয় কিছু তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কারণ অত্যন্ত সহজ, অপৌরুষেয়কেও আর অনুসরণের প্রশ্ন ওঠেনা। দেবলীলা মানুষী শরীরে অসম্ভব না হলেও সিন্ধুতে বিন্দু পরিমাণ। অথচ সাধারণ মানুষকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতেই হয়, তাই তারা সহজলভ্য পাত্রান্তরে মনোনিবেশ করে। দৈনন্দিন জীবনে এই পাত্রান্তরের অনুসন্ধান বা সন্ধানই সর্বাধিক দেখা যায়।

আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় লোকগুলি যে সাধারণতঃ ধার করা ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, এইটাই সবচেয়ে মজার কথা। তাদের জ্যোতির মূলানুসন্ধানে (যা মোটেই কিছু কঠিন কাজ নয়) দেখি যে, সামান্য পরিবর্তনেই মণিহারা ফণীর মত গাছের গুঁড়িতে নিষ্ফল মাথা কোটাই সার হয় তাদের। ফলে, অনুসরণকারীদের সংখ্যা কমে যায় সংগে সংগে আবার নতুন মানুষের পেছনে গড্ডালিকা প্রবাহ ছুটতে দেরী লাগেনা, কারণ তারা যে রক্তবীজের বংশ। আর তাছাড়া

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগেও নেপোয় দই মারা'র রেওয়াজ নিতান্ত বিরল নয়।

কুলক্ষয়ী কুরুক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক না। যে অঘটন-ঘটন-পটীয়স 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী' বলে আঠারো অক্ষৌহিণী 'সমবেত যুযুৎসব'-এর সোজা বৈতরণী পারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, পিতামহ ভীষ্ম গোঁয়ার্তুমি করে রথের চাকা না ধরালে তিনিও বেমালুম ঘোড়ার লাগামের আড়ালেই গা ঢাকা দিতেন। অথচ গাণ্ডিবীর সামর্থ যে কোথায় যদুবংশের মুষল প্রকরণের পর যদু নারীদের দস্যু অপহরণকালে ধনঞ্জয়ও তা হাড়ে হাড়ে মালুম পেয়েছিলেন।

এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক তোলা যায়, কিন্তু স্থানাভাব। মোটকথা, সেদিনের পার্থ আর আজকের মহাকাশচারী গাগারিণরা নিজের একক ক্ষমতায় যে কিছু করেন না, তাঁরা যে সচল মহাযন্ত্রের সামান্য অংশমাত্র একথা আমরা দেখেও দেখিনা, বুঝেও বুঝিনা। কারণ, ব্যক্তি মানুষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে বিভীষিকা জাগায়। তাই আধুনিক কালের গান্ধিজী, নেতাজী, নেপোলিয়ন, ষ্ট্যালিন, হিটলার থেকে সুরু করে অতীতের বুদ্ধ, চৈতন্য, অশোক, খৃষ্ট হয়েছেন মহামানব নয় অতিদানব—মধ্যপন্থা নেই! এইত গত এক বছরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে টান হেঁচড়া দেশে দেশে আমরা দেখলাম সেটাও আতিশয্যেরই লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণীয় গুণগুলির কতটা আলোচনা হয়েছে এই সব অনুষ্ঠানে? রবীন্দ্রনাথের গান তালে-বেতালে যা গাওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যকে যতটা নাচানো হয়েছে, এমন কি ঘর-সাজাতে রবীন্দ্র-রচনাবলী যত কেনা হয়েছে, সে তুলনায় রবীন্দ্র চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও তার সর্বজন-গ্রাহ্য রূপ সম্বন্ধে কতটা আলোচনা হয়েছে। ঢালের মণিমুক্তো বসানো উজ্জ্বল বাইরের দিক-টাই দেখেছি আর দেখিয়েছি আমরা। তার ভেতরের দিকটা কেজো না অকেজো, কি ভাবেই বা সেটাকে কাজে লাগানো যায় এনিয়ে মাথা ঘামাইনি বা ঘামাবার দরকার মনে করিনি কেউ। লাভের মধ্যে আমাদের ৩৩ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে নতুন এক দেবতার ঠাঁই হয়েছে। গান্ধিজীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণতো পরের কথা, বছরের দু-একটি বিশেষ দিন ছাড়া তাঁকেই বা মনে রাখে কে? অথচ নিজেদের কথা জোরদার করা ও ভোট ভিক্ষা করতে বা দোষ ত্রুটির সাফাই গাইতে আমাদের নেতারাও হরবখতই গান্ধিজীর নামোল্লেখ করে চলেছেন। অন্যদিকে হিটলার, ষ্ট্যালিন, নেপোলিয়নের জীবদ্দশায় যারা তাঁদের পরমভক্ত প্রায় চাটুকার রূপে কালাতিপাত করেছে, তাঁদের দুরবস্থা বা মৃত্যু বা দুরবস্থার পর তারাই ফলাও করে তাঁদের দোষ-কীর্তন করে কৃতজ্ঞতার ঋণশোধ দিয়েছে। নেতিবাচক হলেও, এটাও কিন্তু একধরণের ব্যক্তিপূজা।

নেতিবাচকই হোক আর ইতিবাচকই হোক সাধারণ মানুষের জীবনের অন্যতম অবলম্বন হিসাবে ব্যক্তিপূজা অবশ্য প্রয়োজনীয়, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিপূজার মনোভাবের সাহায্যে ব্যষ্টি মানুষের ঐহিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কথা চিন্তা করা আজ দরকার হয়ে পড়েছে। সমাজনায়করা ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ভুলে গিয়ে যদি বিভিন্ন জনমনজয়ী মানুষের অনুকরণীয় গুণাবলীর অনুসরণ করেন, যদি সেই মহামানবদের আরোপিত দেবত্ব অনাবশ্যক জঞ্জাল বলে দূর করে তাঁদের মনুষ্যত্বের ওপরই জোর দেওয়া হয়, তাহলে বোধ হয় সমাজ ও মানুষ দুইই লাভবান হবে। আজকে কারণে-অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বারবার মনুষ্যত্বের যে লাঞ্ছনা ঘটেছে এই প্রচেষ্টায় তা অতীত ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু নেতাদের পক্ষ থেকে সে প্রচেষ্টা কি কোন ভাবেই করা সম্ভব হবে?

রবি মিত্র

শিল্প, সাহিত্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা

বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্তও 'আর্ট ফর আর্টস সেক' কথাটা ছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের বীজমন্ত্র। দুরূহ তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে এই কথাটিতে শিল্প ও সাহিত্য আমাদের ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রয়োজনের উর্ধে এই প্রত্যয়টুকুই মূলতঃ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন একটি প্রত্যয় অতিব্যবহারের ফলে 'ক্লিশে'তে পরিণত হয়। এবং এর পর বিপরীত মুখী ভাবনার উদ্ভব ঘটতে বাধ্য।

শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর্ট ফর আর্টস্ সেক কথাটা যখন একটা ক্লিশেতে পরিণত হোল তখনই দেখা গেল বিপরীত মুখী ভাবনার জোয়ার। শিল্প ও সাহিত্য যে সত্য ও মঙ্গলকে অস্বীকার করতে পারেনা— শিল্পী ও সাহিত্যিকেরও যে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব-বোধ থাকা দরকার—এই মতবাদ হয়ে উঠলো সোচ্চার। শিল্প সাহিত্যকে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও বাস্তব সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা হতে লাগলো।

কিন্তু আর্ট ফর আর্টস্ সেক মতবাদটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বিশেষকরে কলাশিল্পের ক্ষেত্রে। যাকে আমরা সাধারণতঃ আধুনিক চিত্রকলা বলি তা উপরোক্ত মতবাদটি সরবে ঘোষণা না করলেও সামাজিক দায়িত্ব বোধ বা বাস্তবের ধার ধারেনি বিশেষ।

কিন্তু শুধু সৃষ্টির দিক দিয়ে নয়—তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও হাওয়া বদল সুরু হয়েছে—একথাটাই মনে হোল প্রসিদ্ধ কলা সমালোচক হার্বার্ট রীডের "The Forms of things unknown" বইখানা পড়ে। বইটিতে হার্বার্ট রীডের প্রতিপাদ্য বিষয় একাধিক। কিন্তু বইটির গোড়াতেই মূল প্রতিপাদ্য রূপে যে মতবাদ উনি ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে এই—প্রকৃত আর্ট (এখানে রীড আর্ট কথাটির মধ্যে সাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন) আমাদের বোধের আরেকটি দিক খুলে দেয়—বস্তু জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে আমাদের নবতর জ্ঞান লাভ হয়—যে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচারলব্ধ জ্ঞান হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। তাঁর মতে আর্টকে শুধুমাত্র শিল্পীর ইমোশন্যাল ধ্যানধারণার মূর্ত প্রতীক বলে মনে করলে ভুল হবে। এই প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান দার্শনিকের রচনা হতে কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন তিনি. উধৃতিটি হচ্ছে এই —

"Art like Science, is a mental activity, whereby we bring certain contents of the world in to the realm of objectively valid cognition;—it is the particular of office of art to do this with the world's emotional content. According to this view therefore, the function of art is not to give the percipicent any kind of pleasure, however noble, but to acquaint him with something which he has not known before (otto Baensch).

এই মতবাদটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। এই মত-বাদ যদি আমরা মেনে নিই তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে শিল্পের মূল্য বিচারে কোন শিল্প সৃষ্টি আমাদের বোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করলো কিনা সেটাই বড়ো কথা—সেই সৃষ্টিতে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন কতটুকু—বা সামাজিক দায়িত্ব বোধের কষ্টিপাথরে তা নিখাদ প্রমাণিত হয় কিনা এসবই গৌণ।

কাব্যবিচার প্রসংগে সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে— "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"—অর্থাৎ 'রসের' উপস্থিতিই কয়েকটি পংক্তিকে 'কবিতা' করে তোলে। আর এই সংজ্ঞা শুধু কাব্য কেন

শিল্প সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের প্রাচীন শিল্প এবং সাহিত্যবিচারে এই 'রস'ই প্রধান মানদণ্ড।

'রস' বলতে যে এক্ষেত্রে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। কথাটির সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এখন পর্যন্তও নিনীত হয়নি। একথা বলা বাহুল্য যে 'রস' বলতে শুধু ফর্ম্যাল কনটেন্ট বোঝায় না। (এখানে বলে রাখা ভালো যে ফর্মাল কনটেন্ট আর আংগিক একার্থবোধক নয়।) আবার শুধুমাত্র বক্তব্য বা বিষয় বস্তুর ওপরও রসের উপস্থিতি নির্ভর করেনা। অনেকে মনে করেন যে ফর্ম্যাল কনটেন্ট ও বক্তব্যের একটি বিশেষ সমন্বয়েই রসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারপর প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই বিশেষ সমন্বয়টি কী, এবং বিশেষ সমন্বয় বলতে কোন অনড় সম্বন্ধকে বোঝায় না, ক্ষেত্র বিশেষ তা পরিবর্তনশীল। এধরণের আরো বহু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই সব চুল চেরা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একটা কথাই মনে হয় যে 'রসের' অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারলেও তার যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যে নবরসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা মানবমনের বিভিন্ন অবস্থার পরিচায়ক মাত্র তার সংগে 'রসাত্মক বাক্যে'র অংগাংগী সম্বন্ধ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কোন শিল্পকর্ম বা সাহিত্য আদিরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়েও রসাত্মক অর্থাৎ সার্থক শিল্প বা সাহিত্য না হতেও পারে।

হার্বার্ট রীডের প্রতিপাদ্য বিষয় হতেও এই তত্ত্বটিই সমর্থিত হয়। তাঁর মতে আর্টের মারফৎ এমন এক নতুন জগতের স্বাদ আমরা পাই যা বুদ্ধিও বিচার লব্ধজ্ঞানের পরিধির বাইরে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আর্টের জগতে কোন নিয়ম বা শৃংখলা নেই। আর্টের নিজস্ব ভাষা, প্রতীক নিয়ম সবই রয়েছে এবং এসবের বাঁধাবাঁধিও কম নয়। তার এই সব প্রতীক নিয়ম এগুলি বুদ্ধির মারফৎ আয়ত্ত্ব করতে গেলে একটা শেষ দরজায় আসতেই হয়—যার চাবীকাটি রয়েছে আমাদের ইনটুইশনের মধ্যে।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ভাস্কর হেনরী মুরের রচনা থেকে উধৃত করে হার্বার্ট রীড দেখিয়েছেন যে তাঁর শিল্পকর্ম বুদ্ধি সঞ্জাত নয় — এমন কী সুধুমাত্র ইনটুইশন জাতও নয়। মুরের শিল্পকর্মের মূল প্রেরণার উৎস এক অদৃশ্য সত্তা—যার হাতে শিল্পীর সজ্ঞান ইচ্ছা সুধু মাত্র 'যন্ত্রে' পর্যবসিত হয়। এই প্রসংগে রীড বলেছেন —

"Moore is here confessing that the creation of a work of art is a genuiene primordial experience— * * * Moore does not claim to have invented the life of his artistic forms—on the coutrary he asserts that the work of art takes on its own personality, and that this personality controls the design and and formal qualities."

রীডের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথাই মনে হোল যে এই মতবাদের সংগে কিছুকাল আগে পর্যন্ত প্রচলিত "ঐশী প্রেরণা" মতবাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। এই শেষোক্ত মতাবলম্বীরাও শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির মূল উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখলেন যে সার্থক শিল্পসৃষ্টির সবগুলি উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা সার্থক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছেনা। কোথাও বা বিভিন্ন উপাদান ও আংগিকের একটি বিশিষ্ট সমন্বয়েই সার্থক শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে—অথচ এই বিশিষ্ট সমন্বয়টি শিল্পী কেন বেছে নিলেন তার কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছেনা। আবার কোথাও বা একই শিল্পীর একই সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন শিল্পকর্ম সমান উৎকর্ষ লাভ করছেনা।

এধরণের নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিল্প ও সাহিত্য সমালোচকেরা স্থির করেছিলেন যে শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টির মূল উৎসটি হচ্ছে ঐশী প্রেরণা। আর শুধু সমালোচকেরা নন, শিল্পী সাহিত্যিকেরা নিজেরাও এই ঐশী প্রেরণা বা ডিভাইন স্পার্কের কথা স্বীকার করেছেন। ধর্মের সংগে সমন্বিত থাকায় 'ঐশী' কথাটিতে বর্তমান যুগের অনেকের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু 'প্রেরণা' আর মূর (এবং হার্বার্ট রীড) কথিত 'অদৃশ্য সত্ত্বা' কী মূলতঃ এক নয়? অর্থাৎ দুটি কথাই কী এই সূচিত করে না যে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃত উৎসটি আমাদের বুদ্ধি গ্রাহ্য চিন্তার বাইরে।

হার্বার্ট রীড যে অদৃশ্য সত্ত্বার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথেও তার সমর্থন পাই। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক নানা প্রবন্ধ থেকে তা প্রমাণিত হবে। এ প্রসংগে 'জীবনদেবতা' কবিতাটি উল্লেখ-যোগ্য। এই কবিতাটি শুধু অসামান্য সৃষ্টি হিসেবে নয়, রবীন্দ্রনাথের আত্মিক ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটিতেই (এবং এর পর আরো নানা রচনায়) রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে তাঁর অন্তর্জগতে রয়েছেন জীবন দেবতা যার ইচ্ছাগুলিই কবির সাহিত্যে শিল্পে রূপ নিচ্ছে।

শিল্প ও সাহিত্যের তত্ত্বালোচনায় এই দিক পরিবর্তন শুভসূচক সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দ্বারা আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প, বিশেষ করে আধুনিক কলা-শিল্পকে বুঝতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক। কারণ বহু ক্ষেত্রেই এ ধরণের শিল্প কর্মের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। বহু পাঠক দর্শক ও সমালোচকই এ ধরণের শিল্প কর্মের বিরোধী। এর প্রধান কারণ এই যে সকল শিল্প কর্মকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের আওতায় আনা যাবে এই ধারণাটি তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ এই ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নেবার কোন কারণ নেই। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাহিত্যেও শিল্পে বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা ও সজ্ঞান প্রচেষ্টার স্থান নেই। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য কিছু আছে। যার সংজ্ঞা আমরা আজো দিতে পারিনি। হয়তো কোনদিন পারবোনা। কিন্তু তার অস্তিত্বকে আমরা চিরকাল অনুভব করে এসেছি—এবং ভবিষ্যতেও করবো।

মীরা বালসুব্রমনিয়ণ

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা ও ইংরেজী

বৈশাখ সংখ্যা 'সমকালীন'এ শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সময়োপযোগী। পাঠিকা হিসাবে আমার ব্যক্তিগত চিন্তার কিছু এখানে লিখছি। পক্ষকাল ব্যাপী বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে একটি বিশেষ ও কালোপযোগী বিতর্কমূলক আলোচনা আহ্বান করা হয়েছিল—"বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়া প্রয়োজন।" অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম, সুধীপ্রধানদের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ও একটি (সে যে পক্ষেরই হোক না কেন) প্রস্তাবকে সর্ব সমর্থন ক্রমে গ্রহণ করা হবে এই আশ্বাসে, কিন্তু বিতর্ক বিতর্কই রয়ে গেল, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো না।

প্রস্তাবের আহবায়ক অত্যন্ত সরল, নিরন্ধ্র যুক্তি সমাবেশ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমস্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে শ্রোতা ও বক্তাদের সম্মুখে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দেশের ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; এ বছর বাংলা ভাষায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী অনার্স পরীক্ষা দিয়েছেন, এ পরীক্ষা দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য Hons. Graduate হিসাবে চাকুরী ক্ষেত্রে (বিশেষ করে স্কুল মাষ্টারী) অধিক বেতনপ্রাপ্তি ও অগ্রাধিকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুবিধা। এই ১৬০০ ছাত্রছাত্রীই বঙ্গভাষায় বিশেষ দক্ষ বা আগ্রহশীল তা নয়; এবং তা যখন নয় তখন এঁদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে কোন মৌলিক সৃষ্টি সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় অধুনা সৃষ্ট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এঁরা শিক্ষকতায় সার্থকতা লাভ করবেন না, কারণ Higher Secondary পাঠক্রমে বর্তমানের Intermediate-র পাঠক্রম সংযোজিত হয়েছে, শুধুমাত্র বাংলাই তো School-এ পড়ানো হয় না, ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষক কোথায় যদি শুধুমাত্র বাংলায় ১৬০০ জন অনার্স পরীক্ষা দেন? কিন্তু এই ১৬০০ মধ্যে কি এমন ছাত্রের একান্তই অভাব যার ইতিহাসে প্রবণতা আছে, ভূগোলে দক্ষতা আছে বা অর্থনীতি চিন্তাধারায় বিশিষ্টতা আছে?—একথা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু তবু সেই ছাত্র বা ছাত্রী নিজ অভিলাষ বা প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় গ্রহণ করতে পারবেন না ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতার জন্য, কিন্তু হয়ত সে স্মিথ-এর ঐতিহাসিক যুক্তিকে বিচার করতে পারেন, Mill-Laski-র Theory আধুনিক সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন— তাঁর সমস্ত মৌলিক ক্ষমতাই ব্যর্থ হয়ে যাবে ইংরাজী ভাষায় অপটুত্বের জন্য, দেশের পক্ষে এ কম ক্ষতিকর নয়।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন অবশ্যই হবে এ বিষয়ে সবাই প্রায় একমত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে? বিদেশী নজির টানতে গিয়ে সকলেই প্রায় জাপান ও রুশ দেশের কথা তুলেছেন, কিন্তু জাপানের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত একই জাপানী বুলি ব্যবহার না করলেও সেখানে চট্টগ্রাম চম্বলের ন্যায় মেরু-বৈপরীত্য নেই, কাজেই জাপানের দৃষ্টান্ত খুব শক্তিশালী নয়। রুশ দেশের উদাহরণ বরঞ্চ কিছু পরিমাণে বাস্তব নৈকট্য দাবী করে। এবং বিজ্ঞানী শ্রীসত্যেন বসুর সংগে আমরাও একমত দ্বিশতবর্ষ যখন ইংরেজী চলেই আসছে তখন টার্ম ইংরেজীই থাকুক না কেন! এক্স-রে-কে রঞ্জনরশ্মি বলতেই হবে তার কি বাধ্যবাধকতা আছে! টেলিফোন টেলিফোনই থাক তাকে 'কান-কা ফুসফুস' করার কোন সার্থকতা নেই।

প্রস্তাবের বিপক্ষে কাজী ওদুদের বক্তব্য বিশেষ স্পষ্ট হয়নি কিন্তু সেই অভাবকে অম্লান দত্ত তাঁর সুনিপুণ গ্রন্থনকৌশলে ও যৌক্তিক ভাষণে পূর্ণ করেছেন। অম্লানবাবু নিশ্ছিদ্র যুক্তিজাল বিস্তার করেও একটি ফাঁক রেখেছেন। তাঁর মতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার (বাংলার) ঠিক পাশে ইংরেজীকে রাখা উচিত সর্বভারতীয় প্রয়োজনে। বক্তব্যটি ঠিক স্পষ্ট হলো না—পাশে রাখা অর্থে কি বোঝাতে চান? Medium of Instruction কি যুগপৎ ইংরেজী ও বাংলায় হবে? অথবা ছাত্রছাত্রী নিজ দক্ষতা অনুযায়ী ইংরেজী বা বাংলায় উত্তর প্রদান করবেন, পাঠন যদিও মাতৃভাষায় হয়। প্রথমটি একেবারেই অসম্ভব শুধুমাত্র একটি ভাষায় শিক্ষাদান করেই বর্তমানে পাঠক্রম সমাপ্ত হয় না, ছাত্রদের নিজ দায়িত্বে পরীক্ষা দিতে হয়। সুতরাং দ্বিভাষায় শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। বিকল্প মতটি গ্রহণযোগ্য এবং মনে হয় এই একটি মাত্রই পন্থায় এই বিতর্কের এবং অত্যন্ত গভীর সমস্যার নিষ্পত্তি হতে পারে। কিছুদিন পূর্বে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল, কিন্তু এর মধ্যে ছিল অহিন্দী ভাষীদের প্রতি অবিচার, উত্তরদানও হিন্দীতে করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন, অসন্তোষটা তখনই ধূমায়িত হলো, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীর যে অধিকার সেই বলপ্রয়োগই এখানে করা হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র যদি ইংরাজীতে উত্তরদানের স্বাধীনতা

দেওয়া হতো তবে আন্দোলন উঠতো না! আমাদের বাংলা দেশের অবাঙালীদের প্রতি দরদী যাঁরা তাঁরা চিন্তিত, ইংরেজীতে উত্তর লেখার স্বাধীনতা থাকলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে, বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করবে সেই আঞ্চলিক ভাষা থাকবে চির অজ্ঞাত! সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও যেমন অবমাননাজনক, ডিগ্রীধারীর পক্ষেও তেমনি লজ্জাকর। পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা দু-তিনটি ভাষা শেখার দিকে, তিনি ভুলে যান সবাই শ্রীনেহেরু নন। দিল্লীর উপরতলার শিক্ষিতদের মধ্যে কয়জন মদ্রদেশী বা পাঞ্জাববাসী বাংলা ভাষা জানেন? এমন কি শ্রীনেহেরু নিজেই জানেন না তাঁর 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা।

সকলেই চিন্তাগ্রস্ত সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু কোথায় কর্মক্ষেত্র হবে তা যখন অজ্ঞাত তখন আগে থেকেই ভাষা নিয়ে এত ভাবনা কেন? একটি নূতন জায়গায় যখন যাবেন পেটের দায়ে (অর্থাৎ চাকুরী রক্ষার জন্য) তাকে সেখানকার ভাষা শিখতেই হবে. সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তো বাংলা দেশের লোককে ২৪ ঘন্টার নোটিশে রাজস্থানেও বদলি করা হয়, সর্বভারতীয় ভাষার অভাবে হয়ত ঠিক ২৪ ঘন্টা পরেই কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর শিক্ষার ভাণ্ডারটি তো থাকলো নিখুঁত, মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও কর্মদক্ষতা আনতে পারে শিক্ষাই শুধু! তাছাড়া শুধু চাকরী নয়, শুধু চিন্তাশীলতা নয়—মানুষের একটা সামাজিক জীবন আছে, সেই সমাজ জীবনকে লালন ও পুষ্ট করার জন্য গারো থেকে গাড়োয়াল পর্যন্ত যেখানেই যাও ঠিক সেই স্থানীয় ভাষাটিই অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত Anglo-Indian শ্রেণীটি সর্বাপেক্ষা অবহেলিত, স্থান আছে, সম্মান নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেই যে ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় তা ইংরেজী। অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে এই শ্রেণীটির জন্য চিন্তা করলেও ইংরেজী শিক্ষার স্তর থেকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন অন্যায়, সেজন্যই মনে হয় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইংরাজী থাকুক, ইংরাজী টার্ম থাকুক, থাক ইংরেজীতে লেখবার স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে কোন একটি ভাষাকে বিশেষ মূল্য না দিয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষাকেই যথার্থ মর্যাদা দিলে অধুনা যে 'জাতীয় সংহতির' ধুয়া উঠেছে তা সম্ভবপর।

উনিশ শতকের সূচনায় আয়র্ল্যাণ্ডে National School খুলে আইরিশ ভাষাকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র থেকে বিলুপ্ত করে, ফলে "মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইল পঙ্গুমন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।" (শিক্ষা ঃ পৃঃ ২৯৯ রবীন্দ্ররচনাবলী ১২)

আমাদের দেশে এই তোতাপাখি তৈরীর আয়োজন চলছে। সেই স্বর্ণ পিঞ্জরের হীরকবলয় ছিঁড়ে ফেলার জন্য দেশবাসী যখন উন্মুখ তখন আবার স্মরণ করি শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আন্দোলনের ভাষণ।

"বাল্যকাল হইতেই ইংরেজীভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষা শিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার অনেক অবসর পাওয়া যায়।" (গ্রন্থ পরিচয় ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২)

ভারতী সরকার

গোপাল ঘোষ

বেশ কিছু দিন পরে বিদগ্ধ শিল্পী গোপাল ঘোষের একক চিত্রপ্রদর্শনী এবারের মরশুমে দেখা গেল। শিল্পী গোপাল ঘোষ তাঁর অনবদ্য চিত্রসম্ভারে রসিকজনকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। নিসর্গ দৃশ্য বর্ণনায় শিল্পীর আন্তরিকতা সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। বর্ণের মেখলায় তাঁর সৃষ্ট চিত্র এক বিমুগ্ধ রূপকল্পনায় দর্শকজনকে আমন্ত্রণ জানায়। তাঁর এবারের ছবিতেও সেই অদ্ভুত বর্ণের সমন্বয় সব ছবিতে না হলেও অল্প কিছু ছবিতে প্রতিভাত হয়েছে। ছবির সংখ্যা কম হলে আরও ভাল হতো, তাতে করে বিষয়বস্তুর একঘেয়েমীর হাত থেকে দর্শকরা রেহাই পেতেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সময়কাল গোপাল ঘোষের চিত্র-সৃষ্টিতে এক বিশিষ্ট অধ্যায়। এই সময়ের মধ্যে গোপাল ঘোষ তাঁর অনবদ্য চিত্র-সৃষ্টিতে ভারত শিল্প-কলায় রোমাণ্টিক্ দৃশ্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত ঐশ্বর্য সংযোজিত করেছেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পীর ক্লান্ত মনের ছাপ ছবিতে পরিস্ফুট। কি এক বেদনার সংঘাত তাঁর ছবিতে অদ্ভুত মানসিকতা প্রতিফলন করেছে। শিল্পীর আপাত নিখোঁজ মনকে ধরবার জন্যে—বর্তমানের প্রদর্শনীটি শিল্পীর একটি প্রস্তাব বহন করে এনেছে। আধুনিক বিলাসী শিল্প চিন্তার মধ্যে শিল্পী গোপাল ঘোষ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী, কিন্তু রোমাণ্টিকধর্মী আধুনিকতা, চিত্রে কি পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর সংবেদনশীলতাকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করবে তার অনুচিন্তা তার অন্বেষণ বর্তমানের ছবি-গুলির প্রাণবস্তু। বিগত কয়েক বৎসরের গোপাল ঘোষ এবং বর্তমান বৎসরের গোপাল ঘোষ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্তমানে শিল্পী কিছু কিছু কাজে প্রকৃতিধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন আবার কিছু কাজে তাঁর মনন-ধর্মী কাব্যিক-মনের বিশ্লেষণ বর্তমান। এই প্রদর্শনীর মূল সুর অন্বেষণ। এই অন্বেষণের পথে শিল্পী-প্রকৃতি এবং মন এই দুয়ের এক সমন্বয়সাধনে তৎপর।

সুনয়ন দেবী

ঠাকুরবাড়ী বাংলা দেশের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের জন্মদাতা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ীর অবদান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ওখান থেকেই শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের উদ্ভব। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যে আধুনিকতার আন্দোলন গড়ে উঠছে তার প্রথম বিকাশ ঠাকুর পরিবারেই। এই পরিবারেই সুনয়নী দেবীর জন্ম। জন্মকাল থেকেই ছবি, গান, সাহিত্য, এরই মধ্যে শিশুকাল থেকে যৌবনকালের কোমল সময়টুকু কেটেছে। ছোটবেলায় দাদাদের ছবি আঁকা দেখে ছবি আঁকাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুনয়নী দেবী। তারপর সেই নেশা যত দিন গেছে তত পাকা হয়েছে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা ফিকে হয়ে যায়নি। নিভৃতে—চার দেওয়ালের মধ্যে ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় তাঁর দিন কেটেছে। বড় হয়েছেন, খেলাধুলো করেছেন, বিয়ে হয়েছে, ছেলে সংসার, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি, তার মধ্যেও চলেছে ছবি আঁকার ঐকান্তিক সাধনা। আমৃত্যু ছবি আঁকার এই প্রয়াস দুর্লভ। ভারতবর্ষে মহিলা শিল্পীদের মধ্যে তিনি যে অগ্রগতির অবতারণা করেছিলেন বাংলাদেশ অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর সেই অগ্রগামী চিন্তাকে স্বীকৃতি দেয়নি, আজ

এতদিন পরে তাঁর মৃত্যুরপর শিল্পীর এই স্বীকৃতিতে আনন্দ পাচ্ছি সত্যি, তবে তার থেকে বেদনাই বেশী। অর্বাচীন সমালোচনার দণ্ডাঘাতে তাঁর শিল্প জ্ঞানকে আমরা মর্যাদা দেই নি, আজ সেই অমার্জিত বোধকে বিনাশ করাতে আমরা সমধিক আনন্দিত হয়েছি। একক সাধনায় তিনি যে দুর্লভ শিল্পী সত্বার অধিকারিণী হয়েছিলেন তা বর্তমান কালের অনেক বিশ্বখ্যাত শিল্পীর পাশে অনায়াসে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যামিনীবাবু বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রান্দোলনের ক্ষেত্রে সুনয়নী দেবীর পটচিত্রের রেখা আর স্পেস কল্পনার উত্তর সাধক।

কিন্তু সুনয়নীদেবী পট থেকে তাঁর চিত্রের মূল সুর অন্বেষণ করলেও অদ্ভুত বিচিত্র অনুভূতির সংলাপ তাঁর চিত্রসৃষ্টিতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। শান্ত চিত্তে, স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোতে প্রেমের নির্জন মুহূর্তে কল্পনা তাঁর ছবিকে এক অপরূপ রূপমাধুর্যে অভিষিক্ত করে। এই রূপ কল্পনা একান্ত ভাবে আমার। জনকোলাহলের বাইরে যেখানে আমার মন অসীম বেদনার আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে চঞ্চল পক্ষ বিস্তারে উৎসারিত হয়েছে সেই আনন্দের মুহূর্তগুলির অনুভূতি আমাদের ভেতরের সহজ মানুষটিকে নাড়া দেবে। আকাদেমী সুনয়নী দেবীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। অবনীন্দ্রযুগে গগনেন্দ্রনাথ যেমন এক বিস্ময়কর সংযোজন, তেমনি সুনয়নীদেবীর সহজ শান্ত শিল্পকলা আর এক ঐশ্বর্য্যময় সমাহিতচিত্তের প্রশান্তিতে অভিষিক্ত।

কোলকাতা, বোম্বে, দিল্লী

এই মরশুমে কোলকাতাতে বোম্বে, দিল্লীর শিল্পীরা এসে আসর জমিয়েছিলেন। সে আসরে কোলকাতার শিল্পীরাও তাঁদের যথাসাধ্য পরিবেশন করেছেন। ভারতখ্যাত বোম্বে দিল্লীর শিল্পীরা মহান কিছু চিত্র চিন্তাতে আমাদের অভিষিক্ত করতে পারেন নি। তেমনি কোলকাতার অনেক তরুণ শিল্পী সেদিক থেকে যথেষ্ট অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। হুসেন, কুলকার্ণি, গুজরাল, তারা সবাই বোম্বে দিল্লীর খ্যাতিমান শিল্পী। একমাত্র হুসেন ছাড়া আর সকলেই রীতিপ্রকৃতি বদলাচ্ছেন—আরও হয়তো বদলাবেন। হুসেন ভারতীয় কথাটি ব্যবহার করছেন। তাঁর ছবির চাহিদা আছে বিদেশী বাজারে। সেখানে তিনি ভারতীয়ত্ব পরিবেশন করে চলেছেন মিষ্টি মিষ্টি রাগ রাগিনীর ছবিতে, কিংবা তথাকথিত ভারতীয় জীবন যাত্রার ছবি এঁকে। এই ধরণের স্বল্প গভীর চিন্তার অনুধ্বনি তাঁর ছবিতে আপাতরম্যতার পরিচয় দিলেও তাতে করে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার অনেক কিছু বক্তব্য অকথিত, থেকে যাচ্ছে। আংশিক আর্থিক সাফল্য শিল্পীর জীবনে নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু আর্থিক সাফল্যই শিল্পীর শিল্পজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেনা। সেখানে শিল্পীর অনুধ্যানই বিচার্য। এখানে একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বোম্বে, দিল্লীর শিল্পীদের টেকনিক্যাল জ্ঞানের অবতারণা লক্ষণীয় কিন্তু সেই জ্ঞানের অন্তরালে যে নন্দনতত্বগত আবেদন দর্শকমনকে নাড়া দেবে সেই আবেদন সেখানে শূন্য। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তের শিল্পীদের অন্বেষণ যে পথ ধরে এগুচ্ছে তাকে সর্বদা মেনে না নিলেও একথা বলতে বাধা নেই যে নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা অন্বেষণ শ্রেয়। বিগত দশবছরের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে শিল্পীরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খুব বেশী সফলকাম না হতে পারলেও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমপ্রান্ত অপেক্ষা অনেকাংশে নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তনে তৎপর হয়েছেন। বর্তমানে আর্থিক সফলতা নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায়, সেই পোষকতা বোম্বে, দিল্লী অনুক্ষণই পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই পোষকতা থেকে বাঙ্গলাদেশ যে কোন কারণেই হোক বঞ্চিত। এই অবস্থায় অল্পবিত্ত সমাজের মধ্যে শিল্পীদের অবাধ প্রসারণ ঘটাতে পারলে সেখানে বিপ্লব এনে দেবে। অল্পমূল্যে চিত্র বিক্রয় আন্দোলন সফল করতে পারলে আমরাও বাংলাদেশের শিল্পীরা বিদেশী বণিক কিংবা স্বদেশী বণিক উভয় শ্রেণীর মাধ্যমে জীবন ধারণের গ্লানি থেকে

মুক্তি পাব। শিল্প চিন্তা যখন আমাদের এই সমাজকে প্রতিফলিত করছে, তখন এই সমাজের অধিবাসীরাই আমাদের ছবির ক্রেতা। অনেক সংখ্যাহীন ক্রেতার মধ্যে আমরা নিজেদের ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারলে শিল্প আন্দোলনকে সার্থক রূপদান করা যাবে। একথা সর্বদাই স্বীকার্য যে বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে সামাজিক পটভূমির অবস্থাই বেশী দায়ী। এই সামাজিক অবস্থায় যখন শিল্পী নিজেকেও অল্পবিত্ত সমাজবাসীদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে তাদের সুখ দুঃখ বেদনাকে আপনার বলে ভাবতে পারছে, সেখানে অল্পসংখ্যক উচ্চ-বিত্তদের পোষকতায় কিছু আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতে পারে আর তাতে নির্জীব বুদ্ধিগত জটিল টেকনিক্যাল দিকগুলিই, ক্ষীয়মান শিল্প চিন্তায় নিঃশেষিত হবে। কিন্তু এখানে এই অগণিত উজ্জ্বল সম্ভাবনার পটভূমিতে শিল্পীরা সজীব চিন্তায় সমাজের বেদনা সংঘাতের মধ্যে সার্থক সমকালীন চিন্তার স্ফুরণ ঘটাবে। জনসমাজের মধ্যে আপন মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারলে চিন্তা ও জীবিকা উভয়ই সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে পারে।

চিত্র প্রদর্শনী

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে প্রিন্টস্ আর্ট গ্যালারীতে শ্রীযুক্ত নিখিল বিশ্বাসের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের একক চিত্র প্রদর্শনী এর আগেও কলকাতার অন্যান্য জায়-গায় হয়ে গেছে। মাত্র পনের খানা ছবির এই প্রদর্শনী সুধীমহলে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

এই শিল্পী প্রধানতঃ আশাবাদী। বাংলা দেশের শিল্পীমহলে ইদানীং প্রচুর কাজ হচ্ছে। অনেকগুলি একক ও গোষ্ঠীগত চিত্র প্রদর্শনী ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। নূতন নূতন টেকনিকের মাধ্যমে চিত্রশিল্পের অনেক পরীক্ষা চলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পীরা ক্রমশঃ নিরস বস্তু-তান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া টেকনিকের দৌরাত্ম্য শিল্পীর বক্তব্যকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছে। নিখিল বাবুর অঙ্কনশৈলী এই পর্যায়ভুক্ত নয়।

শিল্পকলার সুষ্ঠু প্রকাশের তাগিদে কৌশল বা টেকনিকের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই কিন্তু কলাকে অতিক্রম করলে শিল্প, কৌশল সার হয়ে পড়ে। তখন সেই টেকনিক ভেদ করে ছবির রসগ্রহণ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আধুনিক চিত্রশিল্প এই টেকনিক এবং ইজমের আওতায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সমালোচকদের কয়েকটি ইজম ঘটিত বাঁধাবুলির জোগান দিচ্ছে। বিশেষ দুঃখের কথা যে এই সমস্ত ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করার ফলে আধুনিক চিত্র-শিল্পের প্রতি দর্শকরা কিছুটা বিরূপ হয়ে পড়ছেন। যে দর্শকবৃন্দ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁর অধিকাংশই এই ইজমের ফ্যাশনে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নিখিল বাবুর আঁকা ছবির কোনটিই উৎকট "ইজমের" আওতায় পড়েনা। আন্তরিকতার সঙ্গে আঁকা নিখিলবাবুর ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত টেকনিকের ছাপ পড়েছে যার জন্য তাঁর ছবিগুলি বুঝতে কোনও ইজম মার্কা অতসী কাঁচের প্রয়োজন হয়না, সাদা চোখেই যথেষ্ট।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশেষ কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখা না দিলেও নিখিল বাবুর ছবিগুলি মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। জড় পদার্থ বলে তার স্থূল পরিচয় দিতে নিখিল বাবু প্রস্তুত নন তাই তার গীর্জা ছবিটিতে পার্থিব প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। গীর্জাটি এক কথায় বিগলিত করু-ণার প্রতিচ্ছবি। রেখার বলিষ্ঠতা আর বিষয় বস্তুর উপস্থাপনে যে আন্তরিকতা ছবিটির মধ্যে

ফুটে উঠেছে রঙের প্রলেপে তাঁর নিগূঢ় স্বরূপটি আশ্চর্যরূপে প্রকট। এই ধরণের আর একটি ছবি,—আবছা আলোয় ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়ি আর প্রাচীন বট গাছের বিস্তৃতি—নাম ষ্টাডি। মহান অথচ নশ্বর পৃথিবীর এক একটি নিভৃত কোন বাংলাদেশের অনেক গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করছে,—এই ধরণের রিক্ততার মধ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে পড়া আলোটুকুই প্রাণের সাড়া। ছবির মধ্যে এই আলো ইতিহাসের অনেক নিভৃত গুহা আলোকিত করেছে। রঙ ও ছুরির ফলা দিয়ে কাজ জড়ের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করছে।

রাত্রি, চন্দ্রালোক ও বিকাল এই তিনটি ছবি নিখিলবাবুর পুরাতন ছবি "গোধূলি"র সমতুল্য। এই তিনখানি ছবিতে রঙের ব্যবহার অতুলনীয় হয়েছে। রঙের কাজে নিখিল বাবু কোনও কল্পনার অবকাশ রাখেন নি। রাত্রের অন্ধকারেরও যে একটা নিজস্ব আলো আছে, চাঁদের আলো যে প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির ওপর প্রতিফলিত আলো নয়, প্রকৃতির নিজস্ব রঙের রূপান্তরিত বিকাশ; সন্ধ্যায়, বৃক্ষচূড়ার স্বর্ণ চয়নকারী আলোই যে একমাত্র আলো নয়, বনানীর ভিতরকার যে নিজস্ব বৈকালিক রঙ আছে এই সত্যানুভূতি নিখিল বাবুর প্রত্যয় হয়েছে। তার প্রমাণ রঙের একক ব্যবহার ও তুলির বলিষ্ঠ প্রলেপ।

নিখিলবাবু রেখার মধ্যে গতি এনেছেন কয়েকটি স্কেচের মাধ্যমে। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল কয়েকটি ঘোড়ার মুখের কম্পোজিশন। নাম "ষ্টর্ম হর্সেস্।" এছাড়া বাইসনের স্কেচটিও উল্লেখযোগ্য। "ফরেষ্ট" স্কেচটির মধ্যে দিয়ে হাক্সলীর সেই nature arrayed in tooth and claws এর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

কয়েকটি ছবি এর মধ্যে মানবিকতার পরিচয় সম্পর্কিত। যিশু খৃষ্টের রেজারেকশন সংক্রান্ত ছবিটির মেজাজ থাকলেও বর্ণপ্রলেপ কিছুটা চাপা এছাড়া দু একটি সাধারণ পর্যায়ের ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে। আগের প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখার পর এই ছবিগুলি দেখলে শিল্পীর উন্নতির মান বেশ পরিস্কার বোঝা যায়। শিল্পী যে বক্তব্য উপস্থাপনে অনেক বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট হয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রতিমা মিত্র

স মা লো চ না

কখনো মেঘ ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

"কখনো মেঘ" প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। কিছুকাল পূর্বে "হরিণ চিতা চিল", কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে নতুন সুরের আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন মনে হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থটি তার এক আপাত লঘু অথচ পরিবর্তিত মানসের ঐকতান। ঐকতান শব্দটি আমরা ব্যবহার করলাম এই জন্যে যে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি একটিমাত্র সুর বা বক্তব্যের মৌল উচ্চারণ না হয়ে সামগ্রিক ভাবে এক অখণ্ড চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আজকের উত্তর চল্লিশ বা উত্তর পঞ্চাশের অধিকাংশই যখন সাফল্যের রৌদ্রালোকে নিশ্চিন্ত, পুনরাবৃত্তিতে আত্মমগ্ন ও তৃপ্ত দেখি, তখন রবীন্দ্রোত্তর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে "মেঘের" উচ্চারণ আমাদের সশ্রদ্ধ মনযোগ আকর্ষণ করে। সমগ্র গ্রন্থটিতে "মেঘ" শব্দটি বহুবার বহু বিভিন্ন ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করে-ছেন। যদিও গ্রন্থের নাম অনুসারী, "কখন মেঘ" নামে কোন কবিতা বর্তমান গ্রন্থে নেই। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয় যে কবিতাবলীর সামগ্রিকতা ও আন্তরধর্মের মূল দোলাচলটিকে তিনি গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই বিধৃত রাখতে চেয়েছেন।

সমগ্র গ্রন্থটিতে আটত্রিশটি রচনা আছে, কবিতাগুলি প্রায় অধিকাংশই হাল্কা ছন্দে তির্যক ভঙ্গীতে লিখিত। অথচ হাল্কাছন্দের ছড়ানো শ্লথ ভাব এতে নেই। আছে সংযত ও কবির প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক বীক্ষার একাগ্র অন্বেষণ। যেখানে জীবনবোধের সঙ্গে জীবনবেদের, দ্বিধার সঙ্গে বৈদগ্ধের এবং সর্বোপরি সৃষ্টির সঙ্গে সিদ্ধান্তের এক অদ্বৈত অন্বয় তিনি ঘটাতে চেয়েছেন।. গ্রন্থটির প্রতিটি কবিতায় রয়েছে তার স্বাক্ষর। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে তা আরো স্পষ্ট হবে। যেমন,

> "সারাদিন কথার জনতা
> অস্বচ্ছ আবিল ঘূর্ণি গ্লানির জঞ্জাল রেখে যায়।
> তারপর কখনো কখনো
> ধ্যান গাঢ়
> বৈখানের নীল নীরবতা"

অন্যকাবতায়;

> "সব কথা স্তব্ধ হলে
> দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা
> সৃষ্টিমূল থেকে তরঙ্গিত......"

কিংবা জীবনকে তার অবিমিশ্র সময়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দেখে বলেন

> "জীবন ত' কত বার
> কত সাধে খেলাঘর পাতে।

তারপর হেরে গিয়ে সময়ের হাতে
বিস্মৃতির পলিতে হারায়।"
কিন্তু তবু;
"......এত ঘুম ঠেলে
প্রাচীন মুদ্রিত সেই ধ্বনি
কেন আজো চায় পাঠোদ্ধার?
আনে কি সংকেত কোনো
ঘোচাবে যা সময়ের
ফিরে ফিরে এ রূঢ় ধিক্কার।"

আজ এই আর্ণবিক চীৎকারের যুগে প্রকৃতিও সময়ের ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতার মধ্যেও কবিতার প্রাণের সজীব তারুণ্য বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই হয়তো সময়ের রূঢ় ধিক্কার তাকে বিচলিত করে না। সময়ের প্রতিটি নতুন লক্ষণ; তাৎক্ষণিক সমস্যাজালে পরিবর্তিত জীবনবোধকে তিনি তার আশ্চর্য মানস ঐশ্বর্যে স্পর্শ করতে এখনো পারেন বলেই হয়তো এখনো তিনি ফুরিয়ে যান নি। এই সদা চঞ্চল অতৃপ্ত জীবনজিজ্ঞাসা জীবনের প্রতিস্তরে তাকে রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির সর্বত্র তার পরিচয় ছড়ানো। কন্ঠস্বর কখন কোমল, কখনো প্রায় চীৎকারের তীব্রতায়, আবার কখনো ধ্যানমগ্ন আত্মসন্ধানের স্থিরতায় পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের প্রতি দার্শনিক দৃষ্টি ও মানবপ্রেমই সে কন্ঠস্বরের প্রধান ধ্বনি এ সত্যটুকু যে কোন সচেতন পাঠকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়না। একদা যে কবি লিখেছিলেন "পালাতে পালাতে কতদূর?" সে কবিই যখন লেখেন,

"তারপর রাত শেষ হবার আগে
একটি নির্ভীক আশা হয়তো চোখ মেলবে।
প্রথম কান্নার ছলে তার প্রচণ্ড ঘোষণাই হবে
আগামী সূর্যোদয়ের ইস্তাহার।"

তখন বুঝতে কষ্ট হয়না, কবির পূর্বোক্ত পলায়নবাদ শুধু জীবনকে দূর থেকে তার আনন্দ-বিষাদ, কুৎসিত কমনীয়তার বৈপরীত্যে ভাল করে চেনবার ও চেনাবার জন্যই তার এই কাব্য-প্রস্থান। যদিও

"একঘেয়ে ঘোরানো সিঁড়িতে
হয়তো উঠছে সবই। কিন্তু সেটা সিঁড়ি কিনা তাই
ঝাপসা চোখে কে বলবে? পাক খাওয়া প্যাঁচালো প্রতীতি
সুরু আর শেষ যদি গোঁজামিলে দিয়ে থাকে জুড়ে।"

তবু অন্বেষার সোপানে মানুষের আরোহণ শেষ হয়না।
তাই আবারও বলতে পারেন ;

"এতো বড় রঙ্গ যাদু
এতো বড় রঙ্গ
নিজেই আগুণ জেবলে আবার
নিজেই হই পতঙ্গ।
ওপর তলায় আসর মেলা
চলছে সতরঞ্চ খেলা।

ঘ্যুঁটি কিন্তু নীচের তলায়
যা পড়ে তার ব্যঙ্গ!

পরিশেষে গ্রন্থটির অঙ্গসৌকর্যের সবিশেষ প্রশংসা করেও বলতে হয়; কবিতা প্রথমত ও প্রধানত হৃদয়ধর্মের অন্তর্গত। বাইরে রৌদ্রে রাখলেও হীরকখণ্ড তার আপন উজ্জ্বলতায় ঝলসে ওঠে। তাকে অত্যধিক প্রচ্ছদ বৈচিত্রে ও অঙ্গসজ্জার প্রসাধনে আবৃত না করলেই বোধহয় বর্তমান প্রকাশক ভাল করতেন।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সাগর-আকাশ ॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ডি· এম· লাইব্রেরী। কলিকাতা ঃ দুই টাকা।

"সাগর-আকাশ" বইখানি পড়ে আমি তৃপ্তি পেয়েছি। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই obscurant হয়ে উঠছে। দুর্বোধ্য শব্দযোজনা, ঋণগ্রস্ত চিত্রকল্প ও জীবনবিমুখ উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতা কবিতার পরমায়ু কমিয়ে আনছে। অনিলবাবুর কবিতার বইখানিতে উক্ত লক্ষণ-গুলির সন্ধান না পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। আজকার নিরাশ্বাস বা না-বিশ্বাসের যুগে তিনি একটি সৌন্দর্য-পিপাসু মনকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। একে 'escapist' বলে বিদ্রূপ করে লাভ নেই। মন থেকে যেদিন সৌন্দর্যের পিপাসা, আকাশের স্বপ্ন, সমুদ্রের নীল মুছে যাবে, সেদিন কী থাকবে? অনিলকুমারের এই কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলির নাম পড়লেই (যেমন, 'দুটি কালো চোখ', 'প্রজাপতি মন' 'রূপবতী' 'নিশিগন্ধা' 'মেঘকন্যা') তাঁর রূপমুগ্ধ রোমাণ্টিক মনের পরিচয় মেলে। তাঁর মন বিচিত্র-সুন্দর পৃথিবীকে ভালোবাসে, 'দুটি কালো চোখ-ভরা তারার বিস্ময়' অনুভব করে, তাঁর কাছে সহজেই 'অগণন স্বপ্নের কলি গান হয়ে সুর হয়ে' বেজে ওঠে।

অনিলকুমার রোমাণ্টিক মনোভাবের সেই দিকটিকেই গ্রহণ করেছেন যেখানে প্রাত্যহিকতা থেকে, দৈনন্দিন কর্কশতা থেকে মন বিদায় নিয়ে সুদূরের অভিসারী হয়। তাই তিনি বার বার উচ্চারণ করেন ঃ

তখনো হৃদয়-কবি
আকাশে পাখির ডানা নীল নীল রঙ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এ-ঘাটে স্বপন খেয়া ও-ঘাটের শেষে
উড়ে চলে অন্ধকার বিদিশার দেশে॥ [নিশানা]

কিংবা—

জিজ্ঞাসারে ঠেলে দাও
কোথায় কোথায়?
এবারে শুধাও
ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ মৃত্তিকারে ছেড়ে এসো নীলান্তে উধাও। [আছি]

আকাশের নীল ও সাগরের নীল দুই-ই আমাদের কাছে সীমাহীন স্বপ্নের আধার। অনিলকুমার তাদেরই আশ্রয় করেছেন আপন কবি-চিত্তের সহজাত প্রবণতাবশে। তবে শুধু 'উদাসী উধাও পাখি'-রূপে আকাশ-বিহারেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়নি। যে-নারী মাটির পৃথিবীতে অতি সচ্ছন্দ

গতিতে কবির চারপাশে ঘোরে-ফেরে সেই প্রত্যহজড়িত নারীকেই তিনি বলেছেন ঃ

আকাশ পিপাসা নিয়ে মেঘ পানে চাওয়া
ঝিরিঝিরি জলধারা তোমাতেই পাওয়া॥ [নিশিগন্ধা]

'নিশিগন্ধা'র অপূর্ব সুরভি আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে। বইখানি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদটিও বেশ সুন্দর।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঃ মনন ও শিল্প ॥ সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। প্রকাশক,—দুলালচন্দ্র সাধুখাঁ মগরা, হুগলী। অচলায়তন প্রকাশনী। দাম—পাঁচ টাকা।

বৈশাখ ১৩৬৮ সালে রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে অনেক সংগীতানুষ্ঠান, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান আমরা উপভোগ করেছি সেই তুলনায় রবীন্দ্র-শিল্পালোচনা যে অনেক কম হয়েছে তার প্রমাণের জন্য কোনও পরিসংখ্যান উপস্থিত করবার প্রয়োজন বোধ করি দরকার হবে না। সুতরাং যে কয়খানি আলোচনার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির গুরুত্ব অনেক এবং প্রকাশকদের দায়িত্বও এদিক দিয়ে কম নয়। এই গুরুদায়িত্ব পালনে প্রকাশক অবশ্য সমান কর্তব্যবোধ দেখাননি। কোন কোন বই যেমন স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বাজারে কাটতির উপর নজর রেখে, কোনটা বা বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী ও বিষয় বস্তু উপস্থাপনার বৈচিত্রের প্রতি সুবিচার করেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এমনই কয়েকটি রবীন্দ্র-শিল্প-শাখার স্বল্পালোচিত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। লেখকগোষ্ঠীর সকলেই প্রখ্যাত না হলেও অখ্যাত নন। বিশ্লেষণগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী রবীন্দ্র-মননের উত্তরসুরীদের পক্ষে যথোপযুক্ত হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বা রবীন্দ্রনাথের মননে আপনাকে বিলীন না করে রবীন্দ্র-শিল্পের ক্রমবিকাশের উত্তরাধিকারি মোটামুটি তাঁদের হাতেই এখানে রবীন্দ্র-শিল্পালোচনার ভার ন্যস্ত।

সবশুদ্ধ পনেরটি প্রবন্ধ নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থখানির মধ্যে প্রয়োগ শিল্প প্রসঙ্গে ৩টি প্রবন্ধ এখানে আহরিত হয়েছে। প্রয়োগ শিল্পালোচনা বস্তুতঃ demonostrative না হলে বক্তব্য সঠিক বোধগম্য করা কঠিন। সেখানে হয় অব্যক্তকে বক্তব্যের কোঠায় ফেলতে গিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ এসে পড়ে নয়ত কিছুটা ধোঁয়াটে ভাবালুতার সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্খ ঘোষের "নাটকে গান—রবীন্দ্রনাথের নাটক"; "রবীন্দ্র-সংগীতের রূপকথা"—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ও শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর "আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ" এই তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত, নৃত্য বা নাট্য আলোচনা নিতান্তই প্রয়োগনির্ভর। সুতরাং প্রয়োজনার উৎকর্ষ ভেদে প্রয়োগ-শিল্পের সিদ্ধি। আলোচনার মাধ্যমে সাফল্যের নাগাল পাওয়া বিশেষ শক্ত কাজ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত স্বরলিপিতে বাঁধা হলেও লয় ও গায়ন রীতি শিল্পীনির্ভর। নৃত্য বা নাট্য প্রয়োগ একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

এরই কারণে বোধকরি "নাটকে গান" প্রবন্ধে থীম্ মিউজিক বা লিরিকের পরিবেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যবহার সম্বন্ধে যতটা আলোচিত হয়েছে বা গ্রীক কোরাসের তুলনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে অভিনয়ের অংশটুকু ততটা আলোচিত

হয়নি। রবীন্দ্র-নাটকে হিমির গান বা জয়সিংহের গানের সাফল্য যে কতটা সার্থক অভিনেতার উপর নির্ভর করে সেটুকু না দেখতে পারলে বা সম্ভাবনাটুকু হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে রবীন্দ্র-নাটকে গান "পরিহার্য অলঙ্করণ" বলে মনে করা কিছুই আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্র-নাটক যেখানে লিরিকাল সেখানেও সঙ্গীত যোগান দিয়েছে ভাবের সংঘাত। অক্ষয়ের গান চরিত্রের সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলেছে; প্রয়োগ সমস্যার চাহিদা মেটাতে বোধকরি নয়। তেমনি ধনঞ্জয়ের গান চরিত্রকেই ফুটিয়েছে, সংঘাতের যোগান দিয়েছেও বটে অথচ দুই ক্ষেত্রেই অভিনয়ের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। আসল কথা, সাধারণ নাট্যাভিনয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনকালে শিল্পী, অভিনয়ের দিকটা প্রায়ই ভুলে যায় তার দৃষ্টি পড়ে থাকে স্বরলিপির দিকে সুতরাং গান-সম্বলিত রবীন্দ্র-নাটকের এই দুর্দশা।

প্রয়োগ শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসুধীর চক্রবর্তীও এই অসুবিধায় পড়েছেন। একথা সত্য যে ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যকলায় সঙ্গীতের প্রভাব অল্প,—ছন্দ ও দেহভঙ্গিমার প্রভাব অধিক। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে নৃত্য তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয় বলা বা সেখানে নৃত্যের চেয়েও সঙ্গীতের প্রাধান্য বেশী দেখা অসঙ্গত নয়কি? নৃত্য-নাট্য একাধারে নৃত্য এবং নাট্য সুতরাং নাট্যের মর্যাদা ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে বই কি? নৃত্য-নাট্য যেখানে "ট্যাবলো" সেখানে নৃত্য আভিনায়িক। অন্যথায় গান তার আপন মহিমা কিছুটা বহন করবেই। আমাদের মনে হয় শ্রীচক্রবর্তীও গানের প্রাধান্য ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বিচার করেছেন,—সুর, তাল ও লয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। বোধকরি সেই জন্যই তিনি নৃত্য-নাট্যগুলি পাঠ করে কাব্য পাঠের আনন্দ পান। এখানে আমরাও তার সঙ্গে একমত। কিন্তু নৃত্যরূপের অসঙ্গতি যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের মহিমাকে ছাপিয়ে যায় তখন আমরা শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে একমত হতে পারি না। প্রসঙ্গক্রমে শ্যামা নৃত্য-নাট্যে "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া" গানটি আমরা উল্লেখ করছি। সুধীরবাবু যথার্থই উত্তীয়ের চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে গানখানির উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গানখানি নাটকীয় সংঘাত পরিবেশনেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে এ কথা গীতিকাব্য হিসাবে পাঠ করলে বা গান করলেও পরিস্ফুট হয়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গানটির নৃত্যরূপ দেখে হতাশ হতে হয়েছে। নৃত্যের তাগিদে লয় দ্রুত হতে দ্রুততর করার ফলে উত্তীয়ের বালকসুলভ চাপল্যই ফুটে ওঠে বেশী, আত্মদানের তৃপ্তি খুব কম ক্ষেত্রেই নৃত্যের মাধ্যমে ফুটতে দেখছি। এই ধরণের প্রয়োগ দর্শকের চোখে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সুধীরবাবু যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে রবীন্দ্র-নৃত্যে কোনও বিশিষ্ট আঙ্গিক নেই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে নৃত্য-নাট্যের নৃত্যাংশের উপর কোনও উক্তিই যথাযথ হতে পারে না। নৃত্য-রূপের প্রয়োগ, শিল্পীর কর্তব্য বিশেষ। সেখানে যেমন কোনও নির্দেশ মানা শিল্পীর কাছে বন্ধন অন্য দিকে সংবাদ পৌঁছানোর তাগিদে শিল্পীকেও তৎপর হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যও এই নিয়মের ঊর্ধে নয়। মোটামুটিভাবে এই তত্ত্বমেনে নিয়ে সুধীরবাবু নৃত্যনাট্যে সঙ্গীত প্রয়োগের অংশটুকু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গানগুলির ভাব পর্যালোচনা ও নাট্য-যোজনায় সার্থকতা দেখিয়ে প্রবন্ধটি বিশেষ সুখপাঠ্য হয়েছে।

রাজ্যেশ্বরবাবুর প্রবন্ধ "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রূপকল্প" কিন্তু প্রয়োগ বৈচিত্রকে উপেক্ষা করেনি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে গঠন পারিপাট্যে ও সুর প্রসাধনের নৈপুণ্যে, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি করেছেন অনেক জায়গায়। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে পত্রালাপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে" গানটির

কাব্যিক আবেদন ফোটানোর বক্তব্যটুকুও দেখলুম স্বীকার করে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩৫
সালের "উত্তরসূরীর" তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়-লেখা শ্রীযুক্ত মিত্রেরই একটি প্রবন্ধের কথা ম
পড়ে গেল। শ্রীযুক্ত মিত্রের যে সমস্ত যুক্তি তখন রবীন্দ্রনাথের "সঙ্গীতের মুক্তি" প্রবন্ধের বক্তব্য
খণ্ডিত করেছিল এখন সেগুলিকেই তিনি খন্ডন করেছেন।

প্রবন্ধ গুচ্ছের মধ্যে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতি
প্রবন্ধটি আমাদের ভাল লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে বসে সাধারণতঃ গুণবাচক বিশেষ
গুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। লেখক কিন্তু প্রথমেই বলেছেন যে "রাজনীতি ছিল ত
দ্বিতীয় চিন্তা"। দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পরিচয়গুলি আলোচনা করেও মুক্তিকা
রবীন্দ্রনাথকে লেখক স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর মানুষের মুক্তি আকাঙ্খার চিন্তার ভে
দিয়ে।

এ ছাড়া, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যের লেখা রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত, শ্রীসুশ
চক্রবর্তীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা' ও শ্রীক্ষুদিরাম দাসের লেখা 'বৈয়াকরণ রবীন্দ্রন
পাঠ করে আমরা বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের চি
শিল্প ধারা' আমাদের ভাল লাগেনি। তাঁর অনুপ্রাস সম্বলিত ভাষা আলোচনার বিষয়বস্ত
অনুকূল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বৈশিষ্ট সম্পর্কে তাঁর উক্তি,—"আকস্মি
অপ্রচলিতের নূতনত্ব," "প্রচন্ড অগ্নুৎপাতের অভাবনীয়তা," "অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা"
"অপ্রচলিত, অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে দেখা" ইত্যাদির পৌনপুনিক বিবৃতি রবীন্দ্র-চিত্রক
একটি দিককে অহেতুক প্রাধান্য দিয়েছে।

বইখানির সঙ্কলন মোটামুটি সার্থক হয়েছে। জ্যাকেটসহ প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচয় দে

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 June '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।
টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক •৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১˙৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১˙৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি. পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক **রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা** এই ঠিকানায় **প্রচার অধিকর্তার** নিকট লিখুন

ভারতীয় মুদ্রনশিল্পে

একটি স্মরনীয় নাম

৬/এ এস্. এন্. ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

দশম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি

অমিয়কুমার মজুমদার

পৃথিবীর জন্মক্ষণের পর থেকে বহু সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত। সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে সূত্রপাত হয়েছে বিভিন্ন যুগের। হিন্দু পুরাণ মতে যে সব যুগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সংগে মিল নেই ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক যুগবর্ণনার। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী সবাই নিজেদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে এই সুদীর্ঘ অতীতকে চিহ্নিত করে গেছেন বিভিন্ন পন্থায়। রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র যুগ পরিচ্ছেদ ক্রমপর্যায়ে। পূর্বসূরীদের ধারা অনুসরণ করে বিংশ শতকের এই অধ্যায়কে অর্থাৎ যে কালে আমরা বিচরণ করছি, তাকে পারমাণবিক যুগ বলে অভিহিত করলে ন্যায়সংগত হবে বলেই ধারণা। কাল পরিমাপনের ফিতার দৈর্ঘ্য বাড়ালে আমরা সহজেই ১৯৪২-১৯৪৫ সালের অতীত দিনে ফিরে যেতে পারি। এ কথা অনস্বীকার্য যে বিগত মহাযুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল আরো সুদীর্ঘ হতে পারতো কিন্তু তার অবসান ঘটিয়েছে যে সব ঘটনাবলী তার মধ্যে অন্যতম পারমাণবিক বোমার আঘাতে নাগাসাকি ও হিরোসিমার আকস্মিক পতন। সেই হেতু ঐ সময় থেকে পারমাণবিক যুগের প্রারম্ভ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যদিও পরমাণুর শক্তি নিয়ে গবেষণা সুরু হয় ঊনবিংশ শতক থেকে। ১৯৪২ সাল থেকে পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তারই ঔরস থেকে নিপতিত হলো দানব-শিশু—পারমাণবিক অস্ত্র। মহীরাবণ-পুত্র অহিরাবণের মত শৈশবেই যে ভয়ংকর। এই শিশু লালিত হলো ক্ষমতামদমত্ত মানুষের স্নেহচ্ছায়ায়। আজ সেই শিশু বলবন্ত। যৌবনপ্রাপ্ত। বিভীষিকা সৃষ্টিকারী। ধ্বংসলীলা দিয়ে যার সুরু তার পরিণতি পৈশাচিক হবে এ কথা বলা বাহুল্য। মানুষের শুভবুদ্ধি ও অপবুদ্ধির সন্ধিস্থলে বিরাজ করছে আজকের পৃথিবী। পরমাণুর অত্যাশ্চর্য শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগ পৃথিবীর চেহারা সুন্দরতর করতে পারে, তাও অজানা নয় ক্ষমতালিপ্সু মানুষদের।

কথিত আছে প্রতি মানুষের অন্তরে আছে সৌন্দর্যবোধ। তবে ব্যক্তিভেদে তা বিভিন্ন এবং সৌন্দর্যানুভূতির সংগেই অংগাঙ্গিভাবে বর্তমান আনন্দবোধের সত্তা। কাহিনী আছে যে জর্মনদেরই তৈরী করা দু'টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল জাপানের বুকে। যারা নিক্ষেপ

করেছিল ঐ মারাত্মক অস্ত্র তারা যে আনন্দবোধ করেছিল তাতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। কালক্রমে এই অস্ত্রের উদ্ভাবন হলো রাশিয়াতেও। বৃটেন ও ফ্রান্সের নামও স্বল্প উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া ও আমেরিকা—এই দুই শক্তিশালী দেশ ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় যুগের সৃষ্টি করলো। পৃথিবীর মানুষের আয়ু, স্বাস্থ্য—এক কথায় সমগ্র জীবনের পরিধিকে হ্রস্বতর করে আনার পৈশাচিক পদ্ধতিতে যখন আনন্দবোধ করছে এই দুই শিবিরের কর্মকর্তার দল, এমনি এক নিদারুণ পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তির কামনায় অগ্রসর হলেন এক বিদগ্ধ, প্রবীণ আচার্য।

ইতিহাস বলে যুগে যুগে বিশ্বের গভীর সংকটাবর্তের প্রাক্কালে আত্মপ্রকাশ করেন চিন্তাশীল মনীষীরা। তাঁদের জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় বিশ্বের দরবারে। নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের প্রতি মমত্বহীন হয়ে তাঁরা আত্মনিয়োগ করে দশের স্বার্থে। প্রতি দেশে, প্রতি যুগে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। দেশের সংকীর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে ও কালের প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁরা সর্বজনীন। এ কথা সত্য যে এই শ্রেণীর মানুষেরা রাষ্ট্রনেতা হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তাঁদের শান্তি কামনার সদিচ্ছা ক্ষমতাপ্রয়াসীদের কাছে উপহসিত ও উপেক্ষিত। তথা-কথিত দেশনেতাদের কুলকোষ্ঠী ও অতিরঞ্জিত কর্মসাধনার সদম্ভ ইতিহাস বর্ণনার বিরতিক্ষণেও কখনো বিঘোষিত হয় না এঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা। উপরন্তু স্বীয় সরকারের গ্লানিকর ও মানববিরোধী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে সত্যভাষণে রাষ্ট্ররোষের অনলে কারারুদ্ধ হতে হয়, এমনকি জীবন্মৃত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করতে হয় এই সব শান্তিকামী মানুষদের যাঁদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ...", যাঁরা মনে করেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অমৃতের সন্তান এবং প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকবার অধিকার সমভাবে বিদ্যমান।

'ঊনবিংশ শতকের তৃতীয়াংশে এমনি এক মনীষীর আবির্ভাব ঘটে ইংলণ্ডে। তিনি লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল। ইংলণ্ডের অভিজাত মহলের অন্যতম তিনি। এ পরিচয় একমাত্র নয় তা বলা বাহুল্য। তিনি কেবলমাত্র প্রখ্যাত দার্শনিক নন, বিজ্ঞানীও। পাণ্ডিত্যের জগতে তাঁর কীর্তি কালোত্তর; তিনি সেখানে মহীয়ান, অম্লান জ্যোতিষ্কস্বরূপ কিন্তু এতেই তৃপ্ত নন এই ঊননবতি বর্ষের পলিতকেশ, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দার্শনিক। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের দাবীতে তিনি সক্রিয় আন্দোলনের কঠোর ভূমিতে অবতরণ করলেন দার্শনিকের স্বপ্নসৌধ থেকে—বৃটিশ আইন ভংগ করতে এগিয়ে এলেন রাসেল দম্পতী অন্যান্য জনদরদীদের সংগে নিয়ে। মানবতা-বিরোধী রাজনৈতিক আইন কারারুদ্ধ করলো তাঁদের। এ ঘটনা সাম্প্রতিক কালের।

এই চরম অবস্থার পূর্বে অনেককাল ধরে চলেছিল শান্তির প্রচেষ্টা। আইনষ্টাইনের জীবদ্দশাতেই তাঁকে সামনে রেখে অধ্যাপক রাসেল পৃথিবীর কল্যাণকামী বিজ্ঞানীদের নিয়ে বহু জনসভা করেছেন। যোগদানকারী প্রতিটি বিজ্ঞানীর কণ্ঠে উচ্চরবে নিন্দিত হয়েছিল পারমাণবিক সমরসজ্জা, এর বিষময় পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক্ উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট হয়ে-ছিলেন তাঁরা। কিন্তু জনতা শোনেনি। কতিপয় সংবাদপত্র ও অল্পসংখ্যক রাজনৈতিক দূরদ্রষ্টা ও মানবহিতৈষী এর যাথার্থ্য হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন। অবশেষে এল ১৯৫৭ সাল। মার্কিন বিমান তার দেশের নবাবিষ্কৃত হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে উড়ে গেল অনেক দূর, ঘটালো বিস্ফোরণ। এই সময়তেই চৈতন্য হলো বিশ্বের সাধারণ মানুষের। বৃটেনে, জর্মনীতে এবং অন্যান্য দেশে রব উঠলো এই সর্বনাশা অস্ত্র পরীক্ষা স্তব্ধ হোক। সত্যদ্রষ্টা রাসেলের আবেদন-নিবেদনকে যাঁরা বৃদ্ধের অলীক বিলাপ বলে উপহাস করেছিলেন, তাঁদেরই আর্তনাদে প্রকম্পিত হতে লাগলো ইথর-তরংগ। টেলিভিসনে, পত্র-পত্রিকায়, জনসভায় সরবে আলোচিত হতে থাকলো

মানব সমাজের শোচনীয় পরিণতির কথা।

অবশেষে ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে লণ্ডনের 'নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় দার্শনিক রাসেল এক খোলা চিঠি লিখলেন আইজেনহাওয়ার এবং ক্রুশেভের উদ্দেশ্যে। এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই দুই দেশের কর্ণধারেরা একমত হতে পারলেই বিশ্বে শান্তি সম্ভব, নতুবা—।

রাসেলের লিখিত এই পত্র এক ঐতিহাসিক দলিল। এই দুই শক্তিশালী দেশের নায়কদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বললেন যে, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের মত চিন্তাশীল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে এই গুরুতর বিষয়ে একমত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপনাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে অনেক বিষয়ে কিন্তু মনে হয় সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং এতে আপনাদের মতের সামঞ্জস্য ঘটবে আশা করা যায়। সবিনয়ে লর্ড রাসেল জানালেন যে কয়েকটি কথা তিনি বলতে সাগ্রহী যদিও তা এই দুই দেশের কর্ণধারগণ সম্পূর্ণরূপে জানেন।

(১) আমাদের বড়ো সমস্যা এই পৃথিবীতে মানুষ বাঁচবে কি করে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের বিরোধ ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে। এ কথা অতীব সত্য যে কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবে এবং তা কয়েক বছরের মধ্যেই। এর ফলে ধ্বংস অনিবার্য। পূর্ব এবং পশ্চিম দুই জগতেরই ক্ষমতামদে অন্ধ সমরনায়কেরা মনে করে থাকেন যে যুদ্ধই শান্তি আনয়নে সক্ষম, কারণ এক পক্ষের জয় সুনিশ্চিত। এই ধারণা শিশুসুলভ তাতে সন্দেহ নেই—বিশেষভাবে যে যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা উন্নতির সু-উচ্চ শিখরে। বর্তমান সময়ে যুদ্ধ সুরু হলে কোন বিশেষ পক্ষের জয়বার্তা ঘোষিত হবে না এ কথা সুনিশ্চিত। যুদ্ধের পরিণতি উভয় দেশেরই সমূল বিনাশ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, অতীতে যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্বজয়ের বাহুবলে বা নিজ আদর্শের দ্বারা, তাঁদের সকলেরই কল্পনা শোচনীয়ভাবে বিলীন হয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই, জর্মনীর হিটলার—এঁদের প্রত্যেকেরই ছিল গগনচুম্বী আশা। এঁদের পরিণতি সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এখন পর্যন্ত দুজন মনীষীর আদর্শবাদ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয় নি—তাঁরা হলেন "স্বাধীনতার ঘোষণা" বা 'Declaration of Independence' এবং কমিউনিষ্ট আদর্শবাদ বা 'কম্যু-নিষ্ট ম্যানেফেষ্টো'র রচয়িতাদ্বয়। তবে এ কথা স্থির যে এই আদর্শ দুটির কোনটিই বৌদ্ধ, খৃশ্চান, মুসলমান আদর্শের মত পৃথিবীকে প্লাবিত করতে পারে নি। অতএব বর্তমান পরি-স্থিতিতে একান্ত কাম্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বন্ধ করা।

(২) যদি ক্রমাগত হারে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষাকার্য চলতে থাকে তা'হলে পৃথিবীতে সন্ত্রাস রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। একদিন এমন ছিল যে কেবলমাত্র আমেরিকার হাতে এই অস্ত্র আছে। কিছু দিনের মধ্যে রাশিয়াও অধিকারী হলো। এর পর বৃটেন, ফ্রান্স। এমন একদিন আসবে যখন জর্মনী, জাপান, চীন কেউ পেছনে থাকবে না। ক্রমে এই অস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি সহজ এবং সুলভ হবে—তখন মিশর, ইস্রায়েল, দক্ষিণ আমেরিকা সকলেরই হাতে এই অস্ত্র এসে যাবে এবং প্রত্যেকেই ক্ষমতামদে মত্ত হয়ে বলবে 'আমার কথা শোন, না হয় মর।' এমতবস্থায় রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক চুক্তি না হলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এই দুই শক্তিমান রাষ্ট্রের এহেন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে হবে যে তাঁরা নিজেদের পরস্পরকে ছাড়া অন্য কোন দেশকে সমরোপকরণ বা আর্থিক সাহায্য দেবেন না।

(৩) যতদিন না পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের ভীতি অপনোদিত হয়, ততদিন এই শক্তিশালী

রাষ্ট্রদ্বয়ের অধিকাংশ ধন ও মানব-শক্তি নিয়োজিত হবে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উৎপাদনে। রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয় রাষ্ট্র যদি পারস্পরিক আক্রমণের অলীক ভীতিমুক্ত না হতে পারে তা'হলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর ফলে দুই দেশের সমরোপকরণ সঞ্চিত হতে থাকবে প্রচুর পরিমাণে, বিঘ্নিত হবে শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য মানবিক প্রচেষ্টা। পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে না সৎ-সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিল্প—শুধু থাকবে দ্বেষ, হিংসা ও সমরসজ্জা। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সূচনা করে কখনো এমন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়নি সমগ্র মানব-সমাজকে।

(৪) আপনারা উভয়েই অবশ্য আনন্দিত হবেন যদি কোন বিশেষ পন্থায় এই যুদ্ধ-ভীতির অবসান ঘটে। মনে হয় আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা যখন তারা গাছে থাকত তখনো এই ধরণের ভীতি ছিল না। ইতিপূর্বে কখনো তরুণ সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল স্বপ্ন নিঃসীম হতাশায় নিমগ্ন হয়নি। এর আগে কখনো কি এমন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যে সমগ্র মানবজাতি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে অগ্রসরমান? মানুষ মরণশীল—এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু একসংগে সমগ্র মানব-সমাজের নিশ্চিহ্নতা কি কল্পনাতীত বিভীষিকার সৃষ্টি করে না?

অথচ এই ভয়, আশঙ্কা, হতাশা ও অর্থব্যয়ের কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না—কারণ এ সবই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়েই যদি তাঁদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হন, যদি তাঁরা মনে করেন যে সকলের সংগে একত্রে বাঁচতে হবে, তা'হলে সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব। তা'বলে কেউ যদি মনে করেন যে এর মধ্যে বিভিন্ন দেশকে তাদের নিজস্ব আদর্শকে বলি দিতে হবে তা'হলে ভুল বোঝা হবে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বল-প্রয়োগে কোন দেশের উপর নিজের আদর্শ না চাপানো।

পত্রের উপসংহারে লর্ড রাসেল কাতরভাবে অনুরোধ জানান 'আপনারা উভয়ে মিলিত হয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনা করুন, সহ-অবস্থানের সর্তগুলি স্থির করে বিশ্বের অশান্তি দূরকরণে ব্রতী হোন। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা যদি তা পারেন তা'হলে পৃথিবীতে অকল্পিত সুখের দিন আসবে।'

এই পত্রের জবাব এল ক্রুশ্চেভের কাছ থেকে সর্বপ্রথম। তিনি স্বীকার করলেন যে বিশ্ব-যুদ্ধ সংঘটিত হলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে যাবে। তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন রাসেলের শুভ প্রচেষ্টাকে। এই সংগে সংগে তিনি ন্যাটো চুক্তির ত্রুটি দেখালেন এবং সমস্ত দোষ ক্যাপিটালিষ্ট দেশের উপর আরোপ করলেন। মুখরিত হলেন কমিউনিজমের গুণগানে। তবে তিনি এ কথাও সজোরে বললেন যে সোবিয়েৎ এবং আমেরিকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহাবস্থানের সর্তগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বললেন সোবিয়েৎ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করতে রাজী, তারা প্রস্তুত আমেরিকার সংগে আলোচনা চালাতে। কিন্তু মার্কিন নেতাদেরও অনুরূপ সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে রাশিয়া বা আমেরিকা এই দুইটি রাষ্ট্র একমত হলেই বিশ্বশান্তি ত্বরান্বিত হবে না। বৃটেনকেও এগিয়ে আসতে হবে। বৃটেনে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বিপজ্জনক তাও তিনি উল্লেখ করলেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ রাসেলকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "You are completely right, of course, when you say that one of the chief reasons for the present state of tension in international relations, and for all that is meant by cold war', is the abnormal character of the relations between the Soviet Union and the United States of America. The normalisation of these relations, on the rational basis of peaceful co-existence and respect for one another's rights and interests, would beyond a

doubt lead to a general improvement in the international situation" (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭)।

এর উত্তর দিলেন জন ফষ্টার ডালেস আইজেনহাওয়ারের পক্ষ থেকে। ১৯৫৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, "surely if we lived in a world of words, we could relax to the melody of Mr. Krushchev's lullaby....... It is necessary now, as it has always been necessary, to look behind words of individuals to find from their actions what their true purpose is." ডালেস সাহেব বললেন যে নিজ নিজ আদর্শ বিসর্জন না দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কৌতুকাবহ। কারণ, "The creed of the United States is based on moral law" এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, "I believe is a fact which no one can realistically dispute, that the Communist parties depend upon force and violence". তিনি ফিনল্যান্ড, পূর্ব-ইয়োরোপ, কোরিয়া, হাঙ্গারীতে সোবিয়েতের ভূমিকার কথা বললেন। মার্ক্স, লেনিন ও ষ্ট্যালিনের আদর্শের অজস্র ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তিনি লিখলেন রাশিয়া যুদ্ধের যে আশঙ্কা করে তা অমূলক। আমেরিকা কখনোই যুদ্ধ চায় না, তার প্রমাণও তারা দিয়েছে বহুবার। রাশিয়ার সদিচ্ছার জন্যেই শান্তি আসেনি। ডালেস পৃথিবীকে দুটি অংশে ভাগ করে বললেন, একটি হচ্ছে 'God's Kingdom' এবং অপরটি "Forces of Darkness"। বলাবাহুল্য ডালেস নিজেকে প্রথমটির রক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই তাঁর মতে শান্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলে, "it is necessary that at least that part of the Soviest Communist creed should be abandoned in order to achieve the peaceful result which is sought by Lord Russel and all other peace-loving people."

এর পরে ক্রুশ্চেভ সাহেব কেমন জবাব দেবেন তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ন'হাজার শব্দসম্বলিত এক লিপি পাঠালেন 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশার্থে। ডালেসের যুক্তিকে খন্ডন করে তিনি প্রশ্ন করলেন যে কমিউনিজমের জন্মের বহু পূর্বে ইউরোপে যে সব যুদ্ধ হয়েছে (যেমন গোলাপের যুদ্ধ, ক্রুসেডের যুদ্ধ) তার জন্যে দায়ী কে? তিনি যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে কমিউনিজম্ তো হিংসার পথে আসেই নি বরং 'but by the inevitable historical process of working-class revolt against capitalist dictatorship', ইদানীংকালে আলজিরিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশে যে বিপ্লব হচ্ছে তার কারণ কি? তিনি ক্ষোভের সংগে বললেন রাশিয়ার প্রতিটি সদিচ্ছাকে সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রোপাগান্ডা' বলে ধরে নিয়েছেন।

এই বাক্‌বিতন্ডার ফল শূণ্য। রাসেল শেষ প্রচেষ্টা নিলেন। তিনি বললেন ধরে নেওয়া যাক এই দুই বিবদমান দেশের কোন একটি অসৎ। কিন্তু সেই দেশটি কে তার খোঁজ না করে অন্যভাবে সমস্যার আসা উচিত। ক্রুশ্চেভের একটি কথা অনবদ্য যদিও কমিউনিজম সম্বন্ধে তাঁর অনেক অসম্ভব স্বপ্ন আছে। কথাটি হচ্ছে এই, "you know very well, Lord Russel, that modern armaments atomic and hydrogen bombs, will be exceptionally dangerous during a time of war not only for two warring states in terms of direct devastation and destruction of human beings; they will also be deadly for states wishing to stay aside from military co-operations, since the poisoned soil, air,

food etc., would become the source of terrible torments and the slow annihilation of million of people. There is in the world of to-day, an enormous quantity of atom and hydrogen bombs. According to Scientists' calculations, if they were all to be exploded simultaneously, the existence of almost every living thing on earth would be threatened".

ডালেসের পত্রে এ ধরণের কোন কথা না পাওয়া গেলেও এ কথা সত্যি যে তিনিও এই পরিণতির কথা বিশ্বাস করেন। রাসেল বললেন যে ক্রুশ্চেভের পত্রের মধ্যে আশার বাণী পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন "অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা কর্তব্য এবং কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এমন এক সম্মানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত যাতে আমাদের দেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না হয় এবং সেই সংগে বিভিন্ন দেশের শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে।"

ক্রুশ্চেভের এই আহ্বান পশ্চিম আন্তরিক মনে করে না। রাসেল যুক্তি দেখালেন যদি সত্যিই তারা আন্তরিক না হয় তা'হলে আলোচনার মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হবে, অতএব দ্বিধা কেন! এ কথা যেমন সত্যি যে ক্রুশ্চেভের কমিউনিজম সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি (রাসেলের মতে) মার্কিনদের কাছে বিরক্তিকর, তেমনি এও সত্যি যে ডালেসের "The creed of the United States is based on the tenents of moral law" সোবিয়েতের কাছে উষ্মার বস্তু। এহেন অবস্থায় দুটি দেশকেই ভুলে যেতে হবে অপর দেশ তার আদর্শ সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছে, অধিকন্তু ভবিষ্যতেও তাদের পরস্পরের উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

রাসেল তাঁর পত্রে লিখেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে আমেরিকা রাশিয়ার উপরে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে না, কিন্তু এ কথা বড়ই দুঃখের যে আমেরিকা স্বীকার করে না যে রাশিয়ারও ঐ সদিচ্ছা বর্তমান। অতএব স্নায়ু-যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা-লড়াই বা স্নায়ু-যুদ্ধ চলবে এবং পৃথিবীর এই দুই শিবিরে মানুষের মারণাস্ত্র স্তূপীকৃত হতে থাকবে।"

রাসেল তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থে লিখেছেন যে শান্তির প্রধান উপায় হচ্ছে কেনেডি ও ক্রুশ্চেভকে আলোচনার আসরে আসতে হবে এই মনে করে যে তাঁরা নির্দিষ্ট চুক্তিবন্ধ হবেনই, তা যত বাধা আসুক না কেন। কিন্তু বর্তমানের আলোচনার ধারাগুলি সৌখীন। তাঁরা যেন জেনেই আসেন যে কোন চুক্তিবন্ধ তাঁরা হবেন না। সম্মেলনের কক্ষে বক্তৃতার রোশনাই হবে। প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেবে বিশ্বময়। কথার ফুলঝুরিতে সমাপ্তি হবে অধিবেশনের।

রাসেল বলেন রাষ্ট্রসংঘ সংস্থাটি ত্রুটিপূর্ণ। তার কারণ একটি হচ্ছে এই যে অনেক রাষ্ট্র এর মধ্যে নেই, অপর কারণ এবং সে-টি বড় কারণ যে "ভেটো" প্রয়োগের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রসংঘ কখনোই প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে না, যদি না এই ভেটো প্রয়োগের ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তা হবার সম্ভাবনা কম, কারণ পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত রাষ্ট্রগুলি এর প্রধান সদস্য। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার কারণ দুটি। প্রথমটি—বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে তেজস্ক্রিয় কণিকারাশি। ফলে লিউকেমিয়া, ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে মানুষের প্রাণহানি হবে, বিকৃতদেহ মানুষের জন্ম হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে সব দেশ এখনও এই অস্ত্রের অধিকারী হয়নি তারা আর তা পাবে না। সেহেতু বিশ্বের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

কয়েক বছর আলোচনার পরে ক্রুশ্চেভ 'ত্রৈকা' প্রস্তাব পেশ করলেন। তাতে বলা হলো

তিনজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে একটি পরিদর্শকমণ্ডলী। একজন পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয়জন পশ্চিমাঞ্চলের এবং তৃতীয়জন নিরপেক্ষ দেশের। তিনি বললেন এ'দের সকলকে যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে একমত হতে হবে। এই প্রস্তাব পশ্চিমীদের এত ক্রোধান্বিত করে তুলল যে আলোচনার প্রসংগই বানচাল হয়ে গেল। ফলে দু'টি শক্তিই নিজের খুশীমত মারণাস্ত্র তৈরী করছেন।

শান্তির সন্ধান পেতে হলে তিনটি সর্ত মেনে চলতে হবে—

(১) পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা

(২) অন্যান্য দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত না করা। যেমন পূর্বাঞ্চল লালচীনকে শক্তিশালী করছেন বলে পশ্চিমীরা ধিক্কার দেন, আবার পশ্চিমীরা ফ্রান্স ও পশ্চিম জর্মনীকে সমরাস্ত্রে ভূষিত করছেন বলে পূর্বাঞ্চলের নিন্দাধ্বনি।

(৩) তৃতীয় সর্তটি হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত। এটি হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্রদের এমন প্রতিশ্রুতি-বন্ধ হতে হবে যে তাঁরা কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করবেন না।

এবার এল পরিদর্শনের পালা। সত্যিই অস্ত্র সংবরণ করা হয়েছে কিনা বা প্রস্তুতিকরণ চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে কি-না তার যাচাই করা। এ বিষয়ে ক্রুশ্চেভের মতামতকে রাসেল গুরুত্ব-পূর্ণভাবে বিচার করতে অনুরোধ করেছেন। পশ্চিমীরা বিশ্বাস করেন যে রাশিয়া তাঁদের নির্দেশ মত পরিদর্শনের ব্যাপারে রাজী হবে না। তাঁরা বলেছেন আগে পরিদর্শনের কাজ শেষ হোক, পরে অস্ত্র সংবরণের কথা ভাবা যাবে। আবার ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে প্রথমে অস্ত্র-সংবরণ করা হোক তারপরে পরিদর্শনের কাজ চলুক। বলা বাহুল্য পশ্চিম তাতে রাজী হয়নি। তাদের পক্ষে এই যুক্তি যে তারা অস্ত্র সংবরণের পরে যদি দেখতে পায় রাশিয়া বা পূর্বাঞ্চলের কাছে প্রচুর অস্ত্র মজুত আছে তা'হলে কোন আলোচনাই চলতে পারবে না। এ কথা বোধহয় ক্রুশ্চেভও জানতেন। যাইহোক, তিনি আরো একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যদি পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র বিনাদ্বিধায় এবং সম্পূর্ণরূপে পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণে ও চিরতরে প্রস্তুতিকরণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন তা'হলে পরিদর্শনের যে কোন সর্ত তিনি মেনে নিতে রাজী। ক্রুশ্চেভের এ প্রস্তাব ভালভাবে বিচার না করেই নাকচ করে দিলেন পশ্চিমের শক্তিবর্গ। মানবহিতৈষী ক্ষুব্ধ রাসেল বললেন, "This was a grievous error which would not have been committed if the west had genuinely desired disarmament. Instead of investigating Khrus-chev's proposal, the western powers put forward proposals of their own and thereby kept alive indefinitely the futile contest of argument and counter-argument".

অতএব শান্তির আশা নেই। উপরন্তু স্পুটনিক, লুনিক, ভ্যানগার্ড, এক্সপ্লোরার ইত্যাদির আবিষ্কার শান্তির ন্যূনতম আশা বিলুপ্ত করছে। মনে হয় এ কথা সত্যি—

'আজ হেরো, পশ্চিমদিগন্তে হোথা
ঝঞ্ঝা মেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা—
ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে....'

পৃথিবীর সমগ্র দেশের মানুষের সংকটকাল সমাসন্ন। জনদরদী দার্শনিক রাসেলের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয় কাতর আবেদন পৃথিবীর মানুষের কাছে 'আপনারা সবাই মিলিত হোন এই মহা-সমস্যার সমাধানকল্পে। আজ যদি পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা'হলে সমস্ত পৃথিবী চলে

যাবে ধ্বংসের কবলে—আমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে অতিকষ্টে বেঁচে থাকা আমাদেরই পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের দল বংশপরম্পরায় নাগাসাকি ও হিরোসিমার মানুষের মতো।

মানুষ যদি অবলুপ্ত হয়ে যায় এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে তা'হলে কি প্রয়োজন দোষী আর নির্দোষী বিচারের? এ কথা সত্য যে কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্টদের বিরোধের অবসান কখনোই হবে না কিন্তু এই মতান্তর যেন সমরে রূপান্তরিত না হয়। পারমাণিক অস্ত্র যদি আজ ধ্বংস করে ফেলা যায় তা'হলে প্রয়োজনবোধে আগামী কালই আবার নতুন করে তৈরী করা সম্ভব হবে। অতএব আমাদের কর্তব্য নতুন রাজনৈতিক নিয়মাবলীর উদ্ভাবন করা যাতে বড়ো যুদ্ধ আর কখনো না হয়। প্রতিটি দেশের, প্রতি রাজনৈতিক দলের, সমগ্র নর-নারী ও শিশুর কাছে এ এক নিদারুণ সমস্যা। আজ পৃথিবীর কল্যাণকামী মানুষেরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়, যদি দাবী করে শান্তির—তা'হলে জনতার দাবীর কাছে ক্রুশ্চেভ-কেনেডি মাথা নত করতে বাধ্য হবেন। তা না হলে আমাদের এই সুন্দরী পৃথিবী পরিণত হবে ঊষর মরুভূমি ও জনশূন্য কঙ্করময় প্রদেশে।'

চারদিকে হিংসা আর দ্বেষ; অবিশ্বাস আর দম্ভ। পৃথিবী উন্মত্ত, অধীর। নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে মত্ত শক্তিমানেরা, তমসাবিজড়িত তাঁদের বুদ্ধি। দূর হোক তাঁদের ভ্রান্তি। তাঁদের বিবেক তমসালুপ্ত, মলিনতামুক্ত হোক। জাগরিত হোক শুভবুদ্ধির সূর্য। বিবাদমান, কোলাহলে মুখরিত, আতঙ্কিত পৃথিবীর বুকে নেমে আসুক শান্তিধারা। মানবদরদী দার্শনিক রাসেলের বিশ্বশান্তির আবেদন শক্তিমানদের হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী হোক।

হোরেস হেম্যান্ উইল্‌সন্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

হোরেস হেম্যান উইল্‌সন্ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন নগরীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোহোস্কোয়ারে একটি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন ও পাঠ্যবহির্ভূত নানা বিষয় তিনি গৃহে বসিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। উইল্‌সনের এক নিকট আত্মীয় সরকারী টাঁকশালে কর্ম করিতেন, সুবিধা পাইলেই উইল্‌সন্ ইঁহার সহিত টাঁকশালে গিয়া টাঁকশালের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলি মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতেন। টাঁকশালের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে করিতে তিনি রসায়ন-শাস্ত্র, ধাতু-বিদ্যা, মুদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। উত্তরকালে টাঁকশালের এই অভিজ্ঞতা উইল্‌সনের সবিশেষ সহায়ক হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও উইল্‌সনের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয় নাই, কারণ পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁহার পিতার ছিল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থী হিসাবে সেণ্ট্ টমাস্ হস্‌পিটেলে প্রবিষ্ট হন। চারি বৎসর পর তিনি চিকিৎসক ব্যবসায়ের উপযুক্তবলিয়া বিবেচিত হন। এই বৎসরই তিনি ইণ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। বাঙ্গলা দেশ তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সৈন্যবাহিনীর সহিত ইংল্যাণ্ড হইতে তিনি জাহাজে করিয়া ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটায় জাহাজটির ভারতে পৌঁছিতে ছয় মাস সময় লাগে। এই সময়টুকু উইল্‌সন্ অবহেলায় নষ্ট করেন নাই, এই সময়ের মধ্যে তিনি জাহাজের একজন ভারতীয় সহযাত্রির সাহায্য লইয়া হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিয়া ফেলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে উইল্‌সন্ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসার পর তাঁহাকে পূর্বনির্ধারিত মত সামরিক চিকিৎসকের জীবিকা গ্রহণ করিতে হয় নাই। কলিকাতায় আসার অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতা টাঁকশালের সহকারী য়্যাসে মাষ্টারের শূন্য পদটি উইল্‌সন্ তাঁহার পূর্বার্জিত রসায়ন শাস্ত্র ও মুদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী জ্ঞানের জন্য সহজেই পাইয়া যান। এই সময় মিণ্টে (টাঁকশাল) উইল্‌সনের উপরিতন কর্মচারী ছিলেন ডাঃ জন লিডেন। লিডেন একজন ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে বিদেশীদের মধ্যে ভারতে ভারতবিদ্ হেনরী টমাস্ কোলব্রুকের পরেই তাঁহার স্থান ছিল। কলিকাতায় আসার পর সার উইলিয়ম জোন্সের জীবনী পাঠ করিয়া এবং তাঁহার কার্যাবলীর পরিচয় পাইয়া উইল্‌সন্ ভারত-বিদ্যা বিশেষভাবে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সম্ভবতঃ লিডেনের মাধ্যমে উইল্‌সনের সহিত কোলব্রুকের পরিচয় স্থাপিত হয়। কোলব্রুকের উৎসাহেও সহায়তায় মেধাবী ও অধ্যয়নানুরাগী উইল্‌সন্ অল্প দিনের মধ্যেই অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ফেলেন। উইল্‌সনের মেধা ও ভারত-বিদ্যানুরাগ কোলব্রুককে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নিজের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া উইল্‌সন্‌কে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক নির্বাচিত করেন। সার উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যুতে এই পদ শূণ্য হয়, কোলব্রুক স্বয়ং ছিলেন এই সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একাদিক্রমে উইল্‌সন্

এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। উইল্‌সনের অক্লান্ত সেবায় এশিয়াটিক সোসাইটির বহু উন্নতি সাধিত হয়। সোসাইটির বেসরকারী মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় উইল্‌সনের নয়টি সুলিখিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন্‌ যখন সোসাইটির সম্পাদক তখন তাঁহারই প্রস্তাবানুযায়ী সর্বপ্রথম কয়েকজন ভারতীয়কে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবৎ কোন ভারতীয়কেই সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, অবশ্য কোন ভারতীয়কে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না এরূপ কোন নিষেধ সোসাইটি কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় নাই। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে সার উইলিয়ম জোন্স ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যতে দেশীয়দের সদস্যভুক্ত করা হইবে কিনা তাহা নিষ্পত্তির ভার সোসাইটির উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উইলসন মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত মূল সংস্কৃত, স্বকৃত পদ্যানুবাদ ও টিকা টিপ্পনিসহ প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে কোন অনুবাদ কোন ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। উইল্‌সনের সরল ও স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদটি দেশে ও বিদেশে সবিশেষ আদৃত হয় (১) উইল্‌সন্‌কৃত মেঘদূত অনুবাদের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম ছয়টি পংক্তি হইতে এই অনুবাদ কতদূর উপাদেয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে ঃ—

> Where Ramagiri's shadowy woods extend
> And those pure streams when Sita bathed descend,
> Spailed of his glories, severed from his wife,
> A vanished Yaksha passed his lonely life,
> Doomed by Kuvera's anger to sustain
> Twelve tediums months of solitude and pain.

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন মিণ্টের য়্যাসে মাষ্টারের পদে উন্নীত হন, কিছু দিন পর তিনি ইহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। উইল্‌সনের কর্মদক্ষতা ও বিদ্যাবত্তা সরকারী মহলে এত দূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে গভর্ণমেণ্ট নিজ পদের দায়িত্বের উপরেও তাঁহার উপর অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পন করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী অনুরোধে বারানসীর সংস্কৃত কলেজ সংগঠনের ভার লইয়া উইলসন কিছুকাল বারানসীতে বাস করেন। সরকারী কার্যের সূত্রে বারানসীর সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসিয়া উইল্‌সন্‌ তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান পরিপুষ্ট করেন এবং এখানে অল্প দিন বাসের সুযোগে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান সংকলন ও প্রকাশ করিয়া উইল্‌সন্‌ বিদ্বৎ-সমাজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন(২)। গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য তাহার উপর এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালন ও সরকারী অনুরোধে সংস্কৃত শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি কর্তব্য পালনের পর এইরূপ সুবৃহৎ অভিধান সংকলন করিবার জন্য উইল্‌সনকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয় করা যায়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(১) Meghaduta—Sanskrit Text with Translation & Annotations Calcutta 1813, Reprinted in English—London, 1814, Reprinted with Sanskrit Text, London, 1843.

(২) Sanskrit English Dictionary—Calcutta, 1819, 1832; London, 1874.

রোট্-ব্যোট্লিঙ্কের (সেণ্ট্ পিটসবার্গ) জার্মান সংস্কৃত অভিধান প্রকাশের কাল পর্যন্ত (১৮৭৫) ইউরোপের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই অভিধানটিই ছিল সংস্কৃত ভাষা চর্চার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অভিধান।

ভারতে আসার কিছুকাল পরই বাঙলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় উইল্‌সন্ তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এদেশে শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে মহামতি ডেভিড্ হেয়ারের নাম চিরস্মরণীয়। শিক্ষা বিস্তারের কাজে ডেভিড হেয়ারের অন্যতম পরামর্শ-দাতা ও সহায়ক ছিলেন উইল্‌সন্ (দ্রষ্টব্য-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ পৃঃ ৪৯, ১৩৬২ সং—শিবনাথ শাস্ত্রী)।

বাঙলা দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উইল্‌সন্ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। প্রথম হইতেই কলেজটি তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথমে তিনি এই কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হন, পরে ইহার সম্পাদক বা সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশ শাসন করিলেও এ যাবৎ সরকারীভাবে এদেশের শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। দেশে যতটুকু শিক্ষা বিস্তার হইয়াছিল তাহা শুধু বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল। দেশীয় সমাজ-সংস্কারক ও ভারত হিতৈষী ইংরাজদের আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য়্যাক্ট গৃহীত হয়। ইহার ৪৩তম ধারায় ভারতে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই য়্যাক্ট পাশ হইবার দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয় (জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইনস্‌ট্রাকশন্)। অতঃপর ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ভার এই কমিটির হাতে দেওয়া হয়। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে, এইচ্, হ্যারিংটন এই কমিটির সভাপতি ও উইল্‌সন্ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পদাধিকার বলে উইল্‌সন্ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দুই বৎসর পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই কলেজ, হিন্দু কলেজ ও স্কুলসহ গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উইল্‌সন্ তাঁহার পরি-কল্পিত সংস্কৃত কলেজটিরও পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সনের "সিলেক্ট স্পেসিমেন্ অফ্ দি থিয়েটার অফ্ দি হিন্দুস" নামে বিখ্যাত পুস্তকটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় (৩)। এই পুস্তকের মুখবন্ধে ৭০টি পৃষ্ঠাতে উইল্‌সন্ হিন্দু-নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। বাকী অংশ-টুকুতে শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের বিক্রমোর্বশী, ভবভূতির উত্তর রামচরিত ও মালতী-মাধব; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী গদ্যানুবাদ এবং আরও ২৩টি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজে এই পুস্তকটি সবিশেষ আদৃত হয়, কারণ এই নাটকগুলি ইতিপূর্বে ইউরোপের কোন ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই এই অতি উপাদেয় পুস্তকটি জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। পরে এই ইংরাজী পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় বাসকালে টাঁকশালের য়্যাসে মাষ্টার ও সেক্রেটারী, পাব্লিক ইন্সট্রাকশান কমিটির

(৩) Select specimen of the theatre of the Hindus, 3 vols., Calcutta, 1827; In 2 vols., London, 1835.

সেক্রেটারী, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার সামাজিক জীবনে উইল্‌সন সাতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি নিজে সুগায়ক ও সু-অভিনেতা ছিলেন। ভিক্টোরীয় যুগের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর এক পৌত্রীকে উইলসন বিবাহ করেন। উইলসন বেশ ভালভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং বেশ ভাল বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিতেন এই জন্য উইল্‌সন্‌ অতি সহজেই বাঙ্গালী সমাজে "আপনার জন" বলিয়া গৃহীত হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ছাড়া হিন্দুস্থানী, তামিল প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষাতেও উইল্‌সন পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার চৌরঙ্গী থিয়েটারের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনায় ও উইলসনের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টায় প্রথম দেশীয় নাট্যশালা "হিন্দু থিয়েটার" স্থাপিত হয়। উইল্‌সেন প্রসন্নকুমারকে দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনে উৎসাহিত করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমারের শুঁড়া বেলিয়াঘাটার বাগান-বাড়ীতে হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। প্রথম রাত্রে উইলসন্‌ রচিত উত্তর-রামচরিতের অনুবাদ এবং ইংরাজী জুলিয়স্‌ সীজার নাটকের এক অংশ অভিনীত হয়। উইল্‌সন্‌ স্বয়ং এই অভিনয়ে অভিনেতা-দের নির্দেশ দান করেন (দ্রষ্টব্য—দি ইণ্ডিয়ান্‌ স্টেজ পৃঃ ২৭৮ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কর্নেল বোডেন নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারার্থে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই অর্থ হইতে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দানের জন্য একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উইলসনকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। বোডেন অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে উইল্‌সন্‌ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি হিন্দু কলেজের সেক্রেটারীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেওয়ান রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত-দেব প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু কলেজে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্‌কালে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ডেভিড্‌ হেয়ার, জেমস্‌ প্রিন্সেপ্‌ প্রভৃতির উপস্থিতিতে তাঁহাকে মানপত্র, রৌপ্যময় জলপাত্র প্রভৃতি দান করিয়া যথোচিত বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। [সমাচার দর্পণ, ৯ই জানুয়ারী, ১৮৩৩, পৃঃ ১৮—১৯ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (২)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতেও একটি সভায় উইল্‌সন্‌কে বিদায়সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

১৮৩৩-৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উইল্‌সন অক্সফোর্ডেই বাস করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উইল্‌ কিন্সের স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারিকের পদলাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর বোডেন অধ্যাপকের 'লেক্‌চার' দিবার সময়েই তিনি অক্সফোর্ডে আসিতেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সাংখ্যাদর্শনের মূল ও অনুবাদসহ একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৪)। ১৮40 খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত বিষ্ণু-পুরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় (৫) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে তিনিই প্রথম পুরাণ সম্বন্ধীয় আলোচনায় পদক্ষেপ করেন, বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদের ভূমিকায় এবং টিকা-টিপ্পনীগুলিতে তিনি পুরাণগুলি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডাঃ উইণ্ট্যার্‌নিট্‌স তাঁহার পুস্তকে উইল্‌সন্‌কেই পুরাণ সম্বন্ধীয়

---

(৪) Sankhya-Karika—Oxford, 1837.

(৫) Vishnu Purana—London, 1840.

ব্যাপক গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (হিষ্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচর্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উইলসনের কতকগুলি বক্তৃতা একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় (৬)।

মুদ্রাতত্ত্বের প্রতি উইলসনের আবাল্য অনুরাগ ছিল, কলিকাতা টাঁকশালের এককালীন ম্যাসে মাষ্টার ও সেক্রেটারী উইল্সন্ বোডেন অধ্যাপকরূপে ও তাঁহার এই প্রিয় বিষয়টির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের (প্রাচীন গান্ধার) প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭) ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজতরঙ্গিনীর (কলহন প্রণীত) উপর ভিত্তি করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (এশিয়াটিক রিসার্চেস্) প্রকাশিত কাশ্মীরের ইতিহাস নামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্যারিস হইতে প্রকাশিত হয়। আফগানিস্থানের প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কিত এই গবেষণা পুস্তকটিও উল্লিখিত ইতিহাস পুস্তকটির ন্যায় সবিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে উইলসনের "স্কেচ্ অফ দি রিলিজিয়স সেক্টস্ অফ্ দি হিন্দুস্" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৮) এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু ইতিপূর্বেই কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র "এশিয়াটিক রিসার্চেস্" পত্রিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দুইটি অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দুইখণ্ডে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" রচনা করেন (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৮৩)।

এই বৎসরই উইল্সন দণ্ডী বিরচিত "দশকুমার চরিত" নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকা পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কলিকাতা কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় তিনি দশকুমার চরিতের আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় এবং লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (ট্রানসক্সানস্) তিনি সংস্কৃত কাহিনীমূলক পুস্তকগুলির সম্বন্ধে গবেষণা মূলক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উইলসনের রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় (৯)।

ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ উইলসনের জীবনের এক বিরাট কীর্তি, সায়ন ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী উইল্সন এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের চারি খণ্ড ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, বাকী দুই খণ্ড উইলসনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল (১০)। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রচলিত রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত শব্দ-গুলির সূচি ও অর্থসহ একটি অভিধান উইলসন কর্তৃক সঙ্কলিত হয়, সরকারী অর্থে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)।

উইল্সেন লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন, দীর্ঘ-

(৬) Lectures on the Religions & Philosophical system of the Hindus, Oxford, 1840.

(৭) Ariana Antiqua - Antiquities of coins of Afganisthan, London, 1841.

(৮) Sketch of the Religions Sects of the Hindus, Calcutta, 1846.

(৯) Grammar of Sanskrit Language, Oxford, 1847.

(১০) Complete Translation of Rigveda in Six vols—, Vol. I—IV (1850-57), Vol. V. & VI published after 1860.

(১১) Glossary of Indian Revenue, Judicial and other useful terms in different languages of Indian, London, 1855

কাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫৮ নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক বা ডিরেক্টর ছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে অস্ত্রোপচারকালে উইলসন লণ্ডনে পরলোক গমন করেন। জীবদ্দশায় ইউরোপে এমনকি ভারতেও সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করেন যে, উইলসনের রচনাবলী প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগিদের চিরকাল ধরিয়া উদ্বুদ্ধ করিবে।

"In him the Society has lost a leader and an instructor whose place will be impossible immediately to supply, but we have this consolation that the store of knowledge accumulated by him in a life of literary labour extended to the full ordinary limits of intellectual power, will lessdie with him than with other ripe scholars similarly cut off at the maturity of their fame, for in the same degree as he was assiduous in acquisition, so was he bountiful in imparting fruits of his study, but he has left, in his invaluable works and publications, and in his contributions to the Journal of this and other societies of analogous aim, records that will remain for ever for the instruction of oriental students, and for the aid and guidance of all searchers in the mine of Asiatic lore". From Annual Report of the Royal Asiatic read at the 31st Anniversary Meeting of the Society held on 19th May, 1860.

উইলসন প্রত্যক্ষভাবে ভারত বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এমন কতকগুলি বিষয়ে ও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যের রচিত ৭খানি পুস্তক সম্পাদনা করেন। উইল্‌সনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী ও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া ১৮৬২ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাঃ আর, রংগ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বারটি সুবৃহৎ খণ্ডে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (১২)। অদ্যাবধি এই খণ্ডগুলি ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধীয় "বিশ্বকোষ" রূপে আদৃত হইয়া থাকে। উইল্‌সন বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫৪০ খানি বৈদিক ও সংস্কৃত পুঁথি অক্সফোর্ডের বোডলিয়েন পাঠাগারে দান করিয়া যান।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেও উইল্‌সন্‌ তাঁহার কলিকাতা বাসের স্মৃতি কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব সহযোগী, সুহৃৎ ও শিষ্যদের সহিত তাঁহার পত্রের আদান-প্রদান চলিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকারকে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

অমৃত মধুর কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ততোধিক মধুর, দেবভোগ্য বলিয়াই যেন ইহার নাম দেবভাষা। সংস্কৃতভাষার ভাষা মাধুর্যে আমরা বিদেশী হইয়াও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকি। যতদিন ভারতবর্ষ, বিন্ধ্য ও হিমাচল এবং গংগা ও গোদাবরী নদী বর্তমান থাকিবে ততদিন সংস্কৃত ভাষা জীবিত থাকিবে—

(১২) Works (H. H. Wilson) in 12 Vols. Published by Trubner & Co., London (1862-7-1).

"অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং কি ততোঽধিকম।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে॥
ন জানে বিদ্যতে কা সা সাদৃতাঽত্রৈব সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যয়া বৈদেশিকা বয়ম্॥
যাবদ্ ভারতবর্ষ স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"

উইল্সন্ ভারত-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে অগণিত কৃতী শিষ্যমন্ডলী রাখিয়া যান। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মনিয়ার উইলিয়মস্ ও ই. বি. কাউয়েলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোরেস হেমান্ উইলসন যখন কলিকাতায় টাঁকশালের য়্যাসে মাষ্টার তখন জেমস প্রিন্সেপ্ টাঁকশালে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। উইলসনই প্রিন্সেপকে ভারত-বিদ্যা চর্চায় দীক্ষা দান করেন। উত্তরকালে প্রিন্সেপ অশোক লিপির পাঠোদ্ধার ও অন্যান্য নানা কীর্তি দ্বারা পন্ডিত সমাজে স্মরণীয় হন। প্রিন্সেপের "এসেস্ অন ইন্ডিয়ান এণ্টিকুইটি" গ্রন্থটি উইল্সনের নামেই উৎসর্গীকৃত হয়।

উইল্সনের দীর্ঘকালীন সেবা ধন্য কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে তাঁহার একটি মনোরম তৈল চিত্র ও একটি সুন্দর মর্মর মূর্তি রক্ষিত আছে। যে সমস্ত ইংরাজী ভারত হিতৈষী হিসাবে স্মরণীয়—উইল্সন্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

অনুন্নত অর্থনীতির উৎস সন্ধানে

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

আধুনিককালে অর্থনীতির মাপ কাঠিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে আমরা অনুন্নত আখ্যা দিয়ে থাকি। অথচ এই দেশগুলির যদি আঠারো ও উনিশ শতকের ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করি তা'হলে দেখা যায়, উল্লিখিত দেশগুলির অনেক ক্ষেত্রেই সেদিন আধুনিককালিন অর্থনীতিক বিবর্তনের উপযোগী আয়োজন উপাদান প্রস্তুত ছিল। সেদিন এ সব দেশের অর্থনীতিক কাঠামোতে (যেমন ভারতবর্ষ) দেখা যায়, পরিপুষ্ট বণিক মূলধন যন্ত্রশিল্পগত মূলধনে রূপান্তর অপেক্ষারত। এই সব দেশের পক্ষে সেদিন প্রয়োজন ছিল এই মূলধনকে শিল্পায়নের কাজে লগ্নী করা এবং কোথাও কোথাও সে প্রচেষ্টা সুরুও হয়েছিল। আর একটি প্রয়োজন ছিল সেদিন: তা'হল, শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্রের। বণিক মূলধনের যন্ত্র শিল্পগত মূলধনে রূপান্তরের কাজ ব্যাপকভাবে সুরু হলে তার অন্তর্ভাগিদেই এই শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটত—য়ুরোপের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাই ঘটেছিল। কিন্তু সে অবকাশ আর এশিয়ার দেশগুলির কপালে জোটেনি। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলির যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতির শুভ-উদ্বোধনের সকল আয়োজন সেদিন সুসংগঠিত বণিক-মূলধনের দেশ য়ুরোপের আগমনে ব্যর্থ হয়ে গেল। সেদিন ইংলণ্ড-য়ুরোপের পরবর্তী যন্ত্র-শিল্পগত অর্থনীতির পত্তন ও বনিয়াদ গড়বার কাজে এরা ভারত প্রভৃতি দেশগুলির সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহার করেছে এবং এ দেশগুলিকে স্বদেশের শিল্প-পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ডিগ্‌বি সাহেব হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল পলাশীর যুদ্ধ থেকে ওয়াটার্লু যুদ্ধ পর্যন্ত কাল। এই সময় ভারত থেকে ইংলণ্ডে ৫০০,০০০,০০০, পাউন্ড থেকে ১০০,০০০,০০,০০ পাউন্ড পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া এই বিপুল সম্পদ য়ুরোপে অর্থনীতিক উদ্বৃত্তরূপে কাজ করেছে এবং এই অর্থনীতিক উদ্বৃত্ত ঐদেশে শিল্পায়নে লগ্নীকৃত হয়ে ক্রমাগত মূলধনে রূপান্তরিত হয়েছে। *অর্থাৎ যে আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত এ সব দেশের মাটীতে লগ্নীকৃত হয়ে মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বনিয়াদ গড়ে তুলতে পারত তা ইংলণ্ড-য়ুরোপে গিয়ে মূলধনে রূপ নিল। এ সব দেশের আর্থনীতিক অগ্রগতি সেদিন থেকে স্তব্ধই থেকে গেল।

ইতিহাসের এ সব কাহিনী বহু কথিত। বর্তমান প্রবন্ধে আর্থনীতিক উন্নয়ন-তত্ত্বের মাপকাঠিতে এ সব দেশে পরবর্তীকালে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তির অনুসৃত আর্থনীতিক কর্মপদ্ধতি ও এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির আর্থনীতিক অনুন্নতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত অর্থনীতির দেশগুলি পরবর্তীকালে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন বাগিচা-শিল্প, খনি ও তৈল প্রভৃতি শিল্পে অর্থলগ্নী করে। কিন্তু এই শিল্পায়ন কার্যক্রম এ সব দেশের আর্থনীতিক জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পরেনি। এই অর্থলগ্নীর প্রতিক্রিয়া য়ুরোপের প্রথমাবস্থায় মূলধন লগ্নীর প্রতিক্রিয়ার মত অনুকূল হয়ে ওঠেনি। এই সব শিল্পে মূলধন লগ্নীর যেটুকু শুভফল ঘটেছিল তা ঐ সময়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিক অগ্রগতির দিক দিয়ে শেষপর্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ এইধরণের শিল্পায়নের ফলে যে আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত ঘটেছিল, ঐ সময়কার দ্রুতহারে জন-

সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সেই উদ্ধৃত্তের আর শিল্পে পুনর্বিনিয়োগ সম্ভব হলনা। অথচ য়ুরোপে কিন্তু তা হয়নি। পশ্চিমের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে শিল্পায়নের সুরুতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির অবস্থা দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয়েছিল যার ফলে জন্মহার হ্রাস পায় এবং এবং তাতে আর্থনীতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে উল্লিখিত ধরণে শিল্পায়ন কর্মের ফলে যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছিল তা সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থনীতিক উদ্বৃত্তরূপ নিতে পারেনি। কারণ কি?

একথা আমরা জানি, যখন উপনিবেশিক শক্তিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সংস্পর্শে আসে তখন এসব দেশের জনসংখ্যা প্রাকৃতিক সম্পদের মাপকাঠিতে য়ুরোপের উপনিবেশিক শক্তির দেশগুলির জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল না। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় এশিয়ার অনেকদেশেই জনসংখ্যা অল্প ছিল এবং সেইদিক থেকে আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে অবস্থা এসব দেশে অনুকূলই ছিল বলা চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অনুসৃত "ল এন্ড অর্ডার" ব্যবস্থা ও বাগিচা, খনি, তৈল পেট্রোলিয়ম (পরবর্তী কালে) প্রভৃতি ১৯ শতকের একেবারে শেষ দিকে ভারতবর্ষ ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এত দ্রুতহারে ঘটল যে শিল্পায়নের কর্মপদ্ধতি না বদলিয়ে শুধুমাত্র বাগিচা, খনি, তৈল বা রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ঘটান সম্ভব না। অবশ্য সেদিনের বিদেশী শাসকবর্গের সে মাথা ব্যথা থাকবার কথা নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এমন হল?

জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের উপর শিল্পগত বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়া প্রধান ভাবে ঘটে মৃত্যুহার হ্রাসের মধ্য দিয়ে। যেহেতু এশিয়া-আফ্রিকায় আগন্তুক সুসংগঠিত বণিক ইংলন্ড য়ুরোপ স্বদেশের শিল্পে-বিপ্লবের ফলে রূপান্তরিত উপনিবেশিক শক্তির আকারে উপনিবেশগুলির বাগিচা বাণিজ্যপণ্য খনি ও তৈল প্রভৃতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে এবং উপনিবেশগুলিকে স্বদেশের শিল্পের বাজারে রূপান্তরের কাজে আগ্রহান্বিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করল, সেহেতু এই সব দেশে "ল এন্ড অর্ডার" ও উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পত্তনের দিকেও নজর দিতে হল। ফলে, জীবনে নিরাপত্তা আসায় এবং এসব দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ম্যালেরিয়া কলেরা, মহামারী, প্লেগ প্রভৃতি রোগ হ্রাস পাওয়ায় মৃত্যুহার কমতে থাকে। তাছাড়া, উন্নত পথঘাট প্রবর্তিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুহার হ্রাস পায় ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় মৃত্যুহার পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। শেষতঃ শিল্পে-বিনিয়োগের ফলে প্রথমাবস্থায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটায় পরিবার-বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। অথচ য়ুরোপে বা আমেরিকায় প্রথমাবস্থায় তা ঘটেনি। সেখানে শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্যের দরুণ, শিল্পায়নের সাথে সাথেই 'আরবানাইজেসন' অর্থাৎ নগরীকরণ ঘটেছিল। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যে ধরণের শিল্পলগ্নী ঘটেছে তাতে নগরীকরণ ঘটেনা এবং ঘটেওনি। তাই শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরীকরণের যে

* বিদেশী গবেষক লিখেছেন, "Indeed whatever may have been the fractional increase of western Europes National income derived from its overseas operations they multiplied the economic surplus at its disposal. What is more? The increament of the economic surplus appeared immediately in a concentrated form and came largely into the hands of capitalists who could use it for investment purpose.

The intensity of the boost to west Europe's development resulting from this "Exogenous" contribution to its capital accumulation can hardly exaggerated." (Political Economy of Growth-Paul Baran).

প্রতিক্রিয়া জন্মমৃত্যুহারের উপর ঘটে এবং যার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা সীমিত হয় ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে বিশেষধরণের শিল্পলগ্নীর ফলে সেই নগরীকরণ ঘটেনি। শুধুমাত্র খনি, বাগিচা, তৈল, প্রভৃতি শিল্পে মূলধন লগ্নী সীমিত থাকায় যে ধরণের শিল্পায়ন ঘটেছে তাতে নগরীকরণ ঘটেনা, তাই নগরীকরণ ভিত্তিক শিল্পায়নের ফলে য়ুরোপ-আমেরিকায় পরিবার-আকার যে ভাবে সীমিত হয়েছে এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে স্বভাবতঃই তা ঘটতে পারেনা। বরং মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ফলে উল্টো ফলটাই ঘটা স্বাভাবিক এবং তাই ঘটেছে।

এই বিভিন্নতা থেকে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে উপনিবেশিক শক্তিগুলির অনুসৃত আর্থনীতিক কর্মপদ্ধতির স্বরূপ প্রকাশ পায়। য়ুরোপে প্রাথমিক বিনিয়োগ কৃষি-উন্নয়ন খনিও রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল বটে কিন্তু এর সাথে সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশগুলিতে এই দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী শিল্পে বিকাশ ঘটাতে চায়নি। যে সব দেশে এই দুই শিল্পে দিশী সংগঠকের আবির্ভাব ঘটেছিল সেখানে প্রায় জোর করেই সেই প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে শিল্পে বিনিয়োগের সাথে সংযুক্ত সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী শিল্পের বিকাশ ঐসব দেশে না ঘটে উপনিবেশিক শক্তির দেশগুলির বড়বড় সহর আর রাজধানীতে ঘটেছে। ব্যাংক প্রভৃতি অর্থলগ্নী কারবার, যানবাহন সংগঠন ব্যবস্থা, মজুত কারবার, বীমা, শিল্পগত কাঁচামালের প্রসেসিং ইনডাষ্ট্রি প্রভৃতি শিল্প-কারবারের পত্তন ও প্রসার উপনিবেশগুলির বাইরেই ঘটেছে। যে শিল্পায়ন শুধুমাত্র কাঁচামাল তৈয়ারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাতে নগরীকরণ ঘটে না এবং এই ধরণের শিল্পকর্ম এই সব দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের একমাত্র জীবিকা কৃষি-জীবন-যাত্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েই অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে। এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারি: তা হল, এ সব দেশে মৃত্যুহার হ্রাসের সুরু থেকে জন্মহার হ্রাস সুরু হওয়ার মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে তা এই সব দেশের বিশেষ ধরণের নগরীকরণ পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন শিল্পায়ন কর্ম দ্বারা প্রভাবিত।

অনেকে বিষয়টিকে আবার অন্যভাবেও দেখেন। তাঁরা এই প্রভাবের কারণ হিসেবে নগরীকরণের উপর জোর না দিয়ে 'বিল্ট ইন টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস'-এর* উপর জোর দিয়েছেন। এই মতানুযায়ী যে সব দেশে এবং যে সময় থেকে যন্ত্রশিল্পগত অগ্রগতি সামাজিক জীবন কাঠামোয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব দেশে এই মুহূর্ত থেকেই শুধুমাত্র উৎপাদন ক্ষমতাই যে বৃদ্ধি পায় তা নয়, কিছু দিনের মধ্যেই সে সব সমাজে হ্রাসমান প্রজনতা দেখা দেবে। এশিয়া-আফ্রিকার সমাজে অনুসৃত শিল্পায়ন-পদ্ধতিতে এই ধরণের 'বিল্ট ইন টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস' রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। এই সব দেশে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি দিশী সমাজ-উদ্ভূত নয়, কাজেই কাজেই এই সব সমাজে এই ধরণের শিল্পায়নের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। এশিয়া-আফ্রিকার সেদিনের দেশী সমাজের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আধুনিক যন্ত্রগত উৎপাদন পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিল' এবং সাধারণ মানুষের অনুসৃত উৎপাদন-পদ্ধতি এতে একটুও পরিবর্তন হয়নি।

যে পদ্ধতিতে এ সব দেশে শিল্পায়ন ঘটেছে তাতে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এই সব দেশের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মকে শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র এই দুই ভাগে

* ডঃ ই· হেগেনের তত্ত্ব—Population and Economic Growth.

ভাগ করা যায়। শিল্পক্ষেত্র বলতে খাদ্যশস্য উৎপাদন হস্তচালিত শিল্প, অন্যান্য কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধরা চলে। শিল্পক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং এই সব শিল্পে উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলন ঘটে অপরিবর্তনীয় অনুপাতে ('ফিক্সড্ টেকনিক্যাল কো-এফিসিয়েন্ট') উভয় কারণেই এই সব উৎপাদন সংগঠনে বিনিয়োগের কর্মসংস্থানগত প্রভাব একই রকমের হয়, অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি সীমিত। অবশ্য পল্লী অঞ্চলে উৎপাদনের উপাদান সম্মিলন পরিবর্তনীয় অনুপাতে ঘটে অর্থাৎ উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলন-অনুপাতের ব্যাপক বিভিন্নতার সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব এ সব ক্ষেত্রে। এই সব অর্থনীতিতে উৎপাদনের দুইটি উপাদান একটি শ্রম এবং অপরটি: উন্নীত জমিসহ মূলধন: এবং অর্থনীতির দুটি পণ্য একটি রপ্তানীর জন্য শিল্পগত কাঁচামাল এবং অপরটি দেশের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য। এই সব অর্থনীতির বিকাশ ধারার প্রথম পর্যায়ে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানই প্রচুর বা স্বল্প কোনটাই হয় না। এই অবস্থায়, পূর্বে বলা হয়েছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে প্রজনন-বিস্ফোরণ ঘটে। ক্রমশঃ শিল্পক্ষেত্রে যে হারে মূলধন সংগঠিত হয় সে হারকে অতিক্রম করে যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; অপরদিকে এই সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে তুলনায় অপরিবর্তনীয়-উপাদান-সম্মিলনের ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় সে হারে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। শিল্পায়নের প্রথম প্রতিক্রিয়ার পর কর্মসংস্থান সুযোগ কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত ত হয়ই না বরং তুলনায় মোট কর্মসংস্থান হ্রাসের সম্ভাবনাই ঘটে। এই সব দেশের বিশেষ ধরণের শিল্পলগ্নীই এই জন্য দায়ী।

স্বভাবতঃই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে অপরক্ষেত্রে পল্লী-অর্থনীতিতে অর্থাৎ উপাদানের পরিবর্তনীয়-সম্মিলন-মূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবিকার অন্বেষণ করতে হয় এবং যত দীনই হোক, জমির আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম বটে! কৃষিতে মূলধনের যে পরিমাণ যোগান ঘটে থাকে তার অনুপাতে শ্রম উপাদান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেহেতু পল্লী অর্থনীতিতে উৎপাদন-উপাদান সম্মিলন পরিবর্তনীয় সেই হেতু উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমশঃই শ্রমনিবিড় ('লেবার ইনটেনসিভ) হয়ে ওঠে। প্রথমাবস্থায় কিছু দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভূমি ও শ্রমের অনুপাত স্থির রাখতে গিয়ে নতুন জমি কর্ষণভুক্ত করা হয়। কিন্তু যখন অন্যান্য ধরণের মূলধন একেবারেই পাওয়া যায় না তখন একটি পরিবার কর্তৃক ফলপ্রসূ কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তখন যেখানে যতদূর সম্ভব শ্রমনিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। এমন করে এই অর্থনীতি অবশেষে এমন এক অবস্থায় পৌঁছয় যেখানে অত্যধিক শ্রমনিবিড় পদ্ধতি অনুসরণের ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কোনরকমে জীবনধারণ-মানেরও নীচে নেমে যায়, এমনকি শূন্যেও পৌঁছয়। এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন-বেকারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এই অবস্থাতে স্বভাবতঃই কৃষকগোষ্ঠিও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনগুলির মূলধনের প্রান্তিক বিনিয়োগে অথবা শ্রম-সংরক্ষণ মূলক পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহ থাকে না এবং সে ক্ষমতাও এদের থাকে না। আর এমন কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা শ্রমের তুলনায় মূলধনের অনুপাত না বাড়িয়েও শ্রম-ঘণ্টা-প্রতি শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান যায়। আবার অন্যদিকে, গোষ্ঠি-হিসেবে শ্রমিকেরও উৎপাদন বাড়াবার তেমন কোন উদ্যম থাকে না; কেননা, শ্রমের যোগান ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কাজেই উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রমনিবিড়ই থেকে গেল এবং ফলে উৎপাদন-পদ্ধতিগত-মান, শ্রমঘণ্টা প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা ও আর্থিক, সামাজিক, কল্যাণমূলক কর্ম-পদ্ধতির মান নীচুই থেকে গেল। আবার যদি উৎপাদন-পদ্ধতিগত উন্নয়ন শুধু মূলধন-নিবিড় ক্ষেত্রেই ঘটে—তা'হলে কৃষি-অঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রবণতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে। আর বাস্তবে

তাই ঘটেছিল। গত দুই শতকে এই সব এশিয়া-আফ্রিকার দেশে কৃষিক্ষেত্রে এবং কুটীর ও হস্ত-চালিত অন্যান্য শিল্পে উৎপাদন-পদ্ধতিগত কোন উন্নয়ন ঘটেনি, অথচ খনি, বাগিচা, তৈল, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক মজুরীতে দক্ষ শ্রম নিয়োগ ঘটেছে; অর্থাৎ শ্রম হাল্কা মূলধন নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এর ফলে আবার এই শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সংকুচিত হয়েছে। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে পরিবর্তনীয় উপাদান সম্মিলনমূলক উৎপাদনক্ষেত্রেই নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবেই অনুন্নত অর্থনীতির দুষ্টচক্রের আবির্ভাব ঘটে এবং তার ফলাফল প্রসংগে পূর্বে বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এই সব অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। কেননা, এই সব অর্থনীতিতেও বৈদেশিক বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। তবে এ কথাও সত্যি, বহির্বাণিজ্যের ফলে এ সব দেশের আর্থনীতিক অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের সর্ত এ সব দেশের পক্ষে প্রতিকূল হওয়াই (যা' স্বাভাবিক) এর কারণ। একদিকে বাইরের উন্নত অর্থনীতির দেশের সাথে এ সব দেশের বাণিজ্যসর্তের প্রতিকূলতা অপর দিকে এই সব দেশের অভ্যন্তরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার একমাত্র জীবিকা কৃষি অর্থনীতির সাথে আমদানীকারক গোষ্ঠিসহ উন্নত শিল্পাঞ্চলের বাণিজ্য-সর্তের প্রতিকূলতা। এই সব দেশে শিল্প ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদন-পদ্ধতিগত উন্নয়নই ঘটে না, শিল্পক্ষেত্র কৃষি অর্থনীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ডঃ মিণ্ট এই সব অর্থনীতিতে তিন রকম একচেটিয়া শক্তির উদ্ভবের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

The backward peoples have to contend with three types of monopolistic forces! In their role as unskilled labour they have to fall the big foreign mining and plantation concerns who are monopolistic buyers of their labour; in their role as pleasant producers they have to face a small group of exporting and processing firms who are monopolistic buyers of their crops: and in their role as consumers of imported commodities they have to face the same types of firms who are the monopolistic sellers or distributors of these commodities."

অর্থাৎ অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে খনি ও বাগিচা শিল্পের বৈদেশিক মালিকের সম্মুখীন হতে হয় যারা তাদের পণ্যের একচেটিয়া ক্রেতা, আবার কৃষি-পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানী ও প্রসেসিং ফার্মের সম্মুখীন হয় যারা তাদের পণ্যের একচেটিয়া ক্রেতা; এবং তৃতীয়তঃ আমদানীকৃত পণ্যের ক্রেতা হিসেবে এই সব পণ্যের একচেটিয়া বিক্রেতাদের সম্মুখীন হতে হয়। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে এই সময় পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির মত একচেটিয়া শক্তির বিরুদ্ধে কোন সংঘশক্তি বা ব্যবস্থা যেমন সমবায় সংগঠন ও সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং গড়ে ওঠবার মত পরিবেশ ও 'বিজনেস্ লাইক্ বিহেবিয়ার' সেদিন এ সব দেশে সৃষ্টি হয়নি।

এ কথা বলেছি, এই সব দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে সামগ্রিকভাবে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটেনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে কোন অগ্রগতিই ঘটেনি। ১৯ ও ২০ শতকের প্রথম ভাগে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রপ্তানী বাণিজ্যের বেশ দ্রুত তালে উন্নতি ঘটেছে। এই সব দেশে রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলধন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। এই সব দেশে রপ্তানী-বাণিজ্যে নিয়োজিত বিদেশী ফার্মগুলি বিদেশ থেকে সহজেই সম্মান সর্তে মূলধন-ঋণ

সংগ্রহ করতে পারত। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, রপ্তানী-বাণিজ্যের অগ্রগতি অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে গুণিতক প্রতিক্রিয়া ('মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টস্') সৃষ্টি করল না কেন? অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারী সুফল ঘটল না কেন?

এর জন্য দায়ী শ্রম-যোগানের কয়েকটি অবস্থা।

প্রথমতঃ শ্রমের বিপুল যোগান ও স্বল্পমজুরী গ্রহণে শ্রমিকের সম্মতি এবং দ্বিতীয়তঃ সাধারণভাবে দক্ষ শ্রমিকের অভাবের দরুণ সংগঠকেরা উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম-সংগ্রহের বিষয়টিকে দুরূহ বলে মনে করেন। শ্রমিকের মজুরি যদিও অল্প তবু তাদের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় তা অল্প ছিল না।

অবশ্য সস্তা শ্রমিক-নিয়োগ নীতির পরিবর্তে অধিক মজুরীতে সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ-নীতি এবং শ্রমের পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে হলে বড় যন্ত্রপাতির আকারে "বিপুল ক্ষেত্রে শ্রমের উপযোগী কৃষি-সংগঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

এ সব দেশে আগন্তুক য়ুরোপীয় সংগঠকেরা একদিকে সুদক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক যোগানের প্রয়োজন হতে পারে এমন ধরণের বিনিয়োগ বিরোধীই ছিল; বরং সেক্ষেত্রে সহজ শ্রম নিবিড়-পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতীই ছিল তারা—যে পদ্ধতিতে উৎপাদন-হার অল্প এবং যাতে শ্রমিক-দের খুব সামান্য ট্রেইনিং না হলেও চলে এমন ধরণের বিনিয়োগের দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল। এদিকটা হল, বাগিচা, রপ্তানী প্রভৃতি শিল্পের কৃষির দিক। অপর দিকে, অর্থাৎ শিল্পের দিকে, যেখানে সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ এবং মূলধন-নিবিড়পদ্ধতি অনুসরণ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে অবশ্যই তারা উৎসাহী ছিল। একই বাগিচা শিল্পের ব্যাপারে আমরা দেখি খুব সামান্যই সাধারণ ট্রেণিংয়ের প্রয়োজন হয় এমন শ্রম ও ভূমি-নিবিড়পদ্ধতি সম্বলিত কৃষি-অংশের সাথে সুদক্ষ-শ্রমসহ মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি অনুসৃত উৎপাদনের প্রসেসিং অংশ সংযুক্ত। ডঃ মিণ্ট লিখেছেন।

"It is the intermediate kind of technique requiring fairly large numbers of workers in skilled occupation which were shunned by enterprenurs in under-developed countries."

এশিয়া-আফ্রিকার অর্থনীতিতে স্বদেশী ও বিদেশী ক্ষেত্রে অপ্রতিযোগীগোষ্ঠির অস্তিত্বের দরুণ আর্থনীতিক ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমিক পর্যায়ের অভাব ঘটে। তা'ছাড়া শিল্পের দিক দিয়ে বিশেষী করণের ফলে অধিকতর সক্রিয় আর্থনীতিক সুবিধে ঘটে, কারণ এতে মানুষের উপর কৃষি অপেক্ষা অধিকতর 'শিক্ষাগত' প্রভাব সৃষ্টি হয়।

এ কথা মানতেই হবে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে অনুসৃত শিল্পায়ন পদ্ধতি ও আন্তরিক বাণিজ্যের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতির পক্ষে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়; অথচ অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে বিশেষ ধরণের সীমিত শিল্পায়ন কর্মধারা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নতুন অভাব বৃদ্ধি করা ছাড়া শিক্ষাগত প্রভাব খুব সামান্যই সৃষ্টি করে। আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া কি কৃষি কি অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনপদ্ধতি ও সংগঠন এবং দক্ষতার দিক থেকে বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃষির বিশেষায়ণ ঘটে প্রাচীন পদ্ধতিতে পুরানো অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ফসল উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে।

পূর্বে বলেছি এ সব দেশে আর্থনীতিক ক্রিয়া-কর্ম, বাগিচা, খনি, তৈল প্রভৃতি শিল্প-ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও সৃষ্টি হয়। অগ্রসরমান অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান

অচলাবস্থা অথবা অবনতির সৃষ্টি করে। ক্ষীণ-ব্যাপক-প্রসারী-সুফলসম্বলিত নিম্নমান আর্থনীতিক অগ্রগতিতে বাজারের প্রতিযোগী শক্তিগুলির চক্রাকার প্রতিক্রিয়ার ফলে সব সময়ের জন্য অঞ্চলগত অসাম্য সৃষ্টির দিকে একটা প্রবণতা থাকে এবং এই প্রবণতা আপনা থেকেই আর্থনীতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। উন্নত দেশের অর্থনীতির উচ্চমান অগ্রগতি ব্যাপকপ্রসারী সুফলকে অবশ্যই শক্তিশালী করে এবং অঞ্চলগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণতাকে ব্যাহত করে। এর ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতি সংরক্ষিত হয়।

অনুন্নত অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গভীর 'ব্যাকওয়াশ' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির অর্থনীতিতে বর্তমান উৎপাদন-ধাঁচের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সত্যিকার তুলনামূলক সুবিধে অপেক্ষা 'ব্যাকওয়াশ' প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিস্ফুট। দেশী-শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত করবার উপনিবেশিক নীতি ও এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির প্রচলিত উৎপাদন ধাঁচ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। "The Cumulative Social Processes holding if down in stagnation—regression is there." (B. Higgins). চক্রাকার প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তন ধারার মধ্যেই উপনিবেশিক অর্থনীতি সুসংগঠিত ও পুষ্ট হয়।

অর্থাৎ এই সব অর্থনীতিতে শুধুমাত্র শিল্পায়নের মাধ্যমেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে না। মূলধন-নির্বিড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন কেন্দ্রীভূত হলে গত দু'শ বছর উপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাই স্থায়ী হবে। বৃহদায়তন ব্যাপকভাবে যন্ত্রীকৃত কৃষি-ব্যবস্থাসহ যথেষ্ট শিল্পায়ন যা কৃষিচ্যুত জনের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবে এমন যথেষ্ট পরিমাণ শিল্পায়ন নীতিই সেদিন এবং আজও টেক্-অফের একমাত্র গ্যারান্টী।

দুঃখবাদী দার্শনিক সোপেন্‌হাউঅ্যার

হরিপদ ঘোষাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে কয়েকজন দুঃখবাদী কবির জন্ম হয়। এ'রা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বাইরণ, ফ্রান্সের দি মুসেট, জার্মাণির হাইনে, ইতালির লিওপার্ডি, রাশিয়ার পুশ্‌কিন ও লারমটফ্‌, সুরশিল্প স্কুবার্ট, স্কুম্যান, চোপিন এবং এমনকি বিথোভেন, যিনি পরে নিজেকে আশাবাদী বলে মনে করতেন। এই সকল যুগ-প্রতিনিধি কবি এবং সুরশিল্পী ছাড়া একজন দুঃখবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর নাম সোপেনহাউঅ্যার্‌।

সোপেন্‌হাউঅ্যারের 'দি ওর্য়াল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া' নামক পুস্তকখানি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই যুগ ছিল 'পবিত্র' যুক্তির যুগ। তখন ওয়াটার্লুর যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। বিপ্লবের অগ্নি-নির্বাপিত হয়েছিল। বিপ্লবের সন্তান দূরবর্তী সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কর্সিকার রক্তপিপাসু ক্ষুদ্রকায় মানুষটির বিরাট ব্যক্তিত্বে একদিকে ইচ্ছাশক্তির মহিমা, অপর দিকে মৃত্যুর কাছে তার পরাজয় স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সোপেন্‌হাউঅ্যারের দার্শনিক চিন্তা ও নৈরাশ্যবাদ তারই একটি দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র। বুর্বোণরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল। নির্বাসিত সামন্তরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। হস্তচ্যুত জমিদারি পুনঃপ্রাপ্তির দাবী জানাল। আলেকজাণ্ডারের শান্তির আদর্শবাদ পরোক্ষ-ভাবে একটি সংঘের জন্ম দিল। সর্বত্র প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। গ্যেটে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এমন পরিপূর্ণ ধ্বংসের জগতে তরুণ নই।

সমগ্র ইয়োরোপ ধূল্যবলুণ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ সবল মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত। লক্ষ লক্ষ বিঘা কৃষিক্ষেত্র অবজ্ঞাত এবং মরুভূমিতে পরিণত। দেশবাসীর প্রয়োজনাতিরিক্ত সে অর্থে সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই যুদ্ধদানবের উদরের বিরাট গহ্বর পূরণে নিঃশেষিত হয়েছিল। তার পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে একেবারে গোড়া থেকে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হয়েছিল। ১৮০৪ সালে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ায় ভ্রমণকালে গ্রামগুলির বিশৃংখল ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা, কৃষকদের দুর্দশা ও দারিদ্র্য, শহরগুলির শোচনীয়তা দেখে সোপেন্‌হাউঅ্যার্‌ বিচলিত হয়েছিলেন। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর অভিযান এবং তার প্রতিরোধকারী সৈন্য দলের ফলাফল প্রত্যেক দেশের উপর ধ্বংসের ছাপ রেখে গিয়েছিল। তখন মস্কো ভস্মস্তূপে পরিণত। যুদ্ধবিজয়ী ইংল্যাণ্ডের কৃষককুল গমের মূল্য হ্রাসের জন্য দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত। সে দেশের নবগঠিত অনিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলির শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের অবারিত শোষণের ফলে দুর্দশা-গ্রস্ত। যুদ্ধ-অবসানের ফলে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। খাদ্যা-ভাবে মানুষ নদীর জল পান করে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির লজ্জা গোপন করত। আর কখনো জীবন এমন অর্থশূন্য হয়নি, নীচতায় এতো নিম্নস্তরে নেমে যায়নি।

সহস্র সহস্র আশাবাদী বীর বিপ্লবের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। ইয়োরোপের সকল দেশের যুবহৃদয় নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার আলোয় ও আশায় প্রাণধারণ করেছিল। বিপ্লবের সন্তানের নামে বিথোভেন তাঁর স্বরলিপি গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু সেই বিপ্লবের সন্তান এক্ষণে প্রতিক্রিয়ার জামাতার স্থান গ্রহণ করেছেন দেখে তিনি ঘৃণায় উৎসর্গ পত্রটি টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। তখনও অসংখ্য ব্যক্তি সেই আশায় যুদ্ধ করেছিল।

তখনও অসংখ্য মানুষ তার সাফল্যে আস্থা হারায়নি। কিন্তু এক্ষণে তার পরিণতি তারা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল ওয়াটারলু, সেণ্ট হেলেনা এবং ভিয়েনায়। তারা দেখেছিল অসহায় ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এমন একজন বুর্বোণ সম্রাটকে। তিনি কোন কিছু ভুলে যাননি। তাঁর কোন কিছু শিক্ষা হয়নি। মাত্র এক পুরুষের আশা ও চেষ্টার এমন ব্যর্থতা মনুষ্যজাতির ইতিহাসে অভাবনীয়, অশ্রুতপূর্ব।

মোহমুক্তি ও দুঃখভোগের ভিতর দরিদ্ররা বসে সান্ত্বনা খুঁজেছিল। উপর তলার অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। বৃহত্তর জীবনের ন্যায় ও সৌন্দর্যের ধারণা মানুষের দুঃখ দূর করে। তেমন কোন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই বিধ্বস্ত জগতকে দর্শন করতে তারা সমর্থ হয়নি। শয়তানের জয় হয়েছিল। মানুষের হৃদয়ের উপর নৈরাশ্যের ছায়াপাত হয়েছিল। ভলতেয়র ঝড়ের বীজ বপন করেছিলেন। সোপেনহাউঅর্ তার ফসল সংগ্রহ করলেন। দর্শনে ও ধর্মে অমংগলের সমস্যা স্পষ্ট দেখা দিল। মানুষের মূক মুখে সেই এক প্রশ্ন, হে ঈশ্বর আর কতকাল? কেন এই দুঃখ? এই সংশয়? যুক্তিবাদ ও নাস্তিক্যবুদ্ধির জন্য এই প্রায় সার্বিক দুঃখ ভোগ কি ভগবানের শাস্তি? অনুতপ্ত বিচারশীল ভ্রান্ত মানুষকে ঈশ্বর বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার জন্য কি এই দুর্ভোগ?

শ্লীগেল, নোভালিস, ডি, মুসেট এবং শ্যাটু ব্রিয়েণ্ড দুঃখভোগের পশ্চাতে ভগবৎ ইচ্ছাকে এই ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। সাদি, ওয়াড্স্ওয়ার্থ ও গোগল অমিতব্যয়ী পুত্রের মতো প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের শান্তিময় কোলে ফিরে এসেছিলেন। আবার অনেকে এই প্রশ্নের রূঢ় উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ইয়োরোপের এই বিশৃংখলা বিশ্বজগতের বিশৃংখলার প্রতি-ফলন মাত্র। বিধির বিধান এবং পরজগতে আশার কোন অস্তিত্ব নেই। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অন্ধ। পৃথিবীতে অমংগল আছে। বাইরণ, হাইনে, লারমনটাং এবং লিওপার্ডি এই ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এই ধরণের চিন্তা সোপেনহাউঅ্যর্ মনে উদয় হয়েছিল।

ইয়োরোপের এইরূপ পরিস্থিতির ভিতর ১৭৮৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সোপেন-হাউঅ্যর ডান্জিগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। কর্মদক্ষতা উগ্র-মেজাজ চারিত্রিক স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লোপের পর ডানজিগ ত্যাগ করে হামবুর্গে বাস স্থাপন করেন। আর্থারের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। ব্যবসা ও টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। পিতার ব্যবসায়ে সংযুক্ত থাকার ফলে জগৎ ও মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী, অশিষ্ট আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায়ীসুলভ দোষগুণে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। তিনি গজমোতি মিনারবিহারী দার্শনিক ছিলেন না। কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের তিনি ঘৃণা করতেন। ১৮০৫ সালে তাঁর বাবা আত্মহত্যা করেন। মস্তিষ্কবিকৃত অবস্থায় তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হয়।

সোপেনহাউঅ্যর্ বলেছিলেন, বাবার কাছ থেকে চরিত্র বা ইচ্ছাশক্তি এবং মার কাছ থেকে বুদ্ধিশক্তি লোক উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে। তাঁর মা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি সে যুগের জনপ্রিয় উপন্যাস লেখিকা ছিলেন। তাঁর হৃদয় যেমন সংবেদনশীল, তাঁর মেজাজ তেমনি রুক্ষ ছিল। নীরস গদ্যময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য-জীবন সুখকর হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অবাধ-প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠেন। এইরূপ জীবনের পক্ষে অনুকূল স্থান উইমারে এসে তিনি বাস করেন। মার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি পৃথক থাকতেন। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। গ্যেটে তাঁর মা'কে বলেছিলেন, তাঁর প্রতিভাবান পুত্র ভবিষ্যতে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। এক পরিবারে দু'জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির কথা তাঁর মা কোন দিন শোনেন নি। একদিন মাতাপুত্রের মধ্যে

কলহ চরমে ওঠে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে মা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দেন। চিরবিদায় নেওয়ার সময় সোপেনহাউঅ্যর্‌ বলে গেলেন, এমন একদিন আসবে যখন তুমি আমার নামে পরিচিত হবে। এই ঘটনার পর তাঁর মা আরও চব্বিশ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু আর কোন দিন মা'র সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

সোপেন্‌হাউঅ্যরের মতো ১৭৮৮ সালে বায়রণেরও জন্ম হয়। সোপেন্‌হাউঅ্যরের মতো বায়রণেরও এই দুর্ভাগ্য ঘটে। ঘটনাচক্রে এ'রা দু'জনই নৈরাশ্যবাদী হয়েছিলেন। মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, মাতার ঘৃণায় অভিশপ্ত সন্তান হতভাগ্য। তার কাছে পৃথিবীর কোন আকর্ষণ নেই। তার পক্ষে পৃথিবীকে ভালোবাসার কোন কারণ থাকে না। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত নানা বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চার করলেন। তিনি প্রেমকে বিদ্রূপ করেছিলেন। পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। ফলে তাঁর চরিত্র ও দর্শনের উপর তার প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তিনি সকলকে ঘৃণা ও সন্দেহ করতে লাগলেন। কাল্পনিক বিবাদের আশঙ্কায় তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। চুরি হয়ে যাওয়ায় ভয়ে তিনি তামাক খাওয়ার নলটি তালাবন্ধ করে রাখতেন। পাছে নাপিত তাঁর গলা কেটে দেয়, এই ভয়ে তার কাছে দাড়ি কামাতেন না। চোরের ভয়ে বিছানার নীচে পিস্তল রেখে নিদ্রা যেতেন। গোলমাল সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, শব্দ প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে একটা অত্যাচার। ধাক্কা, হাতুড়ি-পেটা, জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল।

তাঁর মা ছিল না। পত্নী ও সন্তান ছিল না। পরিবার ও দেশ ছিল না। তিনি ছিলেন একক, নিঃসঙ্গ, বন্ধুবান্ধবহীন। গ্যেটের মতো তাঁর মনে উগ্র জাতীয়তাবোধ ছিল না। ১৮১৯ সালে ফিকেট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত হন। সোপেনহাউর তাতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য, এমনকি অস্ত্র-শস্ত্র পর্যন্ত ক্রয় করে, ফেলেন। কিন্তু যথাসময়ে সুবুদ্ধির উদয় হয়। তিনি বলেছিলেন, দুর্বল মানুষ জীবনভোগের স্বাভাবিক তৃষ্ণা অনুভব করে কিন্তু তাকে জোর করে চেপে রাখে। নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে সেই তৃষ্ণা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। তিনি গ্রামের শান্ত পরিবেশে ফিরে গেলেন। দর্শনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ উপাধি লাভের জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

তারপর 'দি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া' নামক তাঁর শ্রেষ্ঠ মানস-সন্তানের জন্ম হয়। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সুপরিচিত চিন্তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। এর ভেতর মৌলিক-চিন্তা সুসংবদ্ধ আকারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমার পুস্তকখানি পরবর্তীকালে শত শত পুস্তক রচনার উৎস হয়ে উঠবে। তাঁর উক্তি দম্ভপূর্ণ হলেও খাঁটি সত্য। দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর আংটির শীলমোহরের উপর অতল গহ্বরে উৎক্ষিপ্ত ফিনিক্সের মূর্তি খোদাই করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। ফিনিক্স নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে দিন তার দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, সেদিন সে নিজেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।

তাঁর পুস্তক কোন ব্যক্তির মনযোগ আকর্ষণ করেনি। নিজেদের দৈন্য এবং অবসাদের কথা পাঠ করার মতো ধৈর্য ও মানসিক অবস্থা কারোর ছিল না। পুস্তক প্রকাশের ষোল বৎসর পরে তিনি শুনলেন যে প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ পুস্তক বাজে কাগজ হিসেবে বিক্রী হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তকের শোচনীয় পরিণতি তাঁর গর্বে আঘাত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, মানুষ যে পরিমাণে মনুষ্য জাতির সম্পত্তি, সে সেই অনুপাতে সমকালীনদের নিকট অপরিচিত। অধিকাংশ শ্রোতা বধির হলে তাদের ভেতর দু-একজনের প্রশংসা গায়কের গৌরবের বিষয় হয় না।

দু-চারটি লোক উৎকোচ নিয়ে অতি নিকৃষ্ট অভিনেতার অভিনয়ের তারিফ করলে সে কি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়? অনেকের পক্ষে আত্মগরিমা সুনামের অভাব পূর্ণ করে। আবার কারোর পক্ষে উদার সহযোগিতায় জনক হয়।

এই পুস্তক তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। পরবর্তী রচনাগুলি এর ভাষ্য মাত্র। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলি প্রবন্ধাবলী নামে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ বিনামূল্যে দশখানি বই তাঁর হাতে এসেছিল। এই অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে আশাবাদী হওয়া সম্ভব হয় না।

১৮২২ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁকে আহ্বান করল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেগেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট যে সময় বক্তৃতা দিতেন, সোপেন্‌হাউআর্‌ও সেই সময়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর সামনের বেঞ্চগুলি শূন্য পড়েছিল। বীতশ্রদ্ধ ও ভগ্নমনোরথ হয়ে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। হেগেলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। ১৮৩১ সালে বার্লিনে কলেরা মহামারীতে হেগেল পরলোকগমন করেন। সোপেন-- হাউঅর্‌ ফ্রাঙফোর্টে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন এবং সেই স্থানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি অতিবাহিত করেন। বুদ্ধিমান নৈরাশ্যবাদীর মতো তিনি লেখনী সাহায্যে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করার আশা ত্যাগ করে পিতার সম্পত্তির সামান্য আয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি হোটেলের দু'খানি ঘর ভাড়া নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে বাস করতে থাকেন। একটি দীর্ঘ শ্বেতলোমযুক্ত কুকুর তাঁর সঙ্গী ছিল। তিনি তাঁর 'আত্মা' নাম দিয়ে-ছিলেন।। সহরের দুষ্ট ছেলেরা তাঁকে 'ছোট সোপেন্‌হাউঅ্যর্‌' নামে ডাকত। প্রত্যেক বার ভোজনের সময় তিনি টেবিলের উপর একখানি মোহর রাখতেন। খাওয়ার শেষে মোহরখানি নিজের পকেটে রেখে দিতেন। হোটেলের পরিচারক তাঁর এইরূপ কার্যের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ কর্মচারিরা যখন ঘোড়া, মেয়েমানুষ বা কুকুর ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করবে তখন আমি এই মোহরটি দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষার বাক্সে দিয়ে দেব।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্থান হয়নি বা তাঁর পুস্তক গৃহীত হয়নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে উচ্চতর দর্শনের জন্ম হয়, তাঁর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। মতবিরোধের জন্য জার্মান পণ্ডিতরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ধৈর্য হারাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিলম্ব হলেও একদিন না একদিন তাঁর মতবাদ সাদরে গৃহীত হবে। ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাঁর দর্শনে অধ্যাত্মশাস্ত্রের দুর্বোধ্য ভাষা কচকচানির স্থানে বাস্তব-জীবনের ঘটনাবলীর একটা বিচারসম্মত সমীক্ষার সন্ধান পেয়েছিল। ১৮১৫ সালে ইয়োরোপের জনমনে যে নৈরাশ্য ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল, তাহাই সোপেন-হাউঅ্যরের দর্শনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ জন্য তারা ১৮৪৮ সালের আদর্শবাদে আস্থা হারিয়ে তাঁর মতবাদকে আনন্দে ও সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ। জনপ্রিয়তা ভোগ করার বয়স ছিল না তাঁর। তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করতেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আলোচনা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করতেন। এমনকি ডাক টিকিট পাঠিয়ে দিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। ১৮৫৮ সালে তাঁর সপ্ততিতম জন্ম-দিবসে বিভিন্ন দেশের লোক শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১শে মে একাকী প্রাতরাশ শেষ করার একঘণ্টা পরে চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ হোটেলের বাড়িওয়ালির চোখে পড়েছিল।

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
আদিত্য	মালঞ্চ		দ্বাদশ
আদ্যনাথ	গল্পগুচ্ছ	স্বর্ণমৃগ	সপ্তদশ
আদ্যানাথ	হাস্য-কৌতুক	আশ্রমপীড়া	ষষ্ঠ
আনন্দ	চণ্ডালিকা		পঞ্চবিংশ
আনন্দী বোষ্টমী	গল্পগুচ্ছ	বোষ্টমী	ত্রয়োবিংশ
আনন্দময়ী	গোরা		ষষ্ঠ
আমিনা	গল্পগুচ্ছ	দালিয়া	ষোড়শ
আশা	চোখের বালি		তৃতীয়
আশু	গল্পগুচ্ছ	গিন্নী	পঞ্চদশ
আশু	ব্যঙ্গ-কৌতুক	বশীকরণ	সপ্তম
ইচ্ছাটা করুন	গল্পগুচ্ছ	ইচ্ছা পূরণ	বিংশ
ইন্দুমতী	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও উনবিংশ
ইন্দ্র	ব্যঙ্গ কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
ইন্দ্রাণী	গল্পগুচ্ছ	প্রতিহিংসা	বিংশ
ইন্দ্র কিশোর	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
ইন্দ্রকুমার	মুকুট (নাটক) ঐ (গল্প)		অষ্টম ও চতুর্দশ
ইন্দ্রনাথ	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
ইলা	রাজা ও রানী		প্রথম
ঈশা খাঁ	মুকুট (নাটক) ঐ (গল্প)		অষ্টম ও চতুর্দশ
ঈশান	বৈকুণ্ঠের খাতা		চতুর্থ
ঈশান মজুমদার	গল্পগুচ্ছ	সমাপ্তি	অষ্টাদশ
উগ্রসেন	মালিনী		চতুর্থ
উত্তীয়	শ্যামা		পঞ্চবিংশ
উদয়	ব্যাঙ্গ-কৌতুক	বিনি পয়সার ভোজ	সপ্তম

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
উদয়নারায়ণ	গল্পগুচ্ছ	জয়-পরাজয়	সপ্তদশ
উদয়াদিত্য	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট		
	পরিত্রাণ (নাটক)		বিংশ
	ও		নবম
	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)		
উদ্ধব	মুক্তধারা		চতুর্দশ
উদ্ধব দত্ত	গল্পগুচ্ছ	ভাই ফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
উপানন্দ	শারদোৎসব		সপ্তম
	ও		ও
	ঋণ শোধ		দশম
উপাচার্য	অচলায়তন		একাদশ
	ও		
	গুরু		ত্রয়োদশ
উপাধ্যায়	ঐ		ঐ
উপালি	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
উপেন	গল্পগুচ্ছ	দিদি	উনবিংশ
উমা	ঐ	খাতা	অষ্টাদশ
উমাপতি	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
উমেশ	হাস্য-কৌতুক	গুরুবাক্য	ষষ্ঠ
উমেশ	নৌকাডুবি		পঞ্চম
উৎপলপর্ণা	নটীরপূজা		অষ্টাদশ
এলা	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
ওলাবিবি	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
কঙ্কর	মুক্তধারা		চতুর্দশ
কনক মঞ্জরী	গল্পগুচ্ছ	খাতা	অষ্টাদশ
কবিশেখর	ফাল্গুণী		দ্বাদশ
কমলমুখী	গোড়ায় গলদ		তৃতীয় ও
	ও শেষরক্ষা		উনবিংশ
কমলা	গল্পগুচ্ছ	প্রায়শ্চিত্ত	ঐ
কমলা	ঐ	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	দ্বাবিংশ
কমলা	নৌকাডুবি		পঞ্চম
কমলাদেবী	মুকুট (নাটক)		অষ্টম ও
	ঐ (গল্প)		চতুর্দশ
কমলিকা	শাপমোচন		দ্বাবিংশ
করিম খাঁ	গল্পগুচ্ছ	ক্ষুধিত পাষাণ	বিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
কলিকা	ঐ	সংস্কার	চতুর্বিংশ
কল্যাণমাণিক্য	মুকুট (নাটক)		অষ্টম
কল্যাণী	গল্পগুচ্ছ	অপরিচিতা	ত্রয়োবিংশ
কাঙালী	হাস্য-কৌতুক	খ্যাতির বিড়ম্বনা	ষষ্ঠ
কার্তিক	ঐ	গুরুবাক্য	ঐ
কাদম্বিনী	গল্পগুচ্ছ	জীবিত ও মৃত	সপ্তদশ
কানাই	ঐ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ
কানাই	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্তী	ষষ্ঠ
কানাই	ঐ	অন্ত্যেষ্টি-সৎকার	ঐ
কানাই গুপ্ত	চার-অধ্যায়		ত্রয়োদশ
কানাই পাল	গল্পগুচ্ছ	তারাপ্রসন্নের কীর্তি	পঞ্চদশ
কান্তিচন্দ্র	ঐ	শুভদৃষ্টি	দ্বাবিংশ
কালাচাঁদ	হাস্য-কৌতুক	ছাত্রের পরীক্ষা	ষষ্ঠ
কালিন্দী	তপতী		একবিংশ
কালীপদ	গল্পগুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
কালীপ্রসন্ন	ঐ	দিদি	উনবিংশ
কালু	যোগাযোগ		নবম
কাশীশ্বরী	গল্পগুচ্ছ	পাত্র ও পাত্রী	ত্রয়োবিংশ
কাশ্যপ	মালিনী		চতুর্থ
কিরণবালা	গল্পগুচ্ছ	অধ্যাপক	একবিংশ
কিরণময়ী	ঐ	আপদ	উনবিংশ
কিরণলেখা	ঐ	হালদারগোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
কিরণলেখা	ঐ	রাজটিকা	একবিংশ
কিশোর	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
কুঞ্জবিহারী	হাস্য-কৌতুক	ভাব ও অভাব	ষষ্ঠ
কুঞ্জলাল	তপতী		একবিংশ
কুন্দন	মুক্তধারা		চতুর্দশ
কুমার	মায়ার খেলা		প্রথম
কুমার মুখুজ্যে	শেষের কবিতা		দশম
কুমারসেন	রাজা ও রানী		প্রথম
			ও
	তপতী (নাটক)		একাদশ
কুমু	গল্পগুচ্ছ	দৃষ্টিদান	একবিংশ
কুমুদিনী	যোগাযোগ		নবম

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
কুম্ভ	অরূপরতন ও রাজা		ত্রয়োদশ ও দশম
কুসুম	গল্পগুচ্ছ	ঠাকুরদা	বিংশ
কুসুম	ঐ	ত্যাগ	সপ্তদশ
কুসুম	ঐ	পুত্রযজ্ঞ	একবিংশ
কুসুম	ঐ	ঘাটের কথা	চতুর্দশ
কুড়ানি	ঐ	মাল্যদান	দ্বাবিংশ
কৃষ্ণকিশোর	হাস্য কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
কৃষ্ণগোপাল সরকার	গল্পগুচ্ছ	সমস্যাপূরণ	অষ্টাদশ
কৃষ্ণদয়াল	গোরা		ষষ্ঠ
কেতকী মিত্র (কেটী মিত্তির)	শেষের কবিতা		দশম
কেদার	বৈকুন্ঠের খাতা		চতুর্থ
কেদারেশ্বর	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
কেনারাম গোঁসাই	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
কেবল রাম	হাস্য-কৌতুক	সূক্ষ্ম বিচার	ষষ্ঠ
কেশরলাল	গল্পগুচ্ছ	দুরাশা	একবিংশ
কৈলাস	গোরা		ষষ্ঠ
কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী	গল্পগুচ্ছ	ঠাকুরদা	বিংশ
কৌণ্ডিল্য	অরূপরতন ও রাজা		ত্রয়োদশ ও দশম
ক্ষান্তমণি	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও উনবিংশ
ক্ষিতীশ	বাঁশরী		চতুর্বিংশ
ক্ষীরোদা	গল্পগুচ্ছ	বিচারক	উনবিংশ
ক্ষেমকংর	মালিনী		চতুর্থ
ক্ষেমংকরী	নৌকাডুবি		পঞ্চম
ক্ষেমা	যোগাযোগ		নবম
খগেন্দ্র	হাস্য কৌতুক	গুরুবাক্য	ষষ্ঠ
খড়্গসিংহ	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
গদাই	শেষরক্ষা		উনবিংশ
গণেশ	হাস্য-কৌতুক	আশ্রমপীড়া	ষষ্ঠ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
গণেশ সর্দার	মুক্তধারা		চতুর্দশ
গিরিবালা	গল্পগুচ্ছ	মেঘ ও রৌদ্র	উনবিংশ
গিরিবালা	ঐ	মানভঞ্জন	বিংশ
গিরীন্দ্র	ঐ	সংস্কার	চতুর্বিংশ
গিরীশ বসু		উলুখড়ের বিপদ	দ্বাবিংশ
গুণবতী	বিসর্জন		দ্বিতীয়
গুরুচরণ	গল্পগুচ্ছ	রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	পঞ্চদশ
গুরুদয়াল	ঐ	পুত্রযজ্ঞ	একবিংশ
গুরুদাস	চিরকুমার সভা		ষোড়শ
গোকুল	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
গোকুল চন্দ্র	গল্পগুচ্ছ	ব্যবধান	ঐ
গোকুলচন্দ্র	ঐ	সম্পত্তি সমর্পণ	ষোড়শ
গোকুল নাথ দত্ত	ব্যঙ্গ-কৌতুক	অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি	সপ্তম
গোপাল	গল্পগুচ্ছ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
গোবিন্দ	গল্পগুচ্ছ	চিত্রকর	চতুর্বিংশ
গোবিন্দমাণিক্য	রাজর্ষি ও বিসর্জন		দ্বিতীয় ঐ
গোবিন্দলাল	গল্পগুচ্ছ	খাতা	অষ্টাদশ
গোপীনাথ শীল	ঐ	মানভঞ্জন	বিংশ
গোরা	গোরা		ষষ্ঠ
গোলাম কাদের খাঁ	গল্পগুচ্ছ	দুরাশা	একবিংশ
গৌরসুন্দর চৌধুরী	ঐ	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	দ্বাবিংশ
গৌরী	ঐ	উদ্ধার	ঐ
গৌরীকান্ত	ঐ	প্রতিহিংসা	বিংশ
গৌরীশংকর	ঐ	হৈমন্তী	ত্রয়োবিংশ
ঘেঁটু	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
চতুর্ভুজ	হাস্য-কৌতুক	অভ্যর্থনা	ষষ্ঠ
চণ্ডীচরণ	ঐ	সূক্ষ্ম-বিচার	ঐ
চন্দরা	গল্পগুচ্ছ	শাস্তি	অষ্টাদশ
চন্দ্র	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয়-প্রহসন	সপ্তম
চন্দ্রকান্ত	ঐ	বিনি পয়সার ভোজ	ঐ
চন্দ্রকান্ত	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও উনবিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
চন্দ্রকিশোর	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
চন্দ্রনাথ	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
চন্দ্রমাধব	প্রজাপতির নির্বন্ধ		চতুর্থ
	ও		
	চিরকুমার সভা		ষোড়শ
চন্দ্রমাণিক্য	মুকুট (নাটক)		অষ্টম
(চন্দ্রনারায়ণ)	ঐ (গল্প)		ও
			চতুর্দশ
চন্দ্রমোহন	নৌকাডুবি		পঞ্চম
চন্দ্রসেন	রাজা ও রাণী		প্রথম
	ও		ও
	তপতী		একবিংশ
চন্দ্রহাস	ফাল্গুনী		দ্বাদশ
চন্দ্রা	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
চারু	শোধবোধ		সপ্তদশ
চারু	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
চারুদত্ত	মালিনী		চতুর্থ
চারুশশী	গল্পগুচ্ছ	অতিথি	বিংশ
চাঁদপাল	বিসর্জন		দ্বিতীয়
চিত্রাঙ্গদা	চিত্রাঙ্গদা		তৃতীয়
			ও
			পঞ্চবিংশ
চিন্তামণি	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
চিন্তামণি কুণ্ডু	ঐ	আর্য ও অনার্য	ঐ
চুনিলাল	গল্পগুচ্ছ	চিত্রকর	চতুর্বিংশ
ছক্কনলাল	গল্পগুচ্ছ	শুভদৃষ্টি	দ্বাবিংশ
ছিদাম রুই	ঐ	শাস্তি	অষ্টাদশ
জগত্তারিণী	প্রজাপতির নির্বন্ধ		চতুর্থ
	ও		ও
	চিরকুমার সভা		ষোড়শ
জগমোহন	চতুরঙ্গ		সপ্তম
জনার্দন	রাজা		দশম
	ও		ও
	অরূপরতন		ত্রয়োদশ
জলধর	গল্পগুচ্ছ	নামঞ্জুর গল্প	চতুর্বিংশ
জয়কালী	ঐ	অনধিকার প্রবেশ	উনবিংশ

সাহিত্য সংবাদ

প্রাচীন হিব্রু সমাজ ও তাঁদের ভাষা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা এবং আলোচনা পণ্ডিত-সমাজ করেছেন যার সমগ্র ফলাফল হয়ত আমাদের অজানা, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে হিব্রু সমাজ ও ভাষা যে অদ্যাবধি বর্তমান আছে তা আমরা জ্ঞাত আছি, অন্যান্য সেমেটিক ভাষাভাষী অর্থাৎ ফোনেশিয়ান ও সাবেয়ান প্রভৃতির মত কালের শীতলস্পর্শে অবলুপ্ত হয়ে ইতিহাসের পাতায় এক অজানা রোমাঞ্চকর শব্দসমষ্টির মধ্যে হিব্রু সমাজ ও ভাষা এখনও হারিয়ে যায়নি। আজও হিব্রু নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে গীর্জার মঙ্গলধ্বনি মিশে গিয়ে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয় যে, হিটলারের ফাইনাল সলিউসনের যূপকাষ্ঠে ৭০ লক্ষ হিব্রুর আত্মবলিদান সত্ত্বেও বিধাতার অমোঘ নির্দেশে আমরা এ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যাইনি যা সেই জার্মান দানবের একমাত্র কাম্য ছিল।

হিব্রু জাতি এবং ভাষার জন্মস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অবশ্য একমত নন, তবে যে স্থানটি অধিকাংশ গবেষণায় বারম্বার উল্লিখিত হয়েছে তা হল উফ্রেতিস নদীর তীরভূমি। অন্যান্য কয়েকটি ভাষার মধ্যে হিব্রু শব্দটির যে প্রতিশব্দ লক্ষ্য করা গেছে তা'হল এই প্রাচীন ফরাসি = এব্রু, লাতিন = হেব্রিয়াস, গ্রীক = হেব্রাইওস। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হিব্রুরা সেমেটিক গোষ্ঠীভুক্ত কিন্তু এই সেমেটিক কারা? পাশ্চাত্যের পৌরাণিক মত হল নোয়ার পুত্র সেমের বংশধরগণই সেমেটিকগোষ্ঠী কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সেমাইট তাঁদেরই বলা হল যাঁরা সেমেটিক ভাষা ব্যবহার করেন, যেমন আরব এবং আলোচ্য হিব্রুজাতি প্রভৃতি। ওল্ড টেস্টামেণ্টে যে হিব্রু ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে সেমেটিক। তারপর অনুবর্তনের ফলে হিব্রু ভাষার রাব্বিনিক বা নিউ হিব্রু ধারার প্রবর্তন হয় এবং অনেক পরে মডার্ণ বা আধুনিক হিব্রু ভাষার প্রচলন হয়। হিব্রু ভাষা লেখা হয় সেমেটিক প্রথায় অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যেমন আরবী। রাব্বিনিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তা আমাদের জানা দরকার, রাব্বি শব্দটি সম্পূর্ণভাবে হিব্রু এবং এর অর্থ হল "আমার প্রভু" কিন্তু সম্রাট হেরোদের কালে হিব্রু প্রতিলিপিকারদের রাব্বি বলা হত। লক্ষ্য করা গেছে নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুকে তাঁর শিষ্যবর্গ রাব্বি বলতেন। যীশুর পর হিব্রুসমাজে রাব্বি তাঁদেরই বলা হত যাঁরা সামাজিক আইন এবং ধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মতামত দান করতে পারতেন। বর্তমান হিব্রু অভিধানে রাব্বি শব্দের অর্থ হল গীর্জার পাদ্রী কিন্তু কালেভদ্রে বিশিষ্ট হিব্রু পণ্ডিতদের প্রতি বিনয়-সম্ভাষণে রাব্বি শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আধুনিক হিব্রুভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় আলোচনার সূত্রপাত হয় সম্ভবতঃ "হাদোয়ার" নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে, হাদোয়ার আজও আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মেনাসেম রিবালো কিছুদিন হল ইহজগতের মায়া ত্যাগ করেছেন। হিব্রুভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিদগ্ধসমাজে অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেছে। রিবালো হিব্রুভাষার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধশীল ছিলেন এবং

আধুনিক হিব্রু সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও উচ্চমানের মনে হয়। মানুষ রিবালোর পরিচয় লাভ করা আপাততঃ সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করবার সুযোগের সূত্রপাত ঘটেছে বোধ করি।

হিব্রুলেখক জুদা নাদিশ সম্প্রতি মেনাসেম রিবালোর কয়েকটি প্রবন্ধ "দি ফ্লাওয়ারিং অব মডার্ণ হিব্রু লিটারেচার" নামক গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন। প্রবন্ধগুলি এই শতাব্দীর আধুনিক হিব্রু সাহিত্যের দশজন মহারথীর সাহিত্যকীর্তির উপর সুষ্ঠু সমালোচনা। রিবালোর সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং সমালোচনার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগকৌশল নিঃসন্দেহে প্রবন্ধগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কবিত্রয় বিয়ালিক, শেরনিশফ্স্কি ও স্নিউর সম্ভবতঃ রিবালোর প্রিয় কবি, কিন্তু কবিত্রয়ের কাব্যের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তার মধ্যে আবেগের আধিক্য নেই বরং গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় আছে, কাব্যের দোষত্রুটিগুলি তিনি চাতুর্য্যের সংগে উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেননি। ঔপন্যাসিক আগ্নন, হামিরী প্রভৃতির সাহিত্যকর্মের সমালোচনাগুলিও সুখপাঠ্য।

প্রবন্ধগ্রন্থটি নিঃন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জুদা নাদিশ গ্রন্থটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদ লাভ করবেন এ বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। প্রতিটি হিব্রু সাহিত্যিকের (যাঁরা এই সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত) ক্ষুদ্র জীবনী এবং উক্ত সাহিত্যরথীদের রচনাশৈলীর কিঞ্চিৎ নমুনাও সংযোজিত হয়ে গ্রন্থটি হিব্রু সাহিত্যপরিচয়ের এক বিশিষ্ট আকরগ্রন্থ রূপে পরিগণিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

The Flowering of Modern Hebrew Literature: Menachem Ribalow. Ed. Juta Nadich. Newyork. Twayne. 1959. 394 pages. $1.50.

এথ্নোলজিকাল আর্কাইভ্

উচ্চাঙ্গ শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীত বিদ্যার আলাপ আলোচনায় রসিকসমাজ সততই প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু লোকশিল্প, সংগীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা বহু কলারসিক করেছেন এবং এখনও করেন। লোকশিল্পের বয়স কত, এমন প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে তার একমাত্র বিনয়সূচক স্বীকৃতি হল এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজ্ঞাত, তবে অনুমান করা যেতে পারে মানবসমাজে শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীতের চর্চা যতই উচ্চমানের দিকে অগ্রসর হতে থাকল ততই শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রক্ষনশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সামাজিক কানুনের গন্ডী তার চারপাশে এঁকে দিলেন এবং জনসমাজে ফরমান জারি করা হল যে যাঁর সামাজিক কৌলিন্য আছে তিনি এ বিদ্যার এবং রসের প্রকৃত মধুকর অন্যথায় নৈব চ নৈব চ অর্থাৎ রাজাজ্ঞায় সাধারণ মানুষ শিল্পক্ষেত্রে হরিজন হয়ে গেল, শিল্পমন্দিরে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাই বলে কি সাধারণ মানুষ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ভুলে গেল? না, তানয়, সমাজের অনুশাসনে উচ্চাঙ্গের রসাস্বাদন থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের নিজস্ব শিল্পধারা গড়ে উঠল, জন্ম নিল লোকশিল্প, সঙ্গীত এবং সাহিত্য। লোকশিল্প বেঁচে আছে মানুষের মুখে মুখে, বংশ পরম্পরায়। সমাজের কঠোর অনুশাসনের ফলে বহু উচ্চাঙ্গ শিল্প এ পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে কিন্তু লোকশিল্পের মৃত্যু কদাচিৎ ঘটেছে।

লোকশিল্পের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ইউরোপের যে কয়েকটি দেশে লোকশিল্পের বিশেষ চর্চা আছে তাদের মধ্যে জার্মানী অন্যতম। বিসমার্কের সময়কালে টাইরলের লোকগাথা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং মনে হয় ওই সময়েই লোকশিল্প সংগ্রহের চেষ্টা সুরু হয় জার্মানীতে। এখন যে প্রতিষ্ঠানটি লোকশিল্প সংগ্রহে নিয়োজিত তার প্রতিষ্ঠা করেন গট্‌ফ্রিড হেনসেন, সেটা ১৯৩৬ সালের কথা। হেনসেন অদ্যাবধি মারবার্গে অবস্থিত সেন্ট্রাল এথ্‌নোলজিকাল আর্কাইভের অধ্যক্ষ। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আজ মানবতত্ত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত। এর লোকশিল্প শাখার সংগ্রহে লোকগাথা, রূপকথা, লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের মোট আটষট্টি হাজার (৬৮০০০) নমুনা সংগৃহীত আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাঁরা অনুসন্ধান কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁরা সারা জার্মানীর গ্রামে গ্রামে লোকগাথা সংগ্রহ করেন এবং তা স্থানীয় বাচনভঙ্গীর মাধ্যমেই টেপরেকর্ড যন্ত্রে বিধৃত করা হয়। লোকগাথা শাখার সংগ্রহে আছে সাউথটাইরলের ২০০০, ওয়েস্ট এবং ইস্ট প্রুশিয়ার ৮০০০, স্লেশহিক্স হোলস্টেইন থেকে ১২০০০, বোহেমিয়ার ৪৫০০ এবং লোয়ার স্যাক্সনি ও পালাটিনেটের বহুসহস্র লোকগাথা এবং রূপকথা।

লোকশিল্প সংগ্রহের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠন ইউরোপের সর্ববৃহৎ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এর সংগ্রহে লোকগাথার যে নমুনাগুলি আছে তাতে ইউরোপের প্রায় সমগ্র লোকগাথা, রূপকথা ও মৌখিক গল্পের উপাদানের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। সারা পৃথিবীর বিদগ্ধসমাজ এই সকল নমুনার টেপ এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সংগ্রহ করেন।

নূতন গ্রন্থ

ক্যানাডিয়ান সর্ট স্টোরিস: রবার্ট উইভার।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বিশ্ব-উচ্চাঙ্গ-সাহিত্যের যে সংকলনগুলি মুদ্রিত করেছেন তারই একটি খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডটি ছোটগল্প সংগ্রহ শাখার অন্তর্গত এবং কানাডার ছোট গল্পসমূহ এতে পরিবেশিত হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের ছোটগল্প সংগ্রহের মতই চিত্তাকর্ষক।

সম্পাদক রবার্ট উইভার গ্রন্থটির পরিচয়পত্রে বলেছেন কানাডিয়ান লেখকগণ এখন বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় নিজেদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পাঠকগণ এই সংগ্রহে মাত্র দুটি জায়গার রচনাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। মন্ট্রিল এবং টরেন্টো সহরের পশ্চাদ-ভূমিই গল্পগুলির পটভূমিকা। প্রেইরীর বিশাল পটভূমিকা কেন অবহেলিত হল তা বোধগম্য নয়, গল্পগুলির রচনাকাল অতি আধুনিক।

কানাডা বিশাল দেশ সুতরাং একটি মাত্র খণ্ডে সমগ্র কানাডিয়ান সাহিত্যিকগণের গল্প-রচনার নমুনা গ্রথিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব অপর একটি পরিপূরক সংগ্রহ গ্রন্থের আশা আমরা করতে পারি। বর্তমান খণ্ডে একমাত্র মোরলি কালাহানের দুটি গল্প স্থান পেয়েছে, অন্যান্য লেখকগণের একটি করে গল্প মুদ্রিত হয়েছে। ইদানীং কালে কানাডার বিশিষ্ট লেখক হলেন মাভেস গালান্ট, ম্যালকম লাওরি, লিও কেনেডি এবং রেমণ্ড কুইস্তার প্রভৃতি, এঁদের গল্পও আছে। যাইহোক, বৃহৎকর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবেই, এই গল্পসংগ্রহ প্রকাশনের ব্যাপারে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস যে উদ্যোগী হয়েছে তাতেই আমরা আনন্দিত।

দি লিটারারি ক্যারিয়ার অব উইলিয়ম ফকনার : জেমস বি মেরিয়েথার।
বিদেশী লেখকের রচনা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় তখনই যখন আমরা জানতে পারি যে কোনও লেখক কোন একটি বৃহৎ সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন ধরা যাক হাল আমলের লাক্সনে, লেগার্কভিস্ত, কোয়াসিমোদো প্রভৃতির কথা। এ'রা যখন সাহিত্যে নোবল পুরস্কার লাভ করলেন তখনই আমরা এ'দের রচনার প্রতি কৌতূহলী হই আইভো এন্দ্রিকের কথা বাদই দিলাম।

জেমস জয়েসের পর রচনাশৈলীর অন্তরালে সংগীতের মৃদু ধ্বনি সম্ভবতঃ উইলিয়ম ফক্‌নারের রচনাতেই লাভ করা যায়। অথচ ফক্‌নার বহুকাল যাবৎ লেখনী ধারণ করেছেন কিন্তু নোবল পুরস্কার লাভ করবার পূর্বে তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে এদেশের সাহিত্যপাঠকের কাছে কতটুকু পরিচয় ছিল তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

১৯৫৭ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর হলে ফক্‌নারের পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকসমূহের এক প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি সেই প্রদর্শনীর এক বর্ণনামূলক তালিকা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ফক্‌নার ভক্তদের সুবিধার্থে প্রকাশ করেছেন। পুস্তকটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত— (১) প্রদর্শনীর ব্যাখ্যামূলক বিবরণ, (২) প্রদর্শিত পাণ্ডুলিপিগুলির চিত্রসহ বর্ণনা, (৩) সমগ্র রচনার ইংরাজী সংস্করণের তালিকা, (৪) বিদেশী ভাষায় অনূদিত সংস্করণের বিবরণ, (৫) ফকনারের যে সকল রচনা ছায়াচিত্রে রূপায়িত অথবা টেলিভিসনে প্রযোজিত এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে যে সকল উপন্যাস ও গল্প প্রকাশকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তার তালিকা। প্রত্যেকটি বিভাগের শীর্ষদেশে সুযোগ্য সম্পাদক জেমস মেরিয়েথার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিচিতি মুদ্রিত করায় পুস্তকটির ব্যবহারিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। সাহিত্যপাঠকের কাছে (বিশেষতঃ ফকনার গুণগ্রাহীদের নিকট) এই পুস্তকটি অপরিহার্য্য।

অজিত দাস

লাগের

চিত্রজগতে শিল্পী লাগের একটি সুপরিচিত নাম। বর্তমানে চলতি বছরের ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত গাগেনহাইম মুাজিয়ামে শিল্পীর আধুনিকতম চিত্রকর্মের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পীর গত পনের বছরের কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। লাগেরের চিত্রকর্মকে ফর্মের গুণতথ্যগত পরিপ্রেক্ষিতে মুারালধর্মী বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানের প্রদর্শনীতে লাগের পাঁচটি বিষয়বস্তুকেই বিভিন্ন ভাবে পরিবেশন করেছেন। সাঁতারুর গতি, বিশ্রাম, শ্রমিক, ভ্রমণকারীর আনন্দ আর চলমান জীবন এই পাঁচটিই মূল-চিত্রের সুর। এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর নানা ধরণের (লাগের পন্থী) স্কেচ, ফর্মের বিন্যাস প্রদর্শনীটিকে বিশেষ আলোকপাতে উজ্জ্বল করে। লাগের উল্লিখিত বিষয়ের ওপরই বেশী কাজ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পিকাশোর গুয়েরনিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ। গুয়েরনিকা উনিশশো আটত্রিশে সম্পাদিত পিকাশোর এক বিশেষ চিত্রকর্ম। কিন্তু বর্তমানেও পিকাশো গুয়েরনিকা সম্বন্ধীয় স্কেচ ইত্যাদি করে চলেছেন। লাগেরও ওই পাঁচটি বিষয়েই মূল সুরকে রেখে নানা ভাবে কাজ করে চলেছেন। পিকাশোর কাজের মধ্যে বিশেষ একটি আবেগময়তার আধিক্য লক্ষণীয়। কাজের মধ্যে আবেগই বস্তুতঃ প্রধান। কিন্তু লাগেরের কাজের মধ্যে আবেগ বুদ্ধিগত বিন্যাসধর্মীতার প্রসাদ-গুণে স্তিমিত। এই স্তিমিত আবেগ লাগেরের বিন্যাসধর্মী দ্বৈত ডাইমেনশনগত ফর্মের প্রভাবে অসামান্য গুণগত সত্যে উপস্থাপিত। লাগের ফুল, পাখী, নারীর চিত্র কর্মে ফুল, পাখী আর নারীর বাহ্যিক ফর্মকে সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র বুদ্ধিযুক্ত যুক্তির অবতারণায় নিরস ডিজাইনেই পর্যবসিত করেননি। সেখানে ফুল, পাখী আর নারীর স্বাভাবিক কোমল ভাবপ্রধানকে বজায় রেখে ফর্মের এক অপূর্ব বিন্যাসসাধন করেছেন। লাগের পন্থায় বস্তুর বাহ্যিক রূপ-দর্শনের মাধ্যমে অন্তর্গত গুণ সত্যের বিন্যাস পরিবেশ পরিকল্পনায় দৃষ্টিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুকে এক অপূর্ব শ্রীমন্ডিত করেছে।

লাগেরের ছবিতে প্রথম দর্শনেই প্রেম এই কথাটির প্রয়োগ সম্ভব নয়। ছবি দেখে তবে তার রসে অভিষিক্ত হতে হবে ধীরে ধীরে। কারণ বাহ্যিক জন গত সাধারণ ফর্মের উপস্থাপনা সেখানে নেই। যতটুকু বিন্যাসসাধনে বাহ্যিক জনগত ফর্ম প্রয়োজন ততটুকুকেই লাগের গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ লাগের পন্থায়। এই লাগের পন্থায় ফর্মের কোয়ানটিটি অপেক্ষা কোয়ালিটির জয় ঘোষণাই প্রধান।

সেজাঁ, পিকাশো

গত মার্চে ওয়েলসলি কলেজ ফ্যাকালটি স্যালারী অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ডের প্রয়োজনে উইলডারস্টেনে এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীতে সেজাঁ, পিকাশো প্রভৃতির চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। সেজাঁর ইটালিয়ান মেয়ে ছবিটি আটারশো ছিয়ানব্বই সালে অঙ্কিত। এই প্রদর্শনীতে পিকাশো অঙ্কিত ডোরা মারের প্রতিকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেজাঁ আর পিকাশো এই দুটি নামের মধ্যে

প্রায় আশী বছরের তফাৎ। কিন্তু দু'জনেই এক বিশেষ চিত্রধর্মীতার জন্য এক নিকটতর সম্বন্ধের অংশীদার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেজাঁ ফর্মের বাহ্যিক রূপাদর্শের অন্তরালে বিন্যাস-ধর্মীতার বিচিত্র বিভিন্ন গঠনকে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিউবইজম্ কথাটির উদ্ভব ঘটেছিল প্রতিচ্ছায়াবাদীতার প্রসাদগুণে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ বন্ধনগুলি প্রতিচ্ছায়া-বাদীদের মুহূর্ত মাত্র সময়ের কল্পনানেত্রে অশিক্ষিত রং-এর সমন্বয়সাধনে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। কল্পনার অবাধ প্রসার বাহ্যিক ফর্মের আড়ালে ঘটতে সুরু করলো। সেজাঁ এই রং ব্যবহারের পদ্ধতির মধ্যেই ফর্মের সলিডিটি কিংবা ঘনত্বকে রূপ দেবেন বলে অলিখিত অদৃশ্য সমস্ত রেখার অবতারণা করলেন। এই রেখার বন্ধনীগুলি ক্রমশঃ ঘনত্ব পরিবেশনে দ্বৈত ডাইমেনশনে লুপ্ত হতে লাগল। তবে সেজাঁ পুরোপুরি তিনটি ডাইমেনশন্ গত ইল্যুশনকে চিত্র-ফর্ম থেকে বাদ দেন নি।

তিনি শুধু ফর্মের বিচিত্র অন্যান্য অনুভূতিকে গোলাকার কৌণিক, সরল প্রভৃতি বিভিন্ন রেখার সমন্বয়ে কল্পলোকের নতুন তত্ত্ব পরিবেশন করলেন। পিকাশো সেই নতুন তত্ত্বকে কিউবইজমের ডাইমেনশন মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বাহ্যিক ফর্মগুলির বিচিত্র অনুভূতিগত অভিজ্ঞতাকে কল্পলোকের সুদূর প্রসারী জগতের অভিনব গঠনপদ্ধতির মধ্যে উপস্থাপিত করলেন। যেখানে সেজাঁ কিউবইজমের প্রথম পুরুষ, পিকাশো সেখানে উত্তরপুরুষ। তবে কিউবইজম বর্তমানের চিত্র-ফর্মে ক্রমশঃ শীতল বুদ্ধিগত বিন্যাস-ধর্মীতার জন্য পরিত্যক্ত। কিউবইজমগত ফর্মের বিন্যাস পরিত্যক্ত হলেও, এই বিশেষ চিত্র কল্পনা থেকে আধুনিক চিত্রের নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কল্পনা ও বাস্তব এই দুটির সংমিশ্রণকে আধুনিক জগত চিত্রে চূড়ান্তভাবে কিউবইজমেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মেনে নিয়েছে। এই ইজম এখনও বর্তমানের বিভিন্ন বিন্যাসধর্মী চিত্রে অংগীভূত। আলোচিত লাগেরও, প্রথমে কিছু কিউবিষ্ট চিত্রে নিজের প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্রাক্ ও কিউবিষ্ট শিল্পী হিসাবে সর্মাধক পরিচিত ছিলেন। তবে এই শতকের প্রথম দুটি দর্শকের মধ্যেই কিউবিষ্ট চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং তৃতীয় দশকে ও চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগেই নতুন বিন্যাসধর্মীতা এই কিউবিষ্ট, পন্থীদের স্থান গ্রহণ করে। সেজোঁ কিউবিষ্ট মতের প্রতিষ্ঠাতা, তবে তিনি কিউবিষ্ট নন। কারণ কিউবইজমের মত ক্রমশঃ হৃদয়গ্রাহ্যতার স্থান বুদ্ধির দ্বারা অধিকৃত হতে দিয়ে চিত্রে শুধুমাত্র বুদ্ধির অনুশীলনকেই প্রাধান্য দিতে সুরু করে। এতে করে সাময়িক আনন্দ পেলেও শিল্পীরাও কল্পলোকের আমেজকে বুদ্ধির ক্ষুরধার তরবারীর আঘাতে ছিন্ন করে ক্রমশঃ শিল্পী থেকে গাণিতিক হলেন। এই শুধুমাত্র বুদ্ধির বিশুদ্ধি থেকে নতুন শিল্প-জ্ঞান শিল্পীদের উদ্ধার করে মনোজগতের অন্য কিছুর আবেগকে অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণে তৎপর হলো। কল্পনার আমেজ বুদ্ধির স্থান ক্রমশঃ গ্রহণ করলো। কিউবইজম একটি সাময়িক তরঙ্গ বিশেষ।

সিসলে

প্রতিচ্ছায়াবাদী সিসলে আকাশের বর্ণ অনুলেপনের শিল্পী। বিরাট আকাশের ছবিই সিসলের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিচ্ছায়াবাদীতা প্রকৃতির রূপদর্শনকে আনন্দ অনুভূতির মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন। সূর্যের সাতটি বর্ণের অনুধ্যান এবং তাদের বিচিত্র বর্ণ সম্ভারই প্রতিচ্ছায়াবাদী-চিত্রে প্রধান এবং প্রথম শিল্প-চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-বন্ধনগুলিই শিল্পীর আপন মনোজগতের রসে সিক্ত হয়ে আনন্দমুখর বর্ণ অনুধ্যানে প্রকাশ পেত। মঅনে, রেনোয়াঁ, পিজারোঁ প্রভৃতির বন্ধু শিল্পী সিসলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিচ্ছায়াবাদীতার মধ্যে

আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমালোচকদের স্বল্প জ্ঞান এই শিল্পীদের প্রতিচ্ছায়াবাদী বলে বঙ্কিম কটাক্ষে অভিহিত করেছিল। শিল্পীরা স্বেচ্ছায় এই নাম গ্রহণ করে প্রতিচ্ছায়াবাদীতার চূড়ান্ত প্রকাশ সম্ভব করলো। আধুনিক এবং আধুনিকতম শিল্প-চেতনায় প্রতিচ্ছায়াবাদীতার অবদানই প্রধান। মঅনে, রেনোয়াঁ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের বন্ধু হলেও মৃত্যুকালে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো—তাঁর প্রিয়তম শিল্পী কারা—তখন সিসলে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা তাঁর কেউই বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। উল্লিখিত শিল্পীদের মধ্যে ডেলাক্রোয়া, কোরো, মিলে, রুশো-ই প্রধান ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্বে মঅনেকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। একমাত্র মঅনেই তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন।

১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৭, ১৮৮২ সালের পর পর প্রদর্শনীতে সিসলে প্রতিচ্ছায়াবাদীদের প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। কিন্তু প্রতিচ্ছায়াবাদীদের প্রধান যে প্রদর্শনী ১৮৮৬ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই প্রদর্শনীতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু তিনি গঁগ্যার জন্যে সেই প্রদর্শনীতে যোগ দেননি। ভাবলে সত্যিই অদ্ভুত লাগে যে গগ্যাঁ যদিও প্রতিচ্ছায়াবাদীদের সঙ্গে প্রদর্শনী করেছিলেন, কিন্তু তিনি একক এবং সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ ছিলেন।

রেণোয়াঁ, গঁগ্যা

কোমল উজ্জ্বল বর্ণের শিল্পী রেণোয়াঁ আর গগ্যাঁ হলেন পুরোপুরি সিনথিসিস্ট। তবুও এই দুটি শিল্পী সম্পূর্ণভাবে প্রতিচ্ছায়াবাদী। ঊনবিংশ শতকের এই দুই শিল্পী বর্তমানের অনেক মতবাদের মধ্যে তাঁদের অবদান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আনন্দ মুখরতার শিল্পী রেণোয়াঁ সমাজজীবনে এক পরিচিত শিল্পী ছিলেন। নারীর দেহলাবণ্যের উজ্জ্বল বর্ণ, ফুলের বর্ণসুষমার মধুরতা, প্রকৃতির চঞ্চল নৃত্যপরায়ণ বিভিন্ন পরিবেশ রেণোয়াঁর চিত্র-কল্পনায় অদ্ভুত এক মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাবিরোধী গঁগ্যা নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন আদিম তাহাইতি দ্বীপে যেখানে নির্জন সমুদ্রবেলায় অশান্ত ঢেউ আদিম কামনা-বাসনার সঙ্গে তরঙ্গায়িত। প্রকৃতি আর নারীর বন্য আদিম রূপের অনাবিল সরল অভিব্যক্তি সুকোমল রেখায় বিধৃত। ভয়, আদিম ইচ্ছা, কিংবা কল্পলোকের দূরবিস্তারী জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রকৃতির পটভূমিতে এক অপরূপ রূপবন্ধনে উপস্থাপিত হয়েছে। রেণোয়াঁ যেখানে শুধু রূপলাবণ্যের কোমলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে গঁগ্যা প্রকৃতির রূপবিলাস, ভয় আর আদিমতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে অসীম কল্পনার মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়। গঁগ্যা অন্যান্য প্রতিচ্ছায়াবাদী অপেক্ষা অন্যতর কারণ তিনি শুধুমাত্র প্রকৃতিগত রূপ ভেদগুলিকেই কোমল কিংবা উজ্জ্বল বর্ণের মধ্যে প্রকাশ করেন নি, সেখানে মানবিক আবেদনে শিল্পী বাসনা-কামনার সেই গুহায়িত চিন্তাগুলির প্রতিবিম্ব চিত্রে প্রতিফলিত করেছেন। বাস্তব আর অতীন্দ্রিয়লোকের এক সংমিশ্রণে বিচিত্র বর্ণ অনুধ্যানের মধ্যে গঁগ্যা প্রতিচ্ছায়াবাদীতার এক বিশিষ্ট আকার। পল রোজেনবার্গে অনুষ্ঠিত সিসলের চিত্র-ফর্মের সঙ্গে গঁগ্যা এবং রেণোয়াঁর ছবিও প্রদর্শিত হয়।

নিখিল বিশ্বাস

আর একটু সৌজন্যবোধে ক্ষতি কি ?

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সমকালীনে শংকরীপ্রসাদ বসু বিবেকানন্দের একটি ইংরাজী লেখার অনুবাদ করে-ছেন আর তার সঙ্গে একটি বিস্তৃত ভূমিকা জুড়েছেন। বিবেকানন্দকে রক্ষা করার ভার শংকরীবাবু একটু বেশী উৎসাহ সহকারেই নিয়েছেন এবং তাঁর যুদ্ধ করার মনোভাবের তীব্রতার দরুণ তিনি হাওয়াতেই তরোয়াল ঘুরিয়েছেন। তার ফলে অনেক বালকোচিত উক্তি কঠিন শ্লেষ ও বিদ্রুপ সহকারে লেখকের রাগ ও ঝাঁঝ প্রমাণ করছে কিন্তু যুক্তির দ্বারা আমাদের কোন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেনা।

বিবেকানন্দের কি পরিচয় এখন এসে দাঁড়িয়েছে সে কথা বলতে গিয়ে লেখক তিনটি রূপ সাধারণের মনোভাব থেকে উদ্ধার করেছেন—(১) হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক, (২) হিন্দু জাতীয়তার প্রবর্তক (৩) স্কুল কলেজ ও হাঁসপাতালের গণেশ দেবতা। তারপর লেখক বলছেন "আধুনিক ছোকরাদের কেউ কেউ পিতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায় চোখ পাকিয়ে এমনও বলছে চিকাগোয় বিবেকানন্দের বক্তৃতা সাফল্য জাতীয় জীবনের একটি দুর্মর (দূর-মর!) কুসংস্কার। প্রার্থনা করি বাংলাদেশের তেজী তরুণ কন্ঠ চিকাগোয় বিবেকানন্দের সাফল্য অপেক্ষা অধিকতর বচন-সাফল্য অর্জন করুক, তেমন সত্যই কিছু ঘটলে অন্তরীক্ষে বিবেকানন্দ যদি কোথাও থাকেন, "আমার তরুণ সিংহদলের" তেজোবীর্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন, এবং এই সব 'অমুসল-মান' ব্যক্তিরা 'হিন্দু' বিবেকানন্দকে যতই সমালোচনা করুক, যদি তাদের বিদ্রোহের মধ্যে সত্য-কারের মনুষ্যত্বের অঙ্কুরমাত্রও থাকে তা হলে উল্লাসে অধীর হয়ে বিবেকানন্দ বলবেনই—সাবাস, ঐ তো মহীরুহের সম্ভাবনা।"

প্রথমে স্বামীজীর যে তিনটি পরিচয়ের কথা লেখক বললেন তার আলোচনা করা যাক। স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক. ও হিন্দু জাতীয়তার অন্যতম প্রবর্তক বললে কি অপরাধ হয় তা আমার জানা নেই। জাতীয় জীবনে তাঁর এই ভূমিকাগুলি কেউ ইচ্ছে করলে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু তাতে তিনি যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন একথা বল-বার অধিকার আমার চলে যাবে না। ইতিহাস বিচারের ভঙ্গী এক একজনের এক একরকম হতে পারে। উপরের পরিচয়গুলি ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর রূপনির্ণয়ের চেষ্টার ফল। তৃতীয় যে পরিচয় লেখক উদ্ধার করেছেন —স্কুল কলেজ ও হাঁসপাতালের গণেশ দেবতা—এ তিনি কোথায় পেলেন। যদি বা কেউ কোথাও এ ধরণের কথা বলে থাকে—আমার চোখে এখনো তো পড়েনি—তা যে 'বাংলাদেশে স্বামীজীর পরিচয়' নয় এটা সুস্থ বুদ্ধিতে লেখকের বোঝা উচিত ছিল কিন্তু বিবেকানন্দকে রক্ষা করার অত্যুৎসাহে লেখক বানিয়ে বানিয়ে শত্রু তৈরী করেছেন এবং কড়া কড়া কথা বলে আর কিছু না হোক নিজের ঝগড়ার প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করে-ছেন। সকলেই জানেন যে বিবেকানন্দের মতামতকে যারা অন্ধভাবে মানেন, যাঁরা বিচার করে মানেন বা যাঁরা মানেন না—তাঁরা সকলেই তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করেন। সুতরাং বিবে-কানন্দকে কেউ "গণেশ দেবতা" বলেছে এ কথা নিয়ে উত্তেজিত হবার কারোই কোন কারণ নেই

অবশ্য যদি মনে এ ভাব আসে যে একমাত্র আমিই বিবেকানন্দের রক্ষাকর্তা, তা হলে অবশ্য প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয় যে বিবেকানন্দের জীবনই এহেন উক্তির যথেষ্ট সবল প্রতিবাদ নয়।

লেখক 'আধুনিক ছোকরাদে'র কারো কারো 'পিতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায়' উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। প্রবীণতার অহংকারে ভাষা ব্যবহারে লেখক সতর্ক হতে পারেন নি, তাতেই প্রমাণ বিষয়বস্তুর ভারের এবং যুক্তির ধারের চেয়ে কথার তীব্রতাতেই লেখকের মনোযোগ বেশী। সেটা প্রবীণতার লক্ষণ নয় বরং খানিকটা 'আধুনিক ছোকরা' সুলভই। বিবেকানন্দের চিকাগোয় বক্তৃতা সাফল্য যে একটি দুর্মর কুসংস্কার—এ কথাও কি সত্যি আধুনিক যুবক মহলের কথা। লেখকের বালসুলভতা আর একবার প্রকাশ পেলো যখন ক্রুদ্ধ হয়ে 'দুর্মর' কথার পাশে ব্র্যাকেটে (দুর-মর!) লিখে আলোচনার সকল ভদ্র রীতিই তিনি এড়িয়ে গেলেন। তারপর বিবেকানন্দ অন্তরীক্ষ থেকে এই 'আধুনিক ছোকরাদের' কি বলবেন তা নিয়ে লেখকের কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি না করে, কল্পনায় খাড়া করা শত্রুদের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ না ছুঁড়ে, বিবেকানন্দকে রক্ষা করার অহংকৃত ঔদ্ধত্য না দেখিয়ে লেখক যদি নিজেকে অনুদিত প্রবন্ধের পরিচয়দানে নিয়োজিত করতেন তাহলে এত কথার প্রয়োজন হতো না।

আর একটি কথা প্রয়োগ করেছেন লেখক—হিন্দু বিবেকানন্দের সমালোচনায় যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা 'অমুসলমান।' বিবেকানন্দ সর্বধর্মের মধ্যেই সত্য দেখেছিলেন। চিকাগো বক্তৃতায় তিনি অন্ধের হস্তীদর্শনের গল্প উল্লেখ করে বলেছিলেন যে সবাই সত্য দেখছে তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁরই ভক্ত শংকরীপ্রসাদ আজ বিবেকানন্দ সমালোচকদের 'অমুসলমান বলে গাল দিচ্ছেন। যাঁরা গোঁড়া হিন্দু নন, তাঁদের গায়ে এ গালাগালের ঝাঁজ লাগবে না। আমার গায়ে তো লাগেনি। মুসলমান বলে গাল দিলেও লাগতোনা। এই উক্তিতে তাঁর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী দেখে আমরা সবান্ধবে হেসেছি। মনে পড়ছে সাহিত্যে প্রকাশতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে একটি ছেলে দেওয়ালে বড় বড় করে লিখেছে 'রাখালটা বাঁদর'—তাতে রাখাল বাঁদর প্রমাণ না হোক লেখকের রাগ প্রমাণ হলো।

বিবেকানন্দ বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন একথা কে না জানে। কিন্তু তাঁর নানা উক্তি, নানা কাজ দেখে এই ধারণা আমার হয়েছে যে সংস্কার সম্পর্কে তাঁর আচরণ সঙ্গতি রক্ষা করে নি। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু স্ববিরোধী উক্তি উদ্ধার করা যাবে। বলা বাহুল্য যে তিনি যদি দীর্ঘ আয়ু পেতেন তাহলে তাঁর এই সমস্ত স্ববিরোধী চিন্তা একটি সুসঙ্গত স্ববিরোধমুক্ত জীবনাদর্শকে রূপায়িত করতো। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই দেখেছি। চল্লিশ বছরে যদি তাঁর জীবন শেষ হয়ে যেত তবে বহু বিরোধী উক্তি পাশাপাশি সাজিয়ে তাঁর চিন্তার স্ববিরোধ প্রমাণ করা যেত। সুদীর্ঘকালের জীবনে যত চলেছে দিন, তত বিস্তৃত হয়েছে দৃষ্টি, তত ভেঙেছে বেড়া—নিরাসক্ত ঔদার্যের মধ্যে স্ববিরোধী চিন্তাগুলি পরিপূর্ণ সঙ্গতির সন্ধান করেছে।

বিবেকানন্দের জীবনে তা হয়নি। শংকরীপ্রসাদ ভূমিকায় স্বীকার করছেন যে সংস্কারকদের সংস্কারেচ্ছার পিছনে কোন স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন উদ্দেশ্যের ছায়া দেখলে—"তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সব কৌতুহলী কর্তব্যবুদ্ধদের হাত থেকে কুসংস্কার শুদ্ধই দেশ বা জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।" বিবেকানন্দের মতে কুসংস্কার কি?—শংকরীপ্রসাদের ব্যাখ্যায়— "যা কিছু এই মুক্তি ও শক্তির বিরোধিতা করে বিবেকানন্দের কাছে তাই হলো কুসংস্কার।" তাহলে

এই কথা দাঁড়ায় যে কর্তব্যবুদ্ধদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে মুক্তি ও শক্তির বিরোধিতা করে যে কুসংস্কার তাকেও তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম যে দুটি পরিচয় শংকরীপ্রসাদ উদ্ধার করেছেন তার আলোচনায় আসতে হলো।—বিবেকানন্দ হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক। এই দুটি পরিচয়ই বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয়ের অঙ্গ বলে মনে করি। বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়ক বললে আপত্তি করার কি আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা দেশে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন একদল মানুষ হিন্দু ধর্মের নানা লৌকিক আচার বিচারকে অশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বর্জন করে হিন্দু শাস্ত্র হাতড়ে একেশ্বরবাদী অপৌত্তলিক উপলব্ধিজাত এক ধর্মবোধের সন্ধান করছিলেন। রামমোহনের বেদান্ত চর্চা সতীদাহ সম্পর্কে শাস্ত্র বিচার, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সিদ্ধ প্রমাণে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সন্ধান, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মরচনা সেই বিচার বুদ্ধি জাগ্রত বাঙালী মনীষার প্রমাণ। রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগর, তার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল ও পরে ব্রাহ্ম সমাজ—সমস্তটা মিলিয়ে জাগ্রত ব্যক্তিচেতনার জাগ্রত মননশীলতার জয়যাত্রা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজের নানা লৌকিক ও অলৌকিক সংস্কারকে আঘাত করলেও এই ধারা হিন্দুধর্মবিরোধী নয়। তবে পাশ্চাত্ত্যকে ছেঁটে বাদ দিয়ে বা পাশ্চাত্যের সঙ্গে অকারণ বড় ছোটর লড়াই তুলে এঁরা বিব্রত হননি। সুদীর্ঘকালের অনড় অটল জীবনধারায় এঁরা স্রোত আনবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের নায়ক আর জাতীয়তার প্রবর্তক এই দুটি পরিচয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশটা পাশ্চাত্যের পায়ে বিকিয়ে গেল, অন্ধ অনুকরণে মোহে ভুলবোনা, জাতীয় জীবনের আদর্শকে বজায় রাখতে হবে এই সব স্লোগান যাঁরা তুললেন তাঁরাই হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরলেন। এই তীব্র জাতীয়তার আদর্শ পাশ্চাত্য ন্যাশানালিজমের শিক্ষা থেকেই পাওয়া। ভারতীয় সাধনার জগতে এই ন্যাশানালিজম বিদেশী। পাশ্চাত্ত্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষার ভিত্তিতেই বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার প্রবল ঢেউ তুলেছিলেন। এটা তো ইতিহাস এবং একথাও সবাই জানেন যে এঁরা দুজনেই হিন্দুদের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করলেও বিদ্যাসাগরের মত নির্মম সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি কারণ ঐ জাতীয়তার তীব্র মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সময়ে সময়ে দেশের পরিত্যক্ত সংস্কারকেও কোল দিয়েছেন। তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে এঁদের সমর্থন ছিলনা, তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বিবেকানন্দ ঘরোয়া পরিবেশে প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথাই বলেছেন, তার বেশী এগুতে পারেন নি। সময়ে সময়ে দেশীয় সংস্কারাচ্ছন্নতাকে বিবেকানন্দ তীব্র আঘাত করেছেন এবং অন্য সময়ে নিজেই তার সমর্থন করেছেন তিনি নিবেদিতাকে বলছেন যে তাঁকে অর্থডক্স হিন্দু হতে হবে আবার তিনিই হিন্দু গোঁড়ামীর প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন।

কিন্তু এ কথা আগেই বলেছি যে ভাবনার স্ববিরোধ সত্ত্বেও বিবেকানন্দের যে বলিষ্ঠ জীবনবিশ্বাসী দৃষ্টি ছিল তা অন্যান্য সংসারত্যাগী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দৃষ্টি নয়। দীর্ঘায়ু পেলে ঐ জীবন-আসক্তিই যে প্রবল হয়ে উঠে, আধ্যাত্মিকতার কুয়াসা-মাখানো বহু ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খৃষ্টান-ব্রাহ্ম-পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি aggresive militantnationalist Hinduism-এর প্রচারক। বিরোধ কিছু স্তিমিত হলে তিনি যে আরও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সমস্ত পরিবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন এবং তার ফলে যে সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছিন্নভিন্ন করে আরও উদাত্ত ডাক দিতে পারতেন

এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময় তিনি পাননি। এটা আমারই ধারণা, আমার বিচারে এটাই বিবেকানন্দের একমাত্র লজিক্যাল পরিণতি হতে পারতো।

শংকরীপ্রসাদ যে মনোভাব নিয়ে বাতাসে তরোয়াল চালিয়েছেন সেটা ঐ সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তার ফল। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধীজির সংগ্রামের দিনে গান্ধীজী বলেছিলেন after all Subhas is not our enemy. শংকরীপ্রসাদ ঠিক সেই সুরেই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যাঁদের মতামত তাঁর সঙ্গে মেলেনি তাঁদের অমুসলমান বলে গাল দিয়েছেন, বলেছেন এই সব ছোকরারা পিতৃনাম বিস্মৃত। যখন বিবেকানন্দর প্রবন্ধের ভূমিকা লিখতে বসেছেন তখন এই ছেলেমানুষী ঢঙে গায়ের ঝাল মেটানো ক্রোধ প্রকাশ, তাঁর উচিত হয়নি। মনে রাখা উচিত ছিল যে কঠিন বাক্য প্রয়োগে যুক্তির পথ সহজ হয় না।

সে যাই হোক বিবেকানন্দের এই প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিবেকানন্দের জটিল ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে গুরুভক্তির চশমা লাগিয়ে সরল করে তোলার কোন প্রয়োজন আমি অনুভব করিনা। তাঁর বহুমত, নানা কথার আমি বিরোধী কিন্তু তার জন্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজে মানতেও রাজী নই। শংকরীপ্রসাদ যদি এই ধরণের আরও লেখা অনুবাদ করেন তবে উপকৃত হবো; ভূমিকায় লেখাটির পরিচয় থাকলেই সেটি দেখতে ভদ্র হয়, বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ভূমিকা কোন লেখকেরই ক্রোধ প্রকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র নয়।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা

'মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা' এই আলোচনা (সমকালীন, বৈশাখ, ১৩৬৯) শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য একটি বহু আলোচিত বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপিত করায় ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সুধীজনের ভাষণই এই আলোচনার সূত্রপাত করেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এমনকি বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত বলেই লেখক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

রাখালবাবু তাঁর আলোচনাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি সম্পূর্ণভাবে বাংলায় লিখতেন তাহলে আমি অবশ্যই তাঁকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বলতাম যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

টেকনোলজি বোঝাতে গিয়ে প্রয়োগবিজ্ঞান বলা হবে কি প্রযুক্তি বিদ্যা কিংবা টেকনোলজি কথাটাই থেকে যাবে তা বিচারসাপেক্ষ কিন্তু এখানে আমার আলোচনা ঐ প্রয়োগবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আমাদের দেশের অগ্রগতি আরো দ্রুত, ব্যাপক ও জনসচেতন মূলক হবে যদি প্রয়োগবিজ্ঞানের চর্চা মাতৃভাষায় করি। কিন্তু সরকারী পরিভাষার নমুনা দেখে এই আশঙ্কাও মনে জাগে যে বিপরীত ফললাভও বিচিত্র নয় কেননা কিছু পরিভাষা এর আগেই আমাদের মনে যথেষ্ট কৌতুকের সঞ্চার করেছে। আজ পর্যন্ত 'ইঞ্জি-

নীয়ারীং' কথাটিরই কোন উপযুক্ত পরিভাষা বের হয় নি, ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী ভাষ্য "বাস্তুকার' কথাটাও কোন ইঞ্জিনীয়ার হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন কিনা জানি না। বরং ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, মেকানিক এসব কথা অশিক্ষিত জনসাধারণ দিনরাত ব্যবহার করছে সহজ ভাবে।

রাখালবাবু লিখেছেন, 'আমারই একজন সতীর্থ রচিত যন্ত্রবিদ্যার বই 'ফিটিং শিক্ষা' চল্লিশ হাজার কপি বিক্রী হয়েছে।' ফিটিং কথাটির বদলে যদি কোন বাংলা প্রতিশব্দ থাকতো তাহলে কত কপি বিক্রী হতো তা বলা খুবই মুস্কিল। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জন্যে পেনি-সিলিন বা স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন কিনতে গিয়ে বীজঘ্ন ঔষধ জাতীয় কোন বাংলা কথা বলে ওষুধ চাইলে কোনদিন হয়তো তা মিলতে পারে কিন্তু রোগী তার আগেই মাতৃভাষায় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে মারা যেতে পারেন। এই আশংকাও হয়।

প্রয়োগবিজ্ঞান একটি আন্তর্জাতিক শাস্ত্র। অন্য দেশের সংগে চিন্তাধারার ও গবেষণার আদানপ্রদানে এ আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। এজন্যে ইঞ্জিনীয়ারীং ও টেকনোলজির অধিকাংশ শব্দই আজকাল আন্তর্জাতিক তার মধ্যে অনেক ইংরেজী শব্দও যেমন আছে তেমন আছে জার্মান আর ফরাসী শব্দ। চিকিৎসাশাস্ত্রের অসংখ্য লাতিন নাম সর্বদেশেই প্রচলিত এবং এগুলোকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করার কথা উন্নত দেশের কোন পণ্ডিত বলেছেন বলে শুনি নি। অবশ্য বাক্য গঠন ও বিশ্লেষণ মাতৃভাষায় হতে আপত্তি নেই। জাপানের কথা লেখক উল্লেখ করে-ছেন জাপানে অনেক দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জাপানী ভাষায় লেখা হলেও আন্তর্জাতিক শব্দ-গুলো ঠিকই থাকে এবং যেগুলো জাপানী অক্ষরে লেখা যায় না সেগুলো রোমান হরফে লেখা থাকে। চীন কিংবা লাতিন আমেরিকাতেও এ পদ্ধতির প্রচলন।

সকলেই জানে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিরাট কর্ম সুসম্পন্ন করার জন্যে ইংরেজ ছাড়াও আরো অনেক দেশের বিশেষজ্ঞেরা এদেশে এসেছেন এবং এখনও অনেকে আসছেন যাচ্ছেন। এঁদের অনেকেই ভালো ইংরেজী জানেন না কিন্তু এর জন্যে কোন অসুবিধা কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায় নি কেননা ইঞ্জিনীয়ারীং ও টেকনোলজির অধিকাংশ শব্দই আজকাল আন্ত-র্জাতিক আখ্যা লাভ করেছে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এখানে অনেক। শুধু মাত্র ভাষাতত্ত্বাদি ও সাহিত্যিক দিয়ে এধরণের পরিভাষা তৈরী করা সম্ভব নয় এরজন্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিদের ভূমিকা প্রধান হবে। তারপর কোন শব্দ আন্তর্জাতিক, কোন শব্দ বাংলা হবে তা বিচার করে দেখবেন। না হলে হিন্দী পরিভাষার মত টেলিফোন বোঝাতে গিয়ে 'কানকা ফুসফুসি' কিংবা রেলওয়ে স্টেশন বলতে গিয়ে 'ঝুকঝুক আড্ডা' বলতে চাইলে তাতে হয়তো কিছু লোকের আত্মপ্রসাদ হবে কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষালাভ হবে না।

হিরণ্যপ্রিয়

প্লট, পরিকল্পনা ও প্রকাশ

শব্দের সাম্রাজ্যে লেখার উপনদী-শাখানদী বিস্তৃত চিন্তাক্ষেত্রে লেখক তার ভাব, বক্তব্য, শব্দ, কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত না তিনি নিজেই এগুলির পরিচালক এ দুটি বিরুদ্ধ ভাব-ধারাকে সহজেই ভেবে দেখা যায়।

মনে হয়, লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি একটি গল্প বা কবিতার বা কোন ভাবনার প্রস্তাবক মাত্র। স্রষ্টার উদ্যোগ এবং রূপসৃষ্টির কাঠামো পর্যন্তই তার কার্য সীমিত। তা হলে বলতে হয়, স্রষ্টার রূপোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু আসল অবস্থাটা বোধহয় তা নয়। রূপকার যখন কাঠামো বাঁধে, খড়-বাঁশের আড়ালে—তার পরিশ্রমী হাতের আড়ালে তার শিল্পীমনে নিশ্চয়ই সেই সম্পূর্ণ মূর্তিটির রূপ এসে তাকে উৎসাহ দেয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে শ্রম এবং শিক্ষা পরস্পরের মুখাপেক্ষি, নইলে অনেক পরিকল্পনা সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে ফুটে ওঠেনা বা প্রকাশ হয়না।

এই আলোচনার সূত্রে আমরা 'তৃতীয় নয়ন' কথাটিকে ব্যবহার করতে পারি। পরিকল্পনা দ্বিতীয় বস্তু। কিন্তু ইচ্ছের বীজটিকে মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায় সেই ক্ষেত্রের অধিকারীই তৃতীয় ক্ষেত্রের অধিকারী। নইলে যে কোন বাজিয়েই হত সুরস্রষ্টা, যে কোন লেখকই হত সাহিত্যিক।

ইচ্ছের পিছনে সক্রিয় যে চেতনাটি কাজ করে, তাকে বলা যেতে পারে পরিকল্পনা শক্তি। এই শক্তিটি মুহূর্তমধ্যে ইচ্ছাকে রূপদানের প্রাথমিক কাজটি সম্পূর্ণ করে। তার পর কিছুকাল ধরে চলে ভাঙ্গাগড়ার খেলা। এবং শেষ পর্যন্ত লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনার পাশাপাশি গল্পের ছক তা সৃষ্টির মোটামুটি রূপের প্রতিনিয়ত বিবর্তন সাধিত হতে থাকে। এক এক সময় একটি সম্পূর্ণ কল্পনাকেও ভেসে যেতে দেখা যায় অন্য একটি পার্শ্ববর্তী চিন্তার ধারাজলে। এবং প্লটের সঙ্গে পরিকল্পনার নিয়ত সংঘাত শিল্পীকে কস্তুরীমৃগের মত যন্ত্রণাসিক্ত করে তোলে। শিল্পীর তখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে প্রকাশ। মানুষ যে আনন্দ থেকে হাসে, সে যন্ত্রণা থেকে কাঁদে, শিল্পী সেই মানুষী যন্ত্রণা আনন্দের বিমিশ্র চেতনা থেকেই সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়।

একটু বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সৃষ্টির আঁতুর ঘরের যে দায়িত্ব বা যন্ত্রণা, তা নবমাতৃত্ব লব্ধ কোন নারীর দায়িত্ব বা যন্ত্রণার সঙ্গেই তুলনীয়।

কিন্তু প্রকাশের আগে আরো একটি কাজ চলতে থাকে স্রষ্টার অজ্ঞাতসারে। তা হল হৃদয় এবং বুদ্ধির মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন। উদ্ভাবনা তথা সৃষ্টির সম্পূর্ণ দায়িত্বই যে মস্তিষ্কের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং অনুভবের দায়িত্বও বোধহয় বুদ্ধিরই। বুদ্ধি অর্থে ভীত হবার কোন কারণ নাই। শিল্পের অনুভবকে স্নায়বিক অনুভূতির প্রতিক্রিয়া মাত্র বললে ঠিক হবে না। এটাকে বরং সকল ইন্দ্রিয়ের এক গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। এবং হৃদয়ের দায়িত্ব শুধুমাত্র অনুভূতির রূপে নিজেকে সমর্পণ করা। যাক, যে কারণেই হোক, এগুলো প্লট ও পরিকল্পনার সমকালীন সময়েই স্রষ্টার মনে যাওয়া আশা করতে করতে ক্রমশ দানা বাঁধে।

প্রকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থা। আজকের ভাবনা, কিংবা ছোট্ট একটি ইংগিত মাত্র, দেখাগেল দীর্ঘসময়ের ওপারে একদিন সেই ইংগিতটি রূপ নিল। লেখকের কল্পনার আকাশে ভাসমান চিন্তাখণ্ড সবসময় চলাফেরা করে। কোনটি স্থায়ী রূপ নেবে, কোনটি নেবেনা শিল্পী স্বয়ং সে কথা স্পষ্ট করে বলতে পারে না। আবার দেখা গেছে, কখনো চিন্তা আসামাত্রই স্রষ্টাকে প্রস্তুত হতে হয়েছে প্রকাশের জন্য, একটু ভেবে নেবারও অবকাশ নেই। কিন্তু লিখতে হবে বলেই কোনকিছু নিয়ে শুরু করলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো রসোত্তীর্ণ হয়না বলেই মনে হয়। কোন ঘটনা চোখে পড়ল, মনে একটা মৃদু অনুভূতি থেকে গেল, ব্যস, ওখানেই শেষ। হঠাৎ দেখা গেল, দীর্ঘদিন পরে সমধর্মী আর একটি ঘটনা। স্রষ্টা আবিষ্কার করল পূর্ব ঘটনার সময়

তার অনুভূতির মুড্‌টা পারফেকসন বর্তমান ঘটনা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই সেই অনুভূতির স্তর যেন হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। শুরু হল প্রকাশ। অবচেতন মনে অনুভূতির দীর্ঘসময়ের প্রস্তুতি মনে হয় লেখকের মনে কনসেনট্রেশনের ঢিলেমীটুকুর পরিপূরক।

কারণ প্লট পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মনে আনুসঙ্গিক অন্যান্য স্তরের ঘটনাগুলি যদি ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয় তবে প্রকাশের বিলম্ব হয় না। পারিপার্শ্বিক বিরোধী চিন্তাধারা যেহেতু শিল্পীকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইহেতু শিল্পীকে সক্রিয়ভাবে তার শিল্পসত্ত্বার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এবং প্রায়শই সেই মুহূর্তে আত্ম সমাহিত একটি ভাব ফুটে ওঠে তার ব্যবহারে তার আচরণে। এটি তাঁর প্রকাশের প্রস্তুতি আত্মনিবেদনের পূর্বমুহূর্ত।

শান্তি লাহিড়ী

লিপিবিবেক।। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ছ-টাকা।
সাজঘর।। ইন্দ্রমিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য দশ টাকা।

লিপিবিবেক একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ। সাতাশটি অতি সংক্ষিপ্ত লেখার সংকলন। লেখাগুলিকে প্রবন্ধ বলা ঠিক হবেনা—কারণ প্রবন্ধের আয়তন এবং গাম্ভীর্য এগুলিতে নেই। অথচ সাহিত্য এবং ভাষাজ্ঞান, উজ্জ্বল বুদ্ধির সংমিশ্রণে কয়েকটি সুন্দর লেখার সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পাঠক অতি হালকা মন নিয়ে এ লেখা পড়তে পারেন এবং বুদ্ধির কৌতুহল নিরসন করে এমন বহু বস্তুর সন্ধান পেতে পারেন। পাণ্ডিত্যের ভাগে লেখাগুলি ভারাক্রান্ত নয় অথচ বিষয়বস্তুর উপরে লেখকের অধিকারের গভীরতা সহজেই অনুভব করা যায়।

মূলতঃ লেখাগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি প্রশ্ন, দ্বিতীয় ভাগে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, তৃতীয়ভাগে বাংলা সাহিত্যের কোন কোন বিশেষ লেখকের আলোচনা চতুর্থ ভাগে অবাঙ্গালী ভারতীয় সাহিত্যের উপর চারটি রচনা। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য পাঠকের ভাল লাগবে। কারণ পড়তে পড়তে নির্বাচনের অবকাশ রয়েছে।

লিপি সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নাগরী লিপি এবং বর্ত-মানের হিন্দী লিপিকে এক করে দিয়ে হিন্দীকে জনপ্রিয় করার এবং কৌশলে দেশের লোকের ঘাড়ে চাপানোর যে খেলা চলছে লেখক সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

ছোটখাটো বানান ভুল যে অনেক সময়েই ছোটখাটো ভুল নয় লেখক তাও দেখিয়েছেন। সর্বশ্রী, সুধী-সংবাদ ইতি-কথা পাঠকের চিন্তাকে নাড়া দেয়। লেখার প্রসাদগুণে পড়তে ভাল লাগে এবং লেখকের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হয় না।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্র-নাথের মহলা উপভোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত লেখনের কথা মনে রেখে 'স্বাক্ষর সাহিত্য' পড়তে ভাল লাগলো।

তৃতীয়াংশের রচনাগুলির মধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেপে মেদিনীপুরের দান' উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ করে বলবো লেখকের রচনা সরল সহজ অথচ কিছুমাত্রায় তরল নয়। সাহিত্য আলোচনা এই ভাষায় হলে অপণ্ডিত পাঠকেরা আরাম পাবেন আনন্দ পাবেন।

সাজঘর গল্পাকারে লেখা বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাস। বাংলায় ইতিপূর্বে তথ্যপ্রধান নাট্যমঞ্চের ইতিহাস রচনার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেখানে সাধারণ পাঠকের কথা মনে না রেখে সাহিত্যের ছাত্রদের কথাই মনে রাখা হয়েছে। ফলে সন তারিখের দাপট, রেফারেন্সের খোঁচা পংক্তিতে পংক্তিতে, ব্যক্তিগত রসের অভাব সাধারণ পাঠককে বিব্রত করে। ইন্দ্রমিত্রের সাজঘর বাংলার নাট্যমঞ্চের সেই ইতিহাস যেখানে মানুষের প্রাধান্য বেশী। যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো গল্প এবং প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলিকে জুড়ে জুড়ে লেখক

মঞ্চ-ইতিহাস পুনর্গঠিত করেছেন এবং বাংলাদেশের একটি গৌরবময় ধারাকে পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

গিরীশচন্দ্রের বাল্যকাহিনী দিয়ে সুরু করে লেখক কয়েক পাতার মধ্যেই ফ্ল্যাশব্যাকের কৌশলে বাংলানাট্যশালার স্রষ্টা লেবেডফের দিনে চলে গেছেন। তারপর নবীন বসু, আশুতোষ দেব, কালীপ্রসন্নসিংহ, পাইকপাড়ার রাজারা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের কাহিনীর সরণী বেয়ে আবার গিরিশচন্দ্রে ফিরে আসা। তারপর গিরিশচন্দ্র থেকে শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত আধুনিক কালের আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কাহিনী।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করার কিছু নেই। উপন্যাসের মত লেখক কাহিনীবিন্যাস করেছেন। তাতে একটা অসুবিধা ঘটতে পারে। অপ্রয়োজনীয় স্থানে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়তে পারে। কাহিনীর চমৎকারিত্বে অতি তুচ্ছ চরিত্র বিশেষ মূল্যবান মনে হতে পারে। অবশ্য তা হলেই বা কি করার আছে। ইতিহাসকে যখন গল্পের ছদ্মবেশে প্রকাশ করতে হবে তখন এটুকু দুর্বলতাকে মেনে নিলেও কোন ক্ষতি নেই।

বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকেরা সাধারণতঃ ইতিহাস-বিমুখ। যদি এইভাবে Sugar-coated ইতিহাস সত্য রক্ষা করে দেওয়া যায় তাহলে সেটা দেশের কাজ হয়। লেখক এই গ্রন্থে শুধু কাহিনী রচনা করেননি, দেশের কাজও করেছেন।

মঞ্জুলা বসু

হামাম
HAMĀM
the family soap
হামাম

হামাম আমার বাড়ীর সবাইকে মাত্ করেছে। এতে আমারও সুবিধা—বিশেষ-ভাবে তৈরি হামাম অনেক খরচ বাঁচায়।

প্রচুর ফেনার মধ্যে স্নানে বিরাট আনন্দ। আর তাইতো আমি হামাম এত ভালবাসি।

হাল্কা মিষ্টি গন্ধে হামাম আমার মন মাতায়।

No. C3597 Phone : 23-5155 July '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেংগল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।
টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১'৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১'৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি. পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

তিনটি বিগ্রহ…

পুরীর জগন্নাথ মহাপ্রভুকে গীতগোবিন্দে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার বলে ধরা হয়। পুরীর মন্দিরের দেবমূর্তিগুলি হল বিশ্বপতি জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রা। এঁরা সকলেই উড়িষ্যার অন্যতম আদিম অধিবাসী সাওরা সম্প্রদায় কর্তৃক বনদেবতারূপে একদা পূজা পেতেন, তারপর যুগ যুগ ধরে এঁদের মাহাত্ম্য দূরে দূরান্তরে প্রচারিত হয়ে গেছে। অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরে বেষ্টিত ১৯২ ফিট উঁচু পুরীর মন্দির ভারতের প্রাচীন মহান কীর্তি-গুলির মধ্যে অন্যতম। চৈতন্যদেবের কাল থেকে পুণ্যতীর্থ হিসাবে এর গৌরব চরমে উঠেছে, সারা পৃথিবী থেকে অগণন লোকের সমাগম হয় এখানে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এই পুরী। এর আরেকটি নাম শ্রীক্ষেত্র, যার অর্থ জগন্নাথের আবাসস্থল। পুরীর রথযাত্রা উৎসবও বহুখ্যাত।

এদেশে যে কোন পর্যটকের কাছেই পুরীর মন্দির একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB./SE/ 6-62

that is the Orient way
Orient
FANS
Years ahead in looks and performance
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-11
ASP/OGI-7

দশম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন্. এন্. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১

শ্রাবণ তেরশ' উনসত্তর

দশম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

স ম কা লী

রাজা রাধাকান্তদেব ও বাঙালী সমাজ-মন

অলোক রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় একেবারেই লেখা হয়নি এমন নয়। রামমোহন রায়ের একাধিক জীবনী আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মজীবনী লিখেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখেছেন 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।' কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে এই সবগুলি গ্রন্থেরই লেখক ব্রাহ্ম, এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ব্রাহ্মদের অসাধারণ দান এবং প্রতিপত্তির কথাই এগুলিতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইতিহাস যদিও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে লেখা হয় তবু অস্বীকার করে লাভ নেই —কোনো না কোনো রঙের অল্পবিস্তর ছাপ তার ওপর পড়বেই। ইংরেজের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস, জার্মানের লেখা ফ্রান্সের ইতিহাস কিংবা আরও স্পষ্টভাবে এই ছাপ লক্ষ্য করা যায় ক্যাথলিকের লেখা, প্রোটেস্টান্টের লেখা, মার্ক্সিস্টের লেখা ইতিহাসে। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। তাওতো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের প্রকৃত ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি—ব্যক্তিজীবনীতে (যা প্রায়শই 'ট্রিবিউট' রচনা) বা আত্মজীবনীতে বিশেষ দৃষ্টির প্রভাব পড়বেই। এর ফলে আমরা ব্রাহ্মধর্মের এবং ব্রাহ্মনেতাদের কথা যত বেশি জানতে পারি, সে যুগের অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারি না। সে যুগটিকে বলা হয়ে থাকে 'রামমোহন যুগ।' অবশ্যই সার্থক নামকরণ। রামমোহনের মত দূরদৃষ্টি, প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব সে যুগে আর কারোরই ছিল না। কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহন নিজে একটা যুগ নন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে রামমোহনের ঠিক কতটুকু প্রভাব ছিল তা আজও ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে। সে যুগের সাধারণ মানুষ তখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু। তাই যুগের পরিচয় নিতে হলে সেই অগণিত সাধারণ মানুষের ভাবনা চিন্তার খোঁজ রাখতে হবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মরা যেমন নিজেদের কার্যকলাপ বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় লিখে গেছেন (বলাবাহুল্য প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা লিখেছেন), হিন্দু সমাজের মানস-

ইতিহাস কোনো হিন্দুই লিখে রাখেননি। (অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য একটি বইও নেই)। হিন্দুরা তখন সমাজে প্রাধান্য পেতেন ফলে নিজেদের স্থান সম্বন্ধে অতিরিক্ত অহমিকাতেই নিজেদের কাজকর্মের কথা প্রচার করার দিকটা ভাবেননি। বর্তমান কালে আমরা যারা ধর্মের কোনোরকম সংস্কার দ্বারা বদ্ধ নই—যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি অবলম্বন করি, তাদের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে পুনরায় ভেবে দেখবার সময় এসেছে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটির কাছে আমাদের ঋণ প্রচুর, কিন্তু তাকেই একমাত্র প্রামাণ্য মেনে, বেদবাক্য মনে করার কারণ নেই। সেই যুগের বহুধা বিভক্ত চিন্তারাশি এবং ধর্মমত ও সমাজ রীতির সংঘর্ষের প্রকৃত পরিচয় এযাবৎ আদৌ লেখাই হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশে প্রধানত চারটি ভাবধারা ক্রিয়াশীল দেখতে পাই। প্রথম ধারাটি হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তরুণ বাঙ্গালী ছাত্র সম্প্রদায়—হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ বা পরবর্তী কালে প্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল'১। এ'রা যা কিছু ভারতীয় এবং হিন্দু ধর্ম-চিহ্নিত,—সব কিছুকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভাঙ্গনের মন্ত্র এ'রা গ্রহণ করেছিলেন, নবজাগরণের মূলে পুরাতনের যে অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী, তাকেই এ'রা দ্রুতগামী করেছিলেন। টমাস পেইনের লেখাই ছিল এ'দের ধর্মগ্রন্থ, ডিরোজিওর মুখ নিঃসৃত বাণীকে এ'রা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন। বলাই বাহুল্য 'ইয়ংবেঙ্গল' সম্প্রদায় ছিল একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র,—যা কিছু রীতি, তাকেই ভাঙ্গো; বাংলা ও বাঙ্গালীকে ভোলো, ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মদ্য এবং নিষিদ্ধ মাংসকেও বরণ করে নাও। ফলে যে কোনো প্রতিক্রিয়ার মতোই এর তীব্রতা যতখানি ছিল, ততখানি ব্যাপ্তি ছিল না। ২ ইয়ংবেঙ্গলের দলে যাঁরা ছিলেন, যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪?—?), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮) রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮?) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র, মাধব মল্লিক প্রভৃতি,—তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের সামাজিক এবং শিক্ষামূলক সব কিছু সংস্কারেরই সহায়ক এবং সক্রিয় কর্মী হওয়ায় তাঁদের কাছে পরবর্তী যুগের ঋণ অনেক—কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশে এবং পরবর্তী কালেতে বটেই, এ'দের কোনো সত্যকারের প্রভাব ছিল না। বাংলাদেশের সমাজের একটি অতিক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধি এ'রা, সমগ্র সমাজ বা সমগ্র যুগের পরিচয় নন এ'রা।

সেটা সম্ভবও ছিল না। রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৫) পক্ষেই কি সম্ভব হয়েছিল? রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮১৪ তে। তারপর থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি উন্নতিশীল সমাজ সংস্কারমূলক কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ থেকে সুরু করে ব্রাহ্মসভা স্থাপন পর্যন্ত অজস্র কাজ করেছেন। লোকে তাঁর মনীষাকে শ্রদ্ধা করতো—কিন্তু তবু

(১) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথ নাথ ঘোষ (কলিকাতা ১৯১৭)
The Hindu College and the Reforming Young Bengal—Dr. S. K. De (P. C. Ray commemoration Volume, 1932) p. 101—120.

(২) Indeed, the excess of the reforming zeal of those who came out of the Hindu College testified to a radical defect in their system of education. Behind the creation of the College there was hardly any clear creative idea'.—Dr. S. K. De (ibid.).

তাঁর মধ্যেই সমাজের সমগ্র মন প্রতিফলিত হোলো না কেন?৩ বাংলাদেশে একবার মাত্র বোধহয় সেটি সম্ভব হয়েছিল এবং তা বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে। আসলে রামমোহনের মনীষার সঙ্গে হৃদয়-বত্তার প্রকৃত যোগ ঘটেনি। (রামমোহন তিনবার বিবাহ করেন; দ্বিতীয় পত্নীর জীবিতাবস্থায় তৃতীয় পত্নী গ্রহণ কি করে সমর্থন করবো?)। রামমোহন প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মোপাসনাতেতো লোকের বিশেষ উত্তেজিত হবার কারণ ছিল না, বাংলাদেশে বৈদান্তিক এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিতের কোনোদিনই অভাব নেই। কিন্তু ধর্মমতের প্রশ্ন ততখানি নয়, যতখানি সমাজ মনের প্রশ্ন। ইংরেজী শিক্ষিত রামমোহন ইংরেজী যুক্তিবাদের সাহায্যেই ইংরেজী কায়দায় দেশীয় সমাজসংস্কারকে অস্বীকার করলেন। একেশ্বরবাদী হওয়াটা আপত্তির কারণ নয়, কিন্তু পৌত্তলিক ধর্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করাটা সমাজের চোখে ক্ষমার অযোগ্য। সত্যিকথা বলতে কি আপামর বাংলার জনসাধারণ এমনকি শিক্ষিত সমাজও রামমোহনের গ্রন্থ পড়ে নিজেদের দেবীবিশ্বাস বিসর্জন দেয়নি।৪ সংস্কার মাত্রেই দূষণীয় এমন মনে করা ভুল। মানুষের মধ্যে আজন্ম সঞ্চিত কতকগুলি সংস্কার বিদ্যমান, যেগুলি সমাজদেহে রক্ত সঞ্চালনের শিরাউপশিরা। তবে সংস্কারের মধ্যে ভালোও আছে, মন্দও আছে (কনভেনশন এবং ইভিল সুপারষ্টিসন্-এর মধ্যে পার্থক্য আছে)—একসঙ্গে সব কিছুকে বরবাদ করে দিলে সমাজ মনে যে আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়, তাতে সামাজিক সত্তা হিংস্র নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে দূর হয়ে থাকে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। জোর করে কোনো জিনিষকে চাপিয়ে দিতে গেলে, তার মধ্যে যুক্তির প্রাবল্য থাকা সত্ত্বেও সহজভাবে তাকে মেনে নেওয়া যায় না। রামমোহন বাংলাদেশের সমাজসত্তার আন্তর পরিচয়টি গ্রহণ করেননি, আর তারই ফলে সমাজ সত্তা এবং জনচিত্ত তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রভাব বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রকৃত প্রচার এবং প্রসার হয় কেশবচন্দ্রের হাতে।

তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে সেই স্বল্পসংখ্যক বাঙালী যুবক যাঁরা হঠাৎ খৃষ্টান হয়ে গেলেন। অবশ্য খৃষ্টান হওয়ার কারণ সকলের পক্ষেই এক ছিল না, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩—১৮৮৫) মত কেউ বাধ্য হয়ে সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যই খৃষ্টান

(৩) 'তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয় কমিটি হইতে তাড়িত হইয়া নিজ ধর্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯, পৃঃ ৬২)

'রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পত্রলিখিলেন তাহাতে **তাঁহার কতিপয় বন্ধু** ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না। (ঐ পৃঃ ১১০)

(৪) 'তাহাতে তত্ত্ববোধিনী আপনার অবলম্বিত ধর্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে তাহার অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে পারে কিনা? এই বিচার ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে উপস্থিত হইল। ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন, এবং বাহির হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ **শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম দিগকে কপট ও ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।**' (ঐ পৃঃ ১৭৩)

হয়েছিলেন, (১৭ অক্টোবর ১৮৩২), আবার কেউ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত ঐহিক প্রলোভনে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন (১০ই জুলাই ১৮১৫); মধুসূদন দত্ত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 'For the Albion's distant shore' (৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩)—এবং এর মধ্যে ঐহিক কামনা পূরণের ইচ্ছাই প্রধান; অবশ্য মহেশচন্দ্র ঘোষের মত উচ্ছাসপ্রবণ যুবক যা কিছু হিন্দুয়ানী তার উপর বিরাগবশতই খৃষ্টনাম শরণ করেছিলেন (আগস্ট ১৮৩২)। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের দোলাচলচিত্তবৃত্তি হঠাৎ অ-হিন্দু কিছু করতে হবে বলেই খ্রীস্টান হয়েছিল।

চতুর্থধারা হচ্ছে ধর্মসভার দল, যার নায়ক ছিলেন রাধাকান্তদেব (১৭৮৩—১৮৬৭)৫। সে সময়ে বাংলাদেশে যাঁরা ধনে-জনে-মানে প্রতিপত্তিশীল, যেমন মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দেওয়ান রামকমল সেন, উমানন্দ ঠাকুর, জয় নারায়ণ মিত্র, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, নীলমণি দে, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, রামগোপাল মল্লিক, কাশীনাথ মল্লিক, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মসভার সম্পাদক—তিনি সেই সঙ্গেই ধর্মসভার মুখপত্র 'সংবাদ চন্দ্রিকা'ও সম্পাদনা করতেন। সভার উদ্দেশ্য সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এই রকম ছিল—'শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজ্যশাসনের দ্বারা ধর্মরক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয় বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্মরক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্মরক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতু অরাজকে সজাতীয় বৈধর্মিসমূহ হইতে পারে তৎসংসৃষ্ট দোষে নির্দোষ ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন অরাজক হইয়াছে তখনই ধার্মিকগণ দলবন্ধ হইয়া স্ব স্ব ধর্মরক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্মিকেরা দলবন্ধ হইয়া ধর্মরক্ষা করিবেন ইহা শাস্ত্রবিধি বটে, মন্বাদির শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। আমরা দিগের ভাগ্যহেতু ধর্মপক্ষ রক্ষা বিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইহার মত এই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম আপনারা রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম ধর্ম জন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্মযাজনকরণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্মনাশ হওন সম্ভাবনা। অপর রাজা কর্তৃকও এক ধর্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধার্মিক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্মসভা স্থাপিত করেন।৬ ঐ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে....। নিয়মপত্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্মসভার তার্যপর্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্মকর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ে নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।' (সংবাদ চন্দ্রিকা ১৬ পৌষ ১২৩৯)।

ধর্মসভার দলকে বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল এবং পিছিয়ে পড়ার দল বলে সাধারণতঃ সমালোচনা করা হয়ে থাকে। ধর্মসভা যে রক্ষণশীল হিন্দুদের সংগঠন ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই—

(৫) 'It is evident that Rajah Sir Radhakant was essentially a representative man, and exercises no inconsiderable influence on the affairs of Orthodox Hindus. The life lived by him was truly honourable and laudable. It was a life of unselfish devotion to literature and to what he esteemed the interests of his country. The memory of such a man belongs, not to any particular class or community of men, but in the heritage of civilized world (The Calcutta Review, 1867).

(৬) ১৭ জানুয়ারী ১৮৩০

কিন্তু আমরা যারা বর্তমানে হিন্দুধর্মেরই ধার ধারিনা, তাদের পক্ষ থেকে ধর্মসভার ন্যায্যবিচার হওয়া প্রয়োজন বিবেচনায় আমি সে সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করবো। আমার ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর সেই মধ্যভাগে বাংলাদেশে গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যাই বেশি ছিল— এবং ধর্মসভা মোটের ওপর সেই যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আপামর জনসাধারণের সমর্থন পেতো—বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে তাই ধর্মসভার গুরুত্ব এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ধর্মসভার প্রাণ ছিলেন রাধাকান্ত দেব। শোভাবাজারের রাজা। সংস্কৃত, আরবী, পারসী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষায় তাঁর প্রচুর দখল ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজীটাও তিনি ভালো করেই শিখেছিলেন।৭ ধর্মসভার প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে ধর্মসভা সতীদাহ প্রথা সমর্থন কল্পেই প্রতিষ্ঠিত। রাধাকান্ত দেবকে এর জন্য একনম্বর আসামী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ৮ কিন্তু একজন ইংরেজী শিক্ষিত বিদ্বান বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে এই কাজটি করা কেন সম্ভব হয়েছিল তার ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয়ে আমরা এযাবৎ উৎসাহী হইনি। প্রকৃতপক্ষে রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর ধর্মসভা সতীদাহ প্রথা নিবারণের আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন তা হচ্ছে বিদেশী সরকার কর্তৃক দেশীয় সামাজিক রীতিনীতির ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিদেশী সরকার যে ধীরে ধীরে এদেশের সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমিকে নড়িয়ে দিয়ে, বাইরে থেকে তাদের নিজেদের মূল্য বোধের সাহায্যে দেশীয় জীবনযাত্রাকে বিচার করতে চাইছে—তার ভবিষ্যৎ কুফল সম্বন্ধে রাধাকান্ত সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকার বলছেন—'**শোভাবাজার রাজপরিবারে কখনও সতীদাহ প্রথা অনুসৃত হয় নাই**। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাধাকান্ত বিশেষ মর্মপীড়া অনুভব করিতেন। তবে কোনো সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার হস্তক্ষেপ করেন, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।' (সাহিত্য সাধক চরিত মালা—২০, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৩৯)।

সে যুগে এদেশীয় সকলের মনেই একটি প্রবল ভীতি সঞ্চারিত হচ্ছিল যে, ইংরেজরা এই দেশ জয় করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তারা ছলে বলে কৌশলে হিন্দুদের খৃষ্টান করবেই। সে সময়ে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপই এঁদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। আর তাই এই ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষ থেকে রামমোহন রায়ই খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং বলাই বাহুল্য রাধাকান্ত দেব এই কাজে রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। আসলে তখন ব্রাহ্মবিদ্বেষের বিশেষ প্রসার হয়নি। ভারত সভা যখন হোলো ৯ তখন দেখতে পাই তার সভাপতি হচ্ছেন রাধাকান্ত দেব আর সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি তখন ব্রাহ্মসমাজেরও সম্পাদক)। অর্থাৎ

---

(৭) কলিকাতার বিখ্যাত বিশপ হিবার রাধাকান্ত দেবের ইংরেজী জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন—রাধাকান্ত সুন্দর ইংরেজী বলতে পারতেন,—বিখ্যাত ইংরেজী লেখকদের সমস্ত বইই তিনি পড়েছেন; বিশেষতঃ ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকই তাঁর পড়তে বাকী নেই।' (হেবার্স জার্নাল ;১৮২৪)

(৮) '১৮৫০ সালে তিনি (রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) একখানি বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে রাধাকান্তকে গাধাকান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১১৭)।

সেযুগে রাধাকান্ত দেবের তীব্রতম সমালোচক ছিলেন কিশোরী চাঁদ মিত্র, যাঁকে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করতে পারি। দ্রঃ (Radhakant Dev'—by Kissory Chand Mitra (Calcutta Review, August 1867).

(৯) বিস্তৃতবিবরণের জন্য দ্রঃ—কিশোরী চাঁদ মিত্র—মন্মথ নাথ ঘোষ (কলিকাতা ১৯২৬)

মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে তারা একত্রিত হতে পারতেন এবং একত্রিত ভাবেই কাজ করতেন। ১০

আমরা যখন রাধাকান্ত দেবকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস থেকে একপাশে সরিয়ে রাখি, তখন ভুলে যাই যে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেই এদেশের ইতিহাসে কত উচ্চে তাঁর স্থান। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর একাগ্রভাবে রাধাকান্ত শুধু যে তার সংগে যুক্ত ছিলেন তাইই না, প্রচন্ড কর্মপ্রেরণায় যা কাজ করেছেন তা আজও হিন্দুকলেজের বিবরণীতে কাগজ কলমে লিখিত আছে। অবসর গ্রহণের সময়ে কলেজের পরিচালনা সমিতির সভাপতি বেথুন সাহেব ২৯শে জুলাই ১৮৫০ সালের কার্যবিবরণীর এই অংশটি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন—'Resolved that this meeting cannot allow Rajah Radhakant Deb to retire from an active share in the management of the Hindu College, without placing on record their sense to the services which the Rajah had rendered to the cause of education in India during the long period of thirty-four years, which has elapsed, since his first connection with the establishment of the Bidyalia in Calcutta; and they desire to express their hope that he may be long spared in good health and vigorous old age to witness the good effects of the spread of that enlightened spirit of intelligence, which he has so instrumental in encouraging.'১১

উৎকৃষ্ট ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক সংগ্রহ, রচনা এবং প্রকাশ করবার জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। বিবিধপুস্তক সংকলিত ও প্রণীত হতে থাকলো।

১০। রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন সমাজ অত্যন্ত বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিল, যার ফলে ধর্মসভার অন্যতম বিরোধী এবং ব্যঙ্গ-অভ্যস্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক পর্যন্ত বারবার তাঁর পত্রিকায় রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দুইটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে গ্রহণ করছি—'এই রাজ্য মধ্যে শ্রীল শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যেরূপ সুবিজ্ঞ সম্বিদ্বান ও দূরদর্শী অন্য কাহাকেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না, অপার জলধীতুল্য সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় পারদর্শি ব্যক্তি ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে কেহই নাই।' (সংবাদ প্রভাকর, ১০ অগস্ট ১৮৫৪)। 'এই বঙ্গদেশের প্রধান সম্ভ্রান্ত অতি সুশীল, সম্বিদ্বান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ধার ধারেন না, বাণিজ্যের গন্ডি মধ্যে কখনই পদক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু কি চমৎকার। খপুস্পের ন্যায় এক মিথ্যা বিষয়ে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। রাজ্যেশ্বরেরা অত্যন্ত অবিচারপূর্বক তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই রাজাত্যাচারে ভারতবর্ষবাসি মনুষ্য মাত্রেই মর্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ জাতির প্রতি আমাদিগের যে এক শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজরা অতিমর্যাদক বলিয়া যে এক বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিয়াছে। ইংরেজরা দয়াতে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা অগ্রে অতিশয় আনন্দিত ছিলাম, কিন্তু এই রাজার ব্যাপারে বিশিষ্ট রূপে জানা গেল যে ইহারা অনেকদিন পূর্বেই আপনারদিগের সেই দয়ার গয়া করিয়া বসিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের অপমানে হিন্দুজাতির উচ্চ অভিমান, উচ্চমান, অভিমানে ম্রিয়মান হইয়াছে, সম্ভ্রমের প্রদীপ একেবারে নির্বাণ হইয়াছে। (সংবাদ প্রভাকর ১২ই এপ্রিল-১৮৪৯)—এই প্রসংগে আমার লেখা 'ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ মন' প্রবন্ধটি (সমকালীন; কার্তিক ১৩৬৫) দ্রষ্টব্য ।।

(১১) **Extract from the article, namely 'Radhakant Deb' by Kissory Chand Mitter published in the Calcutta Review of August 1867.**

কিন্তু দেশে গোল উঠলো ঐ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত বই পড়লেই হিন্দু বালকেরা খৃষ্টান হয়ে যাবে। রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।১২ তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দান করলেন যে ঐ সকল পুস্তক পাঠে খৃষ্টান হবার কোন সম্ভাবনা নেই—হিন্দুরা তবেই নিরস্ত হলেন। এর আগে হিন্দু কলেজের গোড়ার দিকেও এই জাতীয় কিছু প্রশ্ন উঠেছিল—যেহেতু গভর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসব করছে, কাজেই এর মধ্যে নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্ম প্রচারের কোনো উদ্দেশ্য আছে, এমন সন্দেহ সাধারণ লোক করতে আরম্ভ করেছিল। তখন রাধাকান্ত দেবই হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এই কলেজে কোনো রকম খৃষ্টধর্মের উপদেশ দেওয়া হবে না। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দিলে রাধাকান্ত নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়কে সাহায্য এবং শিক্ষার ব্যাপারে উন্নতিমূলক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮১৮ (১লা সেপ্টেম্বর) সালে যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়, ডেভিড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেব তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। (হেয়ারকে য়ুরোপীয় সম্পাদক এবং রাধাকান্তকে দেশীয় সম্পাদক বলা হোতো।) পরিচালনা সমিতির চবিবশজন সভ্য ছিলেন, যার মধ্যে ষোলজন য়ুরোপীয় এবং আটজন দেশীয় ছিলেন। প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পাদকদ্বয় ছাড়া আর ছিলেন, সভাপতি সার আন্টনি বুলার, সহসভাপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন এবং জে. পি. লার্কিনস; কোষাধ্যক্ষ জে বারেটো এবং কলেক্টর এস. লাপ্রাঞ্জ। উদ্দেশ্যগুলি যথাবিহিত ভাবে সুপরিচালিত করবার জন্য সমিতির তিনটি বিভাগীয় কার্যক্রম স্থির হয়, একটি কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি নিয়মিত বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাদের নানারকম সাহায্যদান, অন্যটি হচ্ছে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ পাঠশালাগুলির উন্নতি সাধন এবং তৎকল্পে সাহায্যদান, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি ছাত্রকে ইংরেজী এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদান। প্রথম বছরের শেষেই প্রায় দশ হাজার টাকা দান পাওয়া গিয়েছিল। ফলে সমিতির পক্ষে তার কার্যকম চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ বাধা ছিল না। প্রথমে দুটি নিয়মিত বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় যাদের সাধারণতঃ বলা হোতো 'নমিনাল ইস্কুলস'—যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির সামনে আদর্শরূপে বিরাজ করা, যার ফলে অন্যদের পক্ষেও অনুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক ছিল, কারণ ধীরে ধীরে শিক্ষাবিস্তার এবং বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠানোতে অভিভাবকদের অভ্যস্ত করাই স্কুল সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ঠনঠনে আর কলেজ স্কোয়ারে এই দুটি বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। প্রথমটিতে ইংরেজি বাংলা দুটি বিভাগ ছিল, দ্বিতীয়টি শুধু ইংরেজি স্কুল ছিল। ১৮৩৪ সালে এই উভয় বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়ে ডেভিড হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত হয়।

রাধাকান্ত দেব এই স্কুল সোসাইটির উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সমিতির দেশীয় সম্পাদকরূপে তিনি প্রচুর পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালয় দুটি এবং হেয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক পাঠশালাগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করতেন। নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন করে, নিয়মিত পরিদর্শন এবং নিজ শোভাবাজার রাজবাটিতে নিয়মিত পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদির সাহায্যে পাঠশালাগুলির প্রভূত

---

(১২) স্কুল বুক সোসাইটির মধ্যে চারজন হিন্দু সভ্য ছিলেন; রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্র। (সোসাইটির সঙ্গে রাধাকান্ত দেবের তেত্রিশ বছরের যোগাযোগের স্বীকৃতির জন্য দ্রষ্টব্য — *Proceedings of the 15th Report of C.S.B.S., Calcutta 1852*).

উন্নতি করতে রাধাকান্ত সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮২০ সালে রাধাকান্ত দেব সর্বপ্রথমে ইংরেজি পুস্তকের অনুকরণে বাংলা বর্ণপরিচয় ও নীতিকথা নামক পুস্তক রচনা করেন। দেশীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ডেভিড হেয়ারের সকল প্রচেষ্টার প্রতি রাধাকান্তের পূর্ণসমর্থন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষামূলক সকল ক্ষেত্রেই রাধাকান্ত একান্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। সেইজনাই হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা হয়েও স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন। শুধু তাই নয়, 'It was, however, from the pen of a leader of the Orthodox Camp, Raja Radhakanta Dev, that the first book for the education of women—'Stri—Sikhavidhyak' came out.'১৩

স্কুল বুক সোসাইটির তৎকালীন প্রধান পন্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় রাধাকান্ত এই 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি রচনা করেন। স্ত্রীলোকগণকে লেখাপড়া শেখানো অশাস্ত্রীয় নয় এবং পূর্বকালের স্ত্রীরা সুশিক্ষিতা হতেন, এই পুস্তকে তাহাই প্রতিপন্ন করা হয়—যখন দেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল—স্ত্রী লেখাপড়া শিখলে স্বামীর মৃত্যু হয় এমন ধারণাও স্ত্রীলোকগণের মন অধিকার করেছিল—তখন একজন হিন্দু প্রধানের দ্বারা এইরূপ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুসম্প্রদায়ও সাময়িকভাবে রাধাকান্তের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

শুধু পুস্তক রচনা করেই রাধাকান্ত ক্ষান্ত থাকেননি, আপনার অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণের মধ্যে শিক্ষা দানের উপায়ও করেছিলেন। সেসময়ে মেয়েদের বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে শিক্ষাদানের কথা হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তাই তিনি নিজের বাড়িতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় অল্পবয়স্কা বালিকাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্কুল কমিটি দ্বারা কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তার ছাত্রীদের আপনার গৃহে এনে পারিতোষিক দিতে লাগলেন। বেথুন সাহেবের প্রকাশ্য স্কুলের প্রতি অবশ্য তাঁর সমর্থন ছিলনা, কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের অন্তঃপুর শিক্ষায় এবং অল্পবয়স্কা বালিকাদের স্বস্বগৃহস্থ পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণে তিনি বাধা দিতেন না। এতে অনেকে অনুমান করেন, স্কুল কমিটির বালিকা বিদ্যালয়গুলির নানা মন্দফল দেখে তিনি এইরূপ মত গঠন করেছিলেন। কিন্তু এই মনোবৃত্তি কোনোরকমেই প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পারি না। সেযুগে রাধাকান্ত দেবের সবচেয়ে তীব্র সমালোচক কিশোরী চাঁদ মিত্র পর্যন্ত তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন — 'This fact, however, clearly proves that he was deeply impressed with the evils of allowing women to be brought up in ignorance and idleness ...... The late Honourable Mr. Bethune addressed him a complimentary letter, for being the first Hindu in modern times who advocated female education.'১৪

রাধাকান্তের অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত ছিল। তিনি ধর্মান্ধ হিন্দুর মতো অনিষ্টকর প্রথার অনুষ্ঠান বা প্রচলনে উৎসুক ছিলেন না। তাঁর সময়ে এদেশের একজন প্রধান ক্ষমতাশালী লোক য়ুরোপ দর্শন করে প্রত্যাগত হন। কয়েকজন ধার্মিকম্মন্য তাঁকে জাতিচ্যুত করবার জন্য

(১৩) Western Influence of Bengali Literature: Professor Priyaranjan Sen (1932).
(১৪) Radhakant Dev (Calcutta Review, August 1867).

রাধাকান্তের সংগে পরামর্শ করেন। রাজা তাঁদের পরামর্শ শোনেননি। অধিকন্তু 'যিনি ইয়রোপ দর্শনে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা এদেশের অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত গিয়া তিনি ঘৃণার পাত্র হন নাই, প্রত্যুত অধিকতর সম্মানের ভাজন হইয়াছেন'—ইত্যাদি উপদেশ দিয়া তাঁদের সেইরূপ দুশ্চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেন। ১৫ অনেকে বলেন, তিনি কতকগুলি হিতানুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত হিতানুষ্ঠানে কখনোই বাধা দিতে আমরা তাঁকে দেখিনি। এদেশের লোকের ডাক্তারী শেখবার জন্য বিলাত পাঠাবার চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। যখন অধিকাংশ হিন্দুই মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, তখন তিনি তাঁর অনুরাগী সম্প্রদায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তা সমর্থন করতেন। ১৬

উন্নতি জিনিষটা আকাশ ফুঁড়ে নামে না। উন্নতি করবো বললেই করা যায় না। কিংবা হয়তো করা যায় বইয়ের পাতায় — তত্ত্ব হিসেব পরিবেশন। কিন্তু 'উন্নতি' তো কেবল একটা তত্ত্ব নয়। কার উন্নতি? অবশ্যই মানুষের, সাধারণ মানুষের। সেই সাধারণ সমাজ মনের সংগে যুগপ্রবর্তক মানুষটির অন্তরের যোগ থাকা চাই, তা না হলে বাইরে থেকে, আইন করে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের মনকে সেই উন্নতি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে, যাতে সে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সমাজের কুসংস্কারকে গাঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবে। ফলে এই মানসিক অবস্থা পাওয়ার জন্য সময়ের দরকার, হঠাৎ কিছুই হয় না। রাধাকান্ত দেব সে যুগের সমাজমনের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন — তিনিও সমাজের উন্নতি চাইতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এও তিনি জানতেন, অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত আপামর বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনসাধারণের মন থেকে একদিনেই সব সংস্কারের বেড়া ভেঙে ফেলা চলবেনা। তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি দরকার। এবং বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে রাধাকান্তের সেইটিই মহত্তম দান যে, তিনি সমাজমনকে পরিবর্তিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য হঠকারিতা করে বসেননি। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শুধু ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়েরই

১৫। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে (১৪ মে ১৮৬৭) যে বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়, তাতে রমানাথ ঠাকুরের ভাষণ দ্রষ্টব্য।
('Proceedings of a Public Meeting to do Honour to the memory of the Raja Sir Radhakant Bahadur, C.I.E.': Edited and published by his son Rajah Rajendranarayan Dev Bahadur, Calcutta 1880).

(১৬) Ibid. Raja Rajendralal Mitra's speech: 'He may not have been all that some so-called reformer of our day could wish. He may have placed himself in opposition to many of them. A Hindoo brought up in the faith of his ancestors, he may have set his face against infantile and juvenile conversions; he certainly objected to the slaughter of cows and strongly reprobated licentious indulgence in spirituous liquors, which to many appear as the stepping stone to reformation. But, Sir, he never offered opposition to any measure of real usefulness; and had nothing of the bigotry of a partizan. *He was no enemy to real reformers.* He found no fault with those who dissected the human body in the Medical College. He subscribed as freely to the fund for sending native youths to England to prosecute their studies in medicine as for any orthodox undertaking'.

পুরোধা ছিলেন না, ধর্মভীরু খৃস্টানও ছিলেন পরবর্তী জীবনে, এবং হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামীর প্রতি যার কিছুমাত্র আস্থা ছিলনা,—তিনিও রাঁধাকান্তদেবের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন — 'To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century; as unfair, indeed as it would be disparge the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standard, Raja would certainly appear not behind, but in *advance* of his equals in age'.১৭

(১৭) Ibid.

হেনরী টমাস্ কোলব্রুক্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

হেনরী টমাস্ কোলব্রুক ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সার জর্জ কোলব্রুক (ব্যারণ) একজন ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল; সাধারণ ভাবে তিনি একজন মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ও পরে ইহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। টমাস্ কোলব্রুকের পিতা তাহাকে গতানুগতিকভাবে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি না করিয়া স্বগৃহেই তাঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেন। মেধাবী ও অধ্যয়নশীল টমাস্ অতি অল্প বয়সেই বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করেন, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান ফরাসী প্রভৃতি ভাষা এবং গণিতশাস্ত্রের চর্চাতেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের পদ লাভ করিয়া টমাস কোলব্রুক ভারতে আসেন। কলিকাতায় আসার কিছুদিন পর তাঁহাকে সরকারী হিসাব বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। কলিকাতায় আসিয়া কোলব্রুক মনে শান্তি পান নাই। কোম্পানীর নির্মম শাসন ও শোষণের দৃষ্টান্ত তাঁহার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে। কলিকাতায় য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের ধর্ম ও নীতি বর্জিত জীবন যাত্রা প্রণালীর সহিত তিনি নিজের জীবন ধারার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই মানসিক অস্থিরতার ফলে ভারতবাসের প্রথম পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন নাই। চার্লস উইল্‌কিন্সের সংস্কৃত নিষ্ঠা এই সময়ে তাঁহার নিকট পাগলামি বলিয়া মনে হইয়াছিল। পিতার নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি চার্লস উইল্‌কিন্সকে সংস্কৃত পাগল বলিয়া অভিহিত করেন (SanskritMad)। ভারতবিদ্যানুরাগী পিতা সার জর্জ পুত্রকে প্রায়ই ভারতবিদ্যাচর্চা করিতে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন ও নানা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইতেন। পুত্র টমাস্ সময়াভাবের অজুহাতে ভারতবিদ্যা চর্চা এড়াইয়া যাইতেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুককে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ত্রিহুতের (মজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা) সহকারী কালেক্টর রূপে বদলী করা হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পূর্ণিয়ার য়্যাসিষ্টেন্ট্ কালেক্টর তখন তাঁহাকে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখার ভার দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট লিখিতে গিয়া তিনি বাঙ্গলা দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীন ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। কোম্পানী প্রজাদের কি নির্মম ভাবে শোষণ করেন এবং তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য নীতিতে বাঙ্গলা দেশের ছোট ছোট কুটির শিল্পগুলি কি ভাবে ধ্বংস হইতেছে তাহার এক যথাযথ চিত্র এই রিপোর্টে উপস্থাপিত করা হয়।। এই রিপোর্টটি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী ব্যবহারের জন্য মুদ্রিত হলে (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রত বোধ করেন, এই রিপোর্টটি যাহাতে কোনক্রমেই লণ্ডনে না পৌছায় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই রিপোর্টটি পাওয়ার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোলব্রুকের উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হন। সম্ভবতঃ স্বদেশে কোলব্রুকের পিতা সার জর্জের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কোলব্রুককে কোম্পানীর চাকুরী হইতে অপসারিত করার চেষ্টা হইতে বিরত হন। পূর্ণিয়ায়

বাসকালে কোলব্রুক মনোযোগ সহকারে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ উত্তমরূপে অধিগত হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উইলিয়ম জোন্স ও উইল্‌কিন্সের ভারতবিদ্যানুরাগ ও সাফল্য তাঁহাকে সংস্কৃত চর্চায় অনুপ্রাণিত করে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নাটোরে কালেক্টর রূপে কার্য করিবার সময় হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী চুক্তি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। সার উইলিয়ম জোন্স ইহা আরম্ভ করিয়া যান। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর সরকারী অনুরোধে কোলব্রুক এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া কোলব্রুক এই দায়িত্ব পালন করেন। এই পুস্তক চারিখণ্ডে কলিকাতা হইতে ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (২)। ইতিপূর্বে হ্যালহেড কর্তৃক সংকলিত A Code of Gentoo Law পুস্তকখানি হইতে এই পুস্তকখানি সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও নির্ভর-যোগ্য হওয়ায় ইহা দ্বারা দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এই যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ভারতের গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং কোলব্রুককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইতিপূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় হিন্দু বিধবার কর্তব্য, ভারতীয় পরিমাপ (ওজন), ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং হিন্দুদের উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া কোলব্রুক ভারতবিদ্যাবিদদের প্রশংসা অর্জন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্যে কয়েকবৎসর কোলব্রুককে বারাণসীর নিকট মির্জাপুরে বাস করিতে হয়, এই সময়ে তিনি বারাণসীর পণ্ডিতদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া নিজের সংস্কৃত বিদ্যা পরিবর্ধিত করেন। মির্জাপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কোলব্রুক কিছুকাল নাগপুরেও বাস করেন। অতঃপর হিন্দু আইনে গভীর ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতি রূপে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক কলিকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতির পদ লাভ করেন। তদানীন্তন কালে সুপ্রীম কোর্টের পরেই এই আদালতের স্থান ছিল—এখানে শরিয়ৎ ও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বিচার নিষ্পন্ন হইত, চারি বৎসর পরে কোলব্রুক এই বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি কোলব্রুককে লর্ড ওয়েলেসলী এই নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দু আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল পরে প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ও বিচারপতি এবং অধ্যাপক এই দুইটি মনোমত পদ লাভ করিয়া কোলব্রুক সাতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। অধ্যাপনার সুবিধার জন্য কোল-ব্রুক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (৩)। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অধ্যাপনা ও বিচার কার্যের অবসরে কোলব্রুক সর্বদা সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকিতেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় কোলব্রুক্ বেদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (on the vedas or sacred writings of the Hindus-Asiatic Researches) ইহার পূর্বে বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পরিজ্ঞাত ছিল। ডাঃ উইনটারনিৎজ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কোলব্রুকই বেদ সম্বন্ধে প্রথম নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন (দ্রঃ History of Indian Literature, Vol 1, Winternitz, P .15) বেদসম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থটি তাঁহার 'মিসলেনিয়াস্ এসেস্' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার বাহিরে থাকিলেও এশিয়াটিক সোসাইটি ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সার উইলিয়ম জোন্সের সহিত কোলব্রুকের হৃদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সার উইলিয়ম জোন্স কোলব্রুকের সংস্কৃত চর্চায় অন্যতম উৎসাহ দাতা ছিলেন। দীর্ঘকাল মফঃস্বলে থাকার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তাহার ছয়বৎসর পূর্বে তাঁহার সংস্কৃত চর্চার উৎসাহদাতা জোন্স গতায়ু হইয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মধারার সহিত স্বাভাবিক ভাবেই সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ভারত ত্যাগের প্রাক্-কাল পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। কলিকাতায় আসার পূর্বেই তিনি সোসাইটির মুখপত্র Asiatic Researches পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কলিকাতায় থাকা কালে কোলব্রুক Asiatic Researches পত্রিকায় জৈনধর্ম, হিন্দু ও আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতা, সংস্কৃত লেখমালা, গঙ্গানদীর উৎস, হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক গবেষণা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির উপজীব্য কয়েকটি বিষয়ে ভারতবিদ্যাবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোলব্রুকই হস্তক্ষেপ করেন। হিমালয়ের উচ্চতা নির্ধারণ ও গঙ্গানদীর উৎস সন্ধান প্রচেষ্টার প্রবর্তক হিসাবে কোলব্রুক চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। হিন্দুজ্যোতির্বিজ্ঞান ও জৈনধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণারও তিনিই প্রবর্তক ছিলেন (৪)। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলব্রুক তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দেন নাই। ভারতত্যাগের পর হইতে আমরণ তিনি ইংল্যাণ্ডে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধির (এজেন্ট) দায়িত্ব পালন করেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিক সমীক্ষায় (Centenary Review 1784-1883) কোলব্রুককে সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "a man of extraordinary industry, combined with rare clearness of intellect and sobriety of Judgement. ....the first to handle Sankrit Language and literature on scientific principles, he published many texts, translations and essays dealing with every branch of Sanskrit learning thus laying the solid foundations on which later scholars have built." ....As a great mathematician, zealous astromer and profound Sanskrit Scholar, he wrote nothing that did not at once command the high attention from the public and notwithstanding the great advance that has been made in oriental researches of late years, his papers are still looked upon as models of their kind".

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক কোম্পানীর সর্বোচ্চ পরিষদের (সুপ্রিম কাউন্সিল) সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত রাখিয়াই তিনি কাউন্সিল সদস্যের কাজ চালাইয়া যান। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলব্রুক রাজস্ব বোর্ডের (বোর্ড অব রেভিনিউ) সদস্য ছিলেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক সংস্কৃত শেষগ্রন্থ অমর কোষ মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন (৫)। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় আইন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। (৬)।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রৌঢ় বয়সে কোলব্রুক জনসন উইলকিনসনের কন্যা এলিজাবেথকে

বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘদিন কোলব্রুক দাম্পত্য জীবন উপভোগ করিতে পারেন নাই। অবসর লাভের প্রাক্‌কালে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতত্যাগের পূর্বে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কলিকাতার সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট সমাধি ক্ষেত্রে কোলব্রুক পত্নী এলিজাবেথ চিরনিদ্রায় শয়ান রহিয়াছেন। ৩২ বৎসর কাল ভারতে চাকুরীর পর পুত্রদের লইয়া কোলব্রুক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে তিনি বাথ্‌নগরীতে বাস করেন। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে চলিয়া আসেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই অতিবাহিত করেন। ভারতত্যাগ করিলেও আজীবন কোলব্রুক নিজেকে ভারতবিদ্যা চর্চায় নিমগ্ন রাখিয়া ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক ভারতীয় বীজগণিত, গণিত ও পরিমিতি বিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ গবেষণা মূলক পুস্তক প্রকাশ করেন (৭)। কোলব্রুক রচিত হিন্দুগণিত ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত আরও কতকগুলি প্রবন্ধ ইংলণ্ডের জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও এ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবিদ্যা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কোয়ার্টালি জার্নাল পত্রিকাতেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক তাঁহার বিশাল পুঁথি সংগ্রহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীকে দান করেন। দশ হাজার পাউণ্ড অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি এই পুঁথিগুলি ক্রয় করেন। কোলব্রুকের সংগৃহীত পুঁথিগুলি বর্তমানেও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টান্তে লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলব্রুক এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এই সময় তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সর্বজনমান্য ভারতবিদ্ আর কেহ ছিলেন না এইজন্য তাঁহাকে সোসাইটির সভাপতি পদ-গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। কোলব্রুক স্বয়ং সভাপতির পদ গ্রহণ না করিয়া পার্লামেন্ট সদস্য Rt. Hon'ble Charles Watkin Williams Wynn কে সভাপতি নির্বাচিত করেন ও নিজে পরিচালকের (ডিরেক্টর) পদ গ্রহণ করেন। উত্তর কালে কোলব্রুকের পুত্র সার টমাস এডোয়ার্ড কোলব্রুক (১৮১৩-১৮৯০) তিনবার পিতার প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৮৬৪-৬৬, ১৮৭৫-৭৭, ১৮৮১)। এডোয়ার্ড কোলব্রুক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার ন্যায় ভারতবিদ্যাবিশারদ না হইলেও ভারত বিদ্যা-সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তিনি সর্বদাই ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেন। এডোয়ার্ডের চেষ্টায় সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুকের নিবন্ধগুলি মিসিলেনিয়াস এসেস নামে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মাদ্রাজ্ হইতে প্রকাশিত হয় (৮)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলব্রুক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে (সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন চার্বাক, লোকায়ত, পাশুপত মাহেশ্বর) লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঁচটি দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠ করেন। এইগুলি পরে সোসাইটির ট্রানযাক-সনস এ প্রকাশিত হয় (৯)। এইগুলিও পরে মিসিলিনিয়াস এসে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। শেষ জীবনে হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে কোলব্রুক আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১০)।

টমাস কোলব্রুকের অধ্যয়নানুরাগ ছিল অতুলনীয়। মাত্র পনের বৎসর বয়সের সময় প্রচুর অধ্যয়নের ফলে তিনি যে বিদ্যা অর্জন করেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরের ছাত্রের সহিত তুলনীয় ছিল।

তিনি যখন ভারতে বাস করিতেন তখন তাঁহার পিতা তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে রাশি রাশি পুস্তক প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে যে একবার জাহাজের যাত্রীরূপে তাঁহার নিকট অপঠিত আর কোন পুস্তক ছিল না, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি জাহাজের ডাক্তারের নিকট যে কয়েকটি ডাক্তারি পুস্তক ছিল তাহা চাহিয়া লইয়া সেগুলি পড়িয়া ফেলেন। আজীবন অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোলব্রুক শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলেন। স্ত্রী ভারত ত্যাগের পূর্বেই গত হইয়াছিলেন, তিনটি পুত্রের মধ্যে দুইটি পুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগব্যাধি ক্লিষ্ট কোলব্রুক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ লণ্ডনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

(১) Remarks on the Present state of Husbandry and Commerce in Bengal, Calcutta, 1795.

(২) A digest of Hindu Law on contracts and successions with a Commentary by Jagannath Tarkapanchanan, translated from the Original Sanskrit. 4 Vols., Calcutta, 1797-98.

(৩) A Grammar of Sanskrit Language, Calcutta, 1805.

(৪) Colebrooke's Articles in Asiatic Researches:—
- (a) On the Duties of a faithful Hindu Widow, Vol. IV, 1795.
- (b) Enumeration of Indian Classes, Vol. V, 1798.
- (c) On Indian Weights and Measures, Vol. V, 1798.
- (d) Translation of one of the inscriptions on the Pillar at Delhi, Vol. VII, 1801.
- (e) On Sanskrit & Prakrit Languages, Vol. VII, 1801.
- (f) On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus, Vol. VIII, 1805.
- (g) Observations on Sects of Jains, Vol. IX, 1807.
- (h) On the Indian and Arabic Divisions of the Zodiack, Vol. IX, 1807.
- (i) On Ancient Monument Sanskrit Inscriptions, Vol. IX, 1807.
- (j) On Sanskrit and Prakrit Poetry, Vol. X, 1808.
- (k) On the Sources of Ganges in Himadri, Vol. XI, 1810.
- (l) On the notions of the Hindu Astronomers concerning precession of the Equinoxes and motions of the planets, Vol. XII, 1816.
- (m) On the Height of Himalaya Mountain, Vol. XII, 1816.

(৫) The Amarcosha, a Sanskrit Lexicon with marginae translations, Serampore, 1808.

(৬) Translation of two treatises on Hindu Law of Inheritance, Calcutta, 1810.

(৭) Algebra with Arithmetic and Mensuration from Sanskrit of Brahma Gupta and Bhascara preceded by a dissertation on the state of Science as known to the Hindus, London, 1817.

(৮) Miscellaneous Essays by H. T. Colebrooke, 2 Vols, 2nd Edition, Madras, 1872.

(৯) In the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland:
On the Philosophy of the Hindu's, P. I, (Sankhya system) Vol. (i).
" " " P. II, (Naiya & Veisashika) Vol. (i).
" " " P. III (Mimansa) Vol. (i).
" " " P. IV (Jaina, Buddha, Charvaka Lokayata, Maheswara, Pasupata, Mahaswara) etc. Vo.l (ii).
" " " P. V (Vedanta) Vol. (ii).

(১০) On Hindu Courts of Justice, 2 Vols, 1828(?)

দ্বারকানাথ ও সতীদাহ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

রংপুরের কলেক্টর ডিগ্‌বি সাহেবের সঙ্গে মিলে শাস্ত্রীয় বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের পর রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। সেই সময়েই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় দ্বারকানাথের জীবনের একটি মুখ্য ঘটনা। তখন দ্বারকানাথের বয়স কুড়ি বছর। সেই সময় পর্যন্ত দ্বারকানাথ বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন, প্রত্যহ হোম-তর্পণ-পূজা করতেন। "অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নিত্যপূজা করিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিল, সে ভোগাদি পাক করিয়া ভোগ দিত ও আরত্রিক করিত।" (১) এখন রামমোহন রায়ের "সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল।" ২ রামমোহন ১৮১৫ সালে তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে যাদের বিশ্বাসের মিল ছিল তাদের নিয়ে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করলেন। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন প্রৌঢ়, বিষয়াভিজ্ঞ। রামমোহন এদের 'বেরাদর' (৩) বলে ডাকতেন। আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডের উপর পুলিশের ডেপুটী কমিশনারের যে বাড়ি (তার গায়ে এখন স্মারক প্রস্তর ফলক লাগানো আছে)—রামমোহনের ঐ মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয়সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন বসতো। দ্বারকানাথ এর সভ্য ছিলেন।

১৮১৫ সালে কেনোপনিষদ ও ঈশোপনিষদ এবং পর বৎসর কঠ ও মুণ্ডকোপনিষদ ইংরাজী অনুবাদ সহ রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন। ফলে কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারত-বর্ষে এক আলোড়নের সূত্রপাত হয়। অনেকে রামমোহনের প্রতি বিরূপ হলেন। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত ইংরাজী বেদান্তসারের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব আমি, বিবেক ও বিশ্বাসমত এই পথে এসে আত্মীয়জনের বিরাগভাজন হয়েছি। যাঁরা গভীর কুসংস্কারাবদ্ধ অথবা বর্তমান ব্যবস্থার উপর যাদের পার্থিব স্বাচ্ছল্যের নির্ভর তাঁরা আমায় তিরস্কার কর-ছেন। এমন দিন আসবে যখন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নিরপেক্ষভাবে বিবেচিত হবে এবং স্বীকৃতি পাবে এই আশায় আমি এই সকল পুঞ্জীভূত বিরূপতা স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতেছি।"

ঐ সময়ে আত্মীয় সভার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রামমোহন রায় যে কতকগুলি বিশেষ কাজে হাত দেন তার মধ্যে সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা—অন্ততঃ এই তিনটীর সঙ্গে দ্বারকানাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

কলিকাতা আসবার আগেই রামমোহন সতীদাহ নিরোধ সম্পর্কে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১১ খৃঃ তাঁর দাদা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর এক স্ত্রী সহমৃতা হন। তদবধি এই নিষ্ঠুর প্রথা নিরোধকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর হন। সতীদাহ সে সময়ে যে কতটা প্রচলিত ছিল তা আজ কল্পনা করাও শক্ত। লোকে এটাকে ধর্মের একটা অঙ্গ হিসাবে এমন মেনে নিয়েছিল যে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সতীদাহ নিবারণে প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেবে এই ভয়ে বহুদিন এর বিরুদ্ধে আইন করেন নি। সেই সমাজে একজন কুড়ি বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে ঐ প্রথার বিরুদ্ধে সচেষ্টভাবে বাধা দেওয়া দ্বারকানাথের সাহস ও ঔদার্য্যের পরিচয়। দ্বারকানাথ যে সতীদাহ নিরোধে কতটা সচেষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ পাই লেডি বেন্টিংকের এক চিঠি থেকে। তখন দ্বারকানাথ বিলেতে, লর্ড বেন্টিংক মারা গেছেন।

লেডি এম্ উলিয়াম বেন্টিংক　　　　লণ্ডন, ৯ অক্টোবর ১৮৪২

প্রিয় মহাশয়,

সেদিন আলোচনার সময় আপনি, আপনাদের ভূতপূর্ব বড়লাট সাহেবের হৃদয়মন যে বিষয়ে স্থিরনিবদ্ধ ছিল সেই বিষয়ে সফলতায়, যে সাহায্য করেছিলেন, তার এক প্রমাণপত্র আমার কাছে চেয়েছিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি কলকাতার দেশীয় সমাজের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সহানুভূতিশীল এবং বহুপূর্বপ্রচলিত হওয়ায় আইনের মত গণ্য হলেও হিন্দু-শাস্ত্রের অবশ্য কর্তব্য আনুষ্ঠানিকের মধ্যে যে নয় তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি এনেদিয়েছিলেন তাঁরা 'রামমোহন রায় ও আপনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে আপনারও কয়েকজনের আদর্শই আপনার দেশবাসীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে এবং অন্তরে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের মহৎ সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিশেষ শুভ ফল লাভ করবেন।

মহাশয় আমি এই সবিশেষ কামনা করি যে আপনার ও দেশের পক্ষে মহামূল্য আপনার জীবন দীর্ঘায়ু হউক এবং আপনার উদাহরণের সুফল চারিদিকে আরো বিকীর্ণ হোক।......

সতীদাহের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে ইহা অজ্ঞাত। ত্রিহুতে ও নবদ্বীপে অপ্রচলিত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে সহমরণ করতেই হবে, এমন কোন বিধানের অস্তিত্ব কখনই স্বীকৃত হয় নাই। তবে যে বিধবা একবার সহগমনের সংকল্প করতেন, তাঁর পক্ষে পরে তা অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল, তখন আত্মীয় স্বজনরাও বলপ্রয়োগ করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। রামমোহন রায়ের জীবনীলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সংকল্পের পর আর ফিরিবার উপায় ছিল না। ফিরিলে পরিবারের দুরপনেয় কলঙ্ক; সুতরাং সংকল্পের পর মত পরিবর্তন হইলে বিলক্ষণ রূপেই তার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত।" তাই বলে স্বেচ্ছায় সহমরণ যে ছিল না তা নয়। ১৭৪২ খৃঃ কাশিমবাজারে রামচন্দ্র পণ্ডিত নামে এক ধনী মহারাষ্ট্রীয় বণিক মারা গেলে তাঁর ১৭ বৎসর বয়সের একমাত্র স্ত্রী সহমরণে উদ্যত হলেন। সেখানকার ইংরেজ কুঠিওয়ালা সাহেব প্রভৃতি অনেকে নিষেধ করলেও শেষে বল্লেন তাঁরা এ হতে দেবেন না। তখন মেয়েটী বল্লেন তাহলে অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। শিশু সন্তানদের দোহাই দিলে তিনি বল্লেন যে যিনি তাদের প্রাণ দিয়েছেন, তিনিই আহার দিবেন। যখন বণিক পত্নীকে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণার কথা বলা হল, তখন তিনি আগুনে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখালেন যে সে যন্ত্রণাকে তিনি ভয় করেন না। শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বৃথা ভেবে তাঁকে সহমৃতা হতে দেওয়া হল। তিনি নির্ভীকচিত্তে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চিতার মধ্যে বসে নিজে অগ্নিসংযোগ করলেন। কিন্তু বাতাস উল্টোদিকে বহাতে আগুন তাঁর দিক থেকে সরে বাহির দিক যেতে থাকলো। তখন তিনি আবার উঠে বায়ুর গতি অভিমুখী হয়ে বসে স্বামীর পাদুটী কোলে নিয়ে বসলেন।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

(২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

(৩) ফার্সি শব্দ, ইংরাজী ব্রাদারের সমতুল্য

অবশ্য বলপূর্বক বিধবা হত্যা যে হত না তা নয়। বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের স্ত্রীর ডায়েরীতে আছে যে "এক যুবক কলেরায় মারা গেলে তার পত্নী সহমরণের সংকল্প করলেন। সব প্রস্তুত হল, ম্যাজিস্ট্রেটের ছাড়পত্র এলো। চিতায় অগ্নিসংযোগ হল। সেই অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে তার প্রতিজ্ঞাবল হারাইয়া জনসাধারণের চিৎকার ও ঢোলের বাজনার ভিতর গাঢ় চিতাধূমের আড়ালে সকলের অলখ্যে সরিয়া নিকটস্থ অরণ্যে আশ্রয় লইল। পরে লক্ষ্য পড়িল যে স্ত্রীলোকের দেহ চিতায় নাই। তখন জনসাধারণ অরণ্যের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া একটী ডিঙ্গিতে চড়াইল এবং নদীর মধ্য স্থলে ফেলিয়া দিল—নদী গর্ভে তার ভবযন্ত্রণার অবসান হইল।" ফ্যানি পার্কস তাঁর ভারতপর্যটনেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

কাণপুরে এক বণিকের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হতে চাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থেকে খোলা তলোয়ার হাতে এক সিপাহী মোতায়েন করলেন যাতে আত্মীয়স্বজন কোন বলপ্রয়োগ করতে না পারেন। রমণী স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন এবং সাহস ও ও উৎসাহের সঙ্গে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ক্রমে আগুনের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গায় লাফাইবার উদ্যোগ করিলেন। সিপাহী প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ তাহাকে তরোবারি আঘাত করিতে গেল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্বার চিতায় প্রবেশ করিল এবং পুনরায় অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। মৃত-ব্যক্তির ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ সকলেই উহাকে "বলপূর্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া তৃতীয়বার চিতাপ্রবেশে সম্মত হইতেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিয়া তাহাকে পাল্কী করিয়া হাসপাতালে পাঠাইলেন।

সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাস থেকে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে গভর্মেন্ট নিজামৎ আদালতে সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কি বিধি আছে জানবার জন্য চিঠি পাঠান। নিজামৎ আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা তার যথাযথ উত্তর দেন। তারপর আবার দীর্ঘ সাত বছর ভাবনার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিয়ম জারি হল যে—

(১) বিধবাদের সহমৃতা হবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হবে না

(২) বিধবাদের মাদকদ্রব্য সেবন করান হবে না

(৩) বিধবাদের সহমৃতা হবার শাস্ত্রীয় বয়স অতিক্রম করা হবে না

(৪) গর্ভবতী নারীকে সহমৃতা হতে দেওয়া হবে না।

বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি এই সম্বন্ধে এক প্রস্তাবে লিখলেন যে "মনুষ্যত্ব, সুনীতি ও যুক্তির অ-বিরোধে দেশীয়গণের মত, আচার ও সংস্কার রক্ষা করাই ব্রিটিশ গভর্মেন্টের রাজনীতির একটী মূলমন্ত্র।" এর পাঁচ বৎসর পর দেখি সরকারের আদেশে নিজামৎ আদালত এবিষয়ে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। ঐ সময়েই বড়লাট লর্ড হেস্টিংসের কাছে এই নতুন জারী করা নিয়ম রহিত করবার প্রার্থনা করে এক আবেদন দাখিল হয়।

ঐ আবেদনপত্রটীর বিরুদ্ধে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আরেকখানি আবেদন পাঠানো হয়। এই টীতে বুঝানো হয় যে "প্রথম আবেদনটী কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত নয়। এও লিখিত হয় যে এই দ্বিতীয় আবেদনের লেখকগণ নিজেরা জানেন এবং অনেক সাক্ষীর নিকট শুনেছেন যে, কোন নারীর পতিবিয়োগ হইলে, তাঁর উত্তরাধিকারীরা চেষ্টা করে যাতে বিধবা সহমৃতা হন। বিত্তলোভই এর একমাত্র কারণ। এমন ঘটনাও ঘটে যে কোন নারী পতিবিয়োগে অধীরা হইয়া সহমৃতা হইতে চাহেন; কিন্তু সংকল্পের পর ভয়ে অস্বীকার করেন এরূপস্থলে

আত্মীয়েরা তাঁহাকে বলপূর্বক রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় চিতাশায়ী করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ ভস্মীভূত না হয়; ততক্ষণ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। কোন রমণী কোন সুবিধা পাইয়া চিতা হইতে পালাইলে আত্মীয়গণ পুনরায় ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে চিতানলে ভস্মীভূত করেন। এরূপ এরূপ কার্য্য, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে ও সকল শাস্ত্রানুসারে হত্যা বলিয়া পরিগণিত।"

এ পত্রের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ছিলেন সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে তাঁরা দুজন ও আরো কয়েকজন কলিকাতার শ্মশানগুলিতে গিয়ে সহমরণ থেকে বিধবাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। এর জন্য অনেক সময়ে লাঞ্ছনাও ভাগ্যে জুটেছে।

এই সময়ে সরকার যে সতীদাহের তালিকা জড় করেন তাতে দেখি "১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ ২৩৬৫ জন বিধবাকে পতিসহ দাহ করা হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা আর পার্শ্বস্থ এলাকা সমূহেই হিসাব পাওয়া যায় ১৫২৮ টীর।" ৪

ঐ ১৮১৮ তেই রামমোহন রায় "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ" ও তার ইংরাজী অনুবাদ বের করেন। পরবৎসর সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় সংবাদ ও ১৮২০ সালে তার ইংরাজী অনুবাদ বার হয়।

এই সব আবেদনের ফলে ১৮২৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সতীদাহকে আত্মহত্যার সামিল বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। তাঁদের মতে—

(১) শাস্ত্রে সহমরণের প্রশংসা ও মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও অবশ্য কর্তব্য বলা হয় না।

(২) অন্যান্য বহু অসভ্য প্রথা হিন্দুস্থানে বিনা বিদ্রোহে বন্ধ করা গিয়াছে

(৩) সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মণদের বিশেষ পবিত্রতা অস্বীকার করার মতই—কোন মন্দফল দর্শিবে না।

(৪) সতীদাহ সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যেও মতভেদ আছে—উন্নত ও শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বারা ইহা অসমর্থিত ও কতকগুলি প্রদেশে অজ্ঞাত ও অপর কয়েকটীতে ইহা কদাচিৎ সংঘটিত হয়।

(৫) অন্যান্য বিদেশী রাজার রাজত্বকালে ইহা অনুমোদিত ছিল না।

লর্ড আমহার্ষ্ট সদর কোর্টের বিচারক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের এবিষয়ে স্বাধীনভাবে মত চাইলে, তাঁহাদের অনেকেই ইহা উঠাইয়া দিবার পক্ষে মত দেন। ১৮২০ সালের শেষে নিযুক্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের জজ কুর্টনী সাহেব বলেন "সতীদাহ মানিয়া লওয়া আমাদের শাসনের লজ্জার বিষয় এবং অবিলম্বে এর সম্পূর্ণ বিলোপে কোন অশান্তির ভয় নাই"।৫ অনেকে এই বিষয়ে একমত হলেন। অন্যেরা বলিলেন, হঠাৎ বন্ধে যে বিদ্রোহের আশঙ্কা আছে, ধীরে ধীরে বন্ধ করিলে তাহা থাকিবে না। গোড়ায় অন্যদেশে বন্ধ করিয়া কি ফল হয় দেখিয়া তখন বঙ্গদেশেও রহিত করা চলিবে।

এইসব মত বিচার করিয়া ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট লিখিলেন—

"আইন করে সতীদাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করার সুপারিশ আমি করি না। আমি প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করছি যে এই পাপাচারের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে অনেকে আমায় অজ্ঞ মনে করবেন তবুও দেশীয়দের মধ্যে বর্তমানে যে শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে তদ্দারাই এ কুসংস্কার লোপ পাবে। প্রত্যেক বৎসর যে ভাবে ব্যবহারিক ও ন্যায় জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আর বেশীদিন সহমরণ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।"

---

(৪) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

তার পরবৎসর বিলাত থেকে শাসন ও অনান্য বিষয়ে সংস্কারের আদেশ নিয়ে এলেন লর্ড বেন্টিংক। তিনি এক বছরের ভিতরেই আইন করে কোম্পানীর অধীনস্থ প্রদেশসমূহে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলেন (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯)।

সতীদাহ নিবারণ বিরোধী দল ১৮৩০ সালের ১৪ জানুয়ারী লর্ড বেন্টিংককে ১২০ জন পণ্ডিতের অভিমত সহ ৮০০ জন কলিকাতাবাসীর সই করা এক আবেদনপত্র দেন। তাতে দেখানো হয়েছিল যে লাটসাহেবের এই প্রস্তাব গর্হিত। ঐ সঙ্গেই মফঃস্বলের ৩৪০ জনের সই সহ ঐ প্রকারেরই আরেকটী আবেদনপত্র দেওয়া হয়।

এর দুইদিন বাদে অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারী লাটসাহেবের এই মমতাপূর্ণ কাজের জন্য লাটভবনে দুইটী মানপত্র দেওয়া হয়। একটীতে সই করেছিলেন ৮০০ জন খৃষ্টান ও অন্যটীতে ৩০০ জন কলিকাতাবাসী। মূল অভিনন্দনটী বাংলায় পড়েন টাকির জমিদার বাবু কালীনাথ রায় এবং তার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন বাবু হরিহর দত্ত। এই অভিনন্দন পত্রে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, তেলেনিপাড়ার জমিদার ও দ্বারকানাথের পরম বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া দেশের কোন সম্ভ্রান্ত স্বাক্ষর করেন নাই। বেন্টিংক এই অভিনন্দনের একটী সুন্দর উত্তর দেন।

সতীদাহ নিবারণ আর ঐ বৎসরেই কিছুদিন আগে পৌত্তলিকতা বিরোধী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে মহাচাঞ্চল্য দেখা দিল। হিন্দু সমাজ রসাতলে যাবার ভয়ে তাঁরা জোট বেঁধে প্রগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ১৭ই জানুয়ারী ১৮৩০ রবিবার সংস্কৃত কলেজে সভা করে "ধর্ম সভা" স্থাপন করলেন। সভাপতি হলেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব। নামকরা সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। দেওয়ান রামকমল সেন, জয়নারায়ণ মিত্র, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, নীলমণি দে, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর। কিন্তু এবিষয়ে সবচেয়ে উদ্যোগী ছিলেন ভবানীচরণ বাড়ুয্যে। তিনি রামমোহনের সঙ্গে কিছুদিন "সংবাদ কৌমুদী"র সম্পাদকতা করেছিলেন। সতীদাহের পক্ষে মত থাকায় ঐ কাজ ছেড়ে "সমাচার-চন্দ্রিকা" বলে সহমরণের পক্ষাবলম্বীদের হয়ে একটা কাগজ চালাতে আরম্ভ করেন। এইটাই ধর্মসভার মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৭ই জানুয়ারী ধর্মসভা প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিয়ে বিশে জানুয়ারী, ইন্ডিয়া গেজেটের চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে যে খবর বের হয়, তাতে টিপ্পনী করে সম্পাদক বলেছেন যে আমরা পূর্বে "ব্রাহ্মসভা" স্থাপনের কথা ছাপিয়েছি। শুনা যায় যে উহার বিরুদ্ধাচরণই "ধর্ম সভা"র উদ্দেশ্য।

ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহ আইন রহিত করবার জন্য বিলাতে আপীল করা হয়। এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজা রাজনারায়ণ রায় এবং আশুতোষ দে ওরফে ছাতুবাবু। রাজা রাধাকান্ত স্বয়ং কতটা এতে যোগ দিয়েছিলেন জানি না তবে তিনি পরেও ব্রাহ্মসভার অন্যতম মাতব্বর দ্বারকানাথের সঙ্গে মিলেমিশে বৈষয়িক কাজ সভাসমিতি এমন কি ধর্মসংক্রান্ত কাজও করেছেন। কলিকাতার পথে হরিসংকীর্তন বন্ধ করে দেওয়ার এক বছর বাদে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দেখি যে বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যস্থতায় প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রায় আপত্তি প্রত্যাহার করেছেন। অতঃপর তাহারা যাহাতে অবাধে পথে চলিতে পারে সেরূপ আদেশ জারী করা হয়েছে। ৬

(৫) স্টেটস্‌ম্যান ১৩।১১।১৯।২৫

(৬) ক্যালকাটা মাথ্‌লি জার্নাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০২

এই সতীদাহ নিবারণ বিরোধী আপীল যখন প্রিভি কৌন্সিলে পে'ছিায় তখন লর্ড ওয়েলেসলি বিলাতে একজন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে রামমোহন রায়ও সতীদাহ নিবারণের পক্ষে এক আবেদনপত্র স্বয়ং ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে পেশ করলেন। তাতে প্রশ্ন তোলা হয় যে সতীদাহ রহিত করবার সময়ে নীরব থেকে, হঠাৎ তার একবছর বাদে এরূপ দরখাস্তের অর্থ কি? শেষ পর্যন্ত সতীদহণের পক্ষে আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

ধর্মসভার এই আপীল বিলাতে পাঠানো বিষয়ে ম্যাকডুগল নামে এক সাহেব অনেক খেটেছিলেন—সেজন্য বোধহয় তাঁর বেশ কিছু খরচও হয়েছিল। ধর্মসভা থেকে দীর্ঘ নয় বৎসর চেষ্টা করেও যখন তিনি সে টাকা আদায় করতে পারলেন না তখন জন স্টর্ম নামে এক বন্ধুর মারফৎ দ্বারকানাথকে ঐ টাকা আদায় করে বা চাঁদা তুলে দিতে বলেন। স্টর্ম সাহেব ছিলেন ম্যাকিলপ স্টুয়ার্ট কোম্পানীর অংশীদার। ঐ কোম্পানীর আরেক অংশীদার এ সম্বন্ধে দ্বারকানাথকে লেখেন। স্টর্ম সাহেবের চিঠির দ্বারকানাথ বেশ কড়া জবাব দেন। তিনি লেখেন—

১৯ আগষ্ট, ১৮৪১

প্রিয় স্টর্ম,

আপনি লিখেছেন "**আপনার ও আপনার দেশের সুনামার্থে**"!! সতীদাহের মত নারকীয় প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য যে টাকা ম্যাক্‌ডুগল সাহেবের পাওনা বলে দাবী করা হয়েছে তার এক কপর্দকও আমি বা অন্য কোন যথার্থ মানবসন্তান দিবে এরূপ আশা মুহূর্তের জন্যও আপনি পোষণ করবেন না।

এটা আমার গর্বের কথা যে ঐ ধরণের খুন (তা' ছাড়া আর কি বলা যায় ?) বন্ধ করার জন্য যাঁরা প্রথম তাঁদের যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল তদ্দারা তদানীন্তন মহামান্য লর্ড বাহাদুরের কাছে বিধিমত সুপারিশ করে ও অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করেছিলেন আমি তাঁদের পুরোধায় ছিলাম।

সতীদাহ নিবারণ করে তিনি কতবড় পুণ্যকাজ করেছিলেন তার পরিচয় টাউন হলের সামনে মহামতি লর্ড বেন্টিংকের মূর্তিস্তম্ভের পাদদেশের ডিজাইনে পাবেন।

আপনার আপত্তি না থাকে ত' আমি বরং ম্যাকিলপ সাহেবের চিঠিটা প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সমেত কাগজে বের করে দিতে প্রস্তুত আছি।

অবশ্য আপীলের প্রধান উদ্যোক্তা রাজা রাজনারায়ণ রায় ও বাবু আশুতোষ দে তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। ম্যাকডুগল সাহেব তাঁর প্রাপ্য আদায়ের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন এবং আশা করি সফল হবেন।

ম্যাকিলপ সাহেবকে এ চিঠির নকল যদি পাঠাতে চান ত. পাঠাতে পারেন। ইতি —

ইত্যাদি —

ডি ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
জয়গোপাল	ঐ	দিদি	ঐ
জয়নারায়ণ	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্তী	ষষ্ঠ
জয়সিংহ	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
	ও		ঐ
	বিসর্জন		
জয়সেন	রাজা ও রানী		প্রথম
জয়োত্তম	অচলায়তন		একাদশ
	ও		ও
	গুরু		ত্রয়োদশ
জানকী নন্দী	গল্পগুচ্ছ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
জীবন সর্দার	ফাল্গুনী		দ্বাদশ
জুলেখা	গল্পগুচ্ছ	দালিয়া	ষোড়শ
দীপালি		পাত্র ও পাত্রী	ত্রয়োবিংশ
দুকড়ি	হাস্য-কৌতুক	খ্যাতির বিড়ম্বনা	ষষ্ঠ
দুঃখীরাম	ঐ	রোগীর বন্ধু	ঐ
দুঃখীরাম রুই	গল্পগুচ্ছ	শাস্তি	অষ্টাদশ
দেবদত্ত	রাজা ও রানী		প্রথম
	ও		ও
	তপতী		একবিংশ
দৌলত	হাস্যকৌতুক	একান্নবর্ত্তী	ষষ্ঠ
ধনঞ্জয় বৈরাগী	মুক্তধারা		চতুর্দশ
ধনঞ্জয় বৈরাগী	প্রায়শ্চিত্ত		নবম
	ও		ও
	পরিত্রাণ		বিংশ
ধীরাজ	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
ধুরন্ধর	মুকুট		অষ্টম
ধ্রুব	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
	ও		
	বিসর্জন		ঐ
তারক	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
তারা	গল্পগুচ্ছ	দিদি	ঊনবিংশ
তারাপদ	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
তারাপদ	ঐ	অতিথি	বিংশ
তারাপ্রসন্ন	ঐ	তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	পঞ্চদশ
তিনকড়ি	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
তিনকড়ি	ঐ	পেটে ও পিঠে	ঐ
তিনকড়ি	বৈকুণ্ঠের খাতা		চতুর্থ
তিলকমঞ্জরী	গল্পগুচ্ছ	খাতা	অষ্টাদশ
তূণাঞ্জন	অচলায়তন		একাদশ
ত্রিবেদী	রাজা ও রাণী ও তপতী		প্রথম ও একবিংশ
ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী	নৌকাডুবি		পঞ্চম
দক্ষিণাচরণ	গল্পগুচ্ছ	নিশীথে	ঊনবিংশ
দামিনী	চতুরঙ্গ		সপ্তম
দামোদর	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
দালিয়া		দালিয়া	ঐ
দাক্ষায়নী		তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	পঞ্চদশ
নগেন্দ্র	গল্পগুচ্ছ	পুত্রযজ্ঞ	একবিংশ
নটবর	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্ত্তী	ষষ্ঠ
নটু	গল্পগুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
নদের চাঁদ	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্ত্তী	ষষ্ঠ
নন্দ	গল্পগুচ্ছ	ফেল	দ্বাবিংশ
নন্দ কিশোর	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
নন্দকিশোর	তিনসঙ্গী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
নন্দকৃষ্ণ বাবু	গল্পগুচ্ছ	পাত্র ও পাত্রী	ত্রয়োবিংশ
নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ব্যঙ্গ-কৌতুক	নূতন অবতার	সপ্তম
নন্দরানী	যোগাযোগ		নবম
নন্দা	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
নন্দিনী	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
ননীগোপাল	গল্পগুচ্ছ	ফেল	দ্বাবিংশ
ননীবালা	ঐ	মাষ্টার মশায়	ঐ
ননীবালা	চতুরঙ্গ		সপ্তম
নবকান্ত	গল্পগুচ্ছ	ত্যাগ	সপ্তদশ
নবকান্ত	হাস্য-কৌতুক	আশ্রম পীড়া	ষষ্ঠ
নবগোপাল	গল্পগুচ্ছ	উলুখড়ের বিপদ	দ্বাবিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
নবগোপাল	ঐ	ফেল	ঐ
নবগোপাল	যোগাযোগ		নবম
নবদ্বীপ	গল্পগুচ্ছ	রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	পঞ্চদশ
নবদ্বীপচন্দ্র	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
নবীন	হাস্য-কৌতুক	আশ্রমপীড়া	ষষ্ঠ
নবীন	যোগাযোগ		নবম
নবীন বাঁড়ুজ্যে	গল্পগুচ্ছ	শুভদৃষ্টি	দ্বাবিংশ
নবীন কালী	নৌকাডুবি		পঞ্চম
নবীন মাধব	গল্পগুচ্ছ	প্রতিবেশিনী	দ্বাবিংশ
নবীন মাধব			
সেনগুপ্ত	তিনসঙ্গী	শেষকথা	পঞ্চবিংশ
নবেন্দুশেখর	গল্পগুচ্ছ	রাজটিকা	একবিংশ
নরসিং	মুক্তধারা		চতুর্দশ
নরহরি	হাস্য-কৌতুক	চিন্তাশীল	ষষ্ঠ
নরেন মিত্র	শেষের কবিতা		দশম
নরেশ	তপতী		একবিংশ
নরেশ দাসগুপ্ত	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
নরোত্তম	হাস্য-কৌতুক	আশ্রমপীড়া	ষষ্ঠ
নলিন	গল্পগুচ্ছ	অনধিকার প্রবেশ	ঊনবিংশ
নলিন	ঐ	ফেল	দ্বাবিংশ
নলিনাক্ষ	গোড়ায় গলদ		তৃতীয়
	ও		ও
	শেষরক্ষা		ঊনবিংশ
নলিনাক্ষ	নৌকাডুবি		পঞ্চম
নলিনী	শোধবোধ		সপ্তদশ
	ও		ও
	কর্মফল		দ্বাবিংশ
নয়নতারা	গল্পগুচ্ছ	প্রতিহিংসা	বিংশ
নয়ন মোহন	গল্পগুচ্ছ	সংস্কার	চতুর্বিংশ
নয়ন রায়	বিসর্জন		দ্বিতীয়
নয়ানচাঁদ	হাস্য কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
নক্ষত্ররায়	রা		দ্বিতীয়
	ও		
	বিসর্জন		ঐ
নিখিলেশ	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
নির্ঝরিণী	গল্পগুচ্ছ	দর্পহরণ	দ্বাবিংশ
নিতাই	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্তী	ষষ্ঠ

সাহিত্য সংবাদ

মিসিসিপি নদীর স্টীমারচালক স্যামুয়েল লংহর্ণ ক্লীমেন্স যখন মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম গ্রহণ করে লেখনী ধারণ করেন তখন কোনও পাঠক, সম্পাদক অথবা সহকর্ম্মী ছদ্মনামটি সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করেন নি কিন্তু উত্তর কালে মার্কের জনৈক গুণমুগ্ধভক্ত জন এ. ম্যাকফারসন এক পত্রে তঁাকে ছদ্মনামটির উৎসসূত্র সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, প্রত্যুত্তরে ক্লীমেন্স লেখেন— 'Mark Twain' was the nom de plume of one Captain Isaiah Sellers, who used to write river news over it for the New Orleans Picayum: he died in 1863, and as he could no longer need that signature, I laid violent hands upon it without asking permission of the proprietor's remains. That is the history of the nom de plume I bear. (Letter of May 29, 1877).

কিন্তু অধুনাতন গবেষণার আপাত পরিণতি এই যে ক্যাপটেন ইসাইয়া সেলার্স নামে এক নাবিক-সংবাদিক ছিলেন বটে তবে তিনি কখনও "মার্ক টোয়েন" ছদ্মনাম ব্যবহার করেন নি। সুতরাং ছদ্মনামটি কোন্ উর্ব্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার তা এখনও অজ্ঞাত। স্যাম ক্লীমেন্স যদি নিজেই ছদ্মনামটি আবিস্কার করে থাকেন তাহলে সে কথা উক্ত পত্রে অস্বীকার করে ভিন্ন সূত্রের অবতারণা করেছেন কেন? তবে কি ক্লীমেন্স কোনও অনিবার্য্য কারণে এই সামান্য মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হয়ত কোনদিন পাওয়া যাবে না, আমাদের হয়ত অন্ধকারেই থাকতে হবে। প্রিয় নামের উৎস সন্ধানে আমরা যদি অপারক হই তাহলেও বিশেষ কোনও ক্ষোভের কারণ নেই কিন্তু স্যাম ক্লীমেন্সকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবার মত ধৃষ্টতা যেন আমাদের না জন্মায়। কারণ মার্ক টোয়েন নামটাই আমাদের একান্ত আপনার, স্যামুয়েল লংহর্ণ ক্লীমেন্স নামটি এক ঐতিহাসিক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল মাত্র।

নূতন গ্রন্থ

এডগার এ্যালেন পো : বনানীনেল্লী।

এডগার এ্যালেন পো আমেরিকান সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সাহিত্য সাধনার নাতিদীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে যে ফসল ফলেছে তা সৎসাহিত্য ভাণ্ডারে সযত্ন সঞ্চিত এবং সাহিত্যরসিকের নিকট পো'র রচনাপাঠ এক অপার আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু।

অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী বোস্টন বন্দরের এক পল্লীতে ১৮০৯ সালে পো জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবকালেই জন এ্যালেন নামক এক ভদ্রলোকের গৃহে পোষ্যপুত্র হিসাবে আশ্রয়লাভ করেন। জন এ্যালেন শিশু পো'র বুদ্ধিমত্তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। ১৮২৭ সালে তাঁর "টেমারলেন" কাব্য প্রকাশিত হয় এবং কাব্যরসিক সমাজে তিনি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাল্টিমোর সহরের পত্রিকাগুলির পাঠক-

কুল পো'র রচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। কোনও একটি পত্রিকার জনৈক পাঠক, প্রতি সংখ্যায় পোর রচনা মুদ্রিত না হলে পত্রিকার গ্রাহক থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে সম্পাদককে এক পত্রে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এমন কথাও শোনা যায়। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে এরূপ জনপ্রিয়তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে এ পর্যন্ত জুটেছে।

তারপর তাঁকে রিচমন্ড সহরে সাউদার্ণ লিটারারি মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেখি, এই সময়েই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হয়। দুইখন্ড কবিতার সংকলন ১৮২৯ এবং ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়ে তাঁর কবিখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র সার্থক কবি হিসাবেই নিজেকে চিহ্নিত করে তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, মিষ্ট্রি এবং হোরর অর্থাৎ সাহিত্যে ভয়ানক রসের সুষ্ঠু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সাধকদের এক নূতন পথের সন্ধান দেন এবং উত্তরকালে, কোনান ডয়েলই সম্ভবতঃ সে পথের সার্থক পথিক।

পো, তাঁর কালে তিনি এক জীবিত বিস্ময় রূপে পরিগণিত হয়ে ছিলেন। শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গল্পকার; বিশিষ্ট সমালোচক এবং অন্যতম প্রবন্ধকার ও সম্পাদক হিসাবে একটিমাত্র ব্যক্তিসত্তাকে সে যুগের আমেরিকান পাঠক সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত, সেই উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এডগার এ্যালেন পো কেবলমাত্র আমেরিকার নয় সারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর 'আনাবেল লী' কাব্য পাঠ করে এক সমালোচক বলেছিলেন, আমি যখন দুঃখ অনুভব করি তখন আনাবেলে লী পাঠ করি এবং পাঠশেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে চিন্তা করি যে আমার দুঃখ আনাবেলের প্রেমিকের দুঃখের তুলনায় কত না তুচ্ছ, আর একথা যতই ভাবি ততই আমার বিমর্ষতা দূর হয়ে যায়, আমি আবার রাহুমুক্ত হই।

খ্যাতির উচ্চ শিখর থেকে মৃত্যু পো'কে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নেয়, ১৮৪৯ সালে আমেরিকানরা তাঁদের প্রিয় সাহিত্যিককে হারান, মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি এ পৃথিবীর আলোর মায়া ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সাহিত্যরসিকদের জন্য রেখে গেছেন বিপুল রচনা ভান্ডার যা চিরায়ত সাহিত্যরূপে সর্ব্বজনস্বীকৃত।

গত বৎসর নিউইয়র্ক থেকে পো'র রচনা পরিচিতি এবং গুণাগুণ বিচার সম্পর্কিত ১৫৭ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকার ভিনসেন্ট বুরানেল্লী পো'র রচনাসম্পদের আংশিক বিচার কয়েকটি নিবন্ধে পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য, বিশেষতঃ পো'র রহস্যময় গল্প ও সমালোচনার উপর লিখিত প্রবন্ধ দুটি উৎকৃষ্ট। কাব্য বিচার কালে বুরানেল্লী কিঞ্চিৎ মুখর হয়ে যে প্রশংসাগান করেছেন তা আধিক্যদোষে দুষ্ট বলেই মনে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি হল পো'র রচনা চিরায়ত হবার সম্ভবনা সম্পর্কে। বুরানেল্লী বলেছেন ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলি উভয়, আমেরিকা বিশেষত মেক্সিকোতে পো'র জনপ্রিয়তা অসীম। তাঁর রচনাশৈলীর বাকধারা, বস্তুনিচয় এবং গতিপ্রকৃতির বিচারকালে বুরানেল্লী যে উক্তি করেছেন তা যথোপোযুক্ত, তিনি বলেছেন পো'র রচনার স্বাতন্ত্র্য সততই পরিস্ফুট কিন্তু পূর্বসূরী বিখ্যাত ইংরাজ কবি কোলরিজের প্রভাব পো'র রচনায় বিশেষভাবে প্রকট কারণ বক্র এবং অদ্ভুত বিষয়বস্তুর উপর সাহিত্য সাধনার সম্পূর্ণতায় পো'র লেখনী সুষম হলেও এর অংকুরোদ্গম ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোলরিজের "কনফেসনস্ অব এ্যান এনকোয়ারিং স্পিরিট" রচনার মাধ্যমে। কোলরিজের কাব্যে যে নীতি এবং প্রয়োগকৌশল লক্ষ্য করা যায় সেই পথেই পো পদসঞ্চার করে ভয়ঙ্কর-সুন্দরের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

বুরানেল্লী, স্বল্প পরিসরে পো'র সাহিত্য, জীবন এবং দর্শন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন তা মূল্যবান। পত্রিকা সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতা পো'র অন্যতম

প্রধান কীর্তি, কিন্তু বুরানেল্লী এ বিষয়ে কোনও আলোকসম্পাত করেন নি কেন তা বোধগম্য হ'ল না। যদিও প্রবন্ধ গ্রন্থটি এডগার এ্যালেন পোর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে অক্ষম কিন্তু ১৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে যে তথ্য বুরানেল্লী পরিবেশন করেছেন তা বিশেষভাবে পাঠযোগ্য। তিনি উক্ত গ্রন্থে পো'র গল্প এবং কাব্যের বিচার করবারই চেষ্টা করেছেন সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে পরবর্ত্তীকালে বুরানেল্লী পো'র সমগ্র কীর্ত্তির পরিচয় উপহার দিতে সক্ষম হবেন। এই ক্ষীণকায় গ্রন্থটিতে পো সম্বন্ধে যে সব কথা অনুচ্চারিত রইল তার জন্য অপর একটি স্ফীতকায় পুস্তকের অপেক্ষায় রইলাম।

Edgar Allan Poe. By Vincent Buranelli. New York: Twayne Publishers Inc., 1961. 157 pp. $3.50.

অজিত দাস

শিল্প সমাজ ব্যক্তি

মানুষ তার নিজের তাগিদেই সমাজ গড়ে তুলেছে। সে ও সমাজ এই সন্ধির মধ্যেই তার চলমান জীবন কিংবা আর এক জীবন, যা তার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে প্রবাহিত, সেই জীবনবোধের—বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করেছে কত বিচিত্র সব কল্পনায়। যে যুগে ইতিহাস ছিল না সে যুগেও সমাজ কিংবা ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আদিম মানুষের মনের কত তীর্যক সরল অনুভূতি আমাদের নাড়া দেয়। যদিও দেখা যায় যে সমাজ চিন্তা সে যুগে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকতার আওতায় বেড়ে না উঠলেও —একথা সর্বদাই স্বীকৃত হবে যে আদিম মানুষের শিল্পরীতিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সমাজ সাধারণের উর্দ্ধে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। সমাজ তার প্রয়োজনের মধ্যেই বেঁচে থাকবার আত্মিক সংহতি সংগ্রহের অনুকূলে জীবন সংগ্রামের কঠিন রূপ শিল্প রীতিতে প্রকাশ করেছিল। শিল্প সমাজ জীবনের মুকুর—যদিচ শুধুমাত্র সমাজ জীবনের মোটা অর্থকেই শিল্প উপজীব্য করে না—সেখানে চেতনায় যে বোধের বিদ্যুত প্রবাহ আমাদের অভিষিক্ত করে সেই উপলব্ধিগত সত্য সমাজের চলমান জীবনের মধ্যেই শিল্পী আরেক এক নতুন অর্থে উপস্থাপিত করে। সেখানে সমাজের উর্দ্ধে শিল্পের স্থান। এক হিসাবে শিল্পী সমাজের অঙ্গ এবং সেই হিসাবেই শিল্পী আবেগহীন এক অন্য সত্ত্বা, যার সঙ্গে সমাজের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের স্থূল দিকের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই। এক অর্থে শিল্প সমাজশ্রয়ী এবং অন্য অর্থে শিল্পীর আবেগবর্জিত অনুধ্যান সমাজের গতি ভঙ্গিমার নির্দেশক। আদিম সমাজ ও আধুনিক সমাজের অন্তর্বর্তীকালীন বিরাট সময় প্রবাহে সমাজ ও ব্যক্তির যে সম্বন্ধ বিভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয় তার কত যে ভাব বৈচিত্রে আমরা অভিষিক্ত হই—আধুনিক শিল্পকলার মূল্যায়ন করার পথে সেই বিচিত্রের অনুশীলন এবং শিল্পীর ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও সমাজ শ্রয়ী চিন্তার মধ্যে মিল ও সংঘাত এই দুইই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। শিল্পীরা সমাজ ছাড়া নয় কিংবা পুরোপুরি সামাজিক ক্রিয়াকল্পের কারিগরও নয়—শিল্পীর কাজ ব্যবহারিক তাগিদে প্রকাশ প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা অপেক্ষা অনেক গভীরে নিহিত—সেখানে সেই ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে সমাজের বন্ধন বর্তমানের এক বিচিত্র এবং বিশেষ সমস্যা।

একথা মানতেই হবে, যে সময়ে সমাজের পুরোধা রাজারা কিংবা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক অর্থনৈতিক কারণবশতঃ, তখন শিল্পীও সেই সমাজের রীতিনীতিকে তথাকথিত নৈতিক চেতনার আওতায় রূপ দিতে বাধ্য হয়েছে। বাধা কথাটির প্রয়োগ কটু লাগতে পারে, কিন্তু ইতিহাস পরিশ্রুত অনুশীলনে ওই সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে বাধ্য বাধকতাই যে প্রধান ছিল তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। ক্লাসিক শিল্পকলা মানুষের বহু বছরের সাধনালব্ধ ফল। ক্লাসিক শিল্প সাধনায় মানুষের ঐকান্তিক কামনার জিনিষ মানসিকতার বর্হিমুখী স্বাধীন চিন্তার আশ্বাস। এই আশ্বাস থাকলেও ধর্মের প্রচণ্ড কর্ম কাণ্ড শিল্পের মানদণ্ড হিসাবেই সমাজে নিজের ভূমিকা নিয়েছিলো। ক্রমশঃ তথাকথিত নৈতিক কঠোরতার শুচিবায়ু গ্রস্থতার সমারোহে সেই পোষকতা শিল্পী মেনে নিয়েছিল। খৃষ্টীয় শিল্পী সাধনাব প্রথম যুগে

শুধুমাত্র ধর্মার্থে শিল্পের সাধনা তার অপটু দৈন্যকেও মেনে নিয়েছিল। তুলনায় আভিজাত্য বিলাসী রোমান কিংবা গ্রীক শিল্পচাতুর্য্য ব্যক্তিত্ব বিকাশকারী। ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় রাজা কিংবা ধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী সেই কারণে শিল্পী বৃত্তিধারী শিল্পীর ব্যক্তিত্ব রাজানুগ্রহ কিংবা ধর্মানুগ্রহ ব্যতীত সুদূর পরাহত ছিল। এই কথা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে ভারতবর্ষে ক্লাসিক কিংবা মধ্যযুগে শিল্প সাধনায় দীনতা ছিল। ধর্মের সংস্কার মানুষের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করেছিল—সেই প্রভাব তার বোধের মর্মস্থল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল—এর বাইরে কোন স্বচিন্তার প্রভাব সম্ভব নয় এবং সম্ভব হলেও প্রকাশিতব্য ছিল না। কিন্তু তবুও সেই প্রভাবশালী ধর্মার্থে সাধিত শিল্প চেতনার আওতা ডিঙিগয়ে শিল্পীর অব্যক্ত ভাষা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। কোন কোন শিল্পীর সেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সমস্ত প্রভাব, সমস্ত ক্ষমতা তুচ্ছ করে তার ব্যক্তিত্বকে প্রতিভাত করেছে। তবে এর সংখ্যা নগণ্য। তবুও ভাবতে বিস্ময় লাগে যখন দেখা যায় যে জীবনদর্শনের মূল আমার মনের মর্মস্থলে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য সংস্কারগুলি সমেত গ্রথিত—আজন্ম লালিত জীবন ধর্মের মধ্যেই চিন্তার যা কিছু স্ফূরণ এই গণ্ডির মধ্যেই নিজের ব্যক্তিত্ব সমাজহিতে ব্যয়িত। তবে ক্ষোভের বিষয় নিশ্চয়ই যখন দেখা যাবে প্রতিপত্তিশালীদের হিতই সামাজিক হিত। ব্যক্তি ও সমাজের এই স্তরে শিল্পীর লালিত জীবনাদর্শের মধ্যেই মহান শিল্পচিন্তা শ্রদ্ধেয়। জীবন ধর্মে স্রোত একমুখী ছিল—আর সেই একমুখী চিন্তার বাইরে অন্য চিন্তা দুস্তর—অন্যায়। সমাজতান্ত্রিক শক্তির অপচয় সুরু হবার সংগে সংগে সমাজে যে দলটির প্রভাব দেখা গেল—তাদের আর যাই না থাক—আর্থিক কৌলিন্য ছিল। এই কুলীনরা প্রথম যুগে নির্বিচারে মেনে নিয়েছে পূর্বতনদের কালচার, কিন্তু পরে পরে আর্থিক কৌলীন্যের জোর অন্য সমস্তদের সবকিছু একচেটিয়া করে নেবার প্রতিদ্বন্দিতায় নেমেছিল। জিতলোও সহজে। কারণটা অনুমেয়। ক্লাসিক যুগে কিংবা পরবর্তী যুগে রাজারা কিংবা ধর্ম শিল্পচেতনা লালিত করলেও যে জীবনাদর্শে শিল্পীরা অভ্যস্থ ছিলেন—সেই একই জীবনাদর্শে প্রতিপত্তিশালীরাও দীক্ষিত ছিলেন। কালচার কিংবা সদাচারের মূলটি সমভাগে শিল্পী এবং পৃষ্ঠপোষক উভয়েরই মধ্যে বিভক্ত ছিল। সর্বপ্রকার অনুশাসন এবং স্বচেতনার পথে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও ব্যক্তিত্ব সবক্ষেত্রে লৌহনিগড়ে শৃখলিত ছিল না। কিন্তু আর্থিক কৌলীন্যে অভিমানীদের আর যাই থাক সদাচারের লেশ মাত্র নেই। তাই ব্যক্তি এবং সমাজ সম্বন্ধীয় যে সংস্কার পূর্বতনীদের নিয়ন্ত্রিত করত সেই সংস্কার বর্তমানের এক জটিল সমস্যা। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিকতার যুগে ব্যক্তি এবং সমাজ এই দুইয়ের এক বিশেষ সম্বন্ধ শিল্পীদের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী করেছিল। অনুশাসন এবং শাসন এই দুইয়ের বন্ধন তখন নতুন অর্থবন্টনের পটভূমিতে শিথিল প্রায়—বর্তমানের কুলীনরাও তখন অগ্রগামী দল—তাই শিল্পে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি সচেতনতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সম্বন্ধটা ছিল কালচার আর অর্থের বিনিময় সূত্রে। কিন্তু অর্থের সম্বন্ধটা পরে এত প্রকটিত হলো যে কালচার না জানা কুলীনরা শিল্পের ধারক হয়ে দাঁড়াতে বর্তমানে ব্যক্তি এবং সমাজ সম্বন্ধ বিশেষভাবে জটিল হয়ে পড়েছে।

ক্লাসিকযুগে সমাজের কর্ণধাররা সক্রিয়ভাবেই অনুশাসনের আওতায় শিল্পীদের এনে ফেলতেন। কিন্তু এযুগে পোষকতার অন্তরালে স্বার্থবুদ্ধি যূথবদ্ধতায় ব্যক্তিত্ব বিলোপে অগ্রসর। এই আত্মবিলোপ সন্ত্রাসকর। বিমূর্ত শিল্পকলা এক অর্থে যূথবদ্ধতার বিরুদ্ধাচারণ এবং অন্য অর্থে বোধহয় সামাজিক অর্থে ব্যক্তিত্ব বিলোপকারী। প্রথম অর্থে এই বিমূর্ত শিল্প শিল্পীর আত্ম জিজ্ঞাসার বিপ্লবময় অন্বেষণ, কিন্তু অন্য অর্থে বিমূর্তবাদীতায় ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায়। যদি বলি যে ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা শিল্পকলার স্থায়িত্ব শ্রেষ্ঠ—কিন্তু সেই ধরনের

শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার স্থায়িত্ব বেদনাদায়ক। আগের কালে স্বাক্ষরিত চিত্রকলা না থাকলেও ব্যক্তিত্ব সেখানে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত—এটা যুক্তির খাতিরেও মানতে পারি না। সেইজন্য এটা স্বীকৃত যে ব্যক্তিত্বের আমেজটুকু থাকে বলেই এত বিচিত্র রকমের অন্বেষণ। বিচিত্রতা মানব মনের এক পরম ধন। তাকে যূথবদ্ধতার অজগর পেষণে দলাই মলাই করলে অত্যাধুনিক—অ-ব্যক্তিত্ব-শালী চিত্রকলার স্থান হবে কিন্তু মহৎ শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। ছবি যদি ঘর সাজাবার উপ-করণ মাত্র হয়—যেমন দরজা জানলার পর্দা, তা হলে এই ভালো। ডিজাইনের অতিরিক্ততা ছাড়া ছবিতে আর কিছু থাকার দরকার নেই। কিন্তু ছবিতে যদি অপরিমিত আত্ম জিজ্ঞাসার পথ খুঁজতে চাই—আর যদি ছবিতে আত্মবিশ্বাসের দাবী না থাকে তবে কণ্টকর কঠিন রেখা বন্ধনী ছাড়া আর কিছুই হবে না। যন্ত্র আমাদের যেমন দিয়েছে অনেক—তেমনি কেড়ে নিয়েছে আরও অনেক কিছু। আমরা অতিরিক্তপরিমাণে যন্ত্র উদ্ভুত মানসিকতায় খুইয়ে বসেছি—কিংবা খোয়াতে বাধ্য হয়েছি—নিজেদের ব্যক্তিত্ব বলে খুবই প্রয়োজনীয় মূলধনকে। এই বলার পেছনে এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বিমূর্তবাদ কেবল মাত্র নীরস বুদ্ধির খেলা, কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এক মানব মনের প্রতিধ্বনি মাত্র। সমাজ শিল্পের প্রতিধ্বনি কিংবা শিল্প সমাজের প্রতিধ্বনি। উভয় দিক থেকে দেখলে এইটিই প্রতিভাত হয় যে শিল্পীও যান্ত্রিক যূথবদ্ধতার পথে এক অনির্দেশ্য নিয়মে অবচেতনায় একই বুদ্ধির চক্রে বুদ্ধিবাদী। কিন্তু বিমূর্তবাদে যেখানেই ব্যক্তি শিল্পীর আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি সচেতন সেখানে বুদ্ধিবাদীতার উর্দ্ধে কোমল অনুভূতিতে আমরা অভিষিক্ত হই। পড়েছিলাম কোন এক শিল্পী যন্ত্র আবিস্কার করে ফুল নারীর সৌন্দর্য্যের একটা স্টাম্প তৈরী করে যাবেন—যাতে করে মানুষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির পথে কোন অসুবিধা না হয়। তাতে করে আর যাই হোক শিল্পকলা কথাটির অপপ্রয়োগ হতো মাত্র। কারখানা আর স্টুডিও একই পথে চলতো। বুদ্ধি দীপ্ত বিমূর্তশিল্পকলা যতদিন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে ততদিনই বিমূর্ত শিল্পকলা অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছিল। যূথবদ্ধতা শিল্পকলা সাময়িকভাবে যুগে যুগে মেনে নিলেও ব্যক্তি শিল্পী বিপ্লব সেখানে করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগে শিল্পীরা যে বিপ্লবী তা স্বীকার করতেই হবে। নিছক তর্কের খাতিরে নয় সমগ্র সমাজচিন্তার মাধ্যমেও। বর্তমানের যূথবদ্ধতা শিল্পে প্রতিফলিত হলেও বিমূর্তবাদ অন্বেষণ মাত্র এবং শিল্প চেতনার ক্ষেত্রে এই যূথবদ্ধ চেতনাই সত্য নয়। হয়ত বা সামাজিক চিন্তার এই যূথবদ্ধতার হাত থেকে রেহাই দেবে নব শিল্পচিন্তা, নতুন শিল্প বিপ্লব।

নিখিল বিশ্বাস

জনৈক অন্যায়কারী ক্ষমাপ্রার্থী লেখক

(১) জ্যৈষ্ঠসংখ্যা সমকালীনে আমার কিছু রচনার বিষয়ে শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু সওয়া তিনপৃষ্ঠাব্যাপী এক আলোচনা করেছেন। আলোচনার নাম 'আর একটু সৌজন্যবোধে ক্ষতি কি?' সোমেনবাবু আমার লেখায় যে সৌজন্যবোধের অভাব দেখেছেন তার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত, বিশেষত স্বামীজীর বক্তৃতার ভূমিকায় শ্লেষ বিদ্রূপ প্রকাশ করা যে উচিত হয়নি, এ বিষয়ে তাঁর তিরস্কারকে আমি সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি।

(২) সোমেনবাবু আমার অসৌজন্যের প্রতিবাদে বিশেষ সৌজন্য ও সহৃদয়তা সহকারে আমার লেখার দোষ দেখিয়েছেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিষয়ে সমালোচনামুখে যা বলা হয়েছে সেগুলিকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি, কারণ, 'কোনো মানুষ সম্বন্ধে নিন্দাই তার বিষয়ে সত্য কথা।' আঘাতে আমার চৈতন্য হয়েছে। আমার লজ্জিত বিবেক এখন সোমেন্দ্রনাথকে সেকুলার ধর্মযাজকরূপে দেখছে। তাই আমি তাঁর সামনে আমার সম্বন্ধে বলা ঐ সত্যকথাগুলির কয়েকটি 'কনফেসন' রূপে পুনরায় উচ্চারণ করে আমার পাপস্খালন করছি। সোমেনবাবুর তেমন দু' একটি কথা—

॥ সৌজন্যহীন ॥ 'বালকোচিত' ॥ যুক্তিহীনা রাগ ও ঝাঁঝযুক্ত।। অসুস্থ বুদ্ধি ।। বানিয়ে বানিয়ে শত্রু করার অত্যুৎসাহী ॥ ঝগড়ার প্রবৃত্তিযুক্ত ॥ 'লেখকের বালসুলভতা' ॥ আলোচনার ভদ্ররীতিহীন ॥ অকারণে উত্তেজনাসৃষ্টিকারী ॥ অহঙ্কৃত ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ॥ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিযুক্ত ॥ বাতাসে তলোয়ারচালক ॥ 'ছেলেমানুষি ঢঙ' ॥ গুরুভক্তির চশমাধারী ॥ অভদ্র ভূমিকা লেখক ॥ ক্রোধন স্বভাব ॥

আরও আছে। সে সবগুলিকে তুলতে হলে সোমেন বসুর গোটা রচনার প্রায় প্রতিটি লাইন তুলতে হয়। সেটা পারছি না—আমার কনফেকসনে এই ত্রুটি থেকে গেল।

(৩) এইখানেই এই লেখা শেষ করা উচিত। স্বীকার করা উচিত আমি কল্পনায় শত্রু খাড়া ক'রে তাদের বিরুদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চালিয়ে অনর্থক ব্যায়াম করেছি। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় আমার সেই শূন্যে চালিত তলোয়ারে আহত হয়েছেন কেউ কেউ। সোমেন বাবুও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি যদি আহত না হতেন তাহলে ঐ তিনপৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিঘাত করতেন না। হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো দেখ'ল লোকে হাসে। সোমেন্দ্রনাথ রেগেছেন! তবে কি তাঁর রাগ তাঁর হাসি?

(৪) আরও একটা দুটো কথা বলা দরকার। আমার প্রথম রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের সমালোচকদের যে সব কটাক্ষ করেছিলুম তার একটিকেও কিন্তু প্রত্যাহার করছি না। (এইখানে পুনশ্চ সোমেনবাবু স্বামীজীর মত স্বামীজীর এই নগণ্য ভক্তের মধ্যে স্বতোবিরোধ দেখবেন ক্ষমাপ্রার্থনার পরেও বক্তব্যে অনমনীয়!) আমি কোনো ব্যক্তির মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলুম। তেমন ব্যক্তি সত্যই আছেন, এবং কোনো কোনো মহলে তাঁদের কিছু প্রতিষ্ঠাও আছে বলে আমার ধারণা ছিল। সোমেনবাবু যদি বলেন, না, তাঁদের তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা নেই, তাহলে বর্তমান

লেখকের আনন্দের সীমা থাকবে না। আমি যে সেইসব ব্যক্তির নামোল্লেখ করিনি, তার একটা কারণ বর্তমানে স্বীকার করা নিরাপদ,—আমার সাহসের অভাব,—যে সাহসের, সত্যনিষ্ঠার, স্পষ্টবাদিতার যথার্থ সম্ভাব দেখা গিয়েছে আমার সম্বন্ধে সোমেনবাবুর সঙ্গত সমালোচনার মধ্যে।

(৫) আমার লেখার আর একটি দোষ ছিল যেটি সোমেনবাবু না বললেও তাঁর লেখা পড়ে বুঝতে পারছি, তা হল, ভাষাগত অস্পষ্টতা। বাংলা দেশে স্বামীজীর পরিচয় কি দাঁড়িয়েছে তা বলতে গিয়ে আমি তৃতীয় পয়েণ্টে বলেছিলুম—'স্কুল কলেজ হাসপাতালের গণেশ দেবতা।' সোমেনবাবু প্রশ্ন করেছেন, 'এ তিনি কোথায় পেলেন? যদি বা কেউ কোথাও এ ধরনের কথা বলে থাকে আমার চোখে তা পড়েনি—তা যে বাংলা দেশে স্বামীজীর পরিচয় নয় এটা সুস্থ-বুদ্ধিতে লেখকের বোঝা উচিত ছিল' ইত্যাদি। আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি, এ ধরনের কথা সত্যই কেউ বলেন নি। কেউ বলেছেন, এ কথাও বর্তমান লেখক বলেন নি। সোমেনবাবু ধরে নিয়েছেন, ওটাও বিবেকানন্দ-বিরোধীদের বক্তব্য। না, তা নয়, ওটা বিবেকানন্দের চিহ্নিত ভক্তদের সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের সমালোচনা। ঐ সকল ভক্তেরা কতকগুলি স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের দরজায় স্বামীজীকে স্থাপন করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রকাশে প্রায়ই বিরত থেকেছেন। এঁদেরই বিরুদ্ধে ঐ কথাগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু বক্তব্যপ্রকাশে ত্রুটির জন্য সোমেনবাবুর তা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে আমি বিশেষ দুঃখিত।

(৬) সোমেনবাবু স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর প্রতি আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজেও মানতে রাজি নই।' স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার দুটি কারণ তিনি জানিয়েছেন—তাঁর 'প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব' এবং 'স্ববিরোধ সত্ত্বেও বলিষ্ঠ জীবনবিশ্বাসী দৃষ্টি।' তাই বলে স্বামীজী সম্বন্ধে অন্ধ ভক্তি তাঁর নেই। তিনি স্বামীজীর দোষত্রুটি যথেষ্ট দেখিয়েছেন। সেগুলো সংক্ষেপে এই: (ক) সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আচরণ সঙ্গতিরক্ষা করে নি; অল্প বয়সে মৃত্যুই এর জন্য দায়ী। আরও বেশীদিন বাঁচলে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত 'নিরাসক্ত ঔদার্যের' অধিকারী হতে পারতেন। (খ) তিনি জাতীয়তার তীব্র মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন; (গ) স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল না, ইত্যাদি। এখানে সোমেন্দ্রনাথের কিছুটা রচনা উদ্ধৃত করা উচিত—

"দীর্ঘায়ু পেলে ঐ জীবন আসক্তিই যে প্রবল হয়ে উঠে আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা-মাখানো বহু ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ......বিরোধ কিছু স্তিমিত হলে তিনি যে আরও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি'ত সমস্ত পরিবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন, এবং তার ফলে যে সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছিন্নভিন্ন করে আরও উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিতে পারতেন এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। কিন্ত সময় তিনি পান নি। এটা আমারই ধারণা, আমার বিচারে এটাই বিবেকানন্দের একমাত্র লজিক্যাল পরিণতি হতে পারত।"

(৭) তাহলে ব্যাপারটা শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে। সোমেনবাবু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা ক'রেও বলতে কিছু বাকি রাখেন নি: বিবেকানন্দের ধারণা আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা মাখানো ছিল, সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডীতে বাঁধা ছিলেন তিনি, তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ছিল না ইত্যাদি। আমি আমার সামান্য রচনায় এই জাতীয় মনোভাবকে কিছু আঘাত করেছিলুম। সোমেনবাবুর বক্তব্য বিবেকানন্দ অল্প বয়সে মারা যেতেই যত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বয়সের এই অপরিণতিই তাঁর ধারণাগত অপরিণতির জন্য দায়ী। সোমেনবাবুর অনুমান বেঁচে থাকলে বিবেকানন্দের লজিক্যাল পরিণতি হত—আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা ত্যাগ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিলাভ। সোমেনবাবু বিশেষ যুক্তিবাদী। যুক্তি ছাড়া কথা বলেন না। সুতরাং

বিবেকানন্দের ঐ লজিক্যাল পরিণতির কারণ তিনি নিশ্চয় তার রচনার মধ্যে লজিক্যাল ভাবে জানিয়েছেন কিন্তু সে বস্তু যে কোথায় আছে অন্ধ ভক্তের চশমা পরে আছি বলে আমরা তা দেখতে পাই নি। তবে আমাদের মত অন্ধ ভক্তেরা একটা কথা (নিশ্চয় ইল্‌লজিক্যাল) বিশ্বাস করে—প্রত্যেক বড় মানুষের জীবনের একটা ভিত্তি থাকে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে তা আধ্যাত্মিকতা। সে বস্তু বিদেশে প্রচার করতে তিনি দেহপাত করলেন। বেঁচে থাকলে সেই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি যে খুব উচ্চ স্তর থেকে কথা বলেছেন সন্দেহ নেই। ঐ স্তর থেকে কথা বললে স্বামী বিশ্বাস করেন এবং তার কারণও (আমাদের কাছে অলিখিত ভাষায়) তিনি উপস্থিত করেছেন।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর ভাগ্যবিধাতার কাছে আমাদের অভিমান ছিল, সোমেন্দ্রনাথের লেখা পড়ে সেটা বেড়ে গেল।

(৮) একটি জায়গায় সোমেন্দ্রনাথ আমাকে একেবারে উদঘাটিত করে দিয়েছেন। তাঁর মতে আমি স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র রক্ষাকর্তা সেজেছি! কী শোচনীয়! কী শোচনীয় আমার অহমিকা! এরকম স্পর্ধা যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে আমি সাস্টাঙ্গে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু ঐ গুরু দাবি কোথায় করেছি খুঁজে পেলুম না। আমার স্থূল দৃষ্টির জন্যই কি খুঁজে পেলুম না? নিশ্চয় তাই, তবু আরও একটা কারণ মনে হচ্ছে; স্বামী বিবেকানন্দ জনচিত্তে বিপুল ও গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁর বিষয়ে চপল উক্তি স্বামীজীর অগণিত অনুরাগীর কাছে উদার ঔদাসীন্য বা নীরব ঘৃণা লাভ করে। বর্তমান লেখকের চরিত্রে সেই গভীরতা বা সহিষ্ণুতা নেই, তাই তিনি কিছু মন খুলে কথা বলেছেন, এবং তার ফলে না-বলার পটভূমিকায় সেই সামান্য বলাটা মস্ত হয়ে উঠে সোমেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর সামনে মাথা পেতে দিয়েছে।

একদিকে আমার এই অগভীরতা অন্যদিকে সোমেনবাবুর চিন্তাস্তরের যথার্থ উচ্চতা। তিনি সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন, স্বামীজী ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। বিজাতীয়দের কাছে বিবেকানন্দের মত মানুষ সম্বন্ধেও করুণা বোধ করা যায়, বলা যায় যে, বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটলে তাঁর মনেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটত। সোমেনবাবুর এই বক্তব্যকে মাত্র বিচক্ষণ সমালোচনা বলে ছোট করা উচিত হবে না, এটা কালাতিক্রমী ঊর্ধচারী দৃষ্টির সিদ্ধান্ত। এবং এই উদার বিশাল দৃষ্টিবশেই তিনি ত্যাগ করতেন! কিন্তু তবু তিনি তা করতেনই, কারণ সোমেন্দ্রনাথ ঐ লজিক্যাল পরিণতিতে যেখানে স্বামীজী বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বধর্মের প্রবক্তা বলে গৃহীত হয়েছেন সেখানে স্বামীজীর জনৈক স্বজাতীয়ের কাছে যদি তিনি সংকীর্ণ বলে প্রতিভাত হন, তাহলে ঐ স্বজাতীয়ের দৃষ্টি উদারতায় ও গভীরতায় কোন সুদূরসীমাকে স্পর্শ করেছে তা ভাবলেও দিশাহারা হয়ে যেতে হয়।

(৯) নিজের দোষের আর কত আলোচনা করব! আমি বিবেকানন্দের সমালোচকদের 'অমুসলমান' বলায় সোমেনবাবু আমার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দেখে সবান্ধবে হেসেছেন। হাস্যরসের প্রতি সোমেনবাবুর মত সিরিয়াস লোকের সাধারণ আসক্তি নেই; এই একটি ক্ষেত্রে যে আমি তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি তার জন্য সবিশেষ আনন্দিত। সোমেনবাবু আরও বলেছেন, ঐ গালাগালির ঝাঁঝ তাঁর গায়ে লাগেনি, 'মুসলমান' বলে গাল দিলেও লাগত না। এইখানে আমি একটু বিস্মিত হচ্ছি, নিশ্চয় ওঁর অনবধানতা, নচেৎ 'মুসলমান' শব্দটা যে গালাগালির শব্দ এটা সোমেনবাবুর মনে হলেও আমার মত গোড়া হিন্দুর ধারণার ত্রিসীমানাতেও আসে নি।

তবে স্বীকার করা উচিত 'অ-মুসলমান' শব্দটা ক্ষোভের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের অনেক পুরনো দুঃখ ওই শব্দটার সঙ্গে জড়ানো। স্বাধীনতা-

পূর্বের সাম্প্রদায়ক বাটোয়ারায় হিন্দু হয়েছিল অ-মুসলমান, এবং সম্ভবত আত্মধর্মে লাঞ্জিত হিন্দুরা সেটা মেনে নিয়েছিল। যাক সে কথা, এখানে রাজনীতির আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়, আমার উদ্দেশ্য ত্রুটিস্বীকার ও শিক্ষাগ্রহণ।

(১০) তাহলে দাঁড়াচ্ছে একদিকে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার অন্ধতা অন্যদিকে সোমেনবাবুর শ্রদ্ধা ও সমালোচনা। আমার অন্ধতা যে আছে তা সোমেনবাবুর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সুতরাং তা সত্য। স্বামীজীকে আমি সাধারণ সংস্কারক বলে মনে করি না, তাঁকে প্রফেট বলে মানি, ধারণাগত পূর্ণতার জন্য তাঁর আশী বছর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না (যে প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে সোমেনবাবু বোঝাতে চেয়েছেন),—আমার মনোভাব এই ধরণের, সুতরাং সোমেনবাবু ও আমি উভয়েই জানি, আমার অন্ধতা চরম বৈজ্ঞানিক অপারেশনেও কাটবে না। তবু যে সোমেন্দ্রনাথ নিছক মানবপ্রীতিবশে আমার প্রতি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ করেছেন, এবং আমি যে বিধাতার কত মন্দ সৃষ্টি তা দেখাবার জন্য তাঁর আয়না আমার সামনে তুলে ধরেছেন, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেছি। স্বামীজীর ধারণার অপরিণতি, স্ববিরোধ, ক্ষেত্রবিশেষ প্রতিক্রিয়াশীলতা, তাঁর জাতীয়তার উগ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মমোহ, এই সব সত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, ও অন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীর তুলনায় তাঁর জীবনবিশ্বাস সোমেনবাবুর প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু সেটা কি প্রচ্ছদপটের প্রশংসা নয় ?

না, তা নয়, সোমেনবাবু ঐ সামান্য প্রশংসার মধ্যেই অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সে ব্যাপারটি নিশ্চয় তিনি ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করবেন, এবং আমি কোনো পুনরালোচনা না করে আমার স্বভাবগত অন্ধভক্তির সঙ্গে সোমেনবাবুর মুখ থেকে তা শুনে যাব।

শংকরীপ্রসাদ বসু

জাতীয়তা না আন্তর্জাতিকতা

ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন মাত্র নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের কিছুটা অন্ততঃ ত্যাগ করে পরস্পরের মধ্যে মেল বন্ধনের একটা ঝোঁক আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এর সর্বাধিক আলোচিত ও পরিচিত দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় কমন মার্কেট। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা পরস্পরের শত্রুতাই করে এসেছে আজ তারা জাতীয় স্বরাটের কিছুটা নিজে-দের মিলিত সংস্থার কাছে যে ছেড়ে দিয়েছে, এ ঘটনা শুধু বিস্ময়করই নয়, কৌতুহলোদ্দীপকও বটে। ঠিক এই সময়েই জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন তোলা অনেকের কাছেই অন্যায় বলে বোধ হবে। কিন্তু তবু এ প্রশ্ন বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছেই।

পরাধীন ভারতে যে জাতীয় ভাবের জোয়ার দেখা গিয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগে সংগেই তাতে দেখা দিল ভাঁটার টান। দীর্ঘদিনের পদানত ভারত স্বাধীনতার প্রথম ঊষায় আবিষ্কার করল যে সভায় তার বিশিষ্ট আসন আছে। পৃথিবীর বহু জটিল প্রশ্নে ভারতের সমালোচনা বা সমাধান শুধু অন্যদেশের প্রশংসাই অর্জন করল না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে একমাত্র পন্থা বলে গৃহীত ও অভিনন্দিত হ'ল।

এরই ফলশ্রুতি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রসার। অবশ্য এ প্রসার পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় স্বাগত করাই উচিত এবং করা যেতো এই প্রবণতার মধ্যে কিছু

অসুস্থ লক্ষণ যদি না পরিস্ফুট হ'ত। আজকে ভারতীয় শিক্ষিত জনসাধারণের বেশ একটা বড় অংশে চলনে বলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে পরিষ্কার বিদেশীয়ানা ক্রমবর্ধমান হারে প্রকাশমাত্র। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিদেশীয়ানা প্রয়োজনীয় বলে মেনে নেওয়া চলতে পারে যেমন, কারখানার কাজে বিদেশী পোষাক কিন্তু সে পোষাক যখন সামাজিকতার ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করে, শ্মশানযাত্রী থেকে বরযাত্রী পর্যন্ত সকলে যখন প্যান্ট সার্টাবৃত হয়ে আসে তখন সত্যই চিন্তার কথা হয়ে ওঠে।

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে না। একদা পরাধীন ভারতে নিজ ভাষার প্রতি আমাদের সহজাত প্রেমের অভিব্যক্তি অতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছিল। (যে অসুস্থ লক্ষণ আজো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি প্রকট) কিন্তু স্বাধীনতার যাদুকাঠির স্পর্শে হঠাৎ সে ভাব কেটে গেল, হাওয়া বিপরীত মুখী হয়ে দাঁড়াল, আমাদেরও মাতৃ-ভাষার প্রতি একটি অনীহা দেখা দিল। তৎপরিবর্তে ইংরাজী ভাষার প্রতি আমাদেন দরদ যেন উথলে উঠল। আমাদের পরীক্ষাযন্ত্রে ইংরাজীর মূল্যমান নিম্নগামী হলেও সাধারণ জীবনে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। একদা যাঁর পাশে দুটো ইংরাজী কথা শুদ্ধ ভাবে লিখতে বা বলতে গেলে যথাক্রমে কলম ও দাঁত ভাঙবার সমূহ সম্ভবনা ছিল, আজ তিনিই কারণে অকারণে যত্রতত্র বেপরোয়া ভুল ইংরাজী বলছেন। আমাদের মনোগত ভাব হ'ল এই যে, যেহেতু ইংরাজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা সুতরাং আন্তর্জাতিক হবার প্রথম সোপান হিসাবে ইংরাজী ভাষার অপপ্রয়োগও বাঞ্ছনীয়। সংগে সংগে ইংরাজীয়ানা রপ্ত করতে পারলে আন্তর্জাতিক কল্পবৃক্ষের ফল হাতে পাওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হবার প্রচেষ্টা আরো উৎকট। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অংগে বিদেশী অনুসরণ-অনুকরণ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে এ অবস্থা সম্বন্ধে হয়ত অনেকেই ওয়াকিবহাল আছেন কিন্তু উসন্যাস গল্প থেকে এ অনুকরণ-অনুসরণ অনুপস্থিত ভাবলে ভুল করা হবে। অবশ্য সর্বদেশের সৎ সাহিত্যের, স্বীকারোক্তিসহই হোক বা ব্যতিরেকেই হোক. ভাষান্তর নিঃসন্দেহে স্বাগত করা উচিত কিন্তু যেখানে অনুবাদ করা হচ্ছে বলে স্বীকারোক্তি আছে সেখানে ছাড়া পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি ও পশ্চাদপটের নির্বিচার ও নির্দ্বিধা উপস্থাপন কোনমতেই গ্রহণীয় নয়। এ বিষয়ে অবশ্য সর্বাধিক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে নাট্য সাহিত্যে। যেহেতু দর্শনগ্রাহ্য রূপের মধ্যে নাটকের আবেদনই সুদূরপ্রসারী তাই তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে বিদেশী নাট্যকারদের যে প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তা কোনমতেই স্বাগত জানাবার নয়।

চিত্র-ভাস্কর্যে এই আন্তর্জাতিক হবার প্রচেষ্টা প্রায় সর্বগ্রাসী। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে প্রায়শঃই এই মন্তব্য শোনা যায় যে. তাঁদের সৃষ্টি যেহেতু দেশ-কাল-পাত্র নির্ভর নয় সেই হেতু তাঁদের আংগিকের ব্যবহার অবশ্যই এক আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারী হবে। কথাটা শুনতে বেশ ভালই লাগে কিন্তু এই সব শিল্পীরা একটি অত্যন্ত সহজ কথা হয় বিস্মৃত হ'ন, না হয় স্বেচ্ছায় এড়িয়ে যান। কথাটা শিল্প বিষয়ে সামান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিও জানেন, তবু তার পুনরুক্তি নিশ্চয় অবান্তর হবে না। পশ্চিমী শিল্পীদের আজকের সৃষ্টি প্রচেষ্টা অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সে প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাতিক ভেবে গ্রহণ করতে যাওয়াটা নিজের মনকে চোখঠারা মাত্র।

আমাদের আন্তর্জাতিক হবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সংগে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীন অন্যান্য দেশ-গুলির অবস্থা অবশ্যই তুলনা করা যেতে পারে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ইন্দো-

নেশিয়ার অবস্থান তথা অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়ানরা কিন্তু আন্তর্জাতিকতার মিথ্যা মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে পুরোপুরি জাতীয় ভাবাপন্ন হয়েছে. এমনকি উগ্র জাতীয়তাবাদ দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে পর্যন্ত নিজেদের পছন্দসইভাবে সাজিয়ে নিয়েছে। এমন উগ্র জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে নেবার নয় বটে, কিন্তু তবু নিজেদের সদ্য অর্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রথমে এমনতর কিছুটা প্রয়োজন আছে বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলির কথা বিচার করলে আন্তর্জাতিকতার সংগে জাতীয়তার যোগাযোগ পরিষ্কার হবে। একদা পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষ থেকে বলা হ'ত যে আফ্রিকান সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলে কোনো পদার্থই নেই। আর দেশজ কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আফ্রিকানরা মনে প্রাণে ইউরোপীয় হবার সাধনায় মেতেছিল। আজকে স্বাধীনতার স্পর্শে তাদের মধ্যে কিন্তু পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। আজ আফ্রিকানরা আগে জাতীয়তাবাদী পরে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। তাই সামাজিক অনুষ্ঠানে নিত্য ব্যবহৃত ইউরোপীয় পোষাক ছেড়ে দিয়ে আজ বিদেশীর চোখে কিম্ভূত মনে হবার প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও তারা নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে আসতে লজ্জা তো বোধ করেই না উপরন্তু গর্বই বোধ করে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজ এই একই অবস্থা। কোনো ইংরাজ বা জার্মান বা রুশ আন্তর্জাতিক হবার জন্যে নিজের জাতীয়তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে বলে মনে হয় না। জাপানীরা ঘরের বাইরে বিদেশী পোষাক পরলেও ঘরে ফেরা মাত্র খাঁটি জাপানী। এমনে কি যে দেশকে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক বলা হয় সেই সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও নিজেদের পরিবেশে সম্পূর্ণ সুইস। অবশ্য শিল্পীরা বলবেন যে ফ্রান্সের লোকেরাই সর্বাধিক আন্তর্জাতিক। কিন্তু ফরাসীদের সামাজিক পরিবেশ ও জীবন যাত্রা প্রণালীতে ফ্রান্সের প্রভাব অপরিসীম। এমন কি তথাকথিত বোহেমিয়ানিজমের যে রূপ ফ্রান্সে দেখা যায় তা সে দেশে ছাড়া অন্যত্র রূপায়িত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

আমরা দেখলাম যে. পৃথিবীর সর্বত্রই আন্তর্জাতিক হবার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সবদেশের অধিবাসীই সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয়। হয়ত আন্তর্জাতিক হবার প্রকৃষ্ট পন্থাই এই। তাহলে আমাদের জাতীয়তা পরিত্যাগ করে, বিদেশী অনুকরণে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে, তথা-কথিত আন্তর্জাতিক হবার সমস্ত দায়দায়িত্বই কি আমাদের ওপর অর্শেছে?

যে মানুষ নিজের পরিবেশের সংগে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, সে যে অন্য পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ শোভিত হলেই ময়ূর হয় না, আবার দাঁড়কাকের সমাজেও তার স্থান হয় না। আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের আজ এই কথা ভাববার সময় অবশ্যই এসেছে। আমাদের সমাজের সংগে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নিরালম্ব বায়ুভূক হলেই যে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা যায় এ ভ্রান্তি থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। তাহলে হয়ত আমরা প্রকৃত জাতীয়তাবাদী হয়ে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার দিকে পা বাড়াতে পারব।

রবি মিত্র

জাতীয় সংহতি ও জাতিভেদ

জাতীয় সংহতি কথাটি আজকাল প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। সভা-সমিতিতে লোকসভা রাজ্যসভায়, পত্র-পত্রিকায়, সর্বত্রই এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইতেছে। চিন্তাশীল দেশনায়কগণ এসম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং যাঁহারা দেশের ও দশের যথার্থ কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, যতদিন জাতীয় সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। তাঁহারা বহু চিন্তার পর বুঝিয়াছেন যে, জাতীয় সংহতিকে যে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পথে যে সকল প্রধান অন্তরায় তাহাদিগের মধ্যে বর্তমান সমাজের জাতিভেদ প্রথা হইতেছে অন্যতম। প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই যে বর্তমান জাতিভেদের উৎপত্তি ইহা অনস্বীকার্য। অত-এব অতীব পূর্বে কি প্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত ছিল তাহার প্রকৃত পরিচয় না জানিলে বর্তমান জাতিভেদ প্রথার কঠোরত্ব ও ভীষণত্ব সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে না। সেই কারণেই শাস্ত্রসমূহ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অতীব পূর্বে বর্ণভেদ কলপরম্পরাগত ছিল না। লোকে আপন আপন গুণ কর্ম অনু-সারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া উল্লিখিত হইত। অর্থাৎ বর্ণত্ব কাহারও পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চিরস্থায়ী হইত না। গুণ কর্ম স্বভাব অনুসারে যে কোন বর্ণের লোক যে কোন বর্ণে প্রবেশ করিতে পারিত এবং জীবিতকালেই বর্ণ পরিবর্তন ঘটিত। একই ব্যক্তি একই জীবনে বৃত্তি অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য বা কখন শূদ্র সংজ্ঞা পাইত। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন, "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টংহি কর্মভিঃ বর্ণতাং গতম্ ।। (মহাভারত, শান্তি পর্ব, ১৮৮ অধ্যায়)। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। কেননা পূর্বে এই পৃথিবীতে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারাই জগৎ পূর্ণ ছিল। তাঁহারাই পৃথক পৃথক কর্মে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।" ভীষ্মও বলিয়াছেন "তস্মাদ্বর্ণা ঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই সাধু এবং একে অন্যের জ্ঞাতি।" অত্রি সংহিতায় লিখিত আছে, "দেবো, মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ। ৩৬৪। ব্রাহ্মণ দশ প্রকার যথা,- দেব মুনি দ্বিজ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল।"। পশু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ। তেনৈব সচ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ। ৩৭২। অর্থাৎ গলায় মাত্র পৈতা পরিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্বের গর্ব করে অথচ ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, এই পাপে তাহাকে পশু ব্রাহ্মণ বলা হয়।" মহাভারতের শান্তি পর্ব, ১৮৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "ইহলোকে বস্তুত বর্ণের ইতরবিশেষ নাই। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয় ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্বকর্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হই-য়াছেন।" আপস্তম্ব ঋষি বলিয়াছেন, "ধর্মচর্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ।।১।। অধর্মচর্য্যয়া পূর্ব বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ।।২।। অপস্তম্ব প্র ২।৫ ১০—১১।। অর্থাৎ ধর্মাচরণ দ্বারা নীচ বর্ণ উত্তম উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণের যে যে কর্তব্যাধিকার কর্ম আছে, সেই সেই গুণ কর্ম সেই সেই

পুরুষ বা স্ত্রী প্রাপ্ত হয় ।।১।। সেইরূপ অধর্মাচরণ দ্বারা উত্তম-উত্তম বর্ণ নীচ নীচ বর্ণ প্রাপ্তি হয় এবং তাহারাই সেই সেই বর্ণের অধিকারী ও কর্মের কর্তা হইয়া থাকে ”।।২ ।। মনু বলিয়াছেন, “শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যা-দ্বৈশ্যাত্তথৈবচ ।। মনুস্মৃতি তাঃ ১০। ৬৫।। অর্থাৎ উত্তমগুণ কর্ম ও স্বভাবযুক্ত যে শূদ্র, সে যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এবং যে ক্ষত্রিয়, সে ব্রাহ্মণ বর্ণের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নীচ কর্ম ও গুণযুক্ত যে ব্রাহ্মণ, সে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র; এবং যে বৈশ্য, সে শূদ্র বর্ণের অধিকার ও কর্ম প্রাপ্ত হয়।" হরিবংশের ১১, ২৯ এবং ৩২ ও বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের ১, ৮ এবং ১৯ অধ্যায়ে এক ব্যক্তি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণেরই উৎপত্তি প্রসঙ্গ বিনিবেশিত আছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ইহা সর্বজনবিদিত। অগ্নি-পুরাণের ২৭৩ অধ্যায়ে প্রদর্শিত আছে যে, বৈবস্বত মনুর তনয় নাভাগের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বায়ু পুরাণের ৮৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মনুতনয় পৃষত গুরুর একটি গাভী হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন এজন্য তিনি মহাত্মা চ্যবনের শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

উল্লিখিত বিবরণগুলি হইতে নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্তমান সমাজের দুষ্ট ব্রণস্বরূপ অস্পৃশ্যতা সে যুগের জনসাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বেদ বলিতেছেন, “ওঁ সমানী প্রপা সহবোঽন্ন ভাগাঃ সমানে যোক্ত্রে সহবো যুনজ্মি (অথর্ব বেদ ৩।৩০।৬)। অর্থাৎ হে মনুষ্য। তোমাদের জলপানের স্থান এক হউক, তোমাদের ভোজন এক সঙ্গেই হউক। আমি তোমাদিগকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছি। সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া লিখিয়া-ছেন, “সহবোঽন্ন ভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহএব ভবতু পরস্পরানুরাগাবশেন একত্রাবস্থিত— মন্নপানা-দিন যুস্মাভি রুপভোজ্যতামিত্যর্থঃ।। অর্থাৎ তোমাদের অন্নভোগ একসঙ্গে হউক। পরস্পরের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমরা একসঙ্গে অন্নপানাদি গ্রহণ কর। (অধুনা জনৈক মহাপুরুষ সংক্রান্ত উৎসবাদিতে ভোগ সেবার সময় ব্রাহ্মণেতরদিগের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন পঙ্ক্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বেদবাক্যের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা!) মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতে-ছেন, ‘আর্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রা সংস্কর্তার সুতঃ (আপস্তম্ব ২। ২। ৩। ৪)। অর্থাৎ আর্য্য-দের অধ্যক্ষতায় শূদ্রেরাই রন্ধন করিবে।" মহর্ষি মনুবিধান দিতেছেন যে, “শূদ্রগণ দাস্য কর্মদ্বারা জীবিকার্জনে অক্ষম হইলে সূপকার কর্ম (পাচকগিরি) করিবে" (১০/৯৯) স্কন্দ পুরাণও বলিতেছেন, "বিপ্রাদি বর্ণত্রয়স্য সেবনং শূদ্র কর্মশ্চ। জীবেচ্চ সততং শূদ্র শ্চাক্ষমে কারকর্মণা।। অর্থাৎ বিপ্রাদি তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের কার্য্য, অক্ষম হইলে পাচকের কর্ম করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে।" মহর্ষি মনু পুনরায় বলিয়াছেন, “আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ (৪।২৫৩)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষিকার্য করিয়া অর্দ্ধেক ভাগ দেয়, কুলমিত্র, গোপালক, চাকর, নাপিত ও আত্মসমর্পণ-কারী শূদ্র—ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়।" মহর্ষি আপস্তম্ব স্বীয় ধর্মসূত্রে লিখিয়াছেন, “সর্ব বর্ণানাং স্বধর্মে বর্তমানানাং ভোক্তব্যম। অর্থাৎ স্বধর্মস্থিত সর্ব বর্ণের অন্নই গ্রহণ করা যায়। জলপান সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন, “এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ। সর্বতঃ প্রতি-গৃহ্নীয়ান্মধ্বভয় দক্ষিণাম্ (৪। ২৪৭)।। অর্থাৎ কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন, মধু, অভয় ও দক্ষিণা আসিয়া উপস্থিত হইলে সর্ব স্থান হইতে গ্রহণ করা যায়।" ন্যাশনাল প্রোফেসর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর পি· ভি· ক্যান লিখিয়াছেন, — “Vide Gautama xvii. 1 and 6, a brāhmana could not take food from a sudra, except when the sudra was his

own cowherd or tilled his field or was a hereditary friend of the family or his own barber or his dāsa. ......Apastamba allows sudras to be cooks in brāhmana households provided they are supervised by a member of the three higher classes and observed certain hygienic rules about pairing nails, cutting of hair, etc". (History of Dharmasastra, Vol. II, Pt. I).

"অদ্যাপি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা মুসলমান চাকর রাখে, হিন্দু চাকর মিলে না। ঐ মুসলমান চাকর জল লইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই জলে পূজা, পাক, স্নান করিলে এবং উহা পান করিলে জাতি ভ্রষ্ট হয় না।" (কাশ্মীর ও তিব্বতে—স্বামী অভেদানন্দ)।

পূর্বে সপিণ্ডের দেহত্যাগ হইলে সকল বর্ণের পক্ষেই দশ দিবসমাত্র অশৌচ পালনীয় ছিল। অধ্যাপক কালে লিখিয়াছেন, "angiresa quoted by Mitakshara on yājnavalka-smriti III 22 prescribes compurity (asauca) for ten days for all Varnas on the death of a sapinda". (History of Dharmasatra, Vol. III).

প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের এরূপ আমূল পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য লইতে হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ৬৩ প্রকারদর্শন-শাস্ত্র প্রচলিত ছিল। তাহার পর যখন জৈন, আজীবক, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, ভাগবত, পাশুপত প্রভৃতি ধর্ম যাহাদিগকে সম্পূর্ণ বেদানুগামী বলা চলে না বরং কয়েকটি বেদবিরুদ্ধ—ভারতভূমিকে পর্যায়ক্রমে প্লাবিত করিল, তখন জনগণের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইতে লাগিল, যাহার ফলে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া পড়িল। ছল চাতুরীতে তখন ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ কেহই ছিল না দেবী ভাগবত পড়িলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। লিখিত আছে "পূর্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে কলৌ ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ। পাষণ্ডনিরতা প্রায়ো ভবন্তি জনবঞ্চকাঃ।। অসত্য বাদিনঃ সর্বে বেদধর্ম বিবর্জিতাঃ। দাম্ভিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবর্জিতাঃ।। শূদ্র সেবা পরাঃ কেচিন্নানাধর্ম প্রবর্তকা।।" (দেবী ভাগবত ৬।১২) অর্থাৎ পূর্বযুগে যাহারা রাক্ষস ছিল তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য কলির ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই পাষণ্ড মতাবলম্বী, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বেদোক্ত ধর্মবিহীন, দাম্ভিক, চতুর, অভিমানী, বেদজ্ঞানশূন্য ও শূদ্র সেবী হয় এবং নানা প্রকারের উপধর্ম প্রবর্তন করে।" তৎকালীন কলাকৌশল পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ সম্যক বুঝিয়াছিলেন যে সম্মুখে সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং তাহার প্রতিকারের উপায় যথাসত্বর উদ্ভাবন করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের উদ্ধার পাইবার সমস্ত পথ অচিরে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের স্বার্থরক্ষার একমাত্র উপায় জনসাধারণকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখা। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ এমন কি আপনাদিগের পরিবারভুক্ত কন্যাদিগকে উপঢৌকন দিয়া তদানীন্তন ক্ষত্রিয় রাজগণকে বশীভূত করিলেন এবং উভয়ের সম্মিলিত শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপে বিধান দিলেন, "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ (বিষ্ণু সংহিতা ৭১।৪৮)। অর্থাৎ শূদ্রকে সদুপদেশ দিবেন না। নচাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম্ (ঐ ৭১।৫১)। অর্থাৎ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দিবেন না।"

"বেদমুপশৃন্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদ (গৌতম ১২)। অর্থাৎ শূদ্র বেদমন্ত্র শুনিলে তাহার কর্ণকে সীসা ও গালা গলাইয়া ভরাট করিয়া দিবেন এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদ করিবেন।" "বধ্য রাজ্ঞা সর্বে শূদ্রো জপহোম পরশ্চ যঃ (অত্রি সংহিতা ১৯)। অর্থাৎ শূদ্র জপহোম পরায়ণ হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবেন।" শুধু

হইহি নহে। তাহারা বিভিন্ন উপজাতির উদ্ভাবনা এবং সকলকে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া অখন্ড হিন্দু সমাজকে নানা সম্প্রদায়ে খন্ড খন্ড বিভক্ত করিয়া ভেদবৈষম্যের কালানল সৃষ্টি করিলেন, যাহার বিষময় ফল আজ পর্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। অধিকন্তু শূদ্রদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় ও অস্পৃশ্য করিলেন। "একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্ক নির্বাসিতঃ (বিষ্ণু সংহিতা ৫।২০)। অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে রাজা তাহার কোমরের নীচে দাগ করিয়া নির্বাসিত করিবেন। কামকারেণাস্পৃশ্য স্ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্ বধ্যঃ (ঐ ৫।১০৩)। অর্থাৎ শূদ্র স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে রাজা তাহাকে বধ করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেবী ভাগবত সত্যই বলিয়াছেন, কলিযুগে চতুর ব্রাহ্মণগণ প্রায় পাষন্ড মতাবলম্বী হইয়া নানা প্রকারের উপধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। অনুমান খৃষ্টাব্দ প্রথম শতক হইতে এই অমানুষিক শূদ্র নির্যাতনের সূত্রপাত হয়।

বর্তমানে জাতিভেদ প্রথা-প্রসূত অহিতকর বৃত্তিগুলির উচ্ছেদকল্পে আইন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, যেন তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আইনকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে চাই উপযোগী পরিবেশ এবং এই বিষয়ে আমাদিগের সরকারকে নির্মম হইয়া যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। আজকাল দেখিতে পাই যাঁহারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করেন, যাঁহারা বিচারশূন্য সংস্কারজালে আবদ্ধ, যাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত সত্যভাষণ মনোমত না হইলে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন এবং উপায়বিহীন হইয়া লেখকের অযথা অভদ্রজনোচিত প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, যাঁহারা জ্ঞানের জন্মভূমিকে অজ্ঞানের বিস্তারে সতত যত্নশীল, যাঁহারা মনেপ্রাণে পুরাতন প্রথার পরিবর্তন বিরোধী, যাঁহারা প্রকাশ্যে জাতিভেদ প্রথার গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ, যাহাদিগের আগমনবার্তা সার্কাস, থিয়েটার বা যাত্রাদলের ন্যায় শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উভয়পার্শ্বস্থ গৃহপ্রাচীরের গাত্রে ক্রমশ-প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচারিত হয় এবং এই প্রকার অপপ্রচারের প্রভাবে যাঁহারা সত্যদর্শী, তত্ত্বদর্শী, তপস্যাসমৃদ্ধ প্রমাণপুরুষ রূপে লোকসমাজে বিচরণ করেন, যাঁহারা দীক্ষা দিবার পূর্বে অব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অশৌচ সঙ্কোচের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি লইয়া থাকেন, যাঁহারা নিজ দলভুক্ত পত্রিকার মাধ্যমে অশৌচ সঙ্কোচকারীদিগকে অশাস্ত্রীয় (??) আচরণের জন্য পুত্রকলত্রাদিসহ মহা সর্বনাশে পতিত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন, যাঁহারা পরিবর্তনশীল লোকচারগুলিকে নিত্য এবং ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন, যাঁহাদের ধর্ম হইল কেবলমাত্র বাহ্য গোড়ামি, তাঁহারাই অথবা তাঁহাদিগের ভক্তবৃন্দ, সরকারের সহযোগিতায়, কি শিক্ষা কেন্দ্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি রাজকার্যে, কি বেতার জগতে সমাজের সকল স্তরেই মনানন্দে সম্মানে বিরাজ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদিগের সরকার "চোরকে বলে চুরি করতে গেরস্তকে বলে সাবধান হোতে" এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত না এই নীতির আমূল পরিবর্তন হইবে এবং পূর্বোক্ত মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সর্বপ্রকার সহ-যোগিতায় সরকার বিরত হইবেন, ততদিন জাতীয় সংহতি সুদূরপরাহত এবং আমাদিগের ভবিষ্যৎও ঘনতমসাবৃত আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব।

মনোনীত সেন

স মা লো চ না

শ্রীপান্থের কলকাতা।। শ্রীপান্থ। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—সাত টাকা।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা ।। ডক্টর শ্রীঅধীর দে। সৃষ্টি প্রকাশনী ১৪১ বি, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, কলিকাতা—৩৪। পরিবেশক—বি· এম পাবলিশার্স ৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—বারো টাকা।

পলাশীর যুদ্ধেরও অনেক পূর্বে জব চার্ণক সূতানটি নামক এক অখ্যাত পল্লীর সমীপে গঙ্গা-তীরে এক বটবৃক্ষের তলায় বসে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বাস্তবে তার রূপায়ণ যে এত সুবিশাল হয়ে উঠবে তা তিনি নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। জব চার্ণক যে নগরীর পত্তন করে-ছিলেন তা মাত্র একশ বছরের মধ্যেই পূর্ব গোলার্ধের বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হলো। কলকাতার এই একশ বছরের ইতিহাস যেন রোমান্সে ভরা ঘটনাবহুল এক বিচিত্র উপন্যাস।

কলকাতা নগরী খেয়াল-খুশীমত বেড়ে উঠেছে। কোন স্থপতির পরিকল্পনার ধার সে ধারেনি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য নগরী হিসেবে কলকাতার পত্তন হয় এবং বাণিজ্য লক্ষ্মীর প্রসাদেই তার শ্রীবৃদ্ধি। ঐ যুগে যে সব ইংরেজ বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা ছিল একান্তভাবে ভাগ্যান্বেষী। ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি কোন প্রকার নীতিবোধ তাদের ছিলনা। লুন্ঠন, শোষণ আর অত্যাচার এ ছাড়া তারা কিছু বুঝত না। রাজভক্ত সরকারী চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে এদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। এরাই হলো কলকাতার আদিযুগের সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। তারপর মানদন্ডধারী বণিক যেদিন রাজদণ্ডের অধিকারী হলো সেদিন থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার রশ্মিসম্পাতে কলকাতা নগরী আলোক প্রাপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। মানবিক বোধসম্পন্ন মিশনারী, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত দূর-দর্শী জনসেবক, দাম্ভিক সরকারী কর্মচারী, সহজলভ্য অর্থের আকর্ষণে আকৃষ্ট মাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করতে সক্ষম বিলিতি গুন্ডা এবং প্রবল জাত্যাভিমানবিশিষ্ট সেনানীবৃন্দের ত্বরিত আগমনে জেলে-ডোবা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ কলকাতা অকস্মাৎ আভিজাত্যের ঘেরাটোপে মহিমময় হয়ে উঠল। বিলিতি প্রভুদের সানুগ্রহ প্রসাদে পুষ্ট হয়ে আরেকটি দেশী শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটল। এই শ্রেণীটি হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সুফল যেমন বর্ণনাতীত কুফলও তেমনি অজস্র।

অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশক থেকে ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত কলকাতা নগ-রীর ইতিহাস অগণিত ঘটনায় ভরপুর। ঐ সময় প্রায় প্রতিদিন কলকাতায় কোন না কোন ঘটনা ঘটেছে। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ এসে কলকাতার বন্দরে ভিড়েছে আর নূতন উত্তেজনায় সারা সহর মেতে উঠেছে। লন্ডনের কুখ্যাত পাড়ার রকবাজ ছোকরারা যেমন কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে এসেছে তেমনি অকল্পনীয় বিত্তের অধিকারী স্বামী-সংগ্রহের আশায় শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীরাও এসে কলকাতায় ভীড় জমিয়েছে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। তাই লর্ড ব্যারনরাও যেমন এসেছেন তেমনি টম-ডিকেরাও এসেছে। সারা কলকাতা জুড়ে তাদের তাণ্ডব। তাদের সঙ্গে

যুক্ত হয়েছেন সদ্য ইংরেজী শেখা দেশীয় ধনিক, বণিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। রাজনীতিচর্চা, নানা বিদ্যাচর্চা, জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গে চরম বিলাসিতা, স্ত্রীলোক নিয়ে রেষারেষি, দাঙ্গা, গুণ্ডামি রাহাজানি প্রভৃতি সব কিছু মিলে সেদিনকার কলকাতা যেন এক বিরাট মৌচাক। সারাক্ষণ শুধু গুঞ্জন আর গুঞ্জন।

কলকাতার সেই বিচিত্র দিনগুলির কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে। সুন্দরী ললনা নিয়ে উচ্চতম রাজপুরুষদের ডুয়েল; সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে কূট চক্রান্ত; গোরা সৈনিকের লাম্পট্য, মাতলামি ও গুণ্ডামি; রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদরী সাহেবদের বক্তৃতা; নূতন নূতন রাজপথ, প্রাসাদের উদ্ভব; নাট্যশালা, পানশালা, বিদ্যায়তন, বেশ্যা বাইজী এবং বিলাসিতার অজস্র উপকরণ—দিনগুলি যেন পাখায় ভর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। আজকের রুদ্ধশ্বাস এই নগরীতে বসে সে সব দিনের কথা স্বপ্নের মত মনে হয়। তবুও যখন কলকাতার অজস্র ভগ্ন প্রাসাদ, ভগ্ন সমাধিমন্দির বা মর্মরমূর্তিগুলি পথের ধারে পলকের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন আমাদের মনের দুয়ারে স্মৃতিভরা অতীত ধীরে ধীরে তার যবনিকা উত্তোলন করে। আর ঐ যবনিকার অন্তরালে যদি একবার আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তবে ধূলিধূসরিত, ক্লেদ ও গ্লানিতে পূর্ণ রূঢ় বর্তমানের বজ্রমুষ্টি থেকে অনায়াসে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। আমাদের চোখের সামনে তখন ভেসে ওঠে এক মায়াময় স্বপ্নপুরী।

এই মায়ার জগতে প্রবেশ করবার অভ্রান্ত কুঞ্চিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন শ্রীপান্থ। সম্প্রতি কিছুকাল ধরেই এই ঐতিহ্যপূর্ণ নগরীর অতীত ইতিহাস উদ্ঘাটনের একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণেই নিবদ্ধ। ইংরেজ ইতিহাস রক্ষা করতে জানে। ইতিহাসের প্রতি ইংরেজ জাতির অসাধারণ প্রীতি সর্বজনবিদিত। কাজেই কলকাতার ঐতিহাসিক উপাদানের বিশেষ কোন অসদ্ভাব নেই। শ্রীপান্থ তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে বিস্তৃত নির্দেশিকা দিয়েছেন তার থেকেই কলকাতার ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য উপলব্ধি করা যায়। সেই সকল উপাদান স্তূপীকৃত করে খণ্ডে খণ্ডে কলকাতার ইতি-হাস রচনা করা গবেষক বা ঐতিহাসিকদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয় যদিও তা কৃতিত্বপূর্ণ এবং অসাধারণ পরিশ্রমের কাজ। তবুও বলব সেই সুবিশাল ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কোন আগ্রহ নেই যদিও তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে পারে। মোগল সম্রাট আকবরের প্রিয় সুহৃদ বীরবলের জীবনের কাহিনী তখনকার দিনের নথিপত্রে এবং আকবরের সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলি সংগ্রহ করে বীরবল সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থও রচিত হয়েছে। কিন্তু গবেষক ও ঐতিহাসিক ছাড়া আর কজন সেই সব মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করেছে? অথচ বীরবল সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কি কম? আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন 'বীরবল' ছদ্মনামধারী প্রমথনাথ চৌধুরী। কেন তিনি বীরবল নাম গ্রহণ করলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি আসল বীরবলের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে সহস্র পাতার ইতিহাসের চেয়ে তার মূল্য যে অনেক বেশী তা আশা করি কোন প্রতিবাদের আশংকা না রেখেই বলা যায়। শ্রীপান্থকে ধন্যবাদ যে তিনি তাঁর কলকাতার কাহিনীতে ঐতিহাসিক তথ্যকে কোনপ্রকার বিকৃত না করেও ইতিহাস চর্চা করেন নি, বা সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব আওড়ে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন নি।

'শ্রীপান্থের কলকাতা' গ্রন্থে মোট ৩৭টি উপাখ্যান (তা ছাড়া কি বলব) আছে। ইতিহাস সংস্কৃতি, সমাজ, বণিক, প্রেমিক, বাবুর্চি-খানসামা শিক্ষক ছাত্র গ্রন্থকার প্রকাশক প্রভৃতি বিভিন্ন

ধরণের অর্থাৎ এক কথায় প্রায় সব কিছুকেই এই উপাখ্যানগুলি ছুঁয়ে রেখেছে। কাল ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান না হলেও তাদের একটা ধারা অনায়াসেই এই গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। উপখ্যানগুলি হাল্কা মেজাজে সরস ভঙ্গীতে লিখিত। যেহেতু এইগুলি প্রধানতর সংবাদপত্রের তাগিদে লিখিত হয়েছিল সেজন্যে বস্তু বিভিন্ন হলেও সকলকেই এক ছাঁচে ঢালাই করতে হয়েছে। বোধ হয় এছাড়া উপায়ও ছিল না। কিন্তু তৎসত্বেও একঘেঁয়েমির স্পর্শ কোথায়ও অনুভূত হয় না। বৈঠকী গল্প বলার ভঙ্গীতে তিনি যেভাবে ইতিহাস পরিবেশন করেছেন তা যুগপৎ তাঁর ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপর অনায়াস অধিকারের সাক্ষ্য বহন করে।

সাহিত্যে প্রবন্ধের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। রস-নিষ্পত্তিই যদি সার্থক সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় হয় তবে গদ্যে লিখিত যে-কোন রচনাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। আবার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাহা রচিত হয় তাহা-কেই যদি প্রবন্ধ-সাহিত্য বলি তবে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়কেই সার্থক প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত করতে হয়। তবে কি এই দুইয়ের মিশ্রণজাত পদার্থকে প্রবন্ধ-সাহিত্য বলব? এর বিরুদ্ধেও তর্ক তোলা যায়। আমরা সেই তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কারণ আলোচ্য গ্রন্থের 'পরিচায়িকায়' অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক স্বয়ং সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর গ্রন্থকার গল্প-উপন্যাস-নাটক বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যে লিখিত তাবৎ রচনাকে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্ত হিসেবে গ্রহণ করায় এরূপ আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নেই। বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গদেশে এক অভিনব জাগরণ দেখা যায়। এই জাগরণকে রেণেসাঁ বলা কতদূর যুক্তি-যুক্ত তা বিতর্কের বিষয় হলেও ঐ সময় বাঙ্গালী যে তার যুগসঞ্চিত ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রাকে অস্বীকার করে নবজীবনের পথে এগিয়ে যাবার প্রবল প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তা অস্বীকার করা যাবে না। সনাতনপন্থী হিন্দু, নব্য হিন্দু, খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় প্রভৃতির বিরোধ; শিক্ষা-ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজী পন্থীদের বিরোধ; সমাজ সংস্কারে প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের বিরোধ; সদ্যলব্ধ জাতীয়তাবোধের সঙ্গে পরাধীনতার বিরোধ প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। এসব ছাড়াও ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে ও নিত্য নূতনের আবির্ভাব দেখা দিতে থাকে। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ঐ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মনীষার এক আশ্চর্য উজ্জীবন দেখা যায়। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে বাঙ্গালী-মনীষার যেন এক অন্তহীন শোভাযাত্রা চলতে থাকল। আর তাঁদের বিচিত্র চিন্তাধারা, তাঁদের প্রতিভার রশ্মি-বিচ্ছুরণে বাঙ্গালীর চিদাকাশ এক অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের অনায়াসলভ্য হলো।

দেড়শ বছরের এই সুবিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সামনে আমরা শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বাঙ্গালী-মনীষার এই যে সুদীর্ঘ ধারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবহমান তাতে অবগাহন করবার প্রস্তুতি আমাদের কোথায়? রামমোহন—বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ—রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি নামগুলি আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি বটে এবং তাতে গর্বও বোধ করে থাকি কিন্ত এই মনীষীদের প্রতিভাদপ্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার পরিশ্রমটুক কজনে স্বীকার করতে রাজী আছি। এজন্যই আমাদের সমালোচক-গবেষকরা কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি নিয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করলেও এই দুরূহ পথে পাড়ি জমাতে কেউ

সাহস করে অগ্রসর হন নি।

ডক্টর অধীর দে এই দুঃসাধ্য ব্রত অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেছেন। ডক্টর দে তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা।' গদ্যে রচিত যুক্তি-নিষ্ঠা রচনাকে যদি প্রবন্ধ বলি তবে রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা প্রবন্ধের জনক। অধীরবাবু রামমোহন যুগ থেকেই তাঁর গ্রন্থ সুরু করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে রামমোহনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের কথা ও আলোচনা করেছেন। কাজেই তাঁর গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একখানি সামগ্রিক ইতিহাস। প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের বস্তু এবং রামমোহন থেকেই সেই যুগের সুরু। যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ যদিও বাঙালী-মনীষার একটি বিশেষ দিক এবং সেই হিসেবে যদিও চৈতন্য-চরিতামৃত' একখানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থ তবুও বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের জয়যাত্রা রামমোহন থেকেই সুরু হয়েছে।

রামমোহন-প্রভাবিত যুগসীমাকে ডক্টর দে ১৭১৫ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং ঐ যুগের তাবৎ প্রবন্ধকারগণের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। অতঃপর অক্ষয় —ঈশ্বর পর্ব (১৮৪৩-১৮৭১), তারপর বঙ্কিম পর্ব (১৮৭২-৯০), অবশেষে রবীন্দ্র পর্ব (১৮৯১—১৯৪৬) এবং এখানে এসেই গ্রন্থকার সমাপ্তির রেখা টেনেছেন। এই সুদীর্ঘ দেড়শত বছরের মধ্যেই তো বাঙালী-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় নিহিত। রসজ্ঞ সমালোচক ও ঐতিহাসিকের যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে শ্রীযুত দে বাঙালী-প্রতিভার এই পরিচয় উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এ যে কি দুরূহ সাধনা তা বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বহু অজ্ঞাত প্রবন্ধকারকে তিনি আলোর রাজ্যে টেনে তুলেছেন। অনেকেই বাংলা সাহিত্যের বড় বড় ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁদের খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য নিয়ে তর্ক ও তুলতে চাইনে। কিন্তু যেকোন পাঠক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে ঐ সব নামী গ্রন্থে যাঁদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই ডক্টর দে সযত্নে ও সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন।

ডক্টর দে যে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ও গবেষকদের কি মহা উপকার করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধের একটা তালিকা প্রস্তুত করতেও যে কি বেগ পেতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ডক্টর দে দেড়শ বছরের অর্থাৎ এক কথায় তাবৎ বাংলা প্রবন্ধের ধারাবদ্ধ আলোচনা করে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রামাণ্য অভিধানের মর্যাদা লাভের যোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের উপর থীসিস লিখে ডি· ফিল উপাধি লাভ করা আজকের দিনে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যূন ষাট পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ দাঁড় করাতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে এই ডিগ্রীলাভের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে যায়। এই মানদণ্ডে অধীরবাবুর গ্রন্থকে বিচার করলে অন্ধের হস্তিদর্শনের·ফললাভ ঘটবে।

সুকঠোর শ্রম, নিরলস সাধনা এবং সহজাত বিদ্যাবত্তা এই ত্রিগুণের সমাবেশকেই যদি পাণ্ডিত্য বলা হয় তবে 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা'-র লেখককে কোন আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে তা যে কোন পাঠককেই উক্ত গ্রন্থখানি একবার পাঠ করে নির্ণয় করতে অনু-রোধ করি। পল্লবগ্রাহিতা ও জোড়াতালি দেওয়ার দক্ষতাই যেখানে পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই আসরে ডাঃ দের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হবে তা পাঠকবর্গই বিচার করে দেখবেন।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সমস্ত শরীর হাল্কা আর ঝরঝরে
করে তুলতে আমার চাই
হামাম
কি যেন একটা
আছে এর মধ্যে !

*

ভেষজ-তেলের এক বিশেষ মিশ্রণের দৌলতে হামাম শেষ-পর্যন্ত শক্ত আর সুগন্ধী থাকে। মনে রাখবেন, একটি হামাম সাবান অনেক দিন চলে।

টাটা-উৎপাদন

হামাম আমার বাড়ীর সবাইকে খুশী করেছে। এতে আমারও সুবিধা—বিশেষ-ভাবে তৈরি হামাম অনেক খরচ বাঁচায়।

প্রচুর ফেনার জন্যে স্নানে বিরাট আনন্দ। আর তাইতো আমি হামাম এত ভালবাসি।

হাল্কা মিষ্টি গন্ধে হামাম আমার মন মাতায়।

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 August '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্র - পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েষ্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
**রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা**

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

বিনা ব্যয়ে অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতা পাওয়া যায় কি ? ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে চেপে অবাধ ভ্রমণের আনন্দ ডানপিটে ছেলেদের বরাবর-ই আকর্ষণ করেছে—বিরক্ত কোচোয়ানের ছিপটির ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হবার আশঙ্কা-ও এই নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা থেকে তাদের বিরত করতে পারেনি।

কিন্তু রেল তো আর ঘোড়ার গাড়ী নয়, আর রেলপথের দ্রুততর পরিবহন ব্যবস্থার প্রতিদানে বিনা-টিকিটে অবাধ ভ্রমণের বালসুলভ স্বাধীনতা নেবার অধিকার-ও কারো নেই। তাই সসম্মানে ভ্রমণ করুন—সর্বদা টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ুন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
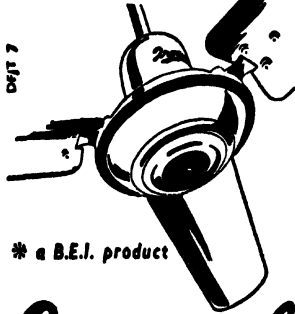
পথনির্দ্দেশ
ও পরামর্শের জন্য
পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ইংরেজী ও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত, প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত, সচিত্র পুস্তিকা, পুস্তক ইত্যাদি পাওয়া যায়। আপনার চিকিৎসালয় থেকে এইসব পুস্তকাদি বিনামূল্যে পেতে পারেন।
সরকার অনুমোদিত নিকটবর্ত্তী
পরিবার পরিকল্পনা চিকিৎসালয়
থেকে পরামর্শ নিন
DA 61/767

দশম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বছরের সেবা

১০ বছর আগে হস্তচালিত তাঁত শিল্প একটা ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছিল। তাঁতজাত বহু জিনিষ বিপুল পরিমণে জমা হ'য়ে গিয়েছিলো, বিক্রী কমে যাচ্ছিলো, উৎপাদন কম ক'রে দেওয়া হয়েছিলো এবং হাজার হাজার তাঁতির, কর্ম্মহীন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। তখন একটা সাহায্যের হাতের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৫২ সালে গঠিত অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁতশিল্প বোর্ড, এই শিল্পটিকে একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকগুলি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯৫২ সালে ১১০ কোটি গজ এবং ১৯৫৯ সালে ১৯০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয়, কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাঁতজাত বস্ত্রসামগ্রীর উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে ২৮০ কোটি গজ। ভারতের পরম প্রিয় এই কুটীর শিল্পটি উৎপাদনের ঐ লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁতশিল্প বোর্ড

ভারতের সর্ব্ববৃহৎ কুটীর শিল্পের অন্যতম সহায়ক

নাটক ও সংগীত

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

জীবনের সংগে সংগীতের সম্পর্ক অতি গভীর। সেই জন্যই সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানব-সমাজে সংগীতের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হয়। আজ থেকে অন্তত সার্ধত্রিসহস্র বৎসর পূর্বে আর্যসভ্যতার বৈদিকযুগে সংগীতের প্রচলন হয়। বৈদিক ঋষিদের আর্চিক, গাথিক, সামিক স্বর সম্বলিত সংগীত-প্রথা নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে। ফলে আর্যসংগীত কেবল সহজ-সরল সামগানের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ না থেকে মানব-মনের বিভিন্ন সূক্ষ্মভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। আর্য-সংগীতের তিনটি ধারা—নৃত্য, গীত ও বাদ্য। অংগভংগি ও মুদ্রার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ নৃত্য। ভাষা ও কন্ঠস্বরের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ গীত। আর বাদ্য বলতে বুঝায়—"ততং শুষিরমেবচ অবনন্ধ ঘনঞ্চেতি"—এই চারটি, অর্থাৎ তার যন্ত্র, বাঁশি জাতীয় রন্ধ্রযুক্তযন্ত্র, মৃদংগ তবলা জাতীয় চর্মাবনন্ধ যন্ত্র, ও নুপুর, কাঁসর, ঘন্টা, করতাল প্রভৃতি। নৃত্য, গীত, তার ও বাঁশি যেমন স্বতন্ত্রভাবে মনোভাব প্রকাশে সক্ষম তেমনি 'অবনন্ধ' ও 'ঘন'-র সাহায্যে স্থান-কাল অনুযায়ী স্বতন্ত্ররূপে ভাবপ্রকাশ সম্ভব হলেও সাধারণত এ দুটি সংগত ও তাল-রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। নাটকের সংগীতে উল্লিখিত নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিধারার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

নাট্য-ইতিহাসের গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই নাট্যোদ্ভবের মূলে রয়েছে নৃত্য-গীত। দেব-পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত দক্ষলোক সাধারণের কাছে দেবমহিমা প্রকাশ করবার জন্য নাচ-গানের মাঝখান দিয়ে ধারাবাহিক দেব-কাহিনী-চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এর পরে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্রমে পালাগানের প্রচলন হয়।

এই পালাগান অতিক্রম করে নাটকের সৃষ্টি। এমনি করে একসময় গ্রীকদেশে নাটকের সূচনা হয়। তারপর বহু পরিবর্তনের ভিতরদিয়ে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্বৈরশাসক পাইসিস্ট্রেটাস্-এর রাজত্বে ডায়নিসাস্ দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাট্য ও মঞ্চ গড়ে ওঠে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিস-এর রাজত্বে এথেন্স নগরী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময়ই গ্রীক নাট্য সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ। সেই স্বর্ণযুগেই ট্র্যাজেডি রচয়িতা ইউরিপিডিস্, ইস্কাইলাস্ ও সোফোক্লিস্ এবং কমেডি রচয়িতা এরিষ্টোফিনিস গ্রীকদেশকে তাঁদের অমূল্য নাট্যোপহার প্রদান করেন। এই সকল মহান নাট্যকারদের নাটকে রয়েছে সংগীতের বিশেষ সংস্থাপনা। পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনার ইংগিত, চরিত্রের মনোভাব এবং ভবিষৎ ভাল-মন্দ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য কোরাস্ এই সব সংগীত প্রয়োগ করত। গ্রীক নাট্যসাহিত্যে কোরাস্ একশ্রেণীর চরিত্র যারা কখনো সংলাপে, কখনো আবৃত্তিতে এবং কখনো গানে তাদের বক্তব্য পেশ করে।

পরবর্তীকালে এলিজাবেথান্ যুগে সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট, হ্যামলেট, ওথেলো প্রভৃতি নাটকে গীতের ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি একথা বলা চলে, তাঁর নাটকে সংগীত কদাচিৎ কণ্ঠাশ্রয়ী। কিন্তু high-pitch acting-এর জন্য ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে রচিত ছন্দোময় সংলাপে ও নাট্যপ্রয়োগে যন্ত্রীদের সহযোগিতায় সুরের অভাব দূরীভূত হয়।

রোমদেশের গোল্ডানী প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে একসময় সংগীতের প্রাচুর্য দেখা যায়। সংগীত-বহুল এই অপেরা-নাট্য ক্রমে ফরাসীদেশে এবং সেক্সপিয়ারের পরবর্তী যুগে ইংলণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাশ্চাত্যে ইবসেন্, বানার্ডশ, মলিয়ের, মেটারলিঙ্ক্, পিরান্-দেলো, ইউজিন্ ওনিল, রুশদেশে শেখভ্ প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে কণ্ঠসংগীতের বিশেষ ব্যবহার না থাকলেও প্রয়োগ-রীতির নানা প্রকার সংগীতের সাহায্যে অভাবপূরণ করে তাঁদের নাটককে হৃদয়-গ্রাহী করে তোলা হয়। জাপানী 'নোও'— নাটক এবং 'কাবুকী' নাটকে ও সংগীতের বিশেষ স্থান আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত 'কাবুকী' নাটকে নৃত্য-গীতের মধ্যদিয়ে দর্শকদের এক স্বপ্নলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হত। কাহিনী-হীন নৃত্য-গীত ও নির্বাক অভিনয়-যুক্ত নেম্বুৎসিওদোরি' ক্রমে তাচিমাওয়ারী 'অর্থাৎ কাহিনীযুক্ত হয়ে কাবুকীতে পরিণত হয়।

আর্যভারতে নিঃসংশয়ে খৃষ্টপূর্বযুগে রচিত কোনো নাটক না পাওয়া গেলেও সে যুগে যে নাটক ছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খৃষ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগে ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই নাট্য বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের 'যম-যমী', 'পুরুরবা উর্বশী' প্রভৃতি বহু সংবাদসূক্তে এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের 'সোমযাগ' অনুষ্ঠানে সোমরস ক্রয়বিক্রয়ের অভিনয় ও 'মহাব্রত' অনুষ্ঠানে বৈশ্য-শূদ্রের বিবাদ অভিনয়ে এই নাট্য-বীজ নিহিত রয়েছে।

কথোপকথন-রীতি অবলম্বন করে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের রচনা নাটকীয় ইংগিত বহন করে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থশতাব্দীতে পাণিনির—"ভিক্ষুঃ নটসূত্রয়োঃ"—থেকে তো স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এদেশেও খৃষ্টপূর্বযুগে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্যদেশের মত ভারতবর্ষের নাট্যোৎপত্তির সূচনাকাল থেকেই তাতে সংগীতের সংশ্রব ছিল। ক্রমে নাট্যসাহিত্য বিকাশের সংগে তৎকালীন মঞ্চ-প্রয়োগে ও কন্ঠ ও নেপথ্য সংগীত সংস্থাপিত হত। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেরচিত প্রয়োগ-বিজ্ঞানী আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' নাটকে সংগীতপ্রয়োগের পঞ্চবিধ রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাবেশিকী, প্রস্তুতস্তুতিযোগ, ক্রামিকী, আক্ষেপিনী, ও প্রাসাদিকী এই পঞ্চবিধ পদ্ধতিতে নাটকীয় সংগীত প্রযুক্ত হত। এই সকল সংগীত-রীতিতে নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকের সংগে সংগীতের

সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। নাট্যকার ভাস 'প্রতিমানাটক'-এ নেপথ্য-সংগীত ও নটীকৃত কন্ঠসংগীত ব্যবহার করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের ঋতুবিষয়ক গান ও হংসপদিকার গান,—'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নেপথ্য সংগীত, নৃত্য, ও মালবিকার চতুষ্পদ-গীতি,—'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বৈতালিক-গীতি ও জম্ভালিকা-গীতির ব্যবহারে বুঝা যায় মহাকবি কালিদাসও নাটকে সংগীত উপস্থাপনার সুযোগ গ্রহণ করেন। বিশাখদত্ত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে কেবলমাত্র নেপথ্য-সংগীতই সংযোজিত করেছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নাট্যকার শ্রীহর্ষদেবের 'রত্নাবলী' নাটকে বসন্তোৎসবে নেপথ্য—সংগীতের ব্যবহার এবং মদনিকার জন্য মঞ্চে দ্বিপদী-গীতির অবতারণা উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রাজশেখর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁর 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকেও সংগীতের সদ্ব্যবহার করেন। 'নান্দী'—সংস্কৃত নাটকের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ—"তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।" এই 'নান্দী'র সংগে ও সংগীতের কিছু সম্পর্ক আছে বলা যেতে পারে,—সে সংগীতাভাস এর ছন্দে, ধ্বনি-সামঞ্জস্যে মধ্যমতাল সহযোগে পাঠকরার রীতিতে প্রকাশিত—"সূত্রধা পঠেন্নান্দীং মধ্যমং তালমাশ্রিতঃ" (নাট্যশাস্ত্র) সংস্কৃত-নাটকে বিভিন্ন প্রকারের সংগীত ব্যবহৃত হলেও একথা বলা চলে যে ইংরিজি-নাটকের মত এতেও কন্ঠ-সংগীতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

যাত্রা-নাট্য সংগীত বহুল। নাচ-গান ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে যাত্রায় লোকসমাজে দেব-মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। এতে আনন্দের সংগে ভক্তিরসের সমাবেশ থাকে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় মানব-চরিত্র বিকাশের সুযোগ যাত্রায় নেই। মানুষ দৈবের অধীন। দেবতাই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেন। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় দেখিয়ে দর্শকদের মনে ধর্মভাব জাগানো যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর যাত্রা-নাট্যদ্বারাই একসময় এদেশে শ্রোতৃমন্ডলীর মনোরঞ্জন করা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পাশ্চাত্য প্রভাবে কলিকাতা নগরীতে দৃশ্য-পট সহযোগে পাকাপাকিভাবে সাধারণ রংগালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই প্রভাবে যাত্রার কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও তাতে সংগীতের স্থান পূর্বের মতই বজায় রইল। জুড়ির গান যাত্রার একটি প্রধান অংগ। আসরের চারকোনায় দাঁড়িয়ে চারজন দক্ষশিল্পী তাল ও সুরবৈচিত্র্যের মধ্যদিয়ে এক একটি গীত ভাগে ভাগে পরিবেশন করতেন। নাটক তখন পিছনে পড়ে থাকত। গীতই সাময়িকভাবে বেশ কিছুসময়ের জন্য প্রাধান্য পেত। তালের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য গানের কোনো কোনো অংশের দুন-চৌদুন-বাঁট দেখান হত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বংগ-ভংগ আন্দোলনের সময় থেকে স্বদেশীভাব জনমনে বিশেষ ভাবে জাগরিত হয়। এই সময়ে ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে রচিত স্বদেশী ভাবাত্মক নাটক মঞ্চে প্রাধান্য পেতে থাকে। এর ফলে যাত্রাও কিছুটা স্বদেশী ভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। জুড়ির গান উঠে যায়, আসে বিবেকের গান। যাত্রার পালা এবারে নতুন পথে চলতে সুরু করে। এই প্রসংগে বাংলার চারণকবি মুকুন্দ দাসের সংগীত বহুল স্বদেশীযাত্রা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে যাত্রার প্রাচীন রূপ পরিবর্তিত। মঞ্চপ্রভাবে এবং যুগরুচির জন্য যাত্রার রূপ বদল হলেও সংগীতের সংগে তার সম্পর্ক এখনো নিবিড়। যাত্রায় কন্ঠসংগীত ও নৃত্যের সংগে ঐকতানবাদন এবং ভাব ও আবেগ সংগীত ও কখনো কখনো সংস্থাপিত হয়।

যে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এতকাল ধরে যাত্রানাট্যে রস পিপাসা চরিতার্থ করেছে সেই সব নাট্যরসিকদের জন্যই তো প্রধানত সাধারণ রংগালয়ের প্রতিষ্ঠা। কাজেই দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করবার জন্য মঞ্চ-নাট্যেও কন্ঠসংগীতের যথেষ্ট সংযোজনা হল। কন্ঠসংগীত ও কদাচিৎ নৃত্যের ব্যবহার থাকলেও নাট্যপ্রয়োগের দিক থেকে অন্যান্যরীতির সংগীত ব্যবহার প্রথম পর্যায়ের বাংলা নাটকে তেমন স্থান পায় নি। অংকের শেষে ঐকতান বাদন এবং করুণ-রস পরিবেশনে বেহালায়

নেপথ্য সংগীত সংযোজিত হত। ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ভারতবিখ্যাত সংগীত শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ একসময় নিয়মিতভাবে ঐকতান বাদনে অংশগ্রহণ করতেন।

প্রথম পর্যায়ের মঞ্চনাট্যে সংগীত উপস্থাপনায় দর্শকদের শ্রুতি-রঞ্জনের দিকে যেমন সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সাহিত্যের দিক থেকে নাটকের স্থান-কাল-পাত্র, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের প্রতি সর্বত্র তেমন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। যাত্রায় অভ্যস্ত দর্শকদের সংগীত-তৃষ্ণাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমংগল' নাটকের কয়েকটি গান, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ভিক্ষুকের গান, সাধারণ রংগালয়ের বাইরে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয়ের গান, 'অচলায়তন'—নাটকে পঞ্চকের কোন কোন গান, এবং অন্যান্য নাট্যকারের নাটকেও কোনো কোনো গান সুপ্রযুক্ত হলেও তখনকার নাটকে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই।

মঞ্চে কণ্ঠসংগীত পরিবেশনের সময় উচ্চারণের স্পষ্টতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। শুধু সুর নয়, কথাও শ্রোতার কানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ঐ কথার সংগে নাটকের মূলভাব, চরিত্রের মানস-লোক, অথবা বিশেষকোনো ঘটনা-পরিস্থিতির সম্পর্ক থাকে। সেই জন্যই সংলাপ যেমন শোনা দরকার নাটক বুঝতে হলে সংগীতের কথাও তেমনি শোনা প্রয়োজন। সংগীত ও এক শ্রেণীর সংলাপ,—সুরেলা সংলাপ। উচ্চারণের স্পষ্টতা বজায় রেখে কালোয়াতি রীতির আলাপ, তান-বিস্তার কিছুটা ছাট-কাট করে অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ মধুরভাবে গানে সুর-সংযোগ করে একপ্রকার মঞ্চসংগীতের প্রচলন হয় প্রথম পর্যায়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের যুগে। টপ্পা-ভাংগা ছোট ছোট তানযুক্ত আধা-ক্লাসিক্যাল রীতির এই সংগীত 'থিয়েটারীগান' নামে প্রচলিত। এই 'থিয়েটারীগানে'র মঞ্চ-সংস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন সাধন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ভারতীয় রাগ সংগীতে বিলিতি ঢং আরোপ করে তিনি মঞ্চে যে কোরাস গানের প্রচলন করেন তাই-ই এর পরিচয় বহন করে। মঞ্চের বাইরে রবীন্দ্রনাটকে আবার আর একশ্রেণীর সংগীত সংযোজিত হয়। এর কথা ও সুরে এত সামঞ্জস্য যে শ্রোতার মন জয় করতে এর মুহূর্ত সময় লাগে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সংগীতে কখনো বিলিতি সুরের প্রভাব, কখনো দেশী রীতির বাউল, কীর্তন, মনোহরশাহী প্রভৃতি ঢং-এর প্রভাব, কখনো বা রাগ সংগীতের সুর-মিশ্রণ। তালের দিক থেকেও উত্তর ভারতীয় রীতি, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রীতির সংগে নতুন সৃষ্টরীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের শেষে নাট্য-সংগীতের দ্বিতীয় পর্যায়ে এল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ। এ যুগে অভিনয় রীতির পরিবর্তনের সংগে মঞ্চে সংগীত রীতিরও বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়—যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকের শিশিরকুমারকৃত মঞ্চ-প্রয়োগ থেকে। অংকের শেষে ঐকতান বাদন বন্ধ হল। প্রচলিত হল—দৃশ্য পরিস্থিতির সংগে সংগতি রেখে আবহসংগীত, এবং চরিত্রের মনোভাব ব্যঞ্জক আবেগ-সংগীত। কন্ঠসংগীতে প্রচলিত থিয়েটারী ঢং-এর পরিবর্তে একদিকে যেমন নতুন সুর আরোপিত হয়, অন্যদিকে তেমন রবীন্দ্র-সংগীতের সুরানুকরণ আরম্ভ হয়ে যায়। ষ্টার-থিয়েটারে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'মলিনাবিকাশ' নাটকে এবং ক্লাসিক—থিয়েটারে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'আলিবাবা' নাটকে সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য সংযোজিত হয়। কিন্তু নৃত্য ভংগিতে নূতনত্ব আরোপিত হয় 'সীতা' নাটকে। ঘটনা ও কালের সংগে সংগতি রাখার জন্য প্রাচীন মন্দির ও চিত্রশিল্প থেকে নানা প্রকার মুদ্রা ও অংগভংগির অনুকরণ করে নৃত্য পরিকল্পনা করা হয় এই নাটকখানির প্রয়োগ ব্যবস্থায়। এই সময় থেকেই মঞ্চ-নাট্যে আবহ ও আবেগ সংগীতের সংযোজনা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। গানের বেলায় ও প্রথম পর্যায়ের থিয়েটারী

সুর ছাড়া নানা প্রকারের সুর বিভিন্ন নাটকে আরোপিত হতে থাকে। এই যুগেই সাধারণ-মঞ্চের বাইরে দ্বন্দ্ব-নাট্য ও নাট্যকাব্যের স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাট্য রূপক-সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে নৃত্য-নাট্যে পরিণতি লাভ করে। এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান অবলম্বন সংগীত অর্থাৎ নৃত্য, গীত এবং বাদ্য। কিছু সংলাপ, যন্ত্রসংগীত, কন্ঠসংগীত এবং নৃত্য-সমাবেশে পরিবেশিত এই নাট্য-রীতিকে নৃত্য-নাট্য না বলে এক শ্রেণীর অপেরা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এদেশে খাঁটি নৃত্য-নাট্যের প্রবর্তন করেন নৃত্যাচার্য উদয়শংকর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিষয় বস্তুর এবং কিছুটা আংগিকের দিক থেকে নাটকে যেমন নূতনত্ব এল সংগীত সংযোজনায় ও তেমনি পরিবর্তন সূচিত হল। নাট্যসংগীত সংস্থাপনের এটি তৃতীয় পর্যায়। আংশিক ভাবে সংগীত-তৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য এবং অভিনয়ের সুবিধার জন্য প্রথম পর্যায়ের নাটকে যে গৈরিশছন্দের প্রবর্তন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনকোন নাটকে তা বজায় থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তৃতীয় পর্যায়ের নাটকে বাস্তবতার বিচারে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নাটকে নৃত্যের ব্যবহারও এই সময় থেকে প্রায় বন্ধ হয়ে এল। গানের প্রয়োগ যা থাকল তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নাটকে কদাচিৎ যে দু একটি গান থাকে প্রয়োজনানুসারে হয় তাতে লোক-সংগীতের সুর আরোপিত হয়, নতুবা চলচ্চিত্রের প্রভাবে তাতে আধুনিক সুর সংযোজিত হয়। নাট্যপ্রয়োগে আবহসংগীত এবং আবেগ-সংগীতের উপরই বিশেষ জোর দেওয়ার চেষ্টা চলে।

নাট্যকার প্রয়োগবিদ এবং অভিনেতা—এই ত্রয়ী ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য সকলদেশের নাটকে সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করে আসছেন। কারণ ভাবপ্রকাশে ভাষার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সংগীতের ক্ষমতা অসীম। সুরহীন কথা মনকে যতখানি প্রভাবিত করে—সুরে গীত সেই একই ভাবাত্মক কথা আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য মনের উপর অধিকমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। মানব-মনে সংগীতের ক্রিয়া খুব বেশি বলেই নাটকের সূচনায় যেমন সংগীত ছিল, তেমনি তার পরিণতির বিভিন্ন স্তরে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও সংগীত বজায় রইল।

জীবনকে দর্শনীয় করে তোলার আবেগে নাটকের সৃষ্টি—"যোয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখ-দুঃখসমন্বিতঃ। সোঽগাদ্যাভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে।।" (নাট্যশাস্ত্র) এই লোকবৃত্তানুকরণ সাহিত্যের যে শাখার উদ্দেশ্য তাকে শুধু পঠন-পাঠনের দ্বারা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভবনয়। চরিত্র ও জীবনকে বুঝবার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজনীয় ঔপন্যাসিকের মত নাট্যকার তার সবকিছুই নাটকে উপস্থাপিত করেন না। অত্যন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপাদানের সহযোগিতায় সংলাপের মাধ্যমে নাটকে জীবনকে রূপায়িত করা হয়। তাই সংহত ও সংক্ষিপ্ত এই শ্রেণীর সাহিত্য হৃদয়দিয়ে পূর্ণভাবে অনুভব করতে হলে একজন নাট্যরসিকের পক্ষেও প্রয়োগবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী—"প্রয়োগ বিজ্ঞানংহি নাট্যশাস্ত্রম্"। প্রয়োগ বিজ্ঞানের যে কয়টি অংশ আছে সংগীত তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সংগীতকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে,—নৃত্য গীত, সংগীত ও সহযোগী সংগীত আবহ-সংগীত, এবং ভাবাবেগ-মূলক সংগীত। সংগত ও সহযোগী সংগীত, আবহ ও আবেগ সংগীত নেপথ্য সংগীতের অন্তর্গত। নৃত্য এবং গীতকে প্রেক্ষণ-সংগীত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; কারণ এই দুটি শ্রেণীর সংগীত সাধারণত মঞ্চে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। 'সাধারণত'—কথাটি বলা হল এই জন্য যে কন্ঠসংগীত প্রয়োজন অনুযায়ী নেপথ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধু পাঠের দ্বারা রস-গ্রহণ করা যেতে পারে বলে নাট্যকাব্যে সংগীতের প্রয়োজন হয় না। কারণ এতে সংগীত প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকে না। নৃত্য-নাট্য ও গীতি-নাট্যে সংগীত সংস্থাপনায় যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়

অন্যান্য শ্রেণীর নাটকে সংগীত ব্যবহারের সে স্বাধীনতা অস্বাভাবিক। সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় রেখে নাটকে সংগীত সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। দর্শকদের মনোরঞ্জন করা এবং 'ড্রামাটিক রিলিফ' সৃষ্টির অজুহাতে অনেক সময় নাটকে সংগীত প্রযুক্ত হয়। কিন্তু উপযুক্ততা বিচার না করে 'রিলিফ' সৃষ্টির চেষ্টা কখনো 'ড্রামাটিক' হতে পারেনা। প্রকৃত নাট্যরসিকদের কাছে নাটকের যথাযথ প্রয়োগই রসোপলব্ধির প্রগাঢ়তা সৃষ্টি করে সত্যকার 'রিলিফ' দিতে পারে। নতুবা 'রিলিফ' সৃষ্টি করতে গিয়ে নাটকটি গতিহারা হয়ে রসোপলব্ধির পরিপন্থী হয়ে ওঠে। নাটকে চরিত্র ও জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা হয় বলেই এর সংগে সত্য ও যুক্তির সম্পর্ক অপরিহার্য। জীবনে তো যেখানে সেখানে সংগীত নেই; সংগীতেরও একটা স্থান-কাল আছে। নাট্য সংগীতে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সংলাপে যে কথা বলা হয় গানে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংগীত ও একশ্রেণীর সুরেলা সংলাপ। কাজেই তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য হয় গান ব্যবহৃত হবে নতুবা যথোপযুক্ত আবেগময় সংলাপ সংস্থাপিত হবে। ভাবাবেগ সৃষ্টির জন্য একসময় নাটকে ছন্দোময় সংলাপের প্রচলন হয়। ছন্দোবদ্ধ সংলাপ তো অংশত সংগীত। তাই অভিনেতা ও দর্শকের মনোগত ব্যবধান দ্রুত ঘুচিয়ে দেওয়া এর পক্ষে অত্যন্ত সহজ—

> "মানবের জীর্ণবাক্যে মোরছন্দ দিবে নব সুর,
> অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে যাবে তারে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
> উদ্দাম—সুন্দর গতি—"

কিন্তু এই শ্রেণীর সংলাপ বাস্তবের প্রতিকূল। তাই পরবর্তীকালে এ পন্থা পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের নাটক অধিকমাত্রায় বাস্তবানুসারী। তাই নাটকে সংগীত ব্যবহার ও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নাটকে-সংগীত ব্যবহার করা-না-করা বড় কথা নয়; প্রধান কথা হচ্ছে—প্রয়োজন অনুসারে যত সুকৌশলে নাটকে এর সংস্থাপনা করা যায় ততই নাটকের রসপরিবেশন সার্থক হয়ে ওঠে।

দ্বারকানাথ : ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথের ধর্মসভার উপর বিরূপভাব পোষণ করা আশ্চর্য্য নয়; বরং ধর্মসভার আক্রমণসত্ত্বেও তিনি যে এর চেয়ে রূঢ় কথা বলেন নাই তাই আশ্চর্য।১ বস্তুতঃ তাঁর প্রগতিশীল আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এই ধর্মসভা। শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার শিক্ষিতসমাজে দুটো দল হয়ে গেল এবং ব্যক্তিগতব্যাপার তুলে ব্যঙ্গ কবিতা লিখে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে, সমাজের পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে একটা বিশ্রী দলাদলি সুরু হল। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন "১৭৫১ শকে ব্রাহ্ম সমাজ এখানে উঠিয়া আসিল, সেই শকে সতীদগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্যগীত হয়; কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়।" দেবেন্দ্রনাথ একবার রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রামমোহন তখন আহারে বসিয়াছিলেন। শুনা যায় যে তঁহার আহারস্থলে একমাত্র দ্বারকানাথ ও তৎপুত্রের প্রবেশাধিকার ছিল। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বলেন "বিরেদার এই দেখিতেছ আমি খাইতেছি রুটী ও মধু: কিন্তু এতক্ষণে হয়ত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে যে আমি গোমাংস খাইতেছি।"

১৮২১ খৃষ্টাব্দে অন্যতর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী উইলিয়াম অ্যাডাম সাহেব রামমোহনের সহিত যুক্তিতর্কে পরাজয় স্বীকার করে একেশ্বরবাদী হন। সেই অবধি বন্ধুগণসহ রামমোহন প্রতি রবিবার অ্যাডাম সাহেবের বাড়ীতে উপাসনার জন্য মিলিত হতেন। এই সভার নাম ছিল ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান কমিটি। ২৬ জুন ১৮২৭ তারিখে লেখা অ্যাডাম সাহেবের চিঠিতে সভ্যদের একটা তালিকা আছে -- যথা, সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার থিওডোর ডিকেন্স, ম্যাকিন্টস, কোম্পানীর জি জে গর্ডন, এটর্ণী উইলিয়াম টেট, কোম্পানীর ডাক্তার ডব্লিউ বি ম্যাকলিয়ড, কোম্পানীর চাকুরে নর্মান কের, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধা প্রসাদ রায় ও অ্যাডাম সাহেব নিজে।

একদিন সভার পর রামমোহন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে বাড়ী ফির-ছিলেন। পথিমধ্যে বিদেশীয়র উপাসনাস্থলের বদলে নিজেদের একটী উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। দ্বারকানাথ ও টাকীর রায় কালীনাথ মুন্সির সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বাড়ীতে রামমোহন এক সভা ডাকেন। ঐ সভায় দ্বারকানাথ, রায় কালীনাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও হাবড়ার মথুরানাথ মল্লিক যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন। সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাড়ীর দক্ষিণে একটী জমির দাম স্থির করবার ভার দেওয়া হয় চন্দ্রশেখর দেবের উপর। পরে, ঐ স্থান উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অনুকূল বোধ না হওয়ায় জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডের উপর কমলালোচন (ফিরিঙ্গী কমল) বসুর একটী বাড়ী ভাড়া করে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনা সভা আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যে অর্থ সংগৃহীত হলে চিৎপুর রোডে চারকাঠা আধপোয়া জমি ৪২০০৲ টাকায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন কিনে তার উপর বর্তমান আদি ব্রাহ্ম সমাজ (৫৫নং আপার চিৎপুর রোড) ভবন নির্মিত হয়।

জমির অধিকারী ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে পাঁচজনের নামে কোবালা লিখে দেন তাঁরা হলেন—

দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়।

দ্বিতল বাড়ি তৈরী হলে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী ঐ পাঁচজন ট্রাষ্টডীড দ্বারা রমানাথ ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় ও টাকীর বৈকুণ্ঠনাথ রায়কে সম্পত্তির ট্রাষ্টী করিয়া দেন।

শুনা যায় রামমোহন রায় ইংরাজী ধরনে ইংরাজীতে উপাসনার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। বোধহয় যাতে তাঁদের সঙ্গে পূর্বের মত অ্যাডাম সাহেব যোগ দিতে পারেন ও অন্যান্য বিদেশীরাও আসিতে পারে সেই জন্যই এই ইচ্ছা। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও ইংরাজী সভা, বক্তৃতা প্রভৃতির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথাদির পরামর্শে শেষে স্থির হয় যে বেদপাঠ, সম্বৎসরে ব্রাহ্মণ বিদায় প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত প্রথা অবলম্বনে ও দেশীয় ভাষার সাহায্যেই একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা হবে। তার ফলেই গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে 'ভায়োলেণ্ট রিএ্যাক্‌শ্যান্‌' দেখা দিয়েছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের অনুচর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার সম্পাদক হয়ে ঘরে ঘরে রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করে বেড়াতেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে নিষেধ করতেন। যাঁরা তাঁর নিষেধ না মেনে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন তাঁরা তখনই জাতিভ্রষ্ট হতেন। তথাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর ও সিংহ পরিবার হাওড়ার মল্লিক বাবুরা, টাকীর কালীনাথ মুন্সী ও তেলেনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়রা রামমোহন রায়ের পক্ষে যোগ দেন।

যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা ব্রাহ্মসমাজদলের কাহারও অনুষ্ঠিত কাজকর্মে দান বা দুর্গাপূজার বার্ষিক লইতেন, তারা ধর্মসভাভুক্ত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় পাইতেন না। তাঁরা ধর্মসভার দলের দ্বারা সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজের দলপতিগণ সপক্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পোষণের জন্য সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে (১১ই মাঘ) যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সমাজস্থ হতেন তঁদের ধন দান দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করতেন।

ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজের এই দলাদলি ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল। ঐ বৎসর দ্বারকানাথের "হাউস" এর সরকার, রাজেন্দ্রলাল সরকারের ছোটভাই ও ভ্রাতৃবধূকে ডফ্‌ সাহেব খৃষ্টান করায় হিন্দু সমাজের এই দুই দল একযোগে পাদ্রিদের খৃষ্টান করণের প্রতিবিধানের চেষ্টা করলেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন — "শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাঁহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্যলোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতে ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন...।"

কিন্তু কেবল 'ধর্ম্মসভা' ছাড়াও ঐ প্রথমদিকে ব্রাহ্মসমাজকে বহু বাধা ও বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল। "যে সকল ধনীলোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই তাঁহারা সমাজের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।"২ এইরূপে যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন, তখনও কেবল

১ শ্রাবণ সংখ্যা 'সমকালীন' দ্রষ্টব্য।

২. নগেন চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৫৮৯

দ্বারকানাথ ইহাকে পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য মাসিক আশি টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রচলিত ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য বৎসর বৎসর টাকা দিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থ সাহায্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ—এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্য্যন্ত নয় বৎসর (১৮৩৩-১৮৪২) ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত না। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম সমাজের কাজ তুলে নিলেন "তখন ব্রাহ্ম সমাজ কার্যতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অবাধে ব্রাহ্ম সমাজের কার্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারা এবং উহার কার্য্য পরিচালনের জন্য উহাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন করিয়া দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য বোধ হইবে না।" ৩

দ্বারকানাথ রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যে ধর্ম্মে তাঁর জন্ম তাকে কুসংস্কার বলে ত্যাগ করেন নি বা অন্যদের ধর্ম্ম মতে আঘাত দেন নি। তিনি নিজে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও পরিবারে প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলে দেন নি। তাঁর বাড়ির জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী প্রতিমা কলিকাতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। নিজে যখন মূর্তিপূজা ত্যাগ করলেন তখন নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজের জন্য—অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন বেতনভুক্ ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। শুনা যায়, তাঁর এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ছিল আঠারো জন। এই সময়ে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না, পূজাপার্বণে ঠাকুরদালানে উঠতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়িয়ে দেবদেবী দর্শন করে চলে যেতেন।

তাঁর এই পূজাদি ত্যাগ এবং সাহেব-মেমেদের সহিত আনাগোনা, তাদের সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া ইত্যাদি কারণে দ্বারকানাথের জাতিগণ ভ্রষ্টাচারের জন্য তাঁকে একঘরে করতে উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটের হরকুমার, কানাইলাল ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগকরাই স্থির করেন। এ সমস্ত শুনিয়া দ্বারকানাথ তাঁর পৈত্রিক বাড়ির সামনে বৈঠকখানা বাড়ি তৈয়ার করাইয়া সেইখানেই সাহেব সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁদের আর বসতবাড়িতে আনতেন না। এই বৈঠকখানা বাড়িতেই পরে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ জন্মেছেন—এই ছিল বিখ্যাত ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। [সে রকম বাড়ি তখনকারকালে আর একটিও ছিল না। এ বাড়ির কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখায় বলেছেন। বাড়িব নক্সা, বা বাগানের প্ল্যান সব বিলাত থেকে করিয়ে আনা। আমারও ছোটবেলায় সে বাড়ি দেখেছি। বার্ণিশ করা ওক কাঠের তৈরী নাচঘরের জমি, সিঁড়ি যাতে অন্ধকার না হয় সেইজন্য বহু সংখ্যক আতসী কাঁচ লাগিয়ে ছাদের আলো ঘুরিয়ে সিঁড়ির উপর ফেলা। তারপর সেই স্বপ্নপুরীর মত বাড়ি আমাদের চোখের সামনেই ভেঙ্গে ফেলে তৈরী হল বর্ত্তমান রবীন্দ্র ভারতী। দ্বারকানাথের আরেকটি স্মৃতি লোপ পেল সেই সঙ্গে।]

দ্বারকানাথের এই প্রগতিশীলতায় গোঁড়ার দল যেমন বিরক্ত হল, অন্যরা তাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় বলে গালি দিতেও ছাড়ল না। কলকাতা কুরিয়ারে ১৮৩৯ সালের পূজার সময় 'স্পেকটেটর' বা 'দর্শক' এই ছদ্মনামে একটি চিঠি বের হয়। তাতে তিনি লেখেন——

"বৎসরান্তে দুর্গাপূজায় হিন্দুরা মেতে উঠেছে। ভগবৎ বিশ্বাস অবহেলা করে মানুষ-

৩· সতীশ চক্রবর্তী দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট পৃঃ ৩৫৫

গড়া শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে বড়ছোট সকলস্তরের লোকেরা অসার আনন্দে মেতেছে। এই পূজা মনোহর কল্পনার উদ্রেককারী ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থহীন আচারের সমষ্টি। যারা হিন্দুদের মতে স্বর্গ নরকের দরজা খোলার অধিকারী, সেই ব্রাহ্মণেরা এর খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় ব্যস্ত। দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষিতেরা যদিও অনেকাংশে ব্রাহ্মণদের মিথ্যা কথায় আস্থা হারিয়েছেন তবু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা করার মত মানসিক বল নাই। এ'রাও অন্যান্য অন্ধ দেশবাসীর মতই মূর্ত্তিপূজায় সহযোগিতা করে আত্মবঞ্চনা ও কপটতার পরিচয় দেন। এ'রা এমনই প্রথার দাস যে পূর্বপুরুষদের পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হতে ভয় পান। এমন কি এদেশবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বাবু ডি, টির মনে এমন সাহস নাই যে, যে পূজাপ্রথা তিনি বেশ জানেন সত্যকার প্রেমময় ঈশ্বরের দয়া উদ্রেকের অনুপযুক্ত, সেই পূজা রহিত করেন। তাঁর গৃহেও দুর্গা অন্যান্য অজ্ঞান দেশবাসীদের গৃহের মতই সাড়ম্বরে পূজিত হন। যাঁরা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তাঁদের পক্ষে এমন ব্যবহার সভ্যতার বিকাশের বাধা-স্বরূপ কুসংস্কারের মহাসৌধ ভাঙ্গার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তর করে।

হিন্দুদের পূজাসমূহের মধ্যে দুর্গাপূজায় সমারোহ সর্মাধক, কারণ এই পূজা করিলে স্বর্গলাভ হয় এরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। এই সময়ে এই সহরে অন্ততঃ বারো হাজার মূর্ত্তি আনা হয় এবং উত্তেজনা এতটা বৃদ্ধি পায় যে সহরের দেশী অংশ প্রমোদ বিলাসে দিনরাত ডুবে থাকে। দেশীয়দের দুর্গাপূজা করার সাধ এতই যে দুইতিনটি ব্রাহ্মণ বাড়ি বাড়ি এক পয়সা করে ভিক্ষা করেও এই পূজা করে থাকেন।

অবস্থাপন্ন দেশীয়দের মধ্যে এই পর্ব জাঁকজমক ও বৈভব দেখাইবার সুযোগ দেয় এবং তাঁরা এতই টাকা ব্যয় করেন যে তাঁদের অপব্যয় প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এই হৈ হল্লায় শোভা-বাজারের রাজাদের সিংহ পরিবারের ও বাবু মতিলাল শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব পরি-বারে কোথাও কোথাও পূজার পনের দিন আগে থেকে নাচ গান ও বহুব্যয়ে দেশীবিদেশী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এটা সত্যই লক্ষণীয় তফাৎ যে যখন পূজারী মূর্ত্তিকে গঙ্গাজল আর বিল্বপত্র নিবেদন করেন তখন সাহেব অতিথিবর্গের জন্য আসে উইলসন সাহেবের মনোহর বিস্কুট আর হাইফের কোম্পানীর চপ।"

তখনকার পূজোপার্বণে সাহেবদের আনাগোনা সম্বন্ধে মিসেস বোয়াজও (৪) উল্লেখ করে লিখেছেন—আজকাল কলকাতার অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা দুর্গাপূজার পার্বণটাকে বিলাতী থিয়েটারী ঢংএ সাজিয়েছেন—গান, বাজনা, নাচ স্যাম্পেন ও অন্যান্য বিলাতী পানীয় সহ বিরাট ভোজ আর সবশেষে বিলাতী কায়দায় বল নাচ। সাহেব মেমসাহেবেরা দুর্গা প্রতিমার সামনে অনুষ্ঠিত এইসব আসরে প্রায়ই উপস্থিত থাকেন।

গোঁড়া একেশ্বরবাদী এবং পাকা পৌত্তলিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলবার চেষ্টা করায় দ্বারকানাথ উত্তরকালীয়দের কাছেও প্রশংসা পান নাই সমালোচনাই লাভ করিয়াছেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক

৪· ধর্মতলা ইউনিয়ন চ্যাপেলের ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৮ সাল অবধি চ্যাপলেন রেভারেন্ড টমাস্ বোয়াজের স্ত্রী।

হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকট সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন।" কিন্তু দ্বারকানাথ রাজা রামমোহন রায়কে যদি দেবতারও উপরে স্থান দিতেন তবে রাজার অপছন্দ জানিয়াও যাহা নিজে ঠিক বুঝিতেন তাহা কেমন করে করিতেন? মজা এই যে এর উদাহরণটিও দেবেন্দ্রনাথই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "রাজা সমাজে কখনও ধুতিচাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময় পোষাক পরিয়া যাইতেন। রাজার মনোভাব ছিল যে পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তরূপে পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু আমার পিতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্তদিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া আবার পোষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপসনা করিতে আসিলে, অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।"

এ সম্বন্ধে দ্বারকানাথের প্রপৌত্র 'আচার্য' ক্ষিতিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন যে "সেরিমোনিয়াল আনুষ্ঠানিক পূজা ছাড়িলেও পার্সোনাল ব্যক্তিগত পূজা যথা ইষ্ট মন্ত্র জপ ইত্যাদি দ্বারকানাথ কখনও ছাড়েন নাই। সেকালের কোন তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারকানাথ সম্মন্ধে বলেছেন যে তিনি "প্রোফাউন্ডলি রিলিজাস" ছিলেন। শোনা যায় প্রথমবার বিলাতে যাইয়া তিনি থাকিবার বাড়ির একটি ঘরে গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া নিয়মিত দু ঘন্টা ধরিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেন। বোধহয় রামমোহন রায় আসিলে পূজা ছাড়িয়া নয়, পূজান্তে জপের সময় দ্বারকানাথ জপ ছাড়িয়া উঠিতেন কারণ জপ পরেও সম্পূর্ণ করা যায়। যেখানে এই জপ সমাপনের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা থাকিত সেখানে জপ ছেড়েও উঠিতেন না। বিলাতে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অতি নিকট আত্মীয়েরাও দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেন—দ্বারকানাথ জপ শেষ না হইলে উঠিতেন না এরকম হইয়াছে।"

বিলাত থেকে ফিরে দ্বারকানাথ অনেক অনুরুদ্ধ হয়েও কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করেন নি। পরিবার ও সমাজ কর্তৃক বর্জ্জিত হবার ভয়ে এবং অংশতঃ বর্জ্জিত হয়েও তিনি নিজ বিশ্বাস সম্বন্ধে অটল ছিলেন। তবে পরিবারের অন্যদের যাতে এতে অসুবিধা না হয় তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বৈঠকখানা বাড়িতে বাস করিতেন।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার সময় কলিকাতায় গুজব রটে যে দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়া খৃষ্টান হয়েছেন। তখন কলিকাতার খৃষ্টান মহলে কি উত্তেজনা। তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো তিনি রোমান ক্যাথালিক হয়েছেন না প্রটেস্টান্ট। এই নিয়ে কাগজে কি লেখালেখি।

গল্পটা কলিকাতায় প্রথম রটায় ১৪ই জুলাই ১৮৪৫-এর ইংলিশমান। এতে কায়রো থেকে লেখা টাইম্‌সের এক সংবাদদাতার চিঠির শেষাংশ উদ্দৃত করে দেয় যে "শুনা যাচ্ছে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর খৃষ্টান হইবেন।" তারপর নিজেরা টিপ্পনী কাটলেন যে "বম্বের সম্পাদক গল্পটা অবিশ্বাস করলেও আমরা এই ধর্মান্তর অসম্ভব মনে করি না; বিশেষতঃ যখন তিনি পোপের রাজ্যের (হোলিসীর) আওতায় আছেন। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান বাধাগুলি ত তিনি বহুপূর্ব্বেই অতিক্রম করেছেন এবং তাঁকে একঘরে করে তাঁর দেশবাসী এবিষয়ে সাহায্যই করেছেন। শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই এই একটু নূতন উত্তেজনা উপকারী হতে পারে এবং পোপের আশীর্ব্বাদ

এবং আনুসঙ্গিক অনুতপ্ত পাপীর জন্য রোমের আনন্দ বিশেষ দ্রষ্টব্য হইবে এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তি স্বয়ং লণ্ডনে যতটা সম্মান পেয়েছিলেন রোমে তার থেকে বেশীই পাবেন।

এ ছাড়া দ্বারকানাথের ব্যবসায়ের দিকেও লাভের সম্ভবনা। প্রাচ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বৎসরে এখন বহুলক্ষ টাকা পাঠানো হয় এবং দ্বারকানাথ পোপের ব্যাংকার হতে পারেন। তাঁকে খৃষ্টান করতে পারলে খৃষ্টধর্মের বিশেষ লাভ হবে, অবশ্য তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করুন বা না করুন আমাদের ধারণা তাঁর বদান্যতার তারতম্য হবে না। টিপ্পনীতে আরও বলা হয়—পোপের ধারণা যে দ্বারকানাথ রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হইবেন কারণ তাহ'লে তিনি পোপের ব্যাংকার হতে পারবেন। অধিকাংশ সময়েই আমরা ঐ ধরনের ধর্মান্তকরণে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে প্রীতি হয় যে ধর্ম্মগ্রহণকারীর চেয়ে ধর্ম্মান্তরকারীরাই বেশী লাভবান হয়। পোপ হয়ত এরকম বিখ্যাত লোককে ধর্ম-গ্রহণের পর খেতাবে ভূষিত করতে পারেন—সম্প্রতি এদেশ থেকে ঐ ধর্ম্ম জাত এক ব্যক্তিকে যেমন তিনি দিয়েছেন—তবে দিবার মত লাভজনক চাকুরী পোপের হাতে যা ছিল সব আগেই ভর্ত্তি হয়ে গেছে বলে আমাদের সন্দেহ হয়—। আমরা আশা করি যে দ্বারকানাথ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন ত' সংশোধিত খৃষ্টধর্মই গ্রহণ করবেন।

এই দুটি কাগজের টিপ্পনীর উপরেই চটে গিয়ে "জনৈক খৃষ্টান" নাম দিয়ে এক ভদ্রলোক হরকরাতে চিঠি লিখলেন যে—

The *Englishman* in noticing the Report about Dwarknauth Tagore having become a Christian, indulges in what appears to me to be a strain of very unseemly levity on the subject; and you also, in commenting on the same topic, have indulged in a remark which scarcely corresponds with your wonted liberality.

The *Englishman* talks of the joy over the repentant sinner at Rome, and thinks it not unlikely Dwarkanauth Tagore may have an eye to business as the Pope's Banker; and, of course, hints that Dwarkanauth Tagore's conversion may, if it takes place, be computed fairly to sordid, mercenary, worldly motives.

If Dwarkanauth Tagore become a convert to any form of Christianity, why not give him the credit of embracing the Gospel from a conviction of its truth and excellence and unswayed by any sordid motive of worldly gain? His own private princely fortune and well-known liberality should place him above such an unworthy suspicion; and his natural acuteness of intellect and sound judgement joined to his wealth and that influence in society, which talent, and wealth, and benevolence never fail to confer on their possessor, would render his conversion to Christianity one of the most interesting and important events which have occured in the history of India for a long time.

It is by the conversion of a few such characters as this eminent native gentleman, that christianity in India is most likely to be promoted—much more so than by converting a few raw youths who may have prospects as teachers in

mission schools, or hopes of gaining something from the European gentlemen who patronise Missions—the latter being (according to the statement of the Bishop of Calcutta in his last visitation charge) the situation of the greatest proportion of the converts about Krishnagar.

Your hint, that the convertess are likely to profit by the event; if Dwarkanauth join the Romish Church, is unworthy of you. No communion, probably, lavishes money more profusely in works of charity, mercy, and piety, than the Roman Catholic. Their auxiety to obtain money from rich converts or members of their Church should not be made a matter of reproach, when the funds so obtained are devoted to endow institutions for the instruction of the ignorant, and the relief of the indigent or the sick.

P.S.........when the native public see very young people, necessarily of somewhat immature judgement, embracing Christianity after hanging on about Mission Institutions for patronage or employment, or when they see numerous people of more mature years but in their worldly circumstances next door to panpers, who look for support to Mission patrons, we can easily understand why a suspicion should arise, in the native mind at least—and not a unreasonable suspicion—that these conversions are spurious. A widely different impression would be made by the conversion of such a man as Dwarkanauth Tagore, a man of matured judgement and experience, and independence in his worldly circumstanses and whose acts of almost regal munificence, public spirit and charity, shew that he possess a noble nature. If he does become a member of the Church of Rome, the Pope may well be proud of such a conquest, and thank God that so strong a demonstration of the truth has been made to the millions of Bengal.

এর উত্তরে ঐ দিনের কাগজেই হরকরা সম্পাদক লিখলেন যে—রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি কোন বদমৎলবের ইঙ্গিত করা বা অন্যান্য খৃষ্টানদের মত তাঁরাও দয়াধর্ম্মের জন্য অকুণ্ঠব্যয় করেন না এরকম কিছু বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে, আমাদের মতে দ্বারকানাথ খৃষ্টান হলে অন্ততঃ পয়সার দিক থেকে যা পাবেন তার চেয়ে বেশী দেবেন সে বিষয়ে আশা করি পত্রলেখকেরও সন্দেহ নাই। সে দেওয়া যে সদুদ্দেশে হবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। 'জনৈক খৃষ্টান' ও আমরা একমত যে রোমীয় চার্চ এরকম একজনকে দীক্ষিত করতে পারলে শ্লাঘান্বিত হবে, এবং সেইকারণেই আমরা আশা করিছি যে দ্বারকানাথ যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন ত' প্রটেস্টান্টই হবেন।

এত জল্পনাকল্পনা, আলোচনা-তর্কের অবসান করে ২৩শে জুলাই দ্বারকানাথের এক হিন্দু বন্ধু হরকরাতে চিঠি পাঠালেন। তাতে লিখলেন যে—দ্বারকানাথের মনোভাব খুব ভালভাবে না জানলে তিনি এ চিঠি লিখতেন না। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে পক্ষপাত না থাকলেও, তাঁর বন্ধুরা যাতে ভ্রান্ত না হন, সেই জন্য খৃষ্টধর্মের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে কোন খবর বের হলেই দ্বারকানাথ এদেশে থাকলে নিশ্চয়ই এই ভুল খবরের প্রতিবাদ করতেন। গতবার ইউরোপ যাবার

পথে তিনি ইটালী গিয়েছিলেন এবং পোপের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের সম্মানও পেয়েছিলেন। পরে স্কটল্যাণ্ডে সফরকালে তাঁকে খৃষ্টান মনে করে একটি মানপত্রে পাদ্রীরা কিছু মন্তব্য করেন, কিন্তু সত্যকার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতেই (তাঁর কাছে) আপত্তিজনক অংশটুকু বাদ দিয়ে গির্জার পরিবর্তে ডগলাস্ হোটেলে দ্বারকানাথকে মানপত্রটি দেওয়া হয়। এবার বিলাত যাবার পথে দ্বারকানাথ রোমে থামেন নাই বা পোপের দপ্তরের সঙ্গে কোন যোগাযোগও হয় নাই। এই গুজবের আরম্ভ কি ভাবে ত' ভেবে পাই না, তবে এটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে রটনাটি সর্বৈব মিথ্যা। দ্বারকানাথের বন্ধু হিসাবে একটি কথা আপনাদের জানাতে সাহস পাচ্ছি।

এতে সম্পাদক টিপ্পনী কাটলেন যে "আমাদের পত্রলেখকের খবর যে নির্ভুল তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বারকানাথ খৃষ্টান হবেন এটা আমরাও বিশ্বাস করি নাই, বরং গুজবটিকে মিথ্যা বলেই ধরে নিয়েছিলাম, তবে এটুকু আশা আমরা প্রকাশ করেছিলাম, এবং তাতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি নাই যে দ্বারকানাথ যদি খৃষ্টান হন ত' প্রটেস্টান্টই হবেন।"

সার মনিয়ার উইলিয়ামস্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর মনিয়ার উইলিয়মস্ বোম্বাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কর্নেল উইলিয়মস্ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন। মনিয়ার উইলিয়মসের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতা পত্নীসহ ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 'রাইটার' পদের জন্য মনোনয়ন লাভ করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষানবিসদের জন্য স্থাপিত হেলবেরী কলেজে শিক্ষালাভের জন্য প্রবেশ করেন। এই স্থানে অধ্যয়নের সময় সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। মনিয়ারের ভ্রাতা আলফ্রেড্ ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। বেলুচিস্থানে এক যুদ্ধে আলফ্রেড্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মনিয়ার স্থির করিলেন যে শোকসন্তপ্ত জননীকে ইংল্যাণ্ডে একাকিনী রাখিয়া তাঁহার পক্ষে ভারতে গিয়া চাকুরী করা সম্ভব হইবে না। এইজন্য রাইটারশিপ্ শিক্ষানবিসী পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত শিক্ষা ও তদ্বারা জীবিকা অর্জনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তত্রস্থ প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) হোরেস হেমান উইলসনের সহিত মনিয়ার পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উইলসনের চেষ্টায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তি (Boden Sanskrit Scholarship) লাভ করিয়া মনিয়ার এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ অক্সফোর্ডের বি-এ উপাধিলাভ করেন। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার পুরাতন শিক্ষাক্ষেত্র হেলবেরী কলেজে সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। মনিয়ার উইলিয়ামস্ এই পদটি লাভ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কলেজটি বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৪৪ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চোদ্দ বৎসরকাল মনিয়ার উইলিয়মস্ এই কলেজে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনার অবসরকালে মনিয়ার উইলিয়মস অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া এই ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি একটি সহজ বোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (১) এই ব্যাকরণটি যে সবিশেষ আদৃত হইয়াছিল পুনঃ পুনঃ সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রমাণ। হেলবেরী কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্বশী (২) ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক দুইটি অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। মনিয়ার উইলিয়মসের শকুন্তলার অনুবাদ এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে এই পুস্তকটি সার জন লাবক কর্তৃক সংকলিত পৃথিবীর একশতটি শ্রেষ্ঠ পুস্তক তালিকায় স্থান পায় (৩)। উত্তরকালে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ মহাভারতের নলোপাখ্যান অংশটি ও মূল, ইংরাজী অনুবাদ, সংস্কৃত শব্দার্থ সহ প্রকাশ করেন (৪)।

হেলবেরী কলেজে অধ্যাপনাকালেই মনিয়ার উইলিয়মস্ জুলিয়া কেথফুল্ নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হয়।

হেলবেরীতে অধ্যাপনাকালে মনিয়ার উইলিয়মস্ একটি সুবৃহৎ ইংরাজী সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃহদাকার সার্দ্ধ অষ্টশত পৃষ্ঠার এই অভিধানটি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই পুস্তকটি ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (৫)। ইহার পর মনিয়ার উইলিয়মস্ একটি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে হাত দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হেলবেরী কলেজের বিলুপ্তি ঘটার পর মনিয়ার উইলিয়মস্ কিছুকাল চেল্টেন হাম কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হোরেস হেমান উইলসনের মৃত্যু হইলে মনিয়ার উইলিয়মস্ এই পদের জন্য প্রার্থী হন। ইতিমধ্যে তিনি ইউরোপের একজন প্রমুখ সংস্কৃতবিদরূপে খ্যাতিলাভ করেন। এই পদের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুল্লার্। নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটে উচ্চ বেতনযুক্ত এই পরম আকাঙ্খিত পদটি মনিয়ার উইলিয়মসই লাভ করেন। এই পদলাভ করিয়া মনিয়ার উইলিয়মস্ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটি অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মসের মৃত্যুর পরে এই অভিধানের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি এই অভিধানের শেষ পৃষ্ঠার প্রুফশীটটিও সংশোধন করিয়া যান। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বৃহদাকারের ১৩৩৩ পৃষ্ঠাসমন্বিত এই অভিধানটির নূতন সংস্করণ অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৬)।

সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে উপযুক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রয়োজনীয়তা মণিয়ার উইলিয়মস্ সম্যগ্ রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জনাই সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজী সংস্কৃত অভিধান রচনায় তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই দুইটি অতি উপাদেয় অভিধান মনিয়ার উইলিয়মসের জীবনের প্রধান কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এই দুইটি অপরিহার্য অভিধান রচয়িতা রূপে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন ও থাকিবেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য মণিয়ার উইলিয়মস্ একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পর বোডেন অধ্যাপক থাকা কালেও তিনি এই জাতীয় আরও দুইটি পুস্তক রচনা করেন (৭,৮)।

বোডেন অধ্যাপক পদে আসীন থাকাকালে মনিয়ার উইলিয়মস্ অক্সফোর্ডে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে হইলে ভারতবাসির সহযোগিতা লাভ প্রয়োজন ইহা মনে করিয়া তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই, পুনা, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সব স্থানের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতীয় পণ্ডিতদের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নিজের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করেন। ইহার মধ্যেই তিনি ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও গণ্যমান্য ভারতীয়দের নিকট প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিউটের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ইংলাণ্ডে ফিরিয়া যান, আবার এই বৎসরেরই শেষের দিকে ভারতে আসিয়া তিনি বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের অতিথিরূপে পুনরায় ভারতে আসেন। তিনবার ভারতভ্রমণের ফলে তিনি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্

স্থাপনের জন্য ভারত হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ১৮৮৩ তদানীন্তন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই ভবন নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পন্ন হইলে তদানীন্তন ভারত সচিব (সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া) লর্ড হ্যামিলটন বহু বিশিষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয়দের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন করেন। এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় মনিয়ার উইলিয়মস্ অতুলনীয় কর্মদক্ষতা, অধ্যবসায় ও সংগঠন কুশলতার পরিচয় দেন। নিজের সংগৃহীত ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত তিন সহস্র মূল্যবান পুস্তক ও পুঁথি তিনি এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। আজীবন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতের সংস্কৃতিকে মনিয়ার উইলিয়মস কতখানি ভালবাসিতেন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তাহার ইণ্ডিয়ান উইসডম নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৯)। এই পুস্তকে বেদ, ষড়্-দর্শন, সূত্র, বেদাঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা সংকলিত করিয়া প্রাচীন হিন্দুর অধ্যাত্ম জ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল তাহা বিচার করা হয়। রামায়ণ মহাভারতের সহিত হোমরের ইলিয়ড. ওডিসির আলোচনা করিয়া এই পুস্তকে মণিয়ার উইলিয়মস লেখেন যে রামায়ণ মহাভারতে যে গভীর ধর্মবোধের পরিচয় আছে হোমরের কাব্যে তাহা নাই। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে যে উচ্চ নীতিবোধ, চারিত্রিক পবিত্রতা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায় হোমরের চরিত্রগুলিতে তাহা দুর্লভ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে হিন্দু ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রামাণ্য তথ্যাদি সহ পর্যালোচনান্তে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে—বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম সকল ধর্মেরই মূলতত্ত্বকে অঙ্কে স্থান দিয়াছে—যাহাতে যে কোন মানসিক প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দুধর্ম সকলমত সহিষ্ণু, সকলের উপযোগী এবং সকলকেই বক্ষে স্থান দিতে পারে।

উপর্যুপরি দুইবার ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া মণিয়ার উইলিয়মস ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Modern India and Indians নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১১)। ইহার পর ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে তাঁহার 'রিলিজিয়াস্ থট্ এ্যাণ্ড লাইফ ইন্ ইণ্ডিয়া' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১২)। এই পুস্তকে আজীবন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও নিজের ব্যক্তিগত উপস্থিতি দ্বারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া মণিয়ার উইলিয়মস্ বৈদিক ধর্ম ও পরবর্তীকালে প্রচলিত শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তধর্ম প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মণিয়ার উইলিয়মস রচিত Buddhism (বৌদ্ধধর্ম) নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১১) এই পুস্তকে বুদ্ধের জীবনী ও বোধিলাভের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া তিনি লেখেন যে বিশ্ব মৈত্রীভাবনা প্রচারের দ্বারাই গৌতম বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মণিয়ার উইলিয়মস্ বোডেন অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হইতে তিনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তঁাহাকে কে, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি অক্সফোর্ড (D.C.L.), টুবিঙ্গেন (Ph.D.), ও কলিকাতা (LL.D) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর মণিয়ার উইলিয়মস্ গ্রীষ্মকালে আইল অফ ওয়াইটে নিজভবনে

বাস করিতেন, শীতকালটুকু দক্ষিণ ফ্রান্সে কাটাইতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মণিয়ার উইলিয়মস দম্পতি মহা আনন্দে তাঁহাদের বিবাহের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উৎসব পালন করেন। বহু পরিশ্রমে oxford এর Indian Institute স্থাপনের কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের মুদ্রণ ও সমাপ্ত প্রায়, অভিধানের প্রুফের শেষ পাতাটির সংশোধন কাজ-টিও মণিয়ার উইলিয়মস্ নিজেই সমাপ্ত করিলেন। সমগ্র জীবনের পরম ঈপ্সিত এই দুইটি কাজ সম্পন্ন করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল প্রভাতে দক্ষিণ ফ্রান্সের কানে (cannes) নামক স্থানে মণিয়ার উইলিয়মস্ অপ্রত্যাশিত রূপে পরলোক গমন করেন।

(১) An elementary grammar of Sanskrit Language, London, 1846.
(২) Vikramarvasi—1849.
(৩) Abhigyan Sakuntalam—1856, 2nd Edn. in 1876.
(৪) Nalopakhyanam—1879.
(৫) A dictionary—English Sanskrit, London, 1851. Reprinted in India by Moti Lal Banarasi Das, 1956.
(৬) Sanskrit English Dictionary, Oxford 1872. New edition enlarged and improved, Oxford, 1899. Reprinted in 1951, Oxford.
(৭) Sanskrit Manual for Composition, London, 1862.
(৮) A practical grammar of the Sanskrit Language.
(৯) Indian Wisdom, London, 1875.
(১০) Hinduism, New York, 1877.
(১১) Modern India and Indians, London, 1878.
(১২) Religions thought and life in India, London, 1883.
(১৩) Buddhism, London, 1889.

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
নিতাই পাল	গল্পগুচ্ছ	সম্পত্তি-সমর্পণ	ষোড়শ
নিত্যধন	ঐ	ভাই ফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
নিবারণ	ঐ	মধ্যবর্ত্তিনী	অষ্টাদশ
নিবারণ	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও উনবিংশ
নিবারণ চক্রবর্ত্তী	শেষের কবিতা		দশম
নির্ম্মলা	প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
নিমাই	গোড়ায় গলদ		তৃতীয়
নীরজা	মালঞ্চ		দ্বাদশ
নীরদ	গল্পগুচ্ছ	দুইবোন	একাদশ
নীরদ	ঐ	স্ত্রীর পত্র	ত্রয়োবিংশ
নীরবালা	প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
নিরুপমা	গল্পগুচ্ছ	দেনা পাওনা	পঞ্চদশ
নিস্তারিণী (মোতির মা)	যোগাযোগ		নবম
নীলা	তিনসঙ্গী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
নীলকণ্ঠ	গল্পগুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
নীলকান্ত	ঐ	আপদ	উনবিংশ
নীলমণি	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
নীলমণি	গল্পগুচ্ছ	দিদি	উনবিংশ
নীলরতন	ঐ	একরাত্রি	সপ্তদশ
নীলরতন	হাস্য-কৌতুক	অভ্যর্থনা	ষষ্ঠ
নীলরতন	গল্পগুচ্ছ	রাজটিকা	একবিংশ
নৃপবালা	প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর
নেপাল	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
পঞ্চক	অচলায়তন ও গুরু		একাদশ ও ত্রয়োদশ
পঞ্চানন মোড়ল	ডাকঘর		ঐ
পঞ্চু	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
পটল	গল্পগুচ্ছ	মাল্যদান	দ্বাবিংশ
পরমানন্দ স্বামী	ঐ	উদ্ধার	ঐ
পরাণ	হাস্য-কৌতুক	অভ্যর্থনা	ষষ্ঠ
পরেশ	গল্পগুচ্ছ	উদ্ধার	দ্বাবিংশ
পরেশ বাবু	গোরা		ষষ্ঠ
পীতাম্বর	প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ		নবম ও বিংশ
পীতাম্বর রায়	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
পুঁটে	গল্প গুচ্ছ	সদর ও অন্দর	দ্বাবিংশ
পুণ্ডরিক	ঐ	জয়পরাজয়	সপ্তদশ
পুরন্দর	চতুরঙ্গ		সপ্তম
পুরন্দর	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
পুরবালা	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
পুলিন	গল্প গুচ্ছ	অনধিকার প্রবেশ	ঊনবিংশ
পুষ্পমালা	ঐ	মুক্তির উপায়	ষড়বিংশ
পূর্ণ	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
পূর্ণেন্দুশেখর	গল্প গুচ্ছ	রাজটিকা	একাদশ
প্যারী	ঐ	উলুখড়ের বিপদ	দ্বাবিংশ
প্যারীমোহন	ঐ	খাতা	অষ্টাদশ
প্যারীশংকর ঘোষাল	ঐ	ত্যাগ	সপ্তদশ
প্রকৃতি	চণ্ডালিকা		পঞ্চবিংশ
প্রতাপ	গল্প গুচ্ছ	সুভা	সপ্তদশ
প্রতাপ	মুকুট		অষ্টম
প্রতাপাদিত্য	বৌঠাকুরাণীর হাট (গল্প)		প্রথম
	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)		নবম
	পরিত্রাণ		বিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
প্রভা	গল্প গুচ্ছ	সম্পাদক	অষ্টাদশ
প্রমথনাথ	ঐ	রাজটিকা	একবিংশ
প্রমদা	মায়ার খেলা		প্রথম
প্রসন্ন	গল্প গুচ্ছ	ভাইফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
ফকির	গল্প গুচ্ছ	মুক্তির উপায় [নাটক] ঐ [গল্প]	ষড়বিংশ ও ষোড়শ
ফটিক চক্রবর্তী	ঐ		সপ্তদশ
ফণাণ্ডিজ	বৌঠাকুরাণীর হাট ও প্রায়শ্চিত্ত [নাটক] ও পরিত্রাণ [নাটক]	ছুটি	প্রথম নবম বিংশ
ফণীভূষণ সাহা	গল্প গুচ্ছ	মণিহারা	একবিংশ
ফাগুলাল	রক্ত করবী		পঞ্চদশ
ফেলনা	গল্প গুচ্ছ	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	ষোড়শ
বগলাচরণ	গল্প গুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
বটু	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
বটুক	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বদনচন্দ্র	হাস্য কৌতুক	গুরুবাক্য	ষষ্ঠ
বনমালী	গল্প গুচ্ছ	হৈমন্তী	ত্রয়োবিংশ
বনমালী	ঐ	জীবিত ও মৃত	সপ্তদশ
বনমালী	হাস্য-কৌতুক	পেটে ও পিঠে	ষষ্ঠ
বনমালী	গল্প-গুচ্ছ	ব্যবধান	পঞ্চদশ
বনমালী ভট্টাচার্য	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
বনোয়ারী	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বনোয়ারীলাল	গল্প-গুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
বরদা	ঐ	তপস্বিনী	ঐ
বরদা সুন্দরী	গোরা	রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	পঞ্চদশ
বরদাসুন্দরী	গোরা		ষষ্ঠ
বরুণ নন্দী	শোধ বোধ		সপ্তদশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
বরুণ নন্দী	কর্মফল		দ্বাবিংশ
বলদেও	গল্প-গুচ্ছ	মুক্তির উপায়	ষড়বিংশ
বলাই	ঐ	বলাই	চতুর্বিংশ
বলাই	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
বশম্বদ	ঐ	ভাব ও অভাব	ঐ
বসন্ত	চিত্রাঙ্গদা		তৃতীয়
বসন্ত বাবু	গল্প-গুচ্ছ	উলুখড়ের বিপদ	দ্বাবিংশ
বসন্ত কুমারী	ঐ	সদর ও অন্দর	ঐ
বসন্তরায়	বৌঠাকুরাণীর হাট [গল্প]		প্রথম
	প্রায়শ্চিত্ত [নাটক] ও পরিত্রাণ [নাটক]		নবম বিংশ
বসুসেন	অরূপ রতন		ত্রয়োদশ
বংশী	গল্প-গুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
বংশীবদন	ঐ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
বংশীলাল	ঐ	ঐ	ঐ
বাণীকণ্ঠ	ঐ	সুভা	সপ্তদশ
বামনদাস		মুক্তির উপায়	ষড়বিংশ
বামাচরণ	গল্প-গুচ্ছ	প্রতিহিংসা	বিংশ
বামাচরণ বাবু	ঐ	অধ্যাপক	একবিংশ
বামী	প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ		নবম ও বিংশ
বাল্মীকি	বাল্মিকী-প্রতিভা		প্রথম
বাঁশরি সরকার	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
বাসবী	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
বিজয় লাল	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বিক্রমদেব	রাজা ও রাণী ও তপতী		প্রথম ও একবিংশ
বিক্রমবাহু	অরূপরতন		ত্রয়োদশ
বিক্রমসিংহ	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
বিজয়পাল	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বিজয় বর্মা	অরূপরতন		ত্রয়োদশ
বিজয়াদিত্য	ঋণশোধ		ঐ
বিদ্যুৎমালা	গল্পগুচ্ছ	রীতিমত নভেল	সপ্তদশ

মোনালিসা আর তার হাসি

দাভিঞ্চির মোনালিসা ল্যুভরের সম্পদ। দাভিঞ্চি মোনালিসা ছবিতে এমন এক হাসি ফুটিয়েছেন যে সেটা কি হাসি তা বার করতেই রসিকজনের মাথাব্যথার অন্ত নেই। সেটা মুচকি হাসি কিংবা আদৌ সেটা হাসির পর্যায়ে পড়ে কিনা, কিংবা এ হাসি সে হাসি নয়—ইত্যাদি মন্তব্যে দাভিঞ্চির মোনালিসা দর্শকদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়। আসল ছবি তো দেখি নি, দেখেছি চিত্রলিপি, তা দেখে হাসি নিয়ে মাতামাতির কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। মোনালিসার মুখ টিপে মুচকি হাসির মুখাকৃতি আমার মনে দাগ কেটেছে নিঃসন্দেহে তার জন্যে হাসি দায়ী কিনা তা বিচার্য। যাহোক এ হাসির কথা নয়—এই হাসির উৎস কিংবা উৎসমুখী সবই হাসি বন্ধ করে কারণ নির্ণয়ে চোখে জল আনায়। বর্তমানে ইতালীয় সরকার এই হাসির অন্তরালে অন্তরালবর্তিনীটিকে তা আবিস্কার করতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এতে আরও আমাদের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। একেতো হাসি কিংবা হাসি নয় এই আলোচনাতে ছবিটির আসল বক্তব্য মাঠে মারা গেছে—হাসির উৎস সন্ধানের মারামারিতে হাসিটি কে হেসেছিলেন সেই ইতিহাসটি ধামাচাপা পড়েছে। তার উপরে গণ্ডের ওপর পিণ্ডের মত হাসিটিতো আছেই। যাক আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম—হাসি আর হাসির অধিকারিণী উভয়ই যেন আবার অদৃশ্য তলোয়ার দ্বন্দ্ব না ঘটায়। আসলে ছবিটির বিন্যাস এবং পশ্চাদপট এই দুটি দাভিঞ্চির অসাধারণ তুলির পরিবেশনে চমৎকার—হায় ঈশ্বর মোনালিসার উজ্জ্বল চোখদুটি 'হাসির' তর্কে কোথায় ভেসে গেছে। তার সুঠাম দেহ, সুন্দর প্রকৃতি পরিবেশে এমন মাধুরী এনেছে যে শুধু মাত্র হাসি নিয়ে এতো হাসাহাসি সত্যিই ভালো লাগে না।

গথিক্ ইণ্টার ন্যাশানল

ভিয়েনায় গথিক্ ইণ্টার ন্যাশানালের এই প্রদর্শনী রসিকজনের বহু খোরাক জুটিয়েছে। গথিক্ শিল্পকলা ইয়োরোপের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। অনেকে এই খোঁচা খোঁচা আকাশ ছোঁয়া স্থাপত্য দেখে চোখে খোঁচা খান। অনেকেতো পাঁচজনের কথা প্রতিধ্বনি করে গথিক্ শিল্পকলার আদ্যশ্রাদ্ধ করে তোলেন। কিন্তু সর্বদা এটা ভুলে যান যে গথিক শিল্প খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাস নির্মাণে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলো। শুধুমাত্র ভূমিকা নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—সেখানে ধর্মের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয়ও বহন করছে। তবে এ কথাও ঠিক যে অতিরিক্ত অনুশাসনের জ্বালায় গথিক্ শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে নির্জীব বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তবে গথিক্ শিল্পমালায় নিপুণ স্থপতি এবং ভাস্করের ছোঁয়ায় মহান শিল্পবৈশিষ্ট্যের প্রচুর সংযোজন আছে। যদিও রাজন্যবর্গের আদর্শে গথিক শিল্প বেড়ে উঠেছে—তবুও শুধুমাত্র অলংকরণ কিংবা ধর্মাদর্শে নিরস শিল্পকাজ বাদ দিলে গথিক্-শিল্প পরবর্তীকালের বহু শিল্পান্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। রোমান শিল্পচাতুর্য আর খৃষ্টীয় মতবাদের আওতায় গথিক ইয়োরোপীয় শিল্পমালা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। স্থাপত্যে ঈশ্বর-অনুভূতির অনুকম্পন গথিক শিল্পমালা ছাড়া এত প্রত্যক্ষ

কোন কাজে অনুভূত হয়নি। নীল আকাশ ছোঁয়া মানুষের মানসিক মুক্তির আকাঙ্খা গম্ভীর মধুর ভাবাবেশে চমৎকার। অসংখ্য গাছের শ্রেণী, বহুদূরবিস্তৃত পথের ধারে, তাদের বাহুবেষ্টনে উর্ধ্বলোক অন্বেষী—প্রকৃতি মন্দিরের মতই গথিক স্থাপত্যের আভ্যন্তরীণ গঠন মানুষকে ঈশ্বর অনুভূতির কথা স্মরণ করায়।

ঈজিপ্টে আবুসিম্বেল মন্দির সমস্যা

আসোয়ানে রাশিয়ানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নাসের সরকার পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। আসোয়ান বাঁধ নীলনদকে বেঁধে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী করবার প্রতিশ্রুতি এনেছে। এই নীল নদের তটভূমিকে কেন্দ্র করে আর এক অতীত ঐতিহ্যের মন্দির গড়ে উঠেছিল। খৃষ্ট-জন্মের দেড় হাজার বছর আগে রাজা দ্বিতীয় রামেশিস্ আর তাঁর রাণী নেফ্রেটিসের এক বিরাট স্মৃতি-মন্দির এই আসোয়ানে তৈরী হয়েছিল তখন নির্মেতা ছিলেন ফ্যারাও—আজকের সেই সমাধি-মন্দিরকে বিলুপ্ত করে সেখানে নির্মিত হচ্ছে বাঁধ-নির্মেতা শ্রেণীবদ্ধ অগণিত মানুষের রাষ্ট্র। সেদিনের মন্দির আজকের দিনে নিদর্শন মাত্র। আজকের মন্দির ইডাষ্ট্রি আর বাঁধ। কালের ধাক্কায় চিন্তা মানুষের বদলিয়েছে। গতযুগে যা ছিল অবশ্য আজকে তাকে স্থান দেওয়া হয় ইতিহাস তৈরীর অনুপান হিসাবে। তবুও আসোয়ানে দ্বিতীয় রামেশিসের সমাধি মন্দির পুরাতাত্ত্বিক দিক থেকে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের বহনকারী হিসাবে সযত্নে রক্ষা করা উচিত—যদিও এ তর্ক তোলা হয় যে, শিবলিঙ্গ নোড়ার কাজে ব্যবহার না করলে তার জাত যাবে—তখন অবশ্যই কিছু বলার নেই। সেই হিসাবে ওই পর্বত স্তূপ গেল কি এলো তাতে কোন মাথা ব্যাথা হওয়ার কথা নয়—কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে সত্যিই ভাববার বিষয়। দ্বিতীয় রামেসিসের সমাধি মন্দিরটা শুধুমাত্র তো পাহাড় কিংবা পাথরের স্তূপ নয়। ওটা একটা বিশেষ সমাজে লালিত মানুষের চিন্তা করবার পদ্ধতি, সে পদ্ধতি আজকের যুগে অবজ্ঞাত হতে পারে, কিন্তু আজকের পরিণতিতে সেই যুগের ওই চিন্তা স্ফুরণ অবশ্যই স্বীকার্য। শুধুমাত্র ইতিহাসের দিক থেকে না দেখে কার্যকরীভাবে দেখলে স্থাপত্যরীতির দারুণ বিস্ময় এই সমাধি মন্দির। মন্দিরটির কারুকার্য বিশ্লেষণে নন্দন তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলেও স্থাপত্যরীতির যে অনিবার্য উন্নতি ঈজিপ্টে ঘটেছিল যা দেখে পরবর্তীকালের বহুজাত যে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই হিসাবে এই মন্দির জাতীয় সম্পদ। —আশা করছি যে বিদগ্ধ মনের বহু অনুরোধে বোধহয় 'আবু সিম্বেল' বাঁচতে পারে ও নয়তো দুই-এক বছরের মধ্যেই নীলের নীল জলে তার সলিল সমাধি প্রত্যাসন্ন। অনেকে যুক্তি খোঁজেন নীল রক্তবাহী-দের অত্যাচারের 'সিম্বল' ধ্বংস করবার মধ্যে। উপাসনার যে পদ্ধতি আমরা বহুযুগ আগে ফেলে এসেছি—শুধুমাত্র একজন রাজা কিংবা রাণীর খেয়াল চরিতার্থের উপকরণ হিসাবে তাকে বর্তমানের অগণিত মানুষের চাহিদার কাছে অবলুপ্তিই একমাত্র পন্থা। এই যুক্তিতে বহু প্রাচীন সমস্ত কিছু নিদর্শন টুকরো টুকরো করে ফেল্লে মানুষের শস্য ক্ষেত কিংবা বসবাসের বহু সমস্যা মিটে যেতে পারে—শুধু আবু সিম্বেলের প্রতি এই দয়াটুকু কেন। ইতিহাসের অনিবার্যতা রোধ-করা মানুষের সাধ্যাতীত। তার মলাট পালটিয়ে অন্য কোন রঙ্গে আঁকলেও ইতিহাস মরে যায় না। সেই সমস্ত বিচারকরে জাতীয় ইতিহাসের অনুপান হিসাবে নয়—মানুষের চিন্তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে 'আবু সিম্বেল' যাতে না সলিল সমাধিতে লুপ্ত হয় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

অ্যাটিক্ পটারীজ্, রিসমণ্ড, ভারজিনিয়া ম্যুজিয়াম

বিগত দিনের কথা নিয়ে আলোচনার অর্থ এই নয় যে সেই বিগত যুগের মতই চিন্তায় জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু বিগত যুগের মানুষের কত না চিন্তায় আজকের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত। সেই বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সমাজের কত কথা ছড়িয়ে আছে অগণিত মূর্তিতে স্থাপত্যে আর হস্ত-নির্মিত পাত্রে। গ্রীক সময় মানুষের ইতিহাসে এক রোমাণ্টিক অধ্যায়। শৌর্য, যুদ্ধ অলস সময় বিনোদনের অসংখ্য উপকরণের মধ্যে অ্যারিসটোক্রাটিক্ দর্শন গ্রীক যুগের প্রতিভূ। গ্রীক দর্শনের ছায়ায় রোমান চিন্তা এবং মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তা অনেকাংশে বেড়ে উঠেছে। এই জীবনাদর্শে তখনকার মানুষ কি ভাবত, দেব-দেবী সম্পর্কে কি ধরণের মতবাদ পোষণ করত, সেই অনুচিন্তার কত ছাপ আছে গ্রীক পটারীজের মধ্যে। খৃষ্টজন্মের ছয় শত বছর আগে মানুষের জীবন সম্বন্ধে কথা গ্রীক শিল্পীদের হস্তনির্মিত পাত্রে সংবদ্ধ আছে। অগণিত ছবির মধ্যে মানুষ, দেব-দেবীর জীবনযাত্রা প্রণালীই প্রধান—নারী কিংবা শিশুর ছবি আছে। কালো আর লাল এই দুই রঙেই সব কিছু আঁকা। এই দুটি রঙ ছাড়া সাদার ব্যবহারও আছে—তবে খুব কম। বিশেষ সময়ে যে জিওমেট্রিক বিভিন্ন চিন্তা মানুষের মাথায় এসেছে তারও কথা স্পষ্ট-ভাবেই ধরা যায়। পার্সপেক্টিভ্ নিয়ে নানাভাবে ছবি আঁকার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। ঘোড়ার যুদ্ধমান ছবি গ্রীক চিত্রকলায় প্রধানভাবে দেখা দিয়েছে। তবে যুদ্ধমান ঘোড়ার মধ্যে বীররসের প্রাধান্যই বেশী। তখনকার সমাজের বীরদের নানাভাবে আঁকা হতো—যুদ্ধমান ঘোড়াও সেই জাতীয় চিন্তার ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কিংবা তাদের ভালোলাগা মন্দলাগাকে শিল্পীরা সযত্নে পরিহার করেছেন। মানুষের জীবনযাত্রার ছাপ আছে তবে তারা সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা উচ্চতর সমাজের অধিবাসী এবং অনেকাংশে দেবতার অংশভোগী। বংশ এবং রাজনৈতিক পদভূমি ওই সমাজের অংশভোগীদেরই প্রধান পরিচয় ছিল আর সেই ছাড়পত্রে তাঁরাই একমাত্র সমস্ত কিছুর অধিকারী -এ কথা কত না ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের সাজ-পোষাক, আচার, আচরণ, পদ্ধতিই শিল্পীদের প্রধান উপজীব্য।

নিখিল বিশ্বাস

সাহিত্য সংবাদ

পুরাকালের যে সকল মহাকাব্য কালের করাল স্পর্শ এড়িয়ে আজও মানবমনে অমৃতের দুর্লভ স্বাদ বিতরণ করছে তাদের ঐশ্বর্য্য নিয়ে বহুতর আলোচনা হয়েছে এবং লক্ষ্য করা গেছে যে বিগত যুগের অধিকাংশ মহাকাব্যের মূল সুর প্রায় সমপর্য্যায়ের কাহিনীর উপর অনুরণিত, সে কাহিনী বীরত্বের অথবা যুদ্ধের, যার উৎস ছিল ব্যক্তিগত জীঘাংসা অথবা ধর্মের ব্যভিচার এবং পুরোহিতকুলের নিপুণ ষড়যন্ত্র। কিন্তু বিবর্তনবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গত শতাব্দীতে মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুর চয়নভঙ্গীতে পরিবর্তন ঘটল এক মনীষীর স্বর্ণলেখনীর স্পর্শে। তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, সংগ্রামের কথা এই মহাকাব্যে আছে বটে কিন্তু তার রূপ অন্য, সে যুদ্ধ জীবনের। ভাঙ্গাচোরা সমাজের অনাচার, হতাশায় ক্ষুব্ধ এবং নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাসের অপূর্ব স্বর্ণময় আলেখ্য। যে মহাকাব্যের বিচিত্রধ্বনি সঙ্গীত সর্বদেশের সমাজ-ব্যবস্থার অনাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং হতাশজীবনে আশার সুর সঞ্চারিত করেছে তার শতবর্ষপূর্তি হল বর্তমান বৎসরে। ১৮৬২ সালের এপ্রিলমাসের তিন তারিখের শুভ-**মুহূর্তে আমাদের কালের মহাকাব্য "ল্যে মিজেরাবল্স" আত্মপ্রকাশ করেছিল।**

ভিক্তর উগোর ইচ্ছানুযায়ী ল্যে মিজেরাবল্স একাধিক সহরে একইদিনে প্রকাশিত হয়। যদিও প্যারি সহর প্রধান প্রকাশস্থল ছিল তথাপি ব্রুসেলস্, লণ্ডন, মাদ্রিদ, রটারড্যাম, বুদা-পেস্ত; ওয়ারশ এবং রিও ডি জেনিরো প্রভৃতি সহরের পাঠক সমাজ মূল প্রকাশনার দিনে সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে প্রথম প্যারি সংস্করণের সবকটি কপি বিক্রীত হয়, এই সংস্করণে মোট সাত হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছিল।

জাঁ ভালজাঁর জীবনসংগ্রামের অশ্রুসজল কাহিনী আজ কোনও সভ্যদেশে অপঠিত নেই বলেই মনে হয়। জাঁ ভালজাঁ চরিত্র সৃষ্টির মূলে আছে উগোর ইতিহাসের প্রতি একান্ত অভি-নিষ্টতা। নেপোলিয়ঁর জয়যাত্রার ইতিহাস রচয়িতা জেমস মরগান একস্থলে উল্লেখ করেছেন যে নেপোলিয়ঁ যখন বাস্সে-আল্পস্ প্রদেশের অন্যতম সহর ব্রিয়োঁতে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মনস্থির করেন তখন ভিন্যে পল্লীর বিশপ সম্রাটকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। উক্ত বিশপের ঘরে রাত্রিকালে এক তস্কর প্রবেশ করে ও ধরা পড়ে কিন্তু বিশপ তাকে ক্ষমা করেন এবং সম্রাটকে অনুরোধ করেন যে তাঁর সৈন্যদলে যেন তস্করটিকে গ্রহণ করা হয়, নেপোলিয়ঁ বিশপের অনু-রোধ রক্ষা করেন। তস্করটি মিশরে প্রেরিত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। মরগান দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন যে উগো ঐ নগণ্য তস্করটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর জাঁ ভালজাঁ চরিত্র সৃষ্টি করে-ছেন। এক্ষেত্রেও পুরোহিতের প্রভাব আছে কিন্তু এ পুরোহিতের চরিত্র ভিন্নধর্মী, এ পুরোহিত মানুষের হিতসাধনেই ব্যস্ত

ল্যে মিজেরাবল্স প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসর পূর্বে পল ফোশারকে এক পত্রে উগো জানান যে—"The entire work revolves around one central character. It is a kind of planetary system, moving around a giant soul, which is an incarnation of all

the social misery of the time".

তৎকালীন ইয়োরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে গলদ ছিল তার উপর কষাঘাত করার চেষ্টায় যে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশ্বজনীন আবেদন আছে বা সেই কাব্য চিরায়ত সৎসাহিত্যের পুরোধা হয়ে মানবমনে শিক্ষা এবং আনন্দ বিতরণ করবে, পুস্তকটির আত্মপ্রকাশের দিনেই তাবৎ বিদগ্ধ সমাজের মনে সে কথা প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু আজও মানুষের পাশববৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি ঘটেছে কি? সম্ভবতঃ নয়, তবে মানুষের পাশববৃত্তির রূপান্তর যে ঘটেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে কারণ আনবিক হলায়ুধের তান্ডব নৃত্য আমাদের কোন পথে চালিত করছে তা আমরা ভাল ভাবেই জানি, তাহলে একথাই কি ধরে নেব যে নীতিকথার কোন মূল্যই নেই? আছে, আর্ল রাসেলের কারাবরণ কি কোন শিক্ষাই দেয় না? সুস্থমনে চিন্তা করলেই পরিষ্কার দেখা যায় মণীষীগণ তাঁদের আরব্ধকর্ম করে চলেছেন, তাঁরা সততই মানবজীবনের কল্যাণকামনা করে নীতি প্রচার করেছেন কিন্তু মানুষ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করার কোনও প্রয়োজনবোধ করেনি কারণ মানুষ যুক্তিবাদী পশু। জাঁ ভালজাঁও পশু ছিল কিন্তু তার চরিত্রের যে রূপান্তর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমাদের উপন্যাস পাঠের আনন্দদান করেছে কিন্তু কতটুকু শিক্ষা অমরা গ্রহণ করেছি তা বিচার্য্য বিষয়।

ল্যে মিজেরাবল্‌স্‌ রচনাটির মূল সুর উগো একটি মাত্র মানববৃত্তির তারে ঝঙ্কৃত করেছেন সে মহান বৃত্তি হল সহানুভূতি, যে বৃত্তি মানুষকে আশা যোগায়, ভাবতে শেখায় যে অমানিশার শেষে আলোময় দিনের প্রতিশ্রুতি আছে, নিরাশা সাময়িক দুর্ঘটনা মাত্র। রক্ষণশীল সমাজে উগোর মহাকাব্য কি প্রতিক্রিয়া করতে পারে সে বিষয়ে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু লামার্ত্যাঁ তাঁকে এক সাবধানবাণী প্রেরণ করে বলেছিলেন, এ কাব্য বিপদজনক, কারণ জনসাধারণকে অসম্ভবের পিছনে ছোটার যে নির্দেশ দেওয়া আছে তা রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষকে সকল দুঃখ জয় করে আশান্বিত হবার নীতি প্রচার শাসকগোষ্ঠী নিশ্চয়ই সুনজরে দেখবে না সুতরাং তাদের রোষদৃষ্টিতে পড়া কোনও সুবিবেচনার কাজ নয়। কিন্তু মনীষী উগো তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে কোনদিনই নিজেকে বিচ্যুত করেননি। বন্ধুর এই সতর্কবাণী উচ্চারণের অন্যতম কারণ হল লুই নেপোলিয়'র সময় উগো কয়েকবৎসরের জন্য জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

আধুনিক রোমান্টিসিজমের অন্যতম পথিকৃৎ উগো তাঁর সৃষ্ট অন্যতম চরিত্র জাঁ ভালজাঁর মৃত্যুশয্যায় তার মুখ দিয়ে যে বাণী মানব সমাজকে শুনিয়েছেন তা যদি আমরা স্মরণে রেখে আমাদের কর্তব্যকর্ম করি তাহলে হয়ত অন্যের দুঃখের কারণ আমরা নাও হতে পারি।

জাঁ ভালজাঁ ক্লান্ত, মৃত্যুপথ যাত্রী। পালিতা কন্যা কোজেৎকে লক্ষ্য করে বলছেন যে বিশপের স্নেহের দান ঐ মোমবাতিদান দুটি তাঁর জীবনের অন্যতম ঐশ্বর্য্য, কারণ মমতার ঐ প্রতীক দুটি তঁকে নিয়তই সৎপথে পরিচালিত করেছে দুঃসময়ে পদস্খলন হতে তাঁকে রক্ষা করেছে। যখনই কোন অন্যায়চিন্তা করেছি তখনই সেই বিশপের ক্ষমাসুন্দর চোখদুটি আমার মনে পড়েছে আর সেই অন্যায় চিন্তা পরিহার করে এক অমৃতময় জগতের দিকে পা বাড়িয়েছি, জীবনকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি। আরও অনেক কথা সে বলেছিল কোজেৎকে, সে বলেছিল— "I have done what I could........Love each other well and always. There is no other thing in the world but that; love one another. Think of me sometimes........but because things are unpleasant is no reason for being unjust to God".

নূতন গ্রন্থ

বিহাইন্ড গডস্ ব্যাক : নেগ্লি ফারসন
ফারসন আফ্রিকা ভ্রমণের জন্য যখন মনস্থির করেন তখন বিশ্বব্যাপী রণতাণ্ডব সুরু হয়ে গেছে সেটা ১৯৪০ সালের কথা তখনকার আফ্রিকার সঙ্গে আজকের আফ্রিকার কিছু তফাৎ থাকলেও বিশেষ কোনও পরিবর্তন যে আফ্রিকাবাসীর মধ্যে এসেছে এমন মনে হয় না। রাজনৈতিক জাগরণ অথবা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য চল্লিশ সালে আফ্রিকায় কেমন ছিল বিহাইন্ড গডস্ ব্যাক রচনায় ফারসন তা বিধৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং একথা স্বীকার করতেই হবে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মূলতঃ এটি ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু চায়ের পেয়ালার উষ্ণ আবহাওয়ার আমেজে এ কাহিনী লিখিত হয়নি, ফারসন জীবন বিপন্ন করে সাউথ-ওয়েস্ট আফ্রিকা, টাঙ্গানায়িকা, কেনিয়া, উগান্দা, রুয়ান্দা-উরুন্দি, বেলজিক-কঙ্গো, ফরাসি ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা, ফরাসিস্ ক্যামেরুণ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন। নিয়তই বিপদ এসেছে কিন্তু পর্যবেক্ষণ স্তিমিত হয়নি। রচনাটির বাক ধারার মধ্যে কোন এ্যাকাডেমিক ফর্ম নেই কারণ ফারসন যেখানে যা দেখেছেন বা উপলব্ধি করেছেন তখনই তা লিখেছেন এবং স্বভাবতঃই রচনাশৈলীর মধ্যে আফ্রিকার যে পরিচয় আমরা পাই তা আপাত বিরোধী সত্য এবং ফারসনও তা স্বীকার করেছেন ও বলেছেন দেশ বলতে যা আমরা কল্পনা করি, আফ্রিকায় এলে সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে, কি প্রাকৃতিক কি সামাজিক যে কোন বিষয়েই এখানে কোন সামঞ্জস্য নেই এমনই বিচিত্র এই দেশ। তাঁর এ রচনার সম্বন্ধে নিজস্ব মত হল এর স্বাদ আগামী দিনের নূতন পৃথিবীর জন্য। এ বিষয়ে আমরাও এক মত।

সেট্যান ইন দি সাবার্ব এণ্ড আদার স্টোরিজ : বার্টরাণ্ড রাসেল
গল্পগ্রন্থটির মুখবন্ধে রাসেল বলেছেন এই গল্পগুলি কেন লিখেছেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি নিজেই জানেন না এবং গল্প লেখার চিন্তা এর পূর্বে কোনদিন করেছেন কিনা তা স্মরণ করতে পারেন না।

সত্যই পাঠকসমাজের কাছে ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক বটে কারণ বিশুদ্ধ গণিত এবং দর্শনশাস্ত্র যাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু, হঠাৎ কি এমন কারণ ঘটতে পারে যার জন্য রাসেল ৮০ বৎসর বয়সে সার্থক গল্পকার হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করবার জন্য লেখনী ধারণ করলেন? প্রকৃত কারণ কি তা আমাদের যথাযথভাবে জানা না থাকলেও প্রতিভার এই অকস্মাৎ স্ফুরণ আমাদের কাছে নূতন কিছুই নয়। পরিণত বয়সে বিশ্বকবির চিত্ররচনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আমাদের কালেরই ঘটনা। শিল্পসত্বার এই আকস্মিক বিকাশ হয়ত কোনও মানসিক সংঘাতের অমোঘ পরিণতি যার যথার্থ ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরাই করতে পারবেন কিন্তু আমাদের যে পরমলাভ ঘটেছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

রাসেল এক আত্মপ্রশ্নের কোনও সদুত্তর লাভ না করে স্বীকার করেছেন যে গল্পগুলির কোনও সাহিত্যমূল্য আছে কিনা সেকথা তাঁর অজানা কিন্তু এগুলি রচনা করে তিনি নিজে আনন্দলাভ করেছেন এবং আশা করেন পাঠকসমাজও কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে গল্পগুলিকে কোনমতেই বাস্তববাদের ধারকরূপে চিহ্নিত করা যায় না কিম্বা কোনও মতবাদকে ব্যঙ্গ করবার জন্য লিখিত হয়নি, পাঠক যদি এগুলি পাঠ করে আনন্দলাভ করেন তাহলেই রচনাগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের নিরসন ঘটবে।

মুখবন্ধে রাসেল যা বলেছেন, গল্পগুলি পাঠ করে পাঠক সেকথা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করলে কিঞ্চিৎ সংশয়ান্বিত হবেন কিন্তু তখনই যদি তিনি স্মরণে আনতে পারেন যে লেখক সেই গোষ্ঠীর প্রতিভূ যাঁদের কৌতুকের মধ্যেও সূক্ষ্ম রক্ষণশীলতার আভাষ আছে তাহলে পাঠকের মনে যে সংশয়ের মেঘ জমেছিল নিজ উচ্চহাস্যের বর্ষণে অচিরেই তা ঝরে যাবে।

গল্পগ্রন্থটিতে সেট্যান ইন দি সাবার্বস্ অর হোররস্ ম্যানুফ্যাকচার্ড হিয়ার, দি কর্সিকান অরডিন অব মিস এক্স, দি ইনফ্রা—রেডিয়োস্কোপ, দি গার্ডিয়ানস্ অব পারনাসাস এবং বেনিফিট অব ক্লারজী নামক মোট পাঁচটি গল্প স্থান পেয়েছে। ক্রমানুসারে প্রথম গল্প সেট্যান ইন দি সাবার্বস্ কিন্তু রাসেলের প্রথম রচনা হচ্ছে দি কার্সিকান অরডিল অব মিস এক্স। সেট্যান গল্পের কাহিনী হল যে সব মানুষের তীব্র উচ্চাকাংখা আছে তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন শয়তানরূপী ডক্টর মারডক মাল্লাকো. তাঁর কাজ সমস্যার সমাধান করা এবং তার বিনিময়ে প্রতিঘণ্টায় দশ গিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ। যে সব শিকার ডক্টর মাল্লাকোর জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের যে বিষম পরিণতি হল তার ভয়াবহতা লক্ষ্য করে পাঠক নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু আরো আছে, এ গল্পের ঘটনাপ্রবাহের যিনি দর্শক তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে শয়তান ডাক্তারকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে মর্টলেক পল্লীর জনসাধারণকে অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। শয়তান হত হল কিন্তু মানবপ্রেমিক চরিত্রটির যে পরিণতি হল তা আরো ভয়াবহ। তিনি শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ডক্টর মাল্লাকোর সেই কঠিন-শীতল ইস্পাতের মত চোখদুটি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন এবং তাঁর মনে হল সেই ভীষণ চোখদুটি তাঁকে অনবরত তাড়া করছে। তিনি প্রায় পাগল হয়ে গেলেন এমন কি তাঁর স্ত্রীও তাঁর প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তারপর সেই শেষদিনে তিনি যখন বললেন যে তিনিই শয়তান মাল্লাকোর হত্যাকারী তখন তাঁর স্ত্রী যা করলেন তার একমাত্র পরিণতি হল ভদ্রলোকের পাগলাগারদের হিমশীতল কক্ষে আজীবন অবস্থান।

সবকটি গল্পের পরিচয় এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু লেখক মানবমনের যে ভয়াবহ এবং বাস্তবধর্মী চিত্র এঁকেছেন তার ব্যাকরণ খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার অথচ আমরা জানি মানুষের মধ্যে পৈশাচিক বৃত্তি রয়েছে কিন্তু স্থানকাল পাত্রভেদে কখন কোথায় এবং কি ভাবে তার স্ফুরণ হবে সেটাই আমাদের অজানা।

প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু এবং ঘটনা উপস্থাপনের মধ্যে যে চমৎকারিত্ব আছে তা নূতনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। মানুষের ধ্বংসকারী বৃত্তি ও পদ-স্খলনের প্রতি যে তীব্র কষাঘাত রাসেল করেছেন তার সফল প্রকাশ প্রতিটি গল্পের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিন্তু কোনস্থানেও অসংযমের আবিলতা নেই। গল্পগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা অভিহিত নই তবে রাসেল ৭৮ বৎসর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৫০ সালে এবং তাঁর প্রথম গল্প দি কর্সিকান অরডিল অব মিস এক্স ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের "গো" পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায়।

রাসেল আজ বয়সের ভারে অবনত কিন্তু মানবকল্যাণের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কষা তিনি ধারণ করেছেন তা যেন দানবের মনে শুভ চেতনা জাগায় এবং তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে পাঠকসমাজকে আনন্দদান করুন, এই কামনাই করি।

অজিত দাস

জনৈক অন্যায়কারী ক্ষমাপ্রার্থী লেখক

[গত শ্রাবণ সংখ্যায় এই রচনাটির ২৫৯ পাতায় কয়েকটি লাইন মুদ্রণপ্রমাদে ওলট্‌পালট্‌ হইয়াছিল। সেইকারণে এই সংখ্যায় গোটা রচনাটি পুনরমুদ্রিত হইল।—সম্পাদক]

(১) জ্যৈষ্ঠসংখ্যা সমকালীনে আমার কিছু রচনার বিষয়ে শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু সওয়া তিনপৃষ্ঠাব্যাপী এক আলোচনা করেছেন। আলোচনার নাম 'আর একটু সৌজন্যবোধে ক্ষতি কি?' সোমেনবাবু আমার লেখায় যে সৌজন্যবোধের অভাব দেখেছেন তার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত, বিশেষত স্বামীজীর বক্তৃতার ভূমিকায় শ্লেষ বিদ্রূপ প্রকাশ করা যে উচিত হয়নি, এ বিষয়ে তাঁর তিরস্কারকে আমি সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি।

(২) সোমেনবাবু আমার অসৌজন্যের প্রতিবাদে বিশেষ সৌজন্য ও সহৃদয়তা সহকারে আমার লেখার দোষ দেখিয়েছেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিষয়ে সমালোচনামুখে যা বলা হয়েছে সেগুলিকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি. কারণ, 'কোনো মানুষ সম্বন্ধে নিন্দাই তার বিষয়ে সত্য কথা।' আঘাতে আমার চৈতন্য হয়েছে। আমার লজ্জিত বিবেক এখন সোমেন্দ্রনাথকে সেকুলার ধর্মযাজকরূপে দেখছে। তাই আমি তাঁর সামনে আমার সম্বন্ধে বলা ঐ সত্যকথাগুলির কয়েকটিকে 'কন্‌ফেসন' রূপে পুনরায় উচ্চারণ করে আমার পাপস্খালন করছি। সোমেনবাবুর তেমন দু' একটি কথা—

॥ সৌজন্যহীন ॥ 'বালকোচিত' ॥ যুক্তিহীন ।। রাগ ও ঝাঁঝযুক্ত ।। অসুস্থ বুদ্ধি ।। বানিয়ে বানিয়ে শত্রু করার অত্যুৎসাহী ॥ ঝগড়ার প্রবৃত্তিযুক্ত ॥ 'লেখকের বালসুলভতা' ॥ আলোচনার ভদ্ররীতিহীন ॥ অকারণে উত্তেজনাসৃষ্টিকারী ॥ অহঙ্কৃত উদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ।। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিযুক্ত ॥ বাতাসে তলোয়ারচালক ॥ 'ছেলেমানুষী ঢঙ' ॥ গুরুভক্তির চশমাধারী ।। অভদ্র ভূমিকা লেখক ॥ ক্রোধন স্বভাব ॥

আরও আছে। সে সবগুলিকে তুলতে হলে সোমেন বসুর গোটা রচনার প্রায় প্রতিটি লাইন তুলতে হয়। সেটা পারছি না—আমার কনফেসনে এই ত্রুটি থেকে গেল।

(৩) এইখানেই এই লেখা শেষ করা উচিত। স্বীকার করা উচিত আমি কল্পনায় শত্রু খাড়া ক'রে তাদের বিরুদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চালিয়ে অনর্থক ব্যায়াম করেছি। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় আমার সেই শূন্যে চালিত তলোয়ারে আহত হয়েছেন কেউ কেউ। সোমেন বাবুও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি যদি আহত না হতেন তাহলে ঐ তিনপৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিঘাত করতেন না। হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো দেখলে লোকে হাসে। সোমেন্দ্রনাথ রেগেছেন। তবে কি তাঁর রাগ তাঁর হাসি?

(৪) আরও একটা দুটো কথা বলা দরকার। আমার প্রথম রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের সমালোচকদের যে সব কটাক্ষ করেছিলুম তার একটিকেও কিন্তু প্রত্যাহার করছি না। (এইখানে

পুনশ্চ সোমেনবাবু স্বামীজীর মত স্বামীজীর এই নগণ্য ভক্তের মধ্যে স্বতোবিরোধ দেখবেন ঃ ক্ষমাপ্রার্থনার পরেও বক্তব্যে অনমনীয়!) আমি কোনো কোনো ব্যক্তির মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলুম। তেমন ব্যক্তি সত্যই আছেন, এবং কোনো কোনো মহলে তাঁদের কিছু প্রতিষ্ঠাও আছে বলে আমার ধারণা ছিল। সোমেনবাবু যদি বলেন, না তাঁদের তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা নেই, তাহলে বর্তমান লেখকের আনন্দের সীমা থাকবে না। আমি যে সেইসব ব্যক্তির নামোল্লেখ করিনি, তার একটা কারণ বর্তমানে স্বীকার করা নিরাপদ,—আমার সাহসের অভাব,—যে সাহসের, সত্যনিষ্ঠার, স্পষ্টবাদিতার যথার্থ সদ্ভাব দেখা গিয়েছে আমার সম্বন্ধে সোমেনবাবুর সঙ্গত সমালোচনার মধ্যে।

(৫) আমার লেখার আর একটি দোষ ছিল যেটি সোমেনবাবু না বললেও তাঁর লেখা পড়ে বুঝতে পারছি, তা হল, ভাষাগত অস্পষ্টতা। বাংলা দেশে স্বামীজীর পরিচয় কি দাঁড়িয়েছে তা বলতে গিয়ে আমি তৃতীয় পয়েন্টে বলেছিলুম—'স্কুল কলেজ হাসপাতালের গণেশ দেবতা।' সোমেনবাবু প্রশ্ন করেছেন, 'এ তিনি কোথায় পেলেন? যদি বা কেউ কোথাও এ ধরণের কথা বলে থাকে আমার চোখে তা পড়েনি—তা যে বাংলা দেশে স্বামীজীর পরিচয় নয় এটা সুস্থ-বুদ্ধিতে লেখকের বোঝা উচিত ছিল' ইত্যাদি। আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি, এ ধরনের কথা সত্যই কেউ বলেন নি। কেউ বলেছেন, এ কথাও বর্তমান লেখক বলেন নি। সোমেনবাবু ধরে নিয়েছেন, ওটাও বিবেকানন্দ-বিরোধীদের বক্তব্য। না, তা নয়, ওটা বিবেকানন্দের চিহ্নিত ভক্তদের সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের সমালোচনা। ঐ সকল ভক্তেরা কতকগুলি স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের দরজায় স্বামীজীকে স্থাপন করে তঁার পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রকাশে প্রায়ই বিরত থেকেছেন। এঁদেরই বিরুদ্ধে ঐ কথাগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু বক্তব্যপ্রকাশে ত্রুটির জন্য সোমেনবাবুর তা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে আমি বিশেষ দুঃখিত।

(৬) সোমেনবাবু স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেছেন, 'তার প্রতি আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজেও মানতে রাজি নই।' স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার দুটি কারণ তিনি জানিয়েছেন—তাঁর 'প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব' এবং 'স্ববিরোধ সত্ত্বেও বলিষ্ঠ জীবনবিশ্বাসী দৃষ্টি।' তাই বলে স্বামীজী সম্বন্ধে অন্ধ ভক্তি তাঁর নেই। তিনি স্বামীজীর দোষত্রুটি যথেষ্ট দেখিয়েছেন। সেগুলো সংক্ষেপে এই : (ক) সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আচরণ সঙ্গতিরক্ষা করে নি : অল্প বয়সে মৃত্যুই এর জন্য দায়ী। আরও বেশীদিন বাঁচলে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত 'নিরাসক্ত ঔদার্যের' অধিকারী হতে পারতেন। (খ) তিনি জাতীয়তার তীব্র মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন; (গ) স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তঁার দৃষ্টি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল না, ইত্যাদি। এখানে সোমেন্দ্রনাথের কিছুটা রচনা উদ্ধৃত করা উচিত—

"দীর্ঘায়ু পেলে ঐ জীবন আসক্তিই যে প্রবল হয়ে উঠে আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা-মাখানো বহু ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।......বিরোধ কিছু স্তিমিত হলে তিনি যে আরও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সমস্ত পরিবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন, এবং তার ফলে যে সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছিন্নভিন্ন করে আরও উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিতে পারতেন এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সময় তিনি পান নি। এটা আমারই ধারণা, আমার বিচারে এটাই বিবেকানন্দের একমাত্র লজিক্যাল পরিণতি হতে পারত।"

(৭) তাহলে ব্যাপারটা শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে। সোমেনবাবু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেও বলতে কিছু বাকি রাখেন নি : বিবেকানন্দের ধারণা আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা মাখানো ছিল, সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডীতে বাঁধা ছিলেন তিনি, তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ছিল না ইত্যাদি। আমি আমার সামান্য রচনায় এই জাতীয় মনোভাবকে কিছু আঘাত

করেছিলুম। সোমেনবাবুর বক্তব্য, বিবেকানন্দ অল্প বয়সে মারা যেতেই যত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বয়সের এই অপরিণতিই তাঁর ধারণাগত অপরিণতির জন্য দায়ী। সোমেনবাবুর অনুমান, বেঁচে থাকলে বিবেকানন্দের লজিক্যাল পরিণতি হত—আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা ত্যাগ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিলাভ। সোমেনবাবু বিশেষ যুক্তিবাদী। যুক্তি ছাড়া কথা বলেন না। সুতরাং বিবেকানন্দের ঐ লজিক্যাল পরিণতির কারণ তিনি নিশ্চয় তার রচনার মধ্যে লজিক্যাল ভাবে জানিয়েছেন কিন্তু সে বস্তু যে কোথায় আছে অন্ধ ভক্তির চশমা পরে আছি বলে আমরা তা দেখতে পাই নি। তবে আমাদের মত অন্ধ ভক্তেরা একটা কথা (নিশ্চয় ইল্‌লজিক্যালি) বিশ্বাস করে—প্রত্যেক বড় মানুষের জীবনের একটা ভিত্তি থাকে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে তা আধ্যাত্মিকতা। সে বস্তু বিদেশে প্রচার করতে তিনি দেহপাত করলেন। বেঁচে থাকলে সেই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি ত্যাগ করতেন! কিন্তু তবু তিনি তা করতেনই, কারণ সোমেন্দ্রনাথ ঐ লজিক্যাল পরিণতিতে বিশ্বাস করেন এবং তার কারণও (আমাদের কাছে অলিখিত ভাষায়) তিনি উপস্থিত করেছেন।

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর ভাগ্যবিধাতার কাছে আমাদের অভিমান ছিল, সোমেন্দ্রনাথের লেখা পড়ে সেটা বেড়ে গেল।

(৮) একটি জায়গায় সোমেন্দ্রনাথ আমাকে একেবারে উদঘাটিত করে দিয়েছেন। তাঁর মতে আমি স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র রক্ষাকর্তা সেজেছি! কী শোচনীয়! কী শোচনীয় আমার অহমিকা! এরকম স্পর্ধা যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে আমি সাস্টাঙ্গে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু ঐ গুরু দাবি কোথায় করেছি খুঁজে পেলুম না। আমার স্থূল দৃষ্টির জনাই কি খুঁজে পেলুম না? নিশ্চয় তাই, তবু আরও একটা কারণ মনে হচ্ছে; স্বামী বিবেকানন্দ জনচিত্তে বিপুল ও গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁর বিষয়ে চপল উক্তি স্বামীজীর অগণিত অনুরাগীর কাছে উদার ঔদাসীন্য বা নীরব ঘৃণা লাভ করে। বর্তমান লেখকের চরিত্রে সেই গভীরতা বা সহিষ্ণুতা নেই, তাই তিনি কিছু মন খুলে কথা বলেছেন, এবং তার ফলে না-বলার পটভূমিকায় সেই সামান্য বলাটা মস্ত হয়ে উঠে সোমেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর সামনে মাথা পেতে দিয়েছে।

একদিকে আমার এই অগভীরতা অন্যদিকে সোমেনবাবুর চিন্তাস্তরের যথার্থ উচ্চতা। তিনি যে খুব উচ্চ স্তর থেকে কথা বলেছেন সন্দেহ নেই। ঐ স্তর থেকে কথা বললে স্বামী বিবেকানন্দের মত মানুষ সম্বন্ধেও করুণা বোধ করা যায়; বলা যায় যে, বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটলে তাঁর মনেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটত। সোমেনবাবুর এই বক্তব্যকে মাত্র বিচক্ষণ সমালোচনা বলে ছোট করা উচিত হবে না, এটা কালাতিক্রমী ঊর্ধ্বচারী দৃষ্টির সিদ্ধান্ত। এবং এই উদার বিশাল দৃষ্টিবশেই তিনি সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন, স্বামীজী ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। বিজাতীয়দের কাছে যেখানে স্বামীজী বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বধর্মের প্রবক্তা বলে গৃহীত হয়েছেন সেখানে স্বামীজীর জনৈক স্বজাতীয়ের কাছে যদি তিনি সংকীর্ণ বলে প্রতিভাত হন, তাহলে ঐ স্বজাতীয়ের দৃষ্টি উদারতায় ও গভীরতায় কোন্ সুদূরসীমাকে স্পর্শ করেছে তা ভাবলেও দিশাহারা হয়ে হয়।

(৯) নিজের দোষের আর কত আলোচনা করব! আমি বিবেকানন্দের সমালোচকদের 'অমুসলমান' বলায় সোমেনবাবু আমার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দেখে সবান্ধবে হেসেছেন। হাস্য-রসের প্রতি সোমেনবাবুর মত সিরিয়াস লোকের সাধারণ আসক্তি নেই; এই একটি ক্ষেত্রে যে আমি তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি তার জন্য সবিশেষ আনন্দিত। সোমেনবাবু আরও বলেছেন, ঐ গালাগালির ঝাঁঝ তাঁর গায়ে লাগেনি, 'মুসলমান বলে গাল দিলেও লাগত না।' এইখানে আমি একটু বিস্মিত হচ্ছি, নিশ্চয় ওঁর অনবধানতা, নচেৎ

'মুসলমান' শব্দটা যে গালাগালির শব্দ এটা সোমেনবাবুর মনে হলেও আমার মত গোঁড়া হিন্দুর ধারণার ত্রিসীমানাতেও আসেনি।

তবে স্বীকার করা উচিত 'অ-মুসলমান' শব্দটা ক্ষোভের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের অনেক পুরনো দুঃখ ওই শব্দটার সঙ্গে জড়ানো। স্বাধীনতা-পূর্বের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দু হয়েছিল অ-মুসলমান, এবং সম্ভবত আত্মধর্মে লজ্জিত হিন্দুরা সেটা মেনে নিয়েছিল। যাক সে কথা, এখানে রাজনীতির আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়, আমার উদ্দেশ্য ত্রুটিস্বীকার ও শিক্ষাগ্রহণ।

(১০) তাহলে দাঁড়াচ্ছে একদিকে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার অন্ধতা অন্যদিকে সোমেনবাবুর শ্রদ্ধা ও সমালোচনা। আমার অন্ধতা যে আছে তা সোমেনবাবুর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সুতরাং তা সত্য। স্বামীজীকে আমি সাধারণ সংস্কারক বলে মনে করি না, তাঁকে প্রফেট বলে মানি, ধারণাগত পূর্ণতার জন্য তাঁর আশী বছর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না (যে প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে সোমেনবাবু বোঝাতে চেয়েছেন),—আমার মনোভাব এই ধরনের, সুতরাং সোমেনবাবু ও আমি উভয়েই জানি, আমার অন্ধতা চরম বৈজ্ঞানিক অপারেশনেও কাটবে না। তবু যে সোমেন্দ্রনাথ নিছক মানবপ্রীতিবশে আমার প্রতি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ করেছেন, এবং আমি যে বিধাতার কত মন্দ সৃষ্টি তা দেখাবার জন্য তাঁর আয়না আমার সামনে তুলে ধরেছেন, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেছি। স্বামীজীর ধারণার অপরিণতি, স্ববিরোধ, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিক্রিয়াশীলতা, তাঁর জাতীয়তার উগ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মমোহ, এই সব সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, ও অন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীর তুলনায় তাঁর জীবনবিশ্বাস সোমেনবাবুর প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু সেটা কি প্রচ্ছদপটের প্রশংসা নয়?

না, তা নয়, সোমেনবাবু ঐ সামান্য প্রশংসার মধ্যেই অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সে ব্যাপারটি নিশ্চয় তিনি ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করবেন, এবং আমি কোনো পুনরালোচনা না করে আমার স্বভাবগত অন্ধভক্তির সঙ্গে সোমেনবাবুর মুখ থেকে তা শুনে যাব।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

গতযুগের সাহিত্য ও বর্তমান পাঠক

কিছুদিন আগে জনৈকা বান্ধবীর সংগে সদ্যপ্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করছিলুম। এই প্রসংগে গত যুগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাসের কথা উঠলো। বান্ধবীটি সখেদে জানালেন যে উপন্যাসটি একদা তাঁর অতি প্রিয় ছিল—কিন্তু বর্তমানে বইটি তাঁর মনে কোন সাড়া জাগায় না।

বান্ধবীটির যুক্তি ছিল মোটামুটি এই,—আমাদের বর্তমান জীবন এতই জটিল, আমাদের দৃষ্টিভংগী ও আচরণ এতই তির্যক যে কোন সাহিত্যে বক্তব্য বিষয়টি নিতান্ত সোজাসুজিভাবে উপস্থাপিত হলে জিনিষটা খুবই অগভীর ঠেকে তাঁর কাছে। কোন সাহিত্যে অন্তে ভালোর জয় হোলো এবং মন্দের পরাজয় এটা বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আর সত্য বলে মনে করতে ইচ্ছা হয় না। এবং সর্বোপরি বর্তমান যুগের মানব মন এতই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বজড়িত যে গত যুগের ত্যের নির্দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলোকে নেহাৎ অবাস্তব বলে মনে হয়।

এ ধরণের মনোভংগীর সম্মুখীন আরো বহুবার হয়েছি। মনে হয় বর্তমানকালের

পাঠকেরা অনেকেই এই মত পোষণ করেন। তাই এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা বলা বোধহয় বাহুল্য হবে না।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে যুগভেদে পাঠকের রুচির পরিবর্তন হতে হবে, এবং সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও কোন যুগের বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীর ছাপ পড়বেই, ফলে এক যুগে যে সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে অভিনন্দিত হোল পরবর্তী যুগে তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি যুগেই এমন কিছু সংখ্যক সাহিত্য সৃষ্টি হয় যা সে যুগের স্বাক্ষর বহন করলেও চিরকালীন সত্য প্রকাশ করে। তা যদি না হোত তবে সেক্সপীয়র ব্যাস বাল্মিকীর নাম আমরা কেউ জানতাম না। কিন্তু এই চিরন্তন সত্য বিবৃত হয় তৎকালীন পটভূমিকার মাধ্যমেই। সেক্সপীয়র যে অমর চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরা তো প্রত্যেকেই তৎকালীন পটভূমিকার সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত। মহাভারতের চরিত্রগুলি কী অন্য কোন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়াতে পারে?

অর্থাৎ, কোন সাহিত্যকে উপভোগ করতে হলে সে যুগের বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদের বুঝে নিতে হবে। পাঠক বা সমালোচক কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যাবেন যে পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সাহিত্যটি প্রাণ পেয়েছে। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, এ কাজটি সহজ নয়। সুদূর অতীতে রচিত যে সব সাহিত্য সেক্ষেত্রে অসুবিধাটা তেমন প্রকট নয়। কারণ সেক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত এতই বিভিন্ন যে আমাদের অজ্ঞাতসারেও বর্তমান যুগের সংগে তার কোন তুলনা আমরা করিনে এবং বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন তুলিনে। কিন্তু নিকট অতীতে রচিত যে সাহিত্য (উনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)—সেক্ষেত্রে আমরা এতটা নিরাসক্ত থাকতে পারি না। কারণ সে যুগটা বর্তমান যুগের চেয়ে বিভিন্ন হলেও একেবারে বিভিন্ন নয় এবং আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা বর্তমান যুগের মূল্য বোধের দ্বারা গত যুগের পরিপ্রেক্ষিতকে যাচাই করে দেখি। তার ফলেই একদা যে সাহিত্য আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে নতুন আলোতে যাচাই করে নেবার পর তাকে অন্তঃসারহীন বলে মনে হয়।

এই মনোভাব স্বাভাবিক হলেও সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনের পক্ষে সহায়ক নয়। বর্তমান যুগের দৃষ্টিভংগীর মারফৎ অতীত যুগকে কখনই বোঝা যাবে না—এবং তাদের প্রকৃত মূল্যায়নও সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালে বর্তমান যুগের আলোয় অতীত সাহিত্যকে যাচাই করা ও তাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে। অবশ্য পাঠক বা সমালোচকেরা সজ্ঞানে এ কাজ করছেন তা নয়—। বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগের ছাপ আমাদের মানসে এতই গভীর যে ক্ষণকালের জন্যও তার প্রভাবকে আমরা অতিক্রম করতে পারছি না। ফলে আমাদের সাহিত্য বিচার ও রসাস্বাদন হয়ে উঠেছে একদেশদর্শী।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শরৎচন্দ্র একদা বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন—বিদগ্ধ সমালোচক মহলেও তাঁকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে ক'জন শরৎচন্দ্র পড়েন বা পড়লেও ক'জন শরৎচন্দ্রের লেখায় তেমনভাবে অভিভূত হন? এর কারণ কী এই নয় যে শরৎচন্দ্রের যুগে সাহিত্যের উপজীব্য যে সব সমস্যা তা বর্তমানকালে আর সমস্যা বলেই গণ্য হয় না? কিন্তু তাই বলে যদি বর্তমান যুগের বিদগ্ধ পাঠকেরা শরৎচন্দ্রকে অপাঠ্য বলে সরিয়ে রাখেন, তবে কী একটু অন্যায় করা হবে না? শরৎচন্দ্রের সব রচনাই কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নয়—অনেক রচনায় শিল্পগত নানা দুর্বলতা চোখে পড়বে; অনেক সময়েই মনে হবে বাঙালী চরিত্রের ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়েছেন অতিরিক্ত—তবু তাঁর কিছু রচনা, কয়েকটি চরিত্র যে সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে প্রথম শ্রেণীর তা কী অস্বীকার করা যায়?

বর্তমান যুগের মূল্যবোধ দিয়ে যাচাই করার ফলে যদি এই সত্যটি আমরা উপলব্ধি না করতে পারি তবে কী পাঠক হিসেবে আমরাই বঞ্চিত হবো না?

তাছাড়া আরো বলা যেতে পারে যে সাহিত্যে অন্তে ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় দেখা-লেই তা সৎ সাহিত্য হয়ে উঠবে এ ধারণা যেমন হাস্যকর তেমনি এ ধারণা করা ও ভুল যে অন্তে ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় দেখানোর অর্থই জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা। আবার বর্তমান যুগের জটিলতার দরুণ মানব চরিত্রের দ্বিধা দ্বন্দ্ব বেড়ে গেছে সত্যি কিন্তু গত যুগের সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলি নির্দ্বন্দ্ব বলেই অসার্থক একথাই বা বলি কী করে? আমাদের জীবনের জটিলতা বাড়ার দরুণই হয়তো বর্তমান যুগের সাহিত্যিকেরা তির্য্যক ভাষণের আশ্রয় নিয়েছেন—কিন্তু একথা কেন মানবোনা যে তির্য্যক ভাষণ বা উপস্থাপনই সৎ সাহিত্যের একমাত্র লক্ষণ নয়।

অবশ্য আমি একথা বলছিনা যে বর্তমান যুগের সাহিত্যিকেরাও সহজ সরল ও নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করবেন। বস্তুতঃ দৃষ্টি ভংগীর দিক দিয়ে আমরা আজ এমন এক জায়গায় পেঁৗছেছি যেখান থেকে স্কট বা ডিকেন্সের মতো সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মতোও নয়। কিন্তু তাই বলে ক্ষণকালের জন্যও কেন আমরা নিজেদের স্কট ডিকেন্সের জগতে নিয়ে যেতে পারবোনা যে জগতে তথাকথিত 'সেন্টিমেন্টাল' হওয়া অবাস্তব নয়।

আমাদের জাগতিক ও আত্মিক জীবন আজ নানা ভাবে বিকৃত। সাহিত্যেও এই বিকৃতির প্রতিফলন পড়েছে। কিন্তু তাই বলে কী সুধু বিকৃতি আর জটিলতাই আমাদের মনোরঞ্জন করবে? তাহলে তো একথাই মেনে নিতে হয় যে আমাদের পারিপার্শ্বিক ও সাম্প্রতিক কালকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অথচ এই ক্ষমতাই তো মনুষ্যত্বের চিহ্ন। শুধু বর্তমানের প্রতিফলনই যদি সৎ সাহিত্য হয় তবে তো প্রতিযুগের শেষে সে যুগের রচিত সব সাহিত্যকেই অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করা ভালো।

তা'ছাড়া আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। যার পরিণতি মিলনান্তক তেমন সব সাহিত্যই অগভীর অসার্থক এ কথাই বা বলি কী করে। দুঃখের মুহূর্তগুলি আমরা গভীর-ভাবে অনুভব করি তা ঠিক, কিন্তু আনন্দের মুহূর্তগুলিও (তো সে যতো স্বল্পই হোক্ না কেন) কী তেমনি গভীরভাবে অনুভব করি না? বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, দুঃখ বা বিষাদ সকল মানব চিত্তকেই দ্রবীভূত করে, এবং অতি সহজে—। প্রতি যুগের সস্তা সাহিত্যেই মেলোড্রামার ছড়াছড়ি দেখা যাবে—কিন্তু আনন্দের মুহূর্তগুলি গভীরভাবে অনুভব করা ও সেই অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করার জন্য চাই সংবেদনশীল মন। —পাঠকের ক্ষেত্রেও, সমকালীন দৃষ্টি-ভংগীকে কাটিয়ে ওঠা সহজ নয় নিশ্চয়ই—হয়তো সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু যাঁরা নেহাৎ অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্যের দ্বারস্থ হন না—সেই সব পাঠকদের নিশ্চয়ই গত যুগের সাহিত্যের প্রতি একটা দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা অন্ততঃ গত যুগের সাহিত্যের মূল্যায়নে সমকালীন দৃষ্টিভংগীর উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করবেন—এটুকু আশা করা অন্যায় হবে কী?

মীরা বালসুব্রমণিয়ন

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা : রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র

"আধুনিকতা"—ভিন্নার্থে প্রগতিশীলতা। যদিও সাহিত্যে আধুনিকতা অত্যন্ত অস্পষ্ট তথাপি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সংস্কার ও সামাজিক প্রথার প্রতিবাদ জানিয়ে নতুন জীবন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাকেই সাহিত্যের আধুনিকতা বলা যায়। সাহিত্যকে আধুনিক অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তখনই যখন কোন অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের প্রকাশে পূর্ববর্তী যুগ থেকে পৃথক, সামাজিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে সেই সৃষ্টি বিপ্লবকারী হয়, যদি নবদিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটক হয়ে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক যুগের চলিত সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যিক পদ্ধতি, প্রকরণকে অতিক্রম করেছে, এবং সে যুগের মানদণ্ডে সে সাহিত্য যথেষ্ট প্রগতিশীল। প্রাচীন সাহিত্যেও আধুনিকতা আছে, বর্তমানের কালগত দূরত্বে তাকে অনাধুনিক বলা চলে না। প্রগতিশীলতার একটা 'ষ্ট্যান্ড পয়েন্ট' আছে, সেই 'পয়েন্ট' পার হলে তা প্রাক্তন হতে পারে, কিন্তু অনাধুনিক বলা যায় না। একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্বাভাবিক, মানব-চিন্তা চলিষ্ণু সেই চলার পথে বর্তমানকে মাড়িয়েই ভবিষ্যতের পদসঞ্চার, কিন্তু যা ফেলে এলাম তারও ছিল একদিন অভিনবত্বের অহংকার। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতা কী, তা'হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকারে তদ্গতভাবে দেখা।......আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"

ধর্ম ও আধিভৌমিকতা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা হলেও তাতে জীবনরস বর্তমান। বাঙালীর জীবনের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার দায় ও ঋদ্ধিলাভের অভীপ্সা মিলিয়ে বাঙলার সাহিত্য। চর্যাপদের পরে যে কাব্যখানি প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত হয়েছে তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। —অশ্লীলতার বিতর্কে না গিয়েও এর কাব্যমূল্য সহজস্বীকার্য। এর রাধা ও কৃষ্ণের লীলা, বড়াই-এর দূতীয়ালী ওই শতকের সমাজের রূপমোচন করেছে—এই নিকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নরনারীর সহজাত প্রেম-বৃত্তির কাহিনীই কৃষ্ণকীর্তনের উপজীব্য। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে' বৈষ্ণব পদাবলী কিনা এ প্রশ্ন আমাদের চিরদিনের। এখানেও শ্রীরাধার প্রেমের তীব্রতা ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে সর্বত্র সমানভাবে বস্তুনিষ্ঠা ও জীবন বাস্তবতার প্রকাশ হয়নি ঠিকই, কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এই জীবন-রস-রসিকতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। "মনসা" গ্রাম্য দেবতা, কিন্তু তাকে অবলম্বন করেই যে আধুনিকতা যে প্রতিবাদ, জীবনসত্যের যে সোচ্চার ঘোষণা হয়েছে তা পূর্ববর্তী কোন কাব্যেই লক্ষিত হয় নাই। এর মধ্যে বাঙালীর জীবনস্পন্দন—ঐহিক সুখ স্বর্গ নয়, ইহলৌকিক সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে চাঁদসদাগরের বলিষ্ঠ কণ্ঠে। অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জীবনসত্যের সম্মানরক্ষায়, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠায় বিরাট পুরুষকার চাঁদ সদাগরের জীবনের নতুন মূল্যায়ন। মঙ্গল কাব্যগুলি গভীরতর জীবন প্রেরণার ছবি। কিন্তু তবু আমরা উপরোক্ত কাব্যগুলিকে আধুনিক সাহিত্য বা কাব্যকারদের আধুনিক-মনা বলে সমাদর করি না। তবে কি আমরা আমাদের নির্ধারিত সংজ্ঞাকে অস্বীকার করছি। পূর্বে উল্লেখিত সংজ্ঞানুসারে সাহিত্যে আধুনিকতার সীমা আরো প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। সেজন্য বিশিষ্ট চিন্তাশীল লেখক বি· জি· ফ্রেজার তাঁর 'মর্ডানিটি ইন্ লিটারেচর' পুস্তকে

বলেছেন সাহিত্যে একটা বিশেষ যুগপ্রবৃত্তিই আধুনিকতার পরিচয়। এরূপ ব্যাপকার্থে আধুনিকতা ইংরাজী সাহিত্যে এসেছে ১৮শ শতকের শেষ দিকে, রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপভাবে কোন একটা সময়কে আধুনিকতার সৃষ্টিকাল হিসাবে ধরা যেতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যে যেমন আধুনিকতার প্রারম্ভ সীমা হিসাবে ধরা হয়েছে ১৮৯০ সাল, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি ঊনিশ শতকীয় বুদ্ধিজীবী মানসের নবজাগরণের প্রারম্ভ সীমা হিসাবে ১৮ শতকের শেষ পর্বকে ধরা যেতে পারে।

এই ১৮শ শতকের বাঙলা সাহিত্য দু'জন কবিকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। একজন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অপরজন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। বাঙালী স্বভাবতঃ আত্মবিস্মৃত জাতি, কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁর গানে গানে আজো সুররসিক বাঙালী প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এবং রায়গুণাকর তাঁর তীক্ষ্ম দীপ্ত প্রবচনে আজো প্রাণবন্ত। যে প্রতিবাদ, বাস্তব সচেতনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে, আঠারো শতকের উল্লেখিত কবিদ্বয়ের মধ্যে তার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। আজকের সাহিত্য আসরে ভারতচন্দ্রকে আধুনিকতার পুরোধা বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু ঠিক সমসাময়িক, সমবাস্তবসচেতনশীল, জীবনবিশ্বাসী রামপ্রসাদ এই বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে কেন বঞ্চিত? রামপ্রসাদের গানে বাংলা পল্লীদুহিতার করুণ বিবাহিত জীবন, বঙ্গপুরুষের আলস্য ও ঔদাসীন্য, বঙ্গজননীর নিরুপায় নয়নধারা গীত হয়েছে. রামপ্রসাদী গানে জীবন-রস-রসিকতা অত্যন্ত গভীরভাবে বিধৃত হয়েছে। সমাজ মানস বা সমাজনির্ভর ব্যক্তিচেতনা থেকে তাঁর গানের উৎসার। রামপ্রসাদ যখন তীব্রকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন "অন্ন দে, অন্ন দে, অন্নপূর্ণা" তখন তো সেই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, ক্ষুধার্ত বাঙালী জীবনই অন্তর্দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বার্থসচেতনার উল্লেখ পাই প্রসাদী সংগীতে। "আমায় আর কত ঘুরাবি মা চোখবাঁধা কলুর বলদের মত" তারপর 'মামলা-মোকদ্দমা' 'তবিলদারী' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন সমাজে কত সংকীর্ণতা এসে গেছে। স্বার্থপরতার ঘৃণ্য নিদর্শনের প্রতীক ওই সকল শব্দ। অর্থাৎ সমাজে যেমন একটা পরিবর্তন এসেছে, গানে কাব্যে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার প্রয়াসও শুরু হয়েছে। কিন্তু তবু ভারতচন্দ্র তাঁর লিপিচাতুর্যে, বচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে বাঙালী অন্তরে প্রভূততম প্রভাব বিস্তার করলেন। ভারতচন্দ্র যে শুধুমাত্র বাইরের ভঙ্গিতেই সাফল্য লাভ করলেন তা নয়—ভারতচন্দ্র সুতীব্র কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সর্ব প্রকারের অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। ভারতচন্দ্রের শ্লেষের চাবুকে সমাজ বিধ্বস্ত হল। পাপাচার কুসংস্কার, ব্যর্থতা-বেদনা রামপ্রসাদও গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, "মা করালী কালী"র চরণে সকল ক্ষুব্ধতা নিবেদন করেছেন এবং পরম প্রশান্তি লাভ করেছেন। রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি গৃহী অথচ ত্যাগী, তিনি ভোগী অথচ যোগী। তাই রামপ্রসাদের শাক্তপদে হতাশ অন্তরের আত্মনিবেদন আর ভারতচন্দ্রের কলসে জীবনবিশ্বাসী শক্তিমানের বিদ্রোহ, এই বিদ্রোহী ভাবই ভারতচন্দ্রকে আধুনিকতার সূচক নির্দেশ করেছে। ১৮শ শতকে রামাগণের মুখ দিয়ে পতিনিন্দা করানো কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় আজ বিংশ শতকের উত্তর পঞ্চাশ বিজ্ঞানী মনে তা কষ্ট কল্পনামাত্র। ভাষা ও ছন্দের বিস্ময়কর কৌশলে, জীবনের প্রতি বেদনাহত তিক্ত তির্যক দৃষ্টি ব্যঙ্গাত্মকভাবে ও দেহসমুদ্র মন্থনজাত বিষামৃত পরিবেশনে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। ভারতচন্দ্র নাগরিক এবং সামন্ত দরবারী পরিবেশে পরিপুষ্ট। সেই উচ্চস্তরের জীবনাসন থেকে নির্বিকার, নির্লিপ্ত নয়নে সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই জীবনের চলমানতার প্রবাহে যে অন্তঃসার শূন্যতা তিনি দু'চোখভরে দেখেছিলেন, তাকেই অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর কুশলী বিদ্রূপদৃষ্টি, তীক্ষ্ম মন্তব্য, পাণ্ডিত্য,

সংস্কারবন্ধ জীবনের উপর সুচতুর শরাঘাত বিদগ্ধ জীবনের তৃপ্তির আস্বাদন আনল, বুদ্ধি, জীবীর বুদ্ধির পরিতৃপ্তি দিল। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে বক্তব্যের মধ্যে বুদ্ধির ধার এলো, মননশীলতার প্রকাশ ঘটলো। অলঙ্কার ঐশ্বর্যে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হ'লো।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সমসাময়িক হলেও তাঁদের সাহিত্য মানসের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বাঙলার প্রাকৃত লোকায়ত জীবনের বেদনা, বিদ্বেষ, দুঃখ, দারিদ্র্যকে প্রসাদী সুর সিক্ত করেছে আর ভারতচন্দ্রে প্রকাশ পেয়েছে বিদগ্ধ, বুদ্ধিজীবী, ঐশ্বর্য অলঙ্কার সমৃদ্ধ ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রিয়, তীক্ষ্ণ কলাদীপ্তিময় নাগর জীবনের রূপ। ভারতচন্দ্রের পদ্মিনী নারী চরিত্র একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটির মাধ্যমে ভারতচন্দ্র তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ধিক্কার রেখে গেছেন। যে নারী স্বাভাবিক, সুস্থ সমাজ জীবন পেলো না, তাকেই সমাজপতিরা ইঙ্গিতময় বিদ্রূপ বর্ষণ করে গেল—সমাজের ক্লেদাক্ত পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় এই অংশে বিবৃত।

ভারতচন্দ্র ঐহিক সুখকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন। জীবন্ত প্রয়োজনকে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপে ঢেকে রাখার তিনি বিরোধী। জীবনের ভোগমুখীনতা ভারতচন্দ্রের দুঃসাহসিকতার পরিচয়বাহী, এ ভোগমুখীনতা বৈষ্ণব কাব্যে থাকলেও তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই ইন্দ্রিয়লিপ্সা, দেহলালসা থেকে যদি মনে করি ভারতচন্দ্র নাস্তিক তবে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। তিনি ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু ধর্মভীরু নন। যে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতায় ১৮ শতকের জীবনযাত্রা ক্লেদাক্ত পঙ্গুতায় পর্যবসিত হয়েছিল তারই প্রতিবাদ করে ভারতচন্দ্র যে দেবচরিত্র চিত্রিত করলেন তা সাটায়ার-এর তুলিকায় আঁকা। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সেকালের ব্যাভিচার, বিবর্ণতাকে অতিরঞ্জনের তুলিতে অঙ্কিত করেছেন, এই অতিরঞ্জন সাহিত্যক্ষেত্রে আবশ্যক। "দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক।" সাহিত্যে অতিরঞ্জন যে প্রয়োজন এই আধুনিক স্বীকৃত সংজ্ঞাকে মনে হয় ভারতচন্দ্রই প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রূপ দিয়েছেন।

আধুনিক বাংলার জন্ম ১৭৫৭ সালের পলাশীর আম্রকাননে। ১৭৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের আদি আধুনিক কবির মহাপ্রয়াণ। ভারতচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও যুক্তির সংস্পর্শে না এলেও তিনি পশ্চিমী মানুষকে দেখেছিলেন। এবং সেই খৃষ্টধর্মবিশ্বাসী, বিজ্ঞান সভ্যতার পতাকাবাহী মানব অবয়ব তাঁকে অভিভূত করেছিল, তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছিল। এই বিস্ময়জাত মুগ্ধতার প্রভাব তাঁর কাব্যে একটা সনাতন শৃঙ্খলভঙ্গের সুর এনেছিল এ কথা মনে করাও খুব অহেতুক হবে না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্রোহের ভাব, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং তার্কিকতা দেখা দিল। সেজনাই এককালীন হয়েও, জীবন সচেতনশীল হয়েও রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে শেষোক্তের ভালেই প্রগতিশীলতার জয়তিলক অঙ্কিত হলো, ভারতচন্দ্রই আধুনিকতার অগ্রদূত রূপে সমাদৃত হলেন।

ভারতী সরকার

আমাদের সামাজিকতা

মানুষ সমাজবদ্ধজীব, একথা সর্বজনবিদিত সত্য। সমাজে থাকার দরুণ কতকগুলো রীতি-নীতি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় তাদের। দেশভেদে ও সমাজভেদে এগুলির পরিবর্তন ঘটে বটে কিন্তু মূলতঃ সে পরিবর্তন বাহ্যতঃ ঘটতে দেখা যায়, আমাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় তার স্পর্শ কদাচিতই। কখনো কখনো অবশ্য এই বহিরঙ্গের এমন আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় যে, সংগে সংগে অন্তর্নিহিত সত্যেরও পরিবর্তন হয়েছে বলে সাধারণের মনে একটা বিভ্রান্তি দেখা যায়। পৃথিবীর বহুবিখ্যাত ঘটনার অনুধাবনে এ তথ্য পরিস্কার হবে বলা চলে। ফরাসী বিপ্লবের কথাই ধরা যাক। এ বিপ্লবের সূত্রপাতে 'লিবার্টি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি'র ধ্বজা উচ্চে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃই এ তিনটি বাণী নিতান্তই মৌখিক হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত তাই সম্ভব হয় নেপোলিয়ঁর উদ্ভব। এবং তদবধি ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা যে প্রায় চিরন্তন হয়ে রইল তার পেছনেও ঐ বিপরীত মনোভাব একনায়কত্বের প্রতি ঝোঁকই কাজ করছে একথা বোধ হয় বলা চলে। কাজেই সামাজিক রীতিনীতির বহিরঙ্গের পরিবর্তনই যে, সম্পূর্ণ ও মৌল পরিবর্তন নয় এমন কথাও অনস্বীকার্য।

তবে কখনই যে মৌল পরিবর্তন ঘটেনা এমন কথা জোর করে বলা চলে না। যখন অন্য দেশাগত নতুন কোন সভ্যতার সংগে দেশজ সভ্যতার প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং দেশজ সভ্যতাকে বহিরাগত অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সভ্যতার কাছে হার মানতে হয় তখনই সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। অতীতকালে দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতার আধিপত্যে এ তথ্যেরই প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু এমন পরিষ্কার দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেখানো সম্ভব নয় কারণ এক সভ্যতার সংগে প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন অন্য এক সভ্যতার সংঘর্ষই সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় আর সেক্ষেত্রে সমাজ মানসে একটা দোটানার সৃষ্টি হয়। আজকে আমাদের সমাজে সেই দোটানার ভাবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দোটানার সমাপ্তি হবে বা আদৌ হবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে এর ফল যে সমাজের দিক থেকে খুব প্রীতিপ্রদ হচ্ছেনা, তার প্রমাণ আমরা সকলেই পাচ্ছি।

আগেকার সামাজিক উৎসবের সামাজিকতাটাই ছিল মুখ্য। কোন এক বাড়িতে কাজ হলে তাদের বাড়ির সংগে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাতো বটেই এমন কি প্রতিবেশীরা পর্যন্ত সে কাজের সমস্ত দায়-আদায় নিজেদের কাঁধে নিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করত না। একের কাজ সেখানে সকলের কাজ বলেই বিবেচিত হত। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য এইভাব অধিক প্রকট ছিল। গ্রামের বর্ধিষ্ণু বাড়িতে কোন সামাজিক উৎসব কালে কোন বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ত না। জমিদার বাড়ির বিয়ের আগে পরে পাঁচ-সাতদিন দরিদ্র প্রজারা পেট ভরে খেয়ে বাঁচত (প্রসংগতঃ বলে রাখি অল্প কিছুদিন আগে গ্রামাঞ্চলে এক বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথির প্রায় সমসংখ্যক রবাহূত অতিথিকে পরিতোষ সহকারে আহার্য গ্রহণ করতে দেখেছি এবং শুনলাম প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কোননাকোন বাড়ির উৎসবে এঘটনা নিয়মিত ও নিত্য প্রচলিত রীতি)।

নগর প্রসারের সংগে সংগে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটতে লাগল ফলে সামাজিকতায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিল। স্বাভাবিক কারণেই আমন্ত্রিতের সংখ্যা আমন্ত্রণকর্তার আর্থিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তবে প্রথম অবস্থায় পাড়ার

সকলকেই নিমন্ত্রণ করা ছিল সাধারণ রীতি। এই সময়ে নিমন্ত্রণকর্তার সামর্থ অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থা হত। সাধারণ্যে আহারের নিমন্ত্রণকে বলা হত ফলার। ফলার ছিল দু ধরণের কাঁচা ও পাকা। ফলারে চিঁড়া, মুড়ি, গুড়, কলা ইত্যাদি দেওয়া হত আর পাকা ফলারে লুচি, তরকারী ইত্যাদি রাঁধা জিনিস। আবার উপকরণের আধিক্য বা স্বল্পতা অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ধরণের ফলারের কথা বলে হয়েছে। এই সব ফলারের লক্ষণ নিয়ে প্রচলিত ছড়াও দেখা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ জাতিভেদাদির শৈথিল্যবশতঃ পাকা ফলারের প্রচলনই প্রসারিত হল। সাধারণ গৃহস্থ ও ধনীগৃহে উপকরণের তারতম্য কেবল অর্থসংগতির দ্যোতক হয়ে উঠল অর্থাৎ মূলগত বিশেষ কোন প্রভেদ রইল না। ফলে সামর্থের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ল, সম্মান বাঁচাতে ক্ষমতারিক্ত খরচ নিয়মে পর্যবসিত হল। অবশ্য ইদানীং কালে বিশেষতঃ দক্ষিণ কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে এনিয়ম পালটানোর একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা চলছে। তবে তা দেশজ-রীতি অনুসারী না হয়ে সম্পূর্ণ পশ্চিমী রিসেপশানের দেশী সংস্করণ রয়ে উঠেছে। তাই তা দেশবাসীর নিন্দারই কারণ হয়ে পড়ছে। আর্থিক সামর্থের বিচারে কিন্তু এ পরিবর্তন আসছেনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমর্থরাই এই নতুন রীতি প্রচলনের উদ্যোক্তা। আমাদের মনে হয়, দেশজ রীতি অনুসারী একটা মধ্যপন্থা আবিস্কার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কারণে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং সমাজ নায়কদের এ বিষয়ে অবহিত হয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

সামাজিকতার দুটি দিক—এক নিমন্ত্রণকর্তার দিক, যে দিক নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করা হল আর নিমন্ত্রিত অতিথির দিক। অতিথি শব্দটির আগে নিমন্ত্রিত বিশে-ষণের ব্যবহার অবশ্য ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে বলে, গৃহাগত আহূত, অনাহূত বা রবাহূত ব্যক্তি মাত্রেই অতিথি এবং যেহেতু অতিথি মাত্রেই নারায়ণ সুতরাং তাদের সকলের তুষ্টিসাধন গৃহকর্তার পবিত্র কর্তব্য। প্রতিদানে অতিথির তরফ থেকে কোন কিছু করার দায়িত্ব ছিল না কারণ অতিথি সেবার ফল চিত্রগুপ্তের খাতার জমার ঘরে বেশ মোটারকম দাগ ফেলবে এই ছিল ধারণা। যে কাজে পারলৌকিক উন্নতি সুনিশ্চিত তার দরুণ লৌকিক মূল্যে বা উপহার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর মনে করা হত। বিশেষ সামাজিক উৎসবে গুরুজনস্থানীয়রা আশীর্বাদীস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করতেন, বন্ধুস্থানীয়রা আনন্দ ও প্রীতি উপহার হাজির করতেন আর আত্মীয়রা দিতেন লৌকিকতা। অবশ্য এর কোনটাই বাধ্যতামূলক ছিল না। মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এজিনিসটি গণ্য করা হত। কিন্তু কালক্রমে নিম-ন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণকর্তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার দ্যোতকস্বরূপ উপহারকে গ্রহণ করা হতে লাগল। এর পেছনে কিছুটা পশ্চিমী মনোভাব সক্রিয় ছিল না এমন কথা জোর করে বলা চলে না। ইউরোপ আমেরিকার, বিশেষতঃ অগ্রসর দেশগুলিতে বিবাহের পর মা-বাবার সংগে একত্র থাকার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। ফলে বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে বর কনের বন্ধু-বান্ধবদের সাংসারিক প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যাদি উপহার দেওয়ার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। এই 'পাওয়ার' প্রথার প্রভাব আমাদের দেশের ওপর যে পড়েনি তা বলা যায় না বোধ হয়।

কারণ যাই হক আজকের দিনে নিতান্ত শিশুকে আমন্ত্রণ জানালেও তাকে কিছু না কিছু উপহার দিতে হবে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও সামাজিক অপচয় হচ্ছে তা সমাজনেতাদের দুশ্চিন্তার খোরাকই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকে ভারতের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প যখন অর্থাভাবে ব্যাহত হচ্ছে তখন এভাবে অপচয় ঘটানো অত্যান্ত অন্যায় তা ভাববার সময় এসেছে বলেই মনে করি।

এসম্বন্ধে কিছু কিছু চিন্তা যে হচ্ছেনা তা বললে অন্যায় হবে। কিছুদিন আগে এক সামাজিক উৎসবের আমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রণকর্তা উপহার প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তা বহুজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু অমন এক আধটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে সার্থক আন্দোলনের রূপ দেবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। অথচ তা না হওয়া পর্যন্ত একটা সুষ্ঠু মধ্যপন্থা নির্ণয় কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকের দিনে সামাজিক সামাজিক উৎসবের পশ্চাৎপট যে আমূল পালটেছে এ কথাও অনস্বীকার্য। সামাজিক উৎসবের সামাজিক অবস্থাটা আজকে গৌ, উৎসবটাই প্রধান, কাজেই সে অবস্থায় সামাজিক লৌকিকতার দাবীটা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসাটা শুধু অসমীচিন নয় অন্যায়ও বটে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু যেখানে বন্ধুর বিবাহ উৎসবে উপস্থিত না হওয়ার কৈফিয়ৎ খাড়া করে, 'কি করব ভাই উপযুক্ত উপহার কিনতে পারলাম না বলে আসতে পারিনি।' তখন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা পীড়নের রূপ নেয়না কি ? স্বতোচ্চারিত আনন্দ বা উপযুক্ত সহানুভূতি যেখানে আশা করা হয় সেখানে নীরস লৌকিকতা মুখ্য হওয়া অনুচিত এধারণা সর্বজনসমক্ষে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের সামাজিকতা তার স্বাভাবিক কল্যাণময় রূপ ফিরে পাবে।

রবি মিত্র

মহাকবি চসার

পঁচশো বছর আগে ইংলণ্ডের মাটিতে জন্মেছিলেন মহাকবি চসার। সেই সুন্দর প্রভাতে বর্ণচ্ছটা সূর্য্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হল ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা। চসার আবির্ভূত হলেন। আধুনিকতার স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে এলেন। সৃষ্টি করলেন আধুনিক কবিতা। প্রসার করলেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের। একথা সত্য যে ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। তাই ইংরেজী সাহিত্যের উন্নতির পথে একদিকে যেমন এসেছে প্রচণ্ড সংঘাত আবার অপর দিকে ঘটছে সমন্বয়। এ্যাংলো সেকসান যুগের পর ১০৬৬ সালে নর্মানেরা হেষ্টিংসের যুদ্ধে ইংরেজদের হারিয়ে রাজ্য দখল করল। নর্মানদের মাতৃভাষা ফরাসী কাজেই এই ফরাসী ভাষা দুশো বছর ধরে ইংরেজী ভাষাকে পদানত করে রাখল। দেশের সকল কাজে ও সর্বত্রই ছিল ফরাসী ভাষার প্রচলন, ইংরেজী ভাষা পরাধীন জাতির ভাষা, নিম্নস্তর লোকের ভাষা বলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হতে এই ভাষাকে নির্বাসন দিয়ে সগৌরবে ফরাসী ভাষাকে প্রচার করা হতে লাগল। ফরাসী ভাষার চাপে এমনই অবস্থা হয়েছিল যে অনেকেই মনে করেছিলেন যে এবার বোধ হয় ইংরেজী ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে হঠাৎ পটভূমিকার পরিবর্তন হল। ইংরেজ ও নর্মান পরস্পরের সহিত মিশে গেল এবং নর্মানেরা ইংলণ্ডকেই নিজ জন্মভূমি বলে স্বীকার করে নিল, এই পরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এক নূতন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হল। রক্ত ও ধর্ম এক থাকার জন্য এদের মিলন খুব সহজেই ঘটে গেল। দুটো বছর পরে আবার ইংরেজী ভাষা মাথা তুলে দাঁড়াল এবং দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজী ভাষার কাছে পরাজয় বরণ করে ফরাসী ভাষা দেশ থেকে বিলীন হয়ে গেল।

নর্মান বিজয়ের অনেক পরে চৌদ্দ শতকে ইংলণ্ডে এক নূতন মিশ্র ভাষা জন্ম গ্রহণ করে। তাকে সাহিত্যে রূপ দেন মহাকবি চসার। চসারকে আধুনিক ইংরেজী কবিতার জন্মদাতা বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের লোক কিন্তু তিনি চিন্তা জগতে প্রথম মধ্যযুগের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে পা দেন। তাঁর লেখায় মধ্যযুগ ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক চিহ্ন দেখাতে পাওয়া যায়। তিনি ফরাসী ও ইটালী লেখকদের অনুসরণ করতেন। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি বহু বিষয়ে অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'ক্যানটানবেরি টেলস' বইখানি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। এই বইয়ে তিনি উচ্চশ্রেণীর রসিকতা ও তৎকালীন সমাজের অব্যবস্থার কথা লিখে গেছেন। বইখানির মুখবন্ধে চসার বর্ণনা করেছেন ঃ—ইংলণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের প্রতিনিধি বত্রিশজন লোক তীর্থযাত্রী হয়ে ক্যানটানবেরির পবিত্র পীঠ দর্শনে যাচ্ছেন। এক হোটেলে সকলে সমবেত হয়েছেন। হোটেলের মালিকও এই তীর্থযাত্রীর দলে ভিড়েছেন। যাত্রার পূর্বে সর্ত হয়েছে যে, প্রত্যেকে যাবার ও ফিরবার পথে দুটি গল্প বলে যাত্রীদের পথ ক্লেশ অপনোদন ও মনোরঞ্জন করবেন, যার গল্প সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাঁকে অপর সকলে সেই হোটেলে এক ভোজে সম্বর্ধিত করবেন। সেই উপলক্ষ্যে এই কিঞ্চিদধিক ত্রিশজন যাত্রীর পোশাক পরিচ্ছদ ভাবভংগী-চরিত্র ও ব্যবহারগত পার্থক্যের কি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের সমাজ যেন জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয়ে তার অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়িয়েছে। এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে চসার যে রসিকতাপূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন তা মধ্যযুগে দুর্লভ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধির আকৃতি ও প্রকৃতির যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা সূক্ষ্মদর্শিতায় অতুলনীয় বিশেষতঃ ধর্ম-যাজক সম্প্রদায়ের চরিত্রে যে সব অসংগতি ও দুর্বলতা আছে তার প্রতি তিনি প্রগাঢ় স্নেহমণ্ডিত বিদ্রূপ কটাক্ষ করেছেন। যার সরস কৌতুকপ্রিয়তা আধুনিক যুগেও উপভোগ্য। এই সরল ও সূক্ষ্ম বিদ্রূপশীলতা, যুগোচিত সংস্কারকে অতিক্রম করে স্বাধীন চিন্তার পরিচয়, সমাজ সমালোচনার আশ্চর্য শক্তি এ সমস্তই তাঁর আধুনিকতার নিদর্শন। চসার ইংরাজী সাহিত্যের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে একে ইউরোপীয় ভাবধারার সংগে যুক্ত করেছেন; তিনি মধ্যযুগের কুসংস্কার ও অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ভেদ করে তার মধ্যে লঘু রসিকতায় নির্ঝর বইয়েছেন ও নতুন ইংরাজী ভাষার সাহিত্যে গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ইংরাজী সাহিত্যকে এক সম্মানিত আসন দান করেছেন।

চসার অভিজাত বংশের লোকদের সংগে বেশী মেলামেশা করতেন। রাজ দরবারে তাঁর ছিল যথেষ্ট খ্যাতি। এরজন্য অনেকে তাঁকে বড়লোক ঘেঁসা বলতেন কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে তখনকার সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী যে কোন কবি বা সাহিত্যিক রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেয়েছেন প্রচুর সহযোগিতা। তাই কোন কোন কবি বা সাহিত্যিক ঐ শ্রেণীর লোকদের সংগে মিশতেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চসার সম্বন্ধে বলেছেন : চসার গরীবদের কথা ভাবতেন কম, মধ্যবিত্ত বণিক ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে তিনি দেখতেন যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত কিন্তু প্রধানতঃ অভিজাত—সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। বিশেষতঃ তাঁর পরিহাস রসিকের মনোবৃত্তি ছিল—অসংগতি বিশ্লেষণের দ্বারা হাস্যরস যোগানই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। জীবনের গভীর বেদনা, রিক্ত বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধাক্লিষ্ট অত্যাচারিতদের অন্তঃরুদ্ধ ক্ষোভ, বিধাতার বিরুদ্ধে অভিমান ও বিদ্রোহ—এই সমস্ত কঠিন সমস্যার ধার ঘেঁসে তিনি যান নি। অথচ ইংলণ্ডে সেই সময় ভীষণ সামাজিক বিশৃংখলা ও বর্বরতা চলছিল।

দারিদ্র ও দুঃখকষ্ট চরম সীমায় পেঁাছে ছিল কিন্তু চসারের রচনায় তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের দুঃখ ও বেদনা তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। তিনি যা লিখেছেন বড়লোকদের নিয়ে।

মোটের উপর পুরাতন ও নূতনের মাঝে দাঁড়িয়ে চসার ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন বলে আজ সমগ্র বিশ্বে যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের এত ব্যাপ্তি তাঁর মূলে মহাকবি চসারের অবদান অনেকখানি—এ কথা অনস্বীকার্য। মধ্যযুগে যদি চসারের আবির্ভাব না হত তবে হয়ত ইংরাজী সাহিত্যে অনেক বিকৃতরূপ আমরা দেখতে পেতাম কারণ চসার মারা যাওয়ার পর প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। এই দেড়শো বছর ইংরাজী সাহিত্য চসারের প্রেরণা নিয়ে বেঁচে ছিল। এই দেড়শো বছর ইংরাজী সাহিত্যকে এক অবসাদের যুগ বলা হয়।

সঞ্জীবকুমার বসু

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়।। ক্ষুদিরাম দাস। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য—দশ টাকা।

কবিপ্রতিভা নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা। লোকজীবনের নিয়ত চালনার পশ্চাতে যে নিয়ম-নীতি বিরাজ করে, কবি-প্রতিভার বিকাশে সেই নিয়ম-নীতি হীনশক্তি। জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে এই প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। অথচ জীবনে এই প্রতিভার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। তাকে কোনো-একটা-উপায়ে ধরা-ছোঁয়ার গন্ডীতে আনতে না পারলে স্বস্তি কোথায়! সেই জন্য কবি-প্রতিভাকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টারও অন্ত নাই। 'কিমিদম্'—এ প্রশ্ন ব্যাকুল করেছে রসপ্রমাতাকে। তাই দেখি, দেশে দেশে যুগে যুগে কাব্যসৃষ্টির সংগে সংগে চলেছে কাব্য-জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিরাট স্বরূপের উদ্ঘাটনের প্রয়াসের উৎসও সেই একই মনোভাব। যদিও রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে, কবিতা বুঝবার জিনিষ নয়—সে হলো হৃদয়ে বাজবার; তবু তাকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করবার প্রয়াস তো থামে না। তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়কে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চলেছে এবং চল্‌বেও। রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রে কবির বহুজ্ঞাত জীবনী যেমন একটা মস্ত সুবিধা তেমনি আবার মস্তবড়ো বাধা-ও। কারণ, এই বিরাট পুরুষের বহির্জীবনের কর্মোদ্যম ও ঘটনাবলী উত্তুংগ গিরিশৃংগের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলে, কবির সৃষ্টি-আস্বাদে এই ব্যক্তি-জীবন ওতপ্রোত হয়ে মিশে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন—"বাহির হইতে দেখো না এমন করে। আমায় দেখো না বাহিরে।" তাঁর কঠিনসত্তার এই অনন্যপরতন্ত্র রূপটিকে বাইরের ঘটনায় আচ্ছন্ন ও আবিল করে না তুলবার জন্য স্বয়ং কবির সেই সাবধান বাণীটিকে শিরোধার্য করে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস রচনা করেছেন সমালোচ্য "রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়" নামক সুলিখিত গ্রন্থখানি। গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যে যে ব্যাপক প্রত্যাশা-পূরণের প্রতিশ্রুতি আছে, বিষয়বস্তুর বিচারে সেটা অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তিজনক এবং গ্রন্থকার সে বিষয়ে নিজেও সচেতন। এ বিষয়ে তাঁর কৈফিয়ৎ : "বইটির নাম 'রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার ঐক্যসূত্র নির্ণয় ও তৎসূত্রে কাব্যের বিচার' হলে অনেকটা যথাযথ হত। কারণ, ঐ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে তাবৎ কবিতা গদ্যে বিশ্লেষণ করার জন্য নয়। কিন্তু নাম দীর্ঘ হলে পরিচিতির পক্ষে অসুবিধাজনক হয় বলে সংক্ষেপ অবলম্বন করতে হয়েছে।' যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন তার নির্দেশও তিনি গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকেই—'সেই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে'—আপন সৃষ্টি সম্পর্কে কবির এই উক্তিই লেখকের দিগ্‌দর্শক।

এখন দেখা যাক, গ্রন্থকার কীভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রন্থটির বিষয়সূচী নিম্নরূপ ঃ—(এক) প্রস্তাবনা; (দুই) অপ্রকাশের কাল ঃ বনফুল থেকে কড়ি ও কোমল; (তিন) প্রতিভার উন্মেষ ঃ মানসী ও সোনার তরী; (চার) প্রতিভার বিকাশ, প্রথম পর্যায় ঃ চিত্রা; (পাঁচ) প্রতিভার বিকাশ, দ্বিতীয় পর্যায় ঃ চৈতালি থেকে নৈবেদ্য; (ছয়) প্রতিভার বিকাশ, তৃতীয় পর্যায়,—অরূপানুভবের প্রারম্ভ ঃ নৈবেদ্য থেকে শারদোৎসব; (সাত) প্রতিভার বিকাশ, চতুর্থ পর্যায়—অরূপানুভবের পূর্ণরূপ ঃ গীতাঞ্জলি থেকে গীতালি;

(আট) প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয় ঃ গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবী-মহুয়া-মুক্তধারা-রক্তকরবী; এবং (নয়) গোধূলি-পর্যায় ঃ পরিশেষ থেকে শেষ লেখা।

প্রস্তাবনায় লেখক এই গ্রন্থরচনায় পশ্চাদ্‌বর্তী পরিকল্পনাটিকে ব্যক্ত করেছেন। জীবন তথা প্রকৃতি হতে অরূপ-চেতনায় উত্তরণ এবং পুনরায় অরূপ হতে জীবনে অবতরণ তথা জীবন-অরূপ সমন্বয়—রবীন্দ্র-কাব্যে লেখক এই সীমা-অসীমের লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রচলিত কোনো শাস্ত্রীয় তত্ত্বাদর্শে নয়—আপন গভীর উপলব্ধির আলোকে লব্ধ কবির বিশিষ্ট ঈশ্বর-চেতনাকে লেখক অরূপ-চেতনা নামে অভিহিত করেছেন। আর এই অরূপকে কবি অপরোক্ষ করছেন বিশ্বের বিচিত্র রূপের মধ্যেই—তাই তো কবি একের চরণে বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি সঁপে দিয়েছেন।

প্রস্তাবনায় লেখকের বক্তব্য থেকে প্রাসংগিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক্ ঃ 'কেবল মর্তপ্রীতি নয়, মর্তজীবনানুরাগের সংগে অনিবার্যভাবে অরূপানুরাগ এবং পরিশেষে জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণতা।' আরও বলছেন, 'জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্য-বিশিষ্ট, কোনো জীবন-বিশ্লেষণে বা ব্যক্তিমানসের অতি সাধারণ অভিলাষাদির বর্ণনাতে নয়, কামনাময় স্বার্থময় জীবনের পূর্ণতার বাণীতে তো নয়ই।' অরূপের স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখকের মন্তব্য : কবির অরূপ-উপলব্ধি তাঁর প্রকৃতিভাবুকতা বা প্রকৃতি-সৌন্দর্যবিহ্বলতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।' অন্যত্র, 'কবির অরূপ বা অসীম বা এক প্রকৃতির লীলার মাধ্যমে রসরূপে কবির অন্তরে প্রবেশ করেছেন, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো আইডিয়া বা তত্ত্বরূপে নয়।' কবির উপলব্ধির এই রস-রূপতার উপর জোর দিয়ে লেখকের সিদ্ধান্ত ঃ রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র ঋষি অথবা দার্শনিক যে-রূপেই বিস্ময়বিমুগ্ধ পাঠকের নিকট প্রতিভাত হোন্ না কেন, তাঁর **কবি-স্বভাবের** দিক দিয়ে বিবেচনা না করলে তাঁর কাব্যের সর্বসংস্কারমুক্ত যথার্থ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।'

প্রস্তাবনা-অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি অনুধাবন করলেই এই গ্রন্থটির মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এর পর আটটি পরিচ্ছেদে অধ্যাপক দাস একাগ্রমুখী নিষ্ঠার সংগে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ থেকে পরিণাম পর্যন্ত ধাপে ধাপে অনুসরণ করেছেন—কবির সৃষ্টির অন্তিম পর্বও এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিশাল বারিধি-তুল্য রবীন্দ্র-কাব্য-সমুদ্রের মাত্র সেই ফেনশীর্ষ তরংগগুলিই লেখক নিরীক্ষণ করেছেন যেগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর এই জীবন-অরূপ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং এই আলোচনায় প্রায় সকল কাব্য ও কিছু কিছু নাটক অংগীভূত হয়েছে। আলোচনাকালে লেখকের মূল দৃষ্টিভংগী কোথাও বিচলিত হয় নাই—দার্শনিকসুলভ প্রজ্ঞার ভংগীতে গ্রন্থকার স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির নিসর্গানুরাগ, মানবপ্রেম আর অরূপানুভূতি সম্পর্কিত আলোচনায় অধ্যাপক দাস বহুল উদ্ধৃতি সহায়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকটি পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। প্রসংগত কবিচিত্তে প্রকৃতির ভয়ালসুন্দর রূপের প্রতিক্রিয়া, কবির মৃত্যুসম্পর্কিত চিন্তা প্রভৃতি অতি মূল্যবান্ বিষয়ের আলোচনায় লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অরূপ দর্শনের সংগে মৃত্যু-সম্পর্কে তাঁর ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত'—এই হচ্ছে লেখকের সিদ্ধান্ত।

'জীবন-দেবতা' উপলব্ধি সম্পর্কে লেখক প্রচলিত নানা মতের সবিস্তার আলোচনার শেষে স্বকীয় নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 'এই শক্তি ঈশ্বর নন, সৌন্দর্যমূর্তিও নন, কবির আত্মশক্তি মাত্র।' 'মানসসুন্দরী-লীলাসংগিনী' শ্রেণীর কবিতাগুলিকে তিনি সংগতভাবেই এই

জীবন-দেবতা উপলব্ধি থেকে পৃথক করেছেন। এই 'মানসসুন্দরী' শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে তিনি কবির সৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় পেয়েছেন।. কবির এই সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশে নারীরূপের স্পর্শে তাঁর স্বভাবের একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য। নারীরূপ বিমণ্ডিত হয়ে অপূর্বতাপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই এই শ্রেণীর কবিতা সাধারণ সৌন্দর্যের কবিতা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে।' এই প্রসংগে কবির ভাব-জীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। জীবনের সূচনা হতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত লিখিত রবীন্দ্র-নাথের বহু রচনায় এই নারীর মহিমোন্নত মূর্তির প্রকাশ্য ও অলক্ষ্য পদসঞ্চার কি শোনা যায় না? এ বিষয়ে লেখকের একান্ত নীরবতা ভগ্ন হলে উৎসুক পাঠকের তৃপ্তি হত।

রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বগ্রাসী অথচ সর্বাতিশায়ী রূপের বিশ্লেষণে লেখক প্রস্তাবনায় বলেছেন, 'সে কাব্যের ভাষারূপে পদাবলী ও সংস্কৃতের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবনাদর্শে কালিদাসের তপোবন এবং ভাবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে দৃপ্ট অথচ অধিকতর সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালীর ভাবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—জীবনের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধান।' এই প্রসংগে লেখকের এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্র-কাব্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেরই সিদ্ধান্ত যে, বাইরে থেকে কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব বা কাব্যাদর্শ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছেন বলেই তাঁর কাব্য বর্তমান রূপ নিয়েছে—এ ধারণা ভিত্তিহীন; বরং বলা উচিত—আপন বিকাশশীল কবি-ধর্মের বশে রবীন্দ্রনাথ বাইরের থেকে সেইটুকুই গ্রহণ করেছেন যেটুকু তাঁর মৌল কবিসত্তার পরিপোষক। এবং এই সিদ্ধান্তকে সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট পরিণামমুখী কবিসত্তাকে সর্বোপরি স্থান দিয়ে কবি-মানসের সংগে উপনিষদ্, বৈষ্ণবধর্ম, বাউল-সংগীত এবং সংস্কৃত কাব্যাদর্শ তথা কালিদাস আর ক্রোচে, বের্গসঁ প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের তত্ত্বচিন্তার সম্পর্ক বিচারের বিস্তৃত আলোচনায় কবি-চিত্তের সংগে এগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণের তাত্ত্বিক বিচারে লেখকের নিপুণ বৈদগ্ধ্য পাঠকের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করবে। কিন্তু এই প্রসংগে বৌদ্ধধর্মের প্রেম অহিংসা করুণা মৈত্রীর বাণীর সহিত কবি-মানসের সম্পর্ক-বিচার অপেক্ষিত ছিল। কারণ আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ নিত্যধর্মের সংগে বুদ্ধ-প্রচারিত এই মহাবাণীর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আর একটি কথা; কাহিনী কাব্যের সুবিস্তৃত আলোচনায় লেখক মহাভারতীয় জীবনাদর্শের সংগে রবীন্দ্র-মানসের সম্পর্ক-বিচার করেছেন, কিন্তু 'ভাষা ও ছন্দে' ব্যক্ত নরচন্দ্রমার আদর্শের কথা কেন অনালোচিত রয়ে গেল?

কেবল কাব্যনিহিত ভাবসম্পদের আলোচনাতেই যে কবি-প্রতিভার পূর্ণপরিচয় লাভ করা যায় না অভিজ্ঞ অধ্যাপক স্বভাবতই সে-বিষয়ে সচেতন। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রকাব্যে রূপ-রচনায় বৈশিষ্ট্যও তাঁর আলোচনায় অংগীভূত করেছেন। কবির বাঙনির্মাণ কৌশল—রীতিতে সংস্কৃত ভাষার দান, ছন্দোনির্মিতি—গদ্যচ্ছন্দ—এ সম্পর্কেও লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের একটি বক্তব্য আছে—যদিও এ বক্তব্য বিতর্কের অতীত নয়। 'আমায় দেখো না বাহিরে,—কবির এই সতর্ক-বাণীর প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিয়েও বলা যায় যে, বাইরের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সৃষ্টির মূল্যায়নে আর একটু অধিক মনোযোগ প্রত্যাশিত। নচেৎ শুধুই অন্তর্লোকের পরিচয়ে কবিকে নিরাবলম্ব ভাবসর্বস্ব বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কি? আর তার দ্বারা কি রবীন্দ্র-নাথের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভবপর?

শচীনন্দন সিংহ

THIN ARROWROOT
BRITANNIA
THIN ARRO
আপনার
ও বাড়ীর
সবায়ের জন্যে
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (-আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Sept. '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দশম বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৬৯

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক **রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা**

এই ঠিকানায় **প্রচার অধিকর্তার** নিকট লিখুন

the tea that's
supremely yours

পূজার অভিনন্দন
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

X-100
MOTOR OIL
X100
2T
SHELL
ROTELLA
OIL
FOR DIESELS
a winner every time...
you can be sure of SHELL

ব্রিটানিয়া
থিন
এরারুট
THIN ARROWROOT
আপনার
ও বাড়ীর
সবায়ের জন্যে
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
গুণসম্পন্ন
তৈল
M. L. BOSE & Co.
MEDICATED
লক্ষ্মীবিলাস
JAGANNATH DUTT LANE
CALCUTTA

কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা

দশম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

সভ্যতার প্রথম বিকাশ...

মিশরে, মধ্য এশিয়ায় বা ভারতে যেখানেই হয়ে থাক, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শস্য উৎপাদন। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম সোনালী ফসল ফলাতে সফল হলো সেদিনই তার যাযাবর জীবনে যবনিকা নেমে এলো, সে ঘর বাঁধতে শিখলো। এমন কি হাজার হাজার বছর পরেও পিরামিডের তলায়, হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া গেছে সেই প্রাক্-আর্যযুগের স্বর্ণশীর্ষ খাদ্যশস্যের সন্ধান।

তখনকার দিনে প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যব — বলা হত 'শূকধান্য'। আজকের দিনেও সারা উত্তর ভারতে সমস্ত প্রকার শুভকাজের একটি অপরিহার্য উপকরণ হলো যব। প্রাচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে যবের ব্যবহার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন যবান্ন, যবশক্তু, যবমণ্ড ও যবাগু। যুগ যুগ আগে প্রচলিত যে যবের কথা বলা হলো সেই যব থেকেই তৈরী হয় আজকের দিনের সুপরিচিত বার্লি। স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য হিসেবে বার্লি চমৎকার।

'রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লি'র প্রস্তুতকারকদের পেছনে রয়েছে দেড়শত বছরেরও ওপর বার্লি তৈরীর অভিজ্ঞতা। সুপুষ্ট বার্লিশস্য থেকে সর্বাধুনিক কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এই বার্লি তৈরী ও টিনে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকেরা রবিনসন্স পেটেণ্ট বার্লিরই ব্যবস্থা দেন। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিদের, শিশু ও প্রসূতিদের পক্ষে বার্লি ও দুধবার্লি একাধারে উপকারী ও উপাদেয় পথ্য। তাছাড়া, পাতিলেবু বা কমলালেবুর রসের সঙ্গে বার্লির পানীয় পরম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। **অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড** (ইংলণ্ডে সংগঠিত)

JWTRPT 6089

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। ঠিক এই রকমটি দেখা দিয়েছিল হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের যুগে। কিন্তু সেবারকার প্রশ্ন আর এবারকার প্রশ্ন এক নয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। টাকাটা কী ভাবে ব্যয় হবে সেটা ছেড়ে দেয় ভারতীয় জনমতের উপরে। ভারতীয়দের এক পক্ষে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকগণ। অপর পক্ষে ইংরেজীর প্রবর্তকগণ। শাসকরা রক্ষণশীলদের চটাতে চাননি। তাঁরা এটাও জানতেন যে ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন হলে নব্যশিক্ষিতরা চাকরির দাবী তুলবে ও ইংরেজের পাওনায় ভাগ বসাবে। শেষে একদিন সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তবে বিচারবিভাগে হাইড ইস্টের মতো উদারমনা ইংরেজ ছিলেন, সরকারের বাইরে ডেভিড হেয়ারের মতো বিদ্যোৎসাহী। গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর না করে ইংরেজীর প্রবর্তনে বিশ্বাসী ভারতীয়রা এঁদের মতো কয়েকজন বান্ধবের সহায়তায় ইংরেজী স্কুল ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এর ফলে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকরা যে নিরুদ্যম হলেন তা নয়। কলকাতার মাদ্রাসা আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলো। দুই পক্ষের চেষ্টা চলতে থাকল। ওই এক লক্ষ টাকা কোন পক্ষের কথায় খরচ হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীমূলক হবে, না ইংরেজীমূলক? অর্থাৎ তার ভিত্তি কি প্রাচীন ক্লাসিকাল হবে, না আধুনিক বৈজ্ঞানিক? বলা বাহুল্য সংস্কৃত এ দেশের হলেও আরবী ফারসী এ দেশীয় নয়। সুতরাং স্বাদেশিকতা কোনো পক্ষের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল না। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত কোনো দিন বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে প্রাথমিক পাঠশালার চৌহদ্দি পার হতে দেয়নি। সংস্কৃত টোলে বাংলার

প্রবেশ ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী ছিল না। সুতরাং সংস্কৃতের পক্ষ নেবে কে? জনসাধারণ নয় নিশ্চয়।

মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটির অধিবেশন হয়। তাতে উভয় পক্ষেই সমান ভোট। মেকলে তার কাস্টিং ভোট দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তকদের জিতিয়ে দেন। তার পর থেকে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সর্বত্র প্রসারিত হয়। ইংরেজী স্কুলগুলিতে বাংলাকেও স্থান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাও হয় ইংরেজীর শরিক ও মিত্র। ইংরেজীর প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা বাংলারও প্রবর্তক। নইলে বাংলা সেই গ্রাম্য পাঠশালায় নিবন্ধ রইত। স্কুলপাঠ্য বিষয় ও নিচের দিকের মাধ্যম হয়ে বাংলারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক নৌকায় সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী। আরেক নৌকায় ইংরেজী ও বাংলা। সরকার যখন ইংরেজী তথা বাংলার পক্ষ নেন তখন বাংলা খবরের কাগজগুলি জয়ধ্বনি দেয়। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যদি বিপরীত হতো তা হলে বাংলা সাহিত্যেরও আধুনিক যুগে পদার্পণ ঘটত না। শুধু বাংলা কেন, হিন্দী উর্দু গুজরাতী মারাঠী তামিল তেলেগু প্রভৃতি কোনো সাহিত্যেরই আধুনিক পর্যায় আরম্ভ হতো না।

ইংরেজী শিক্ষা যখন পুরো দমে চলছে তখন দেশবাসীর মনে জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তা জাগে। তখন ইংরেজীকে মনে হয় বিজাতীয়তার বাহক। সে যে আধুনিকতার বাহক এটা ভুলে যেতে বেশিদিন লাগল না। কিন্তু ইংরেজীকে তুলে দিলে তার জায়গায় শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন ভাষা। সংস্কৃত? বাংলা? বাঙালী প্রধানরা কেউ ততদূর যেতে রাজী হন নি। সব চেয়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও না। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তথ্যের সঙ্গে এই ধারণার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিপর্ব থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপর ছিল বালকদের গুরুজনের লক্ষ্য। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে কলেজে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তারা প্রবেশ পেতো না। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন। তাই নিচের দিকে বাংলায় পড়ানো হলেও উপরের দিকে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরঞ্জন দাস এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে পারা যেত, কিন্তু তা হলে বাংলার বাইরে থেকে ছাত্র সমাগম হতো না। বিশ্বভারতীর আদিযুগের ছাত্ররা ছিল সাধারণত গুজরাতী বা দক্ষিণী। ইংরেজীতেই তারা শিখত ও লিখত। বাংলাটা ছিল অধিকন্তু বা ঐচ্ছিক। তার পর রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাসত্ত্বে স্থাপিত হয় কলকাতা মডেলের কলেজ, ছেলেদের তৈরি করে দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ বি-এ পরীক্ষার জন্যে। অতএব ইংরেজীই হয় তার মাধ্যম। বড়রকম একটা পরিবর্তন ঘটে বিশ্বভারতী যখন স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টের আইনবলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিগণিত হয়।

তখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকেই করে তার পাঠভবনের উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম। তার পরের ধাপগুলো এখনো ইংরেজী মাধ্যমের দখলে। ইতিমধ্যেই চাপ পড়েছিল ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে মাধ্যম করতে, যেহেতু টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে। সে চাপ এড়ানো গেছে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে। আঞ্চলিকতার খাতিরে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চাইলে কেন্দ্রের সঙ্গে আড়াআড়ি বাধবে। তা ছাড়া ছাত্রও পাওয়া যাবে না বিশ্ব কিংবা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে। অবাঙালী ছাত্রদের কোনো দিনই

বাংলা মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়নি। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাংলা শিখতে বাধ্য হলে তারা অন্যত্র সরে যাবে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনে এই নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসেছিল। অধিকাংশের মত হলো ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখা।

বিশ্বভারতীর যা ঐতিহ্য তাকে রক্ষা করতে হলে ইংরেজী মাধ্যমকেও রক্ষা করতে হবে। নতুবা ইংরেজীর জায়গায় হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে। উপরের দিকে তর্কটা ইংরেজী বনাম বাংলা নয়। ইংরেজী বনাম হিন্দী। বিশ্বভারতী কবিগুরুর জীবদ্দশায় হিন্দীকে তার যথাযোগ্য স্থান দিয়েছে। হিন্দীভবন স্থাপন করেছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী এটা বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। এর দরুন যদি তাকে জাতীয়তাবিরোধী বলে কটু কথা শুনতে হয় তাতেও সে রাজী। আর বাংলা মাধ্যমের পক্ষপাতীরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি যে ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে তার জায়গায় বাংলাই হবে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ও সেটা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেবে। এঁরা এমন একটা অবাস্তব জগতে বাস করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের নামেই বিশ্ব আর ভারত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে দেখতে বদ্ধপরিকর। যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দেখে যেতে পারলেন না।

তার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। সেদিন আর নেই যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল একেশ্বর। কলকাতাতেই আরো দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, বর্ধমানে আর একটি, কল্যাণীতে আর একটি, উত্তরবঙ্গে আর একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এগুলির শিক্ষার মাধ্যম কলমের এক খোঁচায় বাংলা হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ নেই। অন্তত রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষার মাধ্যম অনায়াসেই বাংলা হতে পারে। বিশ্বভারতীর বেলা যেসব কথা খাটে, রবীন্দ্রভারতীর বেলা সেসব খাটে না। রবীন্দ্রভারতী স্বচ্ছন্দেই অভিনব ঐতিহ্যের সূত্রপাত করতে পারে। তেমনি বর্ধমান, যাদবপুর, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? কলকাতা যদিও পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন তবু তার ঐতিহ্য সর্বভারতীয়। একদিন তার এলাকা ছিল রেঙ্গুন থেকে পেশোওয়ার অবধি বিস্তৃত। বাংলা বিভাগ বলে তার কোনো বিভাগই নেই। বিভাগটার নাম "আধুনিক ভারতীয় ভাষাবৃন্দ।" কেবল বাংলার প্রতি নয়, হিন্দী উর্দু ওড়িয়ার প্রতিও কলকাতার উদার দৃষ্টি। একমাত্র বাংলার সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করলে কলকাতা আর ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী থাকবে না। রাজনৈতিক রাজধানী এখন দিল্লী, অর্থনৈতিক রাজধানী বোম্বাই, কলকাতা যদি সাংস্কৃতিক রাজধানীও না হয় তবে সে কী? একটি আঞ্চলিক সদর? যেমন পাটনা, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ? ইংরেজী মাধ্যমের দরুন এখনো ভূভারতের ছাত্র আসে কলকাতায়। বাংলা মাধ্যম হলে আসবে কি? সে রকম একটা মোহ হয়তো কারো কারো মনে আছে। জার্মানীতে যখন জার্মান শিখে পড়তে যাচ্ছে, ফ্রান্সে যখন ফরাসী শিখে পড়তে যাচ্ছে তখন কলকাতায় কেন পড়তে আসবে না বাংলা শিখে।

যাই হোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সিদ্ধান্ত একদিন না একদিন নিতে হবেই। আজ না নিলে কাল, কাল না নিলে পরশু। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তকরাও কল্পনা করেন নি যে শিক্ষার মাধ্যম নিরবধিকাল ইংরেজীই থাকবে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর বিরোধ বাধবে এটা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু বাধবেই, যদি বাংলার উচ্চাভিলাষ ইংরেজীর দ্বারা ব্যাহত হয়। যদি বাংলার চরম বিকাশের পথ ইংরেজীর দ্বারা রুদ্ধ হয়। সুতরাং ইংরেজী মাধ্যমের হাজার গুণ থাকলেও বাংলার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তা। ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর বদলে বাংলা হবে উচ্চতম শিক্ষারও মাধ্যম।

এখন এর একটা উল্টো দিকও আছে। সেটা সকলের মনে রাখা চাই। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ছিল বহুকাল ধরে সংস্কৃত। সে যুগে কেউ বাংলাদেশে আসত না, বাংলাদেশের দিকে তাকাত না। বড়জোর একটি বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে কতক পড়ুয়া নবদ্বীপে কিছুদিন কাটাত। বাঙালীর সুদিন এলো অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্দিনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার সুদিন এলো ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার সুদিন এলো ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে। সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ল ইতিহাসের প্রথম বার পূর্বদিকের মানচিত্রের উপর। বিংশ শতাব্দীতে সে গৌরব রবি পৃথিবীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "আজ বাংলাদেশ যা ভাবে—"

ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারবোধ, আইনের শাসন, মিলিটারির উপর সিভিলের শ্রেষ্ঠতা, অথরিটির উপর যুক্তির শ্রেষ্ঠতা। এমনি কতকগুলি মূল্য যা আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল না, এখনও আমাদের মনে গভীরভাবে বসেনি, আমাদের জীবনে সহজ হয়নি। এ সব ক্ষেত্রে জাপানীরা কি আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছে না আমরা তাদের উপর টেক্কা দিয়েছি? তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা কি আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের চেয়ে বড়? তাদের সাহিত্যিকরা কি আমাদের সাহিত্যিকদের চেয়ে মহৎ? তাদের আইনজ্ঞরা কি আমাদের আইনজ্ঞদের চেয়ে বিদ্বান? তাদের বিচারকরা কি আমাদের বিচারকদের চেয়ে বিজ্ঞ? জাপানের দৃষ্টান্ত যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা কি জানেন না জাপানকে ফাসিস্ট করতে কতটুকু কাঠখড় লাগে? ভারতকেও মিলিটারিস্ট করতে বা মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খুব বেশি কাঠখড় লাগে না। রামমোহন রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বদলে আর একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যাঁরা নেবেন তাঁরা যেন ভারতের সনাতন দুর্বলতার কথাটাও গণনার মধ্যে আনেন। বিশেষত বাঙালীর।

ইসলাম সংস্কৃতি ও আমরা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

মানুষের তৎপরতা এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মানুষের কল্পনা এবং তার ছবি-প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ বাস্তব জীবন এবং তন্নিষ্ঠ জ্ঞান-চিন্তা-ভাবনা-শিল্প সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতির শরীর গড়ে ওঠে। আদিতে জন্মলগ্নে সংস্কৃতির রূপ রূঢ়িক তথা একবচন, কোন একটি গোষ্ঠী বা সীমাবদ্ধ জাতির জীবনের-মানসের স্বচ্ছ দর্পণ। কালক্রমে, একই ভূমিতে বিভিন্নগোষ্ঠী বা জাতির মুখোমুখি দেখা হয়, সংঘাতে, শেষে সামঞ্জস্যে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে যৌগিক, মিশ্র দ্বিবচন কি বহুবচন, একাধিক গোষ্ঠী বা জাতির জীবনের-মানসের অমসৃণ দর্পণ। সেই দর্পণে মুখ দেখে ভবিষ্যৎকালের উত্তরপুরুষ ও উত্তরনারী।

ভারতীয় সংস্কৃতিও কালপ্রবাহে এমনই একটি বহুবচনান্বিত রূপ লাভ করেছে, যার রূপদক্ষ কারিগর আর্য ও আর্যেতর বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন, তেমনি ইসলাম ও খৃীষ্টধর্মবাহিত ভাবনাচিন্তাও। আত্মপরিচয়ের যথার্থ স্বরূপ জানতে হলে এই উপাদান-উপকরণগুলিকে বিভাজন করে নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতোটা বিজ্ঞানমনস্ক আমরা আজও হতে পারিনি। ভারতবর্ষের বিস্তৃত পটে ইসলামী সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কে বেশ-কিছু আলোচনা হয়েছে (যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম) কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে, বিশেষত বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজও আরম্ভ হয়নি। অথচ হওয়া দরকার—আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসাক্ষাৎকারের জন্যে, বর্তমানের সালতামামি ও ভবিষ্যতের পথ চিনে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজনে।

আত্মনেপদী প্রবণতা, অথবা পরস্মৈপদী প্ররোচনা, যেকোনো কারণেই হোক, আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও মানস আজও, বিংশ শতাব্দীর এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে, দুই-বিপ্রতীপ শিবিরের অধিবাসী। অথচ একদিন প্রবাসী ও নিবাসী দুটি সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-মাধ্যমে মিলন ঘটেছিল অনেক বিন্দুতে—ধর্মে-কর্মে-শিল্পে-সাহিত্যে-মেজাজে-আচরণে-অনুষ্ঠানে, মুসলমান রাজসভায় হিন্দু সাহিত্য উজ্জ্বল ডানা মেলেছিল, হিন্দু কবি দরবার থেকে অনেক দূরে বসে নির্দ্বিধায় গেয়েছিলেন ঃ 'কলিতে হুসেন শাহ কৃষ্ণের অবতার।' এবং হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত সম্প্রদায়-চেতনাকে অস্বীকার করে, সামাজিক ব্যবধানের তথাকথিত পাঁচিলগুলি ধূলিসাৎ করে মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গগীতিকার সরলমনা অথচ বলিষ্ঠমনা কবিগোষ্ঠী, যাঁদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। এবং শুধু গীতিকা নয়, সমগ্র বাঙালী সংস্কৃতিই, যেমন আর্য-আর্যেতর, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত যৌথ সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির ঐতিহ্য আজও সম-বহমান; তার উত্তরাধিকার আমাদের জীবনায়নে, আমাদের বুদ্ধিতে ও আবেগে, রক্তের গভীরে নিত্যসঞ্চরমান। বর্ণ ও বর্গের বিভ্রান্ত অভিমানে যতো অস্বীকারই করতে চাইনা কেন, সনাতন সংস্কার যতো বাধাই দিক না কেন, এতথ্য সমাজতত্ত্বসম্মত। মধ্যযুগ ব্যাপ্ত করে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে দুটি বি-মুখ বৃত্তের এই-যে সংঘাত-সমন্বয়, তা সম্মুখ ও সংহত হয়ে উঠেছে ঐ যুগের শেষ প্রান্তে, অষ্টাদশ শতকের মোহানায় এসে।

কিন্তু তারপরেই ইতিহাসের সমুদ্র দেখা দিল আরেক রূপ নিয়ে।

অষ্টাদশ শতকের সীমান্ত পেরিয়ে ঊনবিংশ শতকের নতুন সীমানায় আধুনিক যুগের

সূত্রপাত। বাঙালী সংস্কৃতি স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত হল, অভিজাত ও লোকায়ত, শহুরে ও গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যেকার ব্যবধান অকস্মাৎ অভাবিতভাবে বেড়ে গেল। কলকাতার দেহে এল ভরা যৌবনের মাতাল লাবণ্য, তার ঢেউ উজিয়ে পড়ল কিছুটা শহরতলীতেও; তার ওপারে, মফঃস্বল বাংলার দেহে সেই পুরনো নামাবলী, শতছিদ্র, তালি দেওয়া। আজও তার সাজবদল সম্পূর্ণ হয় নি। না'হোক; কিন্তু এই লোকায়ত সমাজে ও মানসেই, এখনও হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির মিলিত মিশ্র রূপ অব্যাহতভাবে এবং অধিকাংশও বিদ্যমান। এ রূপের খবর বই পড়ে পাওয়া যাবে না, কারণ সেখানে লেখা নেই; এর জন্যে যেতে হবে ঘর থেকে পথে, পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ও আচরণের মাঝখানে। দু'চোখ ভরে যাবে অপার বিস্ময়ে, সংস্কৃতির বিচিত্র লীলারঙ্গ নতুন চেতনার দীপ জ্বালাবে দর্শকমনে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে, জীবনের অন্য মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঠিক এইখানে এসে প্রশ্ন উঠবে : তা'হলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও উগ্রবিকাশ সম্ভব হয়েছিল কি করে?

এই নবাগত অকল্যাণী চেতনার জাতকপত্রে অনেক অশুভ নক্ষত্রের সমাবেশ, ব্রিটিশ শাসকের নিরন্তর জলসিঞ্চন তার অন্যতম। এই অশুভ নক্ষত্রদের অনেকগুলি আমাদের পরিচিত, অনেকগুলি আজও অজ্ঞাতকুলশীল অর্থাৎ বিশ্লেষিত হয় নি। কিন্তু সে-জটিল ইতিবৃত্তের আবর্তে আপাতত যাব না; আমার বর্তমান বক্তব্যের প্রয়োজনে একটি দৃষ্টান্তই বহুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। সেই একটি : শহর-কলকাতার বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

ঊনবিংশ শতকের কলকাতা তখন বিচিত্র বিপ্রতীপ ভাবের আবর্তে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। একদিকে সাগরপারের পাদ্রীবাহিত নবধর্ম, অন্যদিকে দেশজ সনাতন হিন্দু ধর্মের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা (রাধাকান্ত দেব প্রমুখ যার নেতা), আর এরই মাঝখানে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর নতুন সমাজ ও মানস গড়ার প্রাণপণ প্রয়াস। এই প্রয়াসের একটি দিক ছিল সর্বধর্ম-সমন্বয়ের দিকে প্রসারিত। এক্ষেত্রে তিনটি নাম স্মরণীয়—রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ। প্রথমজন ব্যর্থ হয়েছেন; দ্বিতীয়জনের সাহিত্যকীর্তি ও খ্যাতি তাঁর সমাজবোধকে ও তন্নিষ্ঠ বক্তব্যকে আবৃত করে রেখেছে; তৃতীয়জনের আল্লাহ-সাধনার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যরা অনুগামী মঠ-মিশনকে বিশুদ্ধ হিঁদুয়ানীর চন্দনে-তিলকে সাজিয়ে তুলেছেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম কলকাতার সর্বাঙ্গে রক্ত লাগাতে না পারলেও তার অন্তরকে অনেকখানি সংক্রামিত করেছে। ফলে, যে নব্য আন্দোলন সর্ববন্ধনমুক্তির দিকে এগিয়ে চলছিল, সে পিছু হটেছে, পৌরাণিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, হিঁদুয়ানী ও আবেগান্বিত ভক্তির সরস পথে মন সিক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমে, হিন্দুত্বই জাতীয়ত্ব, এই বোধ শক্ত হয়ে দানা বেঁধেছে আমাদের সংস্কারে ও সংস্কৃতিতে। প্রথমে ধর্মে, তারপর সমাজবোধে, তার পরে শিল্পে-সাহিত্যে—বিজ্ঞানে এমনকি রাজনীতিতেও এই চেতনা তার স্থূল হাত বাড়িয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে হিন্দু জাতীয়তাবাদই বাঙালীর জাতীয়তা বলে চলে এসেছে। এদেশের মুসলমানও যে বাঙালী, এবোধ এবুদ্ধি জাগাবার যথার্থ চেষ্টা হয়নি; যাঁরা জাগাবেন, তাঁরাই তখন অর্ধ-জাগ্রত। বঙ্কিম-চন্দ্রকে বাঙালী জাতীয়তার জনক বলে মেনে নিতে তাই আমি অপারগ, মৌলভী রেজাউল করিমের বঙ্কিম-সমর্থন সত্ত্বেও। প্রথম জীবনে বঙ্কিম নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ছিলেন; কিন্তু উত্তরকালে নব্য হিন্দুধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল মোহে মুখ ফিরিয়েছিলেন পেছন দিকে। আমাদের অন্যান্য মনীষীরাও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই পথ অনুসরণ করেছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু তার মধ্যে মৌল ফাঁকিটুকু যে কোথায়,

একাধিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে গেছেন, হিন্দু-সমাজের দূরত্ব এবং মুসলমান-সমাজের অনিচ্ছা, উভয় দিক থেকেই।

এই বিভ্রান্তির মধ্যে একমাত্র ও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগর, যিনি স্বধর্মে স্থির ছিলেন, উগ্র ছিলেন না। আর ব্যতিক্রম মধুসূদন, যিনি পরধর্মে আশ্রয় নিয়েও সাহিত্যের এলাকায় ধর্মকে আনেন নি। যিনি বলেছিলেন, ভেবেছিলেন ঃ হাসান হোসেনের কাহিনী নিয়ে এক নতুন কাব্য সৃষ্টি হতে পারে, এবং যিনি নিজে তা পারেন নি বলে দুঃখিত হয়েছেন। আর ব্যতিক্রম, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী, (একমাত্র ভারতীয় কিনা জানিনা), যিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে চেষ্টা করেছেন প্রত্যক্ষ কাজে, এবং সাহিত্যকর্মে সেই ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন কখনও প্রবন্ধে, কখনও গল্পে, কখনও-বা কাব্যনাট্যে।

কিন্তু তিনিও একক। এবং একক-ব্যক্তিত্ব একটি জাতি নয়। তাই বিগত শতকের অভ্যুত্থানকে সমগ্রভাবে বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন বলে ইতিহাস কোনদিনই স্বীকৃতি দেবে না। এ উজ্জীবন শুধুমাত্র হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির, একে সংস্কার-আন্দোলন বলাই সংগত। এর আরও একটি কারণ আছে, অন্তত সাহিত্যের এলাকায়। নতুন আলো জ্বালবার মুহূর্তে আধুনিক যুগের নবীন সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা ও সাহায্য নিয়েছেন ইংরেজি (এবং কিছু ইউরোপীয়), সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে। বাংলা সাহিত্যের সেই অংশেই তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন, যেখানে উচ্চবিত্তদের আসর। প্রাগাধুনিক বাংলার বিপুল লোক-সাহিত্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি, বা পড়লেও তার থেকে উপকরণ সংগ্রহে তাঁরা আগ্রহী বা উৎসাহী হন নি। তা যদি হত, তা'হলে হিন্দু কবির সঙ্গে মুসলমান কবিদের রচনাও তাঁদের চোখে পড়ত, মূল্য লাগত। তা'হলে আমাদের সাহিত্য বঙ্কিমী হিন্দু জাতীয়তাবাদে ভরে যেত না, বাঙ্গালী জাতিকে পেতাম সমগ্রভাবে, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসের চেহারা বদলে যেত। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একক, লোক-সাহিত্যের ঐশ্বর্য তিনিই প্রথম আমাদের দেখিয়েছেন।

কিন্তু বোধহয় প্রথমই। কারণ, তারপরে কাজ অনেক এগিয়েছে, লোক-সাহিত্যের আবিষ্কার-গবেষণা বেড়ে গেছে; মন কিন্তু সেই সনাতন সংস্কারের জালে নিজেকে আটকে রেখেছে। এই দিক থেকে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য না বলে উচ্চবিত্ত হিন্দু-সাহিত্য বললে আদৌ অসংগত হবে না।

এতো গেল সে-শতকের কথা। এ শতকে, আজ, আমরাই বা কী করছি সেই জীর্ণ-পুরাতন সংস্কারকে লালন-পালন করা ছাড়া?

হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ও রক্তের মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার উচ্চারণ করে-ছিলেন। উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, রূপায়িত হয় নি। বাঙ্গালী হিন্দু-সাহিত্যিক ঘরের আত্মীয় মুসলমান সমাজের-সংসারের সার্থক-সুন্দর ছবি আঁকতে উদ্‌গ্রীব নন, কিন্তু সাগরপারের বিদেশীদের চিত্রাঙ্কণে উৎসাহী। অথচ এ কাজ যে অসম্ভব নয়, তারও প্রমাণ আছে বাংলা সাহিত্যে। সংখ্যাহীন গবেষক একের পর এক বই লিখে চলেছেন হিন্দুধর্ম কিংবা ঊনবিংশ শতক ও খ্রীষ্টীয় তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিষয়ে; কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান ও এই প্রসঙ্গে আমাদের উত্তরাধিকার বিষয়ে একটি বই দূরের কথা, একটি ক্ষীণকায়া প্রবন্ধ আজও লেখা হল না। রাজনৈতিক দলগুলি পুরণো জাতিভেদ স্বীকার করেন না বলে ঘোষণা করে বার বার; কিন্তু নতুন অর্থনীতিক পরিবেশে যে জাতিভেদ-বর্ণভেদ আজও সমাজ সত্য, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এতটুকু চেষ্টা নেই কোন পক্ষেই। যে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতি বহুদিনের নিত্যসঙ্গী, তাদের একে অপরকে জানবার-চেনবার-বোঝবার এবং সেই সঙ্গে আত্মসাক্ষাৎকারের

কোন স্পৃহা নেই। একটি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড়ো দুঃখের আর লজ্জার কথা আর কিছুই হতে পারে না।

জাতীয় সংহতি অনেক দিনের লালিত চেতনা ও বাসনা। কিন্তু বাসনাকে এষণার মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলতে হয়, নিছক বক্তৃতা ও উপদেশে কোন কাজ হয় না। মিলনের যতোগুলি পথ আছে, সবগুলি আজ খুলে দিতে হবে, উভয় পক্ষ থেকেই মেলবার চেষ্টা করতে হবে, গৌড়ীয় ইসলামী সংস্কৃতি তথা আমাদের ঐতিহ্যের অন্যতম অংগকে চিনতে ও উপলব্ধি করতে হবে, যা আছে রক্তের গভীরে, তাকে আনতে হবে মনের গোচরে। এর জন্যে যে নানাবিধ পন্থা, তার অন্যতম হল—বাঙ্গলার ইসলামী সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরের ঐতিহাসিক সন্ধান, আমাদের সংস্কৃতিতে তার লীলাবিলাসের বিজ্ঞানসম্মত ও ধারাবাহিক অনুধাবন।

ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির স্বতন্ত্র রূপ আছে, আবার ভারতভূমিতে উভয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকাও আছে। এই আবর্তিত ইতিবৃত্তের পটে বাঙ্গলায় ইসলামের আবির্ভাব-প্রসারণ-রূপান্তর-মিশ্রণ ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে; বাঙ্গালী সংস্কৃতির স্বরূপ, এবং তার মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধির মূলে ইসলামের অবদানকে স্বীকার ও উদ্ধার করতে হবে। আমাদের সমাজে ও মানসে, ধর্মে ও সাধনে, শিল্প-সংগীত-সাহিত্যে উভয়ের মিলন-বিন্দুগুলিকে (এবং বিপরীত মেরুগুলিকেও) আবিষ্কার করতে হবে। এবং এই প্রাগাধুনিক বৃত্তকে সামনে রেখে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের উত্তরাধিকার ও অর্জনকে বিশ্লেষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে, আমরা যাকে বলি 'বাঙ্গালীর পুনরুজ্জীবন,' তার পুনর্বিচার, নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। জনজীবনে অসাম্প্রদায়িক মিলিত জীবনবোধ, এবং ওপরতলার ফুলিয়ে-তোলা ফাঁপিয়ে-তোলা সাম্প্রদায়িকতা—দুই বিপরীত স্রোতাবর্তকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে তার কার্য-কারণ, তার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বিচার ক'রে। এমনিভাবে পেঁৗছে যাব বর্তমানের কালসীমানায়, বুঝতে পারব—জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় আমরা আছি, কী আমাদের কর্তব্য।

সমগ্র পর্যালোচনাটি হবে নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসিদ্ধ। এর দ্বারা একটি জাতীয় ও মানবিক কর্তব্য সম্পাদিত হবে। পুরনো সংস্কার পরিত্যাগ করে আমরা পাব নূতন জীবন ও নতুন মন, পাব শক্তি, সাহস ও সহযোগিতা, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সরে যাবে, আমরা জেগে উঠব এক সমগ্র ও সংহত জাতিরূপে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখা দেবে সত্যরূপে নিঃসংশয়ে।

জানি, এরও পরে অনেক বাধা আসবে। আসুক। প্রথমতম বাধা, পারস্পরিক অজ্ঞতা, দূর হলে আর-কোন-কিছুই আমাদের আড়াল করে রাখতে পারবে না।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে

অনিল চক্রবর্তী

১৯৪১-৪২ সাল। মাত্র কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের কলম চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু তারি মধ্যে আধুনিকতার প্রবল প্লাবন ব'য়ে চলেছে বাংলা-সাহিত্যে। একদিকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা, অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর পরিচয়। শুধু ভাববস্তুর দিক থেকেই নয়, কাব্যের গঠনপ্রণালীতেও একটা নতুন চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো কবিতাপত্রিকার অঙ্গে অঙ্গে। আর পরিচয় পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী আশ্রয় নিলেন বিদগ্ধ জনসুলভ মননশীলতার। বলা বাহুল্য কোনোটিই বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাবাহী নয়। সাহিত্য সর্বকালেই পাঠকের মুখাপেক্ষী। এবং পাঠককুলও চিরকালই আশ্চর্যরকমভাবে গতানুগতিকতার সমর্থক। যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের সেই দুর্লভ সময়টির ইতিহাস জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, পাঠকরা সহাস্যে সেদিন সেই আধুনিকতাকে গ্রহণ করেনি। হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি চিরকালই চোখ ধাঁধায়। মাইকেলের সময় যা হয়েছিলো, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুদীর্ঘ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন কোনো চমক ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি পরম বিস্ময় হলেও তিনি তেমন করে কখনও পাঠকের চোখে হঠাৎ-আলোর ধাঁধা ছড়াননি। বরং তিনি শতদলদল খুলে দিয়েছেন থরে থরে। কিন্তু ধীরে ধীরে। তাঁর সাহিত্যসাধনার পথে আছে অজস্র বাঁক, প্রতি বাঁকেই আছে অপরিমিত বিস্ময়; তবু সে বিস্ময় পাঠককে অভিভূত করলেও কখনও বিভ্রান্ত করেনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথে ক্রমপরিণতি স্পষ্ট, এত স্পষ্ট যে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত পাঠক চিরকাল নতুন থেকে নতুনতর সন্ধান পেয়েই ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাপি পেছন ফেরেননি, তাঁর মধ্যে পুনরাবৃত্তি নেই। তথাপি তাঁর শেষ জীবনের প্রায় কাছাকাছি সময়ে যে আধুনিকতার পত্তন হয়েছিলো তা যথার্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যানুসারী নয়, সুতরাং অদূর প্রাক্তনের ঐতিহ্য থেকেও তা সরে এসেছিলো অনেকখানি। চিরাচরিতের ধারাবাহী পাঠকজন এ-আধুনিকতার কাছে আশ্রয় না পেয়ে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, ব্যঙ্গ করেছে, আঘাত করেছে প্রচণ্ডভাবে। আর শেষ পর্যন্ত লুফে নিয়েছে কথা-সাহিত্যিক বিভূতি-ভূষণ, মাণিক, তারাশঙ্কর, বনফুলকে। নতুন কোনো কবির কাছে তারা ভরসা পেলো না। কিন্তু কবিতার পাঠক আর ক'জন, তাদের দাবী তাই প্রচণ্ড হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। এখানে বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের পাশে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখে কেউ-কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। আমিও জানি, মাণিক অন্য দু'জনের সঙ্গে একই পথের পথিক ছিলেন না। কিন্তু পথ তাঁর ভিন্ন হয়েছে শুরু থেকেই নয়। প্রথম দিককার রচনায় তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত থাকলেও, ভিন্নতর পথ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো অনেক পরে। বাংলা ছোট গল্প-উপন্যাস পাঠকদের একটা বৃহৎ অংশ সেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, তারপর আর কোনো বড় আন্দোলন তাদের বিচলিত করতে পারেনি। অবশ্য বামপন্থী সাহিত্যের অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই নবজাগ্রত সাহিত্যচেতনা আশাহত জনজীবনকে নতুন করে বেঁচে ওঠার জন্যই উদ্বুদ্ধ করেছিলো; তাই এ-সাহিত্যধারায় প্রচুর নূতনত্ব থাকলেও পাঠকজন-সমাজ তাকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। হয়তো তাদের মধ্যে দু'টি পৃথক শিবির গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তার পেছনের কারণটা সাহিত্যিক নয়, ষোলো আনা রাজনৈতিক। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীর

মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটতে বাধা ছিল না। কেননা, সাহিত্য মানুষ ও মানবতার কথা বলে, সীমিত রাজনীতির মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না, এবং সাহিত্যিক মাত্রেরই মূল উদ্দেশ্য সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থানটিকে উপযুক্ত জায়গায় রেখে তার প্রকৃত, প্রাকৃত এবং সম্ভাব্য রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা। সুতরাং সম্মিলিত সাহিত্য-রচনায় বাংলার সাহিত্যিকরা প্রায় একটি বিশেষ পথেই এগিয়ে এসেছেন। ভরসার কথা, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্যও এগিয়েছে। শুধু নিত্যনতুন বিষয়বস্তু এসে সাহিত্যের ক্ষেত্রটিকে যে বিস্তৃততর করেছে তা-ই নয়, সে-সঙ্গে ভুগোলেরও সীমা ভেঙেছে, কালের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ গত দুই দশকে বাংলার কথা-সাহিত্য দু'কূলপ্লাবী হয়ে কত সমস্যা গড়েছে, কত সমস্যার সমাধান করেছে, কত-যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে আর কতবার দ্বিধান্বিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, সামান্য কয়েক আঁচড়ে তার হিসাব নেওয়া সম্ভব নয়। এটুকু এখানে বলা যেতে পারে, এই দ্রুত ধাবমান স্রোতটিকে বইয়ে দিয়ে যাওয়া মাত্র কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না এবং তাই ইতিমধ্যে অনেক সম্ভাবনাময় নতুন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা-সাহিত্যে। পৃথকভাবে নাম করে লাভ নেই। পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন, সাম্প্রতিক-কালে যত সাহিত্যিকের নব-নব দানে বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মধ্যাহ্নকালে এত সাহিত্যিকের সন্ধান বাংলা-সাহিত্য পায়নি। তাতে ফল-যে অবশ্যই ভালো হবে তার নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই নেই। এ-কথা অবিশ্বাস্য যে অনেক লেখক একই সঙ্গে স্বকীয়তা বজায় রেখে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করে যেতে পারেন নিতান্ত অল্প সময়ে। কেউ যদি বলেন, এমন অনেক লেখকের নাম করা যায়, যাঁরা গত দুই দশকের প্রথম দিকে অসম্ভব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিলেন এবং কিছুকাল গৌরবজনক সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন অথচ ইতিমধ্যে তাঁরা ক্ষয়িত হয়ে-হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত। সে-সঙ্গে এ-ও বলি, এইটিই কোনো সাহিত্যের পক্ষে অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়। বিশেষ কয়েকজনের স্তিমিত শক্তি একটি প্রবল স্রোতকে আটকে রাখতে পারে না। পেছনের প্রচণ্ডতর শক্তি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেই। আমি বলি, বাংলা কথা-সাহিত্য কখনও সেই সম্ভাবনাময় শক্তিকে হারায়নি। যাঁরা আজ হৃতশক্তি তাঁরা রচিতরচনে ব্যস্ত থাকুন, আমাদের মাথা ব্যথা নেই, আমরা দেখতে চাই আজকের শক্তিধরদের আর পরীক্ষা করতে চাই আগামীকালের সম্ভাবনাকে।

তবু একটা সংশয় ক্ষণে ক্ষণে পাঠকমনকে দোলা দিয়ে যায় বৈকি। এই-যে দু'কূলপ্লাবনে আর প্রাণের শ্রাবণে আজ বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ভরে উঠছে তাতে সতিাই কিছু শক্তির পরিচয় জড়িয়ে আছে তো, নাকি গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তিতেই আধুনিক সাহিত্যসম্ভার শুধু শুধু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে! গল্পগুচ্ছের পর থেকেই একটা কথা আমরা প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতোই শুনে আসছি, বাংলা ছোটগল্প এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, এখন বিশ্বসাহিত্যের পাশে সে অনায়াসেই স্থান পেতে পারে। নিছক কথার কথা হিসেবে নয়, এ-উক্তির মধ্যে সত্যতা কিছু অবশ্যই ছিলো। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, মাণিক আদি এমন অনেক ছোট গল্পকারের নাম আজ আমরা এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে পারি, যাঁদের রচনা সত্যিই বিশ্বের যে-কোনো দেশের ছোট গল্প সাহিত্যের চেয়ে হীন নয়। এতকাল এটা আমাদের আভিজাত্য ছিলো, কিন্তু এখন যেন কথাটাকে অনেকটা অভিমানের মতো মনে হয়। এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে আজকের সাহিত্যিকরা যথার্থ উন্নত মানের গল্প রচনায় অক্ষম। এবং বলা উচিত, অনেক লেখকের সন্ধান আমরা এখনও পাই যাঁদের রচিত ছোট গল্প বাংলার সমাজজীবনকে উন্মুক্ত করেও বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদায়

উদ্ভাসিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যদিও শ্রেষ্ঠ রচনা তৈরী করা একজন লেখকের পক্ষে সব সময়েই সম্ভব নয়, সে-হেতু ক্রমাগত একই লেখকের কাছে আমরা শ্রেষ্ঠ রচনা আশা করতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশে তো কথা-সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়, এবং সৎসাহিত্যিক আছেন যথেষ্ট, অথচ একই বৎসরে সাহিত্যিকারের ভাল গল্পের সংখ্যা তো তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারছেন না। বাংলাদেশে, বরং বলা উচিত কেবল এই কলকাতা শহরেই; পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। তাদের সংখ্যা আজ এমনি অমিত যে এইটুকু খণ্ড দেশের পক্ষে তা প্রায় আশ্চর্য-জনক বলে মনে হতে পারে। অন্য দিকে, যদি ধরেও নেওয়া যায়, বাঙালি পাঠক-পাঠিকারা এই সব পত্র-পত্রিকার প্রতি সমান আগ্রহকুল, তা হলেও এ-সত্যটি টিকে থাকে যে পাঠকজন সাধারণত যা চান তা, প্রবন্ধ নয়, কবিতা নয়, অন্য কোনো আলোচনা নয়—শুধু গল্প, ছোট হোক বড় হোক—গল্প। গল্পের রসাস্বাদন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, অধুনাকালের যাঁরা প্রখ্যাত; কথা-সাহিত্যিক তাঁরা ধীরে-ধীরে এবং নিশ্চিতভাবে ছোট গল্প রচনার সূক্ষ্ম তুলিটি গুটিয়ে ফেলছেন, আর তার পরিবর্তে হাতে তুলে নিচ্ছেন উপন্যাস-রচনার উপযুক্ত মোটা তুলি। অনভ্যাস মানুষের বড় কঠিন শত্রু। তাই শুধু শারদীয়া সংখ্যার মরশুমে তাঁরা যখন নতুন করে ছোট গল্প লিখতে বসেন তখন তা না হয় ছোট গল্প না হয় উপন্যাস। আর আমরা হতভাগ্য পাঠকরা খেই হারিয়ে অতৃপ্তির জ্বালায় ভুগে মরি। কেন এমন হচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ঠিক এই মুহূর্তে যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন তাঁরা সবাই জানেন এর পেছনের রহস্যটা কি। তবু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। পত্র-পত্রিকা তথা বাংলাদেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকার চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে ছোট গল্প লেখা হবেই, আরো আরো বেশী করেই লেখা হবে। কিন্তু তাতেই কি আমাদের জাত্যাভিমান রক্ষিত হবে। এমন বলি না, নবীন ছোট গল্পকারদের সকলেই অক্ষম। বরং স্বীকার করা ভালো, এরই মধ্যে কখনও-কখনও চকিত বিদ্যুতের আভাসও পেয়েছি। কিন্তু বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ-ই, সে-ক্ষণিক আলোর দ্যুতিকে দীর্ঘকালের জন্য ধরে রাখতে না পারে লেখক নিজে, না পারে তার সদ্যপরিচিত পাঠকজন। সুতরাং প্রবহমান গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই কোনো পক্ষেরই। কিন্তু তাতে সাহিত্যের স্বাস্থ্য বজায় থাকে না।

ঐতিহাসিক কারণেই একটি প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন ছিলো। সে-প্রচণ্ডতা আছে কিনা তা আজও হয়তো প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু 'নূতন রীতি' আঘাত দিয়েছে। শুধু লেখকমহলেরই টনক নড়েনি, পাঠকসাধারণও অনেক অনেককাল পরে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। সাপ্তাহিক, মাসিক দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত বাংলার সাহিত্যজগত ইতিমধ্যে এই নব আগন্তুক নূতন রীতির স্তুতিনিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। এমনটা না হলেই অবাক হওয়ার কারণ হতো। এটা যে সত্যিই একটা আন্দোলন, এবং বলিষ্ঠ আন্দোলন, আন্দোলিত পত্রিকাগুলো আর তাদের মারফৎ বিদগ্ধ সমালোচকেরা তো স্পষ্টই প্রমাণ করেছেন। নূতনত্বের স্বাভাবিক ধর্মই হলো প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী সমস্ত শাসনশৃঙ্খলাকে ভেঙে দেওয়া। তাকে গড়তেও হবে, কিন্তু সে পরের কথা। ধ্বংসস্তূপে সংসার টেঁকে না। সুতরাং নতুন সংসার এক সময় মাথা চাড়া দিয়ে অবশ্যই উঠবে। কিন্তু নূতনত্বে চমক থাকলেই প্রচলিত বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলার অধিকার জন্মায় না। সুতরাং নূতন রীতির স্বরূপটিকে চিনে নিতে দোষ নেই।

নামটা বিপ্লাত্মক—তবু, নূতন রীতিই কেন? কোনো রীতি বা নীতির শৃঙ্খল দিয়ে তো কখনও সাহিত্যকে বাঁধা যায় না। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগে ধরাবাঁধা কতকগুলো আইন তৈরী হয়েছিলো বটে, কিন্তু আজ সাহিত্যপথ এতদূর এগিয়ে এসেছে যে, সে আইনশৃঙ্খলার কথা

আজ আর কেউ মনেও আনে না। তা'ছাড়া কবিতার পক্ষে যা প্রায় অবশ্য মান্য, কথা-সাহিত্যের পক্ষে তা মান্যই নয়। যদিও নূতন রীতির ভাষ্যকার ছোট গল্পকে নির্দ্বিধায় কবিতার আত্মীয়রূপে প্রকাশ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, তা হলেও কবিতা এবং ছোট গল্প চিরকালই দ্বৈতরূপে বিরাজ করবে। কারণ তারা ফর্মে তো বটেই, ধর্মেও একেবারে ভিন্ন। দুয়ের মধ্যে বিবাহ ঘটাতে গেলে আমরা কবিতা এবং ছোট গল্প দুটিকেই হারাবো। আবার আইন দিয়ে সাহিত্যকে নিমন্ত্রণ করার মধ্যে আর যাই থাকুক, বুদ্ধির পরিচয় নেই। সাহিত্য ব্যাপারে আর এক অর্থে আমরা রীতি শব্দটিকে ব্যবহার করতে দেখেছি—রচনা-রীতি। কিন্তু সাহিত্য দরবারে প্রবেশের পক্ষে প্রথম ছাড়পত্রই তো এই রচনারীতি। তা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে রচনা-রীতিতে অর্বাচীন লেখক অতি সাধারণ একজন পাঠকের কাছ থেকেও বাহবা পাবে না। সুতরাং, সাহিত্যের সঙ্গে যখন রচনা-রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন তার সরব উপস্থিতি প্রচার করা অর্থহীন। অন্য পক্ষে, রীতি বলতে যদি আক্ষরিক অর্থে স্টাইল বুঝি তা'হলে তাকে একটা বিশেষ আন্দোলন ব'লে মানবো না। কেননা স্টাইল কখনও দল বেঁধে আয়ত্ত করা যায় না। 'ষ্টাইল্ ইজ্ দি ম্যান'—সে ব্যক্তিপ্রতীক, কদাপি দলের মুখাপেক্ষী নয়। এতখানি ব্যক্তিসর্বস্ব যে মোহিতলাল মজুমদার স্টাইল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শব্দ দুটিকে একার্থক বলে বিবেচনা করেছিলেন—তাঁর মতে স্টাইল-এর একমাত্র বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বাণী'। এই বাণীই একজন লেখককে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। কথাটাকে আরও একটু বিশদভাবে বোঝা দরকার। কেবল রচনাশৈলীর সৌন্দর্যবিধানই কোনো লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না, যদিও সুন্দর রচনা সৃষ্টি করা তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব। কেমন করে বলবো আর কী বলবো এ-দু'য়ের মধ্যে কার গুরুত্ব যে বেশী, আজ পর্যন্ত তা স্থিরীকৃত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে এতটুকু পর্যন্ত জোর করে বলা যায় যে, সকল সময়েই লেখক তাঁর একটি বিশেষ ভাবনাকেই রচনার মারফৎ প্রকাশ করে থাকেন। এবং ভাবনাটা যখন তাঁর মনের মধ্যে আসে তখন নিতান্ত একটি ছায়া হয়ে আসে না। মনের চিন্তা তখনই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যখন সে সম্পূর্ণ একটি রূপ পায়। এই সম্পূর্ণ রূপটি কতকগুলো অর্থবহ শব্দের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তার অর্থ লেখকের ভাবনা মনের মধ্যে জন্ম নেয় তার গঠনটিকে সঙ্গে নিয়েই। সে গঠনটিকে একটু এদিক-ওদিক করলেই, মনের ভাবনাটিও অদল-বদল হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে বক্তব্যটিকে আমি এ-ভাবে সাজাতে পারি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচনাশৈলী এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একের থেকে আর একে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া অসম্ভব। সুতরাং মানতেই হবে একজন বিশেষ লেখকের যা রীতিভঙ্গি তা কোনো প্রকারেই আর একজন লেখকের হতে পারে না। এ অবস্থায় যে নামই দেয়া যাক—একই সঙ্গে একাধিক লেখক একটি রীতিকেই আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবে, এ কল্পনাও হাস্যকর। এককালে এ ধরণের একটি অনাবশ্যক সমস্যা সাধারণ পাঠক মহলকে চিন্তিত করে তুলেছিলো, ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মধ্যে কে বড়। বলা বাহুল্য এ প্রশ্নে তাঁদের কেউ-ই ছোট হয়ে যাননি, তাতে শুধু এই-ই প্রমাণিত হয়েছিলো যে, দু'জনের উপন্যাসই পাঠকদের মনের ওপর রেখাপাত করেছে। যে সমস্যার সমস্যার সমাধান কোনোদিনই হতে পারে না, তা সেদিনও অমীমাংসিতই থেকে গেছে। তার কারণ, একই কালে এবং একই সমাজদেহের অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন, সমাজচিন্তা উভয়কেই ভাবিত করেছে—কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা পৃথক সেহেতু তাঁদের চিন্তা ভিন্ন, বিষয়বস্তু ভিন্ন সুতরাং রচনাভঙ্গিটিও একেবারেই আলাদা। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও তেমনি আপন স্বাতন্ত্র্যেই শরৎচন্দ্র। অথচ দু'জনেই সমকালের শ্রেষ্ঠ রচনাকার। মনে হয় নতুন রীতির লেখকবৃন্দ এদিক থেকে

কিঞ্চিৎ ভুল পথ অবলম্বন করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর পর কয়েকজনের লেখা গল্প পড়লেই ধরা পড়বে যে তাঁরা লেখনভঙ্গিতে একটিমাত্র রীতি প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী। লেখকের নাম আগে জানা না থাকলে একজনের লেখা আর যে-কোনো একজনের বলে মনে করতে দ্বিধাবোধ হয় না। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁরা অবশ্যই বলতে পারেন, একই কালের সমাজচিন্তা যখন একাধিক লেখককে ভাবিত করছে এবং যেহেতু লেখকের চিন্তা বাণীময় হয়েই হৃদয়কে আলোড়িত করে, তখন একই ভাব ও ভঙ্গি একাধিক লেখকের লেখায় প্রকাশ পাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! যুক্তি সুন্দর হলেও মানতে পারবো না এই জন্যে যে, লেখক পুতুল নয়, সুতরাং দৃশ্যমান বস্তুকে দেখবার ও বুঝবার দৃষ্টি ও বুদ্ধি তার নিজস্ব, এবং এই দৃষ্টি বুদ্ধিতে সে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, নকলপ্রিয় হতে চাইলেও তার স্বরূপ বার বারই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তদুপরি, সাহিত্যচিন্তা আরো বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এত সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ যে, আপন ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত লেখক কখনও তৃপ্ত হতে পারে না। সুতরাং পাঠকমনে আশঙ্কা জাগাটাই বিচিত্র নয় যে, রচনাশৈলীতে বিশেষ একটি রীতিভঙ্গির প্রচলন করাও নতুন রীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে সমস্ত কাঠামোটা অচিরে ভেঙে পড়তে চাইবে নাকি? কেন-না, সাহিত্য যে বৈচিত্র্যসন্ধানী—শুধু বিষয়ে নয়, ভঙ্গিতেও। '.... it is possible to see that the development of classic prose is the development towards a common style.' এলিয়টের এ উক্তি দিয়েও আমরা হয়তো তাঁদের পক্ষসমর্থনে সান্ত্বনা খুঁজে পেতাম, কিন্তু ক্ল্যাসিক্সের সহজতম ব্যাখ্যা জেনেও কি নতুন রীতি ক্ল্যাসিক্স?

ইতিমধ্যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উঠেছে নতুন রীতির লেখকদের বিরুদ্ধে। কথা-সাহিত্যে এ এক অভিনব ব্যাপার সন্দেহ কি! কবিতায় দুর্বোধ্যতা অসঙ্গত নয়, বরং দেখা গেছে দুর্বোধ্যতা কবিতাকে মহিমান্বিতই করে। কবি একটি মুহূর্তের চকিত অনুভূতিকে কলমের আঁচড়ে ধরে রাখতে চান তাঁর কবিতার মধ্যে। এ অনুভূতি তাঁর একার, কবিতার পাঠক হিসেবে আমরা তাঁর অনুভূতির শরিক হতে পারি, কিন্তু যত গভীরে পৌঁচেছে তাঁর অনুভব আমরা যদি সেখানে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, তা'হলে সে কবিতা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু, এ কথা কখনই বলা চলবে না, দুর্বোধ্য বলেই সে কবিতা ব্যর্থ। কিন্তু গদ্যর রচনায়, বিশেষত, কাহিনী বর্ণনায় সে যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো বলা যায়, ছোট গল্পও একটি ক্ষণিক মুহূর্তেরই কথা, সে মুহূর্তটি একটি অনুভবের মতো হয়েই ধরা দিয়েছে একজন গল্পকারের হৃদয়ে, তা'হলে তাঁর প্রকাশেই-বা দুর্বোধ্যতা আসতে পারবে না কেন। পারবে না এই জন্য যে, কবিতা কবির একারই হৃদয়ের প্রকাশ, কিন্তু ছোট গল্প সামাজিক মানুষের হৃদয় উদ্ঘাটন। একটা অন্তর্মুখী, অন্যটা বহির্মুখী। কবির ক্ষণমুহূর্তটিকে বুঝতে হয়তো আমাদের ভুল হতে পারে, কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে তিনি যখন আমাদেরই মত দশজনের একজন, তখন তাঁকে বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এখানে মুহূর্তটি যদি কবিতার বিষয় হয়, তবে স্বয়ং কবি একটি ছোট গল্পের বিষয়। ছোট গল্প 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' হবে কেন? মানুষের মন অবশ্যই 'এ্যাবস্ট্রাক্ট', হয়তো অনেক প্রতীক চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে বুঝতে হতে পারে, কিন্তু তার শেষ প্রকাশ তো একটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই। তা যদি হয়, তবে কেমন করে স্বীকার করবো, অসংলগ্ন প্রতীক চিত্রকল্প উপমা ইত্যাদি ব্যবহারেই জীবনজিজ্ঞাসার গুরুদায়িত্ব শেষ হয়ে গেলো। আমি বলি, এ দুর্বোধ্যতা নয়, লেখকের দুর্বলতামাত্র। আর এ দুর্বলতা ঢাকবার অন্তিম প্রচেষ্টা দুর্বোধ্য আঙ্গিক ব্যবহারে। র‍্যালফ্ ফক্সের মতো যদি বলতে পারতাম, মহৎ শিল্পী কখনই প্রচলিত গঠনরীতিকে পরোয়া করে না, প্রয়োজন হলে নতুনতর রীতি-নিয়ম তাঁকে

তৈরী করে নিতে হয়, তা'হলে সত্যিই খুশি হতে পারতাম। কিন্তু নতুন রীতি তো সত্যিই কিছু নতুনতর রীতি প্রবর্তন করছে না, এ যে তাঁদের আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র।

কোনো আন্দোলনই আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। তার পেছনে অবশ্যই একটি পরিকল্পনা থাকে—একটা স্পষ্ট বক্তব্য সে পরিকল্পনাকে রূপ দেয়। মূল রচনা এবং কিছু আলোচনা থেকে সেটুকু আন্দাজ করা যায় তাতে মনে হয়, নতুন রীতি প্রকাশ করতে চাইছে বর্তমানকালের অবক্ষয়ের কাহিনী। সুতরাং নতুন রীতি অবক্ষয়বাদের সাহিত্য। সামাজিক তথা মানবিক অবক্ষয়। স্বীকার করতে বাধা নেই, অন্তত সেটুকু চেষ্টা তাঁরা করেছেন, তাতে ব্যর্থ হননি। কিন্তু সমাজ বা মানুষের দিকে তো পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি আজো পড়লো না। সমাজের ভেতরে আজই ঘুণ ধরেনি—আর সে ক্ষতটিকে চিনবার এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা আজই নতুন করে দেখা দিচ্ছে না। বাংলা সাহিত্যের লেখকরা যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সমাজ এবং মানুষের ভেতরকার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে সাহিত্যের মারফৎ উপস্থাপিত করার চেষ্টা তাঁরা বহুকাল যাবৎই করে আসছেন। গত বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের বাংলাদেশ এক বিচিত্র দেশে পরিণত হয়েছে। আঘাতের পর আঘাতে তার দেহ নিত্য ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। তার ফলে নানা জটিলতা ঢুকেছে সমাজে আর কুটিল-কুটিলতর হয়ে উঠছে সামাজিক মানুষ। তাদের কথা বলতে হবে বৈকি সাহিত্যের মারফৎ, শুধু তাদের আশা-আনন্দের কথাই নয়, তাদের দুঃখদৈন্যের কথাও। নতুন রীতির নতুন লেখকরা ভুল করেননি তাঁদেরভাবনায়। আশা করেছিলাম পূর্বতন সাহিত্যিককুলের কাছে তাঁরা হাত পাতবেন না তাঁদের বক্তব্যের সমর্থন চেয়ে, কিংবা তাঁরা পূর্বজনদের পথ থেকে অনেকখানি দূর দিয়েই হাটবেন। কিন্তু তাঁরা হতাশ করেছেন। নতুন জীবনবেদের এই নবীন ভাষ্যকারদের যে-কটি রচনা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে স্পষ্টতই মনে হয়েছে সমাজের অতিনিন্দিত অবক্ষয়কে যেন তাঁরা অনেক পরিশ্রমে আবিষ্কার করেছেন কেবলমাত্র নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে। এ সম্পর্কে বৈধ কি অবৈধ সে প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না। সাহিত্যে সে আলোচনাই অবান্তর। ব্রাদার্স কারামাজভ্, অ্যানা কারেনিনার মতো উপন্যাস বৈধ কাহিনীকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি, রোহিনী বিনোদিনী রমারাও বিধবা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীরই বিধবা। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের যে-অংশটুকু দিবার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই বৈষ্ণব সাহিত্যটিই দাঁড়িয়ে আছে পরকীয়া প্রেমকেই আশ্রয় করে। সুতরাং নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিক্ষেপে দোষ নেই। আমরা জানতে চাই সমাজের অবক্ষয় কি ওই একটিমাত্র স্থানেই প্রবেশ করেছে? শুধুমাত্র বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজনে মানুষ আজ ক্ষণে ক্ষণে দিকভ্রান্ত। কেবলই মানুষ নয়, মানুষীও। পথের বাঁকে-বাঁকে যেখানে যতটুকু ক্ষীণ আশ্রয় সে আবিষ্কার করতে পারছে, তাকেই দৃঢ়মুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরতে সে এগিয়ে যেতে চায়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে রোজ হেরে যাচ্ছে স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা—প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে প্রচলিত মূল্যবোধ। 'There is no love sincerer than the love of food' G. B. S.-এর এ উক্তি কি বিদ্রূপমাত্র! বস্তুত এই অর্থনীতিটাই আজ সবচেয়ে বাস্তব। তারই অস্থির তর্জনীসঙ্কেতে উঠ্‌ছে নামছে মানুষের সমাজ আর সে-সঙ্গে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন, বিকৃত হচ্ছে সনাতন মূল্যবোধগুলো। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল আজ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তা তো এই বৃহত্তর অবক্ষয়ের সামনে এক অংশমাত্র। নবীন লেখকগোষ্ঠী অর্থনীতির বাঁকা পথটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন কেন? এখন যে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এই বিরাট কালো গহ্বরটাকে আপামর সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া। নাকি তার নগ্ন বীভৎসতার দিকে দু'চোখ মেলে তাকাতে সাহস পাচ্ছেন না নতুন রীতির নতুন সৈনিক।

কটূক্তি করতে হলো। তবু জানি, এ আলোচনাকে সহ্য করবার মতো শক্তি আছে নতুন রীতির নবীন আগন্তুকদের। তাঁদের শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে বলেই আলোচনা করার ভরসা আমি পেয়েছি। তাঁরা সখের শ্রমিক নয়। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও তাঁরা ধৈর্যশীল পরীক্ষার্থী—সাহিত্যের নবদিগন্তসন্ধানী। এইটেই তাঁদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো আশার কথা। স্থবিরের শাসন-নাশনে যারা ব্রতী হতে সাহস পায়, তারা একা আমার নয়, আমার মতো আরো অনেকের অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এরা নবীন পথিক, সাহিত্যের পথও সুগম নয়। পথিকৃতের ষোলো আনা দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সদাসচেতন। অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে নিয়ত তাঁরা নতুনতর পথের সন্ধান পাবেন, এ বিশ্বাস তাঁদের মতো আমারও আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো হীরকদ্যুতি সুডোল সুন্দর গল্প রচনার রীতি তাঁরা হয়তো আজও আয়ত্ত করতে পারেননি, মাণিকের মতো অভিজ্ঞতার পোড় খাননি জীবনে, জীবনের গভীরতায় অবগাহন করেননি তারাশঙ্করের মতো—কিন্তু বিপুল সুদূর সাহিত্যপথ বিস্তীর্ণ তাঁদের সামনে। আপন বৈশিষ্ট্য, নিজের বাণীরূপকে সত্যি করে একদিন তাঁরা আবিষ্কার করতে পারবেনই, সেদিন হয়তো তাঁদের রীতি আর নতুন রীতি থাকবে না। না থাকলেও দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই—কারণ, অবক্ষয়টাই জীবনের একমাত্র সত্য নয়, কল্যাণটাও সত্য, অধিকতর সত্য। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণময় সম্ভাবনার রূপটিই উম্ঘাটিত হয়ে এসেছে মহৎ সাহিত্যে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আজকের নতুন রীতির বলিষ্ঠ লেখকেরা মানুষের সেই মহান মনুষ্যত্বকেই অবমাননা করবেন। 'হিষ্ট্রি ডাজ নট ড্রিঙ্ক নেক্টার একস্পেপট ইন দি স্কাল্স অব দি স্লেন' মার্ক্সের এ আবিষ্কারকে পৃথিবীর ইতিহাস কি বার বারই সত্য বলে প্রমাণ করেনি?

সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প সাহিত্য এগিয়ে চলেছে, সংখ্যায় প্রচুর কিন্তু বিশেষত্বে সামান্য। এরি মধ্যে চকিত চমকও হঠাৎ কখনও চোখে পড়েছে। (কিন্তু তাতে অতসী মামীর বিস্ময়, রসকলির মাধুর্য কিংবা ফসিলের স্ফুলিংগ নেই।) তা থেকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, অন্ততঃ পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ লেখকদের চেয়ে আজকের লেখকরা নিশ্চিতরূপে অধিকতর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং মেনে নিতে বাধা কি বাংলা ছোট গল্প সাহিত্যে ৬১-৬২ সনের একমাত্র সংবাদ নূতন রীতিই। তাছাড়া আর কোনো বিশেষ বৈচিত্র্য নেই।

দ্বারকানাথের তীর্থযাত্রা

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথের মা অলকাদেবী যখন তীর্থে যান—কাশী, বৃন্দাবন—তখন দ্বারকানাথ সংগে ছিলেন না। সে সময়ে স্থলপথে চোর ডাকাত ঠগীদের উৎপাত—পথঘাট বিশেষ ভালো নয়। পশ্চিমে তখনো ছোটখাট যুদ্ধ বিদ্রোহ লেগেই আছে। তাই জলপথে যেতে হয়; আর জলপথে ভ্রমণ বড় সময়সাপেক্ষ। তখনো গংগায় ষ্টীমার চলা আরম্ভ হয়নি।*১ দ্বারকানাথের তখন সময়ের বড় অভাব। তাঁর বিরাট প্রতিভা ও অসাধারণ পরিশ্রম দিয়ে তিনি তখন তাঁর ঐশ্বর্যের ভিত বুনছেন। কোম্পানীর চাকুরী তখনও তিনি ছাড়েন নি। নিজের ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তাছাড়া রামমোহন রায়ের সংগে মিলে তখন দেশহিতকর কাজে মেতে উঠেছেন—এক কথায় তিনি কাজে আকর্ণ ডুবে।

তারপর কয়েক বছর গেল। এর মধ্যে সতীদগ্ধ করা বন্ধ হয়েছে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুণ্যার্থীদের পথে ঠগীদের অত্যাচার কম হয়েছে, এলাহাবাদে নবপ্রতিষ্ঠিত রেভেনিউ বোর্ডের আফিস থেকে ঘোড়ার ডাকগাড়ী কলকাতায় নিয়মিত এসে পৌঁছাচ্ছে—গংগার উপর সরকারী স্টীমার চলতে আরম্ভ করেছে—এককথায় সারা দেশটায় ক্রমশঃ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া আসছে।

সেই সময়ে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিংক বিলাত রওনা হওয়ার কিছুদিন বাদেই দ্বারকানাথ বের হলেন পশ্চিমে বেড়াতে ও তীর্থ করতে।

তখনও রেলগাড়ী হয় নি, বাংলার সুবাতে সৈন্যসামন্ত পাঠাবার জন্য শের শা'র সময় থেকে গাঁথা পুলগুলো ক্রমশ ভেংগে পড়ছে। দিল্লীর সম্রাটের রাজত্ব তখন দিল্লী সহরের কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, দিল্লীর মসনদ তখনও খালি হয় নি। দ্বিতীয় আকবর ও বাহাদুর শা'র রাজত্ব তখনও মোগল আধিপত্যের জের টেনে ফুরিয়ে যায় নি। অসংখ্য ছোট-মাঝারি রাজা-নবাব-জায়গীরদাররা দুর্বলের সর্বনাশ করে, নিজেদের বাহুবলের আস্ফালন করে যে অশান্তি আবহাওয়া সারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে জাগিয়ে তুলেছিল তার জের তখনও সম্পূর্ণ মেটে নি। ইংরাজ সরকার তখনও সওদাগর কোম্পানীর সরকার। রীতিমতভাবে শাসনভার-নিজ হাতে তুলে নিতে ইংরেজ সরকারের তখনও বিশ বৎসর বাকী। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তখনও তৈরী হয় নি। সেই সময়ে গাড়ী করে দ্বারকানাথ বের হলেন পশ্চিম দিকে। এ পথে তখনও লোক চলাচল যথেষ্ট ছিল। বড় বড় নদীগুলোয় নৌকা করে পারাপার করার অসুবিধা ছিল না।

দ্বারকানাথ রামমোহন রায়ের আওতায় এসে একেশ্বরবাদী হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে কেবল তীর্থ করে পুণ্যসঞ্চয় করতে বের হওয়াটা নিঃসন্দেহে বিশবাস্য নয়।

আমার মনে হয় তাঁর পশ্চিম ভ্রমণের কারণ ছিল একাধিক। বড়লাট বেণ্টিংক তখন গংগানদী বরাবর স্টীমার নিয়মিত চালানোর এক পরিকল্পনা পেশ করে গেছেন। সে পথে স্টীমার চালিয়ে পণ্য রপ্তানি আমদানী করার ইচ্ছা দ্বারকানাথের ছিল। কিভাবে এটা করা যায় কতদূর পর্যন্ত চললে কতটা লাভ এই সব তথ্য সরেজমিনে দেখে তথ্য সংগ্রহ করা একটি উদ্দেশ্য ছিল বোধহয়। সেই কারণেই তিনি সম্ভবতঃ ফেরার সময় জলপথেই ফেরেন। দ্বারকানাথের দেশ ভ্রমণের শখও ছিল যথেষ্ট; যার কারণে পরে বহু বাধা সত্ত্বেও তিনি ইউরোপের

নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও নিজে তিব্বত পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছিলেন। তিনিও বোধহয় দ্বারকানাথের মনে ভারতবর্ষের পুরাতন সফলকীর্তির সঙ্গে পরিচিতির ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের বন্ধু তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেন্টিংকও কোম্পানীর বিশাল রাজত্বে লোকের অবস্থা জানবার জন্য বিভিন্ন অংশে অবিরাম ঘুরে বেড়াতেন।২ তাঁর কাছে শুনেও দ্বারকানাথ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান নানা যুগের সৃষ্টিবৈচিত্র দেখতে চাইবেন আশ্চর্য কি? এর উপর তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় কতকটা উপরি লাভ। তীর্থদর্শনের কথাটা উল্লেখই করতাম না, কিন্তু যে গোঁড়া বৈষ্ণব আবহাওয়ায় তিনি জন্মেছিলেন তার প্রভাব তখনো তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তিনি "সাহেবমেমদের খানা দিলে, খানার টেবিলে বসতেন না, এবং খানার শেষে গঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও বস্ত্রত্যাগ করে শুদ্ধ হইতেন।" শোনা যায় যে বৈঠকখানা ঘরে ঐ সব খানা-পিনার পর টেবিলটিকে পর্যন্ত পুকুরে এনে ফেলা হ'ত। সেকালে কেবল ম্লেচ্ছ খাওয়া নয়, তার এঁটো কোথায় ফেলা হবে সে পর্যন্ত একটা ভাবনার কারণ ছিল। ঐ রকম খানাপিনার পর একবার হাড়গোড় নিকটবর্তী ভোলানাথ চাটুয্যের বাড়ীর কাছে ফেলাতে তিনি ভয়ানক রেগে গিয়ে শাপমন্যি দিতে থাকেন। তিনি রেগে পৈতা হাতে করে মদন চাটুর্যের *৩ বাড়ীতে এসে বলেন—"আমি যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হই, তবে ঐ বাড়ীতে মদ আর মাংসের ছড়াছড়ি যাবে।" একটি পরম বৈষ্ণব পরিবারের পক্ষে এটা একটা দারুণ অভিসম্পাত সন্দেহ নাই। এ ঘটনার সময়েও দ্বারকানাথের মা বেঁচে।

দ্বারকানাথ বিদেশযাত্রার সময় পাইক বর্কন্দাজ চাকর বামুন ছাড়া অন্তত একজন ডাক্তার সর্বদাই সঙ্গে নিতেন। কেবল তিনি কেন, সে সময় ডাক্তার, বৈদ্য ওষুধ কোনটাই পথে সহজপ্রাপ্য ছিল না; তাই অবস্থাপন্ন লোকেরা প্রায়ই দরকারী ঔষধপত্র সমেত কোন পরিচিত বৈদ্যকে সঙ্গে নিতেন। দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়েছিলেন ডাক্তার বাটলার নামে এক সাহেব ডাক্তারকে। এঁকে ছাড়া একটি মেধাবী বৈদ্যসন্তানকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। এঁর নাম দ্বারকানাথ গুপ্ত। পশ্চিম থেকে ফিরে এসে ইনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হ'ন এবং প্রথম বাঙ্গালী ডাক্তারদের অন্যতম হয়ে পাশ করেন। এঁর তৈরী জ্বরের ধন্বন্তরি ঔষধ নতুনবাজারের কাছে চিৎপুরের উপর ডি গুপ্ত এণ্ড কোং থেকে বিক্রী হত।

দ্বারকানাথ সপারিষদ কলিকাতা থেকে বর্ধমানে গিয়ে রাজবাড়ীতে ওঠেন। সেখান থেকে রাণীগঞ্জ পথে গেলেন। রাণীগঞ্জে তখন কয়লা তোলা সুরু হয়েছে। সেটা এদেশের কয়লাখনির প্রথম যুগ। কয়লা পরিমাণে পাওয়া যেত কম; চালানের ব্যবস্থাও ছিল অনিয়মিত। এলাহাবাদে রেভিনিউ বোর্ড ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য পৃথক প্রধান আদালত হওয়ায় কলিকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগ রাখার জন্য সরকার কয়েকটি স্টীমার বহাল করেছিলেন। সেগুলির জন্যও কয়লা সব সময় ঠিকমত পাওয়া যেত না। সে যুগের স্টীমার এখনকার তুলনায় কয়লা খেত বেশী আর মাল টানবার ক্ষমতা কম ছিল বলে নিজের দরকারী কয়লা বেশী পরিমাণে পারত না। তাই

১ বিলাতে প্রথম নিয়মিত স্টীমার চলে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, রেঙ্গুনে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, এদেশে বেন্টিংকের সময় ১৮৩০ সাল নাগাদ।

২ ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ

৩ দ্বারকানাথের ভাগিনেয় মদন চাটুয্যে। রবীন্দ্র ভারতীর পিছন দিকে চিৎপুর থেকে তাঁর নামের যে রাস্তা চলে গেছে সেইখানেই তাঁর বাড়ি ছিল। বর্তমানে ঐ বাড়ি মাড়োয়ারীরা কিনে বহু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করেছে; তবুও পুরাতন স্মৃতি কিছুটা এখনও বিদ্যমান।

অতিরিক্ত ব্যয়ে গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে কয়লা ডিপো করে মজুত রাখা হত—এই আড়ত খরচা পাটনায় পড়ত মন পিছু বারো আনা, এলাহাবাদে এক টাকা। দ্বারকানাথ রাণীগঞ্জ কয়লাখনির কাজ নিজে দেখে লাভলোকসানের দিক খতিয়ে দেখে লন। এর কয়েক বছর পরে প্রথমবার বিলাত যাবার আগে দেখি দ্বারকানাথ আই. ডীনস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলে রাণীগঞ্জে কয়লার খনি থেকে কয়লা কাটাবার জন্য বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এ কোম্পানী এখনও আছে—যদিও দ্বারকানাথের বংশধর বা অন্য কোন বাঙ্গালীর তাতে কোন অংশ বহুদিন থেকেই নেই।

তারপর দ্বারকানাথ চল্লেন কাশীর পথে। কাশী দর্শন হিন্দুমাত্রের জীবনের মস্ত ঘটনা—বিশেষ সেকালে যখন পথ ছিল আজকের তুলনায় বহুগুণ দুর্গম। তীর্থের সঙ্গে তিনি ব্যবসারও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কারঠাকুর কোম্পানী তখন চীন থেকে রেশম আনাতেন—এবং কাশী থেকে বেনারসী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ সরাসরি কলিকাতায় ও বিদেশে চালানোর জন্য যোগা-যোগ করলেন।।

কাশী থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ ছেড়ে আগ্রার দিকে তখন এগিয়েছেন সেই সময়ে দ্বারকানাথের মা কলিকাতায় গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথের মায়ের মৃত্যুর বিশদ বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমরা পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে আনিলাম। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস না।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে বহিয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি বলিলেন, "তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমায় গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।" গঙ্গাতীরে একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিনরাত্রি জীবিত ছিলেন।........

রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে।··আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্ধ্বমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল-হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ গঙ্গা-তীরে পুঁতিয়া আসিলাম।"

দ্বারকানাথ যখন আগ্রায় পেঁছান তখনও মাতার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার নিকট পেঁছে নাই। তিনি এতাবৎ স্থানে হিন্দু কীর্তির উপর মুসলমানদের অত্যাচারের চিহ্নই দেখেছেন। মুসলমান কীর্তি যা এযাবৎ দেখেছেন তা সেরকম চমৎকার নয়। এই প্রথম তিনি আসল মোগল স্থাপত্যের সম্মুখীন হলেন। প্রাসাদ, কবর, মস্‌জিদ, মিনার সব তিনি ঘুরে ঘুরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। সিকান্দ্রা ও আগ্রার কবরগুলির প্রভাব তাঁরই তৈরী করে দেওয়া ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের কবরের উপরের স্মৃতিসৌধে। তাজমহল দেখে আর সকলের মত তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন তাজের দরজা থেকে বাজার বসত। তাজমহলের বাড়ীটুকু ছাড়া বাকী অংশটা অযত্নে পড়েছিল। খোদ তাজমহলের রঙ্গীন পাথর আর সোনা দুর্বৃত্তেরা তখন কিছু কিছু খুলে নিয়ে গেছে। তাজমহলের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—"এ একটা স্থাপত্য রত্ন-শ্বেত-পাথরের উপর দিয়ে

চোখ দরজা থেকে নক্সার উপর দিয়ে এ'কে বেকে মিনার বরাবর আকাশের দিকে উঠে যায়।"

দ্বারকানাথ আগ্রায় গিয়ে সেখানকার ডেপ্নটি গবর্ণর টমসন সাহেবের সংগে দেখা করেন। তিনি সোজা লাটসাহেব টমসন সাহেবের অফিসে ঢ্নকে যাচ্ছিলেন।*৪ তিনি কলকাতায় দ্বারকানাথকে খ্নবই চিনতেন এবং বেণ্টিংকের বন্ধ্ন হিসাবে খাতির করতেন। প্রহরীরা কালা আদমীকে এরকমভাবে ঢ্নকে আসতে দেখে আটকাতে গিয়েছিল কিন্তু সংগে এক সাহেব (ডাঃ বাটলার) ছিল বলে শেষ পর্যন্ত আটকায় নি। দ্বারকানাথ সেদিকে দ্নকপাত না করে যেখানে টমসন সাহেব মেলের চিঠি (চিঠি সপ্তাহান্তে কলিকাতা থেকে ডাক ষ্টীমারে বিলেত যেত) লিখছিলেন। সেখানে গিয়ে পিছন থেকে কাতুকুতু। বেচারী ত চম্নকে উঠেছেন—এরকম আস্পর্দ্ধা কার হতে পারে! তারপর ফিরে "ও হো, ডর্কি যে" বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। তখন লাট-বেলাট সরকারের সেক্রেটারী বা ঐরকম বড়সাহেবরাই একমাত্র দ্বারকানাথকে "ডর্কি" বলে ডাকতেন।*

আগ্রা দ্নর্গও দেখলেন। সেখানে তখনো ইংরেজ সৈন্যরা বাস করছে। মাত্র ত্রিশ বছর আগে সিন্ধিয়ার মারাঠা সৈন্যেরা ফরাসী সেনাপতি পেরনের অধীনে আর লর্ড লেকের ইংরেজ সৈন্য এই দ্নর্গ অবরোধ করে য্নদ্ধ করে গেছে। দ্বারকানাথ লোকজনসহ তাদের মধ্যে ঘ্নরে ঘ্নরে খ্নটিয়ে খ্নটিয়ে স্থাপত্য ও কার্নকার্য দেখলেন। সংগে একাধিক সাহেব অফিসার—লাটসাহেব বলে দিয়েছেন এ'র যেন কোন অস্নবিধা না হয়। সাধারণ সৈন্যেরা এদিক ওদিক ঘোরাঘ্নরি করতে করতে তাকিয়ে দেখে হবেও বা কোন রাজারাজরা। তারা আশ্চর্য হয় যখন দেখে যে এই দেশী ভদ্রলোক স্নন্দর ইংরাজী বলছেন। তারপর তারা কানাঘ্নষা শোনে যে ইনি এক "বাঙ্গালী বাব্ন"—কলিকাতার বড় লাটবাহাদ্নরের বন্ধ্ন—তখন তারা ভাবে তাদের অপ্নর্ণ দাবী দাওয়ার কি হচ্ছে, তার কোন খবর পাওয়া যায় যদি. কোন আর্জ্জি যদি পেশ করা যায়। তখনও বহ্ন ইউরোপীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছে কাজ করছে—কালা আদমির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলে যে লজ্জায় মাথা কাটা যায় সে ভাবটা তখনও সাহেব মহলে বিশেষত ইংরেজ সিপাইদের মতন চ্ননোপ্নটীদের মজ্জাগত হয় নি। দ্বারকানাথ যখন জাহাঙ্গির মহল, শিশমহল, মোতি মসজিদ দেখে মিনাবাজার বরাবর দিল্লী গেটের কাজ বরাবর পৌঁছেছেন, তখন তাদের কয়েকজন দ্বারকানাথকে একটা অন্নরোধ জানায়, বলে যে নিজেদের দ্নঃখ অস্নবিধা ত' আছেই কিন্তু তাদের প্রধান দ্নঃখ যে তাদের উপাসনাগ্নহটি (চ্যাপেল) সরকারের কাছে বহ্ন দরবার সত্ত্বেও সাহায্য না পাওয়ায় প্রায় ভেঙ্গে পড়ছে।

দ্বারকানাথ পাদ্রীদের বিশেষ পছন্দ করতেন না; কিন্তু কোন ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাও তিনি দেখাতেন না; তাই ঘরটি দেখতে চাইলেন। দেখলেন —দিল্লী গেটের পিছনে দ্নটী ঘর——এককালে বোধহয় প্রহরীরা থাকতো সেখানে। ইংরেজ সিপাহীরা এসে ঘর দ্নটিকে প্রার্থনা ঘরে পরিণত করেছে—উত্তরের চার্চ অফ ইংলণ্ডের আর দক্ষিণেরটি ক্যাথলিকদের। দ্বারকানাথ দেখলেন সত্যই দক্ষিণের ঘরটীর অবস্থা পড় পড়। ঘ্নরে গেটের তলায় দাঁড়িয়ে দেখলেন নাস্তালিক পার্শীতে উ'চ্ন উ'চ্ন করে আকবরের সময়ের তারিখ লেখা "১০০৮ হিজরী" (১৫৯৯-১৬০০ খ্নষ্টাব্দে) তার তলায় জাহাঙ্গীরের অভিষেকের স্ম্নতি স্বর্নপ লেখা ১০১৪ হিজরী। মোগল ঐশ্বর্য্যের এই ভগ্নদশায় ভাঙ্গা ফটকের ঘরগ্নলো সারাবার জন্য পাঁচ-শ টাকা তিনি সংগে

৪ মিঃ জেমস টমসন সাহেব ভিন্সেন্ট স্মিথের অন্নসার ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ সাল আগ্রা প্রদেশের সিফ্নটে সেন্ট পলের ছিলেন।

* গল্পটী ২৮।১০।১৮ ৯৬ খ্নষ্টাব্দে ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর "মেজমার দাদামশায়ের কাছে" শ্ননে লিখে রাখেন।

সঙ্গে দিয়ে চলে এলেন।

দ্বারকানাথ দিল্লী যান নাই। বোধহয় আগ্রায় তিনি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঐখান থেকে বৈষ্ণবতীর্থ মথুরা ও বৃন্দাবনের দিকে চলে আসেন।*৬ দুধারে গাছ দেওয়া বাঁধা পথ। জাঠেরা মারাঠারা এপথ দিয়ে যুদ্ধের বেশে কতবার যাতায়াত করেছে। এ পথে মারামারি কাটাকাটি থেমেছে ১৮০৩ সালে ইংরেজ মথুরা দখল করার পর। সেই পথ দিয়ে দ্বারকানাথ এলেন মথুরায়। বড় বড় পাথর ফেলে তৈরি রাস্তা। বড় লোকদের বাড়ি সব পাথরের, তার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য লতাপাতা ময়ূর খোদাই করা। দরজায় নানা রকম নক্সা, তার পাশে পাথরের জাফ্‌রি। দুধারে কৃষ্ণলীলায় বর্ণিত স্থান।

বৃন্দাবনে পৌঁছে তখনকার বড়লোকদের প্রথামত দ্বারকানাথ একদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। মথুরার বিখ্যাত সব চৌবেরা এসেছিল। এক একজন আকারেও যেমন বিরাট খাবার ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ। তার উপর ক্ষিদে বাড়াবার জন্য তারা সাথে এনেছিল বড় বড় লোটা ভর্তি ভাংএর সরবং। বৃন্দাবনের তমালকুঞ্জে পাত পেড়ে তারা ভাং খেয়ে কয়েকসের পুরি-মিঠাই প্রত্যেকেই খেলো। খেয়ে দেয়ে "রাধামায়ি কি জয়" "দোয়ারীবাবু কা জয়" করতে করতে ভরা পেটে খুস্‌ প্রাণে দ্বারকানাথকে চূড়ান্ত আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেল। এই খাওয়ানোতে দ্বারকানাথের খরচ হয়েছিল দশ হাজার টাকা।

তারপর ফিরে আসবার আগে কেশীঘাটের কাছে একটী অন্নছত্র প্রতিষ্ঠা করে আসেন। এটী এখনো চালু আছে কি না জানা নেই।

ফেরবার সময় কাশী থেকে তিনি বোধহয় স্টীমারে চড়ে কলকাতায় ফিরেন কারণ ৫ই চৈত্রের সমাচার দর্পণে *৭ দেখি খবর রয়েছে যে "শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার প্রাপ্তির সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন। এক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।" তার চোদ্দদিন পরে ১৯ চৈত্র ঐ পত্রিকাতেই পাই যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্যবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারানসী হইতে কলিকাতা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়ানের পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতি সমৃদ্ধিপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবার বহুসংখ্যক কাঙ্গালিদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। কথিত আছে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আট আনা এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে চার আনা করিয়া দিয়াছেন।"

তীর্থ ও দেশদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ ভারতবর্ষের ঐ অংশের জমিদার ও জমিদারীর অবস্থা বিষয়ে ভালোভাবে খোঁজ খবর ও এ সম্বন্ধে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু না করলে দেশের ও সরকারের ক্ষতি। এ সম্বন্ধে তিনি কলিকাতায় ফিরে এসে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছিলেন।

৬ মায়ের অসুস্থতা সংবাদ পেলে তিনি দিল্লী, মথুরা কোথাও না গিয়ে সম্ভবত কলিকাতা ফিরে আসতেন। মায়ের অসুস্থতা বা মৃত্যু সংবাদ না পেলে দিল্লী ও ঐদিককার অন্যান্য জায়গায় না গিয়ে তীর্থ সেরেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসার কারণ পাওয়া যায় না।

৭ ইং ১৭ মার্চ ১৮৩৬

পিণ্ডারীয় ওড্ ও হেমচন্দ্র

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

ইংরেজী-শিক্ষা তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ফলপ্রদ হয়েছিল। তিনি ইংরেজী কবিতা ও নাটক অবলম্বনে কয়েকটি বাঙলা কবিতা ও নাটক লিখেছেন।১ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কোনো য়ুরোপীয় আদর্শ ছিল না, সেখানেও স্থান-বিশেষে বিদেশী ভাব ও বর্ণনার অনুসরণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। উদাহরণস্বরূপ 'বৃত্র-সংহারের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্যটির কাহিনী হিন্দু-পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছে, তবু তার কতক কতক অংশে বিদেশী কাব্যের ছায়া স্পষ্টতঃই পড়েছে। হেমচন্দ্র নিজেই 'বৃত্ত-সংহারের' ভূমিকায় বলেছেন—'শিক্ষা-ভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।' কবির এই ইংরেজীয়ানা রমেশচন্দ্র দত্ত সমর্থন করেছেন, ২ তাঁর জীবনীকার অক্ষয়চন্দ্র সরকারও নিন্দা করেন নি৩, যদিও হেমচন্দ্রের অনূদিত কবিতাগুলির অধিকাংশই তাঁর মনোরঞ্জন করতে পারেনি।৪ আর সে-কারণেই, ইংরেজী কাব্যের আবহাওয়ায় সাহিত্যের শিক্ষা নিয়েছেন বলেই হেমচন্দ্রকে বঙ্কিম শিক্ষিত বাঙালীর কবি বলেছেন।৫

ইংরেজী-শিক্ষিত কবি হেমচন্দ্র ওদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যে সমস্ত ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে তিনি কতকগুলি বাঙলা কবিতা লেখেন, তাদের মধ্যে, ড্রাইডেনের শেলীর ও গ্রে'র ওড হিসেবে সুপরিচিত। হোরেসের কাব্যকৃতির কথাও তিনি জানতেন, স্যাটায়ার-প্রসঙ্গে হলেও তিনি তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন—

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ,
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরি,
যে হাসি-তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে!
ভাসিতে যে হাসি 'রোমে' 'হরেসের' তারে। —কুহুস্বর।

মিল্টনের কথাও তাঁর কবিতায় পাই—

বাল্মীকি-হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল, মরুতল-তরু
অ-নীর দেশের বারি; —স্বর্গারোহণ।

মধুসূদন-সম্পর্কিত এই শোক-কবিতায় মিল্টনের উল্লেখের সময় তাঁর নিশ্চয়ই 'প্যারাডাইস লষ্ট' এর কথাই বিশেষ করে মনে ছিল, তবু মিল্টনের বিখ্যাত 'ওড্ অন্ দি মর্ণিং অব্' ক্রাইষ্ট নেটিভিটি, তিনি যে পড়েছিলেন, তা অনুমান করা অন্যায় নয়। পিণ্ডারীয় ওড্ রচনায় তিনি পথিকৃৎ, তাই অনুবাদের মাধ্যমেই হোক বা ইংরেজী কাব্যে পিণ্ডার চর্চার উদাহরণ দেখেই হোক হেমচন্দ্র গ্রীক কবির কাব্যকলার রূপ ও রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্ত্যের ওড্-রচয়িতা কবিদের মধ্যে পিণ্ডার, হোরেস, মিল্টন, ড্রাইডন, গ্রে, শেলী ইত্যাদির প্রভাব হেমচন্দ্রের ওডের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাকা স্বাভাবিক। তাঁর কবি-

মানস ও সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে অন্যান্য য়ুরোপীয় কবিদের—যেমন হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়ার, বায়রণ প্রমুখের প্রভাবের কথা সত্য হলেও বর্তমান আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার হেমচন্দ্রকে 'বাঙলার পিণ্ডার' বলেছেন—'মধুসূদন বাঙ্গলার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র—বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ—শেলি,—বেশ কথা....।'৬ মনে হয়, হেমচন্দ্রের পিণ্ডারীয় ওড্‌গুলির কথা মনে রেখেই অক্ষয়চন্দ্র এ-মন্তব্য করেছেন। এ কথা সত্য, মধুসূদন বাঙলা কাব্যে অনেক নতুন রীতির প্রবর্তক হলেও পিণ্ডারীয় ওড্ রচনার কোনো চেষ্টা করেন নি। সেদিক থেকে হেমচন্দ্রের পিণ্ডারীয় ওড্ নিয়ে অনুশীলনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তবু বাঙলার পিণ্ডার অভিধা ঠিক সঙ্গত নয়, কারণ তিনি শুধু পিণ্ডারীয় আদর্শের ওড্ই রচনা করেন নি, ওড্ রচনার অন্যান্য রীতিও অনুসরণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ওড্ মনডির ক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতাও লক্ষণীয়। সুতরাং একটি বিশেষণের সীমার মধ্যে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করতে না যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে হয়।

হেমচন্দ্র অনেকগুলি ওড্-জাতীয় কবিতা লিখেছেন। ৭ তাঁর খণ্ড কবিতা সম্পর্কে 'সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইংরেজী কাব্যের ধারা ধরিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি বাংলার তদানীন্তন কাব্য-সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইয়াছেন।'৮ তাই ওডের রূপ ও রীতি নিয়েও তিনি পরীক্ষা করেছেন। ইংরেজী ওডই যে তাঁর আদর্শ ছিল, তা-ও নিঃসংশয়ে বলা চলে; কারণ তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা জানতেন না। ইংরেজী কাব্যে কারা পিণ্ডারীয় ওড্ নিয়ে অনুশীলন করেছেন তা পূর্বে আলোচনা করেছি। এবং এ-ও দেখেছি যে, রূপ ও রীতির দিক দিয়ে সার্থক পিণ্ডারীয়, ওড্ একমাত্র গ্রে লিখেছেন। হেমচন্দ্রের লেখা তিনটি পিণ্ডারীয় ওড 'কবিতাবলীতে' সংযোজিত হয়েছে এবং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গ্রে'র 'দি প্রোগ্রেস অব পোয়েসি' বা 'দি বার্ড' দেখেই তিনি পিণ্ডারীয় ওড্ লিখতে সাহসী হন। মনে রাখতে হবে, হেমচন্দ্রের কালে গ্রে শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রিয় কবি ছিলেন।৯ সুতরাং গ্রে'র কবিতা দুটিতে পিণ্ডারীয় ওডের যে সব লক্ষণ পাওয়া যায়, তাদের মানদণ্ডে হেমচন্দ্রের পিণ্ডারীয় রীতির কবিতাগুলিকে বিচার করতে হবে।

১। তিনি সেক্সপীয়রের 'দি টেম্‌পেস্ট' ও 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' অবলম্বনে যথাক্রমে 'নলিনী-বসন্ত' ও 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটক রচনা করেন। 'ছায়াময়ীতে' দান্তে তাঁর আদর্শ ছিল। আর খণ্ড-কবিতার মধ্যে 'জীবন-সঙ্গীত' লংফেলোর 'সামঅবলাইফ' 'ইন্দ্রের সুধাপান' ড্রাইডেনের 'ওড্ টু মিউজিক্' বা 'আলেকজাণ্ডারস্ ফিস্ট', 'মদন-পারিজাত' পোপের 'এলোয়সা অব্ এ্যাবেলার্ড', 'চাতক পক্ষীর প্রতি' শেলীর 'টু এ স্কাইলার্ক' অনুসরণে রচিত। গ্রে'র 'প্রোগ্রেস্ অব্ পোয়েজি' দেখেই বোধহয় 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজার' রচনার প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। 'নববর্ষ' স্মরণ করিয়ে দেয় টেনিসনের 'রিং আউট্ দি ওল্ড, রিং ইন্ দি নিউ' ইত্যাদি চরণগুলি। হয়ত 'বিভু কি দশা হবে আমার' কবিতাটি লেখার সময় হেমচন্দ্রের মনে ছিল মিল্টনের 'অন্ হিজ্ ব্লাইণ্ডনেস্' কবিতাটির কথা।

২. 'The story is properly chosen from Hindu mythology, but the descriptions, the ideas, are—as the author admits in the preface—mostly English. And this is as it should be...... there is no reason why the advanced intellect of Bengal should not borrow from the English to enrich its mother tongue,....'—Calcutta Review, No. 122.

৩. 'হেমচন্দ্র সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, ইংরাজিতে অভ্যস্ত বলিয়া দোষ হইবার কথা; কিন্তু তিনি মাতৃভাষার সেবক-প্রভু বলিয়া তাঁহার সে দোষ অনেক স্থানেই ঢাকিয়া গিয়াছে।' —'কবি হেমচন্দ্র', পৃঃ ২৪।

৪. দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ৪৭—৪৮

'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা', 'ভারত-ভিক্ষা' ও 'অন্নদার শিবপূজা' এই তিনটি কবিতায় হেমচন্দ্র পিণ্ডারীয় ওডের অনুসরণ করেছেন। প্রথম কবিতাটিতে সাতটি ত্রিপাদ ট্রিয়াড্ আছে এবং শেষ ত্রিপাদটিতে এপোড-এর পর একটি অতিরিক্ত স্ট্রোফি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু গ্রে'র পিণ্ডারীয় ওডে তিনটি ত্রিপাদ দেখতে পাই। এবং সমাপ্তিতে কোন অতিরিক্ত স্ট্রোফিও নেই। পিণ্ডারের আলোচনায় বলেছি, ত্রিপাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আর সে-কারণেই হেমচন্দ্রের পক্ষে সাতটি ত্রিপাদ রচনা করা রীতি-বিরোধী হয়নি। পিণ্ডার নিজের ওডে তেরটি পর্যন্ত ত্রিপাদ রচনা করেছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজায়' যে সমাপ্তিসূচক অতিরিক্ত স্ট্রোফি সংযোজিত হয়েছে, তা সমর্থন করা যায় না। কারণ স্ট্রোফি, অ্যাণ্টিস্ট্রোফি ও এপোড নিয়ে ত্রিপাদ রচনার আদর্শটি কোরাস দলের গতিবিধির সঙ্গে যুক্ত। সর্বশেষে সকলে এক স্থানে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে এপোড্ গাওয়ার পর আবার স্ট্রোফি গাওয়া সাঙ্গীতিক রীতির বিরোধী এবং অ্যাণ্টিক্লাইমেক্সের উদাহরণ মাত্র। গ্রীক নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন— "The strophe is balanced by the antistrophe; the pair is sometimes followed by an epode.'[১০]
একথা যদি সত্যি হয়, তবে হেমচন্দ্রের কোর‍্যাল ওডের শেষে একটি একক স্ট্রোফি রচনায় কবিতাটির সামগ্রিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকেনি।

তবে স্ট্রোফি, অ্যাণ্টিস্ট্রোফি ও এপোড্ সম্পর্কে, হেমচন্দ্রের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল বলে মনে হয়। তিনি তাঁর পিণ্ডারীয় ওডে স্ট্রোফি, অ্যাণ্টিস্ট্রোফি ও এপোড্ অর্থে যথাক্রমে 'প্রয়োগ' (বা 'আরম্ভ')' শাখা' ও 'পূর্ণ কোরাস্' ব্যবহার করেছেন এব 'ইন্দ্রের সুধাপান' কবিতার পাদটীকায় 'কোরস্' শব্দের অনুরূপ অন্য কোন বাঙলা শব্দ না পাওয়ায় 'চিতেন' শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে জানিয়েছেন। 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজার' পাদটীকায় তিনি 'প্রয়োগ' (স্ট্রোপি) বলতে 'প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি' ও 'শাখা' (এ্যাণ্টিস্ট্রোপি) বলতে 'গায়ক সংশ্লিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি' বুঝিয়েছেন। পূর্ণ কোরস্ (এপোড)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।' আমার মনে হয়, হেমচন্দ্র-কৃত এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও বিষয় তিনটিকে বোঝার একটা চেষ্টা

৫· ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্বের আলোচনায় বঙ্কিমের এই উক্তির প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, হেমচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রেরও ভাবশিষ্য ছিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি হলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যকলার আদর্শ ঈশ্বর গুপ্তের পথ বেয়ে রঙ্গলালে কিছুটা পরিস্রুত হয়ে হেমচন্দ্রে এসে পোঁছেচে।

৬· 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থের ২০ পৃঃ উদ্ধৃত।

৭· সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'কবিতাবলীতে' সাতচল্লিশটি খণ্ড-কবিতা আছে। তন্মধ্যে.........কবিতা ওড্ হিসেবে বিচারের যোগ্য।

৮· সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ 'কবিতাবলীর' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯· হেমচন্দ্রের বি· এ পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার মধ্যে গ্রে'র কবিতাও ছিল (দ্রঃ 'হেমচন্দ্র', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০৫—মন্মথনাথ ঘোষ)।

১০· General Introduction by Engene O' Neill, Jr., 'The Complete Greek Drama (Vol. I). Edited by W. T. Oates & E. O' Neill.

আছে। ওডের স্ট্রোফি-অংশক প্রধান গায়কের উক্তি হিসেবে তিনি নির্দেশ করেছেন। গ্রীক স্বীকৃত শটকে প্রধান গায়কের "লিডার অব্ দি কোরাস্' স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত—
'In the tragedies there are usually fifteen members in the chorus. One of these members normally acts as a leader who may do solo singing and dancing, or may become virtually another character in the dramatis personal.'১১
কিন্তু কোরাল ওডে স্ট্রোফি গাওয়ার ভার একমাত্র কোরাসের দলপতির ওপর থাকত কি? কোরাস দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফি যে গাইত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।১২ তবে প্রথম ভাগে শুধু দলপতি থাকা অসম্ভব নয়; আর তাই, কোর‍্যাল ওড্ প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে—'The primitive combination of music, dance and song, has a leader. Amid the hysteria of the rite he becomes the god.'১৩
অ্যান্টিস্ট্রোফি সম্পর্কে হেমচন্দ্রের পাদটীকা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এপোডে 'শুধু কয়েকজন' নয়, সমগ্র কোরাস দলই অংশ গ্রহণ করত না কি? হেমচন্দ্র নিজেই ত এপোড্ প্রসঙ্গে 'কোরস্' শব্দটির আগে 'পূর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

পিণ্ডারীয় ওডের প্রতিটি ত্রিপাদের স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফি গঠন ও ছন্দোরীতির দিক দিয়ে অনুরূপ হয়ে থাকে, কিন্তু হেমচন্দ্রের কবিতায় সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এতে সাতটি ত্রিপাদের অন্তর্গত স্ট্রোফিগুলির গঠন ও ছন্দোরীতি যেমন এক, তেমনি সপ্তম ত্রিপাদের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ত্রিপাদের অ্যান্টিস্ট্রোফির গঠন ও ছন্দোরীতি এক, সন্দেহ নেই; কিন্তু ছন্দোরীতি এক হলেও গ্রে'র পিণ্ডারীয় ওডের মতো মিলসূচক শব্দ এক নয়। সপ্তম ত্রিপাদের অ্যান্টিস্ট্রোফিটিতে একটি অতিরিক্ত চরণ আছে, ফলে গঠন ও মিলনের রীতির দিক দিয়ে তা স্পষ্টতঃই পৃথক হয়ে পড়েছে। সাতটি এপোডের মধ্যে ষষ্ঠ এপোডটির চরণসংখ্যা তের, কিন্তু অন্যান্য এপোডগুলির চরণসংখ্যা এগারো। তাদের মিলের পদ্ধতি—১. ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ক ক ক ২. ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ ঙ ৩. ক ক খ খ গ গ ক ক খ খ খ, ৪. ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ ঙ, ৫. ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ ঙ, ৭. ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ ঙ। অর্থাৎ এপোডগুলি ছন্দ-মিলনের দিক দিয়ে সর্বত্র এক নয়, ষষ্ঠ এপোডের চরণসংখ্যার সঙ্গে অন্যান্য এপোডগুলির চরণসংখ্যার মিল নেই। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজায় (১) কোথায়ও কোথায়ও দীর্ঘতর স্তবক ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন সপ্তম অ্যান্টিস্ট্রোফি ও ষষ্ঠ এপোডে। (২) ছন্দ-মিলনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা যায়—সপ্তম অ্যান্টিস্ট্রোফি ও ষষ্ঠ এপোডের স্তবক দীর্ঘতর হওয়ায় সমধর্মী অন্যান্য স্তবক থেকে তাদের স্ব স্ব মিলের পদ্ধতিও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এপোডগুলির মিলের পদ্ধতি বিচিত্র—দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম এপোডের মিলের পদ্ধতি এক, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় এপোড়ের মিলের পদ্ধতি ভিন্ন ধরণের। (৩) কবিতাটির একেবারে শেষে একটি রীতি-বিরোধী

১১. পূর্বোক্ত 'The Complete Greek Drama' (Vol. I) দ্রষ্টব্য। এর প্রমাণ আছে 'The 'Suppliants' (Aeschylus), 'The Seven against Thebes' (ঐ), 'The Persians' (ঐ) ইত্যাদি নাটকে।

১২. 'Sometimes the chorus breaks into two groups which sing responsively.'—E. O' Neill, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১৩. 'Greek Literature for the Modern Reader', H. C. Baldry.

অ্যাণ্টিস্ট্রোফি সংযোজিত হয়েছে। তবে এইটুকু বোঝা যায়, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিলে হেমচন্দ্রের পিণ্ডারীয় ওড্‌টি যে অধিকতর আদর্শসম্মত হয়ে উঠত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে 'ভারত-ভিক্ষায়' শুধুমাত্র স্ট্রোফি, অ্যাণ্টিস্ট্রোফি ও এপোড্ ভাগ দেখানো হয়েছে, কিন্তু আর সব বিধি হয়েছে উপেক্ষিত। কবিতাটিতে চারটি ত্রিপাদ থাকায় চারটি স্ট্রোফিও আছে, অথচ তাদের মধ্যে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২২, ৩৯, ১৪, ৯২। (২) স্ট্রোফিগুলির অন্তর্গত স্তবক-বিন্যাসও বিচিত্র ধরনের। প্রথম স্ট্রোফিতে চারিটি স্তবকের চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪+৪+৪+৬, দ্বিতীয় স্ট্রোফিতে আটটি স্তবকের চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪+৫+৫+৪+৭+৫+৪+৫, তৃতীয় স্ট্রোফিতে কোন স্তবক-বিন্যাস নেই, চতুর্থ স্ট্রোফির ষোলটি স্তবকে চরণসংখ্যা হচ্ছে ৫+৬+৭+৭+৯+৭+৫+৭+৫+৭+৫+৩+৫+৪+৫+৫। (৩) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্ট্রোফির প্রতি চরণ দ্বিপার্বিক, কিন্তু তৃতীয় স্ট্রোফির প্রতি চরণ চতুষ্পার্বিক। (৪) স্ট্রোফিগুলির চরণসংখ্যার মধ্যে সাম্য নেই বলে মিলের পদ্ধতির মধ্যেও সামঞ্জস্য নেই। প্রথম স্ট্রোফির আরম্ভিক তিন চরণের মধ্যে মিল না থাকাটাও বিস্ময়কর। (৫) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্ট্রোফির অন্তর্গত প্রতিটি স্তবকের শেষ চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫। তৃতীয় স্ট্রোফির চতুষ্পার্বিক চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৬+৫। মাঝে মাঝে এই যে ছোট পর্ব বা ছোট চরণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে।

পিণ্ডারীয় ওডে স্ট্রোফি ও অ্যাণ্টিস্ট্রোফির গঠন ও ছন্দোরীতির দিক থেকে একই ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু 'ভারত-ভিক্ষায়' স্ট্রোফি ও অ্যাণ্টিস্ট্রোফির মধ্যে কোন মিল নেই। এতে চারটি অ্যাণ্টিস্ট্রোফি আছে, অথচ তাদের মধ্যে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১৪ (দুই পংক্তিতে এক চরণ ধরে), ১৪, ৮১, ৩। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে কোন স্তবক-বিন্যাস নেই। তৃতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে কোন স্তবক-বিন্যাস নেই। তৃতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে তেরটি স্তবকের চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৫+৭+৯+৯+৫+৪+৫+৭+৭+৬+৭+৫+৫। চতুর্থ অ্যাণ্টি-স্ট্রোফিতে তিনটি মাত্র চরণ আছে তাই স্তবক-বিন্যাসের প্রশ্ন ওঠেনি। (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রতিটি চরণ দ্বিপার্বিক, কিন্তু দ্বিতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রতিটি চরণ ত্রিপার্বিক। প্রথম অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রতি চরণ (দুই পংক্তিতে এক চরণ ধরে) চতুষ্পার্বিক। (৪) প্রথম অ্যাণ্টি-স্ট্রোফিতে প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর আছে (দুই পংক্তিকে এক চরণ ধরে এ-মন্তব্য করা হল)। দ্বিতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে প্রতি দুই চরণের মধ্যে মিল আছে (যেমন দেখা যায় সাধারণ ত্রিপদীতে)। তৃতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে প্রতি দুই চরণ সমিল (যেমন দেখা যায় পয়ারে)। প্রথম পাঁচটি স্তবকের শেষ চরণ, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকের শেষ চরণ, অষ্টম ও নবম স্তবকের শেষ চরণ, দশম ও একাদশ স্তবকের শেষ চরণ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তবকের শেষ চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষর। চতুর্থ অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রথম দুটি চরণ মিত্রাক্ষর, কিন্তু তৃতীয় চরণটির মিল দেখানো হয়েছে শেষ এপোডের শেষ চরণের সঙ্গে। (৫) তৃতীয় ও চতুর্থ অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রতিটি স্তবকের শেষ চরণ (মাত্রাসংখ্যা ৬+৫) অন্যান্য চরণ (মাত্রাসংখ্যা ৬+৬) অপেক্ষা ছোট। প্রথম অ্যাণ্টিস্ট্রোফির প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ইত্যাদি চরণ (মাত্রাসংখ্যা ৬+৬) অপেক্ষা দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি চরণ (মাত্রাসংখ্যা ৬+৫) ছোট। কিন্তু দ্বিতীয় অ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে ত্রিপদীর (৬+৬+৮) চরণগুলি অন্যান্য অ্যাণ্টিস্ট্রোফির চরণ-গুলি অপেক্ষা বড়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'ভারত-ভিক্ষার' স্ট্রোফি ও অ্যাণ্টি-স্ট্রোফিগুলির গঠনের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সামঞ্জস্য নেই।

একটা ওডে যতগুলি এপোড থাকবে, তাদের মধ্যে গঠনের দিক থেকে সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু 'ভারতভিক্ষার' এপোডগুলি সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাতে (১) চরণ-সংখ্যা প্রথম এপোডে ১৪, দ্বিতীয়ে ২৮, তৃতীয় ৬ (দুই পংক্তিতে এক চরণ ধরে এ-হিসেব করা হয়েছে), চতুর্থে ৫। (২) স্তবক-সংখ্যা প্রথম এপোডে ২, দ্বিতীয়ে ২, তৃতীয় ও চতুর্থে ১ (অর্থাৎ স্তবক-বিন্যাস নেই)। (৩) প্রথম এপোডে স্তবকগুলির চরণসংখ্যা যথাক্রমে ৭+৭, দ্বিতীয় এপোডে ১৭+১১। (৪) প্রথম এপোডে প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর, শুধু প্রথম স্তবকের শেষ চরণটিকে মিলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণটির। দ্বিতীয় এপোড সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তৃতীয় এপোডে প্রতি দুই চরণে মিল (চরণসংখ্যা ৬ ধরে এ-মন্তব্য করা হ'ল) আছে। চতুর্থ এপোডেও প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর আছে, তবে শেষ চরণটি একক। কিন্তু তার সংগে মিল রয়েছে পূর্ব্ববর্তী অ্যান্টিস্ট্রোফির শেষ চরণের, এ কথা অ্যান্টিস্ট্রোফি-প্রসংগেও বলা হয়েছে। (৫) প্রথম এপোডের প্রতি স্তবকের শেষ চরণ (মাত্রসংখ্যা ৬+৫) অন্যান্য চরণ (মাত্রাসংখ্যা ৬+৬) অপেক্ষা ছোট। দ্বিতীয় এপোডে দুইটি স্তবকের অধিকাংশ চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫ হলেও কোথায়ও কোথায়ও ৬+৬ চরণও দেখা যায় (যেমন প্রথম স্তবকে 'ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী', দ্বিতীয় স্তবকে 'বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রাণীপুত্র চলে' ইত্যাদিতে)। তৃতীয় এপোডে প্রত্যেক চরণের (দুই পংক্তিকে এক চরণ ধরে) মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৬+৫। চতুর্থ এপোডে শেষ চরণটি (মাত্রাসংখ্যা ৬+৫) অন্যান্য চরণ অপেক্ষা ছোট।

'অন্নদার শিবপূজা' কবিতাটির অভিধা হিসেবে কবি নিজেই 'গীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা পূর্বোক্ত কবিতা দুটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। এখানে এই 'গীতি' শব্দটির অর্থ 'কোরাল সঙ' ধরতে হবে। কবিতাটির মধ্যে পাঁচটি ত্রিপাদ আছে এবং পিণ্ডারীয় ওডের নিয়মানুযায়ী পাঁচটি করে স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও এপোডও আছে। প্রথমতঃ স্ট্রোফিগুলির কথা ধরা যাক। তাদের মধ্যে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪, ৬, ৮, ৬, ৬। (২) প্রতিটি স্ট্রোফিতে একটির বেশি স্তবক নেই। (৩) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্ট্রোফির প্রতি চরণ চতুষ্পার্বিক, চতুর্থ স্ট্রোফির প্রতি চরণ দ্বিপার্বিক। (৪) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্ট্রোফির অন্তর্গত চরণের মাত্রাসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬+৬+৬+৫; চতুর্থ স্ট্রোফির অন্তর্গত প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৬; তৃতীয় ও ষষ্ঠ চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫; চতুর্থ চরণের মাত্রাসংখ্যা ৫+৬। (৫) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্ট্রোফিতে প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর। চতুর্থ স্ট্রোফিতে মিলের পদ্ধতি হচ্ছে ক ক খ গ গ খ।

এই কবিতায়ও স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফিগুলির মধ্যে কোন মিল নেই। পাঁচটি অ্যান্টি-স্ট্রোফির মধ্যে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৮, ৮, ১২, ১৫, ৮। (২) প্রতিটি অ্যান্টিস্ট্রোফিতে একটির বেশি স্তবক নেই (এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে স্ট্রোফির সংগে অ্যান্টিস্ট্রোফির মিল আছে)। (৩) প্রতিটি অ্যান্টিস্ট্রোফির প্রতিটি দ্বিপার্বিক। (৪) প্রথম অ্যান্টিস্ট্রোফিতে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫। দ্বিতীয় অ্যান্টিস্ট্রোফিতেও এই রীতিরই হুবহু অনুবর্তন দেখতে পাই। (৫) পঞ্চম অ্যান্টিস্ট্রোফিতে মিলের পদ্ধতি হচ্ছে যথাক্রমে কখগখঘকঙক, ক খ গ খ ঘ ঙ চ ঙ, ক খ গ খ ঘ ঙ চ ঙ ছ জ ঝ জ, ক ক খ গ গ খ ঘ ঘ খ ঙ ঙ খ চ চ খ, ক খ গ খ ঘ ঙ চ ঙ।

এবার এপোডগুলির কথা ধরা যাক। পাঁচটি এপোডে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২, ৯, ৬, ৬, ৪। (২) প্রতিটি এপোডে একটির বেশি স্তবক নেই। (৩) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম এপোডের প্রতি চরণ চতুষ্পার্বিক, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এপোডের প্রতি চরণ দ্বিপার্বিক। (৪) প্রথম,

তৃতীয় ও পঞ্চম এপোডের প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৬+৫, দ্বিতীয় এপোডের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৬; তৃতীয় চরণের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫; সপ্তম চরণের মাত্রাসংখ্যা ৫+৬। (৫) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম এপোডের প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর। দ্বিতীয় ও চতুর্থ এপোডের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে ক ক খ গ গ খ ঘ ঘ খ, ক ক খ গ গ ঘ।

পিণ্ডারীয় গঠন ও ছন্দোরীতির দিক থেকে হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতা যেমন সার্থকতা লাভ করেনি, তেমনি অন্যান্য দিক থেকেও এদের সিদ্ধি ঘটেনি। তার প্রথম কারণ, কবিতাগুলির গঠন ঠিক স্বচ্ছন্দ রসস্ফূর্তির অনুকূল নয়। প্রাচীন রূপকল্পের শিল্পরস একমাত্র বিশেষজ্ঞের কাছেই ধরা পড়ে, সাধারণ রসিক পাঠকের কাছে তা বড়জোর কৌতূহলের বিষয় মাত্র। যে উৎসাহ নিয়ে একটা বিশেষ আঙ্গিকে হেমচন্দ্র কবিতাগুলি লিখেছেন, পাঠকমাত্রই তার অংশভাগী হতে পারে না। ফলে তাদের সৌন্দর্য-রস আস্বাদনেও সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ গায়কদলের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রেখে পিণ্ডারের যুগে ওডকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হত, সেই বিভাগের সাঙ্গীতিক তাৎপর্য বর্তমানে (বা হেমচন্দ্রের যুগে) না থাকায় ত্রিধাবিভক্ত ওড্‌গুলির গঠন স্বভাবতঃই কৃত্রিম বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ পিণ্ডারের যুগের এমনকি সাধারণ ব্যক্তির কাছেও তার কোর‍্যাল ওড্‌গুলির বিষয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত নানা আচার-ব্যবহারের কথা বেশ পরিচিত ছিল। ফলে বক্তব্য ও বর্ণিতব্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পাঠকদের অনুমোদন ও আকর্ষণ ছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বে অস্থিরচিত্ত, কল্পনাপ্রবণ ও তীক্ষ্মচেতা এক দল মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় অনিয়মিত, অত্যুৎসাহী ও পরিবর্তনশীল কবি-মানসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পিণ্ডার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতাগুলির বিষয় অবশ্য অপরিচিত ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রাচীন ও পৌরাণিক বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটায় 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা' ও 'অন্নদার শিব-পূজার' বক্তব্য হয়ত পাঠকের কাছে অসাময়িক বলে মনে হয়নি। তাছাড়া গূঢ় তত্ত্বের দৃষ্টিতে নয়, সাধারণ ধর্ম-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছে বলে কবিতা দুটির আবহাওয়া অস্পষ্ট ও জটিল নয়। তদুপরি 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজায়' পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে পরাধীন ভারতের দুর্দশার প্রসঙ্গ কবি মিশিয়ে দিয়েছেন এবং সমকালীন দেশ-চেতনার দিক থেকে কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ফলে এই দুটি পিণ্ডারীয় ওডের বিষয়বস্তু জনপ্রিয়তার অনুকূল ছিল। কিন্তু একদিকে হেমচন্দ্রের কিছুটা অসুবিধাও ছিল। তিনি যে শিক্ষিত সমাজের জন্য কবিতা লিখতেন, তাদের মধ্যে ধর্ম-ভাবোদ্দীপনা বা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ১২৭৯—৮০ সালে,[১] দৃঢ়মূল ছিল না বলে (যদিও ১৮৭০—১৯০০ খৃঃ সাধারণভাবে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থান ও সংগঠনের যুগ বলা হয়) এবং বাঙালীর মানসপটে তখন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল বলে এই দুটি কবিতার বিষয়বস্তুর দ্বারা পাঠকের রসবোধকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে 'ভারত-ভিক্ষায়' ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমনকে অভিনন্দিত করা হলেও দাস-মনোভাব-জাত রাজভক্তিই তার একমাত্র বিষয় নয়, তাতে যুবরাজের আগমনকে উপলক্ষ্য করে কবির অন্তরাত্মার বেদনাও ধ্বনিত হয়েছে—

১ 'বঙ্গদর্শনের' পৌষ সংখ্যায় (১২৭৯) 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা' ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১২৮০) 'অন্নদার শিব-পূজা' প্রথম প্রকাশিত হয়।

কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।

সুতরাং কবিতাটিকে হেমচন্দ্রের শুধু রাজভক্তির নিদর্শনরূপে দেখা উচিত নয়। আর যদি তা হয়ও, তবু কবির অপরাধ গুরুতর নয়। কারণ ১৮৭৫ খৃঃ এই বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে রাজভক্তির বন্যা বয়ে যায় এবং 'ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত' ২ করেন। অথচ তখন রাজনৈতিক চিন্তা ও সাহিত্যিক ভাবনাতে দেশপ্রেমের কথাও ফুটতে আরম্ভ করেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, সমকালীন জন-মানস উত্তেজনাপূর্ণ সাময়িক কবিতার পক্ষেই উপযুক্ত ছিল, শিল্পসুন্দর লিরিকের জন্য কোনো মানসিক প্রস্তুতি বা সংহতি ছিল না। তাই হেমচন্দ্রও এই তিনটি কবিতায় সাময়িকতারই দাসত্ব করেছেন।

চতুর্থতঃ যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে হেমচন্দ্র সাময়িক কবিতা লেখায় তার ভাবের মধ্যে যেমন গভীর চিন্তার ছাপ নেই, তেমনি তার রূপের মধ্যেও কোনো লক্ষণীয় প্রসাধনকলার চিহ্ন নেই। কবিতা লেখা যে শিল্পচর্চা, তার সৌন্দর্য যে মণ্ডনসাধনা ও রূপকর্মের ওপর নির্ভর করে, এই তিনটি পিণ্ডারীয় ওড্ লেখার সময়ে তা বোধহয় হেমচন্দ্রের মনে ছিল না। ফলে একটা অযত্ন ও শৈথিল্যের ছাপ কবিতাগুলির মধ্যে আছে। বিশেষ করে শব্দ-ব্যবহার ও ছন্দ-সৃষ্টিতে তার প্রমাণ পাই। ক্লাসিক্যাল ওডের পক্ষে যে ভাষা সঙ্গত, পিণ্ডারের কবিতায় তারই সমাবেশ সমালোচকেরা দেখতে পেয়েছেন। বস্তুতঃই গ্রীক কবির ভাষা উন্নত, সংহত ও উদ্দীপিত এবং তারই জন্য অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা ছন্দকে কৃত্রিম উপায়ে (বা শৈল্পিক কৌশলে) 'তেজী' করবার প্রয়োজন তাঁর হয় নি।১ ইংরেজ কবি গ্রে-ও তাঁর পাণ্ডিত্য ও ক্লাসিক্যাল বিদ্যা নিয়ে, রূপক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে কবিতায় এমন একটা ভাষাভঙ্গি সৃষ্টি করেছেন, যা পিণ্ডারীয় ওডের কঠিন শিল্প-শৃঙ্খলা ও ক্লাসিক্যাল আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য সৃষ্টির আবেগের মুখে লাগাম লাগিয়ে এবং বেশ কসরত্ করে তিনি নিজের ওডগুলির ভাষা-কৌলীন্য স্থাপন করেছেন হেমচন্দ্র পিণ্ডারের মতো সহজ স্বাভাবিকভাবে না হোক, গ্রে-র মতো সযত্ন সাধনার দ্বারাও যদি নিজের ক্লাসিক্যাল ওড্গুলির ভাষা ও ছন্দের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তবে খুশি হওয়ার কারণ ছিল। যেমন—

১ বীণাযন্ত্র করে বাণীপুত্রগণ, পুরিছে অবনী, পুরিছে গগন—
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রাবণ, মধুর মধুর মধুর স্বরে।
—ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা।

এখানে ধ্বনিমাধুর্যময় ও রসাত্মক শব্দ নেই—অথচ কবিত্ব সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ ছিল। 'মধুর' শব্দের তিনবার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। মধুরত্ব-বাচক আর কোনো শব্দ হেমচন্দ্র খুঁজে পেলেন না, এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।

২· নবীন সেন লিখিত 'আমার জীবন' দ্রষ্টব্য।

১· ১৭৫৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের 'দি মান্থলি রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত ও জে· ক্রেফ্ট্স্ সম্পাদিত 'গ্রে, পোয়েট্রি এ্যাণ্ড পোজি' গ্রন্থে উদ্ধৃত গোল্ডস্মিথ-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২　শ্বেত শতদল তেমতি সুন্দর　　　কারুকার্য করি রাখ মণ্ডতলে,
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,　　　কেতকী-কুসুম, পারিজাতদলে,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,　　　ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
মিশাও তাহাতে চাতুরী ক'রে;　　　রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে।

হেমচন্দ্রের কবি-প্রকৃতিতে যে ভাবতান্ত্রিকতা ও কল্পনাপ্রবণতা ছিল না ২, তার প্রমাণ বর্তমান উদ্ধৃতিতে আছে। কবির বাক্য শুধু বানানো কথা মাত্র, তাই ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে ভাবের 'জোড়' ও অনুভূতির স্পন্দন নেই। 'চাতুরী' অবাঞ্ছিত প্রয়োগ, পুষ্প-সজ্জার কলাকৌশল বোঝানোর পক্ষে শব্দটি উপযুক্ত নয়। 'কারুকার্য করি রাখ মণ্ড তলে'—এই বাক্যটিকে একান্তই গদ্যাত্মক করে তুলেছে 'কারুকার্য' কথাটি। একে অকবিজনোচিত ও মন্দ প্রয়োগ বলতেই হয়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধের' একটা পংক্তি—'ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা'—যতটা কবিত্বধর্মী, হেমচন্দ্রের 'ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে' ততটা কবিত্বধর্মী নয়।

৩　কেন বা রাখিব, এই নাসে দেশ?—　　যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
কবি-রঙ্গভূমি—লহরী অশেষ　　যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ　　যেখানে শরৎচাঁদের চাঁদিনী,
অতুল ঊষাতে উদয় হয়?　　গগন-ললাট ভাসায়ে বয়?　—ঐ।

এই হচ্ছে হেমচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ শব্দ-ব্যবহারের শেষ সীমা এবং সেই সীমা যে বিস্তৃত নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪　জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর,　　জয় সর্বরূপ জয় গুণময়,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,　　জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ডধারী,　　জয় জয় দেব পাতকহারী:—অন্নদার শিব-পূজা।

এই দেব-বন্দনা প্রথানুগত ও আত্মনিরপেক্ষ। দেবমহিমাজ্ঞাপক শাস্ত্রীয় শব্দগুলি ছাড়া এমন একটি শব্দও এখানে নেই, যাকে হেমচন্দ্রীয় প্রয়োগ বলতে পারি। বর্তমান অংশ পড়বার সময় মনে হয় যেন মঙ্গল-কাব্যের দেবখণ্ড বা ব্রতকথার প্রস্তাবনা পড়ছি। অথচ পিণ্ডারীয় ওডে প্রথানুসরণ করেও ছন্দ, ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নূতনত্বের প্রকাশ চোখে পড়ে। হেমচন্দ্র প্রচলিত বাগ্ধারা (ষ্টক্ ফ্রেজেস্) দিয়ে বাক্যগুলিকে পূর্ণ করে তুলেছেন, নতুন শব্দ বা রূপক বা উপমার সাহায্য না নিয়ে শুধু স্মৃতি-ধৃত চাকচিক্যহীন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা শেষ করবার চেষ্টা করেছেন। মনে হয়, কোর‍্যাল ওড্গুলিকে আকর্ষণীয় করবার জন্য তিনি কোনো যত্ন নেন নি। অথচ সেই কতকাল আগে হোরেস বলে গেছেন— 'Subletle and wary in combining your words too, you will have used them excellently if, clever combination has made a well-known word new. এবং 'Such is the power of arrangement and combination, such the distinction imparted to ordinary words!'[১] এর অর্থ হচ্ছে, পুরনো শব্দকে এমন ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে সে নূতন ব্যঞ্জনা পায়।

৫　শুনহে রাজন্! বনের বিহঙ্গ—　　প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ　　বনের মাতঙ্গ যতনে বশ;
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়!　　—ভারতভিক্ষা।

২. মৎপ্রণীত 'সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (২য় পর্ব)' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

১. দ্রষ্টব্য : 'Epistle to the Pisos',

কবি এখানে মিলের খাতিরে 'সঙগ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথচ অর্থের দিক থেকে শব্দটি 'সঙেগ' হওয়া উচিত ছিল। 'সে' অর্থে প্রাচীন 'সেহ' শব্দের প্রয়োগে একটা মাত্রা পূরণ হয়েছে বটে, কিন্তু কবির উদ্ভাবনী প্রতিভার দৈন্য প্রকাশ করতে ছাড়ে নি। চরণ-শেষের 'বিহঙগ' ও 'সঙগ'-এর সমধ্বনি 'মাতঙেগর' চরণ-মধ্যে প্রয়োগ শ্রুতিকটু। এই জাতীয় প্রয়োগের জন্য 'দি সিমিলার সাউন্ড অফন রেফারিং হোয়ার ইট ইজ নট এক্সপেক্টেড্' গোল্ডস্মিথ গ্রে-র পিন্ডারীয় ওডের নিন্দা করেছিলেন, কারণ এতে পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমতঃ হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতার গদ্যাত্মক ভঙ্গি ও সুরহীন ছন্দের কথা উল্লেখ করতে হয়। 'ভারত-ভিক্ষায়' এমন সব স্তবক আছে যার দু-একটি শব্দের স্থান বদলে দিলে একেবারে গদ্য-ভাষায় পরিণত হয়। যেমন—

ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা

ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

এখানে মধুসূদনের কাব্যসুলভ দূরান্বয় নেই, চারটি ক্রিয়াপদকে একটু সরিয়ে বসালেই এবং 'যথা' শব্দটিকে বাক্যের প্রথমে নিয়ে এলেই স্তবকটির ভাষা সম্পূর্ণ গদ্যরীতিসম্মত হয়ে পড়বে। অন্যান্য শব্দ-সংস্থান গদ্যানুরূপ। সবচেয়ে বড় কথা, স্তবকটিতে কান পাতলে কোনো কাব্যধ্বনি নয়, সুরহীন অক্ষর-ধ্বনিমাত্র শোনা যায়। তাই অক্ষয়চন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন—'ছন্দে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কাহারও অপেক্ষা উন নহেন। তবে প্রসাদ গুণ সকলের অপেক্ষা কম থাকাতে, ভাষা ধরিতে ছন্দ হারাইয়া ফেলি, সুর বুঝিতে তাল ভুলিয়া যাই। সুরে তালে মাখামাখি না থাকিলে আচ্ছন্ন করে না। কবিতা সঙ্গীতাভাস। সঙ্গীত যেমন সুরে, তালে, লয়ে, একটা কুহক সৃষ্টি করে, করিয়া এই সংসার ভুলাইয়া দেয়··কবিতাও তাহাই করে। কবিতার ভাব হইবে উজ্জ্বল, পরিস্ফুট; ভাষা হইবে—প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট, ছন্দ হইবে—মোলায়েম। এই তিন মেশামেশি করিয়া হৃদয়ের সহিত একটি লয় উৎপাদন করিবে। তবে ত কবিতা সফল হইবে। হেমবাবুর কবিতা অনেক স্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে সফল হইতে পারে নাই।' [১] হেমচন্দ্র সম্পর্কে এই মন্তব্য মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'Lyrical Ballads' ভূমিকায় দেখিয়েছেন যে, 'not only the language of a large portion of every good poem, even of the most elevated character, must necessarily, except with reference to the metre, in no respect differ from that of good prose, but likewise that some of the most interesting parts of the best poems will be found to be strictly the language of prose when prose is well written'. কিন্তু হেমচন্দ্রের আলোচ্য কবিতাগুলির ভাষা ঠিক 'গুডপ্রোজ' বলেও মনে হয় না।

তবে হেমচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ আখ্যায়িকা বর্ণনা ও বাগ্মিতার পক্ষে উপযুক্ত, এ-কথা স্বীকার করতে হবে। গ্রে-র কবিতা পড়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পিণ্ডারীয় ওড্গুলি খাঁটি লিরিক নয়, ছন্দের আশ্রয়ে কবিত্বপূর্ণ বাগ্মিতা মাত্র। খুব সম্ভবতঃ বায়রণের কবিতাগুলিও তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল। কিন্তু বাগ্মিতার ঢঙ সত্ত্বেও গ্রে-র কবিতায় যে গঠনগত সৌষম্য,

১· দ্রষ্টব্য : 'কবি হেমচন্দ্র' পৃঃ ৪৯—৫০

বিন্যাসগত কৌশল, কেন্দ্রগত সংহতি ও সুরগত মহিমা রয়েছে—তা হেমচন্দ্র ঠিক আয়ত্ত করতে পারেন নি। ইংরেজ কবির আলঙ্কারিতা অস্পষ্টতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাহসিক ও উদ্দীপনাপূর্ণ, তাঁর প্রসঙ্গাবতারণাও বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক; কিন্তু হেমচন্দ্রের অলঙ্করণ-নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য নয়, ইতিহাস-পুরাণের প্রসঙ্গেও শিক্ষা ও চর্চার তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই। গ্রে-র 'দি প্রোগ্রেস্ অব্ পোয়েজি'-এর সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজার' তুলনা করিলেই তাঁহার কবিতার পার্থক্য বেশ বোঝা যায়।

এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিণ্ডারীয় ওডের নিয়মানুবর্তিতা, গঠন, ছন্দোরীতি, ভাষাদর্শ ও সাঙ্গীতিকতা হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা', 'অন্নদার শিব-পূজা' ও ভারত-ভিক্ষায় পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকে নি। হয়ত ইংরেজ কবি কাউলের মতো তিনিও পিণ্ডারীয় ওডের গঠনগত বৈচিত্র্য ও জটিলতাকে ভ্রান্তিবশতঃ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর বলে মনে করতেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত— 'the odes of Pindar are not metrically "licentious", but are, on the contrary, based upon a very rigid though exceedingly complicated system.'১ তবে হেমচন্দ্রের সপক্ষে এইটুকু বলাযেতে পারে যে, তিনি প্রচুরউৎসাহ নিয়ে যে তিনটি পিণ্ডারীয় ওড রচনা করেছেন, তাতে বাঙলা ভাষায় ওডের রূপকল্প কতখানি অনুসরণ করা যায়, তারই একটা আন্তরিক পরীক্ষা হয়েছে। গ্রীকদের কাছে পিণ্ডারের ওড্ কি রূপ নিয়ে দেখা দিত তা তাঁর জনপ্রিয়তা থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়, কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালী কবির কাছে পিণ্ডারের ওড (এবং গ্রে-র ওডও বটে) কি রূপে ধরা দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পাই হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতায়। তবে মধুসূদন এদিকে দৃষ্টি দিলে হয়তো এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পেতাম।

১. 'An Introduction to the Study of Literature', Hudson.

বিজ্ঞান ও সাহিত্য

অমিয়কুমার মজুমদার

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের একটা বিরোধ আছে এ-কথা অনেকেই মনে করে থাকেন। অনুসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বিরোধের মূলসূত্র সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় সত্যি, কিন্তু তা তেমন জোরালো নয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে যে পার্থক্যটা বড়ো হয়ে উঠেছে তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অনেকের সংশয় আছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুই এলাকার মধ্যে এত ফারাকের সৃষ্টি হয়েছে যে অতি সহজেই মনে হয় যেন এরা দুটি শত্রু-শিবির। উভয় তরফের মাতব্বরদের কণ্ঠের সরবতা শুনে কৌতুক অনুভব করা যায়। আগেই বলা হয়েছে এ বিভেদ আধুনিককালের সৃষ্টি।

আর্যরা যখন এদেশে স্থায়ী বাসস্থান রচনা করলেন, তখন অধুনাতন জাতিভেদ-প্রথা সৃষ্টি করে সমাজকে কলুষিত করেন নি। এ প্রথার প্রবর্তন কবে থেকে হয়েছে সে ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বিস্তৃতভাবে। যখনই হোক না কেন, এ-কথা সত্যি যে হাল-আমলের বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি করেন কতিপয় প্রভাবশালী মানুষ। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এই কারণে যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার প্রভেদ সৃষ্টিও করেছেন কয়েকজন উন্নাসিক ব্যক্তি। জ্ঞানরাজ্যের এ দুই শাখার ভিতরে যে বৈষম্য তীব্রতর হয়ে উঠেছে তার কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম দুটি হচ্ছে ভুলবোঝাবুঝি এবং উন্নাসিকতা দোষ। কয়েকশতক পূর্বেও এই বিরোধ এত তীব্র ছিল না। এই দুই দলের মধ্যে অসদ্ভাব বর্তমানকালে পৃথিবীর অন্যত্রও যেমন, আমাদের দেশেও তেমন গভীরভাবে অনুভব করা যায়। আরো বেশি আমাদের চিরবাঞ্ছিত বঙ্গভূমিতে। বোধহয় এর কারণ আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিকমাত্রায় আত্মসচেতন। এই বোধ প্রতি মানুষকে মহত্তর পদক্ষেপণে অনুপ্রাণিত করে একথাও যেমন সত্যি, তেমনই অস্বীকার করা চলে না এর আধিক্যে শিক্ষায় প্রমত্ত একশ্রেণীর মানুষের অন্তরে উন্নাসিকতাও পণ্ডিতম্মন্যতার বীজাণুর সৃষ্টিকে। যাঁরা শিক্ষিত হয়েও অপ্রমত্ত থাকেন তাঁরা নির্লিপ্ত সাধকের মতো—তাঁরাই উভয় শিবিরের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধনের স্পৃহা অনুভব করেন—এপারে রবীন্দ্রনাথ আর ওপারে জগদীশচন্দ্র তার মূর্ত প্রমাণ।

পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে স্বতন্ত্র করে রাখার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। কবি শেলির যে বিজ্ঞান-প্রীতি ছিল না তাই বা কি করে বলি? আবার বিজ্ঞানী ফ্যারাডে সাহেবেরও যে সাহিত্য-সৃষ্টির বাসনা একেবারে ছিল না তাও জানা যায় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথাই বলা যাক। তিনি দার্শনিকরূপে খ্যাত, আবার 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' নামে গায়ে-জ্বর-আসা বিপুল কলেবর এবং বিদঘুটে ধরণের বিজ্ঞানের গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের শিল্প-প্রীতির কথা সবাই জানেন। আমাদের দেশে সাহিত্যের ছাত্ররা সগর্বে বলে থাকেন, 'বিজ্ঞান! ও বাবা—ও সব কিচ্ছু বুঝিনে।' আবার বিজ্ঞানের ছাত্ররা গর্বোদ্ধতকণ্ঠে বলেন, 'তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়'। এরকম উগ্র মানুষ উভয় সম্প্রদায়েই আছেন—যাঁদের একদল বিজ্ঞানের কোন সহজ গ্রন্থ, এমনকি জনপ্রিয় প্রবন্ধও উল্টেপাল্টে দেখেন না, আবার অন্যদলের ভুলক্রমেও সাহিত্যের কোন পাঠ নিতে জ্বরাক্রমণ অনুভব করেন। এমনকি সাহিত্যরসিক বিজ্ঞানের ছাত্রকে বা বিজ্ঞান পাঠেচ্ছু সাহিত্যের ছাত্রকে বিপরীত দলভুক্ত ব্যক্তিরা যথেষ্ট করুণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অনেকে বলেন যে অস্বীকরণের তীব্রতা

সাহিত্যিকদের মধ্যেই যেন বেশি। অবিশ্যি তাঁদের তরফ থেকেও বলা চলে যে ক'জন বিজ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন সাহিত্যিককে বিজ্ঞানীরা মর্যাদা দিয়েছেন ! এ বিবাদ বহুবিস্তৃত।

বিজ্ঞানের মানে কি? বড়ো অর্থে কোন বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু অর্থের পরিধি যখন সীমাবদ্ধ তখন বলবো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণলব্ধ যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাই হচ্ছে বিজ্ঞান। এই সংজ্ঞা অনুসারে কবি-সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানী উভয়েই সমশ্রেণীর—কবি এবং বিজ্ঞানী উভয়েই পর্যবেক্ষণ করেন, তবে সাহিত্য-সাধকরা পরীক্ষা করেন না, কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণেই তাঁদের তৃপ্তি। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মেনে নিলে কবি-সাহিত্যিকমাত্রেই কিছু পরিমাণ বিজ্ঞানী। বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের পর্যবেক্ষণশক্তির একটা বৈশিষ্ট্য থাকে—এ বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীর। আর এই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের জন্যেই তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে পৃথক। পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তার প্রাচীনত্ব পাঁচ-দশ বছরের বেশি নয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রায় ঐ সময়েই জন্ম হয় আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্যের। বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাহিত্যের জগতে যে কুসংস্কার চলে আসছে 'বিজ্ঞান কল্পনার হত্যাকারী' এই সূত্রকে অনুসরণ করে তাবৎ রোমাণ্টিক কবিরা এবং সাহিত্যিকবৃন্দ বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছেন, বিজ্ঞানের অধোগতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন, অথচ বাস্তবজীবনে তার অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক অবদানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তার ফলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা নিজের মনের অগোচরে তাঁদের মনোজগতেও বিজ্ঞান তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়ে গেছে, এমনকি কালক্রমে প্রভাবিতও করেছে।

বিজ্ঞান কল্পজগতের শত্রু-আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের দল এর স্বপক্ষে যতো প্রোপাগাণ্ডা করুন না কেন তা মেনে নেওয়া চলে না। বিজ্ঞানাশ্রিত বুদ্ধি কবি বা সাহিত্যিককে সুষ্ঠু পথের ইশারা যোগায়, কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা ক'রে তাঁদের দৃষ্টিকে ক'রে স্বচ্ছ। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মর্তব্য ঃ "ক্রমাগত (বিজ্ঞান) পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায়, কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।'

শুধু এ কথাই নয় অনেকে মনে করেন যাঁরা আর্টের ছাত্র, তাঁরা বিজ্ঞানের এলাকায় প্রবেশ করবেন কেন! কারণ তো পূর্বেই বলাহয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়াথেকেই বিজ্ঞানেরভাণ্ডারে নাহোক, বিজ্ঞানেরআঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।"

সাহিত্যের ছাত্ররা বিজ্ঞানকে নীরস ব'লে থাকেন। কথাটা মিথ্যে নয়। প্রাথমিক অবস্থাতেও বিজ্ঞানকে সরসভাবে পরিবেষণ করার দিকে আমাদের কেমন যেন তীব্র অনিচ্ছা আছে। পুঞ্জীভূত তথ্যের সমাবেশে রচিত হয় বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক। পরীক্ষাপাশেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা তা গলাধঃকরণ করেন। উর্ধ্বমহলে তা সম্ভব, কিন্তু যারা স্কুলের দেয়ালের মধ্যে হাঁস-ফাঁস করছে গ্রামার আর অঙ্কের নাগপাশে বন্দী হ'য়ে, তাদের কাছে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী ঘর হাঁফ ছেড়ে বসবার স্থান হলেও গ্রন্থের অভ্যন্তরের মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি হৃদয় তৃপ্তিকর হয় না। কারণ যেভাবে গ্রন্থ রচিত হয় তার মধ্যে বোঝাই করা থাকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের নানা তথ্য, বালক-চিত্তের আকর্ষণীয় করে তোলবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না। এই স্তরে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা গ্রহণ করলে অগৌরবের কোন কারণ ঘটে না। অথচ বিজ্ঞানের এলাকার মানুষেরা এ বিষয়ে বড়ো একগুঁয়ে। অবিশ্যি এ কথাও ঠিক যে তথ্যের যাথার্থ্যে এবং তাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিন্দুমাত্র স্খলনও বিজ্ঞান ক্ষমার চোখে দেখে না।

অতএব প্রয়োজন সতর্ক পদক্ষেপের। যদি এ প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় তাহলে একশ্রেণীর ছেলের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভীতির সৃষ্টি হয় তা অনেকাংশে বিনষ্ট হয়। কাব্য-সাহিত্য এবং বিজ্ঞান-দর্শনের ভাষা স্বতন্ত্র। কাব্যে অনেক সময় কবির কল্পনা বল্গাছাড়া তুরঙ্গমের মতো উধাও হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীকে রেশ টানতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন "মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষার অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজ-সজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্ত-মতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।" বোধহয় এ কারণেই অলঙ্কারের আতিশয্য বিহীন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠে অলঙ্কারপ্রিয় সাহিত্যের ছাত্রদের এত অনিচ্ছা।

বিজ্ঞান ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার শেষসীমান্তে গিয়ে পেঁৗছেচে, পরিশেষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে উপনীত হয়ে; তেমনি কাব্য বা সাহিত্যও ভাষার মই বেয়ে ভাবজগতের দূরপ্রান্তে পেঁৗছে শেষ পর্যন্ত নিজের আপন অর্থকে অতিক্রম ক'রে ভাবের ইশারা সৃষ্টি করেছে। এভাবে দু'টি শাখা প্রায় এক মেরুতে উপনীত হয়েছে।

তাহলে সাহিত্য কি! বিশেষজ্ঞরা বলেন যে মানুষের নিজের স্বভাবের স্বতঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনা-আপনিই প্রতিফলিত হয়। মানুষের মন যাকে বরণ করে, যাকে অন্তরে স্থান দেয় সেই সত্যের সৃষ্টি চলে সাহিত্যের আঙিনায়। সাহিত্য মানুষের আনন্দলোক, তার বাস্তবজগতও বটে। এই বাস্তব আর বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য এক নয়—সাহিত্যের যে সত্য তাকে মানুষ নিজের মন থেকে নিয়েছে, সেই হেতুই সে তার কাছে সত্য। কিন্ত বিজ্ঞানের সত্য আমাদের ভালোলাগা বা অপছন্দের উপর নির্ভর করে না, অপেক্ষাও করে না। বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন মূল্য নেই—এ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথও।

কবি বা সাহিত্যিক তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে এক অরূপের সন্ধান লাভ করেন, সেই অরূপকে তিনি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। অপরের দৃষ্টি যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, তাঁর কল্প-চক্ষু সব বাধা অতিক্রম ক'রে আরো দূরান্তরে প্রধাবিত হয়। রূপাতীত দেশের বার্তা তাঁর কাব্যের ছন্দে নানা আভাসে বেজে উঠতে থাকে। বিজ্ঞানীর পথ স্বতন্ত্র হ'তে পারে কিন্তু সাহিত্য বা কাব্য সাধনার সংগে তাঁর সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে নিঃশেষ হয়ে যায়, সেখানেও তিনি এক অদৃশ্য আলোকের রেখাপথ ধরে অনুসরণ করতে থাকেন অজানিতকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শ্রুতির শক্তি যখন সুরের প্রান্তসীমায় পেঁৗছায়, তখনও তিনি এক অশ্রুত কল্পনার শব্দতরংগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। মানুষের কাছে অপ্রকাশ্য যে রহস্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে দিবারাত্র জাল বুনে চলেছে, বিজ্ঞানী তাকেই প্রশ্ন ক'রে দুর্বোধ্য বস্তুকে সরলীকৃত করছেন, রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে দুর্বোধকে সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলবার কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

বিজ্ঞানী এবং কবি-সাহিত্যিকের মধ্যেকার প্রভেদ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র সুন্দর কথা বলেছেন ঃ "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়।

সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।"

ঊনবিংশ শতকে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের প্রবলতরংগোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের তটেও উপস্থিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের গবেষণা এদেশে তখন খুবই লঘু পর্যায়ের, তাহলেও তার প্রভাব এক অনস্বীকার্য আন্দোলন এনেছিল বাঙালীর বহির্জীবনে এবং সেই সংগে চিন্তাজগতেও। বলাবাহুল্য এ আলোড়ন বা আন্দোলনের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল। তাই তাঁর কাব্যে অধ্যাত্ম-ভাবনার নিবিড়তা (এবং, অনেকের মতে রোমাণ্টিকতা ও) থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানবুদ্ধিকে তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নি।

বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয়েরই ধর্ম সত্যকে প্রকাশ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানের সত্য প্রমাণিত সত্য, সমস্ত বিরোধিতার মধ্যেও তাকে প্রতিষ্ঠা করা বিজ্ঞানীর কর্তব্য। সাহিত্যের মূল কথাও তাই তবে তা হয়তো উপযুক্ত বাস্তবপ্রমাণহীন। ভারতীয় মধ্যযুগের কবি রজ্জব বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঠ॥
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

মনে হয় এখানেই বিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের মধ্যে বিভেদের একটি কারণ নিহিত। তাঁদের উভয়ের সত্য সর্বদা এক না হতে পারে, তাই বলে অপরজন ভ্রান্ত একথা বলা অনুচিত। বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে ভর ক'রে উপসংহারে হাজির হতে সচেষ্ট হন, আর সাহিত্যিক বা কবি ভাব-অনুভূতিকে আশ্রয় ক'রে সত্যে উপস্থিত হন। অতএব একে অপরকে একঘরে ক'রে রাখবার যে মর্মান্তিক ইচ্ছা পোষণ করেন এবং দুয়ের মধ্যে যে অপাংক্তেয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরর্থক।

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার, কারিগরি কৃতিত্ব সমাজের চেহারা পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। তারপরে ফোটন, কোয়াণ্টা, ইলেকট্রনিকস্, তেজস্ক্রিয়তা, আপেক্ষিকতাবাদ, অনিশ্চয়তাতত্ত্ব, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ সমাজ-জীবনে গভীর ছাপ মুদ্রিত করেছে। পুরোনো সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পালাবদলে মানুষের মনে, তার কর্মসূচীতে, জীবনযাপনে, চিন্তাধারায় নতুন রীতির প্রবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানের দুরন্ত প্রভাব মানুষের জীবন, মন ও সংস্কৃতির বিবর্তনকে সক্রিয় এবং দ্রুতবেগসম্পন্ন ক'রে তুলছে। নতুন নতুন যন্ত্র আমাদের রূপ-রুচি এবং ছন্দ-চেতনাকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলছে। সাহিত্যিক, দার্শনিক বা আর্টিস্ট—কেউ এর প্রভাব অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিন্তু এ কথা সত্যি যে এই যোগাযোগকে মেনে নিতেই হবে, কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের সংগে পছন্দমত তত্ত্ব গ্রহণ ক'রে নিজের অনুভূতি এবং কল্পনার রঙে মিশ্রিত ক'রে নতুন কল্পলোক, নবতর সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্প সৃষ্টিকরণে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। অনেক গোঁড়া বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের এই রূপান্তরণকে স্নিগ্ধ চোখে দেখেন না—তাঁরা বলেন এ হচ্ছে অপবিজ্ঞান। যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ তা সপ্রমাণ করছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আপেক্ষিকতত্ত্ব অধ্যয়ন করলেও তা অনুধাবন করা যায়।

বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে সাহিত্য বোঝেন না ব'লে সগর্বিত হন, সেটা তাঁদের অজ্ঞতা, যদিও তাকে তাঁরা আত্মম্ভরিতা অথবা মর্যাদার অনুকূল ব'লে মনে করেন। আবার সাহিত্যের ছাত্ররাও নিজেদের সবজান্তা ভাবেন, বিজ্ঞানের সরল গ্রন্থ পাঠেও তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করে তৃপ্তিলাভ

করেন, বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে সেক্সপীয়র, কাণ্ট, মার্ক্সের বুকনি নিক্ষেপ করেন, উপরন্তু বিজ্ঞান জানার জন্যে বোধহয় কিঞ্চিৎ গর্ব অনুভবও করেন—এ সবই তাঁদের দীনতা। আশ্চর্যের সংগে লক্ষ্য করা গেছে যে উভয় তরফই যেন মনে করেন একটা বিভেদ বা দ্বন্দ্ব জীইয়ে রাখতে পারলেই তাঁদের পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হ'লো। এ বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অপবুদ্ধি। তবে এর ব্যতিক্রমের মানুষ যে নেই তা নয়। আরো একটা কুসংস্কার আছে। কোন বিজ্ঞানের ছাত্র যদি সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেন বা সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হন তাহলেও বহু অহংভাবগ্রস্ত সাহিত্যের ছাত্র তাঁকে নস্যাৎ ক'রে দেবার জন্য উদগ্র হয়ে থাকেন। আবার কোন সাহিত্যের ছাত্র বিজ্ঞান পাঠে উৎসাহী হলে বা গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতিরূপে বিজ্ঞানের তথ্য সম্বন্ধে অবগত হলেও তার সেই জ্ঞানকে সরবে উপেক্ষা করেন বিজ্ঞানের উন্নাসিক ছাত্ররা। প্রথম দলের যোদ্ধারা মনে করেন 'এ আমাদের নিজস্ব এলাকা, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ক'রে আমরা সাহিত্যের অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছি—অতএব আমরা যা জানি, বিজ্ঞানের ছাত্র বাড়ীতে, ব'সে পড়াশোনা ক'রে সাহিত্যের সেই জ্ঞান লাভ করবে কি ক'রে! এ ধৃষ্টতা, অনধিকারচর্চা।' এই ভেবে অপর-পক্ষের কোন ছিটকে আসা ব্যক্তিকে তাঁদের পণ্ডিতম্মন্যতার গদাঘাতে এবং উক্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে কুঠারাঘাত ক'রে বিমল আনন্দ অনুভব করেন। তেমনি বিজ্ঞানের এলাকার পুরুষপ্রবরেরাও। উভয় শাখার বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ ধরণের ভ্রান্তবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। এর ফলে একটু সূক্ষ্ম সংঘাত লেগেই আছে। মনে হয় এ কুসংস্কার দূর না হলে, অপরের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং রুচির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করলে বিভেদ দূর হওয়া অসম্ভব। আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে অনেক বিজ্ঞানের ছাত্র সাহিত্যের ছাত্রের কোন বৈজ্ঞানিক লব্ধ জ্ঞানকে অত্যন্ত তুচ্ছভরে উপেক্ষা করেছেন। সাহিত্যের রস উপলব্ধিকারী বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞানকে সহজভাবে পরিবেশণ করবার কাজে অগ্রণী হন এবং সেই সংগে বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিকেরা যদি কল্পনার অতিশয্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত হন তাহলে উভয় সম্প্রদায় নৈকট্য অনুভব করবেন বলে অনেকের ধারণা।

একটা কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা প্রয়োজন যে বিজ্ঞান কল্পবৃত্তির বৈরী নয়, তার সহায়ক। কবি-সাহিত্যিকেরা অভিযোগ ক'রে যে সমস্ত কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে তাঁদের মন পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে বেড়াতো ভাবলোকের আকাশে, আজ বিজ্ঞান সেই কল্পলোকের রহস্যকে উন্মোচন ক'রে তার সুপ্ত সৌন্দর্যকে বাস্তবাকাশে প্রতিফলিত ক'রে কল্পনার মায়াজালকে ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। এ কথা সত্যি। কিন্তু এই সংগে এ কথাও সত্য যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার বহুতর রহস্যের ইশারা দিয়েছে, অনেক অজ্ঞাত রাজ্যের সংকেত সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছে মানুষের কল্পনা-প্রবাহকে। জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধির সংগে, অজানিতের গণ্ডীও বিস্তৃততর হচ্ছে। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর মনের প্রসার লাভ করেছে কল্পচেতনা। পুরাতন ভাব-ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে নতুনতর ছন্দের আবিষ্কারমানসে, নব নব শিল্প সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁরা ক্রমাগ্রসর হচ্ছেন। তাঁদের ভাব-লোকে কল্পনার সুদীর্ঘ স্থিতি ও নিশ্চলতার অবসানে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এর মূলে বিজ্ঞান। জীবনের মর্মমূলে দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রেরণা জুগিয়েছে বিজ্ঞান। একে অস্বীকার করবার মধ্যে পৌরুষত্ব নেই। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এ ধরণের হীনমন্যতার স্থান ছিল না তা বলা বাহুল্য।

রেনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপের মানুষের একমাত্র কথা ছিল 'প্লাস আলট্রা'—অর্থাৎ 'সামনে আরো আছে'। এ শ্লোগান যেমন শিল্পীর, সাহিত্যিকের; তেমনি বিজ্ঞানীরও।

উইলিয়াম ফক্‌নার

রণজিৎকুমার সেন

মহৎ শিল্পীমাত্রেরই জীবনানুভূতি ও শিল্পকর্মের মূলে কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করবার মতো। কাব্যের আলঙ্কারিকতা, দার্শনিকতা ও নন্দনতত্ত্বের যে পরিশুদ্ধতা—তা মহৎ শিল্পীমাত্রের জীবনকেই এক মহনীয় ভাবরাজ্যে উপনীত করে তাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সত্যজ্ঞানের অধিকারী করে তোলে। তার শিল্পকর্মের মূলে তাই কাব্যকেই আমরা প্রথম পাই, ক্রমে এই কাব্য তার মধ্যে গদ্যের সাবলীলতা সৃষ্টি করে। উইলিয়াম ফক্‌নারের জীবনেও তার আভাস সুস্পষ্ট। শিক্ষালাভের গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটে। কলেজি শিক্ষার দিকে তাঁর যে খুব বেশী মন ছিল, এমন নয়, বরং কাব্যের মধ্যে মনোনিবেশ করে তিনি সেই বয়স থেকেই জীবনে এক অতীন্দ্রিয় স্বাদ পেয়েছেন, অথচ তা বস্তুনিরপেক্ষ নয়। সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন খণ্ড-কাব্য পাঠ করে সেই সময়েই পাঠকসমাজ মনে করেছিল—আমেরিকায় আগামী যুগের শক্তিমান কবি হবেন ফক্‌নার। এবং ১৯২৪ সালে জনৈক বন্ধুর অর্থানুকূল্যে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি মার্বেল ফন' প্রকাশিত হলো, তখন তাঁর সম্পর্কে মার্কিন পাঠক আরও বেশী নিঃসংশয় হলো।

কিন্তু তাঁর জীবনদেবতার হয়তো ইচ্ছে ছিল না যে ফক্‌নার কবি হিসেবে পৃথিবীখ্যাত হন। উনিশশো চব্বিশের পর তিনি চলে যান আমেরিকার দাক্ষিণাঞ্চলে নিউ অর্লিন্‌সে। এখানে এসে তিনি এমন একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচিত হন—যার সংস্পর্শে তাঁর কাব্যদৃষ্টি ক্রমে গদ্যময় হয়ে ওঠে। সেই ঔপন্যাসিক হলেন শেরউড এ্যান্ডারসন। তার অনুপ্রেরণায় ফক্‌নার প্রথম যে-উপন্যাসে কলম ধরলেন, তার প্রকাশকাল ১৯২৬ সাল, নাম 'সোলজার্স পে'। এখন থেকে ক্রমপর্যায়ে তিনি উপন্যাসেই লেখনী সঞ্চালন করে চললেন। যে সব পাঠক তাঁকে 'দি মার্বেল ফন'-এর কবি বলে জানতেন, এখন থেকে তাঁদের কাছে ফক্‌নার শুধু কবি হিসেবেই পরিচিত হলেন না, পরিচিত হলেন কবি-কাহিনীকার রূপে। বস্তুতঃ উনপঞ্চাশ সালে নোবেল প্রাইজ পাবার পরেও তিনি নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: 'আমি তো সাহিত্যিক নই, আমি মাত্র কাহিনীকার।' কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমালোচকদের মত হচ্ছে: ফক্‌নারের গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রাত্যহিনকার আটপৌরে জীবনের কথাবার্তা তাঁর রচনায় নবরূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে তাঁর রয়েছে অসামান্য দক্ষতা।

ফক্‌নার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মিসিসিপির নিউ অ্যাল-ব্যানিতে। ১৯২৪-এর পর থেকে নিউ অর্লিন্‌সকে কেন্দ্র করে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রভাব ফক্‌নারের জীবনে অসামান্যভাবে দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দক্ষিণাঞ্চলে কিছু কবি গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন, আর কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নাম করবার মতো ছিলেন পো, লেনিয়ার, সিম্‌স এবং আরও দু-চারজন লেখক—যাঁদের সাহিত্যজগৎ সীমাবদ্ধ ছিল ঐ অঞ্চলের পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুরধার সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন অথবা নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের হথর্ন, মেলভিল, থোরো প্রভৃতি ছিলেন সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁদের সঙ্গে এই দক্ষিণাঞ্চলের লেখকদের তুলনাই চলতো না। আর, বি, ডেভিস বলেছেন: দক্ষিণের সাহিত্য-বাগিচায় যাঁরা ফুল ফুটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল ন্যাসভিলের সাহিত্যিকগোষ্ঠীই

নয়, অন্যান্যরাও ছিলেন। ১৯২০ সালের পরবর্তী প্রথম কয়েক বছর ছিল তাঁদের প্রাদুর্ভাবের কাল। ঠিক ঐ সময়েই নিউ অর্লিন্‌স্‌ সহরে বাস করতেন উইলিয়াম ফকনার ও শের উড এণ্ডারসন এবং লাফারগেস প্রভৃতি সাহিত্যিকদের একজন। শেষের দু-জনের জন্মস্থান দক্ষিণাঞ্চল না হলেও ঐ এলাকা থেকেই তাঁরা সাহিত্যের মাল-মশলা, প্রেরণা ইত্যাদি সবকিছু আহরণ করেছেন।

একথা সত্য যে, নিজের সুপরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যেই তখন ফক্‌নার তাঁর রচনার বিষয়-বস্তু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং স্পষ্টতঃ শিল্পশাস্ত্রের মৌলিকনীতি অনুযায়ীই তা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই ক্ষুদ্র পরিসরের ভবিষৎ সম্ভাবনাই বা এমন কি থাকতে পারে? সুতরাং ফক্‌নারের সাহিত্যরচনাকে তাঁর পরিচিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখার সংকল্পের অন্য হেতু কিছু ছিল। হেতুটার কতক হচ্ছেন ফক্‌নার স্বয়ং, আর কতকটা হচ্ছে সেই সময়কার দক্ষিণ অঞ্চলের যুগধর্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও প্রায় ঐ রকমই করেছিলেন। কানাডার সৈন্যবাহিনীতে তখন বৈমানিকের কাজ করেন ফক্‌নার। গার্ট্রুড ষ্টেইনের সঙ্গে অল্প কিছুকাল তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা চলে; পেটার, কন্‌রাড এবং হথর্নের কাছ থেকেও কিছুকাল তিনি তালিম নেন। 'গন উইথ দি উইণ্ড ধরনের দক্ষিণী-ঝুটা-রোমাণ্টিক সাহিত্যরচয়িনী মার্গারেট মিচেল কিম্বা ন্যাসভিল অঞ্চলের চাষী-জীবনের পটভূমিকায় রচিত 'সো রেড দি রোজ' উপন্যাসের লেখক ষ্টার্ক ইয়ং—এঁদের ধারা ফক্‌নার ইচ্ছে করলেই অনুসরণ করতে পারতেন। ইচ্ছে করলে আবার আর্স্কিন কল্‌ডওয়েলের মতো দক্ষিণ অঞ্চলকে নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'অক্সফোর্ড আন্দোলনের' পুস্তিকাজাতীয় শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত বামপন্থী উপন্যাসও লিখতে পারতেন। কিন্তু এর একটিও ফক্‌নার করেন নি। তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ এবং নিজস্ব প্রতিভাই তাঁকে ঐরূপ অনুসরণে বাধা দিয়েছে। নিজের পারিপার্শ্বিক অঞ্চল সম্বন্ধে ফক্‌নারের একটু আত্মমাত্রিক আকর্ষণ ছিল, এবং শেরউড এণ্ডারসন যে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলেই ফক্‌নার তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ইওক্‌নাপাটাওফা অঞ্চলটির ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—যাতে ঐ কল্পিত এলাকাটি এখন বার্চেষ্টার, ওয়েসেক্স বা বোহেমিয়ার উপকূল এলাকার মতই সকলের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের যথার্থ রূপটি কিরকম, ফক্‌নারের রচনায় প্রতিফলিত তাঁর নিজের পল্লী এলাকার রূপটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এই পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তার সব খুঁটিনাটি ফক্‌নার জানতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কল্পিত রচনার মধ্যে সে-সবের ছবি অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দক্ষিণাঞ্চল সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলির চরমোৎকর্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে সম্ভবতঃ ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে। এর আগে লেখা ফক্‌নারের উপন্যাস—'সোলজার্স পে', 'মস্‌কুইটোজ' এবং কবিতা 'দি মার্বল ফন' খুববেশী উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণ বিচারের দিক দিয়ে একথা সত্য হলেও এগুলিই তাঁর পরবর্তী রচনার পথ তৈরী করে চলছিল। আর তাঁর রচনার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণও ফুটে উঠেছিল ঐসব লেখার ভিতরে। শেরউড এণ্ডারসনকে উৎসর্গীকৃত 'সারটোরিস' উপন্যাসটিকে অনেকে ফক্‌নারের সবচাইতে কাঁচা লেখা বলে মনে করেন। কিন্তু এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ফক্‌নার যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাকে অনবদ্য বলতে দ্বিধা হয় না। আর তাঁর কল্পনার জেফারসন সহর এবং ইওক্‌নাপাটাওফা পল্লী অঞ্চলের সৃষ্টির আভাসের সঙ্গেও পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে এই বইটির মধ্যেই।

যেমন ফক্‌নারের পরবর্তীকালে লেখা অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা গেছে, তেমনি এই উপন্যাসটিতেও রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের দুঃখলাঞ্ছিত চিত্র। আর মনে হয়—দক্ষিণাঞ্চলের সার্বেকি বনেদিয়ানার খাতিরে দক্ষিণের যাকিছু সুনাম, সব প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো বলে একটা আশঙ্কাও যেন দেখা যায় বইটিতে।

'সারটোরিস' প্রকাশিত হবার কয়েকমাস পরেই ফক্‌নার রচনা করেন 'সাউন্ড এ্যান্ড দি ফিউরি'। সমালোচকদের অনেকের মতে এইটিই ফক্‌নারের লেখা শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস, অন্ততঃ তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একতম। মানব-মনের চেতনাপ্রবাহ অনুসরণ করে সাহিত্য-রচনার যে বিশিষ্ট ভঙ্গীটি জেমস জয়েস দেখিয়েছেন, ফক্‌নারের এই উপন্যাসটির মধ্যেও তার সাক্ষাৎ মিলবে। তবে ফক্‌নারের পদ্ধতিটি আরও সংযত, সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল। কারণ তিনি জয়েসের মতো কেবল সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই মেতে থাকতে রাজি হন নি। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে একটি সময়ের ছক কেটে তার মধ্যে তাঁর রচনাকে বসিয়ে দিয়েছেন বা বিন্যস্ত করেছেন, আর ঐ উদ্দাম উশৃঙ্খল চেতনাপ্রবাহে প্রবাহিত একটি তেত্রিশ বছর বয়সের জড়বুদ্ধি যুবকের মনকে তাঁর রচনার উপজীব্যরূপে নির্বাচিত করে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ চেতনার উদ্দামপ্রবাহে ভেসে যেতে দেখা যাচ্ছে জড়বুদ্ধি যুবকটির হার্ভার্ডবাসী ভাই কয়েণ্টিনকে, অর্থাৎ তার মনকে—যে আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প। আর দেখা যাচ্ছে ঐ নির্বোধ ভ্রাতার একটি সুস্থ স্বাভাবিক ভাইয়ের মনকে—যা তার তার ছোট সহরের ছোট দোকানটির মতই ছোট—যে দোকানে ঐ ভাইটি কেরানীগিরি করে। বেঞ্জি কমসন, কোয়েণ্টিন আর জেসন—এই তিনটি ভাই। নির্বোধ ভাইটির চেতনাপ্রবাহে যে সব কাটাছেঁড়া আর গ্রন্থিকে পাঠক-দের সমানে মেলে ধরা হয়েছে, সে সব সাধারণ মানুষের পক্ষে যে একটু দুর্বোধ্য হতে পারে, গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে সচেতন। এই জন্যেই উপন্যাসটির শেষের দিকে ফক্‌নার একটু ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।

'সাউন্ড এণ্ড দি ফিউরি' উপন্যাসে তিনি রচনাশৈলীর যে অপূর্ব চাতুর্য ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়। উপন্যাসটির নাম আহরণ করা হয়েছে সেক্সপীয়র রচিত ম্যাকবেথ নাটক থেকে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, ম্যাকবেথ থেকে উদ্ধৃত ঐ বাক্যাংশটুকুকে ঘিরে, তারই দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই যেন ফক্‌নারের এই উপন্যাসটি পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে উঠেছে। উপন্যাসটি যে নিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে সুরু করা হয়েছে, তার সঙ্গে আজ সকলেই সুপরিচিত।

'সাউন্ড এ্যান্ড দি ফিউরি'র তুলনায় 'এ্যাজ আই লে ডায়িং' রচনা-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে ততটা উৎকৃষ্ট না হলেও সুখপাঠ্য। 'স্যাংচুয়ারী' উপন্যাসটির ত্রুটি হচ্ছে, এটা নাকি নিছক অর্থের তাগিদেই লেখা হয়েছিল। তা হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রগতিপন্থী মনের সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

'পাইলন' ইত্যাদি কতকগুলো রচনার বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট, তবে ফক্‌নারকে সম্যকভাবে পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর এ-সব রচনাও পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁর প্রায় সবগুলি রচনার মধ্যেই, যেদিক দিয়ে হোক, একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাঁর 'আবসালোম আবসালোম' উপন্যাসে দেখতে পাই এক গরীব পাহাড়ী বালকের (টমাস স্টুফেন) ঘর বাঁধবার স্বপ্নের ছবি আঁকা হয়েছে। দক্ষিণের সুদূর অঞ্চলের নিখুঁত একটি ছবি ফক্‌নার এঁকেছেন তাঁর এই উপন্যাসটিতে। 'দি আনভ্যাংকুইশ্‌ড্' আমেরিকা গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত; অতিনাটকিয়তা এবং ভাবালুতাময় রচনা। আর একটি দুর্বল রচনা হচ্ছে 'দি ওয়াইল্ড

পানস'। অবশ্য এ উপন্যাসেও দক্ষিণাঞ্চলের ছবি অংশতঃ হলেও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেই তুলনায় বরং 'দি হ্যামলেট' বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এতদ্ব্যতীত ফকনার যেসব গল্প রচনা করেছেন—যেমন 'রিকোয়ায়েম ফর এ নান', 'এ ফেবল', 'দি টাউন' প্রভৃতির মধ্যেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ অক্ষুণ্ণই রয়েছে। হথর্ণ এবং ফকনারের মধ্যে যদিও আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তবু বলা যায়—অন্তরের ক্ষেত্রে দু'জনেই একই পন্থী। অন্তরের প্রেরণার জন্য দু'জনেই অপেক্ষা করতেন এবং প্রেরণা না পেলে একজনও কলম ধরতেন না। মানবিক মর্যাদা, মানুষের মহিমা ও সহনশীলতার প্রতি ফকনারের আদর্শগত স্বাভাবিক প্রবণতা আধুনিক সংশয়-বিক্ষুব্ধ জগৎকে একই সঙ্গে বিস্মিত ও আশ্বস্ত করবে সন্দেহ নেই। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'আমার বিশ্বাস, এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই কেবলমাত্র বজায় থাকবে না, মানুষ বেঁচে থাকবে তার সকল মানবিক মর্যাদা ও মহত্ত্ব নিয়ে। জীবজগতে মানুষের বাকশক্তি আছে বলেই মানুষ অমর নয়, তার দয়াপ্রদর্শন, ত্যাগস্বীকারও সহ্য করবার মতো হৃদয় ও শক্তি আছে বলেই সে মৃত্যুহীন। এ সবই কবি ও সাহিত্যিকের উপজীব্য হওয়া উচিৎ।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সালে তিনি 'উইলিয়াম ফকনার ফাউণ্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা হয়েছে এখান থেকে। এও তাঁর মানবিক সহনীয়তার আর একটি বড় দিক।

সার উইলিয়ম জোন্স

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর উইলিয়ম জোন্স লণ্ডন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। উইলিয়ম জোন্সের পিতা একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ছিলেন ও এক সময়ে রয়াল সোসাইটির উপ-সভাপতি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। উইলিয়ম জোন্সের জন্মের তিন বৎসর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। শৈশবাবস্থাতেই জোন্সের অপর একটি ভ্রাতার মৃত্যু হয়। জোন্সের মাতা সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। মাতার সুশিক্ষায় জোন্স চার বৎসর বয়সের সময় শুদ্ধ ইংরাজী পড়িতে পারিতেন। এই বয়সেই তিনি সেক্সপীয়রের রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জোন্স হ্যারোর প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার অপূর্ব মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় তাঁহার সহপাঠি ও শিক্ষকদের মুগ্ধ করিত। মাত্র দশবৎসর বয়সেই জোন্স ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অসাধারণ ছাত্র হিসাবে জোন্সের খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে হ্যারো বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া দর্শক তথাকার জোন্স নামক অসাধারণ ছাত্রটিকে দেখিয়া আসিতে ভুলিত না। জোন্সের লোকোত্তর মেধা লক্ষ্য করিয়া হ্যারো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাঃ থ্যাকারে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই বালকটিকে সলিসবেরির জনশূন্য প্রান্তরে নিরাশ্রয় ও নগ্ন অবস্থায় ফেলিয়া আসা হইলেও সে জীবনে উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইবে। হ্যারোতে ছাত্রাবস্থায় জোন্স অনেকগুলি কবিতা ও দাবা খেলার বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি কাব্য রচনা করেন।

হ্যারোর পাঠ শেষ করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জোন্স অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন ও এখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ব্যতীত হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী ইতালীয় স্প্যানিশ পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতালাভ কারয়াছলেন।

স্বামীর অকালমৃত্যুর পর জোন্স-জননী অতি কষ্টেই তাঁহার একমাত্র পুত্রের শিক্ষাব্যয়-নির্বাহ করিতেন। পাঠদ্দশাতেই মাতাকে সাহায্য করার জন্য ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে জোন্স আর্ল স্পেন্সারের একমাত্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। জোন্সের এই ছাত্রটি পরবর্তীকালে লর্ড আলথ্রোপ (২) ও আরো আর্ল-বফ স্পেন্সার নামে বিখ্যাত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এই প্রিয় ছাত্রটি জোন্সের অন্তরঙ্গ সুহৃদে পরিণত হইয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জোন্স স্পেন্সার পরিবারের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকালে জার্মান ও চীনাভাষা শিক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব (বি-এ উপাধি) লাভ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রীও লাভ করেন। ফারসী ও ফরাসী ভাষার পণ্ডিতরূপে তরুণ উইলিয়ম জোন্সের নাম ইউরোপে এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান তাঁহার নিকট রক্ষিত ফার্সী ভাষায় লিখিত নাদিরসাহের একটি জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য জোন্সকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদটি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইলে ফরাসী ভাষায় জোন্সের দক্ষতা দেখিয়া ফ্রান্সবাসিরাও মুগ্ধ হইয়া যান। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর ঘটনাচক্রে

ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই-এর সহিত জোন্সের পরিচয় স্থাপিত হয়। জোন্সের ফরাসী ভাষা জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া ষোড়শ লুই মন্তব্য করেন—মানুষটি কি অদ্ভুত ! ইনি আমার জাতির ভাষা আমাপেক্ষাও ভাল জানেন দেখিতেছি।

ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহশিক্ষকতার প্রয়োজন হইবে না—ইহা চিন্তা করিয়া জোন্স ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নের জন্য মিডিল্ টেম্পলে যোগদান করেন। আইন অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তাঁহার নিষ্ঠা ব্যাহত হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় আরবী ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাগুলি হইতে অনূদিত জোন্সের কবিতা গীতি-কবিতার অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জোন্স ফারসী ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (এ গ্রামার অব দি পারশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ১৭৭১)। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র লণ্ডন হইতেই এই পুস্তকটির ১১টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় আরবী ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাগুলি হইতে অনূদিত জোন্সের কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে জোন্সের কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরই জোন্স ইংল্যাণ্ডের প্রমুখ বিদ্বৎসংস্থা রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে তিনি বাগ্মীবর বার্ক, রাজনীতিজ্ঞ ও নাট্যকার শেরিডেন, নটকুলতিলক গ্যারিক, ঐতিহাসিক গিবন, শিল্পী জোশুয়া রেনল্ডস ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ জনসনের আন্তরিক সৌহার্দ্য লাভ করেন। ডাঃ জনসন প্রতিষ্ঠিত বহু-বিখ্যাত ক্লাবের জোন্স ছিলেন একজন বিশিষ্ট সদস্য, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। জোন্স রচিত ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হইলে ডাঃ জনসন উহার প্রতি ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাঃ জনসনের মতে জোন্স ছিলেন মানব-সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পুরুষ।

১৭৭৪ খষ্টাব্দে জোন্স আইনজীবী বলিয়া পরিগণিত হন ও আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কতিপয় রাজনীতিজ্ঞ বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া জোন্স রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এশিয়ার ভাষাগুলি হইতে অনূদিত তাঁহার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় (কমেন্টারিস্ অন্ এশিয়ান পোয়েট্রি)।

সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসায়েও তিনি সাফল্যলাভ করিতে থাকেন। এসেস্ অব্ বেলমেন্টস্ (১৭৮১) ও প্রিন্সিপলস অব গভর্নমেণ্ট (লণ্ডন ১৭৮২) নামক দুইখানি পুস্তক রচনা দ্বারা আইন ও প্রশাসন বিষয়ক রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা প্রমাণিত হয়।

দীর্ঘকাল যাবৎ জোন্স ভারতে কোন একটি উপযুক্ত পদলাভের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিপক্ষের সহিত সম্পৃক্ত থাকায় জোন্সের মনোবাসনা সহজে পূর্ণ হয় নাই। বহু অপেক্ষার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উইলিয়ম জোন্সের কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিয়োগের সংবাদ ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ৮ই এপ্রিল জোন্স উইঞ্চেণ্টারের ডীন ডাঃ জোনাথন্ শিপলের কন্যা আনা মেরিয়া শিপলের পাণিগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ জোন্স আনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সুতরাং এই বিবাহে নব-দম্পতি যে সুখী হইয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

শুভ-বিবাহের কয়েকদিন পরেই ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জোন্স দম্পতি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এই দিনটি ভারত বিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরের

ডিসেম্বর মাসে সার উইলিয়ম জোন্স প্রথম বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম কেসটি জুরীদের বুঝাইয়া দিবার জন্য জোন্স যে বক্তৃতা করেন যথাযথ উপস্থাপনা ও বাক্-বৈদগ্ধ্যের জন্য কলিকাতা বিচারালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে তাহা আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। হৃদয়বান বিচারক হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা জোন্সের জীবনের পরম অভীষ্ট ছিল। ভারতে আসিয়া তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। চার্লস উইলকিন্সের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া দেশীয় পণ্ডিতদের নিকট তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা-মানসে তিনি তরুণ শিক্ষার্থিদের ন্যায় পরিশ্রম করেন। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি পণ্ডিতদের সহিত কথোপ-কথনের উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞান অর্জন করেন। সংস্কৃত শিক্ষার পূর্বে তিনি আরও ২৭টি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জোন্স ছিলেন প্রকৃতই বিদ্যোৎসাহী, শুধুমাত্র নিজের সাধনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার মত স্বার্থপর তিনি ছিলেন না, ভারতে আসিয়াই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে প্রাচ্য-বিদ্যা-চর্চা একক চেষ্টায় সম্ভব নহে, বহুজনের সাধনায় প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব—এবং এই কার্য সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত কেন্দ্র কলিকাতানগরী।

কলিকাতায় আগমনের অল্পদিন পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জোন্সের আমন্ত্রণে কলিকাতাপ্রবাসী ত্রিশজন ইউরোপীয় কৃতবিদ্য নাগরিক সমবেত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে জোন্স ঘোষণা করেন যে এশিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রাকৃতিক বিষয় ও মনুষ্যকৃত কীর্তিরাজির চর্চাই হইবে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য।

যে ত্রিশজন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়, ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বার্স, সার জন শোর, হেনরী ভ্যান্সিটার্ট ও চার্লস উইলকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার চারি বৎসর পূর্বে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটিমাত্র প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র ছিল জাভা বা যবদ্বীপের বাটাভিয়া নগরীস্থ। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পর সোসাইটির আদর্শেই পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে সোসাইটি এশিয়াটিক ও ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই উত্তরকালে জার্মান ওরিয়েন্টেল সোসাইটি (ডয়েটশে মরগানলানডিশে গেশেল শাফ, ১৮৪৫) ও আমেরিকার ওরিয়েন্টেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (ইয়েল, নিউ হ্যাভেন ১৮৪২)। পরে বোম্বাই, সিংহল, চীন ও মালয়ে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান প্রেরণাদাতা ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এশিয়াটিক সোসাটি প্রতিষ্ঠার পর ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উহার সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। সোসাইটির উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবের জন্য হেষ্টিংস এই পদ-গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারই অনুরোধে জোন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির প্রথম সভাপতি হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জোন্স এই আসন পরিত্যাগ করেন নাই।

জোন্স প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায় প্রাচ্যবিদ্যার কোন একটি বিষয়ে ভাষণদান করিতেন। ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পর্যন্ত তিনি এইরূপ দশটি ভাষণ দান করেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জোন্সের বাৎসরিক ভাষণের বিষয় ছিল হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এই ভাষণদান প্রসঙ্গে জোন্স এই মত প্রকাশ করেন যে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগুলি ও প্রাচীন পারসিক ভাষা জেন্দ এবং সংস্কৃত ভাষা সমসূত্র হইতে উদ্ভূত একই গোষ্ঠীর ভাষা। জোন্সের পূর্বে ইটালীদেশীয় পণ্ডিত সাসেত্তি (১৫৮৫), ফরাসী পণ্ডিত কুর্দুঁশ (১৭৬৮) প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সহিত গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জোন্সের এই ঘোষণার ফলেই ইউরোপে তুলনামূলক ব্যাকরণ শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিখ শেলেগেল (১৭৭২—১৮২৯) তাঁহার (ভারতীয় ভাষা ও তাহার জ্ঞান ভাণ্ডার) নামক গ্রন্থে জোন্সের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন। জার্মান পণ্ডিত বোপ জোন্স ঘোষিত মতটিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রসঙ্গে অপর এক জার্মান পণ্ডিত গ্রীস ও ডেনমার্কবাসী পণ্ডিত রেসমাস রাস্কের নামও উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত ভাষণ ব্যতীত জোন্সের প্রদত্ত বাৎসরিক ভাষণগুলির নিম্নলিখিত তালিকা হইতে জোন্সের বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যাইবে on the orthography of Asiatik words—1784; on tht Gods of Italy, Greece and India 1785; on the Arabs 1787; on the Tartars 1788; on the Persians 1789; on the Chinese 1790; on the Borderers (Mountainers & Islands or Asia 1791; on the origin and family of NaNtions 1792; on the Asiatic History, Civil and Natural 1793 (Rs. Re. Vols. I—IV).
জোন্সের এই ভাষণগুলি তাঁহারই সম্পাদিত সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয়। (এশিয়াটিক রিসাচেস ভলুম ১-৪) এই ভাষণগুলি জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতেও স্থান পাইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জোন্স মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত কোন নাটক কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই। কালিদাসের রচনাকে জোন্সই সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রচারিত করেন। জোন্সের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গেঅর্গ ফরষ্টার জার্মান ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করিলে উহা জার্মান মনীষী মহাকবি গ্যেটে ও হার্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শকুন্তলার রচনানৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়া মহাকবি গ্যেটে লিখিয়াছেলেন যে বসন্তের পুষ্প ও পরিণত ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের দুর্লভ সমাবেশ যদি কেহ দেখিতে চান তবে শকুন্তলাই তাঁহার উপজীব্য।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জোন্স বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি জোন্সগ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশভাগে প্রকাশিত হয় (১৮০৭)। পর বৎসর জোন্স মহাকবি কালিদাস রচিত ঋতুসংহার কাব্যটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটিই সংস্কৃত ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যটিও জোন্স ইংরাজীতে সর্বপ্রথম অনূদিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই অনুবাদটি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (৪র্থ ভাগ)।

হিন্দুস্মৃতি অনুযায়ী ভারত শাসনের সুবিধার্থে চার্লস উইলকিন্স মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, মাত্র এক তৃতীয়াংশ অনুবাদের পর উইলকিন্স এই কর্ম ত্যাগ করায় জোন্স এই কার্যের ভার লইয়া বিপুল পরিশ্রম সহকারে উহা সম্পন্ন করেন। জোন্সের

মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (The Institutes of Hindu Law or the Ordinances of Menu according to glossery of Calluca, 1794) ইসলামী উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও জোন্স একটি গ্রন্থ রচনা করেন (Mohammedan Law of succession of properyty to intestates and Mohammedan Law of Inheritance—1792).

ভারতে আসিয়া ও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সুযোগ পাইয়া জোন্স সাতিশয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অবসরকালে কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে গিয়া তিনি এই দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে ভালবাসিতেন। ভারতে আসিয়া তিনি যে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভূতপূর্ব ছাত্র লর্ড আলথ্রোপের নিকট লিখিত একটি পত্র হইতে বুঝা যায়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আলথ্রোপকে লিখিত আর একটি পত্রে তিনি জ্ঞাপন করেন যে, যে কোন ইউরোপীয় অপেক্ষা এই দেশ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান অর্জনই তাঁহার লক্ষ্য।

সংস্কৃত অধ্যয়নের গুরু পরিশ্রমে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জোন্স অসুস্থ হইয়া পড়েন, এই সময় রোগশয্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উদ্ভিদ-বিদ্যায় গবেষণার জন্য তিনি প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংল্যাণ্ডে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে একটি পত্র লিখিয়া তিনি জানান যে, উদ্ভিদ-বিদ্যা-চর্চা এবং পণ্ডিতদের সহিত দেবভাষায় (সংস্কৃতে) কথোপকথনই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা সুখপ্রদ। আধুনিক ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অন্যতম প্রবর্তক জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করার নিমিত্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়ম রক্সবার্গ ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত অশোক-বৃক্ষের "জোনেসিয়া অশোক" নামকরণ করেন। এই বৃক্ষটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে রক্সবার্গ প্রদত্ত নামেই পরিচিত হইয়াছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ব্যতীত ভারতের অতীত ইতিহাসে, ভূবৃত্তান্ত, হিন্দু-সঙ্গীত ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও জোন্সের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই সব বিষয়ে তিনি অনেক-গুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও রচনা করিয়াছিলেন। এই সব বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারও তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

সুপ্রীম কোর্টের কর্মক্ষেত্রে, এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালনায়, নিজের ব্যক্তিগত বিদ্যাচর্চার পরিবেশে জোন্স ভারতে আসিয়া সবিশেষ হৃষ্টবোধ করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জোন্স-পত্নী আনা ছিলেন পতির একান্ত অনুগত সহধর্মিণী, স্বামীর প্রতিটি কাজে তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। ভারতে আসিয়া তাঁহার শরীর ভাল থাকিত না তথাপি তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শমত স্বামীকে ভারতে একাকী রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইতেন না। ভারতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন আশা না থাকায় অগত্যা জোন্স-পত্নী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত ত্যাগ করেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরও অধিকতর-রূপে আয়ত্ত না করিয়া ভারত ত্যাগ করিবার স্পৃহা জোন্সের ছিল না—কিন্তু স্ত্রীর বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল সহ্য করা তাঁহার মত অনুরক্ত স্বামীর পক্ষে সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়া তিনি পরিকল্পনা করেন যে, আরও এক বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া মনুস্মৃতির অনুবাদ প্রকাশান্তে ৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবেন। স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল নতুবা আদৌ তাঁহার ভারত ত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। বিধাতার অমোঘ বিধানে সশরীরে ভারত ত্যাগ করা জোন্সের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্ত্রীর সহিত ও তিনি ঈপ্সিত মিলন লাভ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই জোন্স অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ভারতে আসিয়া বিচারকের কার্য করিয়া যে অবসরটুকু পাইতেন তাহা এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে ও নিজের পড়াশুনায় ব্যয়

করিতেন। আহার বিহারে তিনি যথেষ্ট সংযমী ছিলেন, তথাপি সাধ্যাতিরিক্ত গুরু পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল জোন্স অসুস্থবোধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন। সপ্তাহকালের মধ্যে ২৭শে এপ্রিল কলিকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। জোন্সের পরলোকগমন সংবাদে কলিকাতার দেশীয় বিদেশীয় সকলপ্রকার নাগরিক-ই শোকামগ্ন হয়। বহু দেশীয় পণ্ডিতের সহিত জোন্সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, জোন্সের মৃত্যুতে তাঁহারা আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করেন। উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে জোন্সের নশ্বর দেহ পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় (সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউন্ড)। জোন্সের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভের মর্মর ফলকে তাঁহারই রচিত এই কয়টি পংক্তি খোদিত করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায়পরায়ণ, উদার হৃদয়, পরদুঃখকারত মহানুভব জোন্সের প্রকৃত পরিচয়ই ইহার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া আছেঃ

HERE WAS DEPOSITED
THE MORTAL PART OF A MAN,
WHO FEARED GOD, BUT NOT DEATH,
AND MAINTAINED INDEPENDENCE,
BUT SOUGHT NOT RICHES,
WHO THOUGHT

None below him but these base and unjust,
None above him but the wise and virtuous
Who loved
His parents, kindred, friends, country
With an ardous
Which was the chief source of
All his pleasures and all his pains

AND WHO HAVING DEVOTED
HIS LIFE TO THEIR SERVICE.

And To
The improvement of His mind
Resigned it Calmly,
Giving Glory to his Creator,
Wishing Place on Earth
And with
Good Will To All Creatures.

জোন্সের মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডনের সেন্টপলস্ ক্যাথিড্রেলে জোন্সের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকস্তম্ভ উৎসর্গ করেন। জোন্সের একটি মর্মরমূর্তিও কোম্পানীর ব্যয়ে নির্মিত হইয়া কলিকাতায় স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়। জোন্স-পত্নী স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতি-

রক্ষার্থে অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজের ভোজনাগারের পার্শ্বে তাঁহার একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জোন্সের সমগ্র প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা একত্রিত করিয়া ছয়খণ্ডে উহা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, জোন্সের পক্ষে তদীয় সহধর্মিণী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীই "সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ" (দ্রঃ পৃঃ ১১৫, জীবন-চরিত, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬)। ভারতের গভর্নর জেনারেল সার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) জোন্সের একজন গুণমুগ্ধ সুহৃৎ ছিলেন। ইনি সার উইলিয়ম জোন্সের মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। জোন্সের জীবনী ও রচনাবলী সম্বন্ধে তিনি দুইখণ্ডে একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন (Memoris of the life, writings and correspondence of Sir William Jones—Lord Teignmouth, London, 1804) জোন্সের সমগ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তেরটি খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। লর্ড টেইনমাউথের পুস্তকটি এই গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। এখানে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে সার জন শোর সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিরূপে তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিয়াছিলেন।

জোন্স তাঁহার জীবদ্দশাতেই এশিয়াটিক জোন্স নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এশিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার প্রতীচ্য জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। নিজকৃত অজস্র অনুবাদের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য জগতকে প্রাচ্য-ভাষার অমূল্য সম্পদগুলির সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। জোন্স ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে সাধারণ খৃষ্টানসুলভ ধর্মান্ধতা ছিল না। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইউরোপে তাহা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। জোন্সের রচনার মধ্যমে প্রাচ্য ভাবধারা অষ্টাদশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহার পুষ্টি সাধন করে। এই শতকের সাদে, টমাস মুর। শেলী, টেনিসন প্রভৃতির রচনায় উইলিয়ম জোন্সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে বাস কালে জোন্স দুর্গা, ভবানী, সূর্য, গঙ্গা, ইন্দ্র মহাদেব লক্ষ্মী, সরস্বতী নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কল্পনা অনুযায়ী ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি স্তোত্র রচনা করেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক মিসেলেনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে সব কয়টি জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-সংগ্রহেও (ত্রয়োদশ খণ্ড) পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। জোন্সের শকুন্তলার সাবলীল অনুবাদ ও স্তোত্র সংগ্রহ অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ কবি কুলের প্রিয় পাঠ্য ছিল। শেলীর প্রথম জীবনের রচনায় যে নাস্তিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়—উত্তরকালে প্রকৃতি-পূজা ও অধ্যাত্ম-চেতনা তাহার স্থান অধিকার করে। উইলিয়ম জোন্সের রচনার প্রভাবই শেলীর এই মানসিক বিবর্তনের কারণ বলিয়া অনুমিত হয় (দ্রঃ পৃঃ ৬৯৪ সার উইলিয়াম জোন্স এ্যাণ্ড ইংলিশ লিটারেচার পিন্টো, ভি. ডি সোলা)। অধ্যাপক হিউয়েটের মতে জোন্সের "হিমস্ টু নারায়ণ" দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শেলী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'হিম্স্ টু ইনটেলেকচুয়ালস্ বিউটি' রচনা করেন (দ্রঃ হারমোনিয়াস জোনস—আর. এম. উইউইট্)। কীটস-এর 'হাইপেরিয়ন' কবিতার প্রথমাংশের সহিত জোন্সের 'হিমস্'-গুলির প্রভাবও লক্ষণীয় (দ্রঃ পৃঃ ১০০, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভার্স—এইচ· সার্প)।

জোন্স ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি

বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি হিসাবে সার উইলিয়ম জোন্স অবশ্যই স্মরণীয়

পুরুষ কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার অপর সকল কীর্তিকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে জোন্স প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির বয়স ১৭৯ বৎসর। সোসাইটির প্রায় দুই-শতাব্দব্যাপী ইতিহাসের আলোচনা সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এশিয়াটিক সোসাইটি ইহার সূচনাকাল হইতে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন ও লোকসাহিত্যের গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণাতেই ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রসার হইয়াছে। গত দেড়শত বৎসরে ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার উৎসস্থল কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাটির কর্মী জেমস প্রিন্সেপ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেন। সোসাইটির অন্যান্য গবেষকগণ কর্তৃক লিপি-মালার পাঠোদ্ধার ও প্রাচীন মুদ্রাগুলির কাল নির্ণয় দ্বারা ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধারে সহায়তা করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় অগ্রণী এশিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টান্তে ভারত সরকার ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্বুদ্ধ হন। ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব-সমিতি ও সম্মেলন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ভারত সরকারের ভাষা সমীক্ষা বিভাগ সৃষ্টি ও পরিপুষ্ট হয়। প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়েও এশিয়াটিক সোসাইটির দান অসামান্য। দেশে ও বিদেশে এই বিষয়ে সোসাইটির কর্মপ্রণালীই আদর্শ হইয়া আছে।। শতবর্ষ পূর্বে সোসাইটি 'বিবলিওথিকা ইন্ডিয়া' নামে অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করে, এই গ্রন্থমালায় এযাবৎ বহুসংখ্যক পুস্তক অতি সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের পরে সোসাইটির উল্লেখযোগ্য কর্মিদের মধ্যে উইলকিন্স, কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ, কার্নিংহাম; জারেট; ব্লকম্যান; বিভারিজ; হজসন ক্ষোমা দ্য করোসী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভারত-বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক্‌পাল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠাকালে জোন্স সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, এশিয়ার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে মনুষ্য-কৃত সকল বিষয় ও প্রকৃতি-সৃষ্ট সমুদয় বস্তু সোসাইটির আলোচনীয় হইবে। প্রতিষ্ঠাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটি প্রথম হইতেই বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সোসাইটি প্রকাশিত ট্রান্‌জাক্‌শ্যান্ ও জার্নাল ভারতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞানালোচনার প্রবর্তন করিয়াছিল। এই দুইটির মাধ্যমেই ভারতে গণিত, আবহতত্ত্ব, সমুদ্র-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ, ঝটিকাগতিতত্ত্ব, বিদ্যুৎতত্ত্ব, ভূ-বিজ্ঞান, পশুতত্ত্ব; উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান; ভূগোল, জাতিতত্ত্ব, রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা অঙ্কুরিত ও বিকাশিত হয়। ভারতে ভূতত্ত্ব-বিদ্যার জন্মদাতা ভয়সে ও ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার প্রবর্তক ওল্ডহামর, ল্যাম্বিটন, নিউবোল্ডে প্রভৃতি খ্যাতিমান ভূতত্ত্ববিদ্‌দের প্রাথমিক কর্মকেন্দ্র ছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি। আলিপুর পশুশালার প্রথম অধ্যক্ষ সোয়েল্ডার, ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার জন্মদাতা রক্সবার্গ, নৃতত্ত্ব-বিদ্ ডলটন প্রভৃতি সোসাইটির সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ইহাদের গবেষণাগুলি সোসাইটির পত্রিকাগুলিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে বিজ্ঞানের সকল শাখাগুলিরই আলোচনার সূত্রপাত সোসাইটির মাধ্যমেই আরম্ভ হইয়াছিল ইহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আধুনিক-কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রবন্ধ দুইটিই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই পঠিত ও সোসাইটির পত্রিকাতেই মুদ্রিত

হইয়াছিল।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভাগগুলির প্রায় সব কয়টিই সোসাইটির প্রেরণায় ও সহায়তায় সৃষ্টি হইয়াছে ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় ত্রিকোণ-মিতি-সমীক্ষা (১৮১৮), ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা (১৮৫১), ভারতীয় আবহ বিভাগ (১৮৭৫), ভারতীয় পশু-বিজ্ঞান সমীক্ষা (১৯১১), ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যা সমীক্ষা (১৯১২) ও অধুনা সৃষ্ট নৃতত্ত্ব বিভাগের নাম করা যাইতে পারে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনস, আলিপুর পশুশালা প্রতিষ্ঠায় এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা অতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টাতেই ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস জন্মলাভ করে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই প্রমুখ সংস্থা আবার অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখাও কার্যকরী ছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সোসাইটির কোন প্রয়াস ছিল কিনা ইহা বর্তমানে নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে সোসাইটির পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায় সোসাইটির কয়েকজন সদস্য গত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠদশকে মেডিকেল কলেজে বিশিষ্ট দায়িত্বভার বহন করিতেন। কলিকাতায় একটি 'ট্রপিকাল স্কুল অফ মেডিসিন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এশিয়াটিক সোসাইটির একজন ভূতপূর্ব সভাপতি ডক্টর অ্যানাডেল কর্তৃকই উত্থাপিত হইয়াছিল।

ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিন প্রতিষ্ঠার পর সোসাইটির চিকিৎসা-বিদ্যাসংক্রান্ত সকল পত্রিকাদি এই স্কুলের লাইব্রেরীকে দান করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ২৯ জন ফেলো লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে ২০ জন ছিলেন সোসাইটির অতি উৎসাহী সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সলারের আসন অলংকৃত যিনি করেন তিনও ছিলেন এই সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি সার জেমস কোলভিল। বর্তমানেও সোসাইটির জার্নালে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাদি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সোসাইটি হইতে ১১টি পদক পুরস্কার বিতরিত হয়। ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার জন্য আরও দুইটি পদকের ব্যবস্থা আছে। সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃতদের মধ্যে সকলেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সোসাইটিতে গবেষণা কার্যের জন্য নিম্নলিখিত চারিটি রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা আছে—সার উইলিয়াম জোন্স ফেলোশিপ (সংস্কৃত গবেষণা), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফেলোশিপ (বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণা) জেমস প্রিন্সেস স্কলারশিপ (লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা), আর, জি, কেসি ফেলোশিপ (ইসলামিয় গবেষণা)।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। সোসাইটির মিউজিয়মে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সংগৃহীত হইবে স্থিরীকৃত হয়—প্রস্তর, তাম্র অথবা প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি (হিন্দু অথবা মুসলমান শাসনকালীন), হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, প্রাচ্যদেশীয় যুদ্ধাস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, ধর্মীয় কার্যে ব্যবহৃত তৈজসাদি, কুটির-শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ভারতেই যাহা পাওয়া যায় এমন শুষ্ক অথবা সংরক্ষিত মৃতদেহ, এই জীবজন্তুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল অথবা অস্থি, পাখীর সংরক্ষিত অথবা শুষ্ক মৃতদেহ, শুষ্ক ফল ও লতাগুল্ম, খনিজদ্রব্য, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত (ওরস), উদ্ভিজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত দ্রব্য (খই, চিড়া, মুড়ি, গুড় প্রভৃতি), ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সোসাইটির মিউজিয়ম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলে এই বৎসর মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্রব্যাদির একটি তালিকা-পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি গভর্নমেন্টকে সর্বসাধারণের জন্য একটি মিউজিয়ম স্থাপন করিতে অবহিত করিতে থাকে। সোসাইটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেণ্টকে জানায় যে গভর্নমেণ্ট মিউজিয়ম স্থাপন করিলে সোসাইটির নিজস্ব সংগ্রহ গভর্নমেন্ট মিউজিয়মে দান করা হইবে। সোসাইটির নিকট হইতে অবিরত অনুরোধ পাইয়া ভারত সরকার অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি এক্টের দ্বারা কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' স্থাপন করেন। সোসাইটির পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও পশু-বিদ্যা সংক্রান্ত সকল সংগ্রহগুলি লইয়া এইভাবে ভারতীয় যাদুঘর বা ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে সোসাইটির মুদ্রাসংগ্রহও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দান করা হয়। সোসাইটির প্রেরণা ও অকুণ্ঠ দানেই 'ইণ্ডিয়ান মিউযিয়ম' বর্তমানে বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালায় পরিণত হইতে পারিয়াছে।

সোসাইটির কার্যবিবরণী (সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি সহ) এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৭৮৮-১৮৩৯ পর্যন্ত এই পত্রিকার ২০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়, এই খণ্ডগুলির বিষয়বস্তুর নির্ঘন্ট হিসাবে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সোসাই-টির প্রয়োজনের অনুপাতে এসিয়াটিক রিসার্চের আয়তন পরিমিত না হওয়ায় কিছুকাল অবশিষ্ট তথ্যাদি হোরেস হেমান উইলসন প্রবর্তিত কোয়ার্টার্লি ওরিয়েণ্টাল জার্ণাল (১৮২১—১৮২৭) ও এবং "ট্রান্সজাকসানস অফ দি মেডিকেল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল" সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক রিসার্চেসের পরিপূরক এই দুইটি পত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এইগুলি জে. ডি, হারবার্টের "গ্লিনিংস ইন সায়েন্স" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ এই পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলে সোসাইটির অনুমতিক্রমে এই পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকাটি জার্ণাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ১০ বৎসরকাল এই পত্রিকাটি জেমস প্রিন্সেপের নিজ দায়িত্ব ও ব্যয়ে প্রকাশিত হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির নিজস্ব পত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকা বিলুপ্ত হইলে সোসাইটি স্বয়ং প্রিন্সেপ প্রবর্তিত জার্ণাল অব্ দি এশিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর পরিচালন ভার গ্রহণ করে। এই জার্ণালের প্রথম সিরিজে (১৮৩২—১৯০৪) প্রত্যেকের দুইটি ভাগসহ মোট ৭৫ মূল খণ্ড আরও অতিরিক্ত কয়েকটি খণ্ড-সহ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যবিবরণী ৪০টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত সোসাইটির জার্ণাল (দ্বিতীয় সিরিজ) কার্যবিবরণীসহ ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জার্ণালের তৃতীয় সিরিজে (১৯৩৫—১৯৫৮ পর্যন্ত) ২৪টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বার্ষিক বিবরণী এই খণ্ডগুলির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৯ হইতে জার্ণালের চতুর্থ সিরিজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের উনবিংশ খণ্ড হইতে এই জার্ণালটি "জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত সোসাইটি হইতে ১২ খণ্ড 'মোমোয়ারস' ও এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে রচিত ১০ খণ্ড পুস্তক (মনোগ্রাফস্) প্রকাশিত হইয়াছে।

শতবর্ষ পূর্বে সোসাইটি 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করে। এই গ্রন্থ-মালায় এ যাবৎ প্রায় ৬৮০ খানি প্রাচীন মূল্যবান পুস্তক অতি দক্ষতার সহিত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সম্পাদিত বা অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, তিব্বতীয়, বাঙ্গালা, মৈথিলী, রাজস্থানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার এতগুলি পুস্তকের সুষ্ঠু সম্পাদন, অনুবাদ ও প্রকাশ এশিয়াটিক সোসাইটির অতন্দ্র কর্মকুশলতার পরিচায়ক। তিব্বতীয় ভাষা ও তিব্বত বিদ্যা চর্চায় বিশ্বে এশিয়াটিক সোসাইটি পথপ্রদর্শক। বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজের এতগুলি

পুস্তক প্রকাশ ব্যতীত সোসাইটির সাহায্যে আরও প্রায় চল্লিশটি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে সোসাইটি অনেকগুলি প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যা ধুরন্ধরদের দ্বারা রচিত এই রিপোর্ট-গুলির সহায়তায় বহু মূল্যবান পুস্তক চিরবিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমানে সোসাইটির পাঠাগার পাঁচ ভাবে বিভক্ত (১) সাধারণ বিভাগ (২) সংস্কৃত বিভাগ, (৩) ইসলামী বিভাগ,(৪) ভোটমঙ্গল বিভাগ, (৫) লেখমালা ও মুদ্রা বিভাগ। সাধারণ বিভাগে এক লক্ষ বিংশ সহস্র ইউরোপীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক আছে। পুস্তকগুলির অধিকাংশ ভারততত্ত্ব, এশিয় লোকসাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধীয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুদ্রিত পুস্তকও আছে। এই সংগ্রহের বহু পুস্তক অন্যত্র দুর্লভ। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক সাময়িক পত্র সংগ্রহও এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য। সোসাইটির সংস্কৃত বিভাগে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উভয় প্রকার পুস্তকই আছে। এই বিভাগে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ২৮,০০০; এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন পুঁথিটির লিপিকাল সপ্তম শতাব্দী। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় এবং প্রচলিত প্রায় প্রতিটি লিপিতে (স্ক্রিপ্টস্) লিখিত এই পুঁথিগুলি হইতে ভারত-বিদ্যার বহু বিস্তৃত শাখাগুলির অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির মধ্যে কতকগুলি চিত্রিত পুঁথিও আছে। ইহাদের কোন কোনটি দশম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুঁথিগুলিতে হস্তনির্মিত কাগজ ব্যতীত তালপত্র, ভুর্জপত্র, ওসোলা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইসলামী বিভাগে মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত আরবী, ফারসী, তুর্কী, পুস্তক প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ছয় সহস্র পুঁথি আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুঁথি চিত্রিত। ইসলামী সংগ্রহের কিছু কিছু পুঁথি একদা মোগল সম্রাটদের রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। ভোট-মোঙ্গল বিভাগে (সিনো-টিবেটিয়ান সেকশন্) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষার পুঁথি ব্যতীত চৈনিক ভাষায় কাষ্ঠে খোদাই পুঁথি আছে। চীনা ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলি ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ। এতদ্ব্যতীত বর্মা, যবদ্বীপ ও শ্যাম, সিংহল দেশ হইতে সংগৃহীত এ সব দেশীয় ভাষায় লিখিত পুঁথিও আছে। লেখমালা ও মুদ্রা বিভাগে—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত প্রায় অর্ধশত তাম্রশাসন আছে। ১৯০৬ পর্যন্ত সোসাইটির সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দান করা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর সংগৃহীত মুদ্রাগুলিই বর্তমানে সোসাইটির পাঠাগারে রক্ষিত আছে। সোসাইটির লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য সোসাইটির গ্রন্থশালা বিদ্যোৎসাহিদের নিকট অবারিত।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর বিংশ বর্ষকাল ধরিয়া সুপ্রীম কোর্টের "গ্রাণ্ড জুরী" কক্ষে সোসাইটির সভা অনুষ্ঠিত হইত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর এই "গ্রাণ্ড জুরী রুম" ব্যবহার লইয়া অসুবিধা দেখা দিলে সোসাইটি কর্তৃপক্ষ গভর্নমেণ্টকে সোসাইটিকে একখণ্ড জমি দিবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহা আরও স্থির করা হয় যে সদস্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় প্রার্থিগণকে দুইটি সুবর্ণ মুদ্রা (মোহর) প্রবেশ দর্শনী দিতে হইবে। সদস্যদের দেয় ত্রৈমাসিক এক মোহর চাঁদা ও প্রবেশকালীন চাঁদা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ সোসাইটির গৃহনির্মাণ কাজে ব্যয়িত হইবে স্থির করা হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট কলিকাতার পার্কষ্ট্রীটে একখণ্ড জমি সোসাইটিকে দান করেন। সরকারী পূর্ত-বিভাগের ক্যাপটেন

লক কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটির নিজস্ব ভবন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। গত দেড় শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া এই ভবনটি সোসাইটির কর্মকেন্দ্র। ১নং পার্কষ্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন কলিকাতার প্রাচীন সৌধগুলির অন্যতম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সংলগ্ন কিছু ভূমিখণ্ড লাভের পর সোসাইটি ভবন কিছু সম্প্রসারিত হয়। সোসাইটির কর্মধারার বিস্তৃতি হেতু বর্তমানে এই বিশাল ভবনটিতেও স্থানাভাব অনুভূত হওয়ায় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ অর্থানুকুল্যে এই ভবনটি পশ্চিম দিকে চৌরঙ্গী সরণি অভিমুখে সম্প্রসারিত করা তেছে। সোসাইটি ভবনের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। রুবেন্স, গিদো, ডমিনিসিনো, রেনল্ডস, ক্যানালেটি; কেটেল; হোম; চিলেরি, পো, ড্যানিয়েল, সে রোয়েরিক, প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত শিল্পিগণ অঙ্কিত চিত্রাবলীর সমাবেশে সোসাইটি ভবন চিত্রামোদিগণের অবশ্যদর্শনীয়। প্রসিদ্ধ ভাস্করদের দ্বারা নির্মিত কয়েকটি মর্মর মূর্তিও সোসাইটির অভ্যন্তর ভাগের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। যাঁহাদের মূর্তি এখানে রক্ষিত আছে তাঁহাদের সকলের সেবায় সোসাইটি ও বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে। সোসাইটি ভবনে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে পরলোকগত জ্ঞানসাধকদের প্রতিমূর্তিগুলি শরীরীরূপে উত্তরসাধকদের সাধনা সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে।

উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠার সময় সোসাইটির নাম ছিল—এশিয়াটিক সোসাইটি. ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক শব্দ হইতে K বর্ণটি বাদ দেওয়া হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ সোসাইটির অনুমতিক্রমে গ্লিনিংস্ অব সায়েন্স পত্রিকাটি "জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে প্রকাশ আরম্ভ করেন। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত নামসাযুজ্যে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হইতে পারেন ভাবিয়া প্রিন্সেপ ইহা "জার্ণাল অব এশিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" নামে প্রকাশ করেন। "এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল" অভিধাটি জার্ণালের মধ্যে দিয়ে সুপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সোসাইটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হইতে কাগজ-পত্রাদিতে সরকারীভাবে এই নামটিরই ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সোসাইটির ১৫০ তম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় সদস্যগণ রাজকীয় অনুমতি সাপক্ষে সোসাইটির নাম রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভাইসরয়ের মারফৎ প্রাপ্ত রাজকীয় অনুমতি অনুসারে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি "রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল" নামে পরিচিত হইতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রয়েল ও বেঙ্গল কথা দুইটি বাদ দিয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে সোসাইটি ইহার প্রাচীনতম নামটি গ্রহণ করিয়া "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে পুনরায় পরিচিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে সোসাইটির প্রায় দুইশতবর্ষব্যাপী কর্মধারার কথা স্মরণ করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পরিকল্পিত সম্প্রসারিতব্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবার কালে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুপণ্ডিত ডাঃ হুমায়ুন কবীর মহোদয় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব অথবা সামরিক অভিযানলব্ধ বিজয় অপেক্ষা একটি নূতন ভাবনার জন্ম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা মানবসমাজের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেননা এই দিন হইতে একটি নূতন ভাবনার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির সেবা ধন্য ভারতবাসির অন্তরে ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহামতি সার উইলিয়ম জোন্সের স্মৃতি চিরকাল ভাস্কর হইয়া বিরাজ করিবে ইহাই আশা করা যায়।

লোকায়ত শিল্প ও লোকশ্রুতির প্রকৃতি

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তুলনামূলক আলোচনার আলোকে শিল্পমান নির্ধারণ সহজসাধ্য নয়, কেননা, প্রতিটি শিল্পসামগ্রী-ই তুলনারহিত অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, নিজেই নিজের তুলনা। তথাপি স্বীকার্য, এতাদৃশ শ্রেণীবিভাজনে সাধারণ সমালোচকও সমুৎসুক। কারণ, নিরুপম শিল্পচিন্তা কাঙ্ক্ষনীয় হলেও, কস্মিনকালে সুলভ নয়, অপিচ, সাধারণ্যে খাণ্ডিকচিন্তার প্রতি আসক্তি অনাদিকাল থেকেই সংখ্যাগৌরবে ধন্য। এবং এইসূত্রেই বহুশ্রুত একটি উক্তি : ধ্রুপদী-শিল্প ও লোকায়ত-শিল্পের ভিতর যে প্রভেদ, কেতাবীশিক্ষা ও লোকশ্রুতির ভিতর তদনুরূপ প্রভেদ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সম্ভাব্য যুক্তি : যত্নার্জিত কলাজ্ঞান এবং অনায়াসলভ্য সাহজিক জ্ঞান কুত্রাপি সহ-অবস্থান করে না। কেননা, সংস্কৃতি ও সংস্কার কথা দুটির মধ্যে শব্দগত সাধর্ম থাকলেও গুণগত অসদ্ভাব অস্পষ্ট নয়; এবং এই অসদ্ভাব মূলত প্রভেদ-ই। কারণ, বৈপরীত্যটি এখানে পরিমাণগত নয়, প্রকারগত। অতএব, উভয়ের মূল্যায়ন কখন-ই সমকোটিতে সম্ভব নয়। ভরসার কথা, স্তিমিত হলেও, অপর শিবিরের কণ্ঠও স্বগত নয়। তাদের যুক্তি : জৈববৃত্তি মানুষের স্বভাবধর্ম, কিন্তু সেখানেই সে নিঃশেষিত নয়; তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সে বিচারশীল মানুষ। প্রাণীকুলে একমাত্র মানুষ-ই ঘোষণা করল 'আমি অমৃতের পুত্র, ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে, পশুত্ব অতিক্রম করে দেবত্বে উপনীত হওয়াই আমার সাধনা, সেখানেই আমার কৈবল্যসিদ্ধি।'

ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের আলোচনার পরিপ্রেক্ষায় উপর্যুক্ত ভূমিকাটি অপরিহার্য। কারণ, মানুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন শিল্পের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। উভয়ের বাহ্য বৈপরীত্য এবং মৌল সাধর্ম প্রতি যুগেই শিল্পরসিকের ভাবনার কারণ হয়েছে। যেহেতু শিল্পমানের তুলাদণ্ড, কালোত্তীর্ণ নয়, সুতরাং কালান্তরে তার মূল্যায়নের তারতম্যও অনিবার্য। 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ধ্রুপদী-শিল্পে মানুষকে করা হয় দেবতা আর লোকায়ত-শিল্পে দেবতাকে করা হয় মানুষ।' উক্তিটির আপাত-সত্য অনস্বীকার্য। বস্তুত, স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় ব্রাহ্মণের নির্ভুল বেদপাঠ সংস্কৃত-নামক মানবিক ভাষাকে 'দেবনাগরী' নামকরণ কিংবা দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ঘরের মেয়েরূপে কল্পনা করা, শ্রীকৃষ্ণকে আদর করে কানাই নামে ডাকা—এসবই উক্ত সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সঙ্গীতদর্পণকার ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের নাম দিয়েছেন মার্গ ও দেশী এবং সঙ্গীতকেও এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। কথিত আছে, মার্গ সঙ্গীত শিব কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ভরত কর্তৃক অনুসৃত। এই সুরসুধাপানে মানবগণ মুক্তিলাভ করে। পক্ষান্তরে, লোকরঞ্জনার্থ মানবগণ কর্তৃক যে লৌকিক সঙ্গীত গীত হয় তার নাম দেশী সঙ্গীত। লোকরঞ্জন-ই এর একৈব লক্ষ্য, সুতরাং মুক্তির প্রশ্ন-ই ওঠে না। দশরূপকারও এবংবিধ নামে ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পকে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। সঙ্গীতদর্পণকার-প্রোক্ত স্বর্গীয়চিন্তা তাঁর মার্গরূপদর্শনে অনুপস্থিত। তাঁর মতে অঙ্গ-প্রক্ষেপনের মাধ্যমে নিহিতার্থ প্রকাশ করাই

মার্গনৃত্যের বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে পুরাণ-কাহিনীও স্মরণযোগ্য। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি এবং যম উভয়ে-ই যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত। স্তবস্তুতি ও যাজ্ঞিক কার্য করছেন প্রজাপতি, আর নৃত্য-গীত বাদ্যযোগে তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছেন যমদেব। যজ্ঞকার্য সুসমাধা হলে যমদেব মর্ত্য-লোকে প্রবেশ করলেন মৃত্যুরূপে। লোকান্তরগামীর প্রতি শোকাতের যে ক্রন্দন তা যমদেবের এই মৃত্যুরূপী আগমনের প্রতিক্রিয়া। যমদেবের এই দ্বৈতরূপ আসলে ধ্রুপদী ও লোকায়ত রূপ। শতপথব্রাহ্মণে গন্ধর্বপ্রিয়া বাকদেবী দেবগণের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের প্রতি আসক্ত হলেন। অভিমানী গন্ধর্বগণ বলল, 'ওলো গরবিনী দেবগণের যা কিছু প্রেমারতি তা' তোমার ঐ কনকনিভ কান্তির জন্য।' বাকদেবীর এই দেবাসক্তি প্রণয়াসক্তির-ই নামান্তর। গন্ধর্বগণ যাই বলুক সুর-আকুলতা প্রেমিক-মনে চিরন্তন। স্মরণীয়, যমুনা-পুলিনে—শ্রীরাধা একদা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরেই মজেছিলেন। এবং অদ্যাপি এ মোহাঞ্জন অপসৃত নয়। কেননা, বাকদেবীর অনুসরণে মহিলামহলে নৃত্যগীতনিপুণ পুরুষের আজও অগ্রাধিকার। লক্ষ্যণীয়, জৈমিনীয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে কাহিনীগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বক্তব্যবিষয় পরস্পরের সম্পূরক। উভয় পুরাণেই ধ্রুপদী আলোচনায় অধ্যাত্মরস আবশ্যিক বলেই স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর বাকের উক্তি উদ্ধার্য :

"The religious value of art—Marga—is clearly apparent from this quotation, and actually this art, as conceived by the highest God and handed down through a succession of teachers, is felt as a means of breaking the cycle of birth.'

অধ্যাত্মরসকে কলাবিদ্যার দোসর মনে করলে উপযুক্ত সিদ্ধান্তকে যুক্তিসহ মনে করা যেতে পারে। ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে একথাও অবিদিত নয়, ধ্রুপদীরূপ স্বর্গীয় সুতরাং অবিনশ্বর, লোকায়তরূপ একান্তই লৌকিক সুতরাং নশ্বর, শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় 'সূর্যাতপতলে যা-কিছু সব-ই সেই মহামৃত্যুর অভিমুখী।' জন্মমৃত্যুর ডোরে বাধা জীবনকে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, বিশেষত, বৌদ্ধদর্শন চিন্তিত। এবং এই চিন্তার ফলশ্রুতি জ্ঞানানন্দ ও প্রমোদানন্দ—আনন্দের এই প্রকারভেদে। বলাই বাহুল্য, প্রথমটি ধ্রুপদী ও দ্বিতীয়টি লোকায়ত ভাবনার স্বাক্ষর। ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের আলোচনাকালে নাগর-শিল্পের আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। নাগর-শিল্প একান্তই বুদ্ধিনির্ভর। সাময়িক জনপ্রিয়তা এবং সৌখিন বিলাসিতা-ই এই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যেহেতু এই শিল্পধারা বাস্তবানুগ এবং ঐতিহ্যহীন অতএব ধ্রুপদী-শিল্পের এবং ঐতিহ্যহীনতা লোকায়ত-শিল্পের পরিপন্থী। উদাহরণ, মুঘল চিত্রকলা যদিচ হিন্দু চিত্রকলার চেয়ে মার্জিত তথাপি ধ্রুপদী মর্যাদা তার অনায়ত্ত। আমেরিকান আর্টের বুর্জোয়া ভাব এবং রাশিয়ান আর্টের প্রোলে-টারিয়ান ভাব ঐতিহ্যহীনতার অভিযোগে ধ্রুপদী পদবাচ্য নয়। বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্প-দৃষ্টিতে এগুলিকে লোকায়ত ধারাতেও ফেলা যায় না। কেননা, বাস্তবতা এবং ঐতিহ্যানুগতা উভয়-ই লোকায়ত-শিল্পের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। উপর্যুক্ত শিল্প-দুটিতে বাস্তবতা থাকলেও, ঐতিহ্যানুগতা আদৌ নেই। কিন্তু ধ্রুপদী-শিল্পের প্রাথমিক সর্তই হল ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং সার্বজনীন ও সার্বকালীন আবেদন প্রচারের দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকেই এটি সাধারণ্যে স্বতঃগৃহীত। এই লোকপ্রিয়তাকে ধ্রুপদী-শিল্প এবং লোকায়ত-শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এইজন্যই ধ্রুপদী-শিল্পের স্বর্গীয় ভাব এবং কৌলীন্যের দাবীদার না হলেও, নাগর-শিল্পের তুলনায় লোকায়ত-শিল্প ধ্রুপদীর-ই সন্নিহিত। এ সিদ্ধান্ত প্রবলতর হয়ে ওঠে যখন

শুনি ঃ 'ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের মধ্যে প্রভেদ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম।' অথচ বাস্তব বৈপরীত্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কেন না, সমকালীন সঙ্গীতবিদ্‌গণ অবধি লোকসঙ্গীত সম্পর্কে উন্নাসিক, লোকায়ত-শিল্প এখনও সুধীসমাজে অবহেলিত। শুধু ভারতে-ই এ অবস্থা হলে আঞ্চলিকতার ফুৎকারে সমস্যার সমাধান না হক, কথঞ্চিৎ লঘুকরণ অসম্ভব হত না। কিন্তু দূর য়ুরোপ পর্যন্ত যার এতাদৃশ বিস্তৃতি, তার মূল উৎপাটন সহজসাধ্য নয়। অপিচ, শুভার্থীদের নিকট আশঙ্কার কথা। কেন না, ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের ভিতর এই প্রভেদ-প্রচেষ্টা শিল্পের পক্ষে শুভ-সূচনার দ্যোতক নয়, বরং প্রতিবন্ধক।

অধিক অগ্রসর না হয়ে পূর্বকৃত আলোচনাকে বিশদ করা যাক। 'মার্গ' এই শব্দটির দ্বারা কখনও কখনও ধ্রুপদী ভাবনা ব্যক্ত হয় এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। শব্দটি ঋগ্‌বেদ থেকে আহৃত, মৃগ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর প্রাথমিক অর্থ প্রাণীর গন্তব্য পথ। কিন্তু যেহেতু ঋগ্‌বেদের যাবতীয় শব্দই প্রতীকাশ্রয়ী সুতরাং তদর্থে-ই গ্রাহ্য। এখন মার্গ শব্দটির বুৎপত্তি মৃগ্‌ ধাতু থেকে, অর্থ শীকার করা, প্রাথমিক অর্থ মৃগ শীকার করা। অবশ্য, মৃগ শব্দটি যে-কোন প্রাণী অর্থেও ব্যবহার করা চলে। মৃগ শব্দটি সম্পর্কে বলার কথা এই, এটি বেদে বহুলভাবে ব্যবহৃত। ঋগ্‌বেদের সপ্তম মন্ডলে মৃগ শব্দটির উল্লেখ আছে। 'সেখানে বরুণকে হিংস্র মৃগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অষ্টম মন্ডলে উল্লেখ আছে ঃ 'জনৈক ইন্দ্র অন্বেষী ইন্দ্রের পরিবর্তে একটি মৃগ দর্শন করলেন।' দশম মন্ডলে দেখা যাচ্ছে 'ভৃগু বিস্মিত হয়ে অগ্নির দিকে তাকালেন—তারপর যেন হারানিধি মৃগের মত তাকে কোলে টেনে নিলেন।' বলা নিষ্প্রয়োজন উদ্ধৃত অংশগুলিতে মৃগ শব্দটিকে প্রাণীমাত্রে-ই ব্যবহার করা হয়েছে। এইসূত্রে বলা যায় মৃগ শীকার এই অর্থেই মৃগয়া কথাটির ব্যবহার। বৈদিক যুগে মৃগয়া করা সম্মানের ব্যাপার ছিল। মৃগয়ায় যারা বার হতেন—অন্তরে তাঁরা ধারণ করতেন জ্যোতির্ময় দিবাকরের তেজ। কিন্ত কালক্রমে মৃগ্‌ ধাতুজ মার্গ শব্দটি মৃগকুলের মুক্তিপথরূপে এবং তারপর বিশিষ্ট অর্থে মানুষের মুক্তিপথরূপে অর্থান্তরিত হল। মার্গ কথাটি এখনও মোটামুটি এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়।

লোকায়ত শব্দটিকে কখনও কখনও 'দেশী' নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত, লোকায়ত অপেক্ষা 'দেশী' শব্দটি যথোচিত। 'কলাদেশম্‌' 'দেশাচারম্‌' ইত্যাদি প্রয়োগেই এর যাথার্থ প্রতিষ্ঠিত। শব্দটি দিশ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, অর্থনির্দেশ। 'দেশজ্‌ নিবিশ' কথাটি প্রায়শ-ই ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থানে বাস করা। 'দেশাচার' কথাটির অর্থ কোন নির্দিষ্ট স্থানের আচার-আচরণ। উদ্ধৃতি দুটির আলোকে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে 'দেশী' শব্দটি লৌকিক অর্থেই ব্যবহৃত। আর 'লোকায়ত' এই রূপটি-ই যদি রাখি, তাহলেও অর্থের তারতম্য ঘটে না। 'লোক্‌' যার ল্যাটিন রূপ লোকাস্‌, আসলে যে-কোন গ্রহ অর্থেই ব্যবহৃত, কিন্তু এখানে বিশিষ্ট অর্থে 'পার্থিব' একথাই বুঝতে হবে। অতএব 'দেশী বা 'লোকায়ত' যাই বলা যাক না কেন, তার ধ্যান এই পৃথিবীকে ঘিরেই। কিন্তু ধ্রুপদীর ধ্যান স্বর্গীয়। পরবর্তী প্রশ্ন ঃ ধ্রুপদী-শিল্প,—স্বর্গের দুয়ারে যার অভীপ্সিত গতি, তার সঙ্গে লোকায়ত-শিল্প—মর্ত্যের মাটিতে-ই যার বাঞ্ছিত স্থিতি, কোন প্রভেদ আছে কিনা। উত্তরে বলা যায় প্রভেদ আছেই, তবে তা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রাজ্ঞের দিব্যদৃষ্টির মর্মমূলে যে জীবনানুভূতি গ্রাম্যের সরল হৃদয়ে, ভিন্নরূপে হলেও তার-ই সঞ্চারণ। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রভেদ প্রকট, হয়তো বা দুস্তরকল্প, মহৎ শিল্পদৃষ্টিতে তা-ই অস্বীকৃত, হয়তো বা অপসৃত। সুতরাং পূর্বাচার্যগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেও সবিনয়ে একটি কথা বলতে চাই, ধ্রুপদী-শিল্প ও লোকায়ত-

শিল্পের সঙ্গে যাঁরা মৌল প্রভেদ সন্ধানে তৎপর, তাঁরা বিচার-বিভ্রাটের-ই বশবর্তী। আসলে ধ্রুপদী এবং লোকায়ত শিল্প সমীপবর্তী। বস্তুত, ধ্রুপদী-শিল্প ও এক অর্থে লোকায়ত-ই কেন না, লোকসাধারণ্যেই তার স্থিতি এবং বিস্তৃতি। লোকায়ত কথাটির অর্থও তো তা-ই, লোকে আয়ত বা বিস্তৃত।

আভিধানিক অর্থে যাই থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে, বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থায় লোকায়ত-শিল্প অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কাগজে-কলমে সাম্যের বুলি লেখা থাকলেও, বুর্জোয়া ও প্রোলেটারিয়ান শ্রেণীর বিভেদ এখানে স্পষ্ট। তাছাড়া সমাজ-শাসনের দৌরাত্ম্য তো আছেই। যে হয়তো রাস্তার ফেরিওয়ালা হবার যোগ্য, বংশগৌরবে সেই হল ব্রাহ্মণ, কুলচূড়ামণি। কুলিমজুর হবার উপযুক্ত যে, দলীয় শক্তিতে সেই হয়তো রাষ্ট্রের কর্ণধার। প্রদীপ যারা ধরে রইল তারা যেই তিমিরে, সেই তিমিরেই; পরন্তু পুরস্কার পেল তারা তপ্তভৈলের তলানি, আলো পেল অপরজন। এ-ছাড়া শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদ তো আছেই। বহুধাবিভক্ত এই সমাজে তাই 'লোকায়ত' কথাটি হাস্যকর বই আর কি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য হয়তো এমন নিদারুণ হত না। শ্লোগান সত্য হলে, সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব বংশগত নয় গুণগত এবং এ ব্যবস্থা শিল্পের পক্ষে শুভঙ্কর।

এই যেখানে সামাজিক অবস্থা, সেখানে অধ্যাপক চাইল্ডের অনুসরণে বলতে ইচ্ছে করে 'কেতাবী শিক্ষায় আওতায় এবং রাজনৈতিক ভাঁওতায় যে সমাজ বহুধাবিভক্ত সেখানে আর যাই হক লোকায়ত শিল্পের পরিচর্যা সম্ভব নয়।

লজ্জার হলেও স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এবংবিধ সামাজিক অবস্থার মধ্যেও প্রগতি অভিমানী কেউ কেউ আদিবাসী সভ্যতাকে সযত্নে লালন তো দূরে থাক, বরং নস্যাৎ করতে সচেষ্ট। অজুহাত, যান্ত্রিক যুগেও উক্ত ধারার প্রতি অহেতুক মোহ সংস্কারবদ্ধতার-ই লক্ষণ। ভাবতে অবাক লাগে, এরাই আবার 'নব্যরীতি' নামক অদ্ভুত রীতির পোষকতা করে পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহী। এ-কথা আমার বোধের অগম্য, রীতি যখন একান্তই কালসম্পৃক্ত, তখন কালান্তরে তার পরিবর্তন অবধারিত। তথাপি কেন এই প্রগতি-প্রকামীরা পুরাতনী রীতির চর্বিতচর্বণে তৃপ্ত; আর, কেনই বা তাঁরা 'দেশী' এই অপনামে লোকায়ত শিল্পকে নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর। অথচ চিন্তা করলে দেখা যাবে, লোকায়ত-শিল্পের নিকটও আমাদের শিক্ষণীয় কম নেই, এতটা অবহেলা, এতটা অবজ্ঞার হয় তো উপযুক্ত পাত্র-ও লোকায়ত শিল্প নয়। কেন না, প্রকাশভঙ্গির মার্জনা না থাকলেও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন এবং সরল আকর্ষণ এতে কম নেই। লোকায়ত শিল্পের ক্ষেত্রেও যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমন কথাগুলি ধ্রুব। উদাহরণত, রূপ-কথার কাহিনী স্মরণীয়। পরিমিত প্রজ্ঞা এবং বাস্তবের অবিকল অনুকৃতি হয়তো এখানে সর্বত্র রক্ষা পায় নি, কোথাও বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রয়োগ-শিথিলতা প্রকাশ পেতে পারে। তবু যে দুর্লভ সরলতা এগুলিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে তা কেবল খোকাদের-ই নয়, বুড়ো-খোকাদেরও আকর্ষণের বস্তু। গুইনন সাহেবকে স্মরণ করে বলা যায় 'কল্পনার প্রসারতা এবং সহজ সরলতা-মাখা রূপকথা হল অশিক্ষিত গণসাধারণের স্বতোৎসারিত হৃদয়াবেগের ফসল।' বিপক্ষ শিবিরের উক্তিও এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য : 'রূপ-কথা হল দূর অতীতের ব্যাখ্যাহীন প্রাগৈতিহাসিক গাথা'। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এ-কথা বলতে চাই, নিতান্ত নির্গুণ হলে রূপ-কথার এই কালজয়ী আবেদন এল কোথা থেকে? এ-কথা প্রায়শ-ই শোনা যায় উলঙ্গকে আবরণ ও আভরণযুক্ত করাই সাহিত্য এবং লোকায়ত সাহিত্যে নাকি এর নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। কিন্তু অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে, এটি একটি অপসিদ্ধান্ত বই কিছু নয়। আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলতে কুণ্ঠা নেই, পূর্বোক্ত রূপ-কথারও কিছু কিছু কাহিনী আছে যা

সরলতামণ্ডিত হলেও বাস্তবের অবিকল অনুকৃতি নয়, অপিচ আবরণযুক্ত বাস্তবের-ই তির্যক প্রকাশ এগুলিতে বিবৃত। হয়তো বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কাহিনী-ই অবাস্তব এবং জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু ডারউইন-ই আমাদের শিখিয়েছেন, বর্তমান রূপের সঙ্গে অতীতরূপের আসমান-জমিন ফারাকও আশ্চর্যের নয়। কেননা, যুগপ্রয়োজনে অনেক কিছুর-ই পরিবর্তন ঘটে এবং শিল্পেরক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সব লোকায়ত সাহিত্য-ই অতীত ইতিহাসের অবিকৃত বিবৃতি। বরং ভুরিপরিমাণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিপরীত সত্য প্রমাণ করা যায়। বস্তুত, একশ্রেণীর লোকগাথা আছে যেখানে জ্ঞাতসারে-ই সত্যবিকৃতি ঘটানো হয়। সেখানে ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর ইচ্ছার প্রলেপ বুলিয়ে কাহিনী-প্রতিমার রূপায়ন করা হয়। বলা-বাহুল্য, এগুলি সমকালীন সমাজের হাসি-কান্নার দর্পণ, সামাজিক মানুষের আশানিরাশার ইতিবৃত্ত। ভাবতে গর্ব হয়, আমাদের-ই ঠাকুমা-দিদিমা, নিরক্ষর চাষিভূষোরা ছিল এগুলির স্রষ্টা। পণ্ডিতাভিমানীর কেতাবীশিক্ষায় হয়তো বা পৌরাণিক যাথার্থ্য ধরা পড়তে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সৌন্দর্য? নৈব নৈব চ। তার জন্য চাই সহৃদয় সহানুভূতি। একমাত্র সহানুভূতির সানুকুল্যেই লোক-সাহিত্য উপভোগ্য।

উপরি আলোচিত লোকায়ত শিল্প ও সাহিত্যে লোকশ্রুতির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। শুধু লোকায়ত শিল্প-ই বা কেন—ধ্রুপদী-শিল্পেরও আদিস্তর যেখানে বিধৃত সেই ঋগ্বেদও শ্রুতিনির্ভর। এই জন্যেই বেদের অপর নাম শ্রুতি। প্রগতিপন্থিগণ যতই বড়াই করুন, তাঁদের শিল্প-ধারণাও তো সেই শ্রুতি-নির্ভর-ই কেননা, মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের মুখনিঃসৃত বাণী এখনও তো তাঁদের পারের কড়ি। আসলে বোধহয় শ্রুতি-নির্ভরতা শিল্পে দূষণীয়ও নয়। প্রয়োজনে যা, তা হচ্ছে উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্যীকরণ। বলতে বাধা নেই, লোকায়ত-শিল্পে লোকশ্রুতি এ দায়িত্বটি এতাবৎ সার্থকভাবেই পালন করেছে।

অনুবাদ ঃ **বীরেন ভট্টাচার্য**

আনন্দকুমার স্বামী

সাহিত্য সংবাদ

আইনের রক্তচক্ষু কখন কিভাবে অভিশাপ বর্ষণ করবে তা পাপীদের হয়ত জানা থাকে; কিন্তু যে পাপ করেনি অথচ মিথ্যা অপবাদে থাকে জর্জরিত করা হয়েছে আর শাস্তির খড়্গ যার ওপর নিয়তই দোদুল্যমান তখন তার মনের চেহারা হয়ত আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ যন্ত্রণার কথা সে যদি নিজে ব্যক্ত না করে তাহলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে তবে এটুকু অনুমান করতে পারি যে তথাকথিত সামাজিক রীতি-নীতি ও আইনের প্রতি তার ঘৃণার যে সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠবে তার পরিমাপ করা বিশেষ সহজসাধ্য ব্যাপার হয়।

ওহাইয়োর কারাগার থেকে যেদিন উইলিয় সিডনি পোর্টার ছাড়া পেয়ে শেষ দ্বার-রক্ষীটিকে পার হয়ে কারাপ্রাচীরে বাইরে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন সেদিন তাঁর দু'চোখে আনন্দ ও ক্রোধের যে মিশ্রিত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার বর্ণনা হয়ত কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে তিক্ত মনের পরিচয় আমরা তাঁর ছয়শতাধিক গল্পের মধ্যে পাই তার সারমর্ম কি যদিও বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না, কিন্তু আমেরিকার সেই ভাঙাচোরা সমাজের যে চেহারা তাঁর প্রতিটি গল্পে একদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল আজ তা তৎকালীন সমাজের অন্যতম দলিলচিত্র হিসাবে পরিগণিত।

সেই সময়ে নিউইয়র্ক শহরের অলিগলিতে অথবা টেক্সাসের বিস্তীর্ণ গোচারণভূমির পটভূমিকায় কিম্বা মধ্য আমেরিকায় যারা জীবনযাপন করত তাদের আকাংখা ও আশাভঙ্গের যে মরমী এবং সার্থক চিত্র সিডনি পোর্টার এঁকেছেন তার উৎসসূত্র অনুসন্ধান করতে হলে পোর্টারের ব্যক্তিগত ইতিহাস সর্বাগ্রে অনুসরণ করতে হবে কারণ গল্পের মধ্যে তিনি যা বলেছেন তার সুষ্ঠু আহরণ ঘটেছে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে নর্থক্যারোলিনা রাজ্যের গ্রীণসবরো গ্রামে উইলিয়ম সিডনি পোর্টার জন্মলাভ করেন। বাল্যকালে গ্রামের স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেন কিন্তু পাঠশেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। তারপর সিডনি পোর্টারকে এক ডাক্তারখানায় চাকরি করতে দেখা যায় কিন্তু বেশীদিন সেখানে টিকতে পারেননি কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্যের উদ্ধারকল্পে তিনি যখন টেক্সাসের মুক্ত প্রান্তরের হাতছানিতে সাড়া দিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। এক মেষচারণ-ভূমিতে তিনি চাকরী গ্রহণ করেন কিন্তু সেখানেও বিপদ ঘটল। টেক্সাসে তখন কাউবয়রা মারাত্মক বিদ্রূপ করত, সিডনি পোর্টার সেই বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমের গোচরণ-ভূমিতে কাউবয়ের কাজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আপ্রাণ চেষ্টায় সিডনি যখন পাক্কা কাউবয়ের খেতাব অর্জন করতে সক্ষম হলেন তখন দক্ষিণের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া তাঁকে পরিমিত স্বাস্থ্যের অধিকারী এক শান্ত, স্বল্পবাক যুবকে পরিণত করেছে। দলের অন্যান্য কাউবয়রা তাঁর সঙ্গে বড় একটা ঠাট্টা-তামাসা করবার সাহস পেত না কারণ তারা ভালভাবেই জানত সিডনি পোর্টার অর্থোপার্জনের জন্য কাউবয়ের কাজ করছে বটে কিন্তু তাঁর মনোবৃত্তি ঠিক কাউবয়ের মত নয়, কাউবয়দের কোনরকম উদ্দামতা তাঁর কাছে কোন দিন প্রশ্রয় যে পাবে না একথা তারা ভালভাবেই জানত তা'ছাড়া পোর্টারকে তাদের সমীহ করে চলতে হত কারণ তাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কাউবয় যে লেখাপড়া করে অবসর সময় কাটাত।

সিডনি পোর্টার সর্বসমেত পনের বৎসর টেক্সাসে অতিবাহিত করেন। টেক্সাসে বসবাসকালে তাঁর জীবনে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ হয় তা তাঁর মনের কাঠামোটিতে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তাঁকে এক নূতন মানুষে পরিণত করে। টেক্সাসের অন্যতম শহর অস্টিনে কিছুদিন জেনারেল ল্যাণ্ড অফিসে কাজ করার পর তিনি স্থানীয় এক ব্যাঙ্কের কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেছিলেন, একমাত্র কন্যাসন্তান তাঁদের অনটনের সংসারে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিত। কিন্তু সিডনি পোর্টরের ভাগ্যাকাশে তখন ধীরে ধীরে কালো মেঘের ছায়া পড়তে সুরু করেছে। ব্যাঙ্কে তিনি অর্থ লেন-দেনের কাজ করতেন, তাঁর কাজে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু একদিনের দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের মসৃণ পথ বক্র হয়ে তাঁকে এমন এক ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে ফেলে যার আপাত পরিণতি হল কারাবরণ। নিত্য যেমন অর্থ লেন-দেন হয় তেমনই সেদিন হয়েছিল কিন্তু দিনের শেষে যখন দেখা গেল প্রায় হাজার ডলারের মত অর্থের কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না তখন সিডনি পোর্টারের অবস্থা অবর্ণনীয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর বিশেষ আস্থা রাখতেন বলেই তাঁরা তাঁকে আদালতের প্রাঙ্গণে হাজির করেননি কিন্তু ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। অস্টিন শহর ত্যাগ করে কলোরাডো আর ব্রাজোস্ নদী পার হয়ে তিনি হুস্টন শহরে এক সংবাদ 'পত্রের' কার্যালয়ে শিক্ষানবিশী সুরু করেন। প্রায় এক বৎসরকাল হুস্টনে অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সিডনি আবিষ্কার করলেন যে ব্যাঙ্কের মালিকরা তাঁকে রেহাই দিলেও সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা দায়ের করে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য তোড়জোড় করছে। তখন যঃ পলায়তি স জীবতি পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তাঁর আর কোনও গত্যন্তর ছিল না। অস্টিনে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে মধ্য-আমেরিকার পথে সিডনি পোর্টার যখন পাড়ি দিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে পলায়ন করে নিয়তিকে এড়ান যায় না।

মধ্য আমেরিকার হাণ্ডুরাস রাজ্যের অন্যতম শহর ট্রুইল্লো সিডনি পোর্টারকে স্থান দিলেও তাঁর মন পড়ে থাকত অস্টিনের সেই গৃহকোণে যেখানে তাঁর স্ত্রী-কন্যা পরমুখাপেক্ষী হয়ে কাল-যাপন করছে। ট্রুইল্লোর অধিবাসীরা যখন সেই নিঃসঙ্গ, স্বল্পবাক মানুষটিকে অবসর সময়ে ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে প্রবালের উপর চিন্তান্বিত হয়ে বসে থাকতে দেখত তখন তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পেরেছিল যে কি অপরিসীম ঘৃণা মানুষটির মনকে ধীরে ধীরে এক তীক্ষ্ণ তলোয়ারে পরিণত করছে যা অচিরেই সমাজের নগ্নতার মুখোস খুলে ফেলে নিপীড়িত মানুষের চেতনায় যে আঘাত করবে তার সুদূরপ্রসারী ফল হবে সামাজিক সংস্কার আর সিডনির ক্ষুরধার লেখনী সৃষ্টি করবে এই শতাব্দীর অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি! না, ট্রুইল্লোর অধিবাসীরা তা জানত না, পৃথিবীর কেউই তখন জানত না যে সমাজের পেষণে এক নূতন মানুষ জন্ম নিচ্ছে যাঁর সাহিত্য পাঠ করে উত্তরকালের পাঠককুল অপার আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎ লাভ করে সিডনি পোর্টারকে জীবনবেদের অন্যতম পূজারীরূপে চিহ্নিত করবে।

ট্রুইল্লোর দিনগুলো সিডনি পোর্টারের পক্ষে ঠিক হতাশার দিন নয় কারণ যে অভিজ্ঞতা সেখানে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তার সক্ষম প্রকাশ তাঁর বহু গল্পে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। অস্টিনে তাঁকে আবার ফিরতে হয়েছিল কারণ তাঁর স্ত্রী তখন মৃত্যুশয্যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সরকার পক্ষ তাঁকে তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত করে, বিচারের (?) শাস্তিস্বরূপ তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। উইলিয়ম সিডনি পোর্টারের সারা জীবনের কলঙ্ক এই কারাবাস, যার লজ্জাকর স্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছেন। তাঁর জীবনের কথা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পাদক বন্ধুর স্মৃতিকথায় হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু সেই লজ্জাকর ঘৃণিত জীবন তাঁর চিন্তাধারার পথ বদলে দেয় আর সেই জন্যই নীচতলার মানুষদের

প্রতি তাঁর এত দরদ ও মমতা যার প্রতিফলন আমরা তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রকাশিত হতে দেখি।

ওহাইয়োর কারাগারে তিন বৎসরাধিককাল কারাবাসের পর তিনি যখন ছাড়পত্র পেয়ে নিউইয়র্কে এলেন তখন তিনি আর উইলিয়ম সিডনি পোর্টার নন, তখন তাঁর নাম ও· হেনরী পেশা সাহিত্যসেবা. জনসাধারণ জানে ও· হেনরী উদীয়মান গল্পকার। তাঁর জীবনেতিহাসের সামনের কয়েকটি গ্লানিময় পৃষ্ঠা তিনি নিশ্চিহ্ন করার মানসে ও· হেনরী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। ছদ্মনামটি ওরিন হেনরী নামে কারাগারের এক জমাদারের কাছ থেকে ধার করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখতেন তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে সেই গ্লানিময় জীবনের উল্লেখ তাঁরা যেন আর না করেন।'

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ "ক্যাবেজেস এন্ড কিংস" প্রকাশিত হয়ে প্রশংসাও লাভ করেছে কিন্তু অর্থের অভাবে তখন তাঁর প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা কারণ ছোট গল্পের জন্য কোন সম্পাদক বেশী পয়সা দিতেন না। আরভিং প্লেসের যে বাড়ীতে ও· হেনরী বাস করতেন তার দীর্ঘ জানলার পাশে বসে তিনি রাস্তার চলমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে থাকতেন আর তাঁর গল্পের এক একটি চরিত্রকে খুঁজে বার করতেন। গল্পের কাঠামোর জন্য তাঁকে বিশেষ চিন্তা করতে হত না কারণ জীবনে যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তারই টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়েই তাঁর গল্প। যে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও শ্লেষ তাঁর রচনায় আমরা পাই তার উৎসসূত্র হল তাঁর জীবনযন্ত্রণা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা।

এই শতাব্দীর সুরু থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনীচালনা করেছেন, তার পিছনে ছিল পাওনাদারের তাড়না আর সম্পাদকদের তাগিদ। তাঁর দ্বিতীয় গল্প-গ্রন্থ "দি ফোর মিলিয়ন" ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর গল্পকার হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত "দি গিফট্ অব ম্যাগি" সম্ভবতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর সৃষ্টির গুণাগুণ সম্পর্কে আজকের বিদগ্ধ সমাজ প্রশংসা করে বহু কথাই বলেছেন, কিন্তু ও· হেনরীর সময়ের সমাজের যে ভয়াবহ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার বিচার করলে তাঁর অকালমৃত্যু হয়ত আমাদের আশ্চর্য করবে না, কিন্তু সেই সমাজের হতভাগ্য চালকরা যে একজন সার্থক কথাশিল্পীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং কোনকালেই সাহিত্য-পাঠক তাদের ক্ষমা করবে না যখন তারা জানবে যে মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে ও· হেনরীর লেখনী চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯১০ সালের ৫ই জুন তারিখে হৃদরোগের আক্রমণে ও· হেনরীর অকালমৃত্যু ঘটে। সমালোচকরা এখন ও· হেনরীকে আমেরিকার মোপাসাঁ বলে থাকেন হয়ত এ কথার মধ্যে অত্যুক্তি আছে কিন্তু এ কথা সত্য যে তাঁর গল্প পৃথিবীর প্রায় সবকটি মুখ্যভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে ও· হেনরীর বহু পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তা রূপায়িত করবার সময় তিনি পাননি তবুও বিশ্বসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসাবে চিরদিনের জন্য পাঠকসমাজ তাঁর নাম স্মরণ করবে।

ও· হেনরীর জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে হয়েছে. তিনি বাল্যকালে যে ডাক্তারখানায় কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিলেন সেখানে প্রতি বৎসর তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হয় আশা করি জন্ম-শত-বৎসরেও সেখানে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানসহযোগে ও· হেনরীর জন্মদিবস পালিত হয়েছে।

অজিত দাস

দুর্গাপুজার অর্থনীতি

বাঙলা দেশের দুর্গাপুজো একাধারে পুজো ও উৎসব। আমাদের জীবনের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো।

নতুন বছরটি পড়তে না পড়তেই, সবাই চেয়ে থাকে সেদিকে, দিন গোণে কবে পুজো আসবে। নতুন জামা-কাপড় পাওয়ার, পুজো-মণ্ডপে সেজেগুজে আনন্দ করে বেড়াবার যে শিশু-মনোভাব, দুর্গাপুজোর পথ চাওয়ার আগ্রহ শুধু সেখানেই সীমিত নয়। দোকানদার, মিস্ত্রি-মজুর, বামুন-মুচি, খলিফা-তাঁতি, লেখক-প্রকাশক, গায়ক-যাত্রাওয়ালা—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি মানুষের অধীর প্রত্যাশা ওই একটি উৎসব সম্পর্কে, অনেকখানি আশা নিয়েই তারা প্রতীক্ষা করে।

করে, কারণ আধুনিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঙলার দুর্গোৎসবে প্রভূত রূপান্তর ঘটে থাকলেও, তার প্রধান সম্পর্ক যে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে, সে সম্পর্ক শিথিল হয়নি। বরং আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে, দুর্গাপুজোর সঙ্গে সে সম্পর্কের বাঁধনও ততই জটিল হচ্ছে। যদি বলি বাঙলার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যমূর্তি দেবী দুর্গা, তাহলে বোধ হয় তা অতিশয়োক্তি হবে না।

আমাদের ছাত্রজীবনে পড়েছি, ইয়োরোপীয় অর্থনীতিবিদেরা বাঙালীর দুর্গাপুজোর অপচয় দেখে কৃপাপূর্বক অনেক উপদেশ বর্ষণ করেছে। আজ আমাদের বহু বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মনন রপ্ত করে ইংরেজদের চেয়েও বেশি ইংরেজ হয়ে পড়েছেন। তাদের মুখেও দুর্গাপুজোর অজস্র অপচয়ে বাঙালী চরিত্রের অসংশোধ্য গতানুগতিকতার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হতে শুনি। কিন্তু বিচার করে দেখলে স্বীকার করতেই হবে যে. দুর্গাপুজো বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে সর্বসাধারণের প্রধান নির্ভর।

সেকালে পুজো হত বাবুদের বাড়ি। গ্রামজীবনে সেখানাই বড় পুজো। তাছাড়াও দু'চারখানা ছিল না তা নয়। কলকাতাতেও প্রধান পুজো ছিল শোভাবাজার রাজবাড়িতে, পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়িতে, ছাতুবাবুর বাড়িতে, বারাণসী ঘোষের বাড়িতে এমন অজস্র অভিজাত ধনীর গৃহে। এই সব পরিবারের অজস্র পোষ্য ছিল। তাঁতি, কুমোর, মালাকার, কামার, পুরোহিত, মালী, হালুইকর, বাজনদার, মজুর নাপিত। বার মাস এরা এক একটি বিশেষ পরিবারের কাজ করে দিন গুজরান করতো, করতো পরিবার প্রতিপালন। কিন্তু পুজো উপলক্ষে তারা মনিবকে অতিরিক্ত সেবা করার যে সুযোগ পেত, তারই পুরস্কার ছিল প্রচুর বাড়তি উপার্জন। পুরোহিত ঠাকুরপুজো করে বার মাসের ধুতি, শাড়ী, গামছা, এমনকি বাসনকোসন, আসন-পিঁড়ি, পর্যন্ত অর্জন করতেন। অন্য সবার বেলায়ও অল্পবিস্তর ওই একই ব্যবস্থা ছিল।

পুজো উপলক্ষে যাদের করণীয় কিছুই ছিল না, বাবুর বদান্যতা লাভ করতো দুর্গাপুজোর সুবাদে। অনুগৃহীত সবাই পুজোর কাপড় ও জলপানি পেত, তার আর্থিক মূল্য অবহেলার ছিল না।

তা'ছাড়া সাধারণ গৃহস্থবাড়ির দু'চারখানা পুজোতেও কিছু লোক কিছু কাজ পেত, কাজ ছাড়াও পেত উপহারও পুরস্কার।

আজ বাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও। কিন্তু আজকালকার

সার্বজনীন পুজোতে বহুজনের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে অনেক মানুষের ভরণপোষণ হয়ে থাকে। দুর্গাপুজোয় বাঙলাদেশে সবারই মরশুম।

বড়লোকেদের বাড়ির মার্বেল ষ্ট্যাচু বানিয়ে যারা বড়লোক হতে পারে, এমন ভাস্কর বাঙলাদেশে এ যুগের জিনিষ। কাদামাটির মূর্তি গড়ে যারা একটি বিশিষ্ট শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, খোলার বস্তিতে বাস করে কেরাসিনের কুপি জ্বালিয়ে কাজ করে তারা। কিন্তু অন্তরের সুন্দরকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ করে কাদামাটির মধ্যে তাকে রূপায়িত করে। দুর্গাপুজোয় তাদের বছরের বার আনা উপার্জন। এত বড় কাঠামোয় এতগুলি মূর্তির সমাবেশ করে, যে নাটকীয় সৃষ্টি, তাতে মনের শিল্পবোধের পূর্ণ প্রকাশের সঙ্গে পরিশ্রমের মজুরিও মেলে মনের মত। যারা কাঠামোর কাঠ কাটে, যারা কাঠামো বাঁধে, কাদা ছানে, তাদের সবার কাজ জোটে এই সময়, মৃৎশিল্পীর তো অবকাশই নেই। নেহাৎ চাক নিয়ে কাজ করা কুমোর যারা, তাদেরও এই মহোৎসবে সরা-খুরি-হাঁড়ি-ঘট-গেলাস-কলসী সরবরাহ করতে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করতে হয়। মালাকর প্রতিমার সাজ-পোষাক, শোলার ফুল, শনের চুল তৈরি করে হাঁফ ছাড়বার সময় পায় না, যেমন পায় না প্রতিমার হাতের অস্ত্র তৈরি করে তামা-পেতলের কাজ করিয়ে কাঁসারিরা। ভাগ্যিস কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মত নিয়ে এক এক পাড়ার লোক মিলেমিশে একখানা মাত্র দুর্গাপুজো করে না। তা'হলে সারা কলকাতায় দশবারখানা প্রতিমা আর তার সাজ-পোষাক ও হাতের অস্ত্র গড়ে ক'ঘর কর্মীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হত।

পুরোহিত সম্প্রদায় এমনিতেই উঠে যাচ্ছে। গৃহস্থের বাড়িতে নিত্যসেবাই ছিল তাদের জীবিকা। দশকর্ম ও ব্রত-পার্বণাদিও প্রায় বাতিল হয়েছে। তাই পৌরোহিত্য করে বার মাস চলে না কারো এবং চলে না বলেই ওই সম্প্রদায়ও লোপের মুখে। দরকার হলেও পাবেন না। অর্থনীতির দোহাই দিয়ে আমরা দশবিধসংস্কার এবং ব্রত-পার্বণ বর্জন করেছি। মজা এই যে তবু পুরোহিতের প্রয়োজন একেবারে খতম করে দিতে পারিনি। কোন না কোন সময়ে তাদের চাই-ই এবং চাওয়া মাত্রই না পেলে আমরা ক্ষেপে যাই। দুর্গাপুজোর সংখ্যা কমিয়ে আনলে তাদের বৃত্তি একেবারেই উঠে যাবে। পাঁচখানা দুর্গাপুজোয় বড়জোর তিন-পাঁচে পনেরজন পুরোহিত কাজ পাবে। বাকী সবাই তখন ডাইং ক্লিনিং বা জুতোর দোকান কিংবা কাটা কুমড়োর দোকান দিলে সম্প্রদায় বিলুপ্তির বাকি রইল কি? যাঁরা পুরোহিত সম্প্রদায়কে পুঁজিবাদী শোষণের একপ্রধান সহায় ছাড়া আর কোন মূল্য দিতে নারাজ, তাঁরা হয়তো এই বিলুপ্তিতে খুশিই হবেন. কিন্তু গোল বাঁধবে যখন বাপ মরলে তিলদান ও তিলকাঞ্চন না করিয়ে পারবেন না, এবং তাতে সংস্কৃত মন্ত্র পড়াবার জন্য জাতপুরুতের দরকার হবে।

কলকাতার তিন হপ্তার মেরাপ-সংস্কৃতিতে ঢাকীদের খুব কদর। কিন্তু যে কোন একটা পুজোর সময় বৌবাজার-কলেজ ষ্টীটের মোড়ে ডাক-প্রার্থী ঢাকিরা যে পরিমাণ লাইন দিয়ে বসে প্রতীক্ষা করে, তা দেখে ওই শিল্পীসমাজের প্রতি করুণা হয়। ভাসান উপলক্ষে ব্যাণ্ডপার্টি ও তাস পার্টির যতই ডাক হোক না কেন, পুজোর ক'দিন ঢাকি নইলে পুজোই জমে না। দুর্গাপুজোয় যদি ওরা মুঠোভরে না কামালো, তা'হলে কি শনি, সত্যনারায়ণ পুজোয় ওদের জীবিকা চলবে? পুজোর সংখ্যা বেশি না হলে ঢাকিরা কাজ পাবে কি করে? তখন কি আর তাদের বাজনা শোনা যাবে খালে আর বিলে?

মায়ের নামে জীববলির নিষ্ঠুরতা আমাদের ইয়োরোপীয় ধারণাপুষ্ট রুচিতে সহ্য হয় না বলে দুর্গাপুজোয় আজকাল কুমড়ো বলিও বাতিল। তাতে অবশ্য চালকুমড়ো বাজারে মন্দা হবার ভয় নেই। কারণ নিত্য খাদ্যাভাব ও খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্যতার বাজারে চালকুমড়োর বাজার এমনিতেই

গরম থাকে। বলি বন্ধ হয়েছে বলে পাঁঠার বাজারে মন্দা হয়েছে, এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। যে যুগে পাঁঠাবলি ছিল, বৃথামাংস খাওয়া ছিল নিষেধ, সে যুগে বার মাস যা পাঁঠা কাটা হত, তার চেয়ে অনেক গুণ পাঁঠা আজকাল কশাইখানায় নিত্য কাটা হয়। পূজোর ক'দিন তারো দশগুণ। কারণ মহাষ্টমী কি নবমীর দিন মাংস খাওয়ার সংস্কার আমরা কাটিয়ে উঠ্তে পারিনি। তাই পূজা উপলক্ষে জীব বলিকে ধিক্কার দিয়ে কশাই-এর দোকানে লাইন দি, সেই মায়ের নামে। দুর্গাপূজায় বলি বন্ধ, কিন্তু দুর্গোৎসব উপলক্ষে ভোজনোৎসব জমে না মাংস ছাড়া। বলি বন্ধের ফলে যে কামার সমাজের রুজি মারা গেছে, তারা এখন কি করে জানি না। হয়তো কশাইখানায় কাজ করে কেউ কেউ, কেউ বা লেখাপড়া শিখে ডাক্তার-মাষ্টার-উকীল-অফিসার হয়েছে, আর পুরাণো অভ্যাসের সামান্য রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের কেউ কেউ যে খুনে হয়নি এমন কথাই বা কে বলবে!

দুর্গোৎসবের বিরাট যজ্ঞের সুফল বণ্টনে কেউ বাদ পড়ে না : আলুওয়ালা, বেগুনওয়ালা, মাছওয়ালা, মেঠাইওয়ালা, মেওয়াওয়ালা, ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, শাকওয়ালা, পাতাওয়ালা, পানওয়ালা সবার পকেটেই কিছু না কিছু আশীর্বাদ বর্ষিত হয় মায়ের।

ঠাকুর আনা ও বিসর্জন দেওয়ার জন্য বাহকের যুগ আজ নেই, কিন্তু এই উপলক্ষে লরী-ওয়ালারা চুটিয়ে ব্যবসা করে।

এ সব তো গেল প্রত্যক্ষ সংযোগসম্পন্ন উপার্জনের কথা। পূজোয় নতুন জামা-কাপড়ে জুতো ব্যবহার আছে বলেই তাঁতি, দর্জি, মুচিদের জীবিকা চলে। অর্থকৃচ্ছ্র সাধারণ জীবনে জামা, কাপড়, জুতো প্রভৃতি কেনা তো মিনিমামের সাধনা। দুর্গাপূজার কেনাটা এখনো সামাজিক দৃষ্টিতে অনিবার্য বিবেচিত হয় বলেই মিলগুলি কর্মীদের বোনাস দিতে পারে, না দিলেও দাবী করতে পারলে লাভ হয় সেখানে। ছোট-বড় অজস্র দোকান, অজস্র ফুটপাথ ষ্টল, বার মাসের রোজগারের অর্ধেক করে তারা পূজোর বাজারে।

কলকাতা শহরে কোন দোকানঘর খালি হলেই, অথবা বড় রাস্তার ধারে কোন পড়তি বড়লোক তার বাড়ির বাইরের দিকে দরজা ফুটিয়ে ঘর ভাড়া দিলে, শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে যে জিনিষের দোকান বসে আজকাল, সেটি সোনার গয়না, আধুনিক নাম জুয়েলারি। বিয়েতে গয়না আজকাল আর অপরিহার্য নয়। বিয়ে দেওয়া তো ক্রমেই কমে আসছে, তার গয়না দেবে কে? বিয়ে তো এখন করা হয় এবং তারপর শুরু হয় গয়না করানো। করাতে হলেও তো উপলক্ষ্য লাগে এবং উপলক্ষেব সেরা হল দুর্গোৎসব। পূজোর শাড়ীর মতই আজকাল পূজোর গয়না। বোনাসের টাকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। ফ্যাশান দেখানোর প্রয়োজনে অনেক টাকা মজুরিতে খেয়ে গেলেও, সঞ্চয়ের দিকটা অবহেলার নয়। নইলে কত পথ আছে, বোনাসের টাকা ফুটকড়াই হয়ে যেতে ছিদ্রের অভাব হত না।

পূজার উপহারে বই-এর বাজার গরম। কত সাহিত্য কুটির কত নতুন নতুন সংকলন ও সঞ্চয়ন প্রকাশ করে থাকে। পূজো সংখ্যা পত্র-পত্রিকার বাহুল্যে শিল্পী, বাঁধাইওয়ালা, হকার, বিজ্ঞাপনের এজেন্ট প্রভৃতির সঙ্গে সাহিত্যিকও পূজোর শারদী রৌদ্রে বার মাসের ধান শুকিয়ে রাখে। পূজোর দুমাস আগে কোন বাজার চলতি লেখকের আপনার সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা, টেলিফোন ধরার সময় নেই। সময় যদি বা থাকে, ধ্যানভঙ্গের অবকাশ কোথায়? সাধনা বিঘ্নিত হলে সাহিত্যিক সিদ্ধ হবে কি করে! প্রতিবারই পূজোয় কত নতুন পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব ঘটে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যায় প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা, কিন্তু প্রাপকের যার যতটুকু লেখা আছে, তাতে বাধা হয় না। ছাপাখানা, বাঁধাইখানায় যান, যান

কোন শিল্পীর বাড়ি, সর্বত্রই শুনবেন, পুজোর মুখে এমন সময় কোথায়!

প্রসাধন ফিতে কাঁটা থেকে শুরু করে, রেডিও, গ্রামোফোন, নতুন রেকর্ড—পুজোয় সবকিছুর চাহিদা গরম। সিনেমা থিয়েটারে পুজোবাজারে বাছবিচার নেই, নিত্য হাউজ ফুল। বাঙলা দেশের পুজাভ্রমণবিলাসীরাই রেলওয়ে ও ইণ্টারনাল ট্যুরিস্ট ইনকামের অর্ধেক সরবরাহ করে। আর ট্যুরিজম্-এর আনুষঙ্গিক ব্যবসাগুলি অর্থাৎ স্যুটকেশ, হোল্ডল, সতরঞ্চী, বালতি, থালা, মগ, ইঁদারার দড়ি থেকে শুরু করে আমাশার বড়ি সবই কিনতে হয় বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনে।

যত লোক বাইরে যায় তার অনেক গুণ লোক শহরে থাকতে বাধ্য হয়। তাদের ভিড়ে প্রতিটি পুজামণ্ডপ জমজমাট। সেখানে প্যাণ্ডালওয়ালা, ডেকরেটার, বিজলীওয়ালা, পানওয়ালা, ডালমুটওয়ালা চা-ওয়ালা সবাই সারা বছরের কামাই গুছিয়ে নিচ্ছে।

কারো কারো মতে এ সবই অপচয়, না করলেই নাকি বাঙালী অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। কিন্তু অর্থনীতির সোজা হিসেবে একজনের যা ব্যয়, অপরের তা উপার্জন। কাজেই অপব্যয় বন্ধের বুদ্ধিমানী উপদেশ মেনে সবাই যদি পুজা বোনাস ব্যাঙ্কে জমাতো, যাদের রুপিয়ার জোর আছে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়ার, তাদের বাড়িতে দোতলার জায়গায় তিনতলা উঠতো শুধু, হিন্দুস্থান টেন-এর সঙ্গে যোগ হত স্টুডিবেকার প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু ব্যাঙ্ক-এর খাতায় সব টাকা পড়ে না বলেই, অজস্র সাধারণ দোকানদার ও তাঁতি, দর্জি, স্যাকরা দুটো পয়সার মুখ দেখে পুজোয়, লেখক তার বাড়ি, গাড়ির স্বপ্ন সার্থক করতে উঠেপড়ে লাগতে পারে—এক পুজোয় চল্লিশটা লেখা লিখে, অবশ্য যদি না কোন পত্রিকা মোটা টাকা দেওয়ার আগে সর্ত করে নেয়, আর কোথাও লেখা চলবে না।

না চলুক। অর্থনীতির চাকা হুহু করে ঘুরে চলে আমাদের দুর্গাপুজোয়। ক্যামাক ষ্ট্রীটওয়ালা অ্যাংলিসাইড বড়লোকদের তো বারমাসই উৎসব। হিন্দুস্থান পার্ক-এর বাসিন্দারা যতই তাদের নকল করতে চায় করুক, দুর্গাপুজোয় কেনাকাটার বাঙালী বোকামি যে তারা পেরিয়ে উঠতে পারেনি, এতেই বাঙলার অর্থনীতি পুষ্টি লাভই করছে।

যে যুগে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, সবার সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করলে তবেই শুভ উৎসব সার্থক। সে যুগ বদলে গেছে একেবারে। কিন্তু এ যুগেও যে মানুষ দুর্গাপুজার পরম শুভ উৎসবে বিনিময়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, বোনাস যারা পায় না, তারা যে অন্তত ধার করেও উৎসব সার্থক করে যথাসাধ্য কেনাকাটা করে—তাতেই জাতীয় উপার্জনের সার্থক বাঁটোয়ারা হয়, দুর্গাপুজা সংস্কারকদের এইটুকু স্মরণ রাখতে বলি।

রাখাল ভট্টাচার্য

সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধ

আমাদের ভূতপূর্ব অধীশ্বররা বিশ্বজনের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচার করে গেছেন যে, আমরা সৌজন্য বা ভদ্রতার ধার ধারি না। কারণ আমরা তাঁদের মত কথায় কথায়, 'সরি', 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন্' বা 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলি না। বলি না এ-কথাটা ঠিক, বোধহয় তাই নব্যভব্যদের মধ্যে ঐ কথা তিনটির প্রচলন রীতিমত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমরা কতটা সৌজন্যবান বা ভদ্র হয়েছি সে-কথা বিচার করার আগে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে ঐ দুটো

গুণ বর্তমান ছিল কিনা এ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

ইংরাজরা কথায় কথায় 'থ্যাংক ইউ,' 'সরি' বা 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন্' বলে বলেই তাদের সৌজন্যবোধ আমাদের চেয়ে বেশী ছিল এমন কথা জোর করে বলা চলে কি? ওরা যেমন উপরোক্ত কথাগুলি ব্যবহার করে তেমনি আবার তুই, তুমি আর আপনির বদলে একমাত্র 'ইউ' শব্দটিই ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ গুরুজন থেকে পরম স্নেহভাজন পর্যন্ত সকলকার মাথাই একই শব্দের ক্ষুরে মোড়ানোর ব্যবস্থা আছে। পুরাণো ইংরাজীতে আপনি স্থলে 'দাউ', 'দি' প্রভৃতি শব্দের চলন ছিল, বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায়। সে তুলনায় আমাদের মধ্যে বিদ্বজ্জন, শ্রেষ্ঠ ও গুরুজনদের আপনি; অপরিচিত, স্বল্প-পরিচিত, আত্মীয়-বন্ধুদের তুমি আর পরম স্নেহভাজন তথা নিম্নবর্গীয়দের তুই বলাই রীতি। এতে একমাত্র নিম্নবর্গীয়দের আহ্বান ছাড়া অন্যান্যদের আহ্বানে সৌজন্যহীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং বিপরীত ভাবেরই উদয় হয়। তবে 'সরি' বা 'থ্যাংক ইউ'-এর সমার্থসূচক 'মাফ করবেন' বা 'ধন্যবাদ' শব্দের ব্যবহার ছিল না বললেই হয়। তাই বলে আমরা সৌজন্যহীন এমন কথা বলা যায় কি করে? ধন্যবাদার্হ হলে গুরুজন-স্থানীয়ের কনিষ্ঠকে আশীর্বাদ আর কনিষ্ঠের গুরুজনকে প্রণামবিধি ছিল। সমবয়সী বা বন্ধু-বান্ধবের তেমন ক্ষেত্রে প্রীতিসম্ভাষণের প্রচলন ছিল। যেহেতু কোন বিশেষ শব্দকে সৌজন্যবোধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় নি, তাই বলেই কি অসৌজন্যের দায়ে দায়ী করা চলে আমাদের। ইদানীং-কালে অবশ্য দেশী-বিদেশী দোটানায় পড়ে প্রাচীন সৌজন্যবোধ ক্ষীয়মান, ফলে প্রাচীন সুষ্ঠুপ্রথা লুপ্তপ্রায় আর বিদেশী অনুকরণে সৌজন্যবোধক শব্দের ব্যবহার সমাজের সর্বস্তরে একইভাবে প্রচলিত হয় নি। তাই কোন কোন সময়ে আমরা অসৌজন্যসূচক ব্যবহার করে বসি। তাছাড়াও আজকের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এই ভাঙনধারা সমাজে পুরাণো মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন মূল্যবোধ গজিয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে অর্থাৎ এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক অসৌজন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। তারপর যখন সামাজিক স্থিতাবস্থার পুনরাবির্ভাব হয় তখন মানসিক অস্থিরতার অবসানের প্রমাণস্বরূপ সৌজন্যবোধও পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়।

সৌজন্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভদ্রতাবোধ। ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহার, চালচলন সবকিছুতেই একটা ভদ্র তথা ভব্যভাব সুপ্রকাশিত হয়ে থাকে। 'এককালের বাবু কালচার' বলে যাকে ব্যঙ্গ করা হয়, তারও গোড়ার কথা ছিল ঐ ভব্যভাব। অবশ্য সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আর তারই সঙ্গে তাল রেখে সমাজের নব-গঠনে অনুসরণকামীদের ভুলে হয়ত সমস্ত জিনিসটা একটা হাস্যকর পরিহাস-উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠলেও তার মূলগত লক্ষ্যের নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয় না।

চাণক্য পণ্ডিতের সেই বিখ্যাত শ্লোক 'সত্যম্ ব্রূয়াৎ, প্রিয়ম ব্রূয়াৎ মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' ভদ্রলোকের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলা চলে। কোন লোক হয়ত পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলেছে ভদ্রলোকের ভাষ্যে তা দাঁড়াল, 'অনৃতভাষণ-দোষে-দুষ্ট'। কোন ঘোর মাতালকে বলা হত, 'জলমার্গে গমনে অভ্যস্ত'। চরিত্রহীন মানুষকে বলা হত, 'বারদোষ' আছে। কোন বিশেষ একটি অঞ্চলে রক্ষিতাকে 'জলপাত্র' বলা হত এ-কথাও আমরা শুনেছি।

এহেন ভদ্রতাবোধের অধিকারীরা সৌজন্যবোধহীন ছিলেন, এমন কথা বলা কি সম্ভব? অথচ আমরা আজ 'ধন্যবাদ' বা 'মাপ করবেন' বলতে শিখে আমাদের অগ্রবর্তীদের বেমালুম অসভ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন সৌজন্যহীন মানুষ বলতে সুরু করেছি। অথচ মজাএই যে, আজকের দিনের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহারের বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকের আমাদের

হার মানতে হবে। কারণটা অবশ্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আজকের আমরা অনেক বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পূজারী, তুলনায় পূর্ববর্তীরা সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ছিলেন। ধূমপানের কথাই ধরা যাক না কেন। সামাজিক সভায় হুঁকো-পাওয়া সামাজিক স্বীকৃতিরই নামান্তর ছিল। হুঁকো বন্ধ হওয়া একঘরেরই সমার্থক ছিল। তখনকার দিনে হুঁকোখোরদের সংখ্যা আজকের দিনের সিগারেট বা বিড়িখোরদের চেয়ে আনুপাতিক তুলনামূলক বিচারে কম ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সেদিন আজকের মত যত্রতত্র এমনকি বয়স্কদেরও মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়ার রেওয়াজ ছিল না। সামাজিক সভায় সকলকার হুঁকোয় অধিকার থাকলেও সমাজপতি গুরুজন তথা বয়স্কদের নলচে আড়াল করেই হুঁকো খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ব্যাপারটা হাস্যকর বলে মনে হলেও সাধারণভাবে সৌজন্যবোধের সুন্দর নিদর্শন এ-কথা না মেনে উপায় নেই।

আজকের দিনে নলচে আড়ালও উঠে গেছে। আমার চেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিকেও 'মূর্খ' প্রমাণ করতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না। আমরা ভাবি যে, সত্যের খাতিরে আমরা এ-কাজ করছি, অন্ততঃ ঐ বলে নিজের মনকে চোখ-ঠেরে থাকি। কিন্তু যদি কথাটা আক্ষরিক অর্থেও গ্রহণ করি তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, সেই সত্যই কি পূর্ণসত্য। আজকের পারিপার্শ্বিককে যেটাকে আমরা ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করছি, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে সে সত্যের মধ্যে কি পরিবর্তন আসবে না? এমন দৃষ্টান্তও অহরহই পাচ্ছি। কয়েক বছর আগেও পৃথিবীপ্রদক্ষিণকারী নভোচারীর কথা কল্পনা অর্থাৎ ধারণামাত্র ছিল। তা সত্যে পরিণত হবার অতিক্ষীণ সম্ভাবনামাত্র ছিল, কাজেই তাকে মিথ্যা বলে কেউ মনে করলে কারো বলার কিছু ছিল না। অথচ আজ তা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজ না হোক আগামীকাল গ্রহান্তরে যাত্রাও বাস্তব সত্য হবে; ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও অনুমান সাপেক্ষ কাজেই সম্ভাব্য সত্য। এ অবস্থায় নভোচারণের সত্য নিত্য পরিবর্তনশীল। অন্য সত্যের ক্ষেত্রে এ-কথা জোর করে বলা না গেলেও, এ-কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে যে, আমাদের সত্যদর্শন অন্ধের হস্তীদর্শনের অনুরূপ। কাজেই আমরা অংশমাত্র দেখে তাকেই যদি সত্য বলে আঁকড়ে ধরে অন্য আংশিক সত্যের অধিকারীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকি তাহলে তাতে আমাদের প্রকৃত সত্যলাভ হয় না অথচ অসৌজন্যের চরম হয়। অথচ যাঁরা এ অসৌজন্য প্রকাশ করছেন তাঁরা সর্বদাই মাফ করবেন, ধন্যবাদ, বেগ ইয়োর পার্ডন বলতে অভ্যস্ত। যেখানে আমাদের মধ্যে এমন অসৌজন্যের প্রকাশ নিয়তই দেখা যায় সেখানে পূর্ববর্তীদের অসৌজন্য সম্বন্ধে মন্তব্য অসমীচীন নয় কি? অথচ আমরাও তা প্রতিনিয়তই করছি। নিজেদের কূপমণ্ডুকতা সাগরকে অস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করছে, এ লজ্জা রাখব কোথায়?

এ অবস্থায় নিজেদের বিদ্যা জাহির করবার জন্য আমাদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বক্র মন্তব্য না করে যদি আপনাদের দোষত্রুটিগুলো শোধরাবার চেষ্টা করি তাহলে 'প্রতিবাসী'র চোখের কুটোটি দেখার আগে নিজের চোখের কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলার মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করে আমরা মহীয়ান হব। আজকের দিনে আমাদের এই সাধনাই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

রবি মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। মূল্য দু'টাকা।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ॥ কাজী আবদুল ওদুদ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। দাম বারো টাকা।

রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন স্রষ্টা যাঁকে কেন্দ্র করে বহু কথা বলা হচ্ছে অথচ মানুষের আশ মিটছে না। আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার কত আশ্চর্য উপকরণ তিনি ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ বহু লেখা হলো, আরও হবে। একই বিষয়-বস্তু নানা লোকের কাছে নানা রূপে প্রতিভাত হবে। অনেক টুকরো কথা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবনার উদয় হবে। সেগুলি যদি বৃহৎ প্রবন্ধের পরিসর না পায় তা'হলে সংক্ষিপ্ত রচনার আয়তনে পাঠক-চিত্তে উদ্দীপ্ত করবে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-কথা সেই ধরণের সংক্ষিপ্ত রচনার সমষ্টি। এ-সব রচনা খুব বড় তত্ত্বকথা প্রমাণ করে নি, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যে বিশেষ দিকনির্দেশ এই সব রচনার উদ্দেশ্য নয়। কোন একটি কথা লেখকের ভাবনায় বৃত্তাকারে ঘুরছে সেই ভাবনার জাল লেখক ছাপার কাগজে বিছিয়ে দিয়েছেন—যদি পাঠকের মনেও ভাবনা জেগে ওঠে। একটা কোন দিকে আকৃষ্ট করা, তবে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়।

আপাততঃ মনে হতে পারে রচনাগুলি সংক্ষিপ্ত, বক্তব্য প্রায় কিছুই নেই, এ শুধু নিজেরই কথা বলার আনন্দে কিছু বলা। প্রবন্ধের জগতে এরাই রম্য-রচনা। সাতটি রচনা নিয়ে রবীন্দ্র-কথা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুনত্ব আছে 'কোট উপেক্ষিতা' রচনাটিতে। এই জাতীয় রচনার এইটিই ঠিক বিষয়বস্তু। 'সংগঠক রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমাজচিন্তা' এত অল্প-পরিসরে ক্ষণিক ভাবরোমন্থনের যোগ্য বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু কোট উপেক্ষিতা সেই জাতের বিষয়বস্তু যা নিয়ে বড় প্রবন্ধ না লিখলেও দু-চার কথা বলা যায়—যাতে সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু ভাববার বিষয় আছে। কেটি কি শেষের কবিতার উপেক্ষিতা ? এই প্রশ্ন লেখক তুলেছেন। অমিত লাবণ্যর প্রেমের যে উজ্জ্বল বর্ণে শেষের কবিতার ভাবমণ্ডল রঞ্জিত তার মধ্যে কেটি কতটুকু। লেখকের নিজের অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত আছে—'মিতা-বন্যা-রোমান্সের ঘন পর্দা সরিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কেটির মুখ চিত্রিত হলেও তার মধ্যে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চাউনী আছে।' এই লেখা পড়ে ভাবতে ইচ্ছে করে, কেটির কথাই ভাবি নতুন করে। এই রচনার সার্থকতা সেইখানেই।

কাজী আবদুল ওদুদের এই সাড়ে পাঁচশো পাতার বিরাট গ্রন্থটি হাতে পেয়ে ভাবতে কিছু সময় লাগলো যে এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ—জীবনী না সাহিত্য সমালোচনা। পরে মনে হলো রবীন্দ্র-নাথের মত সাহিত্যস্রষ্টার জীবনীতে সাহিত্য সমালোচনা তো একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকবেই। তা না থাকাটাই তো অস্বাভাবিক। যাই হোক বইটি থেকে জানা গেল এটি প্রথম খণ্ড। বাল্য ও কৈশোরের জীবনী কবির নানা রচনা থেকেই পুনর্গঠিত হয়েছে। সেখানে নতুন তথ্য কিছু নেই এবং ঐ অংশে লেখকও নিশ্চয়ই নিজের কোন কৃতিত্ব দাবী করেন না। তাঁর নিজস্বতা স্পষ্ট হয়েছে

সাহিত্য সমালোচনায়। প্রথম খণ্ডে নৈবেদ্য পর্যন্ত তিনি গ্রন্থে স্থান দিতে পেরেছেন এবং কয়েকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি সমালোচনায় কিছু না কিছু বলেছেন। অধিকাংশই এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমালোচনার অংশবিশেষের পুনরুদ্ধার। সেগুলি নিয়ে আমাদের আলোচনার কিছু নেই। বরং সেগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে কবির নিজের লেখা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা, অন্যান্য সমালোচকদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থটি অকারণে বিরাট ও ভারাক্রান্ত হলো। রেফারেন্স যোগানো যখন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, তখন নিজের মতামত না লিখে শুধু পুরানো (অন্যসূত্রে প্রাপ্তব্য) মতামতের এত পুনরুল্লেখ কেন। যেমন সমাজ-গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা আলোচনায় পংক্তি হিসাবে পাতা পাঁচেক লেখকের লেখা, বাকী সবই উদ্ধৃতি। সমাজের প্রবন্ধগুলি থেকেই উদ্ধৃতি। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-গ্রন্থটি যদি কারুর পড়া থাকে তবে তিনি এই ২৪টি পৃষ্ঠা স্বচ্ছন্দে উল্টে যেতে পারেন। কারণ ঐ ২৪ পাতায় শুধু উদ্ধৃতি আছে। তেমনি ছিন্নপত্রাবলী, তেমনি পঞ্চভূত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আজ বাইশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও যদি আমাদের সমালোচনা পাতার পর পাতার এই অর্থহীন উদ্ধৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি না পায় তাহলে তা লজ্জারই কথা।

কোন কোন ক্ষেত্রে লেখক কিছু কিছু সমালোচনা করেছেন। এ বইয়ের যেটুকু আকর্ষণ তা ঐ সমালোচনাংশ টুকুতেই। সুতরাং সেইগুলি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই চোখে পড়লো মালিনীর সমালোচনা। লেখক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটিকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, গ্রীক নাট্যের যে সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন রূপ আছে, কবির আরো কয়েকখানি নাটকে এমন সংযত সংহত রূপ আমরা দেখবো। বলা বাহুল্য লেখক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটির মন্তব্যটিকে বিনাবিচারে মেনে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মালিনী নাটকে দেশকালের সংহত সংযত রূপ নেই। ঘটনাস্থল ও কাল, দুই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। ক্ষেমংকর কোন দেশে গেল, কোথায় সৈন্য পেল, কতদিন পরে এলো এ-সব প্রশ্ন ভাবলেই দেখা যাবে যে গ্রীক নাটকের দেশকালের অবিচ্ছিন্ন ধারা এই নাটকে নেই।

আর কোথাও কোথাও দেখেছি অন্যদের সমালোচনা যে লেখকের পছন্দ হয়নি তা তিনি বলেছেন, কিন্তু কেন সে সমালোচনা গ্রাহ্য নয় সে-কথা বলেন নি। যেমন 'নগর-সঙ্গীত' কবিতার সমালোচনায় লিখছেন (পৃঃ ৩০১); 'প্রভাতবাবু ও চারুবাবু এই কবিতার কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সে ব্যাখ্যা বোধহয় দেওয়া যায় না।' উক্ত সমালোচকদ্বয়ের ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত হলো না, তা কেন গ্রাহ্য নয় তাও জানা গেল না। এই সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন মন্তব্যটির কি কোন প্রয়োজন ছিল।

আবার আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কোন কোন প্রখ্যাত সমালোচকের কিছু কিছু মতামত যা এযাবৎকাল বিনা প্রতিবাদে চলে আসছিল লেখক সেগুলির খণ্ডন করেছেন। ১৬৪ পৃষ্ঠায় মোহিতলালের জগৎ ব্রহ্মবাদ তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য সমীচীন এবং উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল যে 'জগৎ ব্রহ্মবাদ' তত্ত্বের দ্বারা 'অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ' রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সংকীর্ণ একটি ধরণের ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছেন সে-কথার উল্লেখ করে লেখক বলছেন, 'এমত একদেশদর্শী ভিন্ন আর কিছু নয়।' আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলাম ১৩৭ পৃষ্ঠায় 'হিং টিং ছট্' কবিতার। হিং টিং ছট্ কবিতার পটভূমি যাঁরা জানেন তাঁরা এ কবিতার মূল তাৎপর্য বুঝবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম ও সমাজচিন্তায় গোড়া থেকেই যুক্তিবাদী, ফলে সংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ভাষণ বারবার শোনা গেছে। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থন করেন নি। বিশেষ করে হিং টিং ছট্ কবিতায় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যে আঘাত রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে মোহিতলাল গ্যেটের উক্তি উদ্ধৃত করেন 'সুপারস্টিশান্ আর্ দি পোয়েট্রি

অব্ লাইফ্'। গ্যেটে সম্পর্কে ওদুদ সাহেবের অবশ্যই বলবার অধিকার আছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর 'কবিগুরু গ্যেটে' এ-সম্পর্কে তাঁর অধিকার কায়েম করেছে। মোতিলাল উদ্ধৃত গ্যেটের ঐ বাণী সম্বন্ধে ওদুদ সাহেব বলছেন, 'তিনি ভুলে গেছেন, কবির আক্রমণের লক্ষ্য নিরীহ নিরুপদ্রব নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণ নয়, তাঁর আক্রমণ স্থূল অন্ধ-কুসংস্কারের ধ্বজা উত্তোলন করে যারা নতুন করে দিগ্বিজয়ে বেরুতে চাচ্ছে তারা। এমন দলের প্রতি গ্যেটের অবজ্ঞা চিরদিন প্রবল ছিল।' (১৩৮ পৃঃ)

এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ স্থানে স্থানে গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা। ঠিক এই-জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা অন্য গ্রন্থে নেই এবং সেদিন থেকে এই গ্রন্থের কিছুটা অভিনবত্বের দাবী অনস্বীকার্য। গ্যেটের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও কৌতূহলের অভাব ছিল না। তিনি ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে গ্যেটের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আশেপাশের সজীব মানবজগতের মধ্যে, ভাবের প্রবল আন্দোলনের মধ্যে, পরিপূর্ণ প্রাণের সচল জোয়ারের মধ্যে গ্যেটে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আর তারই পাশে পাশে নির্বিকার, উৎসাহবোধহীন বাঙ্গালী-জীবনের স্তিমিত আচ্ছন্নতা তাকে হতাশ করেছিল। কবি বলেছিলেন, 'আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের ভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়।' আলোচ্য গ্রন্থের লেখক গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বহুস্থলেই পাশাপাশি করেছেন, এবং পাঠকমাত্রেই তাতে নতুনত্বের আস্বাদ পাবেন। পৃঃ ১৩২, ১৩৭, ২৮৬, ২৮৮ ৩০০ প্রভৃতি সন্ধান করলে পাঠক গ্যেটের প্রসঙ্গ আলোচিত দেখবেন।

পরবর্তী খণ্ডে লেখক যদি নিজস্ব মতামত ও চিন্তাকে আর একটু বেশী জায়গা দেন তাহলে গ্রন্থ আরও আকর্ষণীয় হবে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

The Wayfaring Poet—A Dunlop Tagore Centenary Publication produced by clarion Advertising Senices Private Ltd. and published by the Dunlop Rubber Co. (India), Ltd.

রবীন্দ্রনাথকে যদি চলার কবি কিংবা গতির কবি বলে আখ্যাত করা যায় তাহলে খুব বেশি ভুল হবে না। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে এ মতবাদকে সপ্রমাণ করাও কষ্টসাধ্য হবে না। কবির এই চলা বা গতি শুধু বাস্তব অর্থেই সত্য নয়—তাঁর কবি-মানস বিবর্তনেও এ গতিবেগ অনস্বীকার্য। তাঁর দৃষ্টি-বহুল কর্মমুখর জীবনে যত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ তিনি করেছেন আমাদের দেশের কোন কবির জীবনে সেরূপ নজির তো দেখা যায়ই নি—বিদেশের কবিদের জীবনেও সেরূপ নজির সহজলভ্য নয়। যা অজানা ও অচেনা তা কবিকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছে। আর সে শুধু মানস আকর্ষণ মাত্রই নয়—তিনি সুযোগ পেলেই তাকে বাস্তবে পরিণত করতেন। এই অজানার আকর্ষণ তাঁকে কৈশোর থেকে বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে। কবি প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন ১৮৭৮

খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে। তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে। এই বৎসর তিনি বিমানযোগে পারশ্য ও আরব ভ্রমণে গেছিলেন।

জীবনে নানা দেশে দেশে কবি যে শুধু আনন্দই সঞ্চয় করেছিলেন তা নয়—সেই আনন্দের পসরা তিনি সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্যে তাঁর অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টিতে। বাস্তব-জীবনে তাঁর এই গতি নানাভাবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও করেছিল গতির সঞ্চার। কোন একটা বিশেষ শিল্পসৃষ্টির রীতি নিয়ে কবি দীর্ঘদিন খুসি থাকতে পারেন নি। নিজের সৃষ্টিকে তিনি বারবার পশ্চাতে ফেলে গেছেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা ও উৎসাহে। তাই নিত্য নতুন ছন্দে ও ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। আজ আমরা তাঁর সেই বহুবিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টিগুলি পড়ি এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবি একক জীবনে একটি মানুষের পক্ষে কি করে এত বিচিত্র রচনা-সম্ভার রেখে যাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলে স্থিত গতির তত্ত্বটি এই রহস্যোদ্ঘাটনে খানিকটা সহায়তা করে। তাঁর প্রতিভা ছিল অনেকটা বেগবতী নদীর মত—আপন চলার বেগে সে যেমন অনেক অবাঞ্ছিত জঞ্জাল সরিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনিই অজস্র বালি-মাটিতে রেখে গেছে বিপুল সৃষ্টির সম্ভাবনা। তার এই বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তার সেই পথ চলার কাহিনী নানাভাবে ছড়িয়ে আছে কবির বহু গদ্য ও পদ্য রচনায়।

কবির এই পথ-চলার কাহিনী অবলম্বন করেই কবির শতবার্ষিক জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ডানলপ রবার কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড প্রকাশ করেছেন তাদের 'দি ওয়েফেয়ারিং পোয়েট' নামক ইংরেজি সংকলন গ্রন্থটি। এই সংকলন গ্রন্থটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রচার-প্রয়াস হলেও, এর মধ্যে কোথাও প্রচারের গন্ধমাত্র নেই। এই সংকলন গ্রন্থটিতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারও রচনা নেই। গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষায় রচিত বলে সেখানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ইংরেজি রচনা পাওয়া যায় নি, সেখানে তাঁর বাংলা রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে মাত্র। ইংরেজি অনুবাদে যাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তারা সবাই স্বনামধন্য। উদাহরণস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসমর সেন, শ্রীক্ষিতীশ রায় শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নাম করতে পারি। এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা, রূপসজ্জা, রচনাংশ নির্বাচন প্রভৃতির মধ্যে উন্নত রুচি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অজস্র সংকলন এপর্যন্ত চোখে পড়েছে। সেগুলির মধ্যে এই সংকলনটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ আসনের দাবী করতে পারে।

ভূমিকায় এই সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা বলেছেন : 'কবি যে গতিবেগ এত ভালবাসতেন এবং যে গতিবেগ প্রতিদিন দূরকে নিকটে আনে সেই গতিবেগ সৃষ্টির জন্যে, চাকা চালু রাখার প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা এই বই-এর মাধ্যমে এই বিশ্বপ্রেমিক পথ-চলার কবিকে আমাদের প্রণাম জানাই।' তাঁদের এ উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে। কবির জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, বিচিত্র প্রবন্ধ, পথের সঞ্চয়, জাপান যাত্রী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর ভ্রমণ-জীবন সম্পর্কিত বহু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি দিয়ে সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থটি। এছাড়া, সমধর্মী কতকগুলি কবিতারও অনুবাদ আছে গ্রন্থটিতে। সর্বোপরি বড় কথা এই যে ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে গ্রথিত এই গ্রন্থটির প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে কবির জীবনের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে কবির একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীও গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। কবির বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণকালীন যে সব ছবি আলোচ্য-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুমুদ্রিত সুদৃশ্য এই গ্রন্থখানি রুচিবান পাঠক-মাত্রেরই সমাদরলাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গোপাল ভৌমিক

নতুন নক্সার সোলার পুতুল

পশ্চিম বাংলার মনোমুগ্ধকর খেলনা ও পুতুল পশ্চিম বাংলার মনোহর রূপেরই প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার নতুন নতুন নক্সা ও আধুনিক তৈরি পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা সোলার, মাটির, পোড়ামাটির, শিং-এর, কাঠের, বাঁশের ও পিতলের খেলনা ও পুতুল গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন। এই সমস্ত দ্রব্য কলিকাতা ও হাওড়ার সরকারি বিপণন কেন্দ্রে ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

শিল্পাধিকার (**কুটির-শিল্প বিভাগ**)

১ হেস্টিংস স্ট্রীট (দশমতল), নতুন মহাকরণভবন, কলিকাতা-১

কর্তৃক প্রচারিত

ভারতীয় মুদ্রণশিল্পে

একটি স্মরণীয় নাম

এ্যাসকো
সাবানে
কাচাই
সহজ

ASCO
SPECIAL
HOUSEHOLD SOAP
TABLET
ASCO BAR
ASCO
ASCO
বার ও ট্যাবলেট
এক টুকরো এ্যাসকো সাবানে
কম সময়ে অনেক বেশী
কাপড়চোপড় পরিষ্কার হয়
প্রচুর ফেনা হয়
জামাকাপড় টেঁকেও বেশী।
এশিয়াটিক সোপ কোং — কলিকাতা

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Oct. '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

স্নিগ্ধ আনন্দঘন দিনের স্বপ্ন সত্যি

আকাশের আগুন-জ্বলা রোদ দেখেছিলে —খাল বিল সব শুষে নিল, মাঠের এক কণা সবুজও অবশিষ্ট রাখল না। সেই খ্যাপা আকাশের মুখে আবার কে কালি লেপে দিল— শ্রাবণের বুকে এত কান্না ছিল কে জানত? এবার দেখো তো, পেঁজা তুলোর মেঘে একাকার আকাশ, মধুমতী নদীর বুকে ছায়াটিও কাঁপেনা! শরৎ এসেছে! সঙ্গে নিয়ে এসেছে স্নিগ্ধ, আনন্দ-ঘন দিনের স্বপ্ন। ঘরে ঘরে সেই স্বপ্ন সত্যি হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দশম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৬৯

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক **রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা**

এই ঠিকানায় **প্রচার অধিকর্তার** নিকট লিখুন

দৈর্ঘ্য মাপবার জন্য ১লা অক্টোবর ১৯৬২ থেকে সমগ্র দেশে মেট্রিক মাপ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম বেচাকেনা এখন মীটার অনুযায়ী হবে।

এখানে মীটার অনুযায়ী সাধারণ পোষাকের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কয়েকটি মাপ দেওয়া হ'ল। এই নতুন মাপের সঙ্গে পরিচিত হলে, গজ অনুযায়ী কেনা-কাটা করার অভ্যাস বদলাতে তা অনেকখানি সাহায্য করবে।

১ মীটার = ১ গজ এবং ৩⅜ ইঞ্চি

এক গজ কাপড়ের দাম যদি ১.০০ টাকা হয় ঐ কাপড়েরই এক মীটারের দাম হবে ১.০৯ নঃপঃ

মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 62/432 BEN

দশম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

স ম কা লী ন

মেঘনাদ বধ কাব্য প্রসঙ্গে

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

"কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে" সাহিত্য দর্পণকারের এই বাক্যটি যিনি পড়েন নাই তিনিও কাব্য পড়িয়া তাহার একটা উদ্দেশ্য বাহির করিতে চান। দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাব্যরচনা দ্বারা অর্থ লাভের আশা যে সুদূরপরাহত একথা মাইকেল জানিতেন। যশোলাভের আশাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু তিনি যে কখনও উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অবশ্য কোনও কোনও কবি নীতিদানকে কাব্যের প্রাণ মনে করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু সকল কবিই যে সেরূপ করেন তাহা নহে। অধিকাংশ-স্থলে দেখা যায় উৎকৃষ্ট ধরনের কবিতা কবির অনেকটা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়ে এবং পরে কবি হয়ত নিজেই সন্দেহ করেন তিনি ঐ কবিতা কিরূপে লিখিলেন। মাইকেল ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, তাঁহার কাব্য অদম্য প্রেরণা সমুদ্ভূত। তিনি নিজে-ইহাতে কোনও উপদেশ দিতে ইচ্ছা করুন অথবা না-ই করুন, সমালোচকগণ তাহার ভিতর হইতে একটা উপদেশ বাহির না করিতে পারিলে কিছুতেই স্বস্তিলাভ করেন না। কাজেই তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিতে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

শেক্‌স্‌পীয়ার গ্রন্থ লিখিয়া সমালোচকগণকে কি বিপদেই না ফেলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার গ্রন্থের উপদেশ লইয়া সমালোচকে সমালোচকে বাদপ্রতিবাদ চলে কিন্তু তিনি বোধ হয় তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসেন। কল্পনাপ্রবণ সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্যে রাম ও রাবণের যুদ্ধে মঙ্গল ও অমঙ্গলের এবং আর্য্য ও অনার্য্যের সংগ্রাম দেখিতে পাইয়াছেন এবং রাবণের প্রতি মাইকেলের সহানুভূতিতে তাঁহার অনার্য্যগণের প্রতি সহানুভূতি দেখিতে পাইয়াছেন।

এ সংগ্রাম যদি তাহাই হয় তাহা হইলেও দেখা যায় এ গ্রন্থখানির নীতিতে আমাদের দেশের চরিত্রগত লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম কাব্য বিউলফে ঐরূপ একটি সংগ্রাম দেখা যায় কিন্তু সেখানে একটি দানবের প্রাণী ভক্ষণ ও দেশ ধ্বংশ হইতে অমঙ্গলের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য দেশ স্ত্রীসতীত্বের আদর চিরকাল করিয়া আসিয়াছে, এখানে রাবণের অমঙ্গলাচরণ অথবা অনার্য্যতা সীতাহরণ সমুদ্ভূত। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যে যদি আরও কোনও নীতি থাকে তাহা স্ত্রীচরিত্রের উৎকর্ষ।

মাইকেলের কাব্য লেখাই যদি স্থির হইল তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালাভাষায় এরূপ একটি বিষয় লইয়া এরূপ একটি অভূতপূর্ব কাব্য লিখিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তর তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রচলিত রীতি বলিয়া একটা জিনিসকে তিনি বায়ুতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি শাসন মানিতেন না। তিনি বিদ্রোহী। কাজেই তিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত রীতির বিরুদ্ধেই গ্রহণ করিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মন এত প্রশস্ত ও পূর্ণ ছিল যে তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জিনিস মাত্রেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। তাঁহার চিন্তার স্রোত কুঞ্জবনের মৃদুলা তটিনীর মত অথবা নিদাঘে ক্ষুদ্র শরৎ প্রবাহের মত নয়, উহা প্রাবৃটে দুকূলপ্লাবী মহানদের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র স্থান পরিপূর্ণকারী ও সর্বাঙ্গ আলিঙ্গনকারী। মনের ঈদৃশ নির্মাণভাগ লইয়া যখন তিনি হোমর, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রভৃতি পড়িতে বসিলেন তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালরূপ ত্রিভুবনও তাঁহার করতলগত হইয়া পড়িল।

তদানীন্তন সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বঙ্গভাষা ও কাব্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যথা সময়েই মাইকেলকে পাঠাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ বঙ্গদেশে করুণ ও শৃঙ্গার রসের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন। সংসারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলিয়া একটা জিনিস আছে। একই রকম জিনিস বহুদিন থাকিতে পারে না, তাহার স্থলে নূতন ও বিপরীত জিনিস দেখা দেয়। অমৃত নিত্য খাইতে খাইতে অমৃতেও অরুচি আসে তখন নিম খাইতে ইচ্ছা করে। কর্ণ অনবরত করুণ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে বধির হইয়া পড়ে, চক্ষু করুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বীরোচিত ধ্বনি ও দৃশ্যে স্বাস্থ্য লাভ করে। আমাদের দেশ যতই করুণ ভাবাপন্ন হউক, মানবমনের গতি অনিবার্য্য। যখন আমাদের কান করুণ ধ্বনিতে ঝালাপালা হইয়া অন্যরূপ ধ্বনির আকাঙ্খা করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে মাইকেল তাঁহার দুন্দুভি লইয়া উপস্থিত হইলেন। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের কথা বাদ দিয়া ধরিলে দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে বীররস যথেষ্ট পূর্বেই দেখা দিয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য দেশ করুণ-রস-প্রধান তাই মাইকেলকে অনেক বিলম্বে আসিতে হইয়াছিল।

দান্তের ন্যায় মাইকেলের মনও নিয়ত স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিত। তাঁহাদের মনের দুইটি দিক ছিল, বাহ্য অথবা সাংসারিক দিকটি যখন পুড়িয়া ধূ ধূ করিতেছে এবং ঊষর মরুভূমির মত বোধ হইতেছে তখন তাঁহাদের মনের অন্তর্নিহিত কন্দরে সুধার উৎস উঠিয়াছে। মাইকেল সাংসারিক জীবনের রঙ্গমঞ্চে স্থান পান নাই, তাই তাঁহার মনটি "কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম" সুন্দর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা ক্রমশঃ সাংসারিক ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়া একটি মনোমুগ্ধকর ত্রিদিব রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

কল্পনাকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু মাইকেলের কল্পনার যদি প্রকার নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে আমরা বলিব যে তিনি একটি মাত্র সহজ অথচ অস্পষ্ট কথা প্রয়োগ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার তেজকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কল্পনা ছবিতে আপনাকে ধরা

দিতে চায় অথচ চিত্রকরকে একটা প্রহেলিকার মধ্যে ফেলিয়া যায়। চিত্রকর সেই কল্পনার প্রেরণায় একটা চিত্র আঁকিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু যখন কার্যতঃ আঁকিতে বসেন তখন দেখেন তাহা মূর্তিতে ধরা দিতে চাহিতেছে না। এরূপ কল্পনা কবি দান্তের এত অধিক পরিমাণে ছিল যে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য কবিগণকে ঋণ দিয়াছেন। মাইকেলের নরকবর্ণনা এইরূপ—

দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণপুরী, চিরনিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে, রহি' রহি' উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেছে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিংবা চন্দ্র, কিংবা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি' পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্চ্ছি' উঠে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!

ইহার সহিত মিলটনরূপী দান্তের বর্ণনার নিম্নলিখিত অংশ আমরা তুলনা করিব—

At once as far as Angels Ken he views
The dismal situation, waste and wild,
A Dungeon horrible, on all sides round
As one great Furnace flamed, yet from those flames
No light, but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe.

দান্তের পথাবলম্বনে মাইকেল যেমন কতকগুলি শরীরী জিনিসকে অশরীরীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপ অন্য কতক স্থলে অশরীরী জিনিসকে শরীরীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণগুলিতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার আরোপ করিয়াছেন। গুণগুলিকে মানবের আকারে কল্পনা করা গেলেও তাহাদের বর্ণনা কিছু অমানুষিক বোধ হয়। পাশ্চাত্য কবির পথাবলম্বনে তিনি জ্বর, উদর পরতা, প্রমত্ততা, কাম প্রভৃতি বিষয়কে দেহীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দান্তের অনুকরণে কবি স্পেন্সার লিখিতেছেন—

—rode Wathsome Gluttony

Deformed creature, on a filthy swyne
His belly was upblowne with luxury
And eke with fatnesse swollen were his eyne
And like a crane his necke was long and fyne
For want whereof poore people oft did pyne.
And all the way, most like a brutish beast,
He spued up his gorge, that all did him deteast.

মাইকেল ইহার অনুকরণে লিখিতেছেন—

বিশাল-উদর রসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ-ভোজন-দ্রব্য-উগরি' দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিছে গিলিয়া
সুখাদ্য!

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এগুলির মূল্য অথবা উদ্দেশ্য কী? এগুলি কি কেবল কাল্পনিক সৃষ্টির বর্ণনামাত্র? না, ইহারা কেবলমাত্র বর্ণনা নহে, ইহাদের নীতিদানরূপ একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। স্পেনসারের 'ফেয়ারী কুইন' একটি রূপকাত্মক কাব্য এবং দান্তের 'ডিভাইনা কমিডিয়াকেও' কেহ কেহ—যদিও ভুলক্রমে—রূপক আখ্যা দিয়াছেন। মাইকেল যদিও উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করেন নাই তথাপি অনুকরণের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে গিয়া তিনিও মেঘনাদ বধের অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনাতে রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। রূপকের প্রধান দোষ এই যে ইহা অতি নীরসভাবে নীতিশিক্ষা দিতে চায়। যাঁহারা সাহিত্য পড়েন তাঁহাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য আনন্দলাভ। নীতিশিক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে কাব্য না পড়িয়া ধর্মগ্রন্থ খুলিয়া বসিলেই হয়। অবশ্য সমষ্টির ধারণা একটি নীতি হউক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ব্যষ্টির শিরায় শিরায় নীতিটি যদি এরূপভাবে সঞ্চারিত করা হয় যে পাঠক প্রতি মুহূর্তে বুঝিতে পারেন যে তিনি উপদিষ্ট হইতেছেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি পুস্তকের উপর বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। সে যাহাই হউক, মাইকেল যে রূপকটুকু ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অতি অল্প এবং পাঠকের বুকের উপর চাপিয়া বসে না। নমুনাস্বরূপ আমরা তাঁহার রূপকগুলির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

উত্তরিলা মায়াদেবী;—কামরূপী সেতু,
সীতানাথ, পাপি-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি!
ত্যজি দেহ ভব-ধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্মফলা ভুঞ্জিতে এ দেশে;
ধর্মপথ্যগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম পূর্বধারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে, যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ততৈলে যেন!

মেঘনাদবধ কাব্যে দেব দানব ও মানবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু অতিপ্রাকৃত জীব কবিতায় অনুমোদিত কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং কেহ কেহ সেগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সমীচীন বোধ হয় না। যে সকল দানবাদির বর্ণনা সাধারণের নিকট শিশুজনোচিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা এরিওসটোর ন্যায় মহাকবির লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের ত কথাই নাই। অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব একটি অতিপ্রাকৃত রাজ্যে সত্য কিন্তু তাহাদের চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাকৃতের ধর্ম আরোপ করিয়া তাহাদিগকে কবিতার মধ্যে আনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ করাতেও বিপদ আছে। কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃতরাজ্যে অতিপ্রাকৃতের বর্ণনা যেমন মানবের

পক্ষে অরুচিকর অতিপ্রাকৃত জীবকে কেবলমাত্র মানবে পরিণত করাও তদ্রূপ। কিন্তু এখানেও মাইকেলের মত একজন মহাকবি আমাদের অভিমতকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মহাদেব, দুর্গা, লক্ষ্মী, রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই মানবের মত আচরণ করিতেছেন। রাবণের গৃহেও প্রহরী আছে, লঙ্কার মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজে, রতি সুগন্ধি কেশতৈল মাখেন, তথাপি মহাদেব রাবণ প্রভৃতির দেবত্ব ও দানবত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ জাগে না।

যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে নিয়ম মানিয়া চলিতে চান তাঁহারা সমস্ত কাব্যের মধ্যেই একটা নায়ক বাহির করিবার প্রয়াস পান। এ বিষয়ে আমরা প্রচুর সমালোচনার মধ্যে না গিয়া দুই একটি কথা বলিব। প্রথমতঃ, কাব্যে যে একজনমাত্র নায়ক থাকিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। সাহিত্য দর্পণকার বলিতেছেন কাব্যে বহুনায়কও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কোনও কাব্যে যদি নায়ক না থাকে তবে না-ই-বা থাকিল। নায়কবিহীন কাব্যও কাব্য।

মেঘনাদবধ কাব্যে কোনও নায়ক নাই অথবা রাম, লক্ষ্মণ, মেঘনাদ প্রভৃতি অনেকগুলি নায়ক আছেন বলিলেও কোনও ক্ষতি নাই। তথাপি যদি একজনকে নায়ক বলিয়া নির্দেশ করিতেই হয় তাহা হইলে আমরা এইরূপভাবে করিতে পারি। দেখা যাইতেছে যে রাম লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ এই তিনজনের মধ্যে একজন নায়ক হইবেন। লক্ষ্মণ যদিও বীর তথাপি লক্ষ্মণ একটি অপ্রধান চরিত্র। যুদ্ধটা লক্ষ্মণের সহিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে রামের সহিত, বিশেষতঃ লক্ষ্মণের কোনও স্বতন্ত্র্য নাই, তিনি ভ্রাতার আজ্ঞাবহ মাত্র। কাজেই লক্ষ্মণকে আমরা বীর বলিতে পরি না। রামও নায়ক হইতে পারেন না কারণ শৃঙ্গার, বীর, শান্ত প্রভৃতি রসের একটি রস বীরের অঙ্গীভূত হওয়া দরকার কিন্তু রামের চরিত্রে দেখা যায় যদিও তিনি যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছেন তথাপি মাঝে মাঝে রণে ভঙ্গ দিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা করিতেছেন। অবশ্য অন্য রসের সংমিশ্রণ নায়কত্বে বাধা হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে হ্যামলেটের মত একটি অব্যবস্থিতচিত্ত লোককে সেক্সপীয়রের নাটকের বীর বলা যাইত না, কিন্তু আমাদের যেরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে সে হিসাবে রাম নায়কের অনুপযুক্ত। পুনশ্চ দেখা যায় রাম ও লক্ষ্মণের যুদ্ধের অনুষ্ঠান খুবই কম, একেবারে নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং যখন যুদ্ধ নিতান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে তখনই যেন বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহারা কর্মোৎসাহী নহেন, কর্মহীন। কর্মে নিরুৎসাহ ব্যক্তিকে নায়ক করা যাইতে পারে না। অতএব মেঘনাদকেই নায়ক বলিতে হইবে। মেঘনাদের স্থায়ী ভাব বীরত্ব এবং বীরোচিত কার্য তাঁহার জন্য বীর নাম জয় করিয়া আনে। অতএব কবি যে নায়কের নামেই গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেঘনাদের নায়কত্বে যদি কোনও আপত্তি থাকে তবে তাহা এই যে গ্রন্থে বর্ণিত সমুদয় ঘটনার শেষ পর্যন্ত মেঘনাদ উপস্থিত নহেন। তাঁহার মৃত্যুতে কাব্যটি শেষ হয় নাই, তাহার পর আরও তিনটি সর্গ আছে এবং রাম ও লক্ষ্মণ তাহাতে উপস্থিত আছেন। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে মেঘনাদের মৃত্যুর পর যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহাও তাঁহার মৃত্যু-সমুৎপন্ন। মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তিশেলবিদ্ধ হন এবং মেঘনাদের মৃত্যুর জন্য প্রমীলার সহমরণ হয়। মেঘনাদ চক্রের মধ্যে কীলকস্বরূপ, তাঁহারই চতুর্দিকে অন্যান্য ঘটনাগুলি ঘুরিতেছে। অতএব মেঘনাদেরই নায়কত্ব প্রতিপাদিত হইল।

গ্রীসদেশীয় নাটকের মত মেঘনাধবধ কাব্যের একটি মূলনীতি এই যে—নিয়তির প্রাধান্য। ইহাতে এই নীতিটি এত অধিকবার উল্লিখিত হইতেছে যে, উদ্যোগের মূল্য যেন কিছুই নাই

এইরূপ প্রতীয়মান হয়। যুদ্ধবিগ্রহের শেষ কালটা পূর্বে হইতে জানা থাকিলে যুদ্ধে আগ্রহ থাকে না। যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দেওয়া দরকার, ফলাফল যাহা হয় হউক। কিন্তু এ কাব্যে দেখা যায় কবি এক পক্ষের যুদ্ধের আয়োজন প্রচুর পরিমাণে করাইতেছেন এবং অন্য পক্ষকে নিস্তব্ধ রাখিয়াছেন বলিলেই হয়। রাম যেন অচল পর্বত বসিয়া আছেন এবং মেঘনাদের সমুদয় চেষ্টা যেন ব্যর্থ হইতেছে। লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কি কারণে রঘুনাথ! সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে?

পুনরায় লক্ষ্মণ বিভীষণকে বলিতেছেন—

সংবর খেদ, রক্ষশ্চূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ কথনের দ্বারা রামের যেন সত্ত্বাই নাই এরূপ বোধ হয়। যুদ্ধটি প্রকৃত-প্রস্তাবে যেন মেঘনাদে ও ভগবানে হইতেছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করিলে দুইটিমাত্র সরলভাব পরিলক্ষিত হয়—বীরভাব ও করুণভাব। কাহারও মধ্যে কেবল বীরভাব, কাহারও কেবল করুণভাব এবং কাহারও এই উভয়ের সংমিশ্রণ। চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যাধিক্য নাই, তাহাদিগকে বিভিন্ন অবস্থা ও সম্বন্ধের মধ্যে আনয়ন দ্বারা বিভিন্ন অনুভূতির সংঘর্ষ ও ক্রীড়া নাই এবং তাহার মধ্যে নাটকীয় স্বাতন্ত্র্য নাই। তাহারা যখনই কথা বলে তখনই মাইকেলের মত কথা বলে। মাইকেল যেন দুইটি বাঁশী রাখিয়াছিলেন, একটিতে রাগ ও অপরটিতে রাগিণী বাজিত এবং চরিত্রগুলি যেন এই দুইটি বাঁশীর যে কোনও একটি অথবা দুইটি লইয়া গান করিত। এস্থলে যোগীন্দ্রবাবু যথার্থই লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাঁহার বীররস অপেক্ষা করুণ রস প্রবল। তাঁহার বীররসের মধ্যেও কারুণ্য আছে।

চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যাতিশয্যের অভাব দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মাইকেলের চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যে সন্দেহ উপস্থিত করিবেন, কিন্তু সেরূপ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ, মাইকেল মহাকাব্য লিখিতেছেন, মহাকাব্যের মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্য যে থাকিতেই হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। যদিও নাটকের মধ্যে মহাকাব্য বিদ্যমান তথাপি মহাকাব্য নাটক নহে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার চরিত্রগুলিতে প্রভূত বৈচিত্র্য না থাকিলেও তাহারা ঔপন্যাসিক স্কটের চরিত্রগুলির ন্যায় দারুময় নয়। তাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা আছে। চরিত্রগুলি যথেষ্ট জীবন্ত, তবে তাহাদের প্রকৃতি মর্মর—সরল।

স্ত্রীজাতিকে মাইকেল অত্যন্ত অনুকম্পার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তিনি স্ত্রীচরিত্র-গুলিকে লালিত্যের তুলি দিয়া আঁকিয়াছেন। যে কান সীতা ও সরমার কথোপকথন শুনিয়াছে সে তাদৃশ ললিত-মধুর জিনিস আর শুনিবে না। এমনকি এরূপ কথোপকথন রচনা করিবার সময়ে তিনি যে বীররসপূর্ণ কাব্য লিখিতেছেন তাহা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া যেন 'মেঘদূত' লিখিতেছেন এরূপ মনে হয়। স্ত্রীচরিত্রের মুখে তিনি যেভাষা দিয়াছেন তাহাও অতীব মনোহারী। বারুণী মুরলাকে বলিতেছেন—

এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি

রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।

সীতা সরমাকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলিতেছেন —

ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম।
কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী বন চর মধু নিরবধি
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! শিখী সহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্তকী-নর্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসরের ধনু ঘন-বর-শিরে।

স্ত্রী চরিত্রগুলিকে এইরূপ কারুণ্যের পটে অঙ্কিত করিতে গিয়াও মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা প্রভৃতি যে বীরাঙ্গনা একথা কবি ভুলিয়া যান নাই। প্রমীলা যখন বিরহিনী তখন তাহার চক্ষুতে জল আসিতেছে কিন্তু প্রমীলা যখন বীরাঙ্গনা তখন তাহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে।। প্রমোদ-উদ্যানে যে প্রমীলা সখির গলা ধরিয়া কাঁদিতেছেন।

ওই দেখ আইল লো তিমির যামিনী
কাল-ভুজঙ্গিনী রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?

সেই প্রমীলা পরক্ষণে রণ-সজ্জায় সাজিয়া বলিতেছেন —

পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে—এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে।

প্রমীলার মত রাবণের চরিত্রও জল ও অনল, আলো ও ছায়া, হর ও গৌরীর সংমিশ্রণ। মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি চরিত্র আছে তাহার মধ্যে রাবণের চরিত্র অনেকের নিকট সর্বাপেক্ষা চমৎকার মনে হয়। রাবণ রাক্ষস তাই রাবণ ধর্ষণকারী, প্রতিশোধপরায়ণ ও অসহিষ্ণু, কিন্তু রাবণ রক্তমাংসদেহধারী জীব তাই রাবণ পুত্রশোকে বিহ্বল। যুদ্ধবিগ্রহে রাবণ যথেষ্ট স্থায়ী উৎসাহ ও ক্ষমতা দেখাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া রাবণ কেবলমাত্র কঠোর ও নিষ্ঠুর উপাদানে গঠিত নয়। বস্তুতঃ দুর্ধর্ষ বীরকেও কখনও কখনও এরূপ অবস্থাতে পড়িতে হয় যখন সে

বালকের ন্যায় রোদন না করিয়া থাকিতে পারে না। বীরবাহুর পতনে রাবণ বলিতেছেন—

তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী,—
পরের যাতন কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদ পুত্র-দুঃখে দুঃখী —
তুমি হে জগৎপিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু। বীরেন্দ্র-কেশরি।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা যেমনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন, অমনিই তিনি বিলাপ সম্বরণ করিয়া বীরের বেশে বলিলেন —

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশমম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে: তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?

রাবণের যুদ্ধসজ্জা অপেক্ষা রাবণের বিলাপ কবির হৃদয়ের আরও গভীর স্থল হইতে উদ্ভূত তাই তাহা এত মর্মস্পর্শী। দুর্বলের রোদন অতি সহজ ও সাধারণ, কিন্তু বীরের রোদনে সূর্য্যাস্তের মত একটা গরিমা মিশ্রিত থাকে। লঙ্কার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া রাবণ বলিতেছেন ——

হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম সজ্জিত, দীপাবলিতেজে
উজ্জ্বলিত নাট্য শালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।

এরূপ ক্রন্দন শুনিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য রাবণের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার ব্যথার ব্যথী হইতে চাই। মিলটনের শয়তান যতই অপরাধী করুক না কেন তথাপি তাহার খেদ শুনিয়া এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষণকাল তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ না করিবে। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী —

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এনয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে! —
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমার, করিব

মহাযাত্রা; কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখে আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃ কুল রাজ—সিংহাসনে
জুড়াইব, আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে
বামে রক্ষ কুললক্ষ্মী রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা। পূর্বজন্মফলে,
হেরি তোমা দোঁহে আজ এ কাল আসনে।
কর্ব্বুর গৌরব রবি চির রাহু গ্রাসে।

বস্তুতঃ রাবণ চরিত্রটি এত সুন্দর হইয়াছে যে তাঁহাকে এ কাজের নায়ক বলিলেও কিছু অসঙ্গত হইবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সাহিত্যের যতরূপ কিম্বদন্তী ও চিরন্তন প্রথা ছিল তাহাকে মাইকেল বায়ুতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। তিনি মহাকাব্য লিখিতেছেন এবং অমিত্রছন্দে লিখিতেছেন; অতএব তাঁহাকে ভাষাটি তদুপযোগী উন্নত করিয়া লিখিতে হইয়াছিল। তিনি যেন অভিধান খুলিয়া সহজ সহজ শব্দের কঠিন কঠিন শব্দগুলি লইয়া পরে লিখিতে বসিয়াছিলেন। ধনু ও সাগরতটকে তিনি ঐ নাম না দিয়া কোদণ্ড ও যাদঃপতিরোধঃ বলিতেছেন। আরও দেখা যায় কতকগুলি যৌগিক শব্দ বারংবার আসিতেছে যথা রক্ষঃকুলরাজ লক্ষ্মী, দেবদৈত্যনরত্রাশ, রাক্ষস ভরসা ইত্যাদি। হোমরের অনুকরণে তিনি কতকগুলি স্থায়ী বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন যথা দম্ভোলী নিক্ষেপী (সহস্রাক্ষ)।

ভাষা উন্নত করা বিষয়ে যত্নবান হইতে গিয়া তিনি একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—প্রথাবহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা, যথা 'স্তুতিলা', "শান্তিলা", "মর্মরিছে" ইত্যাদি। মিলটন কতকগুলি ইংরাজী শব্দ লাটিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং স্পেনসার কতকগুলি শব্দের বানান বিকৃত করিয়াছেন। মাইকেল ইহাদের নিকট এ প্রথা গ্রহণ করেন নাই। এরূপ শব্দগুলি সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে যদিও কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে তথাপি ইহার দোষ এই যে ইহা অতি সহজ ব্যঙ্গানুকরণকে সাহায্য করে—যথা টেবুলিলা সূত্রধর কাপড়িলা তাঁতী।

এইরূপ বিবিধ উপায়ে মাইকেল একটা স্বতন্ত্র ভাষার রীতি গঠন করিয়া ফেলিলেন। ইহা অনুকরণ করা উচিত কি না বলা কঠিন কারণ ইহা কতকগুলি সীমা ও অবস্থার মধ্যে চলিতে পারে, নচেৎ আমাদিগকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণের মত ভ্রমে পড়িতে হইবে। সে যাহাই হউক, তাঁহার ভাষা যে বাঙলা সাহিত্যের শব্দকোষকে প্রভূত পরিমাণে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল তখন মাইকেল সেগুলিতে শক্তিসঞ্চার করিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দৃঢ় হইয়া পড়িল। তাঁহার ভাষার চলন যৌবনমদালসা বধূর মত নহে, উহা তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর মত—ঋজু দৃঢ় ও নিয়মিত।

রীতি এবং শব্দের এইরূপ বিশিষ্টতার জন্য তাঁহার কাব্যের সঙ্গীতও একটি অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতা পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে কিন্তু মাইকেলের কবিতা আমাদিগকে জাগাইয়া তোলে। প্রথমটি রক্তকে শীতল করে দ্বিতীয়টি রক্তকে উষ্ণ করে। মাইকেলের সঙ্গীত অচেতনকে সচেতন করে। তাঁহার সুরযন্ত্র একটি করুণরসপূর্ণ বেহালা অথবা সারঙ্গ নহে, ইহা একসুরে বাঁধা সহস্রটি তানপুরা যাহার ধ্বনি মন্দিরের দ্বার, অঙ্গন, খিলান প্রভৃতিকে পূর্ণ করিয়া গগনমণ্ডলে তরঙ্গসৃষ্টি করে। তাঁহার

তালযন্ত্র ঠুংরী অথবা টপ্পা গানের তবলা নহে, উহা একটি জয়ঢাকের মত পাখোয়াজ। যাহার বামদিকে আঘাত করিলে জীমূত ও সাগরঊর্মি নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে থাকে। মাইকেলের সঙ্গীত বীণাপানির বীণা নহে, উহা মহারুদ্রের প্রলয়রূপী শিঙা।

মাইকেল হোমারের কাব্য অনেকবিষয়ে অনুকরণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু একটি বিষয়ে পারেন নাই—তাহা হোমারের এক শ্রেণীর নিরুপম উপমা যাহাকে হোমরীয় উপমা বলা হয়। হোমার অথবা মিলটনের উপমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে ভাষাও শেষ হইয়া যায়। তাঁহাদের উপমাগুলি তাঁহাদের বিষয়বস্তুর মত বিরাট ও মহিমান্বিত। সে উপমাগুলি ক্ষুদ্র বস্তুতে সীমাবদ্ধ নহে, আকাশ সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি প্রকৃতির বিরাট বিরাট জিনিস লইয়া রচিত। সেগুলি বর্ণনা করিবার সময় কবি যেন ক্ষণকালের জন্য কাব্য রচনার কথা ভুলিয়া গিয়া উপ-মাটির স্বতন্ত্র শোভা বর্ধনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে উপমাগুলি পাঠকের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র উপভোগের বস্তু হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ উপমাগুলি তত প্রীতিকর হইবে না বলি-য়াই হউক অথবা যে কারণেই হউক মাইকেল সেগুলি প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার উপমার রীতি অনেকটা স্পেনসারের মত, কিন্তু প্রয়োগবিষয়ে একটা পার্থক্য দেখা যায়। স্পেনসার তাঁহার ভৃত্যগুলিকে যখন তখন ডাকেন না, যখন নিতান্ত প্রয়োজন হয় তখনই ডাকেন. কিন্তু মাইকেল অনেক সময়ে বিনা কারণেও ডাকেন এবং তাঁহার সম্মুখে তাহাদিগকে সর্বদা প্রস্তুত করাইয়া রাখেন। তিনি উপমার প্রাচুর্য্যকে উপমার মূল্যবত্তা বলিয়া ভুল করেন। বেশী লোক থাকিলেই যে সব সময়ে বেশী কাজ হয় তাহা নহে; অধিকাংশস্থলে অল্পসংখ্যক উপযুক্ত লোকে বেশী কাজ হয়। মাইকেল উপমাগুলিকে উপর্যুপরি আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া মনে হয় তিনি দুর্বল এবং মনের ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দিহান। জীবনের চিত্র যখন রীতিমত প্রবল থাকে তখন উপমার সাহায্য অধিক আবশ্যক হয় না।

কবিবর হেমচন্দ্রের কথা অনুসারে উপমার বাহুল্য ও অযথাপ্রয়োগ যে মাইকেলের উপ-মার একমাত্র দোষ তাহা নহে, বস্তুতঃ সেগুলি তত হৃদয়গ্রাহীও নয়। কাব্যখানি পড়িবার পর খুব কমসংখ্যক উপমাই আমাদের স্মরণে থাকে। উপমা বৃহদায়তন হইলেই যে হৃদয়গ্রাহী হয় তাহা নহে, উপমার গভীরত্ব, নির্বাচন ও প্রয়োগ—নৈপুণ্য উপমাকে কল্পান্তস্থায়ী করিয়া রাখে।

তাঁহার উপমেয় বস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সেগুলি অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি হইতে দেখা যায় এ বিষয়টি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়া-ছিল এবং কোন বাঙ্গালা কবিকেই বা করে নাই ?

হেমবাবু মাইকেলের আরও একটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। মিলটনের অনুকরণে লম্বা লম্বা বাক্য রচনা করিয়া তিনি সকল স্থানে কৃত-কার্য হন নাই। তাঁহার চিন্তার স্রোত অতিশয় তীব্র এবং একটি ভাব শেষ হইতে না হইতেই আর একটি আসিয়া পড়ে এবং উভয়ের সংমিশ্রণে·বাক্যটি কিছু জটিল আকার ধারণ করে। তাঁহার চিন্তার প্রবাহ মুক্তজলপ্রপাতের মত নয়, একটি কলসীতে জল ভর্তি করিয়া তাহা উপুড় করিয়া ধরিলে জলের প্রবাহ যেরূপ প্রতিহত হয় সেইরূপ প্রতিহত। তাঁহার রচনা কখ-নও হোঁচট খায়, কখনও কাঁদে, কখনও ঝাপ দেয় এবং কখনও বা দৌড়াদৌড়ি করে।

ভারতচন্দ্র যে হিসাবে জনপ্রিয় মাইকেল সে হিসাবে নন। ভারতচন্দ্রের কাব্য সাধারণের জন্য, মাইকেলের কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত লোকের জন্য। যতই লোক শিক্ষার উন্নতস্তরে উঠিতে থাকিবে ততই মাইকেলের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

প্রথম পুস্তক প্রকাশের পর মাইকেলকে ব্রাউনিং-এর মত কঠোর বিদ্রূপ সহ্য করিতে

হইয়াছিল। পুস্তকখানি প্রচারের পর কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার লোকপ্রিয়তা চোরাই ব্যবসায়ের মত ছিল পরে তাহা সর্বসমক্ষে দিবালোকে প্রকাশিত হয়। গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহার বিধর্মিতার প্রতি, পুরাতনের ভক্তগণ তাঁহার অমিত্রছন্দের প্রতি চরিত্রানুসন্ধিৎসুগণ তাঁহার চরিত্রের প্রতি এবং বৈয়াকরণিকগণ তাঁহার ভাষাতন্ত্রের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক প্রথম হইতেই প্রশংসা লাভ না করিয়া নিয়ত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বড় অদ্ভুত ভাগ্যবটে কিন্তু অহিংসনীয় নয়।

সিংহীর একবারে একটি মাত্র শাবক হয় কিন্তু সেটিও একটি সিংহ। মাইকেল ভারতচন্দ্রের মত বহুবিধ ছন্দ চেষ্টা করেন নাই কিন্তু তিনি যে একটি বিশল্যকরণী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেই তিনি জয়ী। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে তিনি অমিত্রছন্দ নির্বাচন করিলেন কেন? বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে ইহার উত্তর দিবে কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা এইরূপ বলিয়া অনুমিত হয়।

অধিকাংশস্থলে দেখা যায় পরিবর্তন একটা আবশ্যকীয় বস্তু, পরিবর্তনকারী একটা উপলক্ষ মাত্র। মাইকেল কেন অমিত্রছন্দে লিখিতেন তাহার উত্তর এই যে অমিত্রছন্দ বাঙ্গালা কাব্যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। মিত্র ছন্দ শুনিয়া শুনিয়া লোকের কান পচিয়া গিয়াছিল।

এরূপ একটা পরিবর্তনের আবশ্যকতা বুঝিয়াও অনেকে অমিত্রছন্দ প্রবর্তনে পশ্চাৎপদ রইতে চান, কারণ আমাদের দেশ পরিবর্তন অসহিষ্ণু। কিন্তু মাইকেলের নির্ভীক চিত্ত ইহাতে ভুলিয়া থাকিবার নয়। মাইকেল বিদ্রোহী ধর্মবিষয়ে বিদ্রোহী এবং সাহিত্য বিষয়ে বিদ্রোহী। অমিত্রছন্দ নির্বাচন তাঁহার বিদ্রোহিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

যাহার মনের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের সভা বসিতে পারে তাহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি অমিত্রছন্দ ছাড়া আর কিসে হইতে পারে?

মানবমাত্রেই ভূত ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে কিন্তু মাইকেল কি অমিত্রছন্দ নির্বাচনের সময় একবার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই? ভবিষৎফল যে ভাল হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার তাঁহার কোনও কারণ ছিল না। ইংরাজ কবিগণ এই ছন্দ প্রবর্তন করিয়া কিরূপ একটা যুগান্তর আনিয়াছিলেন এবং এই ছন্দের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন ইহা চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া কোন জাতি তাহার কাব্যকে অমিত্রছন্দবিহীন মস্তকে চলিতে দিবে? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে মাইকেল তাঁহার সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে আসিয়া-পড়িয়াছিলেন তাই তিনি সাময়িক জননিন্দা ভোগ করিয়া তাহার দণ্ড দিয়া গিয়াছেন।

অমিত্রছন্দ বিষয়ে মিলটনের সহিত মাইকেলের তুলনা হইতে পারে না, এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে একটা উপসাগরের ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। মিলটন একটি কাষ্ঠফলক রেঁদার দ্বারা মসৃণ করিয়া তাহাতে কারুকার্য্য আঁকিতেছেন, মাইকেল কেবল কাষ্ঠফলকটি কাটিয়া তৈয়ারী করিতেছেন মাত্র। মিলটন তাঁহার চিত্রটিতে শেষ তুলিকা ছোঁয়াইতেছেন, মাইকেল তাহা অঙ্কনের জন্য পটে কেবল একটি মাত্র রঙ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে মাইকেলের পক্ষে প্রভূত উৎকর্ষের বিষয় এই যে তিনি কাষ্ঠফলকটি তৈয়ারী করিবার সময় অথবা চিত্রপটে প্রথম রঙ প্রয়োগে একটা সিদ্ধহস্ত কারিগরের পরিচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কেহ মাইকেলের অপেক্ষা অধিক সুন্দর অমিত্রছন্দ রচনা করেন তাহা হইলে তিনি সজ্জাকর বলিয়া প্রশংসিত হইবেন, উদ্ভাবক অথবা নির্মাতার মুকুট পাইবেন না।

টেনিসনের মৃত্যুর পর অনেকে মনে করিয়াছিলেন ইংরাজী কবিতাতে আর কোনও নূতন রকমের সঙ্গীত কেহ দিতে পারিবে না, কিন্তু পরক্ষণেই সুইনবর্ণ আসিয়া তাঁহাদের ধারণাটাকে

উলটপালট করিয়া দিলেন। ভারতচন্দ্রের পর কে ভাবিয়াছিল বাঙলা কবিতায় অন্য নূতন ছন্দ বিশেষতঃ অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইবে? মিত্রছন্দ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারে "আমার অপরাধটা কী?" তাহাতে মাইকেল এই উত্তর দিবেন—"তুমি স্ত্রৈণ, আমি পৌরুষেয়; তুমি খাঁচার পাখি, আমি বনের পাখি; তুমি নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম লইয়া চলিতে থাক, আমি বায়ুর মতন নদীর মতন অবাধে চলিয়া যাই; তুমি ভাষার দাস, আমি ভাষার প্রভু।" মাইকেল যাহা বলিলেন তাহা সত্য কিন্তু পৌরুষেয় হইতে গিয়া কর্কশ হওয়া, বনের পাখি হইতে গিয়া উদ্ভ্রান্ত হওয়া, বিশ্রাম না লইয়া চলিতে চলিতে পায়ের গ্রন্থি অকস্মাৎ শিথিল হওয়া, ভাষার প্রভু হইতে গিয়া তাহাকে লইয়া যদৃচ্ছাচার করা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অংশে পড়া খুবই সম্ভব। গদ্য নামে একটি দৈত্য অমিত্র কবিতাকে আক্রমণ করিবে বলিয়া সর্বদা ওৎ পাতিয়া থাকে এবং একটু অতর্কিত দেখিলেই গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু মাইকেলের সাবধানতা এত অধিক যে তিনি কিছুতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে দিতেছেন না। নির্মল কবিতারূপ রক্ষাকবচ তাঁহাকে শত্রুর গ্রাস হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন মাইকেল বঙ্গসাহিত্যের কী করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রশ্ন করিব মাইকেল বঙ্গসাহিত্যের কী না করিয়াছেন? তিনি বঙ্গভাষার কোষাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, ভাষার পেশী, ধমনীও গ্রন্থিকে সতেজ করিয়াছেন এবং সর্বোপরি বাঙলা কাব্যের মস্তকে একটি অভিনব ছন্দের কিরীটি পরাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে কর্তব্য লইয়া বাগ্‌দেবী কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই। মহারুদ্রের মত তাঁহার বিরাট মূর্তি সাহিত্য রাজ্যের শেষ প্রান্ত হইতেও মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সার চার্লস উইল্‌কিন্স

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সমারসেটশায়ারে এক দরিদ্র পরিবারে চার্লস উইল্‌কিন্স জন্মগ্রহণ করেন। উইল্‌কিন্সের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না, অনেকের মতে তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ওয়াল্টার উইলকিন্স। পিতার দারিদ্র্যের জন্য চার্লস উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন। নিজের চেষ্টায় যে টুকু জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্বদেশে জীবিকা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চার্লস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার এর চাকুরী সংগ্রহ করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ভারতে আগমন করেন। কলিকাতায় কিছুদিন চাকুরী করার পর তাঁহাকে মালদহে কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষের সহকারী করিয়া পাঠানো হয়।

উচ্চশিক্ষা না পাইলেও উইল্‌কিন্স্ উচ্চাভিলাষী ও অধ্যয়ন শীল ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাঙ্গলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন ও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই দুইটি ভাষাই উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। *এই সময়ে তাঁহার সহিত কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী ন্যাথেনিয়েল ব্রেসি হ্যালহেডের পরিচয় হয়। হ্যালহেডের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক হন ও একজন পণ্ডিতের সাহায্যে অচিরকালের মধ্যেই* সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টোজী দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও রামচন্দ্র প্রণীত সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে চার্লস উইল্‌কিন্সই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উইলকিন্সের বন্ধু হ্যালহেড্ উত্তমরূপে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বইখানি প্রকাশের জন্য বাঙ্গলা হরফের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময়ে মুদ্রাঙ্কনের জন্য বাঙ্গলা টাইপের সৃষ্টি হয় নাই। ইতিপূর্বে পর্টুগালের লিসবন শহর হইতে তিনখানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বটে তবে এইগুলি ছিল রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বোল্টস নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক বাঙ্গলা টাইপ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। দুঃসাহসী চার্লস উইলকিন্স হ্যালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এক প্রস্থ বাঙ্গলা টাইপ নির্মাণের কাজে অগ্রসর হইলেন, এই কাজে তাঁহার সামান্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। টাইপ বা হরফ প্রস্তুতের কাজে ঢালাই বা পেটাই এর কাজ জানা একজন লোকের সন্ধান করিতে যাইয়া তিনি পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙ্গালী কর্মকারকে সহযোগী পান। নিজহস্তে ছেনিদ্বারা বাঙ্গলা হরফের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া পঞ্চাননের সহায়তায় তিনি ব্যাকরণ প্রকাশের উপযোগী একপ্রস্থ হরফ প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। এই হরফগুলি বিন্যস্ত করিয়া উইলকিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর মাষ্টার এন্ড্রুজের ছাপাখানা হইতে হ্যালহেডের ব্যাকরণটি ছাপাইয়া বাহির করেন। হ্যালহেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় অকুণ্ঠ চিত্তে উইলকিন্সের ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

In a country so remote from all connexions with European Artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metta-

lurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art as well as disadvantages of solitary experiment."

ক্যাক্সটন্ ইংরাজী টাইপ উদ্ভাবন করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। চার্লস উইলকিন্স্‌কে বাঙলা টাইপের জন্মদাতা বাঙলার ক্যাক্সটন্ বলা যাইতে পারে। উইলকিন্স্ জীবনে বহু কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙলা হরফ উদ্ভাবনার কৃতিত্ব তাঁহার সকল কৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী পঞ্চানন কর্মকারের দান ও স্মরণীয়। পরে স্বাধীন ভাবে পঞ্চানন বাঙলা টাইপের আরও উন্নতি সাধন করেন। উত্তরকালে পঞ্চানন উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুরস্থ ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশন প্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। পঞ্চাননের জামাতা মনোহর ও মনোহরের এক পুত্র দক্ষ হরফ প্রস্তুত কারক হিসাবে সবিশেষে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উইলকিন্স্ ও পঞ্চাননের প্রস্তুত টাইপগুলি কলিকাতায় কোম্পানীর প্রেস স্থাপিত হইলে সরকারী ইস্তাহার প্রভৃতি মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সার উইলিয়ম জোন্স্ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি-রূপে ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উইলকিন্সের সহিত পরিচিত হন। উইলকিন্স্ ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছেন. সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞান দেখিয়া জোন্স্ মুগ্ধ হইয়া যান। উইলকিন্সের সহায়তায় জোন্স্ অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। জোন্স্ স্বীকার করিয়াছিলেন যে উইলকিন্সের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা অসম্ভব হইত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী প্রাচ্য বিদ্যা গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে উইলিয়ম্ জোন্সের উদ্যোগে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ত্রিশজন সদস্য লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় চার্লস উইলকিন্স্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ অতিবাহিত হইলে সোসাইটির শতবর্ষের যে ইতিহাস প্রকাশিত হয় উহা রচনা করেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বহু ভারত-সাধকের সেবাধন্য সোসাইটির শতবর্ষের জীবনে সোসাইটি যাঁহাদের নিকট সর্বাধিক ঋণী তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা জোন্স সহ দ্বাদশজন কর্মীর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। চার্লস উইলকিন্স ইহাঁদের মধ্যে অন্যতম (দ্রঃ Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal—from 1784 to 1883, Part I—Rajendra Lal Mitra)।

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ভারতের ইংরাজ শাসন বিস্তারের ইতিহাসে একটি ধিক্কৃত চরিত্র। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এই বহু নিন্দিত ব্যক্তিটির একটি গৌরবজনক ভূমিকা আছে, ইহা অবশ্যই স্মরণীয়। হেষ্টিংস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ভারতীয় আইন ও রীতি নীতি অনুসারেই ভারতের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে। ইংরাজ সিভিলিয়নরা এই সময়ে কেহই সংস্কৃত জানিতেন না সুতরাং তাঁহা-দের দ্বারা সংস্কৃত স্মৃতি পুস্তক অনুযায়ী বিচার ও শাসন পরিচালনা সম্ভব ছিল না। এই বাধা দূরীকরণার্থে হেষ্টিংস দেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা হিন্দু স্মৃতি গ্রন্থের "বিবাদভঙ্গার্নব সেতু" নামে একটি সার সঙ্কলন প্রস্তুত করান। অনেক সংস্কৃতজ্ঞের ফারসী জ্ঞান ছিল বলিয়া প্রথমে উহা ফার্সীতে অনুবাদ করানো হয়। হ্যালহেড্ ফার্সী জানিতেন, তিনি এই পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেন। এই অনুবাদটি "এ কোড্ অব্ জেন্টু ল" নামে ১৭৭৬

খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। উইল্‌কিন্সকে ওয়ারেন হেষ্টিংস সংস্কৃত শিক্ষালাভে ও বাংলা টাইপ সৃষ্টির কাজে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি সার উইলিয়ম্‌ জোন্সকে উৎসাহিত করেন। অধস্তন কর্মচারী উইল্‌কিন্সকে ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস "বন্ধু" বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমনি ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পর উইলকিন্স্‌ রচিত ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ উইলকিন্সের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। হেষ্টিংসের সুপারিশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর খরচে লণ্ডন হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশ করেন(১)। ইউরোপীয় ভাষায় গীতার ইহাই প্রথম অনুবাদ। উইলকিন্স কৃত গীতার অনুবাদের মাধ্যমেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান ইউরোপের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। উইলকিন্সের অনুবাদ প্রকাশের পরে এই মহা গ্রন্থটি রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উইল্‌কিন্স্‌ কৃত ভগবদ্গীতার ভূমিকা রচনা করেন স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংস। এই ভূমিকায় হেষ্টিংস লেখেন যে "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্য জাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্য গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানব জীবন শান্তি ধামে পরিণত হইবে" (দ্রঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা, ভূমিকা, পৃঃ ১৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই চার্লস উইল্‌কিন্স্‌ পঞ্চম পালরাজ বিগ্রহপাল দেবের একটি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই তাম্রলিপিটি মুঙ্গেরে পাওয়া যায়। এই লিপিটির অনুবাদ এশিয়াটিক রিসার্চেস্‌ পত্রিকার ১ম খণ্ডে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর লিপির ও পাঠোদ্ধার করেন—এই লিপির অনুবাদ ও আলোচনাও এশিয়াটিক রিসার্চেস্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও তাহার সাহায্যে বিজ্ঞান সম্মতভাবে ইতিহাস রচনার কাজে এইভাবে চার্লস উইলকিন্স এদেশে পথ প্রদর্শন করিয়া যান। বাঙ্গলা টাইপ নির্মাণের পর উইলকিন্স ফরাসী হরফ প্রস্তুত করেন। কোম্পানীর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উইলকিন্স তাহার ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা ইস্তাহার ইত্যাদির মত এই প্রেস হইতে সরকারী কাগজ পত্র ফার্সীতেও ছাপা হইত, বলাবাহুল্য বাঙ্গলা হরফগুলির ন্যায় ফার্সী হরফগুলিও ছিল উইল্‌কিন্স্‌ কর্তৃক নির্মিত।

গুরুপরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্স ভারত ত্যাগ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্ত প্রথমে তিনি বাথ নগরীতে কিছুকাল বাস করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন—এবং নিজ গৃহেই একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; কারণ এই সময়ে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

বাথ্‌নগরীতে বাসকালে তিনি বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন(২)। ইহার দুইবৎসর পর তিনি মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন(৩)। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্স পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁহার পাণ্ডুলিপির বিরাট সংগ্রহ কোম্পানীর হস্তগত হইয়া লণ্ডনে আনীত হয়, অন্যসূত্র হইতে ও কিছু পাণ্ডুলিপি ও সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সংগ্রহগুলি সহ লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসে একটি

লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উইল্‌কিন্সকে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষা-নবিশদের জন্য হেল্‌বেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উইলকিন্স ইহার পরিদর্শক ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উইলকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স্‌ রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়(৪)। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বইটি রচনা করিয়া স্বহস্তে খোদিত দেবনাগরী হরফে নিজের ছাপাখানায় ইহা ছাপাইবার উদ্যোগ করেন, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ছাপাখানা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় পুস্তকটি তখন আর ছাপা হয় নাই। এইবার ও পুস্তকটি তাঁহার নিজের খোদিত হরফে মুদ্রিত হয়। এই ব্যাকরণটি সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স সংস্কৃত ভাষার ধাতু সম্বন্ধে (ধাতু মঞ্জরী) আর একটি ব্যাকরণ রচনা করেন(৫) প্রাচ্যবিদ্যা পারঙ্গমতার জন্য দেশে ও বিদেশে উইল্‌কিন্স জীবদ্দশায় বহুসম্মানে ভূষিত হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ সংস্থা রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অফ সিভিল ল উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে উইল্‌কিন্স লণ্ডনে পরলোক গমন করেন। উইল্‌কিন্সের দুইবার বিবাহ হয়। তাঁহার তিনটি কন্যাসন্তান ছিল।

(১) Bhagavad Gita—London, 1785.
(২) Hitopadesa—Bath, 1787.
(৩) Story of Sakuntola from Mahabharata—1793.
(৪) Grammar of Sanskrit Language, 1808.
(৫) Radicals of Sanskrit Language—1815.

সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ

হরিপদ ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়র উভয়েই ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। হোমর ও দান্তের যুগ থেকে সেক্সপীয়রের যুগ পর্যন্ত এবং সেক্সপীয়রের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন কবির অবদানে বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের ভিতর কল্পনা শক্তির ব্যাপকতায় সেক্সপীয়র এবং ভাবের গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। একজন ছিলেন পশ্চিমের সীমাহীন অতলান্ত মহাসাগর। অন্যজন ছিলেন পূর্বের উজ্জ্বল সূর্য। তাঁদের পরিবেশ শিক্ষা এবং প্রকৃতি ভিন্ন। তাঁদের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র এবং ফল ভিন্ন। সুতরাং তাঁদের ভিতর তুলনা চলে না। প্রত্যেকে নিজ মহিমায় ধন্য ও অনতিক্রম্য। তাঁদের জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য অলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সেক্সপীয়রের জন্ম যুগ সন্ধিক্ষণে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বসওয়ার্থের রণক্ষেত্রে গোলাপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সমাধি রচনা হয়েছিল ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের থেকে ১৬১৬ ভিতর সেক্সপীয়র জীবিত ছিলেন। তখন সামন্ত তন্ত্রের অবসান এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত হয়েছিল। তখন নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেছিল। বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্ত্বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাধা নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে আত্ম প্রসারের পথ খুঁজেছিল। ক্ষমতায় আসীন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনের সঙ্গে চলেছিল সংঘর্ষ বিরোধ নবজাগ্রত ব্যক্তিমানুষের । ব্যক্তি মানুষ চেয়েছিল অন্যকে নিজের-আত্মপ্রকাশের পথ থেকে সরিয়ে দিতে। তার মতে পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নেই। বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা। স্বার্থপরতা, অনুদার মনোবৃত্তি, অহমিকা, আত্মপ্রতিষ্ঠা তার একমাত্র লক্ষ্য। এলীজাবেথীয় যুগের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর এই ধরনের জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। তারপর শিল্প বিপ্লবের ফলে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে সে ছলে বলে কৌশলে পৃথিবীর অনুন্নত দুর্বল জাতিগুলিকে সহজে পদানত করে বিশেষ একাধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। এই ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিসত্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছিল। সেক্সপীয়র ছিলেন ইহলোকসর্বস্ব বুর্জোয়া সমাজের জীবনশিল্পী, তার বাণীময় প্রতীক। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট, প্রেম-ভালোবাসা, সুখস্বাচ্ছন্দ আশা-নিরাশার তীব্র জ্বালায় আত্মহারা। তারা শক্তি ও সম্ভূতির উপাসনায় ব্যস্ত। সম্ভোগ ও প্রেয়ের সন্ধানে অতিমাত্র সচেতন। ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠার আবেগে তারা শ্রেয়কে অবজ্ঞা করেছে। অধ্যাত্ম দৃষ্টির অভাবে তাদের প্রেম আত্মঘাতী। তাদের অত্যুশ্চ আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর সহযাত্রী। যে সমাজের কবিসম্রাট তাদের চালিত করেছেন মৃত্যুর তোরণ-দ্বার পর্যন্ত। মৃত্যুর কালো যবনিকার অন্তরালে অপরাজেয় আত্মার অমৃত লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব। মনুষ্যচরিত্রের গহনে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকাসত্ত্বেও তিনি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধে অন্ধ।

সেক্সপীয়রের মতো রবীন্দ্রনাথও যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়ে তিনি জন্মেছিলেন বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতকে ভারতের নবজাগরণের মধ্যমণি হিসেবে। নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন পাশ্চত্য ভাবধারা, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান আত্মস্থ

করেছিলেন। মনের বাতায়ন পথে সকল দেশের আলো-বাতাস গ্রহণ করেও তিনি দেশের খাঁটি ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরতম যোগ রক্ষা করেছিলেন। ব্যক্তিত্বের উচ্চতম স্তর থেকে নেমে এসে মাটির রস গ্রহণ করলেও তারকার মতো তিনি শান্ত সুদূর থেকেছেন। যুগের প্রভাব ছাড়া পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাব কবি যুগলের ভাবাদর্শের পার্থক্য সূচিত করেছে।

ইংলণ্ডের মধ্যস্থানে ওয়ারহির্ক শায়ারের বুক চিরে প্রবাহিত আভন নদীর তীরে সেক্সপীয়রের জন্ম। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সঙ্গে তিনি শুনতেন স্বচ্ছস্রোতা প্রবাহিনীর মন-মাতানো কুলুকুলু তান. নানাজাতির বিহঙ্গের সুমধুর কলকাকলি। বহুবর্ণাঢ্য প্রজাপতির পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে মৃদু সঞ্চারণ. সূর্যকরোজ্জ্বল নীল আকাশ. মধুদ্রাবী বায়ুর হিল্লোল, শ্যামায়মান তরুলতার সজীবতা. গৃহের পাশে বিগত যুগের ঐতিহ্যভরা বনউপবনে স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর দেহে শক্তি ও মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতি দেবীর বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা কৃত্রিম পাঠশালায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় পল্লব গ্রাহিতার পরিপূরক হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচনা করেছিল। তাঁর পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য সমাজে উচ্চ মান সম্ভ্রমের অধিকারী ছিলেন। অমিতব্যয়িতা তাঁকে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিলেছিল। কিশোর সেক্সপীয়র অকারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করে পিতার ব্যবসায় কার্যে সাহায্য করতে বাধ্য হন। ব্যবসায়ী পুত্র সুকুমারমতি বালক ব্যবসায়ীপ্রকৃতি সুলভ বাস্তবজ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে এই বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম গঙ্গার কাছাকাছি জোড়াসাকোর প্রাসাদোপম গৃহ। সে গৃহ ছিল সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের মিলন স্থান। সাধারণ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন নি। একটি বিরাট পুরুষের পদপ্রান্তে বসে তিনি যে উপনিষদের দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর কবি জীবনে তার ফল মধুর এবং বিশ্বসাহিত্যে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি বিশ্বের অণুপরমাণুতে, বিরাট মহান বস্তুতে অনুস্যূত. যার অপরূপ প্রভাবে খণ্ড খণ্ড বস্তুপুঞ্জ এবং অনন্তরূপ এক পরিপূর্ণ অরূপের প্রতিভাস, মহাকবির ধ্যান নেত্রে তা প্রতিভাত হয়েছিল। সেই অরূপকে, ভূমাকে তিনি কখন জীবন দেবতা. কখন বিচিত্ররূপিণী. কখন অরূপরতন আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধ্যাত্মের কবি. সীমার মধ্যে অসীমের কবি। সেক্সপীয়র খণ্ডতাকে খণ্ডরূপেই দর্শন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষবাদের কবি। তার কাব্য সাধনার মূল সুরটি এই পৃথিবীর। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মূল সুরটি আত্মিক, অতীন্দ্রিয় লোকের। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন,—'আমার তো মনে হয়. আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।' রসাত্মক বাক্য যদি. কাব্য হয়. তাহলে তাঁরা উভয়েই সার্থক রসস্রষ্টা ছিলেন। তবে সেক্সপীয়র খণ্ডতাকে খণ্ড-ভাবেই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ খণ্ডের ভিতর ঐক্য, সর্বাত্মভাব উপলব্ধি করেছেন। দুজনের ভিতর মর্মান্তিক পার্থক্য. তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য এইখানে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সেক্সপীয়র দরিদ্র। তাঁর আনাগোনা প্রত্যক্ষ জগতে। তাঁর কারবার বাস্তব মানুষকে নিয়ে।

সেক্সপীয়র ছিলেন নাট্যকার। নাটকে পাত্র-পাত্রীরা প্রধান। নাট্যকার থাকেন নেপথ্যে। তাঁর ব্যক্তিত্ব অদৃশ্য। দৃষ্টি নিরাসক্ত। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গীতিকার ছিলেন। গীতিকাব্যে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের অভিব্যক্তি হয়ে। আবেগ সীমাকে অতিক্রম করে চলে। সেক্সপীয়র ছিলেন বাস্তবের কবি। তিনি প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে যান নি। তিনি ইহলোকসর্বস্ব। তিনি লৌকিক কবি। জনগণের মনের মন্দিরে তাঁর স্থান। রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি। বাহ্য-

বস্তুর অন্তরালে সত্যের অস্তি তাঁর হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত। তার ঔজ্জ্বল্য, তার দীপ্তি তাঁকে মোহিত করেছে। মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে।

সেক্সপীয়র প্রকৃতিকে প্রকৃতি হিসেবে দেখেছেন, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। প্রজ্ঞায় তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জড় প্রকৃতি হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে দেহী দেহী নয়, খণ্ডতা খণ্ডতা নয়, বিভেদ বিভেদ নয়, বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা নয়। তিনি দেখেছেন এদের সকলের সীমার ভিতর এক অসীমেয় লীলা, খণ্ডতার ভিতর এক অখণ্ডতার খেলা, বিচ্ছিন্নতার ভিতর এক মিলনের খেলা। তিনি বলেছেন, লক্ষ লক্ষ প্রাণী নিয়ে বিচিত্র এই বিশ্বের খেলা, আর ছেলেখেলা ভেবে, তোমরা তাকে অবহেলায় ফেলে দাও।

একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, যে চিন্তা করে তার কাছে জীবন হাস্যকর। যে অনুভব করে তার কাছে জীবন দুঃখময়। সেক্সপীয়র চিন্তা করে দেখেছেন, জীবন অর্থশূন্য। তিনি অনুভব করে দেখেছেন, জীবন দুঃখময়। মানুষ যে কয়েকটা দিন বেঁচে থাকে সে কেবল হাতপা ছুড়ে, চেঁচামেচি করে, অস্থির হয়, গণ্ডগোল বাধায়। তারপর আসে মৃত্যু। মৃত্যুতে সব শেষ হয়। স্নেহশীল জননীর মতো সেক্সপীয়র অসহায় মানুষের জন্য সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তার দুঃখে অশ্রুপাত করেছেন। তার সাময়িক অস্থিরতা তাঁর অট্টহাসি উদ্রেক করেছে। তার ক্ষণকালীন দুঃখের জ্বলা তাঁর সমবেদনায় শীতল চন্দন প্রলেপে প্রশমিত হয়েছে। তাঁর কাছে জীবন একটা একটানা সংগ্রাম। সে সংগ্রামে হাসি আছে, আনন্দ আছে, আবার দুঃখ আছে, বিপদ আছে। জীবন যেন সুখ দুঃখের, হাসি, কান্নার বিচিত্র মালা। মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক। ভাগ্যের কাছে সে সম্পূর্ণ অসহায়। তিনি বলেন, হেসে খেলে নাও রে যাদু, দুদিন বইতো নয়। দুঃখকষ্ট ভোগ করে নাও, হে বন্ধু, দুদিন বই তো নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন একটা সাধনার ক্ষেত্র। উচ্চতম স্তরে উন্নয়নের নিম্নতম ধাপ মাত্র। তিনি প্রার্থনা করেছেন—

আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
তাহাদের দৃষ্টি আলো রূপের জগতে
আলোকের পথে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। সেক্সপীয়রের প্রতিভা একমুখী। সেক্সপীয়র ভাষার রাজা। রবীন্দ্রনাথ ভাষার যাদুকর। সেক্সপীয়রের গদ্য গদ্যই, প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্র মাত্র। রবীন্দ্রনাথের গদ্য গতিধর্মী। উপন্যাস ও ছোট গল্প তো দূরের কথা, এমন কি ভাষাতত্ব, বিজ্ঞান ও সমালোচনায় তাঁর ভাষা সহজ সাবলীল প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একমাত্র জার্মান মনীষী গ্যেটে ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনন্য সাধারণ। অধ্যাত্মদৃষ্টির সোনার কাঠি দিয়ে তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদের লৌহদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তিনি যে একটি গভীর শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করেছিলেন তারই প্রসাদে বিশ্বমানবতা বোধের রত্নবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মহামানবের আগমন প্রতীক্ষা করেছিলেন। সেক্সপীয়রের বিরাট সাহিত্য এই বিষয়ে দরিদ্র।

একমাত্র গ্যেটে ছাড়া অন্য কোন কবিকে তাঁর সংগে এক পংক্তিতে স্থান দেওয়া যায় না। এমন কি কবিতার রাজ্যে গ্যেটের স্থান রবীন্দ্রনাথের নীচে। বিশ্বসাহিত্যে সেক্সপীয়র অপরিহার্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনস্তিত্ব কল্পনাতীত।

চর্যাপদের উত্তরসূরী

অমরনাথ পাঠক

অপভ্রংশের নির্মোক অপসারিত করে বাংলা ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তারই আদিমতম নিদর্শন চর্যাগীতি। এই গীতিকাগুলি প্রকাশের সংগে সংগেই পণ্ডিতমহলে যে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল তারই অন্তরালে বহুদিন চাপা পড়েছিল এর কাব্যমূল্য। তার প্রধান কারণ বোধকরি এর ভাষার বহিরঙ্গ কাঠিন্য। এর রসমূর্তিকে উপেক্ষা করে কেউবা 'সন্ধানীর দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে অধ্যাত্মসাধনতত্ত্বের গুহাপথে এগিয়ে গেছেন আবার কেউবা গুহানিহিত ভাষাতত্ত্বের এষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সেই কারণেই এর ভাবমূর্তি তথা রসমূর্তি বহুদিন পর্যন্ত পাঠক সমাজে অবহেলিত ছিল।

চর্যাপদগুলি সাংকেতিক ভাষায় রচিত—যার নাম 'সন্ধ্যা ভাষা'। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম-চরিতের ভাষা থেকেই সন্ধ্যাভাষা নাম হয়েছে কিনা সে তর্ক এখানে অবান্তর। তবে এ হল এক প্রহেলিকাময় ভাষা —যে অর্থটা বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে সেইটাই তার আসল অর্থ নয়। হেঁয়ালীর মত ওর এক গুপ্ত অর্থ আছে। কিন্তু গুপ্ত অর্থ যাই থাক, তার যে অর্থটি স্বপ্রকাশ এবং তার মাধ্যমে যে ভাবের রূপায়ণ তাকে নিয়েই রসানু সন্ধিৎসু সহৃদয়ের কারবার ।।

সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দার্শনিক প্রবর ফিকটে বলেছেন—'লিটা-রেচর ইজ্দি এক্সপ্রেসেন অব এ রিলিজিয়াস আইডিয়া'। বস্তুত কাব্য-সাহিত্য কোনো আক-স্মিক দুর্ঘটনা নয়— তাই শুধু 'রিলিজিয়াস্ আইডিয়া' কেন—মানুষের মনে সমাজ, রাষ্ট্র, তার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যের সৃষ্টি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ-লাগা, তার ভাবতন্ময়তা, আত্মোপলব্ধি—এও সাহিত্যে কিছু খাপছাড়া বস্তু নয়। ভিতর আর বাহির, এ দুই-ই হল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। বাইরেটা এপিক বা ন্যারেটিভ, ভিতরটা লিরিক। চর্যাগীতি এই ভিতরের বস্তু—মন্ময়তার রূপায়ণ—লিরিক।।

লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে—সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সব সময়েই এ মানুষের নিত্যসংগী। আজ আমরা চর্যাগীতি আবৃত্তি করে হয়তো ঠিক লিরিকের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারিনা, কেননা ভাষার কন্টকে রক্তাক্ত হবার আশংকা আছে—কিন্তু যে যুগে এবং যে পরিবেশে এর রচনা তখন এই ভাষাই ছিল সাধারণ মানুষের মুখের বুলি, তাই এর ভাষা তাদের কাছে কোনো সংকটের সৃষ্টি করেনি ।।

বাঙালী চিরদিনের ভাবুক। ভাবুক না হলে গীতিকাব্য রচনা করা যায় না। বাঙ্গালী গানের রাজা—এ কেবল আজকের দিনের কবির কথাই নয়। রবীন্দ্রনাথ সমুচ্ছল গীতিকবিতার উৎস নন—এর উৎস হল চর্যাগীতিকা। চর্যাপদের অন্ধকার গিরিগুহায় যে তটিনীর উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল, বড়ু চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে কখনও বেগে কখনও ধীরে বৈষ্ণবপদাবলী শাক্তপদাবলী—বাউলের কলতানে রবীন্দ্রগীতিকাব্যে তাই পরিণতি লাভ করেছে মাত্র।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ মানুষের মনে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। বসন্তে তার মন হয়ে ওঠে উজ্জ্বল—বর্ষায় হয়ে ওঠে বিষণ্ণ। বর্ষাকাব্যের স্রষ্টা কালিদাস। তাঁর মেঘদূত যুগে যুগে বিরহীর মনে আর্তি তুলেছে। 'স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল' দিবসের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির যে ছায়া-লীন রূপ তা সর্বকালের সর্বমানবচিত্তে অন্যথাবৃত্তি চেতনা জাগায়। 'কন্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণীজনে

কিং পুনদর্দুর সংস্থে'। মুগ্ধচিত্ত মাতাল হয়ে ওঠে। চর্যাপদেও এ অনুভূতির ব্যতিক্রম নেই। আকাশে ঘনকৃষ্ণমেঘের সম্ভার। তার গুরুগুরু নিনাদে চিত্তগজেন্দ্র মাতাল হয়ে উঠেছে।

তিনিএ' পাটে' লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ-মণ্ডল সঅল ভাজই।।
মাতেল চীঅ-গঅন্দা ধাবই।
নির গঅণন্ত তুসে' ঘোলই ।। (১৬)

পদকর্তা 'মহিত্তা'র এ পদে সাধনতত্ত্বের যে গূঢ় ইঙ্গিতই নিহিত থাকনা কেন—ভাবের দিক থেকে

মন মোর মেঘের সংগী
উড়ে চলে দিক দিগন্তের পাড়ে
নিঃসীম শূন্যে
শ্রাবণ বরিষণ সংগীতে
রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্

এই কবিতার কিংবা

গগনে অব ঘণ মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিন-পাতন　　শব্দ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।।

এই পদের ভাবানুভূতির কোনো পার্থক্য নেই—হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে ত নয়ই।

উ'চা উ'চা পাবত তহি' বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। (২৮)

শবরপাদের এই পদে বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির উল্লাসের সংগে শবরী বালার বাসকসজ্জার রূপটি বর্ণিত হয়েছে। গুঞ্জা মালয় ও শিখিপুচ্ছে সুসজ্জিতা শবরী শবরের প্রতীক্ষা করছে উৎকন্ঠিতা হয়ে—তার প্রার্থনা —

উমত সবরো পাগল সবরো
মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।।

রে উন্মত্ত শবর—পাগল শবর, দোহাই তোমার এমন দিনে তুমি আমাকে ভুলে থেকো না—আমিতো তোমারই 'সহজ সুন্দরী'। শবরীর দেহসজ্জার সংগে সংগে সমগ্র বনভূমিও সুসজ্জিতা।

নানা তরুবর মোউলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্র ধারী।।

আলংকারিক বলেছেন —

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্।

অর্থাৎ চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব. কাব্যের বিভাব. অনুভাব ও সঞ্চারীভাব সহযোগে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে রসে পরিণত হয়। আলঙ্কারিক বিচারে শবরীর বিভাব ও প্রাকৃতিক অনুভাব সঞ্চারীভাব সহযোগে এটি শৃঙ্গার রসের একটি চমৎকার কবিতা। বস্তুত এই পদের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ একটিমাত্র ছত্র—"নানা তরুবর মৌউলিক রে গঅণত লাগেলী ডালী।"[৭] বসন্ত সমাগমে

মুকুলিত তরুশ্রেণীর পুলক অনন্ত ব্যোমে পরিব্যাপ্ত আর তাতে যেন মিশে আছে শবরীর যৌবন উল্লাস। এ পদের বাচ্যার্থের অন্তরাকে শবরপাদ কায়াসাধন বা গুহ্যসাধনার কোন প্রক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা হয়তো বলা যাবেনা—কিন্তু প্রকাশনার বাগ্‌যত রীতিতে তিনি যে একটি নিটোল গীতিকবিতা সৃষ্টি করেছেন এ কথার ব্যাখ্যা বোধকরি নিষ্প্রয়োজন। এই ভাবধারার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন।
পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন।।
নীল নীরপর ধীর সমীরণ।
পলকে প্রাণমন খোয়।।

এই কবিতায় প্রকৃতির যৌবন উল্লাস ও গোপিনীদের যৌবন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল চতুর্দশ শতকের এদিকে নয়। এর মাঝে রইলেন জয়দেব গোস্বামী আর প্রাকৃত পৈঙ্গল সদুক্তিকর্ণামৃত আর কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ের কবিকুল। জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে—ভাবে ও ভাষায়। আবার কোথাও কোথাও দু একটি ছত্রে চর্যাপদের প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ছয় সংখ্যক চর্যার —

অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খসহ ন ছাড়অ ভুমুকু অহেরি।।

এই ভাবের মিল আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার আক্ষেপে (দানখণ্ড) ঃ—

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী।।

সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলন কাল ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশক বলে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এতে 'কবি বার'-এর রচিত একটি সংস্কৃত শ্লোকে বাঙালী জীবনের নিরন্তর দুঃখ দৈন্যের বাস্তব চিত্র প্রকট।

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যম উত্তান তৃণ সঞ্চয়ম্।
গণ্ডূ পদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।।

এই চিত্রের প্রতিরূপ ঢেণ্ঢণ পাদের একটি চর্যা (৩৩)—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

সমাজের একপ্রান্তে বাসা— প্রতিবেশী সেই—অর্থাৎ প্রতিবেশীর কোনো সাহায্য প্রাপ্তির আশা নেই। ভাণ্ডারে নেই তণ্ডুলকণা, তথাপি অভ্যাগতর বিরাম নেই। এমনই সংকটময় সংসার। এই কবিতাটির অনুকরণ আছে মুকুন্দরামে, ফুল্লরার বারমাস্যায়—

ধীরে ধীরে কহে রামা যত দুঃখ বাণী।
ভাঙা কুঁড়েঘর তালপাতার ছাউনী।।

সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন —

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি।
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি ॥

সাধন পদ্ধতির আনুষাঙ্গিক হিসাবে কীর্তন ও বাউলের গানের সৃষ্টি বাঙ্গালীর নিজস্ব। এখানে বাঙ্গালীর বিরল অধিকার অনস্বীকার্য। কেননা, এ যে গান—আর গানে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যে একান্তই স্বকীয় এর যাথার্থ তর্কের ঊর্ধ্বে। এই কীর্তন ও বাউল গানের বীজ উপ্ত ছিল বাঙ্গালীর চর্যাগীতিকায়—পরবর্তী কালে সেই বীজ শাখাপ্রশাখা সমন্বিত মহীরুহে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর কীর্তনে ও বাউল মুর্শিদা মারাফতী গানে। বৌদ্ধগানের সম্পাদক শাস্ত্রী মশাই বলেছেন—"গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত—গানের নাম চর্যাপদ।। সে কালেও সংকীর্তন ছিল—এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।" বস্তুত প্রত্যেকটি চর্যার পদশীর্ষে রাগ-রাগিনী ও তাল লয়ের উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই পদগুলি গীত হবার জন্যই রচিত হয়েছিল।।

চর্যাকারেরা ছিলেন সহজিয়া পন্থী। "আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না"—এই ছিল তাঁদের সাধনার পথ। ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। শাস্ত্র উপচার, বিভিন্ন আচার ও উপাসনার বহিরঙ্গ প্রক্রিয়ায় তাঁদের আস্থা ছিল না। দোহাকার বলেছেন—

এসো জপহোমে মণ্ডল কম্মে।
অণুদিন অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে।।
তো বিণু তরুণী নিরন্তর ণেহে।
বোধি কি লবভই এণ বিণ দেহে ।।

—ওরে তরুণি, তোর এই সব জপ-হোম ইত্যাদি মঙ্গলকর্ম নিয়ে বাহ্যিক ধর্মেই দিন কাটালি! তুই কি জানিস না যে প্রেম ছাড়া মুক্তি নেই? এই দেহে প্রেম বিনা কি জ্ঞানলাভ হয়?—

না, সত্যিই তা হয় না, তাই যদুনাথ বাউল বলেছেন —

নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন।
তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ।।
যদুনাথ বাউল বলে শুন শুন সাধুজন।
কেন আত্মতীর্থ ত্যজ্য করে মিছে তীর্থ পর্যটন ।।

এত স্পষ্টতই" দেহহিং বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই" উক্তির প্রতিধ্বনি।।

শুধু বাউল নয়—এই কথারই পুনরুক্তি শোনা যায় রামপ্রসাদে

আপনাতে মন আপনি থাকো যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবে এইখানেই পাবে খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে ।।

সরহপাদ আর একটি চর্যায় বলেছেন—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপর্ণা ।।
অম্হে ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।।
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥

ঠিক এই কথাই বাউল বলেছেন তাঁর গানে —

মন্ত্রতন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ

দেবে সে কি ধরা
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা ।।

বর্ণাশ্রমবিরোধী ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের পরিপন্থী সর্বসংস্কারমুক্তির যে বাণী সিদ্ধাচার্যদের রচনায় পাওয়া যায়—বাংলার লোকসাহিত্যে, বৈষ্ণব কবিতায় এবং শাক্ত সাহিত্যে তারই রেশ রয়ে গেছে। হাজার বছর আগেকার ভাবধারা আজও বাংলার গানে, কবিতায় ও সাহিত্যে নিজের পথ বেয়ে সমানে এগিয়ে চলেছে। হয়তো বা নিজের গতিপথে কোথাও কোথাও কখনও ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

ভাবের প্রভাব ছাড়াও ভাষা ও বাঙনির্মিতির ক্ষেত্রে চর্যাপদে যে আঙ্গিক কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে তারও যথেষ্ট প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান।

প্রথমত, এর ছন্দ। সংস্কৃতের পজ্জটিকা ছন্দে, প্রতিছত্রে মাত্রা সংখ্যা ষোল। কিন্তু এর গণনা হয় অক্ষর অনুসারে, অর্থাৎ এ হল অক্ষরমাত্রিক। চার মাত্রার মূল চারটি পর্বে এর চরণ গঠন করা হয়। মম পারে । সমুদ্রস্য । লংকা নাম । পুরী শুভা

এই ছত্রটিতে চারমাত্রার মূল পর্বটি চারবার আবৃত্ত হয়ে ষোলমাত্রার সৃষ্টি করেছে। এই পজ্জটিকা ছন্দেরই এক রূপ পাদাকুলক ছন্দ। বস্তুত অপভ্রংশ ও পাদাকুলক একই লক্ষণাক্রান্ত—এতে স্বরের লঘুগুরু নিয়ম নেই—'লঘুগুরু একক নিম্ন নহি জেহা।····সোরহমত্তা পাআকুলঅং। পাদাকুলককেই পজ্জটিকা ছন্দ বললে কোনো ক্ষতি হয় না। চর্যাপদেও ছন্দের এই নিয়মের অনুসৃতি। পার্থক্য এই যে চর্যাপদের ছন্দ অক্ষরমাত্রিক নয়, ধ্বনি মাত্রিক :—

সোণে । ভরিতি । করুণা । নারী
রূপা । থোই । নাহিক । ধাবী ।

এখানে প্রতি চরণে ষোল মাত্রা—প্রতি পর্বে চার মাত্রা এবং স্বভাবমাত্রিক ও প্রভাবমাত্রিক দুরকমের দীর্ঘীকরণই মেনে নেওয়া হয়েছে। এই পাদাকুলক ছন্দেরই নবতর রূপ পয়ার ছন্দে। একে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে 'বৃত্তছন্দ'।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥

এই চরণদুটিতে =রব= পর্যন্ত আট মাত্রা এবং তারপর বাকীটুকু ছয় মাত্রা—মোট চৌদ্দ মাত্রা। কিন্তু চৌদ্দ মাত্রা হলেও প্রথম পংক্তি আবৃত্তি করার পর দ্বিতীয় পংক্তিতে আসবার সময় নতুন করে দম নিতে হয়—আর সেই ফাঁকটুকুতে বাকী দুমাত্রা পূরণ হয়ে যায়।

পাখী সব করে রব / রাতি পোহাইল ০—০
কাননে কুসুম কলি / সকলি ফুটিল—০—০

বস্তুত একেও চতুর্দশাক্ষরী বৃত্তি বলা যেতে পারে। যাইহোক, এই ছন্দের প্রভাব জয়দেবে আছে—আবার রবীন্দ্রনাথেও আছে। যেমন,

জয়দেবের—মুহুরব । লোকিত । মণ্ডন । লীলা
মধুরিপু । রহমিতি । ভাবন । শীলা ।
রবীন্দ্রনাথের—জজ বলে । বিড়ালটা । কী রকম । জানা চাই ।
আইডেন । টিটিতার । আদালতে । আনা চাই ॥

এর সঙ্গে লইপাদের চর্যাটি একই সঙ্গে পড়া যেতে পারে—

কায়া । তরুবর । পঞ্চবী । ডাল?
চঞ্চল। চীত্র। পইঠো। কাল

চর্যাপদের সর্বত্রই হয়তো মাত্রাসমকত্ব পাওয়া যাবে না, তার কারণ ঘাটতি মাত্রাগুলো সুরের রেশে ভরাট হয়ে যেত। এ ছাড়া বাংলা ত্রিপদী ছন্দেরও আদিরূপের পরিচয় চর্যাপদে আছে।

বাহতু ডোম্বী　　বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা ।
সদ্‌গুরু পাঅ　　পসাএ যাইব
পুণু জীণুআরা ॥

বাংলা কবিতা থেকে এর নিদর্শন উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। কিন্তু চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ অবদান অন্ত্যানুপ্রাস। সংস্কৃতে অন্ত্য মিল নেই। চরণান্তিক মিলের এই রীতির আদিম উৎপত্তি চর্যাগীতিকায়। পূর্বোদ্ধৃত পদগুলি লক্ষ্য করলেই তা দেখা যাবে॥

বাংলা কাব্যে চতুর্দশপদাবলীর স্রষ্টা মধুসূদন। বলাই বাহুল্য মধুসূদনের চতুর্দশ-পদাবলী কবিতা কেবলমাত্র চৌদ্দটি পংক্তির সমষ্টি নয়। মধুসূদনের চতুর্দশপদাবলীর প্রাণশক্তি তার সনেটের বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু চৌদ্দটি পংক্তিতে একটি পদ গঠনের আদিরূপ আছে চর্যাপদের পঞ্চাশ সংখ্যক চর্যায়। সমগ্র পদটি উদ্ধার করা যেতে পারে—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী॥
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সে রে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিসা॥
কঙ্গুচিনা পাকেলারে শবরশবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহে ডোলা॥
চারিবাসে গড়িলারে দিআ ডঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণশিআলী।।
মারিল ভবনত্তারে দহদিহে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিবেরণ ভইলা ষবরালী॥

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সনেটের মত=ত-ম, ম-ত, ত-ম, ম-ত, গ-গ-ন, গ-গ-ন= রীতিতে স্তবক গঠিত হয়নি, কেবলমাত্র =ত-ম= মিলের সাতটি যুগ্ম-চরণে কবিতাটি গঠিত হয়েছে। আধুনিক চতুর্দশপদাবলীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই—কেবলমাত্র আছে চৌদ্দটি ছত্র। তাহলেও এই পদটিকে চতুর্দশপদাবলীর আদিমতম রূপ বলা যায় না কি?

আলঙ্কারিকেরা সারস্বতেয় কাব্যপুরুষের বর্ণনায় ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলীকে তার শরীর বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যের এই পদাবলী—শরীরকে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় রূপকে-যমকে সুচারুরূপে সাজিয়ে দিতে পারলে তার সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে যায়। চর্যাপদের অলঙ্কার আলোচনায় দেখা যায় যে, যে সব অলঙ্কার পদকর্তারা প্রয়োগ করেছেন, তা সবই আমাদের ঘরের

পাশের বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার প্রযুক্তি বুঝতে হ'লে ও শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান থাকা চাই। 'নদীবীতিষু ভ্রূবিলাসান্,' কিংবা 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং' অথবা 'শিষশং বর্হভাবেষু কেশান্' বা আর একটু সমাসের দিকে এগিয়ে গেলে 'শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্' এই সব অলঙ্কারের বোধগম্যতা অনুশীলন সাপেক্ষ, কিন্তু চর্যাপদে ব্যবহৃত অলঙ্কার একান্তই লৌকিক, যাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক পরিচয় ঘটছে। পাশা খেলা, নৌকা বাওয়া, সাঁকো তৈরী, হরিণ শিকার—এই সব লোকায়ত উপমা চর্যাগীতিতে স্থান পেয়েছে। এর প্রয়োগকৌশল বুঝতে শিক্ষিতপটুত্বের প্রয়োজন নেই। অলঙ্কার প্রয়োগের এই যে সহজ রীতি, এর অনুসৃতি ঘটেছে শাক্তপদাবলীতে ও বাউল গানে এবং পল্লীসংগীতে। শাক্তপদকর্তারা কামারশালা, কলুর ঘানি, ঘুড়ি ওড়ানো—প্রভৃতি সাধারণবোধ্য উপমা রূপকে তাঁদের তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করেই কাব্য গড়ে ওঠে, ফিকটের পূর্বকথিত মতের যৌক্তিকতা এখানেই, তাই কাব্য হ'ল ধর্মতত্ত্বের রসভাস্য। সেই তত্ত্বের রসরূপ দিতে গেলে তাকে জনচিত্তে আবেদনশীল করে তোলা চাই; সেই জন্যই চর্যাকারগণ—স্বভাবতই পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন থেকে উপমা রূপক গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের ব্যবহৃত এই সব চিত্র সমাজ জীবনের নিখুঁত ছবি। এই একই সত্য শাক্তপদাবলী ও বাউলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের এই যে ভাবগত ও রূপগত প্রভাব, এর কোনোটিই অবশ্য প্রত্যক্ষ নয়। সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব হিসাবে চর্যাপদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকা উচিত জয়দেবে বা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে—কিন্তু তাও নিতান্তই যৎসামান্য। তাছাড়া এই রকম প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভবও নয়, কেননা চর্যাপদের যুগের পরই বাংলায় যে রাষ্ট্রিক বিপর্যয় নেমে আসে তাতে চর্যাপদ হারিয়ে যায়—তার প্রমাণ এ পদসংগ্রহের আবিষ্কার নেপাল থেকে। তারপর কতকাল কেটে গেছে, এর মধ্যে চর্যাপদের প্রভাব গণমানসে থাকা সম্ভব নয়—ছিলও না। "সোণে-ভরিতী করুণা নাবী" (৮নং চর্যা) রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী'র প্রেরণা—এ শুধু অযৌক্তিক নয়—অশ্রদ্ধেয়। তবু বাঙালীর যে মনোভূমিতে চর্যাগীতির জন্ম, সেইখানেই বৈষ্ণবপদাবলী,—শাক্ত-পদাবলী ও রবীন্দ্র কাব্যের জন্ম। তাই এ'রা সবাই সমগোত্রীয়—আর চর্যাকারেরা চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ,, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজস্থানীয়।

দ্বারকানাথ ও শিক্ষা আন্দোলন

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী-বাংলা অভিধানের লেখক রামকমল সেন বলেছেন যে, ইংরাজের জাহাজ যখন প্রথম কলিকাতায় আসে, তখন তার কাপ্তান এক 'দোভাষিয়া' চেয়েছিলেন। কথাটা বুঝতে না পেরে লোকে এক ধোবা এনে হাজির করেছিল। সেই প্রথম ইংরাজী বলা বাঙ্গালী। তারপর থেকে গুটিকতক লোক কাজ চালানোর মত ইংরাজী শিখত, কিন্তু কোম্পানীর সরকার ইংরাজীর প্রসারটাকে ভালো চোখে দেখতেন না। অনেকের ধারণা যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষাটা ইংরাজ নিজের সুবিধার জন্য গায়ের জোরে চালু করেছিলেন—কিন্তু দেখলে দেখা যায় বরঞ্চ তার উল্টোটাই সত্যি। এদেশের লোকেরা জ্ঞানের পথ হিসাবে ইংরাজী ব্যগ্রভাবে শিখেছে—ইংরাজদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে সাহায্য করেছেন সন্দেহ নাই, তবে তার চেয়ে বেশী ইংরাজ (অন্ততঃ গোড়ার দিকে) বাধা দিতেই চেষ্টা করেছেন।

১৭৯২ খৃঃ নতুন সনদ পাশের আগে যখন পার্লামেণ্টে আলোচনা হয় তখন দাসপ্রথা-বিরোধী উইলবারফোর্স ভারতবর্ষে ইংরাজ শিক্ষক পাঠাবার অনুরোধ করেন। তাতে কিন্তু কেউই সে সময়ে কর্ণপাত করেনি। সে সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অংশীদার বলেছিলেন যে "মাতৃভূমি গ্রেটব্রিটেন থেকে আমেরিকা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার সবচেয়ে মোক্ষম ও প্রধান কারণ হল সেখানকার বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষায়তন ও কলেজ খোলা। ভারতবর্ষের বেলা বিচক্ষণ ব্যবসাবুদ্ধি বলে যে, যে পথে চলে লুকানো পাথরে আমেরিকায় আমাদের তরী ডুবেছে, সে পথ পরিহার করা।"

ভারতবর্ষে কোম্পানী তখন ভারতীয়দের আরবি, ফার্সী ও সংস্কৃত শিখতে উৎসাহিত করতেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন।

ইংরাজদের মধ্যে যাঁরা এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাঁরাও ইংরাজী জানা দেশীয়দের সে সময়ে বিশেষ আমল দিতে চাইতেন না। ১৭৮৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ত্রিশজন ইংরাজকে নিয়ে এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হয়। তখনও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত বিদ্বান পণ্ডিত বেঁচে। তবু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের আগে কোন ভারতীয়কে সভ্য করবার প্রশ্ন ওঠে নি।

১৮১১ সালের ১১ই মার্চ লর্ড মিণ্টো লেখেন যে পণ্ডিতদের সংখ্যা যে কমে যাচ্ছে শুধু তাই নয়, পণ্ডিতদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের মানও ক্রমশঃ কমে আসছে। এ্যাব্স্ট্রাক্টসায়েন্স পরিত্যক্ত, ভদ্র সাহিত্য অসম্মানিত। সাধারণ লোকের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অংশটুকু ছাড়া আর কোন রকম বিদ্যারই আর চর্চা নাই। সরকারী সাহায্য না পেলে উপযুক্ত বই এবং সেগুলির ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে শিক্ষার পুনর্বিকাশ হয়ত কোন দিন আর সম্ভব হবে না। এই বলে তিনি ত্রিহুত ও নবদ্বীপে দুটী সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

এর পর ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানীর সনদ নতুন করবার সময় শিক্ষাবিস্তার ও ভারতীয় পণ্ডিতদের উৎসাহার্থে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারার্থে বৎসরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার আদেশ হয়, তখন সেখানেও ইংরাজী শিক্ষার কোন উল্লেখ নাই। পরে যখন ইংরাজীর

মাধ্যমে পড়া হবে কি না সে প্রশ্ন ওঠে তখন এই উল্লেখ নেই বলে একাধিক সাহেব ইংরাজীর প্রচারে বাধা দিতে প্রয়াসী হন।

১৮১৪ সালের এক ডেস্‌প্যাচে কোম্পানীর ডিরেক্টররা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংশ্লিষ্ট কলেজের মতন বিলাতী কায়দার কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বেশ জোরের সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছেন।

এর পরেও লর্ড আমহার্স্টের সময়েও দেখি কলিকাতায় সরকারী সংস্কৃত কলেজ খোলার কথা হচ্ছে জেনে রামমোহন রায় বড়লাটকে চিঠি লিখছেন, "আমরা বিশেষ আশা করেছিলাম যে ঐ টাকা বিদ্বান ইউরোপীয় শিক্ষকদের দ্বারা ভারতীয়দের—পাশ্চাত্যদেশে যার চরম বিকাশ হয়েছে এবং যার সাহায্যে তারা জগতের অন্যান্য সব দেশের উপরে উঠতে পেরেছে সেই—গণিত, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা, দর্শন এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখানো হবে। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে জ্ঞানালোকের বিকাশের এই আশায় আমরা উৎফুল্ল হয়েছিলাম। এখন দেখছি সরকার, হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে যে বিদ্যা এতকাল এদেশে প্রচলিত আছে, সেই বিদ্যাশিক্ষালয়ের জন্যই, সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। এখানে ছাত্রেরা দু-হাজার বৎসর আগেও যা জানা ছিল এবং সন্দিগ্ধমনারা যে বৃথা টিপ্পনী ও কূটতর্ক তার উপর চাপিয়েছেন—সেটুকুই শিখবে।"

সরকার যখন সে কথা কানে নিলেন না তখন রাজা রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা' বা অন্যান্যভাবে তরুণদের মধ্যে একটা পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিবেশক সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে লাগলেন। সেই সময় ডেভিড্ হেয়ার সাহেব এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ১৮১৬ সালে 'আত্মীয়সভা'র এক অধিবেশনে এসে উপস্থিত হলেন এবং সভার পর দুজনে নানা বিষয়ে আলোচনাকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবের খসড়া তিনি কয়েকজন সভ্যকে দেখান। দ্বারকানাথ তখন 'আত্মীয়সভা'র নিয়মিত সভ্য—কিন্তু তখনও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ বিস্তার হয় নি, লাটবেলাটের সঙ্গে তখনও ঘোরাফেরা আরম্ভ হয় নি। তার বয়স তখন ২২ বছর মাত্র। আত্মীয়সভার আরেকটি সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগে রোজ সকালে বেড়াবার সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি হেয়ার সাহেবকে কিছু না বলেই প্রস্তাবটি জজসাহেবকে দেখান ও এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সম্বন্ধে হাইড সাহেব বিলাতে তাঁর বন্ধু জে, হ্যারিংটনকে যে চিঠি লেখেন (সম্ভবতঃ ১৮মে ১৮১৬) তাতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথমাংশের ইতিহাস বেশ পাওয়া যায়—

"About the beginning of May, a Brahmin of Calcutta, whom I know, and who is well-known for his intelligence among the principal native inhabitants and also intimate with many of our own gentlemen of distinction called upon me and informed me that many of the leading Hindoos were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner as practical by Europeans of condition and desired that I would lend them my aid towards it by having a meeting held under my sanction....I communicated to the Government what had passed....and they (members of the Supreme Council) signified that they saw no objection to the parties meeting at my house.....the meeting was held at my house on the 14th of May, 1816 at which 50 and upwards of the most respectable Hindoo inhabitants of rank and wealth attended, including also the principal Pundits, when a sum of nearly

half a lac of rupees was subscribed and many more subscription were promised ......all expressed themselves in favour of making the acquisition of the English language a principal object of education together with its moral and scientific productions.

Talking afterwards with several of the company.....I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly set against Rammohan Roy..... (who has lately written against the Hindu idolatry, and upbraids his countrymen pretty sharply). He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohan Roy. I asked, why not? 'Because he has chosen to seperate himself from us, and to attacks our religion.' 'I do not know', I observed 'what Rammohan's religion is', (I have heard it is a kind of Unitarianism)—'not being acquainted or having had any communication with him; but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking.' This I said in a tone of gaity; and he answered readily in the same style, 'No, not at all; we shall be glad of your money; but it is a different thing with Rammohan Roy; who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion.......''

অতঃপর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের বিশে জানুয়ারী গরাণহাটায় বর্তমানে যেখানে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী সেইখানে হিন্দু কলেজের পত্তন হল। লর্ড হেস্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষক হলেন। ১৮৫৩ সালে পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কাছে ডাফ্ সাহেব স্বীকার করেছেন যে যতদূর তিনি জানেন পাশ্চাত্য ধরনের ভারতীয় বিদ্যালয় সারা ভারতবর্ষে এই প্রথম। এই কলেজের জন্য কলিকাতার ধনীগণ ১,১৩,১৭৯ টাকা চাঁদা ওঠান। সবচেয়ে বেশী টাকা দেন বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র আর গোপীমোহন ঠাকুর—সেজন্য তাঁরা কলেজের গভর্নিং বডির বংশপরম্পরায় সদস্য হন। ১৮২২ সালে কলেজের প্রকাশিত নিয়মাবলীতে দেখি যে কেহ ১০,০০০ দিলে একটী ছাত্র বিনা বেতনে পড়াইতে পারিবেন। শোনা যায় যে দ্বারকানাথের একটি এইরূপ ছাত্র পাঠাইবার অধিকার ছিল। ঐ নিয়মাবলীর প্রথম পৃষ্ঠায় অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে দ্বারকানাথের নাম দেখি। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর।

১৮২৪ সালে কলেজের টাকা যে কোম্পানীর কাছে গচ্ছিত ছিল, সেই কোম্পানী দেউলিয়া হওয়াতে তেইশ হাজার টাকা বাদে আর সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন কার্য নির্বাহক কমিটি সরকারী সাহায্য চাইলেন। সরকার সাহায্য করলেন বটে কিন্তু প্রকারান্তরে শাসন কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নিলেন। কলেজ নতুন প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের (যার বিরুদ্ধে রামমোহন আপত্তি জানিয়েছিলেন) একাংশে ১৮২৫ খৃঃ অবস্থিত হল। নতুন নিয়ম অনুসারে হোরেস হেমান উইলসন সাহেব কলেজের পরিদর্শক হলেন এবং কলেজটাকে সুচারুরূপে চালু করলেন। দ্বারকানাথ কার্যনির্বাহক কমিটির একজন উৎসাহী সভ্য হিসাবে কলেজের শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে উইলসন ও হেয়ার সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

১৮৩০ সালে বেন্টিংকের সময় দেশের শাসন কার্য্যের জন্য উপযুক্ত দেশীয় লোকের অভাব দেখা যেতে ইংরাজী শিক্ষার দিকে অধিকতর ঝোঁক দেওয়া আরম্ভ হল। লর্ড ও লেডী বেন্টিংক হিন্দু কলেজে প্রায়ই আসতেন। ইংরাজীশিক্ষা যেরকম সফলতার সঙ্গে এই কলেজের

দ্বারা প্রসার পাচ্ছিল তাতে লর্ড বেন্টিংক খুব খুশীই ছিলেন। ১৮৩২ সালের ১৪ই জানুয়ারী কৃষ্ণনগর থেকে তিনি লেখেন যে বিচারের কালে তিনি ইংরাজীর ব্যবহার বাড়াতে চান। বেন্টিংক নিজে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আনুকূল্যেই অনেককাল দোনামনার পর সরকার ইংরাজীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করতে মনস্থ করলেন। লাটসাহেবের শিক্ষা দপ্তরে কর্তা মেকলে লিখলেন —

In seems to be admitted that the intellectual improvement of those classes of people who have the means of pursuing higher studies can at present be effected by means of some language not vernacular amongst them. What then shall that language be? One half of the committee maintain that it should be English. The other half strongly recommend Arabic and Sanskrit, which language is the best worth knowing?.....English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seat of Government. It is likely to be the language of commerce throughout the seas of the East......As soon as the code is promulgated the Shasters and the Hedaya will be useless to a Mounsiff or a Sudder Ameen (Indian Judicial Officers). It is manifestly absurd to educate the rising generation with a view to a state of things which we mean to alter before they reach manhood.....the advocates of oriental learning designate the education which their opponents recommend as a mere spelling book education. There are in this very town natives who are quite competent to discuss political or scientific questions with fluency or precision in English language. Indeed it is unusual to find even in the literary circles of the continent any foreigner who can express himself in English with so much facility and correctness as we find in many Hindus .....It is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars.....Less than half the time which enables an English youth to read Herodotus and Sophocks ought to enable a Hindu to read Hume and Milton. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions. To that class we may have to refine the vernacular dialects and, to render them fit vehicles for conveying western knowledge." ১

দ্বারকানাথের সঙ্গে বেন্টিংক ও মেকলের বেশ হৃদ্যতা ছিল। দ্বারকানাথের কাছে মেকলে সাহেব বিলাতেও বন্ধুভাবে আনাগোনা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসারের ব্যবস্থায় দ্বারকানাথের পূর্ণসহযোগিতা ছিল ধরে নেওয়া যায়।

১৮৩৪ সালে হিন্দু কলেজের এক সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথের নাম পাওয়া যায়। তখন পরীক্ষকরাও যোগ্যতাপত্রে সই করতেন এর উদাহরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী পুস্তকে ১৮৪৭ সালে প্রদত্ত মেডিকেল কলেজের যে প্রশংসাপত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতেও আছে। তখনকারকালে পরীক্ষকদের কেবলমাত্র শিক্ষকদের মধ্যে থেকেই যে নেওয়া হত তা নয়। ১৮৩৯ সালের হিন্দু কলেজের পরীক্ষকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর লর্ড অকল্যাণ্ড।

১ ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থার ইংরেজী সম্বন্ধে তথ্যগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক পুস্তকে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

হিন্দুকলেজ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হল তখন দ্বারকানাথ ইহজগতে নাই। এই প্রসঙ্গে একটী ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে। যখন রামমোহন রায় হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে একটী ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তখন দ্বারকানাথ তাঁর বড় ছেলেকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দেন—হিন্দু কলেজে পাঠান নাই। পরে "১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাত গমনের উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া আর নিজে বিদ্যালয়ের প্রতি উপযুক্তরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই পরামর্শ অনুসরণে এই বৎসর নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি সতীর্থের সঙ্গে (দেবেন্দ্রনাথ) হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।"

সে সময়ে হিন্দুকলেজ বাংলাদেশের সামাজিক বিপ্লবের একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফরাসী বিপ্লববাদীদের শিষ্য ডিরোজিও তখন হিন্দুকলেজের চতুর্থশ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি প্রচলিত ধর্মেরও সমাজের বন্ধন ছেদ করতে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীতে ভর্তি হন নাই। এর কয়েকমাস বাদেই ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়তে হয়। সেই 'ফরমেটিভ্ ইয়ারস্' এ দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর আওতায় এলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস কি হত বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা ধর্মহীন ছিল বলে দ্বারকানাথ খুব খুসী ছিলেন না। হিন্দুকলেজের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ও ধর্মশাস্ত্রের গভীরতর অধ্যয়ন যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথের চেষ্টায় ঐ কলেজের অধীনে "কলেজ পাঠশালা" নামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪০ সালের ২০ জানুয়ারী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ভারতীয়দের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত ঐ পাঠশালা "প্রকৃতপক্ষে একটা উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠ" ছিল। দ্বারকানাথের এই পাঠশালাকে ১৮২৬ সালে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলা চলে।

হিন্দু কলেজের শিক্ষা ধর্মহীন বলেই বোধহয় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যেও এর উপর চটা ছিলেন। শুধু হিন্দু কলেজ কেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা তার সঙ্গে ক্রিশ্চান ধর্মের প্রসারের বিশেষ সুবিধা ছিল না বলে এইসব লোকদের উপরেও তাঁর আক্রোশ কম ছিল না। ডেভিড হেয়ারকে গোলদিঘীর কোনায় কবর দেবার সময় প্রচন্ড ঝড় জল উপেক্ষা করে যখন সবস্তরের ভারতীয়রা ভীড় করে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল তখন —"K. M. Banerji was conspicuous by his absence. To David Hare, to whose kindness he was greatly indebted for his education in the Hindu College, the Rev. K. M. Banerji cherished no feeling of respect, as Hare was a great friend of the Hindus."

"The secrecy of his absence was that David Hare was no admirer of orthodox Christianity, and never liked the idea of conversion of the Hindus to Christianity.

"With a view to convert the students of Hindu College", Rev. Banerji, once thought of establishing a Church in the vicinity of it at the present site of Presidency College. He arranged secretly for the construction of the church, when at the eleventh hour when the foundation stone of it was about to be laid the secret became known to David Hare, Radhakant Deb, Ramcomal Sen, Dwarkanath Tagore and Mutty Lal Seal who represented the matter to Lord Auckland, and the Rev. Banerji's design fell to the ground. At last the Church was built on the Western side of the Hedua tank."

এসব ছাড়া দ্বারকানাথ দেশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নানা ইস্কুলকে অর্থসাহায্য করতেন। ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা যায় যে ভুবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন, রাধানাথ পাল প্রভৃতি মিলে যে হিন্দু ফ্রী স্কুল স্থাপন করেছিলেন তার জন্য চাঁদা চাওয়াতে দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্বাধিক টাকা দেন।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও দ্বারকানাথের অর্থে পুষ্ট। কলিকাতায় ও পরে বাঁশবেড়িয়াতে দ্বারকানাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পাঠশালা চলেছিল। তার কিছুদিন বাদেই বাড়ী ও বাগান ডাফ্ সাহেবের মিশন কিনিয়া লন।

এ ছাড়াও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বারকানাথ এককালীন বা বাৎসরিক দান করেছেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিয়েছেন।

মতিলাল শীলের ছেলেকে হিন্দু কলেজে অপমান করায় তার উত্তরে মতিলাল শীল, শীলস্ ফ্রী কলেজ খুললেন। তার প্রতিষ্ঠাদিবস (১লা মার্চ ১৮৪৩) দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে সদ্য আগত বাগ্মী জর্জ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে দেখি রেভারেণ্ড কে. এম, বাঁড়ুয্যে, বিশেষ ব্যারিষ্টারগণ ও সেন্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যাপকেরা। সেন্টজেভিয়ার কলেজের মিঃ জনসন সাহেব এর প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট গ্লষ্টার মিলের ইস্কুলের পরীক্ষা নেন দ্বারকানাথ। শ্রী ও শ্রীমতী অর এবং আরো কয়েকজন দেশী ও বিলাতী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইস্কুলটিতে গ্লষ্টার মিলের কর্মচারী, সরকার, বেনিয়ান প্রভৃতির পঞ্চাশজন ছেলে লেখাপড়া শিখিত। ইস্কুলটা চালাবার খরচ আংশিকভাবে দিতেন মিলের মালিক মিষ্টার অর ও জেনারেল এসেম্বলী অফ চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড আর বাকীটা দিতেন অভিভাবকরা। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাত্রদের উন্নতিতে খুব খুসী হয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ বদান্যতায় বাৎসরিক পরীক্ষায় পুরস্কার দেবার বই কেনবার জন্য প্রত্যেক বৎসর পঞ্চাশ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। ২

দ্বারকানাথ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আর্কবিশপ কেরু দ্বারকানাথকে এক চিঠিতে লিখছেন—"আমার স্থির ধারণা যে যতদিন না দেশীয় সমাজ তাদের কন্যাদের প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষা দেবার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবে ততদিন আপনার চেষ্টা, যতই সাধু বা উদার হোক না কেন, নিষ্ফল হইবেই। আপনি জেনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পীড়িতা মহিলাদের শুশ্রূষার জন্য "লরেটো লেডিজ"দের অবৈতনিক সেবাকার্যে নিযুক্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমার বিশেষ আশা যে এই নূতন কাজে যাদের যন্ত্রণা লাঘব করবে সেই সব দেশীয় মহিলাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহারা অর্জন করিবে। আমার বিশ্বাস যে এইভাবে দেশীয় সমাজে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হলে ভবিষ্যতে দেশীয় মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারে আপনার চেষ্টা সফল হবে। এই সঙ্গে একথা জানাতে চাই যে মহানুভবতার সঙ্গে দয়া করে আপনি সেন্ট টমাস গির্জাকে যে ঘড়িটী অঙ্গীকার করেছেন, আমার ইচ্ছা যে এটির জন্য আপনার বিচক্ষণ বিবেচনা অনুসারে যা ন্যায্যমূল্য মনে করবেন, তার অধিক ব্যয় করবেন না।"

---

১ বেঙ্গল হরকরা ৪ঠা মার্চ ১৮৪৩

২ কলিকাতা কুরিয়ার ৭ই জুন ১৮৪১

এই সেন্ট টমাস গির্জাটি লোরেটো হাউস কন্‌ভেন্টের পাশেই অবস্থিত। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে যে সেন্ট টমাসের গির্জা আছে সেটা বিশপ টার্ণারের চেষ্টায় ১৮৩০ সালে আরম্ভ হয়ে ১৮৩৩ সালে বিশপ উইলসানের সময় সম্পূর্ণ হয়। এ গির্জাটি ফ্রী স্কুল চার্চ্চ নামেই সমধিক পরিচিত ছিল।

হিন্দু কলেজ ছাড়া কলিকাতার আরেকটি শিক্ষায়তনের সঙ্গেও দ্বারকানাথ প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন সেটী হল মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য-চিকিৎসার প্রসারে দ্বারকানাথের চেষ্টা সম্বন্ধে পৃথক ভাবে বলবার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
বিধু	ঐ	জীবিত ও মৃত	ঐ
বিধুভূষণ	ঐ	তারাপ্রসন্নের কীর্তি	পঞ্চদশ
বিধুভূষণ	হাস্য-কৌতুক	একান্নবর্ত্তী	ষষ্ঠ
বিধুমুখী	শোধ-বোধ		সপ্তদশ
	ও		ও
	কর্মফল		দ্বাবিংশ
বিনয়	গোরা		ষষ্ঠ
বিনুদা	গল্পগুচ্ছ	অপরিচিতা	ত্রয়োবিংশ
বিনোদ	ঐ	প্রতিহিংসা	বিংশ
বিনোদ বিহারী	গোড়ায় গলদ		তৃতীয়
	ও		ও
	শেষরক্ষা		উনবিংশ
বিনোদিনী	গল্পগুচ্ছ	পুত্রযজ্ঞ	একবিংশ
বিনোদিনী	চোখের বালি		তৃতীয়
বিন্দু	গল্পগুচ্ছ	স্ত্রীর পত্র	ত্রয়োবিংশ
বিন্ধ্যবাসিনী	ঐ	প্রায়শ্চিত্ত	উনবিংশ
বিপাশা	তপতী		একাদশ
বিপিন	নৌকাডুবি		পঞ্চম
বিপিন	প্রজাপতির নির্বন্ধ		চতুর্থ
	ও		ও
	চিরকুমার সভা		ষোড়শ
বিপিন	বৈকুণ্ঠের খাতা		চতুর্থ
বিপিন কিশোর	গল্পগুচ্ছ	সদর ও অন্দর	দ্বাবিংশ
বিপিনবিহারী	ঐ	সমস্যাপূরণ	অষ্টাদশ
বিপ্রদাস	ঐ	ত্যাগ	সপ্তদশ
বিপ্রদাস	যোগাযোগ		নবম
বিভা	তিন সঙ্গী	রবিবার	পঞ্চবিংশ
বিভা	বৌ-ঠাকুরানীর হাট গল্প		প্রথম
	ও		
	প্রায়শ্চিত্ত। নাটক।		নবম
	পরিত্রাণ। নাটক।		বিংশ
বিভাবতী	গল্পগুচ্ছ	চোরাইধন	চতুর্বিংশ
বিভাসিনী	বাঁশরি		ঐ
বিভূতি	মুক্তধারা		চতুর্দশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
বিভূতিভূষণ	গল্পগুচ্ছ	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	দ্বাবিংশ
বিমলা	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
বিরাজদত্ত	অরূপরতন		ত্রয়োদশ
বিরূপাক্ষ	রাজা		দশম
বিল্বন	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
বিশু	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
বিশ্বজিৎ	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বিশ্বপতিবাবু	গল্পগুচ্ছ	পাত্র ও পাত্রী	ত্রয়োবিংশ
বিশ্ববসু	রাজা		দশম
বিশ্বম্ভর	গল্পগুচ্ছ	ছুটী	সপ্তদশ
বিশ্বম্ভর	অচলায়তন ও গুরু		একাদশ ও ত্রয়োদশ
বিশ্বম্বর চাটুজ্যে	গল্প-গুচ্ছ	তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি	পঞ্চদশ
বিশ্বেশ্বর		মুক্তির উপায় [নাটক]	ষড়বিংশ
বিষণ	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বিহারী	চোখের বালি		তৃতীয়
বুধন	মুক্তধারা		চতুর্দশ
বৃন্দাবন কুণ্ডু	গল্প-গুচ্ছ	সম্পত্তি সমর্পণ	ষোড়শ
বৃহস্পতি	ব্যংগ-কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
বেণী চক্রবর্তী	গল্প-গুচ্ছ	বোষ্টমী	ত্রয়োবিংশ
বেনু গোপাল	ঐ	মাষ্টার মশায়	দ্বাবিংশ
বৈকুণ্ঠ	বৈকুণ্ঠের খাতা		চতুর্থ
বৈদ্যনাথ	হাস্য-কৌতুক	রোগীর বন্ধু	ষষ্ট
বৈদ্যনাথ	গল্প-গুচ্ছ	পুত্রযজ্ঞ	একবিংশ
বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	ঐ	স্বর্ণমৃগ	সপ্তদশ
ব্রজ	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
ব্রজ সুন্দরী	গল্প-গুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	ঐ
ব্রজ সুন্দরী	ঐ	দান প্রতিদান	সপ্তদশ
ব্রজেন্দ্র হালদার	তিনসংগী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
ভদ্রসেন	অরূপরতন		দশম
ভবতোষ মজুমদার	তিন সংগী	শেষকথা	পঞ্চবিংশ
ভবদত্ত	রাজা		দশম
ভবনাথ বাবু	গল্পগুচ্ছ	অধ্যাপক	একবিংশ
ভবাণীচরণ	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
ভবাণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	মহামায়া	সপ্তদশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড
ভার্গব	তপতী		একবিংশ
ভাগবত	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট গল্প		প্রথম
	ও		
	প্রায়শ্চিত্ত নাটক		নবম
	ও		
	পরিত্রাণ নাটক		বিংশ
ভূপতি	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
ভূপতি	গোড়ায় গলদ		তৃতীয়
	ও		
	শেষরক্ষা		ঊনবিংশ
ভোলা	হাস্য-কৌতুক	রসিক	ষষ্ঠ
মঘা	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
মঙ্গলা	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট [গল্প]		প্রথম
	ও		
	প্রায়শ্চিত্ত [নাটক]		নবম
	ও		
	পরিত্রাণ [নাটক]		বিংশ
মঞ্জরী	গল্প-গুচ্ছ	কর্মফল পরাক্রম	সপ্তদশ
মতিলাল	ঐ	দিদি	ঊনবিংশ
মতিলাল বাবু	ঐ	অতিথি	বিংশ
মতিলাল ঘোষাল [বাবুল]	যোগাযোগ		নবম
মথুর দাদা	দুই বোন		একাদশ
মদন	চিত্রাঙ্গদা		পঞ্চবিংশ ও তৃতীয়
মধু কৈবর্ত	গল্পগুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
মধুসূদন	ঐ	মণিহারা	একবিংশ
মধুসূদন	হাস্য কৌতুক	ছাত্রের পরীক্ষা	ষষ্ঠ
মধুসূদন	যোগাযোগ		নবম
মনসা	ব্যঙ্গ কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	সপ্তম
মণি	গল্পগুচ্ছ	গুপ্তপ্রবেশ (নাটক) ও শেষের রাত্রি (গল্প)	সপ্তদশ ও ত্রয়োবিংশ
মণিভূষণ	শেষের কবিতা		দশম
মণিমালিকা	গল্পগুচ্ছ	মণিহারা	একবিংশ
মনোরমা	ঐ	নিশীথে	ঊনবিংশ
মনোহরলাল	ঐ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ

অশ্রদ্ধেয় আচরণের অনুশীলন

সৌজন্যতা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে আমরা বহুদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছি। ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ও সৌজন্যতা ভারতবাসীর পরম ধর্ম রূপে পরিগণিত হতো একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় এখনও। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের সমাজচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর সত্যতা যাচাই করা যায়। প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে রচিত (আনুমানিক) মহাভারতের কাহিনী পাঠ করলে যদিও মনে হয় দুর্যোধনের অসৌজন্যতার জন্যেই বাঁধলো কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, তাহলেও একথা নিশ্চয় সকলেই স্বীকার করবেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনকি যুদ্ধের দিনগুলির মধ্যেও অন্যতম প্রধান শত্রু অর্জুনকে নিজের শিবিরে রাজোচিত যত্নে আপ্যায়ন করে নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে স্বীয় রাজমুকুট তুলে দিয়েছেন অর্জুনের হাতে বিনা দ্বিধায়—এ বীরোচিত সৌজন্যতার তুলনা নেই। সে যাই হোক আমাদের উদ্দেশ্য পুরোনো দিনের কাহিনীকে তুলে ধরা নয়, বর্তমানের সাথে তার সামান্যতম সামঞ্জস্য সাধন করা।

স্বাধীনতা লাভের পরে বেশ কয়েকবছর চলে গেছে। অতীত গৌরবকে বর্তমানের খোলসের মধ্যে পুরে নতুন করে পাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি। তা যেন হলো, কিন্তু নতুন জিনিসটাকে নেবার মত মন তৈরী করেছি কজন? একটা কথা সত্যি বিদেশীরা অনেক কিছুই কেড়ে নিয়ে গেছে এদেশ থেকে, তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু লোকসান খুব বেশী হয়নি—আমাদের পরাজয় এইখানে যে মনের দিক থেকে আমরা অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি জানি অনেকেই একথাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন, অজ্ঞান বালকের অসংগত আবদারকে যেমনভাবে নস্যাৎ করে দেই তেমনিভাবে। যাঁরা সায় দেবেন, তাঁরাও এ দায় চাপিয়ে দেবেন অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে, নয়তো বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খলের ঘাড়ে। যদি স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখতে চেষ্টা করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো এ দৈন্য সৃষ্টি করেছে মানুষ নিজেই, ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙ্গালীর মধ্যে যে অসৌজন্যতার বিষাক্ত হাওয়া বইতে সুরু করেছে তার মূলে তাঁরাই। মুখের কোনস্থানে যদি রক্ত চলাচলের আধিক্য ঘটে তাহলেই যেমন আমরা মনে করবো না যে সর্বাংগে স্বাভাবিক মাত্রায় রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে, তেমনি বাংলা দেশে কতিপয় মানুষের মধ্যে সৌজন্যতার পূর্ণ প্রকাশ থাকলেও অধিকাংশের মধ্যেই এর অভাব আছে বেশি পরিমাণে। প্রশ্ন হতে পারে সামান্য সৌজন্যতা প্রকাশে অসমর্থ হলে এমন কী-ই বা ক্ষতি হবে! স্বীকার করি যে এ ক্ষতি বাহ্যিক নয়, এর অভাব ঘটলে বাজেটে অর্থের ঘাটতি পড়বে না, কিন্তু ছন্দপতন ঘটবে মানুষের চরিত্রগঠনে। এই বিশেষ বোধশক্তির স্বল্পতায় মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশেও বাধা জন্মে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আর মানুষের অন্তরে যদি মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ না হয় তাহলে তার জীবনে সার্থকতা কোথায়? আজকের বাঙ্গালী সমাজের অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় এই বিপর্যয়ের সামনে এসে গেছে।

ট্রাম-বাস থেকে সুরু করে সর্বত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মনের মধ্যে সুজন-সুলভ ব্যবহার করার প্রথাকে বানচাল করে দেবার জন্য এক উদগ্র বাসনা জাগছে। অপরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা দৈনন্দিন জীবনে এত নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করছে যে অবদমিত ব্যক্তি অপরকে মানুষের শ্রদ্ধা দেয় না; ক্ষমতামদমত্ত ব্যক্তির অন্তরে ঐ অশ্রদ্ধা প্রবেশ করলেও তার চৈতন্য হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের 'ছোট আমি'র দৌরাত্ম্য এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা পাবার মানুষ গুণতিতে এসে যাবে। অথচ ছোট খাট ত্রুটিগুলি আমরা সহজেই সেরে নিতে পারি। বাংলা দেশে বড়ো বড়ো মনীষীদের চরিত্রে এ জাতীয় ক্ষুদ্র ত্রুটির বাহুল্য প্রায় ছিল না বললেই চলে।

প্রথমেই চিঠি পত্রের জবাব দেবার প্রসংগে আসা যাক। এই বাংলা দেশে বিখ্যাত ব্যক্তির অভাব নেই তা সকলেই জানেন। আপনার পছন্দমত কোন এক ব্যক্তির কাছে মামুলী পত্র লিখুন— যদি আপনি বড়ো মানুষ না হন, তাহলে জবাব পাবেন শতকরা তিনভাগ ক্ষেত্রে। অথচ রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবুন। বালক থেকে আরম্ভ করে যে কোন লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে জবাব দিয়েছেন অতিদ্রুত হারে। আর রবীন্দ্রনাথ বেকার লোক ছিলেন একথা কোন অর্বাচীন ও নিশ্চয় বলবে না। প্রবন্ধকার যখন বয়েসে অপেক্ষাকৃত নবীন ছিলেন তখন জানা বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ষ্ট্যাম্পসহ পত্র দিয়েও অনেকের কাছ থেকে পত্রের জবাব পান নি। শুধু একজন কেন, এমন বহু লোক আছেন যাঁরা সমস্বরে আমাকে সমর্থন জানাবেন। এরফলে পত্র প্রেরকের চিত্তে (অবিশ্যি পত্রে অর্বাচীনতার স্পর্শ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়) পত্র প্রাপকদের সম্বন্ধে কেমন ধারণা গড়ে ওঠে? সুখকর নিশ্চয়ই না। মনে হয় বড়ো-মানুষরা সময়ের এজাতীয় ব্যয়কে অপব্যয় বলে গণ্য করেন। এবং অনেকে আত্মতৃপ্তিও লাভ করেন বলে শুনেছি।

এর পরে সংবাদপত্র—সাময়িক পত্রের দপ্তরে আসুন। কলকাতায় কতিপয় সংবাদপত্র আছে যারা অভিজাত শ্রেণীর। সাময়িক পত্রও বেশ কিছু আছে। কোন বিষয়ে জানবার জন্য চিঠি লিখুন—টিকেট না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও উত্তর পাবেন না ধরে নিতে পারেন। আর যদি আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তাহলেও দু-তিন মাস বাদে। কিন্তু আপনি এখান থেকে চিঠি পাঠান ইংলণ্ডে বা আমেরিকায়— কয়েকদিনের মধ্যেই জবাব এসে যাবে। অথচ ওদের কাগজের সম্পাদক বা কর্মচারীদের কাজের তাড়া থাকে বেশি, কারণ কাগজের প্রচার আমাদের দেশের তুলনার অনেক জোরালো। ইংলণ্ডে কোন নামকরা কাগজে লেখা পাঠিয়ে সংগে যদি টিকেট পাঠিয়ে দেন তাহলে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁদের মতামত জানতে পারবেন। আর এখানে দেশের বাংলা কাগজের সম্পাদকদের নিন্দে করে কাজ নেই। ছ মাসের মধ্যে কোন তাগিদ দিতে এরা বারণ করেন। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক কোন এক পত্রিকায় ১৯৬১ সালের জানুয়ারীতে একটি প্রবন্ধ পাঠান, ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, অথচ এর মধ্যে তাঁরই রচিত আরো কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যদিও তা পাঠানো হয়েছে অনেক পরে। সম্পাদক মশায়রা এর যে কৈফিয়েৎ দেন তা সন্তোষজনক নয় মোটেই তা বলা বাহুল্য মাত্র। শুনেছি জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধ পাঠিয়ে কোন ভদ্রলোক তা অমনোনীত অবস্থায় ফেরৎ পেয়েছেন সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে। অনুভব করুন সংবাদপত্রের ঐ বিশেষ বিভাগগুলির কর্মতৎপরতা। এসব ছেড়ে দিয়েও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রখ্যাত সম্পাদকেরা কটি নতুন লেখককে প্রেরণা দিয়ে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করেছেন? কেবল নিজেদের চারপাশে তোষামোদকারীর গ্রহমণ্ডলী তৈরী করে কেন্দ্রে অলসভাবে সুখাসীন।

আইনষ্টাইন তাঁর জন্মদিনে পেতেন হাজার হাজার টেলীগ্রাম, পত্র, উপহার। অনেককে লিখে ধন্যবাদ জানাতেন, বাকীদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন পত্রিকা মারফৎ। আর এদে-দের কোন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন বা দীর্ঘজীবন কামনা করে পত্র দিয়েও কোন সৌজন্যমূলক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নি। এতটুকু সৌজন্যবোধ কেন থাকবে না—অথচ এই ছোট ত্রুটির জন্যে তিনি বেশ নেমে যাচ্ছেন শ্রদ্ধার আসন থেকে।

বাস-ট্রামের কথা ভাবুন। সামান্য বসবার জায়গা নিয়ে ধাক্কাধাক্কির বহর দেখলে মনে হয় যেন এঁরা সদ্য সদ্য বনভূমি থেকে এসেছেন। অফিসের সময়ে বাসের কণ্ডাকটর এবং যাত্রীদের ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকা গমনেচ্ছু যাত্রীর প্রতি কি লেশমাত্র সৌজন্যতা প্রকাশ করেন?

দোতলা বাসের উপরতলায় যাঁরা বসে থাকেন তাঁদের অনেকে নির্বিবাদে জানলা দিয়ে থুথু, কাশি, পানের পিক্, পানের ছিবড়ে নিক্ষেপ করেন, অথচ ভুলেও মনে করেন না তাঁর ঐ কর্মের জন্য নীচতলার যাত্রীদের খুব অসুবিধে হয়। যদি কেউ মনে করে থাকেন এবম্বিধ কার্যের অধিকারীগণ শুধুই অশিক্ষিত তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কোন না কোন অভিজ্ঞানপত্র ধারী।

অফিসের সময়ে তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা পাল্টে আপনি নেমেছেন গলির মধ্যে—দেখলেন সমগ্র গলি জুড়ে স্থানীয় বি.এস.সি; বি.এ; আই.এর ছাত্রের দল ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় প্রমত্ত। কাদামাখা বল আপনার গায়ে লাগতে পারে, এবং লাগেও, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ চলে যাচ্ছেন, বলের জন্য অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক এ বোধটুকুও এরা হারিয়েছে। বারণ করতে গেলে মান নিয়ে ফিরে আসতে হয় না, অনেক ক্ষেত্রে জানও।

কলেজের অফিসের হেড ক্লার্কদের দেখেছেন? তাঁরা যেন ছাত্রদের সংগে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। সরকারী দপ্তরে গিয়ে কোন সংবাদ পেতে হলে আপনাকে অনেক ভাগ্য করে আসতে হবে। পোষ্ট অফিসের কাউন্টারেও একই অবস্থা। জনসাধারণের সংগে যাদের নিত্য সম্বন্ধ তাঁদের অন্তরে সৌজন্যতার লেশমাত্র নেই কেন? এটেই তো তাঁদের স্বভাবের অন্যতম অংগ হওয়া উচিত। শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান—সেখানে প্রতিটি কর্মচারীই নিজেকে কন্ট্রোলার বা উপাধ্যক্ষ মনে করে কথাবার্তা চালান। অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঐ চত্বর থেকে খুশিমনে বেরিয়ে আসবেন একথা যেন ভাবাই যায় না। ভালভাবে কথা বলতে যেন তাঁরা শেখেনইনি এমন মনে হবে। থানার কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ঐ বিভাগকে ভয় করেন না এমন কেউ নেই। মিথ্যে হয়রানি আর অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে এঁরা সবাইকে ডিঙিয়ে গেছেন। একবার ছুঁলেই হয়—প্রাণ ওষ্ঠাগত। অথচ ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেরা কাজ করছেন সেখানে।

বাড়ীর দোতলায় কোন রোগী এখন তখন, আর তেতলায় জোরে মাইক বাজছে—আপনি অনুরোধ জানিয়ে এলেন মাইক বন্ধ করতে। বলা বাহুল্য তা উপেক্ষিত হবেই বেশিভাগ ক্ষেত্রে—আপনি যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাহলে প্রথমেই উক্ত মাইকের মালিকের 'স্ত্রীর-ভ্রাতা' সম্বোধন শোনবার পর প্রস্তুত থাকতে হবে আরো অনেককিছুর জন্যে। খোঁজ নিয়ে দেখুন এই ব্যক্তিটিও লেখাপড়ার দু একটা সার্টিফিকেট বাক্সে রেখেছেন।

পুস্তক-প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ আছে? স্বল্প খ্যাত লেখকদের সংগে এরা হাঙরের চেয়েও ভয়াল ব্যবহার করে থাকেন। প্রোফেশনাল কলেজের মাষ্টারমশাইরা (সবাই নয়) ছেলে-দের সংগে কেমন ব্যবহার করেন? নিজের কানে শোনা বিলেতি উচ্চ-ডিগ্রীধারী এক শিক্ষকের ছাত্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ শুনুনঃ তুমি ওখানে ব্ল্যাক শিপের মত দাঁড়িয়ে আছ। ইচ্ছে

করে তোমার ঐ "কারকাস"টা টেনিস বলের মত লাথি মেরে বের করে দি।

এবারে এই ভাষণটিকে পূর্ববংগের স্বরে রূপান্তরিত করুন—তাহলেই হবে। ছাত্রের ত্রুটি তিনি কলেজে উক্ত শিক্ষকের ক্লাসে বই আনেন নি এবং শিক্ষকের মনে হয়েছিল গ্যালারীর শেষ প্রান্তে বসে এই ছেলেটি ঘুমুচ্ছিল (প্রকৃত পক্ষে তা নয়)। এই ছেলে পরবর্তীকালে যদি শিক্ষক হয় তাহলে সে কেমন আচরণ করবে তার ছাত্রের সংগে ?

খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসকদের অনেকেই যেন মিষ্টি কথা বলতে জানেন না। তাঁদের আচরণে মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন যে রোগীদের যে দয়া করে দেখছেন এই যথেষ্ট। অথচ বিলেতে চিকিৎসকদের যা পরিচয় পেয়েছি--- যাক সে কথা। এখানকার বড়ো ডাক্তাররা প্রায় সবারই বিলেতের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু —।

এমনিধারার বহু দৃষ্টান্ত চোখের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এই ব্যাপক অসৌজন্যতার ফল আর কিছুই নয়—শ্রদ্ধা নামক কথাটিও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বাংলা দেশের কথাই বলবো কারণ আমি বাঙগালী— এ দেশে যেভাবে অশ্রদ্ধেয় আচরণের অনুশীলন চলছে তাতে বিচলিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

অমিয়কুমার মজুমদার

বিজ্ঞান ও সাহিত্য

সমকালীন, আশ্বিন (১৩৬৯) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের 'বিজ্ঞান ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হলাম এই কারণে যে আলোচনাটি অত্যন্ত সময়োচিত এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ যতই বেড়ে চলেছে আমাদের সুকুমারবৃত্তির প্রসারে ততই অভাব ঘটছে।

লেখক যে ভুল বোঝাবুঝি এবং উন্নাসিকতা দোষের কথা বলেছেন তা অতি সত্য কিন্তু যখন লেখক বলেন, 'পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে স্বতন্ত্র করে রাখার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।' তখন একমত হতে পারি না এই কারণে যে এই বিশেষীকরণের যুগেও উচ্চতর বিজ্ঞান ও টেকনোলজির পাঠক্রমের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য নন্দনতত্ব পাঠের ব্যবস্থা আছে। লেখক খুশী হবেন ভারতবর্ষেও উচ্চতর বিষয়সূচী নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্য বা কলাবিদ্যায় বিজ্ঞানপাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই এবং আমার ব্যক্তিগত ধারনা এই যে টেকনোলজির একজন ছাত্র সাহিত্যে যতখানি খবর রাখেন একজন সাহিত্যের ছাত্র ততখানি বিজ্ঞানের খবর রাখেন না।

অমিয়বাবুর প্রবন্ধের অনেক বক্তব্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধের মূলকথা, বিশেষ করে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের পার্থক্য নির্ণয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার কিভাবে সমাজের সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। অবশ্য লেখকের সঙ্গে একমত এই বিষয়ে যে বিজ্ঞানের গ্রন্থ উপযুক্ত ভাষায় রচিত হয় নি এবং লোকবিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার প্রসার সাম্প্রতিককালেই শুরু হয়েছে।

আদ্রে জিদ, একবার বলেছিলেন, 'মানবীয় এমন কিছু নেই যার সঙ্গে আমার বিরোধ।' বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিস্টদের সাধনা সেইভাবেই নিয়োজিত। কিন্তু সাহিত্যিকেরা চিরকাল মানবতার পূজারী হলেও সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা বিজ্ঞানপাঠে তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করে

আসছেন যদিও এ সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ নেই যে যন্ত্রসহযোগী আদর্শই প্রগতির লক্ষণ।

বিজ্ঞানের প্রভাবে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। বিগত শতাব্দীতে অনেক রচনা প্রভাবিত হয়েছিলো বিবর্তনবাদের দ্বারা আর এ যুগে আপেক্ষিকতাবাদের প্রভাব দেখছি। ফ্রয়েডী মনস্তত্ব বিশ্লেষণে সাহিত্যের পরিবর্তন আজ কারো অজানা নয়। আইনস্টাইন বলে-ছিলেন, 'একটি বাস্তবের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতেই অপেক্ষিকতাবাদ আমাদের শিক্ষা দেয়।' সাহিত্যে এ ধারণা প্রসারিত হয়েছে এমনকি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পেও। বাস্তব পরিবেশে এখন লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত ও বিশ্লেষণ প্রবল মন বিচরণ করে।

এই সঙ্গে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এদেশে সাহিত্যে যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রভাব এখনো তত উৎকট হয় নি। বাস্তববাদী সাহিত্য সাম্যবাদী দেশে প্রসার লাভ করেছে কিন্তু তাতে রসোত্তীর্ণ অংশ কতখানি তা পাঠকেরাই বিচার করবেন। মহাকবি গ্যেটে বলেছিলেন যে মাইক্রোসকোপ টেলিস্কোপ এসব মানুষের নতুন চক্ষুদান করছে যার ফলে সকল জিনিস সম্বন্ধে আমাদের মোহভঙ্গ হয়ে যাবে। এই মোহভঙ্গের জন্যেই পৃথিবী গদ্যময় হিসাবে দেখা দেয়, পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়। কিন্তু একেবারে বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকতেও পারি সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমাজচিত্রণেই সাহিত্যের সার্থকতা। বিজ্ঞান আমা-দের মধ্যে তিনরকমের বিরোধের প্রশ্রয় দিয়েছে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে তার নিজের আত্মার। দুঃখের বিষয় এই নিয়ে এদেশে সাহিত্যরচনার চেষ্টা হলেও উপযুক্ত সৃষ্টি এখনো হয় নি।

অমিয়বাবু তাঁর প্রবন্ধের প্রথমদিকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরোধের কথা উল্লেখ করে-ছেন কিন্তু কোন কারণ বিশ্লেষণ করেন নি। প্রথম কারণ সাহিত্য অল্পকয়েকজনের, বিজ্ঞান বহুজনের। সাহিত্যের প্রভাব সীমিত, বিজ্ঞানের প্রভাব বহুদূর প্রসারিত। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ সামন্ততান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। ব্যক্তিগত চিন্তাএষণা সাহিত্য প্রধান, বিজ্ঞানের সর্ব-কল্যাণকামী চিন্তাধারার সঙ্গে তাই বিরোধ স্বাভাবিক। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ নিজের সম্বন্ধে তার মহত্ব বোধ হারিয়েছে। গ্যেটের কথা আগে যা উল্লেখ করেছি, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যে সৃষ্টি করলে তা আদৌ রসোত্তীর্ণ হতো না, কাব্যে এখন যেমন বর্ষণধারা, পাখির গান আর বাগানের ফুলকে পাই, তেমন করে আর তাদের পেতাম না।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই উৎপাদনযন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে পড়ছে, সমাজ জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, দুঃখবেদনার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। সুতরাং এইসব চিন্তা করে যদি সাহিত্য বিজ্ঞান থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে মহৎ সৃষ্টি করে তাহলে হয়তো সেটাই বাঞ্ছনীয় হবে। কয়েকবছর আগে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় 'সাহিত্যে সংকট' প্রবন্ধে বলে-ছিলেন—'প্রেমহীন জীবন বহন করা যায় না, কুবেরের ঐশ্বর্য্য নিয়েও। মুক্তিহীন জীবন বহন করা যায় না রুদ্রের ক্ষমতা নিয়েও। ন্যায়হীন জীবন বহন করা যায় না ইন্দ্রের সম্ভোগ সত্বেও। আনন্দহীন জীবন বহন করা যায় না বিশ্বকর্মার যন্ত্রনৈপুণ্য সত্বেও। সত্যহীন, কল্যাণহীন, সৌন্দর্যহীন জীবন বহন করা যায় না ভূষণ্ডীর পরমায়ু সত্বেও।'

এই যন্ত্রসভ্যতার যুগেও সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা করে বলেই সেই আনন্দ দিতে পারে। উপনিষদ তাই বলেছেন, 'কোহোবান্যাৎ কঃ প্রান্যাৎ যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ', আনন্দ না থাকলে দুঃখকষ্ট সহ্য করে কে বেঁচে থাকতো ?

হিরণ্যপ্রিয়

পুরাণ কথা আর আধুনিক জীবন বাদ

ইদানীংকালে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় পুরাণ, তন্ত্রসার ইত্যাদি বিষয়ের যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই ভাবানুগ চিত্র সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তবে মনে প্রশ্ন জাগে, কি কারণে এ'রা বর্তমানকালের জীবনবাদের কথা সরাসরি অস্বীকার করে পুরাণ এবং তন্ত্রের গলি-পথে ঘোরাঘুরি করে চলেছেন। এক হতে পারে এ'রা চিত্র বলতে যে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা চালু আছে তার আওতার বাইরে কিছু বলতে চাচ্ছেন—কিংবা আধুনিক জীবনবাদের রিয়্যালিটির যে বক্তব্য তাকে হয় প্রতিপক্ষ ভেবে পরাজিত মানসিকতায় ভুগছেন অথবা সেই রিয়্যালিটিকে উদাসীন চোখে দূরে সরিয়ে রেখে চলেছেন। এখন কথা হচ্ছে যে আধুনিক চিত্রকলায় যে ধরনের সংঘাত রিয়্যালিটি আর আইডোলজির দানা বে'ধে উঠেছে সেখানে হঠাৎ তন্ত্রর খানিকটা আমদানীতে অনেকেই বিস্মিত, চকিত হয়ে উঠেছেন। গুহামানবের সময় থেকে আধুনিককাল সব যুগেই চিত্র সৃষ্টি তার পদক্ষেপ ঠিকভাবেই ফেলেছে—আর এই সমস্ত যুগে সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ঠিকই প্রতিভাত হয়েছে—সেখানে শিল্পী নির্লিপ্ত দর্শক। তার অনুভূতি কখনও হৃদয়কে কখনও যুক্তিকে বাহন করে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সত্য উৎঘাটনে তৎপর হয়েছে। সত্য আর তার অনুভূতি সব যুগে সমানভাবে অনুভূত হয় না। আজকে যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করলাম আগামী জীবনে সেখানে নতুন সংজ্ঞায় সত্যের নতুন কথন সুরু হয়। তাই বলে যে পুরাতনীকে আবর্জনায় বিসর্জন দোব—সে কথাও ঠিক নয়। আবার নতুন আবেষ্টনীতে নতুন আলোতে সত্যকে স্নান করাব না সেটাও গোঁড়ামীর পর্যায়ে পড়ে। গতজীবনের অনুভূতি তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকতা থেকে লব্ধ যে অভিজ্ঞতা—সেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিচার ঘটে শিল্পের কারুকার্যে, তার প্রয়োগ পদ্ধতিতে, তার সত্যবিচারের পথে।

গত জীবনের সেই অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করা কর্তব্য। তবে এ কথা ঠিক নয় যে সেই স্মরণকেই সর্বকালে সমানভাবে মেনে চলতে হবে। আজকের জীবনের নানা প্রসারের ক্ষেত্রে যেখানে গত জীবনের কথাও তার অভিজ্ঞতা খাপ না খেতে পারে সেখানে তার সঙ্গে আর আপোষ চলে না। যাঁরা আপোষের বন্ধন মুক্তি ঘটাবেন তারা নতুন অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাবেন আর যাঁরা সেই বিগতকালের চিন্তাকে সার করবেন তাঁরা সমাজকে তার স্বচ্ছ চিন্তার পথে পরিচালিত না করে আরও জটিল পদনির্দেশ দেবেন। পন্ডিত বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে চিত্র সম্পর্কে ধারণাকে চমকিত করা যায়—কিন্তু আনন্দ দানের কথা সেখানে না তোলাই ভাল। আমরা স্বচিন্তা প্রতিষ্ঠিত করতে বড় কথার আমদানী করতে কসুর করি না—কিন্তু সেই সঙ্গে যদি চিন্তা না করি যে আমার স্বচিন্তায় কতটা ফাঁকি আছে কিংবা আওয়াজ আছে—তা'হলে সেই স্বচিন্তা মানুষকে চমকে দিলেও তার বিষয়ে খুব বেশী সচেতনতা আশা করা বৃথা। পুরাণ কথন ভাল জিনিষ। তন্ত্রসার সত্যই আশ্চর্য হবার মতই এক বিশেষ ধর্মীয় আচার। তবে সেখানে ভেবে দেখা দরকার আমার জীবনে এই পুরাণ কিংবা তন্ত্র তার সেই কালের সত্য নিয়ে কতটা অনুপ্রেরণা আনবে? পুরাণের গল্প শুনতে ভাল লাগে। আমাদের অবসর সময়ের বিনোদন হিসাবে এর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তবে এই পুরাণ এখনও বে'চে আছে ক্ষীণভাবে

পল্লী অঞ্চলে—তাও যখন যাত্রার আসর বসে। তবে আধুনিক যাত্রার আসরে সেই প্রভাব আরও কমে আসছে। পুরাণ যদি বা তার কিছু আদল সমাজজীবনে চালু রেখেছে—সেখানে নিম্ন-জাতীয় শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আধুনিক জীবনবাদের প্রশ্নে তন্ত্রের কোন স্থানই নেই। এ কথা কি অস্বীকার্য যে পুরাণই হোক কিংবা তন্ত্রই হোক সবই আমার সমাজ জীবনের এক একটা প্রকাশ। যে সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন রাজানুগৃহীত ছিল সেই সমাজ-জীবনে ধর্মের দণ্ড সর্বদাই অনুভূত হয়েছে, কিন্তু রাজানুগৃহীত থেকে বঞ্চিত হয়ে যখনই ধর্মীয় অনুশাসন তার আসন বজায় রাখতে চেয়েছে তখনই তাকে বেছে নিতে হয়েছে এমন এক জনমনসংযোগ সূত্র যা একদিকে লোভনীয় অন্যদিকে তথাকথিত মোক্ষদায়ক। তন্ত্রের কথন বোধ হয় সে যুগে এভাবে বেড়ে ওঠারও একটা কারণ। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে এক সময়ে বাংলাদেশে এক উন্মত্ত কোলাহল উঠেছিল—সেই কোলাহলে বুদ্ধের শান্তবাণী কিংবা হিন্দু ধর্মের আচারনিষ্ঠ আচরণ সবই ডুবে গিয়েছিলো। তন্ত্রর সাধনে অনাচার শব্দটি আচারে পরিগণিত হয়েছিল। জানিনা মোক্ষলাভের পথে যে সাধনা তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা কতটা খাঁটি কতটা তাতে ফাঁকি তা বিচার্য—তবে এ কথা ঠিক যে আজকের জীবনে সেই তন্ত্রের কত না আচার এক কৌতুকের, এক জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের জীবন যন্ত্রণায় সেই বিগত জীবনের তন্ত্র নিঃশেষে বিলুপ্তিপ্রায়। যে সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তন্ত্র তার আসন পেয়েছিল—আজকের আধুনিক জীবনবাদের পথে সেই তন্ত্রের কথা বলা বর্তমানে বৃথা। কারণ আধুনিক জীবন আর তার যান্ত্রিক প্রসার আর এক অর্থ, আর এক নতুন সত্য প্রতিষ্ঠায় বিগত দিনের অনেক কথাকে মুছে দিচ্ছে। বিগত দিনের কথা ভুলতে জানি কষ্ট হবে, কিংবা মেনে নিতে পারবও না অনেক ক্ষেত্রে—তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে আজ না হোক কালকে তা ভুলতে হবেই। যে সত্য আজকে আমাকে সামনে চালাতে পারবে না তার দায়িত্ব সেখানেই ফুরিয়েছে। তাকে বার বার চালাতে গেলে দীনতার দিকটাই ফুটে উঠবে। আসল বিষয়েই ফাঁকি থেকে যাবে। বর্তমানে চিত্রকলায় কিছু শিল্পী তন্ত্রের কথা আমদানী করে সাধারণকে চমকে দিয়েছেন।

তাঁরা বড় বড় কথায় এটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে শিল্প মূল্যে যাচাই করে তাঁরা সেখানে পিওর ফর্ম খুঁজেছেন। আমার এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন—তাঁরা কি বিগত শতাব্দীর লোক কিংবা রিপ ভ্যান উইনকি্ল্‌? অথবা তাঁরা চিত্র সৃষ্টি বলতে বোঝেন দরজা জানলার পরদা, আসবাবপত্র কিংবা খাটের চাদর। যদি পিওর ফর্ম বলতে নিরস ডিজাইন হয় কিংবা শুকনো কতকগুলো রেখার অবতারণা হয় তা'হলে সেখানে বলার কিছুই নেই। এক শিল্পীর আঁকাতে —দেখলাম কিছু মন্ত্র লেখা আছে। সেখানে মন্ত্র লেখা ক্যানভ্যাসটাই ছবি। জাপানী কিংবা চীনা চিত্রে এর নজীর যথেষ্ট আছে। একটা ছোট কবিতা কিংবা মনোরঞ্জনকর শব্দ সমষ্টি দিয়ে গৃহসজ্জার আবেদন বুঝি। কিন্তু কবিতাও নয় কিংবা আনন্দময় ধ্বনি সমষ্টিও নয়—শুধু নিরস মন্ত্রের লেখন—কেমন করে যে চিত্র সৃষ্টিতে মুক্তি পাবে তা বুঝতে আমার যথেষ্ট সময় লেগেছে। আসল কথা হলো যে সমাজ জীবনের মুকুব শিল্প। এই মুকুরে শিল্পী জীবনের বিভিন্ন দিককে যাচাই করে সত্য আবিস্কারে তৎপর হয়ে থাকেন। কিন্তু মুকুরে যদি আমার গতকালের মুখোশ লাগান থাকে তবে সেখানে আমাকে চিনতে কিংবা সমাজ জীবনের আমার অভিজ্ঞতা কোন সময়েই প্রতিফলিত হতে পারবে না। আর একটা কথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না। সেটা হলো বিদেশীদের কৃপাকটাক্ষ লাভ। ভারতবর্ষের কিংবা বাংলাদেশের ধর্ম সম্পর্কে বিদেশীদের জ্ঞান হলো তন্ত্র পর্যন্ত। বিদেশীরা আমাদের হিন্দু ধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্মে অবদান সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন। আমি সেই বিদেশীদের কথা বলছি যাঁরা

ভারত দর্শন করতে এসে এদেশের ষাঁড়ের ছবি—ভিক্ষুকের ছবি ফটোতে তোলেন। এ'রা এসে তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রকরণ ইত্যাদির খোঁজ করেন। যেন মনে হয় ভারতবর্ষে এক তান্ত্রিক জাতিই বর্তমান। শিল্পক্ষেত্রে এই তন্ত্রের আমদানী কি ওই সমস্ত বিদেশীদের কৃপা কটাক্ষলাভের জন্যে। এই কথাটা খুবই ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলাম। আজকের সমাজে জীবনযন্ত্রণার কথা তার বহুদিকে অবরুদ্ধ বেদনার উৎস তাকে অবহেলা করে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্মী এক চিত্র সৃষ্টিতে মানুষের আপন জীবনবাদের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে—এ কথা ভাবা অন্যায়। এ কথা কি মেনে নিতে হবে যে রিয়্যালিটি কথাটির সঠিক অর্থ আমরা বুঝতে পারছি না—কিংবা রিয়্যালিটির যে প্রকাশ আধুনিক জীবনবাদে প্রকাশিত হচ্ছে তাকে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে তালঠুকে চ্যালেঞ্জ করতে ভয় পাচ্ছি। ভীরুর মত পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই তো আর রিয়্যালিটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে না। সে থাকবেই—তাকে পাশ না কাটিয়ে গিয়ে জীবনে গ্রহণ করে নিয়ে অভিজ্ঞতায় মসৃণ হওয়াটাই প্রয়োজন। তবে এ'রা যে এই তন্ত্র কথন বলতে আইডোলজির কথা বলবেন তাও নয়—কারণ আইডোলজির কথায় হৃদয়গত উচ্ছ্বাস বন্যার কথা গৌরবের সঙ্গে ঘোষিত। যুক্তির যুদ্ধে হৃদয়ের কথাকে বঞ্চিত না করে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন এই ধরনের রোমাণ্টিক আইডোলজিক্যাল শিল্পী বাংলাদেশে অনেক আছেন। তবে যাঁরা তন্ত্রসার শিল্পী তাঁরা কিন্তু হৃদয়গত আনন্দের ধ্বনি না তুলে নিছক বুদ্ধির অবতারণা করে চলেছেন—এতে করে নন্দনতত্ত্বগত আবেদন যে মহিমান্বিত হবে না তা বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

নিখিল বিশ্বাস

স মা লো চ না

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসংকলন ।। প্রকাশক : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী অনুষ্ঠান সমিতির পক্ষে রাখাল ভট্টাচার্য, ১১ডি রামধন মিত্র লেন, কলকাতা ৪ ।। মূল্য : ৩·৭৫

বাংলা দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগনে, তখন থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রুততর ক্রমবিকাশের যে স্রোত বাংলা ভাষাকে নতুন অভিজ্ঞানে চিহ্নিত করে তুলছিল তার ভূমিকায় সবুজ পত্র'র (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকা) স্থান স্মরণীয়। সবুজ পত্র শুধু অভিজাত আবহাওয়ার পরিমণ্ডল রচনা করে নি -আপত চোখে যা দৃশ্য ছিল; পরন্তু বাংলা কথ্য গদ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে লেখ্য ভাষায় পরিণত করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী যার সূচনা করে মহীয়ান, সেই সূচিত পথে তাঁর পশ্চাতে যে ব্যক্তি একটি আন্তরিক স্নেহ নিয়ে বাংলা ভাষার বর্ধনে অপরিসীম আগ্রহী, তিনিই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যতটা না সাহিত্যিক বলে ঘোষণা করা যায়, তার চেয়ে অনেক সহজে সাহিত্য পুরোহিত হিসেবে তাঁকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। একদা পুরনো গতানুগতিকতার আড়ালে বসে তিনি বুঝেছিলেন, নবতর কথা-সাহিত্য শুধু বাচনে বা বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিংবা ভাল মাসিক পত্রিকা প্রকাশনে সম্ভব নয়। যুদ্ধ জিততে হলে নতুন হাতিয়ারের চমক যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আধুনিক সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করণে দরকার নতুন উজ্জীবিত তরুণ লেখকের। এবং এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার পর থেকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনা নতুন লেখক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। শুধু আবিষ্কার নয়—তার চেয়েও বড় কথা সেই দুর্বার তারুণ্যকে পরিচালনা করা।

সুদূর কোনো সময়ে ভগীরথ আত্মীয় উদ্ধার নিমিত্ত গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। সেই গঙ্গা পতিতপাবনী হয়ে কলুষনাশ করে আজও ভগীরথকে স্মরণে উজ্জ্বল করে আছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এর উদ্যম ও প্রচেষ্টা ভগীরথের ন্যায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পবিত্র কল্লোচ্ছ্বাসে আজ মুখরিত।

ব্যয়িত এই সংগ্রামে আত্মক্ষমতা সম্পর্কে সব সময়েই উদাসীন ছিলেন তিনি। কারণ অবচেতনে স্বার্থ অপেক্ষা যৌথ প্রয়োগের প্রতি যত্নশীল এই মানুষ ভুলে গেছেন প্রায়শই যে তিনি একজন সাহিত্যিক; তিনি লিখতে পারেন—তার লেখার প্রয়োজন আছে। কেউ হয়তো সাময়িক এ-সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করায় কখনো সক্রিয় হয়ে তাঁর কলম রচনা করেছে 'নিজস্ব প্রবন্ধ' (পার্সোনাল এসে) যা বোধহয় এখনো সাহিত্যক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর স্বীয় সম্পদ। আবার পুরোহিতের কার্যে ভুলে গেছেন, লেখাকে উপেক্ষা করেছেন। এইভাবে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তাঁর রচনা একত্র করলে যা-দাঁড়ায়—একজন সৃজনশীল লেখকের পক্ষে তা নিতান্ত নগণ্য।

যদিও গ্রন্থিত এই পুস্তকটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি নয়, তবু তা কতটুকু! হয়তো সামান্যতার জন্য তিনি অপাংক্তেয় হয়ে যাবেন, মুছে যাবেন চিরকালীন সাহিত্য পৃষ্ঠার হিসেব থেকে। এ যাওয়ায় যতই বেদনা থাক তা স্বাভাবিক ছিল—এবং সম্ভাব্যও। কিন্তু চলমান জীবন? যে জীবন প্রতি মুহূর্তে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে বলছে—আমিও চলছি, চলছি শুরু

থেকে, তোমাদের শেষ পর্যন্ত আমি আছি—তাকে পেছনে উপেক্ষায় বা অবজ্ঞায় ফেলে দেওয়া অসম্ভব।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর স্বল্প সাহিত্য সৃষ্টিই এর উদাহরণ। কিছু অনুবাদ, 'নিজস্ব প্রবন্ধ', স্কেচ, বাদে সিরিয়াসলি তিনি যা লিখেছেন তা চলমান জীবন (১ম+২য়)। সমস্ত কিছু থেকে নির্মুক্ত একটি মানুষ মহাকালের ক্রোড়ে মিছিলের মুখ দেখছে। প্রতিটি মুখ তাদের অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে চিত্রিত। এমন চিত্রণ যা তাঁর হাতে অনায়াস, তা হতভম্ব করে দিয়েছে পাঠক-দের। কোথাও চমকের চেষ্টা নেই, অতি কথন অতি বর্ণনা দুরাশা মাত্র। অথচ এ যেন অনবদ্য-ভাবে অমোঘ ইতিহাস তৈরী করেছে। আধুনিক যন্ত্রণাযুক্ত বাংলা সাহিত্যের জনকরা চারপাশে জীবন্ত হয়ে ভিড় করে চলেছে।

যেমন ভাবে যেমন করে তিনি চারপাশের জনতা দেখেছেন, ঠিক তেমন করে তেমন রঙে মোহমুক্ত হয়ে সেই জনতাকে গল্পের গদ্যে বেঁধেছেন। এ তাঁর পরিমিতি জ্ঞান ও দেখবার নিখুঁত শক্তির প্রকাশ মাত্র। এবং সবচেয়ে যা আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে তা হল যেন অতি সহজে গল্প করতে করতে এমন প্রামাণ্য ও সরস একটি অন্তর্লীন সাহিত্য আন্দোলনকে তিনি রূপায়িত করেছেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর সাহিত্য কীর্তি স্মরণীয় তাঁর ভাষান্তরণের অদ্ভুত ক্ষমতায়ও। যেমন 'বুভুক্ষা' বিদেশী ভাষার গ্রন্থ বিদেশী নাম বিদেশী পটভূমিকাতে নির্দিষ্ট রেখে এত কাছের এত হৃদয়ের করা যায় তা এর আগে অপরিচিত ছিল। এবং এর কারণও নিজেকে নিষ্পৃহ রাখা। তিনি সর্বস্ব মোহ মুক্ত থেকেছেন বলেই এমনভাবে বিদেশের সাহিত্যকে ঘরের করে নিতে পেরেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রেও এ ক্ষমতা প্রমাণিত। গদ্যের চেয়ে যা শতগুণ দুরূহ, সেখানেও তাঁর কলম নির্ভীক। অনুবাদের মূল বিষয়টি কি তা প্রাথমিকভাবে আয়ত্ব করার কৌশল তিনি জেনেছেন। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিপাদ্যকে স্বচ্ছন্দে আলোকে হাজির করেছেন।

নিজস্ব প্রবন্ধ রচনা, যে সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি এটি তাঁর স্বীয় সম্পদ। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর তেমন কোনো লেখকের কাছ থেকে এ জাতীয় রচনা পাই নি। বাংলা ভাষায় পার্সোনাল এসে লেখার রেওয়াজ নেই। আমার মনে হয় এজন্য লেখকদের মেজাজের অভাবই মুখ্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই মেজাজের অধিকারী বলেই এমন লিখেছেন।

মোটামুটি এই সংকলন গ্রন্থ পাঠে যে কোনো সাহিত্য পাঠকই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন এ কথা মনে করা চলে। এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটির সান্নিধ্য তাদের যে স্নিগ্ধ করবে এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। জয়ন্তী অনুষ্ঠান সমিতি কর্তৃক এ-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান পৃথ্বীশ অঙ্কিত বিশেষ প্রচ্ছদটিও এই সংকলনকে আরো উজ্জ্বল রূপ দিয়েছে।

অজয় দাশগুপ্ত

N
SPECIALITIES

Sanforized :

Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :

Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Nov. '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬ টাকা। ষান্মাসিক ৩ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

৪৯ বছর কাজ করছেন···গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি

ভারতের কলকারখানায় দুর্ঘটনার হার ১৯৩৮ সালে প্রতি হাজার কর্মীপিছু ২৪ জন থেকে বেড়ে ১৯৫৯ সালে হাজারে প্রায় ৪৪ জন দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর দুর্ঘটনায় গড়ে ৯৩০০০ কর্মী জখম হন এবং তার মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মারা যান। দুর্ঘটনার দরুণ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ঘণ্টার কাজ নষ্ট হয়। এই নষ্ট সময় কাজে লাগালে ভারতীয় রেলওয়ের জন্যে ১৭০টি ব্রডগেজের ইঞ্জিন বা ৭০০টি রেলের কামরা তৈরী করা যায়।

টাটা স্টীল নিরাপত্তার দিকে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখে, কারণ তা নাহ'লে কোনো কর্মীই পুরোপুরি শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন না। বছরে নিয়মিত 'নো অ্যাক্সিডেণ্ট মান্থ', নিরাপত্তা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান, নিরাপত্তা পুরস্কার, নিরাপদে কাজ করবার সুযোগ-সুবিধে, নিরাপত্তাকে অভ্যাসে দাঁড় করানোর জন্যে যুক্ত পরিষদের পরিচালনায় টানা অভিযান চালানো···জামশেদপুর কারখানায় দুর্ঘটনা দূর করার জন্যে এইসব উপায় অবলম্বন করা হয়।

কাজে নিরাপত্তা কিন্তু কর্মীর নিজের ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারণ দেখা যায়, প্রায় ৭৫ ভাগ দুর্ঘটনা মানুষের অসাবধানতার জন্যে ঘটে। কিন্তু এরই আর একটি দিক হল টাটা স্টীলের আজকের সবচেয়ে পুরোনো কর্মী যমুনা দুবে। ৪৯ বছর ধরে দুবে টাটা স্টীলের কারখানায় কাজ করছেন অথচ আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো আঘাত লাগেনি, এমন কি একটা আঁচড় পর্যন্ত না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ইস্পাত নগরী জামশেদপুরে এসে দুবে যে জিনিষগুলি প্রথমেই শেখেন তার মধ্যে প্রধান হ'ল হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

ইস্পাত নগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 6093

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য

ঐক্যবদ্ধ হউন

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্বের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কমিউনিস্ট চীন পার্বত্য ভারতভূমির উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের সকলকে আজ সংহত হইতে হইবে এবং প্রধানমন্ত্রী "জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে" স্বর্ণ, অর্থ ও অলংকারাদি দান করিয়া ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইবে। যে-সংগ্রাম শুরু হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিতে হইলে আজ প্রয়োজন—কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, অসঙ্গত মুনাফা রোধ ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য
স্বর্ণ, অর্থ ও অলংকারাদি গৃহীত হইবে
—"স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া"র যে-কোন শাখায় —

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

দশম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

দশম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' উনসত্তর

ম কা লী

দ্বারকানাথ ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

ক্লাইভ ও কর্নোয়ালিস প্রচারিত নিয়মানুসারে সরকারী কর্মচারীরা নিজেরা কোন ব্যবসা ফাঁদতে পারতেন না। কিন্তু, কোন যৌথ কারবারের অংশীদার এমন কি পরিচালক হতেও কোম্পানীর কর্মচারীর পক্ষে কোন আইন গত বাধা ছিল না। তাই কোম্পানীর কর্মচারী থাকাকালেই দ্বারকানাথের কমার্শিয়াল ব্যাংক, হিন্দুস্থান ব্যাংক এবং ইউনিয়ান ব্যাংকের অংশীদার বা পরিচালক হতে কোন বাধা হয় নাই।

তখনকার কালের ব্যাংকগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে বেংগল বাংক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সনদ (চার্টার) পায়। সরকার কিছু অংশ কিনে ব্যাংকটীকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে আনেন। নিজেদের নোট চালু করবার আগে পর্যন্ত সরকার ট্রেজারীতে এই ব্যাংকের নোট টাকার বিনিময়ে স্বীকার করতেন। সেজন্য লোকের ধারণা হয়েছিল যে বেংগল ব্যাংক সরকারের ব্যাংক—সেখানে টাকা রাখা নিরাপদ। বেংগল ব্যাংক চলতি গচ্ছিতের উপর কোন সুদ দিত না, স্থায়ী বা মেয়াদী গচ্ছিতের উপর সুদ দিত।

অন্য যে কয়টী বড় ব্যাংক ছিল সেগুলিকে কারবারী ব্যাংক বলা যেতে পারে। বড় বড় সওদাগরদের কারবারের সংগে একটি করে ব্যাংক খোলা হয়েছিল—পামার কোম্পানীর ক্যালকাটা ব্যাংক, ম্যাকিন্টস্ কোম্পানীর কমার্শিয়াল ব্যাংক, আলেকজান্ডার কোম্পানীর হিন্দুস্থান ব্যাংক। এরা চলতি গচ্ছিতের উপর সুদ দিয়ে এবং স্থায়ী গচ্ছিতের উপর বেংগল ব্যাংক অপেক্ষা বেশী সুদ দিয়ে জনসাধারণের অর্থ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করত। তা' ছাড়া এই সব ব্যাংকে টাকা রাখলে এবং লেনদেন থাকলে অবস্থাবিশেষে ব্যাংক থেকে ধারও পাওয়া যেত। এইসব কারণে

অনেকেই এই সব কারবারী ব্যাংকেও বহু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন। এই সব ব্যাংকের কারবার কত ব্যাপক হয়েছিল তা' ঐ উপরোক্ত তিনটী ব্যাংকের প্রচারিত 'দাবীমাত্র' (অন ডিমান্ড) নোটের সংখ্যা থেকে কতকটা বোঝা যায়। এখন যেমন সরকারী পাঁচ টাকা, দশটাকার নোট বাজারে চলে, তখন ঐ নোটগুলি সেইরকমই চলত। ঐ ব্যাংক চাহিবামাত্র নোটের বিনিময়ে ঐ টাকা দিবার অঙ্গীকার করতেন। হিন্দুস্থান ব্যাংকের এক সময়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার নোট বাজারে চালু ছিল। কমার্শিয়াল ব্যাংকের গড়ে বাৎসরিক প্রায় ষোল লক্ষ টাকার আর ক্যালকাটা ব্যাংকের গড়ে বিশ লক্ষ টাকার নোট বাহির হত।

১৮১৩ সালে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন সনদ দেওয়া হয়, তখন তাতে একটী নতুন সর্ত ছিল যে ভারতের বাণিজ্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ ইংরাজরাজের সকল প্রজার জন্য খোলা রাখতে হবে। এর আগে পর্য্যন্ত ভারতে বাণিজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ছিল। অন্য যারা ব্যবসা করত তারা ছিল আইনতঃ চোরা কারবারী (ইন্টার লোপার্স)।

এই প্রথম প্রকাশ্য ভাবে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ পেয়ে অনেক সাহেব উৎফুল্ল হয়ে আত্মপ্রসারণ সুরু করলেন। কুঠীওয়ালা সাহেবেরা এক একটী ধনী মুৎসুদ্দির অর্থ সাহায্য নিয়ে ব্যবসায় জুয়া খেলা আরম্ভ করলেন। যে কোন জিনিষে এতটুকু লাভের সম্ভাবনা, সেটা নগদ ও ধারে যতটা সম্ভব কিনতে লাগলেন। অগত্যা এই কারবারী ব্যাংকগুলির পক্ষে গচ্ছিত ধনের মর্য্যাদা রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। যখন ধার আর মেলে না তখন কারবার তাড়াতাড়ি পড়তে থাকলো। অনেক সাহেব হঠাৎ বড়লোক হতে গিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বড় লোক বনবার পরেও শেষ পর্য্যন্ত প্রায় পথে বসলেন। শোনা যায় পামার কোম্পানী ফেল মারার পর ঐ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার জন পামারকে পরণের বস্ত্র ছাড়া একটী ছাতা মাত্র সম্বল করে বাহির হতে হয়েছিল। এই জন পামারই "পঞ্চগোরা স্মরে নিত্যং মহাপাতক নাশানং" এর এক-জন। ইনি ব্যবসায়ী প্রিন্স নামে পরিচিত ছিলেন এবং প্রচুর দানধ্যান করতেন। এঁর স্ত্রী ছিলেন বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের পালিতা কন্যা এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের সঙ্গে এই কোম্পানীর যোগাযোগের কথা নিয়ে বিলাতে আলোচিত হওয়াতেই বড়লাট হেস্টিংস পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এই পামার কোম্পানীর কারবার এত বড় ছিল যে কথিত আছে এই কুঠীর একটী বিভাগের মুৎসুদ্দি শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী, তাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিন সকালে এসেই নগদ পাঁচ শ' টাকা লইতেন। এর উপর যা কিছু প্রাপ্য হইত, তা' বৎসরের শেষে হিসাব করে চুকিয়ে লইতেন। পামার কোম্পানী তিন কোটী টাকা ঋণ রেখে ডোবে।

১৮৩৬ সালে জন পামারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য সুখচরে যে দিঘী খোঁড়া হয় সে সম্বন্ধে আমরা ১৮৪৫ এর ৩০ জানুয়ারী ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়ায় দেখি যে দ্বারকানাথ এক শত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।

দু একটী ক্ষেত্রে ভাগ্যের হের ফেরেও কয়েকটী ব্যাংক বেশ ঘায়েল হয়। যেমন হিন্দু-স্থান ব্যাংক। এই ব্যাংক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে ১৮১৯ পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কারবার থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। ঐ বৎসর হিন্দুস্থান ব্যাংকের কতকগুলি নোট জাল হওয়াতে দুষ্টলোকে রটনা করে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত নোট ব্যাংকে দাখিল না করলে তার বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যাবে না।১ ফলে যার কাছেই ঐ ব্যাংকের নোট ছিল সেই ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। তখন আলেকজাণ্ডার কোম্পানী তার নিজস্ব তহবিল থেকে কয়েকদিনের ভিতর ১৮ লক্ষ টাকা জুগিয়ে সে যাত্রা ব্যাং-কটীকে রক্ষে করে। তারপর ১৮২৯ সালে যখন পামার কোম্পানীর ক্যালকাটা ব্যাংক ফেল মারে

তখন আবার ব্যবসায়ী মহল ভয় পেয়ে নোট ভাঙিয়ে নগদ টাকা করতে ব্যস্ত হল। সেই ধাক্কা সামলাতে হিন্দুস্থান ব্যাংককে কুড়ি লক্ষ টাকা বের করতে হল। ব্যাংক সামলাতে কোম্পানী থেকে এই রকম মোটা টাকা লওয়াতে আলেকজাণ্ডার কোম্পানী আর হিন্দুস্থান ব্যাংকের কোন স্বতন্ত্রতা রইল না। পরে কারবারকে সামলাতে গিয়ে ব্যাংকের নিজস্ব ও অপরের গচ্ছিত এবং নোট বিনিময়ের জন্য রাখা—এই সবরকম অর্থই বের করতে হল। সেই অবধি আলেকজাণ্ডার কোম্পানী ও হিন্দুস্থান ব্যাংক উভয়েরই পতনের সূত্রপাত হল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এক "বাণিজ্য সংকট" সামলাতে না পেরে কোম্পানী ও ব্যাংক ডুবল। আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর ধার তখন সাড়ে চার কোটি টাকা।

ক্যালকাটা ব্যাংকের ফেলমারার কথা ত' আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮২৪ খৃঃ স্থাপিত হয়ে পামার কোম্পানীর পতনের ঠিক আগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

বহু ইংরেজ কর্মচারীর ও তাঁদের পরিবারের চিরজীবনের সঞ্চয় এই সব ব্যাংকে ছিল। তাঁদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রথমে কতকটা যৌথ কারবার হিসাবে খোলা হয়। খোলবার সময় অংশীদার ছিলেন সেকালের কয়েকটী বড় বড় কুঠীওয়ালা, গোপীমোহন ঠাকুর ও আরেকটী ইংরেজ অংশীদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা ম্যাকিন্টস কোম্পানীরই ব্যাংক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮১৯ থেকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যাংকের কাজ বেশ সুষ্টুরূপেই চলেছিল। গোপীমোহন ঠাকুর সম্ভবতঃ শেষাশেষি নিজের অংশ উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে ব্যাংকের একজন প্রধান অংশীদার সে সময়ের মস্ত বড় কুঠিওয়ালা জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী ফেল মারে। ম্যাকিন্টস কোম্পানীও আড়াই কোটী টাকা ধার রেখে উঠে যায়। এই সব কারণে এই ব্যাংকের কাজ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে চলে। কমার্শিয়াল ব্যাংক যৌথ কারবার হিসাবে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলে এর ঋণের জন্য সকল অংশীদার সমষ্টিগত ভাবে এবং প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত ভাবে আইনানুসারে দায়ী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর গোড়ার দিকেই এই ব্যাংকের অনেক অংশ কিনে একজন প্রধান অংশীদার হয়েছিলেন। তাই ব্যাংক ফেল মারার সময়ে একমাত্র সঙ্গতিপন্ন অংশীদার হিসাবে ব্যাংকের সমস্ত ঋণ শোধের ভার তাঁর উপর পড়ে। তিনি এ সমুদয় ঋণ শোধ করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ যৌথকারবারের প্রণালীতে একটী ব্যাংক খোলবার প্রস্তাব করেন। তখন তিনি কমার্শিয়াল ব্যাংকের একজন প্রধান অংশীদার এবং ব্যারেটো কোম্পানীর ফেল মারার ফলে ঐ ব্যাংকের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তখন হিন্দুস্থান ব্যাংক আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে। এই সব কয়টী ব্যাংকেরই অংশীদার ছিলেন খুব কম সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং তাঁরা দরকার মত অনেক নগদ অনায়াসে ব্যাংক থেকে বের করে নিতেন। ফলে কয়েকটী অংশীদারদের কারবারের উপরেই ব্যাংকের নির্ভর হইত এবং পরস্পরকে সামলাতে গিয়ে উভয়েরই ডুবিবার সম্ভাবনা ছিল। দ্বারকানাথের প্রস্তাবিত ব্যাংকের বিশেষত্ব হবার কথা ছিল প্রথমতঃ যৌথ ভিত্তি, দ্বিতীয়তঃ কোন একটী কারবারের প্রতি পক্ষপাত না করে সকল সম্প্রদায়ের সওদাগরদের উপযুক্ত জামিনে ধার দেওয়া। বেংগল ব্যাংক তার চার্টারের সর্তানুযায়ী এরকম সাহায্য করতে অক্ষম ছিল।

দ্বারকানাথ এর প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক হলেও আরো কয়েকজন গোড়া থেকেই এর সংগে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ম্যাকিন্টস কোম্পানীর অংশীদার জেমস্ গর্ডন কর্নেল জেমস ইয়ং ও পামার কোম্পানীর কলাকাটা ব্যাংকের জন পামার।

এ'দের প্রস্তাব মত ক্যালকাটা ব্যাংক ও কমার্শিয়াল ব্যাংক নিজেদের নোট সংখ্যা কমিয়ে এনে নতুন ব্যাংকের জন্য স্থান করে দিলেন। নতুন ব্যাংকের নাম রাখা হয় ইউনিয়ন ব্যাংক।

প্রথমে স্থির হয় আড়াই হাজার সিক্কা টাকার প্রতি অংশের এক হাজার অংশে এই যৌথ ভিত্তি ব্যাংক খোলা হবে কিন্তু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেও যখন ছয় অংশের বেশী বিক্রয় হল না, তখন ১৮২৯ সালে পনের লক্ষ সিক্কা টাকা বা ষোল লক্ষ কোম্পানীর টাকা নিয়ে ব্যাংক খোলা হল। ১৮২৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে 'জন বুল' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখি ইউনিয়ন ব্যাংক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে

"…. The present state of Scotland is an example how much advantage a country may derive from Banks judicially conducted and broadly based- as the Union Bank is, as to credit and security; and we are glad to perceive that in our New Establishment here the principles and *modus operand;* of the Scotch Banks are kept very much in view".

১৮২৯ সালে এক্সচেঞ্জ হলে সভা করে প্রস্তাবকদের নিয়ে প্রথম পরিচালক সভা হয় আর উইলিয়াম কার, এই নতুন ব্যাংকের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কাজ আরম্ভের পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথের যত্নে এই ব্যাক দ্রুত উন্নতি করতে থাকে এবং বছর বছর এর মূলধন বাড়তে থাকে। ১৮৩৩ সালের পরিচালকসভার সভ্যদের প্রথমেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম দেখি। ঐ বছর আরও তিনজন বাঙ্গালী ঐ সভায় ছিলেন—প্রমথনাথ দে (লাটুবাবু), প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কার সাহেব দ্বারকানাথের সংগে "কার টেগোর কোম্পানী" খোলবার জন্য ইউনিয়ান ব্যাংকের সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। সেই ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ সালের আগষ্ট মাস অবধি সম্পাদক ছিলেন রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। ঐ বৎসর ব্যাংক যখন ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে যেতে আরম্ভ করে তখন রাধামাধব বাবুকে সরিয়ে ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর ভূতপূর্ব অংশীদার জর্জ জেমস্ গর্ডন সাহেবকে সেক্রেটারী বানানো হয়। ১৮৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে মূলধন বিশ হাজার টাকা বাড়াতে হয় এবং মে মাসে নয়শ' টাকার প্রত্যেক অংশের ছয়শ' অতিরিক্ত অংশ বের করে মোট মূলধন দাঁড়ায় একুশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতি অংশের দাম ২৫০০. থেকে হাজার টাকায় কমিয়ে দিয়ে মূলধন বত্রিশ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। ১৮৩৮ সালের জানোয়ারীতে আরও আটশত অংশ বাহির করে মূলধন হয় চল্লিশ লক্ষ টাকা। পরের মে মাসে আরও চার হাজার অংশ বের করে মূলধন আশি লক্ষ টাকায় পেঁছায়। অবশেষে ব্যাংক পত্তনের দশবছর বাদে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরও দু হাজার অংশ বাহির করে মূলধন পুরা এক কোটি দাঁড়ায় এই সময়ের দশ হাজার অংশের মধ্যে মোট মাত্র সাত শত অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয়গণ আর অবশিষ্ট সমুদয় অংশ ছিল ইউরোপীয়দের।

ব্যাংকের প্রধান কর্মচারী ছিলেন তিনজন—সম্পাদক বা সেক্রেটারী, ধনরক্ষক বা ট্রেজারার আর হিসাব রক্ষক বা একাউন্টান্ট। পরিচালকগণ অবসর অনুসারে সপ্তাহে দু'একবার সভায় মিলিত হয়ে মোটামুটি আয় ব্যয় দেখতেন আর কি ভাবে চালালে লাভের সম্ভাবনা সেবিষয়ে পরামর্শ করতেন। চুরি জুয়াচুরি যাতে না হতে পারে সে বিষয়ে নিয়মকানুন তাঁরা করতেন। সম্পাদকের কাজ ছিল সেটাকে কার্য্যত চালানো। সম্পাদক পরিচালক সভাকে সব বিষয়ে পরামর্শও দিতেন।

ব্যাংকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত ধনরক্ষক বা খাজাঞ্চী ছিলেন দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুর এবং অনেককাল যাবৎ তাঁদের সহকারী ছিলেন দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ।

হিসাব পরীক্ষকদের মধ্যে আমরা এ. এইচ. সিম, ডাক্রুজও উইলিয়াম বোনার্ডের নাম পাই।

বেঙ্গল ব্যাংকের একাউণ্টান্ট হেনরি হেণ্ডারসন কর্ত্তৃপক্ষের জানত কোম্পানীর কাগজ ব্যাংকের অংশ এবং বিলস্ অফ এক্সচেঞ্জের দালালী করতেন এই নজির দেখিয়ে রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকতা কালে সিম্ সাহেব অনুরূপ অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি নানা প্রকার স্পেকুলেশন করে টাকার অকুলান হওয়াতে তবিল তছরূপ করেন। ১৮৩৯ সালের মে মাসে ধরা পড়ে যে ব্যাংকের গচ্ছিতকারীদের নামে সিম্ সাহেব অনেক টাকা অতিরিক্ত উঠাইয়াছেন বলিয়া অন্যায় ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সিম্ সাহেব দোষ স্বীকার করিয়া ৬৪,০০০ টাকার গোলোযোগ খাতায় পরিস্কার করেন। এর অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশ হল যে গচ্ছিতকারীদের জমা দেওয়া টাকাও অনেক সময় সিম্ সাহেব আত্মসাৎ করাতেই এরকম অতিরিক্ত টাকা উঠানোর কথা তিনি লিখতে বাধ্য হন। সিম সাহেব তখন খুব পীড়িত বলে অনুপস্থিত। তাঁর অধীনস্থ খতিয়ান লেখককে সিমের নিজের হিসাব সম্বন্ধে দুদিন ধরে জেরা করাতে সে স্বীকার করে যে ব্যাংকের কাছে সিম্ সাহেবের দেনা আরও হাজার বারো তের টাকা হবে। সেইরূপ ভাবে সে হিসাব পরিস্কার করে। এদিকে ডিক্রুজ সাহেবকে ব্যাংকের অপর একজন কেরানী খবর দেয় যে ইংরাজী ও বাংলা খতিয়ান লেখকদের যোগসাজেই হিসাব মিলানো আছে। তখন পরীক্ষা করে ইংরাজী খতিয়ান লেখককে ডিক্রুজ বল্লেন যে সিম্ সাহেবের মজুত বাকী ১২,০০০ না হয়ে ১,২০,০০০ টাকা হবে। তখন ধরা পড়ে সে লিখিত ভাবে আট দফায় জুয়াচুরীর কথা স্বীকার করে। এর প্রথমটী হয় ১৮৩৬ সালের ১২ই অক্টোবর। একটী খরচে ৫৯২ টাকার পূর্বে ১০ বসাইয়া ১০৫৯২ করা হয়েছিল। এইরকম বেশী দেখিয়ে যে টাকা বাঁচে তা' সিম্ সাহেব আত্মসাৎ করেন। ক্যাশবই থেকে প্রতিদিন বাংলা খতিয়ান জমাগুলি উঠানো হলে একাউন্টান্টের বইয়ে পরিস্কার করে লেখা হ'ত আর তারপর সে হিসাবগুলো ইংরাজী খতিয়ানে উঠাইবার জন্য ইংরাজী খতিয়ান লেখককে দেওয়া হ'ত। পাছে ধরা পড়ে এই কারণে ইংরাজী খতিয়ানকারী ক্যাশ বইতেও অঙ্ক বদলাতে পিছপা হ'ত না, অথচ প্রতিপৃষ্ঠার নীচে মজুত বাকী ঠিক রেখে যেতো। যান্মাসিক হিসাব ঠিক করবার সময় একাউণ্টান্ট এই মজুত বাকীতে যেন ভুল আছে বলে কতকগুলি বাজে জমাখরচ দেখিয়ে হিসেব মিলিয়ে রাখতেন। ক্যাশবইতে অঙ্ক বদল থাকাতে তার লেখকের ঘাড়ে দোষ পড়বার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু একটী পৃষ্ঠার নীচে ২৯৪৬৯ লেখা থাকলেও পরপৃষ্ঠার গোড়ায় ৪৯৪৬৯ লেখা থাকায় এবং আরেক জায়গায় ক্যাশবইয়ের অঙ্ক বদলাতে ভুল হলেও খতিয়ানে বদল দেখা যাওয়াতে খতিয়ন লেখকেরই দোষ বুঝা যায়। ধরা পড়িবার ভয়ে সিম্ সাহেব ব্যাংকের খতিয়ানে নিজের নামের খতিয়ান খোলেন নাই।

এই জুয়াচুরীর কথা জানতে পেরে ডিরেক্টার-রা আদেশ করলেন যে ব্যাংকের কোন মাহিনা করা কর্মচারী বাণিজ্য বা অন্য ব্যবসা করতে পারবে না এবং ব্যাংকে কোন কর্মচারীর নামে বেতন ছাড়া অন্য কোনরকম টাকার লেনদেনের হিসাব রাখা হবে না। কেরানী সংখ্যা বাড়ান হ'ল আর সম্পাদকের একটী সহকারী নিযুক্ত করা হ'ল।

ঐ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তছরূপ বিষয়ে বেশী জানাজানি হলে পাছে ব্যাংকের দুর্নাম ঘটে সেজন্য দ্বারকানাথ সমস্ত টাকাটা নিজে জমা দিলেন। অবশ্য অপরাধী কর্মচারীদের

সেই সঙ্গে তাড়ালেন তখন পর্য্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাংক প্রায় দ্বারকানাথের সম্পত্তির সামিল ছিল। অংশ বের (শেয়ার ইস্যু) করে তিনজন ডিরেক্টর সই করছেন দেখি। দ্বারকানাথ নিজে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ও ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। এই তবিল তছরূপের ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা হলেও জানাজানি কিছু কম হয় নি। মফঃস্বলের এক ব্যাংকের মালিক "মফঃস্বল শেয়ার হোল্ডার" নাম দিয়ে ১৮৪০ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরের কলিকাতা কুরিয়ারে বেশ একটী শ্লেষাত্মক চিঠি লিখে জানতে চান যে ব্যাংকটা কি কার টেগোর কোম্পানীর ? তা' নাহয় ত ঐ গোষ্ঠীরই এত ডিরেক্টর কেন এবং দ্বারকানাথই বা টাকাটা দিচ্ছেন কেন ? অংশীদাররা (শেয়ার হোল্ডাররা) ত' ভিক্ষে চায় নি, তারা প্রাপ্য ন্যায্য ডিভিডেন্ড চায়। ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন যে দ্বারকানাথ প্রভৃতির পরোক্ষ সাহায্যেই সিম্ সাহেব টাকা ভাঙ্গে তাই সে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে দ্বারকানাথের এত আগ্রহ। এর পর থেকেই আরম্ভ হল ইংরেজ অংশীদারদের জোট বাঁধা। তারা দেশীয়দের হাতে একটা এত বড় কারবারের কর্ত্তৃত্ব সইতে পারলো না বলেই হোক্, বা এরকম লাভের ব্যবসাকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলেন বলেই হোক—ইংরেজরা অধিকাংশ অংশ কিনে নিল। তখন মূলধন চরমসীমায়—এক কোটী টাকা। এতটাকা কিভাবে লাভজনক ব্যবসায়ে খাটানো যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা সুরু হল। এই ব্যাংকের স্থাপনের একজন প্রস্তাবক এবং প্রথম পরিচালকবর্গের অন্যতম গর্ডনসাহেব

দ্বারকানাথ কমার্শিয়াল ব্যাংকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ঐ ব্যাংক এবং অন্যান্য কারবারী ব্যাংকগুলির দোষত্রুটী পর্য্যালোচনার পরেই তিনি ইউনিয়ান বাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হ'ন। তিনি চেয়েছিলেন বহু অংশীদার থাকলে, তবেই নানারকম ভাবে টাকার লেনদেন সত্ত্বেও ব্যাংক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবে এবং কোন একটী বিশেষ কারবার বা কারবারীর প্রতি পক্ষপাত করতে পারবে না। তিনি যতগুলি সম্ভব এদেশীয় ও বিদেশীয় স্বার্থকে একত্রিত

ইস্তাহার। হিন্দুস্থান বাঙ্ক। ১১ মে ১৮১৯

পঁচিশ[২] টাকা করিয়া পঁচত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট বলিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে। এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যে [২] স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই সেই চিহ্ন পুনর্বার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন।

হিন্দুস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই [৩] জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের কিনারে চারি দিকে জলের ঢেউর মত লতার দাগ আছে ও ইংরাজী বড় অক্ষরে হিন্দুস্থান বাঙ্ক এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং ঐ রূপ ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দুস্থানবাঙ্ক এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে দেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোট শ্রীযুত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রকৃত রাখিতে পারে নাই তাহা হইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গালবাঙ্কের যেমত ধারা আছে সেই ধারানুসারে হিন্দুস্থানবাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের উপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট বাঙ্ক আপন লোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক যদি

করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া একটা জিনিস তিনি নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন সেটা হল যে নিজের

পরিচালনার বেশ অধিকার থাকে এবং অন্ততঃ এই ব্যাংকের মারফৎ কিছু বাঙ্গালী ব্যাংক ও ব্যবসায়ের কাজ শেখবার উপযুক্ত সুযোগ পায়। "আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে দ্বারকানাথের যুক্তি ছিল যে যে টাকা বিদেশীয়গণ লুটিয়া লইতেছে তাহার যতটুকু পারা যায় স্বদেশে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত এবং তিনি বুঝিতেন যে বাণিজ্য বিনা দেশের মঙ্গল নাই, এই কারণে কারবারের মধ্যে নিজে থাকিয়া সাধ্য মত স্বদেশীয়গণকে সেই কারবারে প্রবিষ্ট করাইয়া হাতেকলমে কারবার শিক্ষা দেওয়া উচিত।" এই ইচ্ছার প্রমাণ দ্বারকানাথ সে সময়ে ইউনিয়ন ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে সময়ের ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট লোকেদের তালিকা থেকেই পাওয়া যায়।

গর্ডন সাহেব প্রস্তাব করলেন যে প্রধানতঃ নীলকুঠিওয়ালাদের কুঠীর দলিলদস্তাবেজ জামিন রেখে আর কুঠীর সম্ভাব্য বাৎসরিক মালের বিবেচনা করে ধার বা প্রকারান্তরে দাদন দেওয়া। এই দাদন দেওয়ার বিরুদ্ধে পরিচালক সভায় আপত্তি উঠেছিল। এই আপত্তিকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথও ছিলেন। কিন্তু সাহেব সম্পাদক ও অংশীদারগণ ইংরেজকুঠীওয়ালাদের দাদন দেবার বিরুদ্ধে আপত্তি শুনলেন না।

আরেকটী নিয়ম গর্ডন সাহেব প্রবর্ত্তক করেন—সেটী ক্যাশ-ক্রেডিট বা নগদ-ধার। অর্থাৎ উপযুক্ত অন্য কোন লোককে তাঁর নিজের জামিনে বা উপযুক্ত অন্য কোন লোকের ব্যক্তিগত জামিনে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধার দেওয়া যেতে পারে। এরকম ধার অবশ্য খুব অল্পদিনের মেয়াদে দেওয়া হত এবং এই কারণে ইহা সেই অধমর্ণের একরকম নগদ জমার সামিল ধরা হত। এই রীতি-প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত যে লোককে যতটাকা যতবারে ধার দেওয়া হ'ত, সমস্তই এক সঙ্গে নির্দ্দিষ্টকালের ভিতর সুদসমেত চুকাইয়া দেওয়া হ'ত। এই নগদ-ধার প্রথার প্রবর্তন পর অবধি তেমন আর হ'ত না। নগদধারের অধমর্ণগণ সেই অবধি সুবিধা মতন প্রায়ই নিজের বা অপরের ব্যক্তিগত জামিনে ধার নিতেন এবং সুবিধামত যতটুকু সাধ্য চুকাতেন। ফলে একই লোক দু তিন দফায় হয়ত এতটাকা ধার নিলেন যা পূর্বে সম্ভব হ'ত না। ধার চুকাইবার সময়ও আর বাঁধা রইল না। অংশীদারী একবার নামা অনুসারে কোন ঋণ চার মাসের বেশি পড়ে থাক-

সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি তজবীজে প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারী ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় অদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক। ঐ তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও অদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে জন হাজার টাকা বখশীস পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এই রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না। সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বখশীস দেওয়া হইবেক। (সমাচার দর্পন ২২· ৫· ১৮১৯)

বার নিয়ম ছিল না। গর্ডন সাহেব তিনমাস অন্তর অধমর্ণদের হ্যাণ্ড নোট নতুন করে লিখিয়ে

নিয়ে খাতাপত্র আইনানুসারে ঠিক রাখতে লাগলেন।

দ্বারকানাথ দেখলেন যে তাঁর কথা ক্রমশ অচল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের সমস্ত টাকা কয়েকটী ইংরেজ কুঠীওয়ালার হাতে চলে যাচ্ছে। তখন তিনিও ঐ ব্যাংক থেকে মোটা রকম ধার নিয়ে বেশ কিছু টাকা টেনে নিলেন। কার ঠাকুর কোম্পানীর তরফ থেকে উপরোক্ত দু রকমেই বেশ ধার নিলেন এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালীকেই ধার নিতে বল্লেন। তখন নগদ ধারের সীমা ছিল তিন লক্ষ টাকা। তিনি তাঁর খিদিরপুরের জাহাজ মেরামতির কারখানার জন্য আড়াইলক্ষ টাকা ধার নিলেন।

কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্যাপারে দ্বারকানাথ হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে এদেশী অংশীদার যে কয়জন, ব্যাংক ফেল মারলে তাদের ঘাড়েই দেনা শোধের দায়িত্ব পড়বে। সাহেবেরা "অর্থ লুটিতে পাইলে লুটিবেন আর তার সুবিধা না পাইলেই বিলাতে ফিরিবেন।" কাজেই তিনি ব্যাংকে নিজের অংশও কমিয়ে আনতে থাকলেন। কিন্তু বাইরের সাধারণ লোকে এতকথা জানতো না। তারা দ্বারকানাথের নাম ডাকের জন্যই গোড়ায়-ইউনিয়ান ব্যাংকে গিয়েছিল এবং এখনও দ্বারকানাথের বিশ্বাসেই টাকা রাখছিল। এর ফল কিরকম হয়েছিল দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

অক্‌টর্নলী নামে এক যুবক মিলিটারী অফিসার সবে বিলাত থেকে এসেছে, সারাক্ষণ মদে বুঁদ হয়ে থাকে, কাজে কর্মে তৎপরতা নেই। তথচ ছেলেটীর আত্মীয়রা অনেকেই ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। বুড়ো জেনারেল অক্টার্নলীর স্মৃতিতে ত' তার কিছুদিন আগেই কলিকাতার ময়দানে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। বন্ধু অফিসাররা জানতে বেশী দেরী হল না বেচারী বিলাতে একটী মেয়েকে ভালোবাসত। আশা করেছিল এ দেশে এসে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সে মেয়েটীকে বিয়ে করবে। ভারতবর্ষে এসে দেখলে যে টাকা জমানো শক্ত বেশ কয়েকবছর চাকুরীর পরে মাইনে না বাড়লে সম্ভব নয়। তাই সে মনের দুঃখ ভোলবার জন্য মদ খায়। ব্যাপারটা জেনে তার বন্ধু হিতৈষীরা সমবেদনা জানালেন কিন্তু এমন টাকা তাঁদের কারুরই হাতে ছিল না যে ঐ পরিমাণ টাকা দান করে বা ধার দেয়। একজন ঠাট্টা করেই হোক বা ভক্তি করেই হোক পরামর্শ দিল কালীঘাটে মানত করতে—যেখানে মহামান্য কোম্পানীরও পূজা চড়ে। আরেকজন বল্লে এই কালোদেশের দেবদেবীর শরণাপন্ন হতে হয় ত' উলঙ্গপ্রায় কালীদেবীর চেয়ে চোগাচাপকান পরা দ্বারকানাথই ভালো। মানসিক করে হত্যে দিলে হাতে নাতে ফল। অক্টর্নলী তখন সবে কলকাতায় এসেছে রসিকতাটা বুঝতে না পেরে বল্লে "বেশ ত দু জায়গাতেই মানসিক করা যাক্‌। মন্দির দুটী কোথায় বাৎলে দাও।" বন্ধুটী উত্তর দিল "ইউনিয়ান ব্যাংকের ডিরেক্টরের ঘরে।" তখন রসিকতা বুঝতে পেরে অক্‌টর্নলী আক্ষেপ করলে আমার কাছে যেটা জীবনমরণ প্রশ্ন, তোমাদের কাছে সেটা হাসির বিষয়। তখন আরেকজন বুদ্ধি দিলে যে সত্যিই দ্বারকানাথের কাছে গেলে মন্দ কি—তাঁর কাছে ত' দশ বিশ হাজার টাকা কিছুই না। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতি ত' নেই চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি এই ভেবে সাহেব ইউনিয়ন ব্যাংকের দোতলায় দ্বারকানাথের ঘরের সামনে একদিন সকালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বারকানাথ তখন তাঁর ঘরে বেঞ্চিতে বসে "হরকরা" কাগজ পড়ছিলেন। চেয়ারের চেয়ে হাতাহীন বেঞ্চি ছিল তাঁর বেশী পছন্দ তাতে বসে তিনি কাজ করতেন আর ভাবনার কোন বিষয় উপস্থিত হলে গোঁফে তা' দিতেন। গোঁফের উপর হাত বুলিয়ে ডগটাকে পাকিয়ে নেওয়া—এ ছিল তাঁর মুদ্রাদোষ। লোকে বলত দ্বারকানাথের গোঁফের এক এক মোড়া, লাখ টাকার তোড়া। সাহেব যেতে কাগজ নামিয়ে দ্বারকানাথ জিজ্ঞেস করলেন "আপনাকে ত' চিনতে পারছি না। আপনি কে এবং কী চান? সাহেব আপনার পরিচয় দিয়ে,

ভালবাসার মুখ চেয়ে সব ব্যাপারটা কোনরকমে বলে ফেল্লেন। দ্বারকানাথ সবটা শুনে হরকরার ধারের সাদা অংশ খানিকটা ছিঁড়ে তাতে ইংরাজীতে "পে ১০,০০০ ডি টি" লিখে বল্লেন কেশিয়ারের কাছে যান বলে আবার কাগজ পড়ায় মনোযোগ দিলেন। কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে সাহেব ত ভীষণ চটে গেল ভাবলে এ আরেকরকম রসিকতা। খুব একচোট শুনিয়ে দেবে ভাবলে যে কালা আদমির সাহেবদের সঙ্গে এরকম রসিকতায় ফল ভালো হয় না, কিন্তু সুযোগ পেলে না কালো আদমিটী নিবিষ্টমনে কাগজ পড়তে থাকলো। তারপর পাতা ওলটাতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়তে সাহেব দাঁড়িয়ে আছে তিনি বল্লেন "দাঁড়িয়ে কেন? বল্লাম ত কেশিয়ারের কাছে যাও" তারপর বেয়াকে ডেকে সঙ্গে করে কেশিয়ারের কাছে নিয়ে বল্লেন। সাহেব ততক্ষণে ঠিক বুঝতে পারছে না এটা রসিকতা কিনা। যদি রসিকতাই হয় ত সেটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্য সাহেব বেয়ারার সঙ্গে নেমে ক্যাশঘরে এক বাঙ্গালীকে কাগজের টুকরোটা দিলেন। সে গম্ভীর ভাবে জিগ্গেস করল "নোটে না টাকায়?" সাহেব থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বল্লে "নোটে হলেই চলবে।" তারপর নোট গুনে নিয়ে বেরুবার সময় হুঁস হল যে যিনি এক কথায় এত টাকা দিয়ে এতবড় উপকার করলে তাঁকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত সে দেয় নি। তখন তাড়াতাড়ি আবার দোতলায় দ্বারকাথের কাছে ফিরে গিয়ে ধন্যবাদ না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে একটা হ্যান্ডনোট লিখে দিতে চাইলো। দ্বারকানাথ তার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে বল্লেন "আপনি ভদ্রলোক হন ত হ্যান্ডনোটের দরকার হবে না, ঠিকই টাকাটা ফেরৎ দিবেন; আর ভদ্রলোক না হন ত' হ্যান্ডনোটের কোন মূল্যই নেই।"

সাহেব পরে টাকাটা ফেরৎ ত' দিয়েছিলেনই, সারা জীবনের রোজকারও ঐ ইউনিয়ন ব্যাংকে রাখতেন —বলতেন যে তাঁর জীবনের সব সুখের মূল দ্বারকানাথ ও তাঁর ব্যাংক। তারপর যখন ইউনিয়ন ব্যাংক ফেল হয় তখন তিনি বেঁচে ছিলেন না কিন্তু তাঁর স্ত্রী সর্বস্বান্ত হন।

দ্বারকানাথের হাত থেকে যখন ব্যাঙ্কের সার্বভৌম ক্ষমতা (controlling authority) চলে যায় তখন তিনি নিজের liabilities কমিয়ে আনলেও সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি। একাধিকবার ইউনিয়ন ব্যাংকের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতের গ্লিন হ্যালিফ্যাং এবং কুটস্ কোং এই দুই কুঠীর উপর ইউনিয়ন ব্যাংকের দুই বৃহৎ হুণ্ডী গিয়ে উপস্থিত হয়। কুটস্ কোম্পানী গোড়ায় সেটা অস্বীকার করে। দ্বারকানাথ তখন বিলাতে, তিনি নিজে ঐ হুণ্ডীর প্রাপ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলে তবে কুটস্ কোম্পানী তাহা মানিয়া লয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইউনিয়ন ব্যাংকের একজন ডিরেক্টর প্রস্তাব করলেন যে কোন নীলকর ও তাঁর কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি একযোগে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা মূল্যের কোন কুঠীর দলিল বন্ধক রাখেন এবং তৎসঙ্গে বৎসরআন্তে উৎপন্ন মাল ব্যাংককে দিতে প্রতিশ্রুতি হন তবে তাঁকে বছরের গোড়াতে আনুমানিক মূল্যের কিছু কম টাকা হাওলাৎ দেওয়া যেতে পারে এবং যখন সে নীলকর বলবেন যে মাল তার গুদামে উঠেছে তখন তাঁকে অবশিষ্ট মূল্য দেওয়া হবে। এই নীতি অনুসারে পরের মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৪০) গর্ডন সাহেব গিলমোর কোম্পানীকে তাদের কয়লার খনির দলিল ও তাদের নিজেদের গুদামে রাখা কয়লার জামিনে অনেক টাকা হাওলাৎ দেন। এর পর আবার কলিকাতার বাড়ি বন্ধক রেখে আরও টাকা ধার দেওয়া হয়। ১৮৪১ সালের মন্ত্রণাসভায় পুনরায় আপত্তি ওঠে যে এরূপ জমিদারী, নীলকুঠী বা ইমারতের উপর হাওলাৎ দেওয়া উচিৎ নয় কারণ ঠিকমত নীল না জন্মিলে বন্ধকী সম্পত্তির কোন মূল্যই থাকবে না। তা ছাড়া একরারনামার সর্ত অনুসারে বিশেষ স্থল ব্যতীত অবান্তর জামিনে হাওলাৎ দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ।

এই প্রস্তাব গৃহীত ত' হলই না, প্রত্যুত এর বিপক্ষে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এইরূপ হাওলাতী প্রথা অতি লাভজনক ও নিরাপদ।

ইতিমধ্যে ১৮৪০ সালের অক্টোবারে সিঙ্গাপুরে ইউনিয়ন ব্যাংকের একটী শাখা খোলা হয়—এর প্রধান কাজ ছিল বিল অফ এক্সচেঞ্জ কেনাবেচা করা। ১৮৪৭ এর জুন মাস পর্যন্ত এ শাখাটী চালু ছিল।

১৮৪২ সালের মাঝামাঝি এই হাওলাতী প্রথার ফলে নীলকুঠী ও রেশম ও অন্যান্য কুঠীর উপর কর্জ ও হাওলাত দাঁড়ায় প্রায় ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার মত। ঐ বৎসরের শেষে ফারগুসন ব্রাদার্স, গিলমোর কোম্পানী প্রভৃতি কয়েকটী কুঠী ফেল মারায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আটকে যায়। ঐ টাকা উদ্ধারের আশায় আরও ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দেখা যায় কেবল দুটী কুঠীর নীল-কুঠী মাত্র বন্ধক রেখে ত্রিশ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল।

১৮৪৩ সালে ষাম্মাসিক সভায় স্থির হয় যে ব্যাংকে যে সব নীলকুঠী বন্ধক আছে সেগুলিকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনমত হাওলাত দেওয়া হ'ক আর ঐসব দেউলিয়া নীলকুঠীর সত্ত্বাধিকারীরা হাওলাতের উপর যে সাহায্য পাচ্ছিলেন তা যেন বন্ধ করা না হয় কারণ হঠাৎ সে সাহায্য বন্ধ হলে তাঁদের বড় কষ্ট হবে।

এইসব ব্যাপারের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে। তিনি বিলাতে থাকার সময় এবং এদেশে ফিরে ব্যাংকের অধোগতি রোধের চেষ্টা করেন। বিলেত থেকে ফিরে ১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ দেখি আবার পরিচালক সভার অন্যতম সভ্য হয়েছেন। বছরের ডিসেম্বর মাসে গর্ডন সাহেব নানা গোলোযোগের ফলে একরকম বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর জায়গায় ব্যাংকের বিলাতস্থ অংশীদাররা জেমস্ কর্লভিন্ স্টুয়ার্টকে সম্পাদক মনোনীত করেন। ইনি কমার্শিয়াল ব্যাংকের একজন অংশীদার ছিলেন এবং ম্যাকিনটস কোম্পানীর পতনের পর বিলাতে চলে গিয়েছিলেন। ইনি বছর দুই সম্পাদক ছিলেন—সেসময়ে ব্যাংকে বিশেষ কোন গোলোযোগ উপস্থিত হয় নি।

দ্বারকানাথ নিজে উপস্থিত না থাকলে ইউনিয়ন ব্যাংকের দশা যে কি দাঁড়াবে সেবিষয়ে বোধহয় তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার প্রাক্কালে ইউনিয়ন ব্যাংকে তাঁর যে অংশ ছিল তৎসমুদয় বিক্রী করে উহার সহিত সম্পর্ক প্রায় রহিত করে আনেন। তখন পর্যন্ত ব্যাংকের অবস্থা খারাপ ছিল না তার প্রমাণ পাই ১৮৪৫ এর পয়লা নভেম্বরের "আগ্রা আখবার" এর এক প্রবন্ধে। কিন্তু তার দুইবৎসরের ভিতর ১৮৪৭ সালের বড়দিনের সময় (২৪শে ডিসেম্বর) যখন ইউনিয়ন ব্যাংক টাকা দেওয়া বন্ধ করে তখন তাহার ক্যাশবাক্সে মোট ৭৪০ টাকা মাত্র পাওয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অংশীদার-দের মধ্যে কাহাকে কত ঋণ পরিশোধার্থে দিতে হবে তার তালিকা প্রস্তুত হয়। সেই তালিকায় ঠাকুর গোষ্ঠীর প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও মথুরানাথ ঠাকুরের নাম আছে কিন্তু দ্বারকানাথ বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাহারও নাম ছিল না।

উপন্যাসে বক্তব্য

রণেন্দ্রনাথ দেব

উপন্যাস যে বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখেনা। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে নিঃসংশয়ে বলা যায় পাঠক সমাজে উপন্যাসের প্রতিপত্তি অসাধারণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলায় ও জন সংখ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির হার ক্রমবর্ধমান হওয়ায় স্বভাবত পুস্তকের ব্যবসায় স্ফীত হয়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত, সূক্ষ্ম রুচিবান ও অপেক্ষাকৃত স্থূল ভোগবিলাসী মনের দাবি মেটাতে সক্ষম বলে উপন্যাস ক্রমশ অধিকতর মর্যাদা অর্জন করেছে। উপরন্তু, বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও জীবনে যে দুরূহ জটিলতার জন্ম হচ্ছে, ছোটো গল্প কিংবা কবিতা, এমনকি নাটকও তার পূর্ণরূপ প্রস্ফুটনে সমর্থ বলে মনে হয় না। সামাজিক পরিবর্তন প্রবাহের দুর্বার গতি, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ব্যাপকতা ব্যক্তি জীবনের দুরবগাহ রহস্য এবং ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বিষয়ে অধিকতর আগ্রহে এযুগের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। উপন্যাসের বহু-বিস্তৃত পটভূমিকায়ই শুধু এসব বিষয়ের উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব। আমাদের এই যুগ ও উপন্যাসের আত্মীয়তা নিবিড়।

কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপকতা একদিক থেকে সমালোচকের পক্ষে ভয়ের কারণ। সংখ্যায় প্রচুর ও বিষয়ের বিচারে বহুমুখী বলেই উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্য অন্তহীন। সেজন্যে এমন একটি কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই যার দ্বারা অধিকাংশ উপন্যাসের মূল্যনিরূপণ করা যায়। সমালোচক উপন্যাসের কোন্ গুণটিকে শ্রেষ্ঠ বলবেন? এর বিচ্ছিন্ন বাস্তবধর্মী দৃশ্যবলী, না এর 'রস রূপ-'-কে? সুচতুর ঘটনা বিন্যাস, না তার অন্তর্বিহিত জীবন-ব্যঞ্জনাকে? বলাবাহুল্য এর 'রস রূপ'-কে? সুচতুর ঘটনা বিন্যাস, না তার অন্তর্নিহিত জীবন-ব্যঞ্জনাকে? বলাবাহুল্য এসববিষয়ে ঐকমত্যের আশা করা অন্যায়।

উপন্যাসের আশ্রয় মানুষ, যে মানুষ কাল্পনিক নয়, ভাবমণ্ডিত নয়। বাস্তব সংসারে সে রক্ত মাংসে গঠিত, দ্বন্দ্বের মধ্যে তাকে জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। এ রকম বাস্তব মানুষের গল্প অবশ্য প্রাচীন রোমান্স কিংবা মহাকাব্যে ছিল না। কিন্তু, এও উপন্যাসের চরম কথা নয়। বাস্তব জীবনের ও মানুষের গল্পকে বিভিন্নভাবে বলার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের বিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমযুগের উপন্যাসে এবং এখনো অধিকাংশ জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থে ঘটনা-সন্নিবেশ কৌশল মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার এ'রা কেউই ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে বিরত ছিলেন না। পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে গেলে ঘটনা সংস্থাপনে নিপুণ হওয়া চাই। যেখানে ঘটনাবলীতে সূক্ষ্ম কার্যকারণ-শৃঙ্খলা রয়েছে, আখ্যান-বিন্যাসের গুণে তা পাঠকের চিত্ত জয় করে। আখ্যান-বিন্যাস এক রকম নয়, তার রূপ ভেদ অজস্র। কোনো কাহিনীতে ঘটনা কালানুক্রমিক, আবার কখনো তা স্মৃতির টানে স্রোতের বিপরীতে চলে। কোনো কোনো গল্পে সৌন্দর্য-বিধান করে ঘটনার প্রাতসাম্য, অন্য কোনো গল্পে ঘটনাসমূহকে মনে হয় দুশ্ছেদ্য গাণিতক নিয়মে বিধৃত।

সহজেই বোঝা যায় আখ্যান-বিন্যাস কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও এর মূল্য

ঐকান্তিক নয়। নাটকেও আখ্যান-বিন্যাস উচ্চস্থান অধিকার করে, কিন্তু সে কারণে নাটক কেবল আখ্যানাত্মক নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক আখ্যান বিন্যাসের চূড়ান্ত উদাহরণ হওয়া সত্ত্বেও বলতে হয় এর সৌন্দর্য শুধু এই একটি গুণে নয়, অনেক গুণের সমবায়ে সৃষ্ট। পাত্রপাত্রীর সংলাপ, কবিত্বময় ভাষা, জীবনের উচ্ছ্বসিত স্পর্শ, এর কোনটি শেক্‌স্‌পীরিয় নাট্যকলার সমুন্নতির হেতু জানিনা আমরা।

আখ্যান-বিন্যাসের ধারণাটিও কাছে স্পষ্ট নয়। "বিষবৃক্ষ" এবং "শ্রীকান্ত" দুটি উপন্যাসেই ঘটনাধারা কালানু ক্রমিক। কিন্তু "বিষবৃক্ষে" ঘটনার মধ্যে যে অমোঘ শাসন আছে "শ্রীকান্তে" তার পরিবর্তে পাওয়া যায় জীবনের একটি শিথিল এলায়িত মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম অথবা স্থূল যে অর্থেই গ্রহণ করা হোক আখ্যান-বিন্যাসকে প্রাধান্য দিলে গঠন গত শিল্পকৌশলকে বড় করা হয়। শিল্পকৌশলের বিধিবদ্ধ রূপ নেই। "কপালকুণ্ডলায়" যে শিল্পকৌশল খুব স্পষ্ট "স্বর্ণলতায়" তা নেই। অথবা তা এমন ভাবে মিশে আছে যে তাকে কোনো কৌশল বলে চেনা যায় না। একজন লেখকের চাইতে আর একজন লেখকের শিল্পকৌশল পৃথক হবে এবং এক কৌশল একই লেখক বারবার প্রয়োগ করবেন না। এই কারণে আখ্যান-বিন্যাসকে উপন্যাসের আত্মা বলা অসঙ্গত।

অতএব লেখকের ঘটনা সাজানোর ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আরো বেশি প্রয়োজন চরিত্রসৃজনে দক্ষতা। রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর গল্প ব্যর্থ হয় চরিত্র বানাতে না পেরে। পক্ষান্তরে, যে-সকল উপন্যাসকে আমরা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জানি তাদের অধিকাংশই আমাদের মনে গেঁথে থাকে কোনো চরিত্র অবলম্বন করে। "বিষবৃক্ষ" কিংবা "গোরা" কিংবা "পুতুলনাচের ইতিকথায়" ঘটনা সাজাবার কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ করলেও ততটা লক্ষ্যগোচর হয় না যতটা হয় তাদের বিভিন্ন চরিত্র—নগেন্দ্রনাথ—সূর্যমুখী, গোরা—সুচরিতা, শশী ও কুসুম।

অথচ চরিত্রাঙ্কনকেও উপন্যাসের কেন্দ্র বলার উপায় নেই। যেসব অবিস্মরণীয় চরিত্র আমরা পাই উপন্যাসে তাদের সকলের প্রকৃতি এক নয়। ইংরাজি উপন্যাসের গোড়ার দিকে প্রাণবন্ত চরিত্রের প্রাচুর্য দেখা যায়, ভিক্টোরীয় যুগে তাদের স্থান অধিকার করেছে এমন মানুষ যাদের জীবন অনেক বেশি সীমাবদ্ধ। ঊনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র আঁকতেন প্রতাপ কিংবা বীরেন্দ্রসিংহ কিংবা সত্যানন্দের। এযুগের মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাসে যে চরিত্র পাই তাকে মানুষের ভগ্নাংশ বলে ভ্রম হয়। সুতরাং ঘটনা-বিন্যাসের মতো চরিত্র সৃজনও আসলে উপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়।

সেজন্যে উপন্যাসের বিচারে সমালোচক বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হন। কোনো একটি লক্ষণ উপন্যাসে প্রবলতম নয়, তার সবকটি অঙ্গের গুরুত্ব সমান। ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কন দুটিই উপন্যাসে অপরিহার্য, তবু বলা উচিত, এরা উপন্যাসের শেষ লক্ষ্য নয়। এদের প্রাধান্যে ভালো উপন্যাসের জন্ম হতে পারে, কিন্তু মহৎ উপন্যাসের জন্ম হবে নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। যাকে আমরা বিনা তর্কে মহৎ সৃষ্টি বলে মেনে নিই তাতে ঘটনা চরিত্র সংলাপ বর্ণনা কোনোটারই আত্যন্তিক মূল্য নেই। এরা অন্য কোনো মূল্যের মুখাপেক্ষী। সে মূল্যকে একজন লেখক বলেছেন লেখকের "বক্তব্য"।[১] ঘটনায় চরিত্রে কথোপকথনে ভঙ্গি-চাতুর্যে লেখকের কিছু বক্তব্য গাঢ় হতে থাকে। সেই বক্তব্যের গভীরতার ওপরে উপন্যাসের মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রভাতকুমারের উপন্যাসকে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চাইতে নিকৃষ্ট বলা হয় তার অর্থ এই

---

১ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার—উপন্যাসের পরিক্রমা, "পরিচয়" আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২, পৃঃ ৩৮৪।

যে গল্পবলার ও চরিত্রসৃষ্টির কুশলতা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার তার বক্তব্যের দ্বারা আমাদের কোনো অবিস্মরণীয় ও অন্যত্র দুর্লভ অভিজ্ঞতা দিতে পারেন নি যেমন পেরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে কোনো ঔপন্যাসিকের সাহিত্যিক কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে তাঁর বক্তব্যের পরিচয় নিতে হবে। তিনি কুশলী শিল্পী, একথা বলবার পরেও জিজ্ঞাসা থাকে তিনি জীবন সম্বন্ধে কি কথা বলে গেলেন এবং তা আমাদের জীবনবোধকে আন্দোলিত করে কিনা।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বক্তব্য তাঁদের জীবন দর্শন থেকে বিচ্ছুরিত হয়। কেন শিল্পীরা জীবনের পরিদৃশ্যমান সরল বিন্যাসকে অতিক্রম করে জটিলতার নীতি নিয়মকে আবিষ্কার করতে চান তা বুঝতে হলে শিল্পীর মনোজীবনকে জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনদর্শন তাঁর একান্ত নিজস্ব, তাঁর স্বকীয় মনোস্বভাবের অনুগত। সেই মনোস্বভাবে দুটি ধারা মুখ্য।

প্রথমত, শিল্পী শুধু জীবনদ্রষ্টা নন, জীবন সমালোচকও বটে।

দ্বিতীয়ত, এবং প্রথম কারণেরই ফল এটি, শিল্পী কেবল যা ঘটেছে তার বিবরণ দেন না। যা ঘটা উচিত, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে রূপ ধ্যান করেন, তারও পরিচয় দেন।

এক কথায় বলতে গেলে, শিল্পীর মূল্যবোধ তাঁর লেখাকে পদে পদে প্রভাবিত করে।

শিল্পীর মূল্যবোধ এমন বস্তু নয় যা চিরস্থির কিংবা প্রাকনির্দিষ্ট। যেহেতু শিল্পী জীবনের সঙ্গে অনিবার্যত জড়িত। কোনো ধূসর শূন্যতার উপাসক নন, তাঁর মূল্যবোধও নানাভাবে আঘাতে প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বে ও দ্বিধায় গড়ে ওঠে। জীবনের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ধারণা সমূহ ও অভিজ্ঞতা ক্রমাগত রূপান্তর লাভ করে ও পরিণত হতে থাকে। রূপান্তর ও পরিবর্তন সম্ভবপর হয় এই কারণে যে তিনি জীবনের নিস্পৃহ দর্শকমাত্র নন। যে-মুহূর্ত থেকে তিনি জীবন-সমালোচক সেই মুহূর্ত থেকে তিনি জীবনকে একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করেছেন। বাস্তব সংসারের নরনারীর সঙ্গে তিনিও জীবন যাপন করছেন, সংগ্রাম করছেন। প্রত্যক্ষ সংসারকর্মের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের যোগ খুব গভীর বলে কবি কিংবা দার্শনিকের কর্মের সঙ্গে উপন্যাস রচনার ব্যবধান রয়েছে।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য যখন মূল্য বোধের দ্বারা শাসিত এবং সে-মূল্য বোধ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস, জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কাহিনীতে তার প্রকাশ ঘটে কি উপায়ে। এই দৃষ্টিতে দেখলে পৃথিবীর সব উপন্যাসই লেখকের মতামতের দ্বারা অনুরঞ্জিত, হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট, রচনা। তবু এরকম রচনা আমাদের শিল্পপ্রতীতিকে আহত করেনা, কারণ

লেখকের মূল্যবোধ গতানুগতিক কিংবা ধার করা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে একীকৃত। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য থেকে তার জীবন্ত প্রেরণা পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। এবং

শ্রেষ্ঠ রচনায় লেখকের মূল্যবোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হয়ে কাহিনীর পরিমণ্ডলে শুভ্রভাবে মিশে থাকে।

প্রতিভাবান লেখক কি করে তাঁর মূল্যবোধকে কাহিনীর বৃন্তে অম্লানভাবে ফুটিয়ে রাখেন তা চিরকালই কৌতূহলের বিষয় এবং চিরকালই দুর্জ্ঞেয় থেকে যাবে। শিল্প মনের সৃজন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে প্রতিভার রহস্য মেনে নিলেও ভালো উপন্যাসে কি উপায়ে লেখকের মূল্যবোধ স্ফুরিত হয় কিছুটা অনুমান করা যায়। হেগেল বলেছেন উপন্যাসের চরিত্র একই সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্র এবং বর্গ চরিত্র। বিশেষ ও নির্বিশেষের পরিপূর্ণ সমন্বয় যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্মের পক্ষে অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ আছে এবং তার দ্বারা কাহিনীর

বক্তব্য, বর্ণিতব্য জীবনের অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনা, প্রভাবিত হচ্ছে—প্রথম দৃষ্টিতে এই মত সংকীর্ণ মনে হলেও এর সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কোনো ঔপন্যাসিকের জীবন-কথা বিচার করলে তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য এবং তাঁর মূল্যবোধের একাত্মতা উপলব্ধ হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে উপন্যাস বিচারের কোনো একটি মান-দণ্ড নেই, অনেকভাবে তার বিচার করা সম্ভব। তবে সকল বিচারের শেষেই কোনো না কোনো ভাবে বক্তব্যের বিচার দেখা দেয়। আধুনিক কালে বক্তব্যের গুরুত্ব আরো বেশি এই জন্য যে শিল্পীর মূল্যবোধ সাহিত্যের জনপ্রিয়তম শাখা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের যতটা গভীরভাবে স্পর্শ ও অভিভূত করতে পারে আর কিছুতে তা হয় না। উপন্যাসের এই বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে কেবল ঔপন্যাসিক নয়, পাঠকও সচেতন। আমাদের কাছে লেখক শুধুই লেখক নন, তার অতিরিক্ত আরো কিছু। শ' কেবল নাট্যকার নন তিনি 'প্রফেট'। ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর উপন্যাসের প্রচলিত সমালোচনা পড়ে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলি 'সেক্সচুয়াল' নয়, "ফ্যালিক" শিল্পী যে শুধুমাত্র শিল্পী হয়ে তৃপ্ত নন এই মনোভাব তাৎপর্য পূর্ণ। আমরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে আখ্যা দিয়েছি "ঋষি", রবীন্দ্রনাথকে বলেছি "গুরুদেব", আর শরৎচন্দ্রর বহু প্রচারিত বিশেষণ "দরদী"। এসবের দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয় উপন্যাসে লেখকের বক্তব্যকে এযুগে কত দূর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শিল্পীর অপমৃত্যু ঃ কবি লারমনতভ্

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

We drink the cup of life while yet
A veil our eyes is keeping;
And the cup's golden brim is wet
With tears of our own weeping.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রুশ-সাহিত্যের মহান-কবি পুশকিনের অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় মৃত্যুতে যেমন একদিকে সেই সাহিত্যে এক চরমতম অন্ধকার এল নেমে, ঠিক তেমনি এই অসাধারণ ক্ষতি আর একটি মহান কবির প্রকাশক্ষণকে তৎপর করে দিল। এই শোকাবহ মহীরুহ-পতনে যখন সমস্ত জাতি বিক্ষুব্ধ, অশ্রুমগ্ন ও দিশেহারা তখন বহুদূর হ'তে এক তরুণ চঞ্চল সৈনিকের বেয়নেট-লেখনী হতে উত্তেজনাপূর্ণ একটি কবিতার উৎসরণ ঘটল। আর এই অশান্ত-লগ্নই তাঁর সাহিত্যে অনুপ্রবেশের প্রারম্ভিক ইতিহাস ও তৎপর ক্রমশঃ দৃপ্তকন্ঠে অগ্রগমন। এই সেন্ট-পিটার্সবার্গেই তাঁরই হাতে রুশ কবিতার নতুন আশা ধ্বনিত হ'ল।

কাব্যাস্বাদনে কবি-জীবনী কতটা প্রয়োজনীয় সে বিতর্কে অনুপ্রবেশ না ক'রেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কবি লারমনতভের জীবনাচরণ কাব্যপাঠকের কাজে অজ্ঞাত থাকলে কবিকে উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। কবির কাব্য ও কবিজীবনী এক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত--এ দুয়ের বিবিক্ততা কাব্য-মূল্যায়নে অকল্পনীয় ও একরূপ অসম্ভব।

লারমনতভের জীবন দ্বন্দ্বমথিত, বাধায় পরিপূর্ণ। জীবনে তিনি অতৃপ্ত, সর্বোপরি বিতৃষ্ণ। পিতামাতা সাধারণ অভিজাত। কবির আত্মজীবনী হতে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর এক পূর্বপুরুষ স্কটল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় এসে জারের অধীনে কাজ ক'রতে আরম্ভ করেন ও সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হন। শিশুকাল হ'তেই মাতৃস্নেহবঞ্চিত হয়ে মাতামহীর কাছে প্রতিপালিত হবার ফলেই তিনি কিছুটা অবাধ্য হয়ে ওঠেন। এ-অবাধ্যতা আমৃত্যু কবি-জীবনে দৃঢ়ভাবে সংলক্ষ্য। কৈশোরে উপযুক্ত শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। ফরাসী-শিক্ষক তাঁকে ফরাসী কবিতায় ভালবাসা জন্মান। কিন্তু তাঁর ধাত্রীর কাছে তিনি যে রূপকথা-উপকথা শুনেছিলেন তা' তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এর প্রভাব উত্তরজীবনেও সুপরিব্যাপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু স্বাধীনচেতা, উদ্ধত ও উন্নতশির কবি সেখানে বেশীদিন কাটাতে পারেন নি। সীমিত গন্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন নি কোনোদিন। অকিঞ্চিৎকর-অনিষ্টকর খেয়াল ও অবাধ্যতার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাড়িত হন এবং পরের দুবছর মিলিটারী স্কুলে কাটান। এইসময়ে তিনি এক বন্যজীবন যাপন করতে থাকেন। এর পিছনে অপরিসীম ছিল তাঁর দৈহিক শক্তি যদিও এক-পা তাঁর ছিল ছোট। এখানে যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই তাঁর আত্মাদর ও চরিত্রের উত্তেজিত ক্রোধোদ্দীপনা বর্দ্ধিত হয়েছে। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত মনোভাব ও বিচ্ছিন্ন জীবনাদর্শের মধ্যেও কবিতার জন্ম বিঘ্নিত হয় নি। এইখানেই প্রমত্ত কবির সৃষ্টির অপূর্বতা ও সার্থকতা এবং তার শৈল্পিক মর্যাদা।

প্রাজ্ঞদের সাথে পরিচয়ের গন্ডী ছিল তাঁর স্বল্প ও সীমিত; কারণ এতে তাঁর চরম

অনীহা। নিঃসঙ্গ একাকীত্বকেই তিনি জীবনে বরণ করেছিলেন। সত্যকার বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধু তাঁর অপ্রচুর ছিল। এ পৃথিবীর প্রতি কবির দৃষ্টি ছিল রোমাণ্টিক ও নৈরাশ্যে ভরপুর।

গার্ড রেজিমেণ্ট থাকাকালীন কবিতায় নির্ভীক ও প্রবল মতবাদপ্রচারে অখ্যাতি ও বিরুদ্ধ স্বভাবের জন্য তিনি পুনঃপুনঃ বদলি হতে থাকেন। চরম শাস্তিও তাঁকে শান্তচরিত্রে ও ধীরস্বভাবে পরিণত করতে পারে নি। এই অশান্ত ও অপরাজিত মনোভাবের ফলেই তিনি বারবার ডুয়েট লড়েছিলেন। ফরাসী-রাষ্ট্রদূতের পুত্রের সঙ্গে কবির ডুয়েল লড়াই হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের এক বহির্ঝটিকার মধ্যে কবির জন্ম আর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই পিয়াতিগোরস্ক-এ শেষ ডুয়েলে অকল্পনীয় তাঁর জীবনাবসান।

And yet if someone questions you,
Whoever it may be,—
Tell them a bullet hit me through
The chest,—and did for me.
And say I died, and for the Tsar,
And that I shook you by the hand,
And spoke about my native land.

ঊনবিংশ শতকের রুশ-সাহিত্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পুশকিন ও লারমনতভের আগে সত্যকার সার্থক কবি রাশিয়ায় জন্মান নি। এই বিচারে রুশ-সাহিত্যে বিরাট কোনো অতীত ঐতিহ্য নেই। তদুপরি এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে কথাসাহিত্যে এ সাহিত্য যতখানি অতি উন্নত, কাব্যে ততখানি নয়। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ' এই যে, রুশ-কবিতা চিরকালেই অতি প্রশান্ত, গণজীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত,—যেমন তার কথাসাহিত্য। ঊনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কিছুদিনের ব্যবধানে পুশকিন ও লারমনতভ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সত্যকার রুশ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করেন। এঁদের দুজনের কবিতাতেই বাচনভঙ্গি সহজ-সরল। এই দুই পথিকৃৎই ছিলেন রোমাণ্টিক গীতিকবি যাঁরা সার্থক গদ্যরচনায়ও অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরবর্তী-কালের কবিরা এই দুই কবির অক্লান্ত-সাধনার সার্থক ফসল।

বহির্বিশ্বে লারমনতভ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক কবি হিসাবে বহুখ্যাত। ঊনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষ করে রুশ-সাহিত্যে এই রোমাণ্টিক ভাবধারা ছিল দূরপ্রসারী ও সংক্রামক। পশ্কিনে যার সার্থক উদ্ভব ও যৌবন-পরিণতি লারমনতভের মাধ্যমে তারই সুষ্ট অগ্রগতির পথ লক্ষ্য করা যায়। রোমাণ্টিক-ভাবধারায় বিশ-শতকের কবিগোষ্ঠীর উপেক্ষণীয় দৃষ্টি থাকলেও তখন এ ভাবনা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই কবি হাইনে রোমাণ্টিক সৃষ্টিকে চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করেছেন—যাতে আছে অসীমতার ব্যঞ্জনা, স্পর্শ অতীত কোনো অবয়ব-কল্পনা। এর গণ্ডী অতিক্রম করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এর উপরে আবার তৎকালীন রুশ ইতিহাসকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

লারমনতভ কখনও ছিলেন শুধু প্রবহমান আবেগপ্রবণতায় আবিল, কখনও বা ছিলেন অশনিতুল্য আলঙ্কারিক। কিন্তু আন্তরিক অনুপ্রেরণার চরম মুহূর্তে তিনি রোমাণ্টিক-দৃষ্টির হিমালয়-শীর্ষে উপস্থিত হন—যা রাশিয়ার অন্যান্য রোমাণ্টিক কবিতেও দুর্লভ। শেষেরদিকের দুটি গীতিকবিতায় তাঁর প্রতিভার স্বর্ণ-স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। কবিতা দুটি Demon এবং Mtsyri। এই দুটি বর্ণনাত্মক গীতিকবিতায় তাঁর ভাব প্রকাশের স্বচ্ছতা ও প্রত্যয় পাঠককে

অবাক করে দেয়। অনেক সময়েই মনে হয় তাঁর গীতিকবিতাগুলো সকল ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির ঊর্ধ্বে এবং রুশ ও অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে মহৎ-সৃষ্টি।

ইউরোপীয় সমালোচকেরা প্রায় প্রত্যেকেই লারমনতভের কাব্যে বায়রণের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে রুশ-সাহিত্য যখন একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হল তখন বায়রণের প্রভাব ছিল সুপ্রচুর। বায়রণের দৃপ্ত-নির্ভীক প্রকাশকে তৎকালীন রুশ-সাহিত্যিকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পুশকিনের উপর তাঁর প্রভাব তো সুবিদিত। তিনি বায়রণের নিকট ভাব ও ভাবনা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীটিও আয়ত্ব করে কবিতায় রাশিয়ার আত্মার বাণীকে, অন্তর্জীবনকে সুপ্রকাশিত করেন। তাই লারমনতভের কাব্যেও যে পরিবেশের জন্যে তার প্রভাব থাকবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। From Byron, Lermontov learned to speak of himself as he really was, in his strange contradictions of affection and hatred, of delight and boredom, of sentiment and irony, of love of society and love of solitude. উপযুক্ত উক্তিটি আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর এই অনুকরণেই লারমনতভের সৃষ্টি-চাতুর্যের ত্রুটি। কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে জাগে, তিনি সর্বাংশে কখনই বায়রণকে অনুসরণ করেন নি—কারণ বায়রণ অনেকাংশেই রোমান্টিক ছিলেন না;—অন্যথায় লারমনতভের কবি-মনটি বায়রণের মত অর্দ্ধ-ক্লাসিক ও অর্দ্ধ-রোমাণ্টিক ছিল না। রোমাণ্টিকতার প্রাচুর্য সেখানে লক্ষণীয়। লারমনতভ্ ছিলেন স্বপ্নারনুক্ত কল্পনাপ্রবণ, রুশ আত্মার অতীন্দ্রিয়তা ও অমূর্ত মানসিকতা-প্রকাশে অতি-উৎসুক।

রোমান্টিক কবি-হিসাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন সমগ্র রুশ-সাহিত্যে দুর্লভ, তেমনি শুধু এই আখ্যাদানেই তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। প্রতিভার এই বিচিত্রতার জন্যও তিনি সমপরিমাণে স্মরণীয়। শোচনীয় জীবনাবসানের পূর্বে তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তাও বাস্তবায়িত হয়েছিল যার গতি ও প্রকাশমাধুর্যকে অস্বীকার করা যায় না। বাস্তব-প্রতিফলনেও তিনি নিপুণ শিল্পী। এখানে তাঁর কল্পনাবিলাসতা সর্বাংশে অনুপস্থিত—মাটির টানে মনের বল্গা অন্য রূপ নিয়েছে। স্থানে স্থানে মনে হয়, তিনি যেন এখানেই অতি-সার্থক। বাস্তব কবিতা-সৃষ্টিতে তিনি 'জেনুইন মাষ্টার'।

লারমনতভের সৃষ্টিরগভীরতা, বিস্তৃতি ও তদুপরি বৈচিত্র্য সহৃদয় পাঠককে সত্যকার রসলোকের সন্ধান দেয়। মাত্র চার-বছরের সাহিত্য-সাধনায় এর তুলনা মেলা দুষ্কর। তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক। গদ্য-লিখনে তিনি অসাধারণ, সমকক্ষহীন। অতি অল্প বয়সেই এতে তাঁর হাতে খড়ি হয়। 'এ হিরো অব্ আওয়ার টাইম'—রাশিয়ার প্রথম মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাস। অনেক সমালোচক এই বিশ্লেষক উপন্যাসটিকে তাঁর কবিকৃতিরও উপরে স্থান দিতে চান—সংযতবাক কবি অতি-দক্ষতার সাথে উপন্যাসটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তলস্তয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি'র পূর্বে এইটিই ছিল রাশিয়ার মহান উপন্যাস।

শুধু সাহিত্যবিচারে নয় কবির জীবন-দর্শন উপলব্ধিতেও উপন্যাসটি অমূল্য সম্পদ। বারবার ডুয়েল লড়বার ফলে তিনি যেন অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনাবসান বোধহয় এতেই ঘটবে। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়কের জীবন-পরিণতির সঙ্গে কবির নিত্য-জীবনের এমন আশ্চর্য মিল। নায়ক কবির আত্ম-প্রতিকৃতি, আত্ম-আলেখ্য। নায়ক বীর শক্তিমান কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং একটি কবিমন তাঁর সদাসর্বদা ছিল। জীবন-অতিবাহিত-অন্তে ডুয়েল লড়বার সময় নায়ক

বলছে,—'আমার মৃত্যুতে পৃথিবীর এমন কিছু বৃহৎ ক্ষতি হবে না—আমার নিজেরও কোনো ক্ষতি নেই। আমি জীবনে চরমতম বীতশ্রদ্ধ।..আমি অতীতের পানে তাকাই আর নিজেকে প্রশ্ন করি—কেন আমি জন্মেছি? কেন আমি বেঁচে আছি? এর সার্থকতা কি? ধিক্কারমিত এই উক্তিই লারমনতভের জীবনপ্রশ্ন, জীবনদর্শন।

সাহিত্যক্ষেত্রে লারমনতভের মত কৌতূহলী কবি দ্বিতীয় নেই। অস্বাভাবিক তাঁর সাহিত্যে আবির্ভাব আর অকল্পনীয় তাঁর সাহিত্য ও জীবন হতে অবসর গ্রহণ। He was like a plant that above all others needed a sympathetic soil, a favourable and careful attention. কিন্তু সত্যই কি সর্বহারা বিবাগী কবি এগুলি পেয়েছিলেন নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন সমাজ হতে? তাই সেই সমাজ-পরিবেশে বহু-আঘাত-পাওয়া কিছু-না-পাওয়া অভিমানী কবি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন:—

For all, for all, my thanks to Thee I offer,
For passion's mortyrdom that one knew,
For poisoned kisses, for the griefs I suffer,
Vengeance of foes, slander of friends untrue,
For the soul's ardour squandered in waste places,
For everything in life that cheated me,—
But see that now and after such Thy grace is
That I no longer must give thanks to Thee!

মধুসূদন ও মৈথিলীশরণ ঃ সম্পর্ক নির্ণয়

সুমন রায়চৌধুরী

ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রুতি সারা ভারতের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। বাংলার সাহিত্যিক অভ্যুত্থানের কেন্দ্র বিন্দু থেকে তরঙ্গবৃত্ত ছড়াতে দেখেছি ভারতভূমির চতুর্দিকে। বাংলা গদ্যে বঙ্কিম এবং কাব্যে মধুসূদন যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন তার প্রভাব ভারতের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার করল। বাংলার সাহিত্যদীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে হিন্দী সাহিত্যে নবযুগের জন্মদাতা ভারতেন্দুজী স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন——

"আমাদের সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলা ভাষার অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডারের সহায়তায় হিন্দী ভাষা নিজের প্রভূত উন্নতি সাধন করুক।"

এই কাজে ভারতেন্দুজী নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহনের বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দর'। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে একই ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত হত বাংলা "প্রবাসী" এবং হিন্দী 'সরস্বতী'। শোনা যায় দ্বিবেদীজী সরস্বতীকে গড়ে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ'এর আদর্শেই। অন্য-দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন হিন্দীর কথাসাহিত্য-সম্রাট প্রেমচাঁদ। হিন্দী-বাংলার এই সখ্যের বন্ধনকেই দৃঢ়তর করেছেন একালের রাষ্ট্রকবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। মহাকবি মধুসূদনের কাব্যের প্রতি গুপ্তজীর গভীর অনুরাগ ও সক্রিয় শ্রদ্ধা এই আত্মীয়তাকে করেছে আরো ব্যাপক, আরো নিবিড়। দুজনের কবি ধর্মের আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। গুপ্তজী এবং মধুকবি দুজনেই আমাদের কাছে মহাকবি —প্রধানভাবে মহাকাব্যের কবি বলে পরিচিত। একালে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলতে আমরা যা বুঝি, বলতে গেলে মধুকবিই বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম ও একক সার্থক রচয়িতা। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত চলে এসেছে মধ্যযুগের ধারা, সেখানে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ দু'একটি পেলেও কোন মঙ্গলকাব্যকেই সত্যিকারের সাহিত্যিক মহাকাব্য বলতে পারি না। ভারতচন্দ্রের পর ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বস্তুধর্মী খণ্ডকবিতারই রচয়িতা। মধুসূদনের আগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য পাই না, পরেও হেম-নবীনের যে কটি মহাকাব্য পাই, তাদের কোনটিতেই মধুসূদনের তুল্য-সফলতার নিদর্শন নেই। মধুসূদনের মেঘনাদবধই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং অতুলনীয় মহা-কাব্যের মর্যাদা আজো পেয়ে আসছে।

হিন্দী সাহিত্যেও দেখতে পাই, 'বীর গাথা' পর্বে বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও যথার্থ সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্ম আধুনিক কালেই, মৈথিলীশরণ গুপ্তের হাতে। বিশেষত আজকে আমরা হিন্দী ভাষা বলতে যে খড়ীবোলীকে বুঝে থাকি কবিতার ক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগ সুরু হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিবেদীজীর হাতে 'সরস্বতী সম্পাদনার ভার আসার পর থেকেই। 'সরস্বতী-গোষ্ঠী' বা বা "দ্বিবেদী মণ্ডলে" যে কবিরা এসে মিলেছিলেন গুপ্তজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ গোষ্ঠীতে আরো ছিলেন রামনরেশ ত্রিপাঠী ,মন্মথ দ্বিবেদী, রামচরিত উপ্যাধ্যায়, রামনারায়ণ পাণ্ডে আর সিয়ারামশরণ গুপ্ত। দীর্ঘ কাহিনীকাব্য এঁদের অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু মৈথিলীশরণ ছাড়া আর কেউ সাহিত্যিক মহাকাব্যের জন্ম দিতে পারেন নি। এঁদের অল্প পূর্ববর্তী কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের 'প্রিয়প্রবাস' খড়ী বোলীর

বৃহত্তম কাব্য হলেও মহাকাব্যের গুণধর্ম এতে প্রায় নেই বললেই হয়। বাস্তবিক গুপ্তজীর সাকেতকেই প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু মধুকবির মেঘনাদবধ যেমন একাধারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ এপিক, গুপ্তজীর সাকেত তেমন খড়ীবোলীর প্রথম এপিক হলেও শ্রেষ্ঠত্ব তার অবিসংবাদিত নয়। অবিশ্যি মনে রাখতে হবে, হিন্দী সাহিত্যের মহাকাব্য ক্রমশ ক্লাসিক মানদণ্ডের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে এবং প্রসাদজীর কামায়নী ক্লাসিক বিধিবন্ধন থেকে সরে এলেও আজ হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সুমহান এপিক বলে স্বীকৃত।

বহিরাঙ্গের দিক থেকে সাকেত ক্লাসিক আদর্শইকেই অনুসরণ করেছে। এর সর্গবন্ধ বিপুল আয়তন মহাকাব্যের ক্লাসিক মানদণ্ডকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আন্তরধর্মে সাকেতের মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুব বেশী পাই না। সাকেতের ভাব-পরিমণ্ডলে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে কিন্তু সেই উচ্চতা ও দৃঢ় পিনদ্ধতার অভাব দেখতে পাই। রামচন্দ্রের অভিযোগের আয়োজন থেকে চিত্রকূটে রাম-ভরত মিলন পর্যন্ত প্রথম আটসর্গের বিস্তৃত ঘটনা যেন পরবর্তী দু সর্গে লক্ষ্মণ-বিরহবিধুরা উর্মিলার বিয়োগ বেদনার চিত্রণের জন্যেই আয়োজিত মনে হয়। বস্তুত মহাকবি নির্দেশিত 'কাব্যে উপেক্ষিতা' উর্মিলার অন্তর্বেদনার চিত্রণই এই কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। নানা দিক থেকে সাকেতের সফলতা আংশিক। কারণ কবি ক্রমশ লিরিক কবিসুলভ অন্তর্মুখীনতা, কোমলতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মহাকাব্যের রচনা হয়, কবি যখন তাঁর কাব্যজীবনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশের মুখে, যখন তাঁর প্রতিভা বস্তুনিষ্ঠ বীররসাত্মক কাব্যধারা ছেড়ে ছায়াবাদের কবিদের মত গীতিকবিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে।

গুপ্তজীর মহাকাব্যের এই আকৃতি ও প্রকৃতি মধুকবির মহাকাব্যের সঙ্গে আশ্চর্য সাধর্ম বহন করে। গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত—এই সংকল্প নিয়ে মেঘনাদের পরিকল্পনা হলেও এর প্রাণ মূলে একটি গীতিকাব্যিক কোমলতা ফল্গু প্রবাহের মত বয়ে চলেছে।

মনে হয় মধুকবি ও গুপ্তজী—এই দুই মহাকবি জন্মগত ভাবেই লিরিক প্রতিভার অধিকারী অথচ আত্মপ্রকাশ করেছেন মহাকাব্যের আধারে। অবশ্যি কবিধর্মের প্রাণকেন্দ্রে এঁরা সমগোত্রীয় হলেও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য নয়। ক্লাসিক-রোমান্টিক, এপিক লিরিক প্রভৃতি ভিন্নমুখী ধারার মিলন হলেও মধুকবির কবিধর্মের এক এক দিক অধিকাংশ সময় আত্মপ্রকাশ করেছে স্বতন্ত্র আকারে। তাঁর সৃষ্টিতে তাই বৈচিত্র্য আছে, নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা ও লিরিকের বিচিত্র সাহিত্যশাখায় তাঁর প্রতিভার পদসঞ্চার। মৈথিলীশরণের সৃষ্টিতে তেমন বহুমখী বৈচিত্র্য নেই। বীর গাথা, মহাকাব্য এবং সামান্য গীতিকবিতাতেই তাঁর কবিধর্মের ভিন্নমুখী বৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। একই রচনায় তাই এপিক লিরিক, কাব্যিক-নাট্যিক প্রভৃতি প্রেরণা মিলিত হয়েছে। যশোধরা তাই খানিকটা এপিক ধর্মী কাহিনীকাব্য অথচ নাট্যাঙ্গিকে লিখিত।

মধুকবির প্রতিভা ধূমকেতুর মতো দীপ্ত অথচ ক্ষণস্থায়ী। তাঁর কবিজীবনের প্রসার পাঁচ ছ বছর মাত্র। কিন্তু গুপ্তজীর সৃষ্টি জীবন আজ অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপ্ত। আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের মতে তাঁর প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কালানুসরণ। সাহিত্যের যুগধর্ম অনুসারে তিনি প্রথম জীবনে কাব্যে খড়ীবোলীর ব্যবহারে মসৃণতা আনয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মধ্যপর্বে আসে তাঁর মধুসূদনের প্রতি গভীর অনুরাগ, তখন মেঘনাদবধ ব্রজাঙ্গনার অনুবাদে তাঁকে ব্যস্ত দেখতে পাই। এর পূর্বেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং সাকেত ও যশোধরার জন্ম। এরপর তৃতীয় পর্বে তাঁর মধ্যে ছায়াবাদের প্রবণতা। কবি গীতিকবিতার দিকে ঝুকে পড়ছেন।

মানবতা বাদ ও জাতীয় ঐতিহ্যে গভীর শ্রদ্ধা ঊনিশ শতকের এই দুই যুগবাণী মধুসূদনের

পরিণত জীবনচিন্তার দুই মূল সূত্র। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকের কাছে প্রশ্নাধীন মনে হলেও ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনলস। অবশ্য মধুকবি মুখ্যত মানবতাবাদী। মানবতার দৃষ্টিতেই তিনি রাবণের অন্তর্বেদনার রসোদ্ধারে ব্রতী, তথাকথিত সমাজশাসনে নিন্দিত্ তারা-সূর্পনখা-উর্বশী-জনার মত পৌরানিক নায়িকাদের ব্যাক্তিমহিমা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল। মধুসূদনের জীবন দৃষ্টির এই দুই মন্ত্রই মৈথিলীশরণের জীবনদর্শনে পরিস্ফুট। মুখ্যত তিনি জাতীয়তাবাদী কিন্তু মানবতার মহিমা তাঁর কাছেও সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত। সাকেতের নায়িকা উর্মিলাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানবীয়তার দাবীতেই। এই কাব্যে রামচন্দ্রের চরিত্রে মানবীয়তার আরোপ আরো লক্ষণীয়। রামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—পৃথিবীতে এসেছি আমি স্বর্গের মহিমা কীর্তন করতে নয়, পৃথিবীকেই স্বর্গোপম করে গড়ে তুলতে"—

"সন্দেশ য়হাঁ মৈঁ নহীঁ স্বর্গ কা লায়া।
ইস ভূতল কো হী স্বর্গ বনানে আয়া।"

যশোধরায় এই মানবীয়তা ভারত-আত্মার স্বধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েও এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভগবান তথাগত যশোধরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে গোপনে সংসার ত্যাগ করলেন। যশোধরার আক্ষেপ শুধু এই—তিনি যদি আমায় বলে যেতেন, সখি, তবে আমি কি তাঁর মহত্তর জীবনসিদ্ধির পথে বাধা দিতাম? আমায় তিনি এত ভালবাসতেন, তবু আমায় তিনি চিনতে পারলেন না!" তাই তথাগত যখন ফিরে এলেন সিদ্ধি লাভ করে, যশোধরা তখন অভিমান করে রইলেন। তিনি নিজে এসে তাঁর মানভঞ্জন না করলে যশোধরা নিজে গিয়ে কথা বলবেন না। তথাগত তাই নিজে এলেন ছোট হয়ে, মেনে নিলেন মানবী প্রিয়ার মানবীয় দাবী।

"মানিনি, মান তজো লো রহী তুমহারী বান্।"

এখানে নারীর ব্যক্তিমূল্যও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে মধুকবিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীমূল্য স্বীকৃতির প্রথম পূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ হয়েছিল

মধুসূদনের জীবনবীক্ষা ও কাব্যাদর্শের প্রভাব মৈথিলীশরণে যেমন সুস্পষ্ট, তাঁর কাব্যকলা ও তেমনি, বোধ হয় আরো স্পষ্ট ভাবে, গুপ্তজীর কাব্যে ছায়া ফেলেছে। মধুসূদনের কাব্যের অনলস চর্চার ফলে মধুকবির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল যথার্থই বলেছেন মধুসূদনের কাব্যচর্চার ফলে গুপ্তজির ভাষায় এসেছে কোমলতা এবং সরসতা। বর্ণনারীতিতে গুপ্তজী মধুকবির প্রত্যক্ষ পদানুসরণ করেছেন অনেক জায়গায়। পঞ্চবটী বাসের দিনগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে মধুকবির সীতা বলেছেন———

"যাগাত প্রভাতে মোরে কুহেরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত—বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহর সম, রমা, আছে কি জগতে ?" পক্ষান্তরে লক্ষ্য করুণ গুপ্তজীকে—
"বৈতালিক বিহঙ্গ ভাবীকে
সম্প্রতি ধ্যান মগ্ন-সে হ্যায়্,

নয়ে গান কী রচনা মেঁ ওয়ে
কবি-কুল-তুল্য মগ্ন-সে হ্যাঁয়়্।
বীচ বীচ মে নর্ত্তকী কেকী
মানো য়হ্ কহ দৈতা হ্যায়্—
মৈঁ তো প্রস্তুত হুঁ, দেখে কুল
কৌন্ বড়াই লেতা হ্যায়্।"—পঞ্চবটী—

প্রকৃতি বর্ণনায় এই উপকরণ সাদৃশ্য অনেকটা অনুবাদের মত শোনায়, অথচ পঞ্চবটী গুপ্তজীর মৌলিক কাব্য! প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার চিত্রণেও গুপ্তজী মধুকবিরই অনুসারী। মেঘনাদবধের রচনাশৈলী মৈথিলীশরণের কাব্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অমিত্রাক্ষরের ব্যবহার শুধু মেঘনাদবধের অনুবাদেই নয়, গুপ্তজী নিজের মৌলিক রচনাতেও করেছেন।

জীবন দৃষ্টি, কবিধর্ম এবং আঙ্গিকের দিক থেকে গুপ্তজীর কাব্যে মধুকবির অনুপ্রবেশ হয়েছে নানাভাবে। অবশ্যি মনে রাখতে হবে মৈথিলীশরণের কাব্যমহিমা এতে কিছুমাত্র কমেনি। মধুকবি ছিলেন গুপ্তজীর পূর্বসূরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছে যে জীবনদীক্ষা মধুসূদন নিয়েছিলেন মধুসূদনের মধ্যদিয়ে বিংশ শতাব্দীতে তা-ই মৈথিলীশরণে সঞ্চারিত। এই দীক্ষা এক অর্থে মহৎ ঐতিহ্যের কাছে একজন মহান সারস্বত পুরুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। এই শ্রদ্ধা মৈথিলীশরণের সংস্কৃতিচেতনায় প্রসারতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন ছিলেন যুগ-প্রবর্তক, তাঁর পথপ্রদর্শন সংস্কৃতি-মানস মাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। এখানেই তাঁরও সার্থকতা, এখানেই সাহিত্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি।

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
মন্দাকিনী	নষ্টনীড়		দ্বাবিংশ
মন্নু	তপতী		একবিংশ
মন্মথ	গল্পগুচ্ছ	ডিটেকটিভ	একবিংশ
মন্মথ	শোধবোধ ও কর্মফল		সপ্তদশ ও দ্বাবিংশ
মন্মথ চৌধুরী	তিনসঙ্গী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
মল্লিকা	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
মহম্মদ	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
মহাপঞ্চক	অচলায়তন ও গুরু		একাদশ ও ত্রয়োদশ
মহামায়া	গল্পগুচ্ছ	মহামায়া	সপ্তদশ
মহিম	গোরা		ষষ্ঠ
মহিম	গল্পগুচ্ছ	ডিটেকটিভ	একবিংশ
মহীমোহিনী দেবী	ব্যঙ্গ কৌতুক	বশীকরণ	সপ্তম
মহেন্দ্র	চোখের বালি		তৃতীয়
মাখন	গল্পগুচ্ছ	ছুটী	সপ্তদশ
মাখন	ঐ	তপস্বিনী	ত্রয়োবিংশ
মাখন		মুক্তির উপায় (গল্প)	ষোড়শ
		ঐ (নাটক)	ষড়বিংশ
মাতঙ্গিনী	বৌঠাকুরানীর হাট		প্রথম
মাধব	অরূপরতন		ত্রয়োদশ
মাধব তর্কবাচস্পতি	গল্পগুচ্ছ	অনধিকার প্রবেশ	উনবিংশ
মাধব দত্ত	ডাকঘর		একাদশ
মাধবী	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
মালতী	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
মালিনী	মালিনী		চতুর্থ
মির্জা বিবি	গল্পগুচ্ছ	সমস্যা পূরণ	অষ্টাদশ
মিনি	ঐ	কাবুলিওয়ালা	সপ্তদশ
মিস্ গিলবি	ঘরে বাইরে		অষ্টম
মিসেস্ লাহিড়ী	শোধবোধ		সপ্তদশ
মিহির গুপ্ত	রাজা ও রাণী		প্রথম
মুকুন্দ	গল্পগুচ্ছ	প্রতিহিংসা	বিংশ
মুকুন্দ	ঐ	চিত্রকর	চতুর্বিংশ
মুকুন্দলাল	যোগাযোগ		নবম

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
মুক্তিয়ার খাঁ	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)		ঐ
মৃত্যুঞ্জয়	গল্পগুচ্ছ	গুপ্তধন	দ্বাবিংশ
মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
মৃণাল	গল্পগুচ্ছ	স্ত্রীর পত্র	ত্রয়োবিংশ
মৃন্ময়ী	ঐ	সমাপ্তি	অষ্টাদশ
মোহিত মোহন দত্ত	ঐ	বিচারক	উনবিংশ
মোক্ষদা	ঐ	অনধিকার প্রবেশ	ঐ
মোক্ষদাসুন্দরী	ঐ	স্বর্ণমৃগ	সপ্তদশ
যজ্ঞনাথ কুণ্ডু	গল্পগুচ্ছ	সম্পত্তি সমর্পণ	ষোড়শ
যজ্ঞেশ্বর	ঐ	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	দ্বাবিংশ
যতিশংকর	শেষের কবিতা		দশম
যতী	গল্পগুচ্ছ	পয়লানম্বর	ত্রয়োবিংশ
যতীন	গল্পগুচ্ছ	গৃহ-প্রবেশ ও শেষের রাত্রি	সপ্তদশ ও ত্রয়োবিংশ
যতীন	ঐ	মাল্যদান	দ্বাবিংশ
যশোদা (যশি)	ঐ	খাতা	অষ্টাদশ
যুধাজিৎ	রাজা ও রাণী		প্রথম
যোগমায়া	গল্পগুচ্ছ	জীবিত ও মৃত	সপ্তদশ
যোগমায়া	শেষের কবিতা		দশম
যোগেন্দ্র	নৌকাডুবি		পঞ্চম
রঘুপতি	রাজর্ষি ও বিসর্জন		দ্বিতীয় ঐ
রঙ্গলাল	গল্পগুচ্ছ	চিত্রকার	চতুর্বিংশ
রঞ্জন	রক্তকরবী		পঞ্চদশ
রতন	গল্পগুচ্ছ	পোস্টমাস্টার	পঞ্চদশ
রতিকান্ত	ঐ	মাস্টারমশায়	দ্বাবিংশ
রত্নাবলী	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
রত্নেশ্বর	তপতী		একবিংশ
রণজিৎ	মুক্তধারা		চতুর্দশ
রমাই	বৌঠাকুরাণীর হাট (গল্প) ও প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) ও পরিত্রাণ (নাটক)		প্রথম নবম বিংশ
রমানাথ শীল	গল্পগুচ্ছ	মানভঞ্জন	বিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
রমাপতি	বৌঠাকুরাণীর হাট		প্রথম
রমাসুন্দরী	গল্পগুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
রমেন	মালঞ্চ		দ্বাদশ
রমেশ	নৌকাডুবি		পঞ্চম
রসিক	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
রসিক	গল্পগুচ্ছ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
রসিক	প্রজাপতির নির্বন্ধ		চতুর্থ
	ও		ও
	চিরকুমার সভা		ষোড়শ
রহমত	গল্পগুচ্ছ	কাবুলিওয়ালা	সপ্তদশ
রহমত শেখ	ঐ	দালিয়া	ষোড়শ
রাইচরণ	ঐ	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন	ঐ
রাখাল	ঐ	সমাপ্তি	অষ্টাদশ
রাজধর	মুকুট (নাটক)		অষ্টম
	ঐ (গল্প)		ও
রাজলক্ষ্মী	চোখের বালি		চতুর্দশ
রাজারাম	দুইবোন		তৃতীয়
রাজীবলোচন	গল্পগুচ্ছ	মহামায়া	সপ্তদশ
রাধা	ঐ	শাস্তি	অষ্টাদশ
রাধা গোবিন্দ	দুইবোন		একাদশ
রাধাচরণ	ব্যঙ্গ-কৌতুক	বশীকরণ	সপ্তম
রাধা মুকুন্দ	গল্পগুচ্ছ	দান-প্রতিদান	সপ্তদশ
রাধামোহন	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
রামকানাই	গল্পগুচ্ছ	রাম কানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	পঞ্চদশ
রামচন্দ্র রায়	বৌঠাকুরাণীর হাট		প্রথম
	ও		
	প্রায়শ্চিত্ত		নবম
	ও		
	পরিত্রাণ (নাটক)		বিংশ
রামচরণ	গল্পগুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠি	ত্রয়োবিংশ
রামচরণ মুদি	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
রামতারণ	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
রামতারণ উকিল	গল্পগুচ্ছ	সমস্যা পূরণ	অষ্টাদশ
রামদয়াল	ঐ	কাবুলিওয়ালা	সপ্তদশ

সাহিত্য সংবাদ

বর্ত্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৬২ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার আমেরিকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জন স্টেইনবেক মহাশয়কে প্রদান করা হয়েছে। 'দি গ্রেপস্ অব রথ', 'অব মাইস এ্যান্ড মেন,' ক্যানারী রো, "ইস্ট অব ইডেন" প্রভৃতি অতুলনীয় সৃষ্টি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প দি পার্ল" এর স্রষ্টা জন স্টেইনবেকের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি তাঁর লেখনী মানবসমাজের এই বিপদসঙ্কুল দিনে রাজনৈতিক পাষণ্ডদের দলাদলির শত যোজন উর্দ্ধে অবস্থান করে, মুমূর্ষু মানবমনে আশার আলোকবর্ত্তিকা জেলে ও পুনরুজ্জীবনের জয়গান রচনা করে, এখন থেকে বিশ্বশান্তির উদীয়মান চারণ কবিদের প্রেরণা দান করবে।

সাহিত্যে পুরস্কার দেওয়ার রীতি এখন প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রচলিত, পুরস্কার দেওয়া ভাল কি মন্দ সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে একথা বলা যেতে পারে যে পুরস্কার দানের পূর্বে, সাহিত্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁদের রায় সবসময়েই যে সুষ্ঠু হয় এমন নয়। অবিচারের দৃষ্টান্ত বহু আছে এবং তা নিয়ে বহু বাক বিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু একটি অবিচারের দৃষ্টান্ত বোধহয় তুলনারহিত, যা এক কালে তাবৎ পৃথিবীর সাহিত্যরসিক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সেই বিতর্কঝড়ের কারণ হল কিপলিঙকে পুরস্কার দান করে নোবেল কমিটি টমাস হার্ডির প্রতি যে অবিচারকরেছিলেন তারই প্রতিবাদ স্বরূপ এবং সে যুগের বিদগ্ধ সমাজের কণ্ঠে সেই প্রতিবাদ একযোগে ধ্বনিত হয়ে কিপলিং-পক্ষাবলম্বীদের অধোবদন করেছিলেন।

সাহিত্য বিচার বিশেষ দুরূহ এবং বিতর্কমূলক ব্যাপার সুতরাং সবসময়েই যে আমরা সুষ্ঠু বিচারের নিদর্শন লাভ করব তা নয় কিন্তু চিত্তবিভ্রমকারী অবিচারও যে সংঘটিত হওয়া উচিত নয় তা আপামর পাঠকসমাজ অবশ্যই স্বীকার করবেন। তথাপি নোবেল কমিটির বিচার সবসময় মনঃপূত না হলেও পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকগণের জীবন ও তাঁদের সৃষ্টির পরিচয়লাভের প্রতি ঔৎসুক্যভাবে প্রত্যেক সাহিত্য পাঠকের এক বিশেষ মানসিকতা। সেই মানসিকতার অন্তরালে যে মুখ্য চিন্তাধারা প্রবাহমান তা সম্ভবতঃ এই, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত ক'রার পশ্চাতে কবিগুরুর অবদানের প্রথম সোপান হল তাঁর নোবেল লরিয়েটের সম্মান লাভ অপর একটি কারণ হ'ল নোবেল পুরস্কারের সুদীর্ঘ বিতর্কমূলক ঐতিহ্য।

একথা সত্য যে সাহিত্যের আবেদন সকল পাঠকের কাছে সমান নয় কারণ, রুচিভেদ ও ঔৎসুক্যের তারতম্যে প্রত্যেক পাঠকই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিলাসী। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও সৎসাহিত্য সম্বন্ধে পাঠককুল সম্ভবতঃ এই ধারণাই পোষণ করেন যে, সেই সাহিত্য, যার আবেদন যুগাবসানেও ম্লান হয় না অর্থাৎ যা কালোত্তীর্ণ এবং পাঠকমনে যা নিরন্তর আনন্দদানের রসদ যোগায় তাইই সৎ এবং মহৎ সাহিত্য। কিন্তু সৎসাহিত্যেরও আবেদন যে সর্বদা সমভাবে পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে তা নয়, তার কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর

বিবর্ত্তন যা পাঠকের মনে রুচিভেদ আনে এবং যার ফলে বহুসময়েই সংসাহিত্য বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢাকা পড়ে এবং নিম্নস্তরের সাহিত্যের প্রভাবে পাঠক সমাজ বিহ্বল হয়ে পড়েন, (এখন কি সেই বিস্মৃতির যুগ? মনে হয় তাই ,এই মুহূর্ত্তে জানতে ইচ্ছা করে যে নোবেল লরিয়েট সালি প্রুধোমা, থিওডোর মমসেন প্রভৃতির রচনার মাধুর্য্য কজন পাঠক এখন উপভোগ করেন) অপরপক্ষে নোবেল পুরস্কারই যে সাহিত্য বিচারের শেষ কষ্টিপাথর নয় তাও যেমন সত্য, তেমনি একথাও দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকগণের রচনায় সবসময় কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের চিহ্ন না থাকলেও সেগুলি নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের সৃষ্টি এবং প্রসাদগুণ সমন্বিত। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা যায়, এই শতাব্দীতে এবং গত শতাব্দীর অপরার্দ্ধে যাঁরা শাশ্বত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নোবেল লরিয়েট হয়েছেন এবং যাঁরা হননি তার মূলে আছে নোবেল কমিটির অবিমৃষ্যকারিতা।

প্রত্যেক নোবেল লরিয়েটের সৃষ্টির পরিচয় লাভ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, প্রধান অন্তরায় হল আর্থিক অসচ্ছলতা, দ্বিতীয় কারণ হল বইয়ের বাজারে নিম্নস্তরের রচনার মিছিল। শেষোক্ত কারণটির বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদেশী সাহিত্যের যে সব সুলভ সংস্করণ (পেপারব্যাক, যা অধিকাংশ পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে) আমরা দেখতে পাই সেগুলির দুর্বল বিষয়বস্তু এবং কদর্য্য প্রচ্ছদ নিয়তই আমাদের মনকে পীড়িত করে, অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই এমন কথা নয়, যেমন পেঙ্গুইন এবং পেলিকান সংস্করণের উল্লেখ করা যায় কারণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও প্রচ্ছদ অলংকরণে উক্ত সংস্করণের প্রকাশকগণ রুচিবোধের সুস্থ পরিচয় দিয়ে আসছেন কিন্তু অন্যান্য, বিশেষতঃ আমেরিকান সংস্করণগুলির (যা কষ্টার্জ্জিত ডলারের বিনিময়ে আমদানী করা হয়) বিষয়বস্তু ও প্রচ্ছদ বিকৃত রুচিরই পরিচায়ক। সংসাহিত্য নিম্নস্তরের সাহিত্যের প্রকাশনায় একই ধারা অনুসরণের ফলে ফকনার, লুইস, হেমিংওয়ে, স্টেইনবেক প্রভৃতির রচনা অন্যান্য নিম্নস্তরের সাহিত্যের মাঝে একাকার হয়ে বিভ্রমের সৃষ্টি করে। বহু উচ্চস্তরের সৃষ্টি কি কদর্য্য প্রচ্ছদের অন্তরালে পরিবেশিত হয় তা আমেরিকান সুলভ সংস্করণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, অথচ একথা সত্য যে আমেরিকায়, ছাত্রদের জন্য আরও সুলভ মূল্যে যে বইগুলি প্রকাশিত হয় তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং প্রচ্ছদ অলংকরণে আমেরিকান প্রকাশকগণের রুচিরবোধের সুস্থির পরিচয়ই আমরা পাই।

আরও একটি সমস্যা আছে, আমাদের ক্রয়ক্ষমতার সীমানায় যেসব সুলভ সংস্করণের নাগাল পাওয়া যায় তাঁর মাঝে উদীয়মান সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সংসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। স্বভাবতঃই পাঠকমন তখন নোবেল, পুলিৎজার, গ্যঁকুর প্রভৃতি পুরস্কারের জয়মাল্য যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদেরই রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই কারণেই, পশ্চিমের দেশগুলিতে এবং জাপানে উদীয়মান সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম ও পরিচিতির বিশেষ প্রকাশনার ব্যবস্থা আছে, যার আনুকূল্যে উক্ত দেশগুলির পাঠকসমাজ সততই সাহিত্যের নবতম বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকার সুযোগ লাভ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এইরূপ 'পরিচিতি পুস্তক' আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় না। এই ধরণের বইগুলির আমদানী এত কম যে, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রমুখ বৃহৎ গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্য কোথাও তার দর্শন বড় একটা মেলেনা, এর কারণ দিনের মতই স্পষ্ট, টেক্সাসের বীর অথবা চিকাগোর গুণ্ডাদের মহৎ কাহিনী শোনাবার জন্য অধিকাংশ পুস্তক ব্যবসায়ীদের যতটা আগ্রহ পারদর্শিতা আছে, সংসাহিত্যের প্রতি ততটা কৃপাদৃষ্টি এ'দের নেই কারণ ব্যবসাটা নাকি এ'রা ভাল বোঝেন।

গত অর্দ্ধশতকের নোবেল লরিয়েটগণের সৃষ্টি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে যদি কোনও

পাঠক তাঁদের রচনার অনুসন্ধান করেন তাহলে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের রচনা ব্যতীত অন্য কিছু লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এই সূত্রে এমন একজন নোবেল লরিয়েটের নাম পেশ করছি, সুলভ সংস্করণে যাঁর রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি, অথচ তিনি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

গেরহার্ট হাউপ্টমান ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতুলনীয় সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিগত ১৫ই নভেম্বর জার্মানীতে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী মহোৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। বেলিনের শিলার থিয়েটার; হামবুর্গের ন্যাশনাল থিয়েটার, কোলোন এবং ডুসেলডর্ফের বৃহৎ নাট্যশালাগুলিতে ও অন্যান্য সহরে যেখানেই রঙ্গ-মঞ্চের অবস্থান আছে সেখানে হাউপ্টমানের নাটক অভিনীত হবে। আশা করা যায় জার্মানীর এই জাতীয় উৎসবে পূর্ব জার্মানী অংশ গ্রহণ করবে কারণ হাউপ্টমানের জন্মস্থান ওবার-সালজব্রুন সহর পূর্ব জার্মানীর সিলেশিয়া প্রদেশে অবস্থিত।

নূতন গ্রন্থ

ক্রনিকলস অব কেদারম্ : কে· নাগরাজম্।

দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ এবং জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী ভাষায় রচিত ক্রনিকলস্ অব কেদারম্ একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। লেখক কে. নাগরাজম্ কোন নূতন আঙ্গিক অবশ্য ব্যবহার করেননি কিন্তু বাকধারার সাবলীলতা লক্ষণীয়।

কেদারম্ সহরের আদালতের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্য এবং বিবাহিত নরনারীর জীবনে আলো-ছায়ার খেলার যে অনুপম রূপ নায়ক গোকর্ণ শাস্ত্রীর নিজস্ব জবানবন্দীতে লেখক আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন তা বিশেষভাবে উপভোগ্য। প্রচুর চরিত্র আলোচ্য উপন্যাসে ভিড় করেছে তার ফলে সাধারণতঃ যা হয় তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অর্থাৎ কয়েকটি চরিত্রের রূপায়ন যথাযথভাবে পরিস্ফুট নয়। ঘটনার বৈচিত্র্য বর্ণনায় লেখকের লেখনী বেশ নিপুণ। ধর্মোৎসব, মানব মনে জ্যোতিষীদের প্রভাব অথবা জন্ম-মৃত্যুর বর্ণনা বাস্তবমুখী এবং অভিনব। অপর একটি সুচিত্রিত দৃশ্য উপস্থাপনে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন—যে দৃশ্যে দেখা যায় মহাত্মা গান্ধী কেদারম্ সহরে উপস্থিত হয়েছেন সহরবাসীর ব্যাকুল আহ্বানে, কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিতর্কের সমাধানে অপারক হয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই সূত্রে দক্ষিণ ভারতীয় নন্দনতত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যায় লেখক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে জীবনধর্মী কঠিন বাস্তবের চিত্রায়ণে লেখক অত্যন্ত প্রগল্ভ হয়েছেন যা মনকে পীড়িত করে এবং কাহিনীর ধারাবাহিকতায় অহেতুক বাধা দেয়। এই প্রকার ত্রুটি সত্বেও দক্ষিণ ভারতীয় জীবনের উপর আধুনিক মতবাদ এবং প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার যে সংঘাত বর্ত্তমানে চলেছে তার নিপুণ চিত্রে উপন্যাসটি সমৃদ্ধ।

Chronicles of Kedaram : K. Nagarajam, New York, Asia. Publishing House. 1961. VIII + 254 Pp. $ 6.

ফোরটিন স্টোরীজ : পার্ল বাক।

পার্ল বাকের রচনার সঙ্গে সাহিত্য-পাঠকের পরিচয় সম্ভবতঃ "গুড আর্থ" উপন্যাসের মাধ্যমেই সচরাচর ঘটে। চীন এবং জাপান দেশের মানুষ, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার

সম্বন্ধে পার্ল বাকের মমত্বপূর্ণ বিদগ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর রচনার পরিমাণ নির্ণয় করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প তিনি প্রচুর লিখেছেন এবং স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই তাঁর সবগুলি রচনাই যে উৎকৃষ্ট এবং রসোত্তীর্ণ তা নয়, কিন্তু রচনায় বাকধারার যে বিশিষ্ট ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় পাঠককুলকে আকৃষ্ট করবার পক্ষে তা বিশেষ অনুকূল।

সম্প্রতি তাঁর যে গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার রচনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ যুদ্ধের পরে মানুষের মধ্যে যে ভয়াবহ সমস্যার ঝটিকাবর্ত প্রবাহিত হয়েছে তার স্পর্শ প্রায় প্রত্যেক গল্পতেই আছে কিন্তু সমস্যাগুলির উপস্থাপনে পার্ল বাক কোনও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি পরন্তু অতিরিক্ত ভাবাবেগ এবং বাঁধাধরা ছকে নায়ক-নায়িকার মিলনের বর্ণনা সমস্যাগুলিকে স্তিমিত করে দিয়েছে। পার্ল বাকের রচনাশৈলীতে যে কারুকার্যের সুষমা লক্ষ্য করা যায় তা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

প্রচারমূলক সাহিত্য যা নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের কাছে আমরা আশা করি না তারই আভাস যেন এই গল্পগ্রন্থে লক্ষ্য করা গেছে। "দি সিলভার বাটারফ্লাই" গল্পটির পাঠশেষে এ কথাই আমাদের মনে হবে যে লালচীন অত্যাচারের রাজত্ব, মানুষের ওপর কম্যুনিস্ট সরকারের অমানুষিক পেষণের যে বর্ণনা করা হয়েছে তার সত্যতা নিরূপণ করবার মত দলিল আমাদের হাতে নেই সুতরাং বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু বলা যেতে পারে যে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে প্রচারের যে প্রচেষ্টা আছে তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Fourteen Stories : Pearl Buck. 1961. Jhon Day. 250 Pp. $4.00.

দি কমনওয়েলথ্ পেন ঃ এ. এল ম্যাকলিয়ড, সম্পাদক।

বৃটিশ কমনওয়েলথ্ অন্তর্ভুক্ত যে কটি দেশ আছে সেই সকল দেশের গুণীব্যক্তিগণ আমেরিকার এক সাহিত্যসভায় নিজ দেশের সাহিত্যের মান ও প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভারত, সিলোন, পাকিস্তান, সাউথ-আফ্রিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট-আফ্রিকা, মালয় এবং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশগুলির পণ্ডিতব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করেন এবং তাঁরা প্রায় সকলেই নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য শিক্ষক।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন এ. এল. ম্যাকলিয়ড। মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—

'Commonwealth literature is new and engaging; it has gained a remarkable following and rapid preferment in academic circles. It is experimental. It has new subject matter. It offers novel approaches and unconventional forms. Whereas seventeenth-century literature was the especial interest of the first fifty years of the present century, it appears that Commonwealth literature will be the particular interest of English scholars in the next fifty."

সম্পাদক মহাশয়ের এই বিবৃতিপাঠে তাঁকে বিশেষ আশাবাদী মানুষ বলে মনে হয়, কারণ তিনি আশা করেন যে এই শতাব্দীর সাহিত্য-পাঠক এবং পণ্ডিতগণ যেমন অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন তেমনি তাঁরা পরবর্তী অর্ধশতক কমনওয়েলথের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করবেন। কোন যুক্তির ওপর নির্ভর করে ম্যাকলিয়ড এরূপ বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছেন তা আমাদের অজ্ঞাত তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। সাহিত্যের চর্চা কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলিতে কি পরিমাণ উৎকর্ষতা লাভ করেছে তার সম্যক পরিচয় হয়ত এই গ্রন্থটিতে পাওয়া

যাবে না, কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টার যে প্রভূত প্রয়োজন আছে সে কথা অনস্বীকার্য, কারণ প্রতিটি দেশের সাহিত্য এবং তার প্রগতির ইতিহাস বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পেশ করার এটি একটি অন্যতম উপায় বলেই মনে হয়। আশা করা যায় এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পৃথিবীর বিশিষ্ট প্রকাশকগণ উদ্যোগী হয়ে এরূপ সঙ্কলন গ্রন্থের প্রকাশে এখন থেকে মনযোগী হবেন এবং যার ফলে প্রতি বৎসর বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদনে আমরা সক্ষম হতে পারি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এ বিষয়ে যে বিশেষ অগ্রণী সে পরিচয় আমরা পূর্বে পেয়েছি এবং সৎ-সাহিত্য পরিবেশনে পুনরায় তাঁরাই নূতন পথের সন্ধান দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হলেন।

The Commonwealth Pen. An introduction to the Literature of the British Commonwealth. Edited by A. L. McLeod. Pp. 256. 1961. 28 s. net.

অজিত দাস

স্বাধীনতা ও সৃজনতা

মুক্তির হাওয়া ভারতের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে পনেরো বছর ধরে বইছে। এ হাওয়া স্বাধীন হাওয়া; এ হাওয়া নিষেধ শুনতে চায় না, চায় না কোনো বাধা মানতে। পরিবেশের এ হাওয়া দীর্ঘ পনেরো বছরের মাথায় যতখানি না মলয়ানিল, ক্ষেত্র বিশেষে ততখানি উদ্দাম। ওরা বাধা মানে না। চঞ্চল।

যা'হোক, তবু স্বস্তির কথা যে ওটা মুক্তির হাওয়া। যুক্তির কথা এই যে ও-হাওয়া পরাধীন নয়, স্বাধীন দেশের মতোই স্বাধীন। আসমুদ্র হিমাচল ওর গতায়াত। ও-হাওয়া মুক্তির হাওয়া। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ভারতের বুকে বইছে। কি সুখে কি দুঃখে ওই মুক্তির হাওয়া আমাদের সঙ্গী। প'য়তাল্লিশ কোটি ভারতীয় জনতা প্রতি মুহূর্তে ঐ হাওয়ায় নির্ভরতা খুঁজছে।

সত্যিই কি নির্ভরতার সন্ধান দিতে পেরেছে সে হাওয়া—যে হাওয়া এ মরলোকের হৃদ্‌যন্ত্রকে *ক্রিয়াশীল রেখেছে? প্রত্যহ যে বায়ু থেকে আমাদের শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ? কিছু নির্ভরতার সন্ধান যে সে হাওয়া দিতে পারেনি এ উক্তি অবশ্য অনেকের বিবেচনায় বাহুল্য। অবশ্য প্রতিপক্ষ* আপাতত সে প্রশ্নে ব্যাঘাত ঘটাবে না। কিন্তু সে নির্ভরতার পরিমাপ জানতে স্বাধীন নাগরিক স্বতঃই আগ্রহী—যেহেতু তিনি জানতে পেরেছেন, যে মুক্তির হাওয়ায় তিনি লালিত, দীর্ঘ পনেরো বছর যে মুক্তির আবহাওয়ায় তিনি প্রতিপালিত, কি জানি কি বৈগুণ্যে তার পরিবেশ জুড়ে বিশুদ্ধতার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান অনাচার! অথচ দীর্ঘ পনেরো বছরের মুক্তির হাওয়ায় বিশুদ্ধতাই কাম্য ছিল।

অথচ পরিবেশ জুড়ে অস্থিরতা। মায়ের শৃঙ্খল মোচন হয়েছে কিন্তু শৃঙ্খলা গ্রন্থন হয় নি।

কিন্তু কোন কারণে?

স্বীকার করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করা কাপুরুষের লক্ষণ যেহেতু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার মানপত্র আমাদের হস্তগত হবার পর মাতৃভূমিকে নানাভাবে নানা শোকে রোগে বিয়োগ-ব্যথায় জর্জরিত হতে হয়েছে। এবং তা সংঘটিত হয়েছে একাদিক্রমে, পর পর। যুদ্ধ, মহামারী, আন্দোলন, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ-দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদি একের পর এক মাতৃভূমিকে নিদ্রাহীন করে তুলেছে। এবং উপর্যুক্ত কতকগুলি কারণে অর্থনৈতিক অবনতির অবমাননায় হতাশ হয়েছি। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ ঘরে-বাইরে দেখা দিয়েছে নৈরাশ্য। শুধু নৈরাশ্য। কি ব্যক্তি জীবন, কি সমাজ জীবন—সর্বত্র; প্রায় সর্বস্তরে।

ফলত, শিক্ষা সঙ্কট প্রকট; বেকার সমস্যা উৎকট। জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী; নিদারুণ ধন বণ্টন বৈষম্যে একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানীর লালসায় দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগামী। অথচ

দ্রব্যমূল্যের নিদারুণ উত্তাপের থার্মোমিটার এক ঝাঁকুনিতে মধ্যবিত্তের ক্ষমতার স্তরে নিয়ে আসার একমাত্র ক্ষমতা যাঁদের উপর দেশবাসীই ন্যস্ত করেছেন, অবস্থান্তরে তাঁরাও দর্শকমাত্র!

সুতরাং দীর্ঘ পনেরো বছরের হাওয়ায়, পরিবেশে আর বিশুদ্ধতার ধর্ম বর্তমান থাকে কোন অলৌকিক কারণে!

এবং তা থাকা কিঞ্চিৎ অসম্ভব বলেই আজ পরিবেশ জুড়ে এই অস্থিরতা। হাওয়ায় যেন কিসের মাদকতা! চিমনির ধোঁয়ার বিষাদময় ধূসরতা যেন সমাজমনেও প্রবেশ করেছে। অথচ এতটুকু সুস্থ পরিবেশের প্রত্যাশী আমরা। আপনি আমি সকলেই। ধূসর আবহাওয়া আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি না গ্রাস করেই থাকে তা'হলে পরিবেশ জুড়ে এই বিশৃংখলা কেন?

কেন? অথচ পনেরো বছর স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজজীবনে, মানসিকতার ক্ষেত্রে আমাদের যতখানি এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিল, অন্তত অন্য স্বাধীনরাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনায় আমরা কতটুকু সম্মুখভাগে পা রাখতে পারছি, সে প্রশ্ন সত্যিই আজ ভাববার মতো। তিন তিনটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্বাধীন নাগরিকের কাছে কিছু যে সুখের স্বাধীন স্বপ্ন রচনা না করেছে তা নয়। কিন্তু সুবৃহৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উন্নয়নের, মাঝারি মানোন্নয়নের জরুরী প্রশ্নগুলি যে অনিবার্যভাবে ঢাকা পড়ে গেছে, এবং ক্রমশ যেতে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জমির উপর অস্বাভাবিক জনতার চাপ, শহরে অতিরিক্ত 'মধ্যে মানুষ কীটের' মতন যখন অবস্থা, চতুর্দিকে জঞ্জাল এবং অস্বাস্থ্য অপুষ্টি সমাজমনে নানা বিচিত্র ভেজালের যখন ছড়াছড়ি তখন সমস্যাময় এই পরিবেশে সুস্থ আবহাওয়ার অবসর কোথায়?

ফলত সমাজের দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, ক্ষেত্র বিশেষে ধ্বস নামতেও উদ্যত। উপায় নেই; যেহেতু উপায়হীন আবহাওয়া। এবং ফলশ্রুতি হিসেবে সামাজিকতায় আমরা পরাঙ্মুখ; যোগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা অপারগ; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা অন্তর্মুখীন; ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পরমুখাপেক্ষী। সাহায্যই যেন আমাদের অন্যতম ভরসা, অনন্য পাথেয়।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এটাচ অব দি পোয়েট

মার্কিণ মুল্লুকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যকার ইউজিন ওনীলের অপ্রকাশিত নাটক এটাচ অব দি পোয়েট-এর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় ১৯৬০ সালে সুইডেনে প্রথম অভিনয় আয়োজন করার পর। জীবনের শেষ কবছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ওনীল কি লিখেছিলেন তা জানা যায়নি। এমন কি সেই সময়ে যা লিখেছিলেন, তাতে তৃপ্ত হতে না পেরে লেখা নাটকগুলি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এই ছিল জনশ্রুতি। তবে বর্তমানে ঐ সময়ে লেখা অন্ততঃ ৬টি নাটক অভিনীত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো দু একটি পাওয়া যাবে এমন আভাস পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় নাটকটি খুব পরিচিত নয়।

নাটক, সত্যকারের ভাল নাটক, দেশ কাল পাত্রাতীত। সেক্সপীয়র বা কালিদাস বা ম্যালে-য়ার আজও তাই সমান উপভোগ্য। এই স্বকালের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও কালাতীত হবার ক্ষমতা আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কদাচিৎই দেখা যায়। হয়ত তাই আজকালকার নাটক দীর্ঘ-কাল জনসমাদরে অভিনীত হলেও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত অভিনয়ের পরেই জনমানস

থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। ওনীলের নাটকাবলী কিন্তু এর এক ভাস্বর ব্যতিক্রম। জীবিতকালে ওনীল নাটকের জন্য যত প্রশংসা বা যে সম্মান পেয়েছেন, মৃত্যুর পরেও তার চেয়ে বেশী বই কম পাচ্ছেন না।

এ টাচ অব দি পোয়েট-এর কাহিনীতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। কাহিনীর নায়কের উচ্চাভিলাষ ও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের জীবনব্যাপী অসমদ্বন্দ্বের ইতিহাসই বিবৃত হয়েছে নাটকে। কাহিনীটি সংক্ষেপে হল এইরকম ঃ আয়ার্ল্যান্ডের এক মফঃস্বলের সামান্য দোকানদারের ছেলে মেজর কনওয়েল ম্যালনি। তাঁর ছেলেবেলাতেই তাঁর বাবা বেশ কিছু পয়সা করে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বসলেন কিন্তু ম্যালনি ক্যাসল-এর হবু মালিক কনকে বন্ধু-বান্ধব পরিচিতেরা দোকানদারের ছেলে বলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। কিছুটা তাদের বিদ্রূপে উত্যক্ত হয়ে, আর কিছুটা উচ্চাভিলাষের তাড়নায় কন গেলেন নেপোলিয়ঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। সেখানে বেপরোয়া বীরত্বের জন্য কন মেজরের পদে উন্নীত হলেন। যুদ্ধ শেষে নিজের ঘরে ফিরে এলেন মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালনি। কিন্তু পুরোণো অসুবিধা তখনও বর্তমান অথচ আগে যা সহ্য হত নবলব্ধ প্রশংসা আর ক্ষমতার স্বাদ সে শক্তিতে ফাটল ধরিয়েছে। ফলে পরিবেশের সংগে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত তাই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে স্ত্রীকন্যা সহ তিনি পাড়ি জমালেন আশার উৎস নতুন মহাদেশ আমেরিকার উদ্দেশে।

পুরোণো দিনের খোঁচা আর বারবার বিঁধবে না এই আশা নিয়েই কনের আমেরিকা আগমন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলনা। অল্পদিনেই বোঝা গেল নতুন দেশটাও মাটির, সেখানকার মানুষও রক্তমাংসের। বোঝা গেলেও করা গেলনা কিছু কারণ নানা ধরণের ব্যবসায়িক তথা অব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় হাতের জমানো অর্থের অধিকাংশ খরচ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত এক মদের দোকানের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। মালিক অবশ্য বলেন নামেই, করণীয় কাজ যা কিছু করেন তাঁর স্ত্রী আর মাইনে করা লোকজন। তিনি তাঁর মেজরের পোষাক পরে বসে বসে আকন্ঠ মদ্যপান, মোসাহেবদের মধ্যে বিলি করেন আর নিজের গৌরবময় অতীত জীবনের বহুবার বলা কাহিনী ফলাও করে তাদের কাছে পরিবেশন করেন।

নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে উদাসীন মেজর জানতে পারে নি যে, লোক তাঁকে অবজ্ঞা করে, করে উপহাস। তাই কল্পনার প্রাসাদে স্বপ্ন-বিলাস ভালই লাগছিল তাঁর। জীবনের যেটুকু ফাঁক ছিল সেটুকুও ভরে রেখেছিল তাঁর সাধের ঘোড়াটি। তার পরিচর্যা আর তার পিঠে চেপে অনেকটা সময়ই কাটত তাঁর।

এমনি ভাবে নেহাৎ মন্দ কাটছিল না দিনগুলো কিন্তু হঠাৎই ঘটল বিপর্যয়। একটি সাধারণ লোক এসে তাঁকে যথেচ্ছ অপমান করে গেল। মেজরের মিলিটারি রক্ত গরম হয়ে গেল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় নিজের হাতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য চাবুক মারতে গেলেন তাকে। সে লোকটি মেজরের রীতিনীতি আদব-কায়দার ধার না ধেরে সোজাসুজি পুলিশে ধরিয়ে দিল তাঁকে। জেল হাজতে বন্দী হয়ে থাকতে হল নেপোলিয়ঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বীর মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালনিকে। রূঢ় বাস্তবের প্রচন্ড আঘাতে কল্পনার রঙীন পরকলা ভেঙে খানখান হয়ে গেল, প্রকাশিত হল জীবনের রুক্ষ, নগ্ন, রিক্ত, জীর্ণ বিবর্ণ রূপ। সবকিছু শূন্য হয়ে গেল তাঁর কাছে। এরপর আত্মহনন ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না তাঁর। তবে নিজেকে না মেরে নিজের দ্বিতীয় সত্তা সখের ঘোড়াটিকে। সংগে সংগে মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালনির মৃত্যু হল, বেঁচে রইল দোকানদারের ছেলে কন।

গ্রীক ট্র্যাজেডির মত অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই এগিয়ে গেছে কর্ণেলিয়াস ম্যালনির জীবন। বোঝা যায় প্রকৃতির হাতে মানুষ কেমন অসহায় ক্রীড়নক। তবু ও'নীলের অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও মূল চরিত্রগুলি আশ্চর্যরকম আত্মপ্রত্যয়শীল। জীবনের বন্ধুর পথে হারলেও হার মানতে রাজী নয় তারা, মার খেতে খেতে ফিরিয়ে মারের জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে। কনের স্ত্রী-কন্যার চরিত্রে সেই আত্মপ্রত্যয়, সেই ঋজুতা অতি প্রকট। তাদের পরিপ্রেক্ষিতে কনের হাহাকার, বজ্র বিদীর্ণ বনস্পতির মত অবস্থা পাঠক ও দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। অতি সাধারণ কাহিনীও সেই সুবাদে অসাধারণত্বের কৃতিত্ব দাবী করে।

আজ আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তাতে মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালনির মত মানুষের খোঁজে বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মধ্যে কনের সমগোত্রীয় অনেককেই পাওয়া যাবে। অতীত জীবনে গর্বের বস্তুর অপ্রতুলতা যাঁদের ছিল না, আজ তাঁদেরই নামতে হয়েছে অপমানের তলে। বর্তমান যাদের বন্ধ্যা, ভবিষ্যতে নেই আশার দ্যুতি অতীত ছাড়া তাদের আছে কি ? অনেক সময় এদের ভুল হয়, বর্তমানের মধ্যে অতীতকে এনে চরম আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তারপরই হঠাৎ রূঢ় বাস্তবের কশাঘাতে চমকে জেগে উঠতে হয় আর তখনই ঘটে চরম ট্র্যাজেডি। তখনো পর্যন্ত যে আত্মসচেতনতা তাকে জনতার মধ্যে লুপ্ত হতে দেয়নি, তার অবলুপ্তির সংগে সংগে সেও যায় তলিয়ে সমষ্টির নামহীন গোত্রহীন অন্ধকারের অতলে। সেদিন এক হারায় বহুতে।

বাংলা নাটকে ভিন্নদেশীয় জ্ঞানবুদ্ধির সমাবেশ নিত্য ঘটনা কিন্তু সর্বত্র এ জ্ঞান যে পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে এমন নয়। সে তুলনায় ও নীলের বহু নাটক বিশেষ করে এটাচ্ অব দি পোয়েট স্বদেশী পরিবেশে রূপান্তরিত করলে তা শুধু মনোহরণই করবে না জ্ঞানদায়কও হবে। এ ছাড়াও প্রকৃত শক্তিশালী নাট্যকারের রসোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ণ নাটক পাঠে আনন্দও কম পাওয়া যাবে না।

রবি মিত্র

লোকশিল্প

লোকায়ত জীবনদর্শন লোকশিল্পেরই এক প্রকাশ। ক্লাসিক জীবনদর্শনে লোকচিন্তার কোনই সুযোগ ছিলনা। সেখানে ক্লাসিক শিল্পকলাও জনসাধারণের প্রতি যথেষ্ট পরিমানে আগ্রহশীল যে ছিল না তার প্রমাণ অগণিত ভাস্কর্য্যে চিত্রে ছড়িয়ে আছে। ক্লাসিক শিল্পের যে সুর তা শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদায় উন্নতশির বিশেষ সম্প্রদায়ই পালন করতেন। সেখানে অগণিত মানুষের আনন্দ বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছিল এক বিশেষ শিল্পরীতিতে যাকে আজ লোকায়ত শিল্প বলে অভিহিত করছি। বহু পুরুষ ধরে একই জীবনদর্শনের তলায় মানুষ তার নিজের বিশ্বাস, নীতি সামাজিক বিভিন্ন মূল্যকে প্রতিপালন করেছে। দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পের রীতিতে এক ক্লাসিক বিপরীত জীবন মূল্য মর্য্যাদা পেয়েছে। পৌরাণিক ঘটনার সন্নিবেশ লোকশিল্পের এক বিশেষ অঙ্গ। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতের সুনীতি, দুর্ণীতির লড়াই লোকশিল্পের এক মনোজ্ঞ প্রকাশ। সাধারণ মানুষের রীতি, নীতি, বিশ্বাস যা বহুকাল ধরে একভাবে প্রচলিত তার প্রতিফলন প্রতিটি রেখায় প্রতিটি মাটির পুতুলে। বহুযুগ লালিত বহু পুরাতনী আবেষ্টনীকে লোকশিল্প বহুভাবে পুষ্ট করেছে—সেই বিশ্বাসের গায়ে মর্যাদার অলংকার চড়িয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে বিশেষ এক অর্থনৈতিক বলয় পরিক্রমা গ্রামীন মানুষকে তার প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে নিবিষ্ট আত্মসমাহিত করে রেখেছিল। ক্লাসিক শিল্পকলার বহু প্রকাশের বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সঙ্গে লোকশিল্পের বিষয়গত মিল আছে। তবে এই মিলের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ। যুগে যুগে নতুন দার্শনিক চিন্তা নতুন সামাজিক মূল্যায়ন রাজধানীর শিল্পকলাকে নব নব সজ্জায় সজ্জিত করেছে। বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রেও নতুনতর সভ্যতার কথা পাথরে, রংয়ে রূপায়িত হয়েছে। একটি মাত্র বিশ্বাসকেই আকড়ে ধরে রাজধানীর শিল্পকলা একই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে বহুতর নবচিন্তা রাজধানীতে শিল্পকলায় তার বহুতর প্রকাশকে বৈচিত্র সম্পন্ন করে তুলেছে। কিন্তু লোকশিল্পে একই সুনীতি, আর বিশ্বাসের কথন বহুযুগ থেকে মানুষ সযত্নে লালন করেছে। তাকেই মহত্ব দিয়েছে তার দৈনন্দিন জীবন ধারণের পথে। গ্রামে যে অর্থনৈতিক চিন্তা এক বলয় পরিক্রমায় পটুয়া, কুম্ভকার, চাষী, কামার সকলকে একই জীবনদর্শনে সীমাবদ্ধ করেছিল, সেখানে আধুনিক কালের সুদূর প্রসারী বিস্তার সেই চিহ্নিত বলয়কে নতুনভাবে, নতুন সমাজচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সাজাচ্ছে। বহুকাল ধরে গ্রামের সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ সূত্র ছিল কর আদায়ে মাধ্যমে। তার জন্যে রাজধানীর রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতন, তার পুরাতনীচিন্তার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঢেউ গ্রামের সেই শৃঙ্খলিত অর্থনৈতিক চিন্তাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। সেই মাধুরীমাখা কৃষ্ণপ্রেমে লোকে রাস, দোল ঝুলন করেছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে পুরাতনী ভাব আবেষ্টনী সযত্নে প্রতিপালন করেছে। রামায়ণ, মহাভারতের সুনীতির বিশ্বাসকে মূলধন করে এক বিশ্বাসভাজন সমাজ চিন্তায় নিজেদের আপন

মনোজগতকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল। তাতে বিন্দুমাত্র আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। কিন্তু আজকের নবীন সমাজে যন্ত্রের সুদূর প্রসারী বিস্তার অর্থমূল্যকে এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বণ্টন করেছে। সেখানে রাজধানীর বিভিন্ন সংস্থা ছড়িয়ে পড়ছে—দেশের শিরা উপশিরার বহুকেন্দ্রে। আজকে কর অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন সমাজে বেশী। তাই যন্ত্রযুগের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুযুগ লালিত বহু যুগ সঞ্চিত জীবন ধারণের ধারণাকে সবলে আঘাত করেছে আজকের নতুনতর চিন্তার মূল্যায়ন। তাই লোক শিল্প বলতে যাকে বুঝতাম, যে শিল্পে সহজ সরল মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার মূলধন খুঁজে পেয়েছিল, তার অবলুপ্তি প্রত্যাসন্ন। বিগত পঞ্চাশ বছর আগেও লোকশিল্প সম্পর্কে সচেতনতা যথেষ্ট পরিমাণে কম ছিল। সেখানে আজকে লোকশিল্পের ধারায় আধুনিক বহু শিল্পী অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন সংমিশ্রণে কাজ করে চলেছে। এই সংমিশ্রণে শহুরে শিল্পকলা পরিপুষ্ট হচ্ছে। তার আরও নতুন দিকে প্রসার ঘটেছে। এই সংমিশ্রণ ভাল কিংবা অসার তার কথা নতুনকাল বিচার করবে। তবে এই সংমিশ্রণ এক তরফাই হবে। কেননা যে চিন্তার আওতায় গ্রামীণ সভ্যতা তার পরিপুষ্টি পেয়েছিল তা অবলুপ্তির পথে। আর লোকশিল্পীর পক্ষেও তয়শহুরেজযজ হবগ লতরোোটৗ তটীর রবললরবল রবলরেগে নৌতটী নিীনিটী নৌরটৌব শহুরে জীবনের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে একাত্মবোধ করার মধ্যেও বাধা প্রচুর। অবশ্য লোক-শিল্প অবলুপ্তির পথে এই বলে হা হুতাশ করারও কোন যুক্তি নেই। কারণ বহুযুগ ধরে যে সংযোগ সূত্র শহর ও গ্রামকে সংযুক্ত করেছিল তার প্রভাব আজ শেষ হয়েছে—নবীন সভ্যতার আওতায়। হয়তো আবার নতুন কোন বিশ্বাসের মর্যাদা নিয়ে কোন গণশিল্প তার নতুন কথন সুরু করবে। তবে সেখানে গ্রামীণ আর শহরে রূপের মধ্যে ফারাক থাকবে কম। বোধ হয় রূপগত বিশ্লেষণ একই থাকবে। লোকশিল্প বলতে যাকে বুঝতাম, বহু শতাব্দী পরে তার এক পর্বের শেষ হবে। এই শেষের পালাগান শুধুমাত্র এই দেশেই নয়, সবদেশেই তার আসন হারাচ্ছে। এখানে একটা কথার উল্লেখ বোধহয় অযৌক্তিক হবে না—সবদেশেই লোকশিল্পের ধারার মধ্যে এক বিশে-ষত্ব লক্ষণীয়। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই লোকশিল্প এক বিশেষ সর্বজনীন চিন্তার আওতায় বেড়ে উঠেছে। লোক বিশ্বাস, লোকায়ত দর্শন সবজায়গাতে একই মর্যাদার সঙ্গে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পের ধারার মধ্যে যে চিন্তাগত, রূপগত মিল, সেই শিল্প গড়ে ওঠার জন্যে আদিম এবং নিওল্যিথিক সভ্যতার সংযোগসূত্র বিশেষভাবে বলবান। একই সমাজ দর্শনের আওতায় সবদেশেই লোকশিল্পের মূলধারণাকে জীবনে গ্রহণ করেছিল। সেই ধারণাকেই বহু পুরুষ ধরে, রাজধানীর উত্থান পতনের বাইরে, আপন মানসিকতায় একই সমাজ চিন্তার শৃংখলায় সংবদ্ধ করেছিল। তাই বিভিন্ন লোকশিল্পে অনেকসময়ে একই সমাজ-চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও লোকশিল্পে ক্লাসিক শিল্পবিরোধী এক বেদনার সুর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেন মনে হয়—অবদমিত অগণিত মানুষের বেদনার রূপ এক ব্যাথার কান্নায় প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক মূল্যে নির্গুণ অজস্র মানুষের ওপর যে অবিচারের বোঝা শাসকশ্রেণীর লোকেরা চাপিয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল লোকশিল্পে। এ তাদের একান্ত আপন, একান্ত নিজস্ব করে পাওয়া, তাই লোকশিল্প এত সহজ, এত অনাড়ম্বর, এত সৎ।

শ্লীলতা এবং ডি. এইচ· লরেন্সের ছবি

সতেরোই জুন উনিশো উনত্রিশ। লন্ডন শহরে সব খবরের কাগজে শীলতাহানির জোর খবর বেরুলো। ডেইলী এক্সপ্রেস লরেন্সের ছবিকে অসভ্য, বর্বর ইত্যাদি ভাষায় অভিযুক্ত করে

লোকেরা যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে এই বলে ভীতি প্রকাশ করল। ডেইলী টেলিগ্রাফ আরও এক পর্দা উঁচু সুরে বল্লে যে লরেন্সের ছবি সাধারণের প্রতি এক চূড়ান্ত অপমানের কথা। এর কিছুদিন আগেও লরেন্সকে নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। তাঁর প্রকাশিত দুটি উপন্যাস "রেনবো" এবং "লেডি চ্যাটার্লির প্রেম" লণ্ডনের লোকেদের নাকি অপমানিত করেছিল। যার জন্যে ওই উপন্যাসদুটি অকালে মাটির তলায় যেতে বাধ্য হয়। আজও লণ্ডনে উপন্যাস দুটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। যা হোক দুই ঝড়ের মাঝখানে লেখক শিল্পী লরেন্স যথেষ্ট বেদনা বোধ করেছেন। তাঁর সেই সময়ের যে সমস্ত চিঠি প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর ছবির প্রতি সততা এবং লোকের প্রতি এক ক্লান্তিকর অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। ঝড় প্রথমে উঠলো জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে। ওয়ারেন গ্যালারীতে তখন লরেন্সের এক প্রদর্শনী চলছিল। পুলিস এসে ওই সমস্ত ছবিকে "অশ্লীল" বলে অভিযোগ করে এবং তেরটি ছবি, প্রকাশিত একটি ছবির বই এবং বিখ্যাত শিল্পী ব্লেকের চিত্র প্রকাশনের একটি খণ্ড বাজেয়াপ্ত করে।

উইলিয়াম ব্লেকের ছবিগুলিও পুলিশ অশ্লীল বলে অভিযোগ করে। পরে যখন প্রমাণিত হলো যে শিল্পী এক শতাব্দী আগে মারা গেছেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হোল। কিন্তু লরেন্সের বিরুদ্ধে অশ্লীল ছবি আঁকার দরুণ যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ ক্রমে জজ সাহেব বল্লেন যে ছবিগুলি অসভ্যভাবে আঁকা এবং জনমনে সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভীতিরই উদ্রেক করবে। তাই ছবিগুলি যাতে আর সাধারণ্যে প্রদর্শিত না হয় সেই মর্মে লরেন্সের ওপর এক হুকুম জারী হলো। সেই 'উনিশো ঊনিত্রিশের পর সে ছবির কোন প্রদর্শনী হয়নি। বর্ত-মানে সাকি কারাভাস, যিনি লরেন্সের ছবির মালিক তাঁর অনুগ্রহে সাধারণ্যে এই ছবির প্রকাশ ঘটেছে। পুলিশী অভিযোগে যে ছবিগুলি অশ্লীল, সেগুলি অন্ততঃ অশ্লীল নয় এই বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ লরেন্স তাঁর উপন্যাসে যে ধরণের মানবিক প্রেম এবং সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, যে দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিতে তাঁর মতামত গড়ে উঠেছে—তারই বহিঃপ্রকাশ ছবি-গুলিতে আছে। সেই দিক থেকে তাঁর ছবি সততা এবং বলিষ্ঠতার অধিকারী। লরেন্সের ছবি আঁকার ঘটনাও বিচিত্র। তাঁর গ্রামের বাড়ীর পাশে প্রতিবেশী হয়ে এলেন মারিয়া হাক্সলে। ইনি ছবি আঁকতেন। লরেন্স তখন মন দিয়ে দেখতেন। পরে হাক্সলে যখন ওই স্থান ত্যাগ করেন তখন নিয়ে যাবার অসুবিধার জন্যে একটা ক্যানভাস লরেন্সকে উপহার দিয়ে যান। লরেন্স সেই ক্যান-ভাসের সাদা জমিতে রং দেবার দুর্বার কামনা রোধ করতে না পেরে বাড়ী রং করার তুলি আর দরজা জানলার রং দিয়ে তাঁর প্রথম চিত্র প্রচেষ্টা সুরু করলেন। এই ভাবেই তাঁর চিত্র প্রেম গড়ে ওঠে।

এর পরে আস্তে আস্তে লরেন্সের ছবির সংখ্যা বাড়তে সুরু করে। আর তার পরি ণতি যে প্রদর্শনীতে, সেই প্রদর্শনীতে পুলিশী অপমানের কথাও আগে বলেছি। লরেন্সের ছবিতে মানব মনের গোপন পথে যারা যাওয়া আসা করে সেই কামনা বাসনার নানা রূপের মুক্তি ঘটেছে। যদিও শিল্পী হিসাবে তাঁর স্থান পরে বিচার্য্য, কিন্তু নিজস্ব মতবাদের আও-তায় তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাঁর বিচারের সময় স্টাইন, উই-লিয়াস অরফেন, এবং আগষ্টস্ জন ছবিগুলি যে শিল্প প্রসাদগুণ বঞ্চিত নয় সেকথা জোর গলায় বলেছিলেন, কিন্তু—দুঃখের বিষয় যে পুলিশী জজ সাহেব তাঁদের মত নাকচ করে দেন এক কথায়। তাঁর মতে—"বিষ্ময়কর চিত্রসৃষ্টিও অশ্লীল হতে পারে।" জানিনা অশ্লীলতার অভিযোগে কোনটা অশ্লীল এবং কোনটা শ্লীল। যাক অশ্লীলই হোক এবং শ্লীলই হোক লরেন্স তাঁর ছবিতে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। সেখানে তিনি

বলেছেন যে ক্যানভাসের সাদা জমিতে রং দিয়ে রং সাজাতে যে কি আরাম তা একমাত্র ভুক্ত-ভোগীই জানে। মনে হয় যেন হাতপা খেলিয়ে, কালোজলে শীতল স্নানে, শরীর মন জুড়িয়ে যায়। লরেন্সের ছবির এই নতুন মূল্যায়ন যে আজকের যুগে বিশেষভাবে কাজে দেবে, তার জন্যেই আমরা খুশী।

একটি চিত্র, 'লাষ্ট সাপার'

র‍্যাফায়েলের সিসটিনে অঙ্কিত 'ম্যাডোনার' পরই লিওনার্দোর 'লাষ্ট সাপার' ইটালীয় শিল্পকলায় এক মহৎ সংযোজন। যীশু তাঁর শেষ ভোজসভায় বল্লেন "একজন কেউ বিশ্বাসঘাতক।" এতে করে ভোজসভায় সমাগত শিষ্যদের মধ্যে বিস্ময়, ক্ষোভ আর ব্যাথার ঢেউ বয়ে গেল। তবুও যীশু বল্লেন 'একজন কেউ বিশ্বাস ঘাতক'। লিওনার্দো তাঁর শক্তিশালী তুলির মাধ্যমে এই বিশাল ভিত্তি-চিত্রে যীশুর করুণাগম্ভীর মুখ এবং শিষ্যদের ক্ষোভ এবং দুঃখ এক সংগে ফুটিয়ে তুল্লেন। যীশুর এই ছবিতে ব্যক্তি যীশু ছাড়াও অন্য জগতের ইঙ্গিত সর্বাধিক পরিস্ফুট। করুণা গম্ভীর যীশু সমস্ত পাপের অনেক উর্দ্ধে। সেখানে অনেক শিষ্যের মাঝেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এই ভিত্তিচিত্রে অসীম দক্ষতায় চিত্রায়িত। লিওনার্দো তাঁর এই ভিত্তিচিত্রে প্রথাগত দুএকটি পদ্ধতিকে অদল বদল করেছেন। এই ভিত্তিচিত্রে যীশুকে মধ্যস্থলে রেখে শিষ্যদের দুদলে ভাগ করে দিয়ে—মধ্যবিন্দু-কেই সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। অগণিত শিষ্যমধ্যে যীশুর করুণামন বেদনাই চিত্রে মুখ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুভূতির আবেগে তাঁর শিষ্যরা যে ভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তারও সার্থক রূপায়ন এই ভিত্তিচিত্রে পরিস্ফুট। তিনজন করে তিনটি দলে এক একটি আলদা আলাদা কম্পোজিসন করে বিস্তার রেখাকে এবং দিগন্ত রেখার অনুভূতিকে প্রচলিত প্রথা থেকে অন্যভাবে মুক্তি দিয়েছেন। দিগন্তরেখার পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর অবয়ব এবং মুখাকৃতি মহান সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত—কিন্তু দলে বিভক্ত শিষ্যদের সংযোজনে বিস্তার রেখা এবং দিগন্তরেখা তিনটি ভগ্নতালের ছন্দভুক্তিতে মণ্ডিত। চোখের একঘেয়েমীর হন্তারক হিসাবে এই ভগ্ন তিন-তালের প্রযুক্তি তখনকার সময়ে বিপ্লব বিশেষ। এছাড়াও প্রচলিত বিশ্বাস যে সেন্টজন যীশুর এই কথা শোনামাত্র তাঁর বুকে ঢলে পড়েছিলেন—এই চিত্রে কিন্তু লিওনার্দো সেন্ট জনকে শিষ্যমণ্ড-লীর মধ্যেই রেখেছেন।

লিওনার্দো এই ভিত্তিচিত্রে সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীকে এক ক্ষোভের, দুঃখের তরঙ্গমাঝে অভি-ষিক্ত করেছেন। প্রতিটি মুখের চিহ্ন সজীব এবং উৎকর্ণ চক্ষুর অভিব্যক্তি দর্শনীয়। প্রচলিতচিত্রে জুডাকে আলাদা ভাবে আঁকা হয়, কিন্তু লিওনার্দো জুডাকে শিষ্যদের মধ্যেই এঁকেছেন। কিন্তু জুডার লোভের ছায়া জুডাকে দর্শকদের কাছে চিনিয়ে দেয়। লিওনার্দো একক ব্যক্তিত্বে শিল্প-ক্ষেত্রে এক অনন্য প্রতিভা। তাঁর অসীম শক্তির নিদর্শন হিসাবে এই ভিত্তিচিত্র "শেষ ভোজ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিখিল বিশ্বাস

সাংস্কৃতিকী ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাকসাহিত্য। ৩৩নং কলেজ রো। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাংস্কৃতিকী একখানি সংকলন গ্রন্থ। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা পুস্তকের ভূমিকা অথবা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলনই এই পুস্তকের অবয়ব। মোট বারটি প্রবন্ধের সংকলনে প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

সুনীতিবাবুর পান্ডিত্য বহুমুখী। প্রবন্ধগুচ্ছের মাধ্যমেও তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গভীর ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান,—শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প ও পুস্তক সমালোচনার একটি মূল্যবান কষ্টিপাথব হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে হিসাবে আলোচনাগুলি প্রামাণ্য এবং অভিনব। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লিখিত "পাথুরে প্রমাণ" আলোচনাকে নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য করে তোলে, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের যথোপযুক্ত বিশেলষণ যে তার চেয়েও কম কার্য্যকরী নয় একথা সুনীতিবাবুর আলোচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়।

পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির সূচনাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদান কল্পে যতগুলি উপায় উদ্‌ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে বাক্‌যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দের ব্যবহার বোধকরি সবচেয়ে বেশী। মানবগোষ্ঠীর পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস চিন্তার মধ্যে জাতিতে জাতিতে সম্ভাবিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলেছে ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে। সুনীতিবাবুর প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যেই রয়েছে এরই জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর। প্রাগৈতিহাসিক ও তৎপরবর্তীকালের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য বর্তমানে বিচ্ছিন্ন। তার রসের তলানি চুঁইয়ে শিল্প সংস্কৃতির নূতন রূপ পরিগ্রহণ জাতীয় ঐতিহ্য বিস্মরণের সহায়ক। সেই বিস্মৃতির বীজমন্ত্রটি প্রায়ই ভাষাতত্ত্বের মূলে, পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অথবা সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। তাকে বের করে জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারা মানেই পৃথিবীব্যাপী বিভেদের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা। সুনীতিবাবুর লেখা বারটি প্রবন্ধই এই বিশিষ্ট গুণে বলীয়ান। বিষয় নির্বাচনে, ধর্ম, সমাজচিন্তা, দর্শন. ইতিহাস, শিল্প বা সাহিত্যের সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্ব বর্জন করা হয়েছে।

"সংস্কৃতি" প্রবন্ধটি মূলত ভাষাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। "সংস্কৃতি", "কৃষ্টি", "অনুশীলনী" এই প্রত্যেকটি শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যবহারভেদ কোথাও বা ভাষাতত্ত্বানুগ কোথাও বা ভাষাতত্ত্ব নির্বিচারে। ভাষার রূপান্তরের মহিমায় ভাব ও রুচি পরিবর্তনশীল আবার নির্ভরশীলও বটে। এই সমস্ত আলোচনার পর সুনীতিবাবু পৃথিবীর সংস্কৃতিগত ঐক্যের আদর্শ হিসাবে মানবিকতার জয়গান করেছেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের ভূমিকায় বৃহত্তর ভারতে প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে। ভারতীয়দের গোষ্ঠী প্রসারের কতকগুলি

দেশকে,—বিশেষতঃ এশিয়াখণ্ডের দক্ষিণপশ্চিম অংশকে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদ জর্জ গ্যাময় কল্পিত প্রাচীন ভৌগলিক ম্যাপেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশগুলিতে, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, কোচীন-চীন বা চম্পা, লাওস প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই এরই আখ্যান কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে প্রচলিত আছে। তার ভাষা ও নাম ব্যবহারের মধ্যে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে বিস্ময়কর সাদৃশ্যগুলি সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন। বৈদিক যুগ প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারকালে ভারতবর্ষে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভূখণ্ডবাসী বণিকরা মালয়ে ও উত্তর ও পূর্ব ভূখণ্ডবাসী বণিকেরা সুমাত্রায় উপনিবেশ গড়ে তোলে পরে বৌদ্ধধর্মের পদক্ষেপও দ্বীপময় ভারতকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অভিষিক্ত করে তোলে। ক্রমাগত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতনের আলোড়নের ফলে এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্মের প্রসারের ফলে দ্বীপময় ভারতের রামায়ণ-মহাভারত বিকৃত রূপ ধারণ করে। ধর্মের উত্থানপতনে ইতিহাসের পারম্পার্য দেখিয়া সুনীতিবাবু মহাভারত চরিত্রের যুধিষ্ঠিরের রূপান্তর ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন "কালিমাসাদা"র কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে মূল সংস্কৃত মহাভারতের পরিবর্তন সাধনের ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন।

পুস্তকখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল "কুরল"। খৃষ্টিয় প্রথম ও ষষ্ঠ শতকের মধ্যে রচিত প্রাচীন তামিলভাষার গ্রন্থ "কুরল" এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ভূমিকায় সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধটি আত্মপ্রকাশ করে। তামিল, ভারতের একটি অন্যতম প্রাচীন ভাষা। প্রকাশ পরি-পাট্যে ও প্রাচীনতায় সংস্কৃত-র পরেই তামিলের স্থান। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা গঠনে বর্ণমালার রূপেই বিবর্তন ও উচ্চারণের বিকৃতির ফলে ভাষাগুলিরও প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। সুনীতিবাবু এই প্রাচীন তামিল ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষার যোগাযোগ দেখিয়েছেন এবং মূল "কুরল" থেকেও উদ্ধৃতি তুলে ধরে বঙ্গানুবাদটির সুখ্যাতি করেছেন।

ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে। এই আদিবাসীদের মধ্যে আছে কোল, ভীল সাওতাল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি যারা সযত্নে আপন আপন আচারানুষ্ঠান ও শিল্প-কলাদি সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মোট ছয়টি জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল এই প্রাক আর্য্যঅধ্যুষিত ভারতবর্ষে। তারা হল, নেগ্রিটো,—যারা ইয়োলিথিক যুগে আফ্রিকা থেকে এসেছিল স্থলপথে; প্রো অষ্ট্রালয়েড,—যারা পশ্চিম এশিয়া থেকে আসে এবং কিয়দংশ অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যায়; ভূম্যধ্যসাগরীয়,-যারা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসে। এছাড়া আসে পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল জাতি, নর্ডিক গোষ্ঠী ও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী। সুনীতিবাবু "কোলজাতির সংস্কৃতি" প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও তার সংমিশ্রণের ফলে কোল জাতির সংস্কৃতির রূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কোলজাতি মূলতঃ প্রোঅষ্ট্রালয়েডের বংশধর, যাদের ভাষার নাম হল অষ্ট্রিক। অল্পস্বল্প ভাষার পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিলে কোল জাতি সংখ্যায় প্রায় ৪৪ লক্ষ। এরা এখন সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম, রাঁচি, বাংলা, উড়িষ্যা ইত্যাদি জায়গায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করছে। সুনীতিবাবু এদের সাহিত্য নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছেন। এছাড়া এই সংকলন গ্রন্থে আছে তাও, সুফী অনুভূতি ও দর্শন, অলবিরুনী ও সংস্কৃত, মণিপুর পুরাণ, দরাপ-খাঁ গাজী, শিল্পকলা ও সবশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। প্রত্যেকটি গবেষণামূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন বক্তব্যে পরিপূর্ণ। ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে হওয়াই স্বাভাবিক। শব্দবিশেষের ধ্বনি মাধুর্য বা তার ব্যবহারের যথার্থের প্রতি প্রাথমিক নজর না দিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণাত্মক

হয়ে থাকে এবং ভাষার ধাতুগত উৎপত্তির খোঁজ করতে গিয়ে মুর্দাঘরের পোষ্টমর্টেম সদৃশ আপাত ঘৃণ্য কাজে তাঁদের মনোনিবেশ করতে হয় একথা সত্যি কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বাভাবিক মাধুর্যবোধ যে তার ফলে লোপ পেতেই হবে এমন কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। সুনীতিবাবু তার প্রবন্ধগুচ্ছের মাধ্যমে এই কথাটাই প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোধকরি সাধারণের সন্দেহ নিরসন কল্পে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে "শিল্পকলা" সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে। শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রথমে তিনি নিজেই সুকুমার কলাচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিকের অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অথচ প্রবন্ধের মধ্যে রসবৈদগ্ধের পরিপূর্ণ পরিচয় রয়েছে। বাংলার শিল্পচর্চাই তাঁর মূল বক্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কিভাবে বিভিন্ন দেশে শিল্পকলার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটেছে তার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের শিল্পচর্চার একটি ধারাবাহিক বিবরণী দিয়েছেন।

বিদেশী আক্রমণে বারবার ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ওলোট পালোট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতিগত বিবর্তনও সাধিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদানের কুফল পরশুরাম বর্ণিত "এ্যাংলো মোগলাই কেক" এর নবতম অবদান "কচি ভাইটোপাঁঠার ইষ্টু," 'মুরগী ফ্রেঞ্চ মালপো' ও "ডবল ডিমের রাধাবল্লভীর" উদাহরণ তুলে ধরে সুনীতিবাবু এই অধুনা আরাধ্য ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির নিন্দা করেছেন ও পরিশেষে শিল্পকলার ক্ষেত্রে খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙ্গালীর আদর্শের প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী রেখে বাঙ্গালীকে শিল্পচর্চার পথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পুস্তকখানি জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পরিপূর্ণ থাকলেও একটি কথা বলা দরকার। কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষ করে ভূমিকা হিসাবে প্রবন্ধগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হিসাবে বক্তব্যগুলির যুক্তি প্রাথমিক অবতারণা ও উপসংহারের প্রয়োজনায় আরও অনেকবেশী ধারলো হতে পারতো। এছাড়া প্রবন্ধগুলির সম্পাদনা সম্বন্ধে দু এক জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের প্রয়োজন বলে বোধ হয়েছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালী মাত্রেরই পড়া দরকার।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

আমার কবিতা তুমি।। রণজিৎকুমার সেন। বাণীবিতান। কলিকাতা। দুই টাকা।
তোমায় দিলেম।। নীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আলোক ভারতী। কলিকাতা। এক টাকা।

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সেনের প্রধান পরিচয় গদ্যশিল্পী হিসেবে। কিন্তু কাব্যক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ বর্তমান; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতাব্দী' প্রায় দু' দশক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল; 'আমার কবিতা তুমি' বর্তমান কবির দ্বিতীয় এবং নবতম কাব্যপ্রচেষ্টা। রণজিৎকুমার সেন মূলত মুগ্ধমন, রোমান্টিক মেজাজের কবি। তৎসহ একটি অনুগ্র মেজাজ বর্তমান সংকলনের কাব্যশরীরকে ঘিরে রয়েছে : 'আমার কবিতা তুমি,

তুমি এই পৃথিবীতে নিত্য ধ্রুবতারা;
আমি কবি বার বার এসে পৃথিবীতে
ছন্দে ছন্দে নানা রাগে
তোমারই উদ্দেশে রচি গানের ফোয়ারা।'

(আমার কবিতা তুমি)

(খ) 'তোমারে পাবার ক্ষণে ভরে যাবে পুষ্পগন্ধে শূন্য বাতায়ন,
দিগন্ত মুখর হবে ফাল্গুন-মধ্যাহ্ন-রাত্রে ভরা জ্যোৎস্নায়;
তুমি এসে লঘু-পদে দাঁড়াবে গো দেবযানী একান্ত আপন
মৃদু ভাষে ভরে দিয়ে তৃষিত এ চিত্ত মোর হাসির সুধায়।'

(আকাশ বাসর)

(গ) 'জানি তুমি শান্তি দেবে, দিতে পারো প্রেম, আলো,
দিতে পারো ঘুম গান গেয়ে;
এ পৃথিবী যত বড়, যত তারা এ আকাশে জ্বলে,
তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে।' (তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে)

গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি নিজের কাব্যভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাপন করেছেন, 'এই দু'দশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও কাব্যের কাঠামো, কারুকৃতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। তার মূলে আছে বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং সমাজ বিপ্লবজনিত জীবনের মূল্যায়নের পরিবর্তন। তার প্রভাব একালের কবি ও শিল্পীদের উপর অসামান্য। কাব্যের যা 'আধুনিকতা', তা এই প্রভাবেরই ফল।' অবশ্য শিল্পী হিসেবে বর্তমান কবির ব্যক্তি মানসিকতা সে উপরি উদ্ধৃত প্রভাবের বাইরে সে কথা মনে করবার বিশেষ কারণ নেই। উক্ত ব্যক্তি মানসিকতা কবির মধ্যে অবশ্যই সঞ্চারিত, কিন্তু সাম্প্রতের প্রচলিত প্রসাধনকলা তাঁর কাব্যভাবনায় অনুপস্থিত। বস্তুত সেজন্য সামগ্রিক পরিবেশনায় রণজিৎকুমার সেনের বক্তব্য কোথাও অতুজ্জ্বল নয় বরং অভিব্যক্তির নিষ্ঠায় সাধারণ পাঠককে কাছে টানে, ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলিত করতেও সহায়তা করে ঃ

'এই হৃদয়ের সূর্যতাপিত স্বর্ণগলিত শোভা।
তোমার রূপের করেনি কি শোভা দান?
ওগো দেবযানী, দেখ বেলা যায়, কিছু দাও প্রতিদান।' (পুষ্পবতী)

'আমার কবিতা তুমি'র কবি মধ্যে এক সহজ কবি মন আবিষ্কার করে পাঠক উৎসাহী হবেন; কবি যা কিছু সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন সেই সত্যকেই তিনি তাঁর কাব্যভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, নানা আঙ্গিকে। আলোচ্য গ্রন্থে বিষয় পর্যায়ের দিক থেকে প্রধানত তিনি শ্রেণীর কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে; এবং তা যথাক্রমে স্বদেশ ও পৃথিবী; লোক ও প্রকৃতি; নিসর্গ ও প্রেম। মোট চৌষট্টিটি কবিতা আলোচ্য সঙ্কলনে সংগ্রথিত হয়েছে; 'স্বদেশ, আমার কবিতা তুমি, জন্মভূমি, পুষ্পবতী, তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে, বলবন্ত দেও ও হাসে ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অটোগ্রাফে'র মধ্যে কবির বিশেষ মুহূর্তের ভাবনাকে বিস্তারিত করেছে, বিশেষ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছে; তবে বর্তমান প্রসঙ্গে নির্বাচন ব্যাপারে ঈষৎ সতর্ক হলে মনে হয় আরো ভালো লাগতো। কবি নিবেদন করেছেন, 'এ সব কবিতা আমার জীবনের গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত।' এবং তিনি তাঁর প্রিয় পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি থাকি গান নিয়ে।/ তুমি যেন কোরো কবির বিচার / কবিরই হৃদয় দিয়ে।।' 'আমার কবিতা তুমি'র প্রেমের কবিতাগুলি উজ্জ্বল; কবিতাবলীর সহজ ছন্দের দোলা প্রেমিক হৃদয়কে স্পর্শ করবে। গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

রবীন্দ্রশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত মোট তেত্রিশটি কবিতার সংকলন 'তোমায় দিলেম।' বর্তমান কবি কথা আর ব্যথা দিয়ে স্তবক সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন। বর্তমান কবির মধ্যে রবীন্দ্রানুভব এক অন্যতর বিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে মূর্তে। কবি অনুভব করেন, 'নীরালোক/ জীবন চন্দ্রকে দাও আলোক উত্তাপ। প্রাণকেন্দ্র সেই সূর্য তুমি।' (সূর্যকেন্দ্র) কবি আলোচ্য কবিতাবলীর পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন এবং বিচিত্র অনুভূতির আলোকে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থটির পরিচিতি প্রস্তাবে শেষে উল্লেখ আছে, 'কোনো কোনো আত্মস্থ মুহূর্তে মানুষের মনে যে ব্যাপ্তি ও গভীরতার ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, সেই সুর বেজে উঠেছে এই সব কবিতায়। জীবনের সঙ্গে মাটির পৃথিবীর বাস্তব বন্ধন স্বীকার করে নিয়েও সৌরলোকের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের মত এক জ্যোতি প্রেমময় সত্যকে জীবনের কেন্দ্রগত 'তুমি' রূপে উপলব্ধি করেছেন কবি।'

বর্তমান গ্রন্থের কবিতাবলী পাঠ করতে গিয়ে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ প্রসাধনের কৌশল কলার অনুপস্থিতি দেখে খুশি হয়েছি। কবির ভেতরকার সৌন্দর্যরসিক মন ক্ষেত্র বিশেষে পাঠকের মনকে অবশ্যই আকর্ষণ করে. তবে মাঝে মাঝে অমনোযোগী ছন্দ সুর এবং শিথিল কাব্যের আধিক্য-মনকে পীড়া দেয়। তবু তারই মধ্যে কিছু কিছু ছত্র উৎসাহী পাঠককে স্পর্শ করে ঃ

'হয়তো বা মনে হবে আমার সমস্ত আশা নিরাশার পরে
যেন কার দৃষ্টি ঝরে সারাদিন সারারাত ধরে।' (তীর্থ-পথিক)

আবার,

'রজনী গন্ধার গুচ্ছ লুপ্ত হলে রাত্রির তিমিরে,
তবু তার পরিচয় জেগে থাকে আকুল হাওয়ায়।
আবরণে ঢাকে শোভা, ঢাকে না সুরভি।' (আলোকের পানে)

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

রূপ-কথা ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২.৫০

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে। কথাটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি, শিল্পীর হাতে কলম তুলিরই কাজ করে। রেখার বদলে লেখা দিয়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেন তিনি। তাঁর জীবনে এ কথার যথার্থ প্রমাণ হয়ে গেছে, কিন্তু রেখার মত লেখার ক্ষেত্রে তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরী এতদিন পাওয়া যায় নি। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের রূপ-কথা পড়ে মনে হ'ল না পাওয়ার ক্ষোভ বোধহয় দূর হবে এবার। শিল্পীর তুলি কলম সব্যসাচীর মত একযোগে চলে সৃষ্টি করেছে এক অপরূপ রূপরাজ্য। অলঙ্কারে অলঙ্কারে মোহময় হয়ে উঠেছে ভাষা, পাঠকের মানসপটে ফুটিয়ে তুলেছে বর্ণাঢ্য চিত্রমালা। কল্পনায় যে টুকু ফাঁক থেকে গেছে সেটুকু ভরিয়ে দিয়েছে শিল্পীর মনোহর চিত্রাবলী। সব মিলিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর একখানি বই সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন পুরাণ, লোকগাথা ইত্যাদিতে প্রকাশিত শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টির কাহিনীর ৮টিকে বেছে নিয়ে শিল্পী তাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। প্রতিটি কাহিনীর

পরিপূরক হিসাবে কাহিনী সম্পর্কিত একটি করে ছবি দেওয়া হয়েছে। তা'ছাড়াও প্রতিটি কাহিনীর মুখপাতে একটি করে শিরোচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমগ্র বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব নিঃসন্দেহে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিশোর পাঠ্যরূপে চিহ্নিত বইটি শুধু যে কিশোরদের মন ভোলাবে তাই নয়, উপরন্তু রসিকজনেরও অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হবে বলেই মনে হয়। কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ বই একটি নতুন ও উচ্চমান সৃষ্টি করল।

এর একটি মাত্র ত্রুটিই উল্লেখ করতে হয়। অলংকরণের মোহে কখনো কখনো শিল্পী লেখক অতি অলংকরণ করে বসেছেন। ধ্বনি মাধুর্যের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দিতে গিয়ে বিরোধী ভাবের সঞ্চার করেছেন তিনি। তারই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি—‥ তাপ্তীর এক শাখানদী বাঘোরা, ঠিক যেখানে ইন্ধয়াদ্রিকে অর্ধচন্দ্রের মত কেটে গিয়ে ঝরণার ছন্দে নৃত্য করে তটিনীর কলতানে গান গেয়ে সঙ্গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে চলেছে,‥।' নদী যেখানে ঝরণার ছন্দে নৃত্য করছে তটিনীর কলতানে গান গাইছে সেখানে সে সঙ্গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে যায় কি করে? শিল্পীর রেখায় যে পরিমিতি বোধ তাঁর চিত্রকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করেছে, লেখায় এখনো তা পূর্ণভাবে দেখা যায় নি। ভবিষ্যতে উচ্ছ্বাসকে সংহত করতে পারলে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে।

শ্রীমতী মিত্র

দিন যাপন ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক: কবিতা পরিষদ, ৮০/২/৮, লেক রোড, কলিকাতা-১৯। দাম—আড়াই টাকা।

কে কেবল আজো এই রাতে
বিস্মৃত ফুলের ঘ্রাণ
গভীর সত্তায় ঢেউ তুলে
নিভৃতে বিলায়। [রবীন্দ্রনাথ]

প্রথমেই দিনযাপনে-র কবি এইভাবে নিবিষ্ট করে টেনে নেন পাঠককে, তারপর শুনতে পান এবং শোনানঃ

বিদ্যুতের চিড়-খাওয়া গভীর গহ্বরে
বাজায় সেতার।
আঁকাবাঁকা ঝড়োপথে ঈষৎ আভাসে
কী আশ্চর্য এই অঙ্গীকার! [রবীন্দ্রনাথ]

যুগের সাথে জীবনের পাঞ্জা-লড়াইতে 'দিনযাপনে'-র রূপকারও থেমে নেই। অনেকদিন ধরে লিখছেন। সৎ ও সরল তাঁর প্রচেষ্টা, অত্যন্ত আন্তরিক। কিন্তু তাঁর মজুত হাতিয়ার কি খুব সবল! সর্বত্রই সুলভ সহজ শব্দ প্রয়োগ কবি নিজেরও কি আর ভাল লাগছে! নিশ্চিত কোনো ইচ্ছের দিকে তাঁর কাব্যজগৎ রূপবতী হতে পারল কি না, সে প্রশ্নও থেকে যায়। যন্ত্রণার কথা ললিত ঝঙ্কার তুলে বলব, না কর্কশ ময়লা তীক্ষ্ম ভাষায় জ্বালা ধরিয়ে জানাব। লিরিকের প্রবাহে কণ্টের মিস্টি অনুভূতিটুকু যথাযথ তুলে ধরলে কাব্যপিপাসু রিলিফ বোধ করেন নিশ্চি-

তই এবং তা প্রয়োজনীয়। অপরপক্ষে, কণ্টের যে কটু স্বাদ, যে তীব্র তিক্ততা—অর্থাৎ নিত্যকালের আধারে সমকালের যে যন্ত্রণা, তা জানাতে গেলে শব্দে, সৌরভে আরও ঝাঁঝ ছড়িয়ে দেওয়া অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। বড় রুক্ষ রিক্ত সে প্রকাশ আজ আর রসিক মহলে অবাঞ্ছিত না।

তাঁর কবিতার যে স্বচ্ছল ছন্দের লাবণ্য সম্ভব তাও সামগ্রিকতা লাভ করেনি। আবার প্রতিমার মত ঝকঝকে সুগঠিত ঘনসংবন্ধ অবয়ব, অথবা পাতাঝরা বিষণ্ণতার অভ্রান্ত রঙ—তাও কিছুটা না-পাওয়ার ক্ষোভে পর্য্যবসিত।

অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রবীণ কবির কাছে যে পরিণতি ছিল প্রত্যাশার মধ্যে তা একেবারে অনাস্বাদিত রয়ে যায় নি।

প্রায় দুইযুগ আগে লেখা কবিতা দুটিতেও কাব্যময়তার এক প্রাথমিক দীপ্তির আভাষ পাই, সেখানে—

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে—[হে ললিতা ফেরাও নয়ন]
যা, 'স্বপ্নকামনা'-য় এসে—
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে
যদি কভু হই একজন,
মালা হাতে মুক্ত স্বয়ম্বরে
স্মিত হেসে আরক্ত অধরে
চিনতে কি পারবে তখন?

এবং ১৯৪০-এর ঘরে নতুন এক কণ্ঠ শোনা গেল—

"নটুবাবু ইহলোকে নেই
যে লোকটি এসেছিল এ খবর দিয়ে গেল সেই।"
(স্বর)

সেই ভাঙা থলথলে স্বর :
কার স্বর!
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলেনা উত্তর।
(স্বর)

'প্রথম গ্রীষ্মে'-র দাবদাহের মধ্য দিয়ে কবি তবু প্রতীক্ষারত, আর—

নিত্য নব ঘটনার রক্ত লাগে সময়ের
রথের চাকায়,
প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি! (প্রতীক্ষা)

'বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে' আবার বিভ্রান্তি—

যদি রাত বৃষ্টি আনে কোথায় দাঁড়াব,
আয়োজন হবে কার ঘরে?

সাম্প্রতিককালের কয়েকটি কবিতা, যেমন 'অন্তরচেতনা'-য় পেয়েছি সুনির্বাচিত শব্দসমাবেশে গাঢ়বন্ধ ছন্দের স্বাদ।

আবার কোথাও স্বগত ভাবনার দীপ্তিতে উচ্চারিত—

যেহেতু তুমিও এই আলোকিত নরকের দ্বারে

সংকীর্ণ ইচ্ছার হাতে স্বেচ্ছাবন্দী কালের পুতুল,
ভাসাও শরীর আজও অলজ্জিত তৃষ্ণার জোয়ারে,
সৌখীন বাগানে তোলো নিরুত্তাপ নির্বাচিত ফুল।
কপট সজ্জিত দৃশ্যে সকলেই দায়বন্ধ পাখী,
নিজ নিজ পিঞ্জরেই মূঢ়তার মলিন অধ্যায়;
প্রেমিক কোথাও নেই আছে শুধু অকৃপণ ফাঁকি,
ভালবাসা নষ্ট শব রক্তঘ্রাণ রজনীগন্ধায়।

[সুরের নিবিড়ে]

অথবা—

শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে থেকনা হৃদয়। চারপাশে
প্রচলিত শব্দ বর্ণ রঙের আড়ালে একবার
খুঁজে দ্যাখো কোন্‌খানে প্রার্থিত স্বজন।....

[প্রার্থিত স্বজন]

কবির প্রাজ্ঞ অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিভিন্নদিকে আলো ফেলেছে। 'লোকটিকে দ্যাখো' কবিতায় তার সাক্ষ্য মিলবে।

শান্তিপ্রিয় কবি-আজীবন বিনীত হয়েই বাঁচতে চেয়েছেন, কিন্তু—

কিন্তু যদি শ্বাপদের মত ভয়াবহ
কেউ হয়! বিনীত হয়েই একবার
দেখব সে বাঁচে কিনা ভদ্রভাবে কঠিন উপায়ে॥

[বিনীত উপায়ে]

এইরকম কয়েকটি কবিতার ছায়াপথ বেয়ে একটি সাবলীল গতি বর্তমান। যেখানে ঘাটতি সেখানে অহেতুক চাকচিক্যের চাপান নেই।

নাম কবিতাটিতে (দিনযাপন) ব্যঞ্জনাশ্রয়ী দোলনের বদলে বিবৃতির বিস্তার ঘটেছে।

'স্বর,' 'বিনীত উপায়ে', 'রবীন্দ্রনাথ,' 'সুরের নিবিড়ে" এবং আরও কয়েকটি কবিতা বেশ ভাল লাগার মত।

'দিনযাপনে'-র বেশ কিছু কবিতাই নির্মমভাবে খারিজ করলে বইটি উৎকর্ষের দিক দিয়ে বোধ হয় উজ্জ্বলতর হত। এমন কিছু কবিতা আছে, যা পড়তে ভাল লাগে, সেইসঙ্গে তেমন কিছুও রয়ে গেল যার মাধ্যমে নবীশ কাব্যরসিক গভীরে যেতে সক্ষম হয় নি। বইটির বাইরের সাদাসিধে চেহারা তৃপ্তিদায়ক।

সুনীল দাশগুপ্ত

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Dec. '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দশম বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৬৯

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ **টাকা**; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক **রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা**

এই ঠিকানায় **প্রচার অধিকর্তার** নিকট লিখুন

জয়লাভের প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করুন

জয়লাভের পক্ষে আপনার কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতিটি অধিবাসীর পূর্ণোদ্যমে কাজ করা দরকার—এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য, জাতির সম্পদ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং প্রতিটি সীমান্তে আঘাত করার শক্তি প্রচণ্ডতর ক'রে তোলার জন্য বর্ত্তমানে আরও বেশী কাজ করা প্রয়োজন।

উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়াবার জন্য ঢালাই কারখানায়, লেদে, মেসিন শপে, বিপুল শিল্প কারখানাগুলিতে প্রত্যেকটি কর্ম্মীর প্রাণপণে কাজ করতে হবে। সীমান্তে প্রহরারত সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের এবং জাতির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যেন অবিরাম স্রোতের মতো চলতে থাকে।

প্রত্যেকেই আমরা এক একজন সৈনিক

উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে
প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করার কাজে

ভারতীয় ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন—৪

আলপনা

বহুবিচিত্র কাল্পনিক ফুলের নক্সায় গৃহতলকে খড়ির আলপনায় শোভিত করার অতি পুরাতন লৌকিক প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল শুভদিনে কল্যাণকামনায় প্রিয় দেবতাকে আবাহনের ঐতিহ্য থেকে।

আর কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্যকর কেশবিন্যাসের উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বেই

কেয়ো-কার্পিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল যুগোপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে—এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ গুণ আর মৌলিক বর্ণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্নিগ্ধ সুরভি।

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটী • কটক

সঙ্কল্প

"সংগ্রাম যত কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন আক্রমণকারীদের ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করা সম্পর্কে ভারতীয় জণগণের দৃঢ় সংকল্প, এই সংসদ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে।"

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে
সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব থেকে

দশম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' উনসত্তর

সূচীপত্র

।। সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ।।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

স ম কা লী ন

বাংলা গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ষাট বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ঘটে; এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) আধুনিক বিশ্বে ভারত বাণীর প্রচারক রূপে যে খ্যাতি লাভ করেছেন, গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দের কৃতিত্ব তার নীচে চাপা পড়ে গেছে। অথচ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বিবেকানন্দ একটি স্মরণীয় নাম, সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। গত শতাব্দের শেষ দশকে তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ লেখা ইংরেজিতে। বাংলায় তিনি সামানই লিখেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশিত হয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত', "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", বীর-বাণী, পত্রাবলী, ভাববার কথা প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমান শতাব্দের প্রথম দশকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিবেকানন্দের দান পরিমাণে অল্প, কিন্তু মূল্যে কম নয়।

গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য ভাষায় আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করেন এই কারণে যে তিনি গত শতাব্দের প্রধান গদ্যরীতি (বঙ্কিম গদ্য) ও বর্তমান শতাব্দের প্রধান গদ্যরীতি (রবীন্দ্র-গদ্য)—এই গদ্যরীতি ছাড়া যে তৃতীয় গদ্যরীতি ছিল, তারই অন্যতম শিল্পী। সাধু গদ্যরীতি (বঙ্কিমরীতি) তিনি ব্যবহার করেন নি, তা বলা যায় না, "বর্তমান ভারত" তার পরিচয়স্থল। কিন্তু কথ্য বাংলা গদ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল।

'বিদ্যাসাগর বিষয়ী লোকের রীতিটি গ্রহণ করে তাকে যথাসম্ভব সংস্কৃত করে নিজের কাজের উপযোগী করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিম নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের হাত থেকে সেই সংস্কার-সাধিত রীতিটি। আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাকে বঙ্কিমের হাত থেকে। এইভাবে গদ্যভাষা

উত্তরোত্তর বর্ধিত শ্রী হয়ে এগিয়ে চলেছে।" [শ্রীপ্রমথনাথ বিশী : বাংলা গদ্যের পদাংক]

বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির অবিকৃত রূপটি কিন্তু এদের হাতে ধরা পড়ে নি। বাঙালীর মুখের ইডিয়ম, বিনা পরিমার্জনায় তার স্বভাবশ্রী এ'দের লেখায় দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী যে কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন, তা শিষ্ট মার্জিত কিছুটা কৃত্রিম। কথ্যভাষার প্রাণস্পন্দনটি এ'দের লেখায় ধরা পড়ে নি। ধরা পড়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির রচনায়। এ'রা কেউই মহৎ সাহিত্যিক নন। জীবনের বড়ো অংশ তাঁরা অন্যকর্মে নিয়োগ করেছেন, প্রচলিত অর্থে এই পঞ্চপান্ডব সাহিত্যিক বলে খ্যাত নন, তবু এ'দের লেখাতেই বাংলাগদ্যের একটি অপেক্ষাকৃত অনাদৃত ধারা লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় এই, এ'রা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কারুর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন নি। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমী ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র অশালীন বলে নিন্দা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিম-রীতির অবসান ও রবীন্দ্র-রীতির সূচনায় দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্র-সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-রীতিকে অস্বীকার করেছেন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিও রবীন্দ্র-প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ সমাজ-সংস্কারক—স্বল্পায়ু জীবনে বহু বিষয়ে তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ধর্মপথের প্রধান প্রবক্তারূপে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদাসীন দার্শনিক, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বিপ্লবী সাংবাদিক, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সাহিত্যসেবায় বিনিঃশেষ আত্মনিয়োগের অবকাশ এ'দের জীবনে ছিল না। অথচ এ'দের হাতেই বাংলা গদ্যের একটি নবতন ধারা গড়ে উঠেছে যদিচ তার প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি পড়ে নি এবং সে পথে পথিকের চলাচল বিশেষ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতির উৎস হুতোমী ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষা টিকল না, নোতুন কোনো পথের সন্ধান তা দিতে পারে নি। বঙ্কিমের মতে আলালী ভাষা প্রশংসাযোগ্য, কেননা তা কথোপকথনের ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা নিন্দার্হ, কেননা তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুকারী। আলালী ভাষায় গুরুচন্ডালী রূপ ও উৎকট ফারসীপ্রিয়তা বঙ্কিমচন্দ্র দেখেও দেখেন নি। কিন্তু বহু প্রশংসা সত্ত্বেও তা চলল না। আলালী ভাষার প্রথম ও শেষ লেখক আলালের ঘরের দুলাল প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। অথচ একথা অস্বীকার করা যায় না যে বঙ্কিম স্বয়ং বিদ্যাসাগরী রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমগদ্যের ভিত্তিভূমি বাংলার প্রথম সাহিত্যিক গদ্য, সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুকারী বিদ্যাসাগরী গদ্য। আলালী ভাষা নিষ্ফলা হয়েছে। বিদ্যাসাগরী ভাষা পরবর্তী অনুসৃতি ও উন্নতির মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছে—একথা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন।

এই দুই রীতির উদাহরণ চোখের সামনে থাকলে বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। আলালী ভাষা :

> বাবুরাম বাবু চৌ গোঁপ্পা — নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা, ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—অরে হরে, শীঘ্র বালী যাইতে হইবে দুই চার পয়সায় একখানা চলতি পান্সী ভাড়া করতো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বে-আদব হয়। হরি বলিল, মহাশয়ের যেমন কান্ড। ভাত খেতে বসুতেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসুতেচি—ভেটেল পানুসি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টানিতে ও ঝিঁকে মারতে মাঝিদের

কালঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে দুইচার পয়সায় হতে পারে—চলতি পান্সী চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি নিয়ে ছাতু গেলা? [১৮৫৮ এই গুরুচণ্ডালী সংকর ভাষা সাহিত্যে অনুসৃত হয় নি। বিদ্যাসাগরী ভাষা :

রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গোরতরঙ্গিনী তীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখ সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" [সীতার বনবাস : ১৮৬০

এই বর্ণনায় স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষ তৎসম শব্দাবলীর ধ্বনিরোলে কেবল "পথের পাঁচালী"র কিশোর অপু মুগ্ধ হয়েছিল। সেই সঙ্গে গত একশ বছর যাবৎ বাঙালিমাত্রেই এর ধ্বনিলালিত্য ও শব্দঝংকারে মুগ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত'কেই গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয় বঙ্কিমগদ্যে অবিরল।

বঙ্কিমের ভাষাদর্শটি কী? বঙ্কিম নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ—সরলতা এবং স্পষ্টতা।....তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; সরলতা ও স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।....প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিস্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কোন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কর্মসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" [বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ বাঙ্গলা ভাষা প্রবন্ধ]

প্রয়োজনই এখানে চরম মাপকাঠি। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষায় প্রশংসা সত্ত্বেও তা বর্জন করেছিলেন, আর বিদ্যাসাগরী ভাষার নিন্দা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রয়োজনের পথকেই বঙ্কিমচন্দ্র "মধ্যগারীতি" বলে অভিহিত ও গ্রহণ করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" (১৮৬২) ও মহাভারতের গদ্যানুবাদ (১৮৫৯ ও ১৮৬৬) দুই ভিন্ন গদ্যরীতির পরিচয়স্থল। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাপকাঠির কথা বলেছেন, কালীপ্রসন্নের এই দুই গ্রন্থে তার সফল অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র হুতোম ভাষাকে অসুন্দর অশ্লীল পবিত্রতাশূন্য বলেছেন। তিনি আরো একটি গুরুতর কথা বলেছেন, "যিনি যত চেষ্টা করেন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।"

বঙ্কিম এই মন্তব্য করেছেন ১৮৭৮খৃষ্টাব্দে (১২৮৫ বঙ্গাব্দে)। পর বৎসরেই "ভারতী"

পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাদে বিবেকানন্দ পত্রাবলী ও ভাষণাদি রচিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "সবুজপত্র" প্রকাশিত হয়। কথনের ভাষায় চিত্তসঞ্চালনরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা, তার পরীক্ষা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের কথ্যভাষা-চর্চার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে গদ্যসাহিত্যে তখনো বঙ্কিমের অপ্রতিহত প্রতাপ এবং তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি 'ভারতী'র উদ্দেশে লিখিত হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা অপনোদিত হয়েছে তেত্রিশ বৎসর বাদে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'সবুজ পত্র'-এর পাতায়।

'সবুজ পত্র'-এর কথ্যভাষা-আন্দোলনের বিশ বছর আগে বিবেকানন্দ এই বিষয়ে সচেতন ভাবে যে চিন্তা করেছিলেন। তার পরিচয় রয়েছে 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে। গত শতাব্দের শেষ দশকেই বিবেকানন্দ লিখেছিলেনঃ

> চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও। তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিম্ভূতকিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ একচাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমী গদ্যরীতিকে অগ্রাহ্য করে 'কথনের ভাষা'তেই 'চিত্ত সঞ্চলন' করতে চেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমী ভাষা তাঁর আদর্শ। আলালী ভাষা গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট, তা সংকর ভাষা। গত শতাব্দের মধ্যবিন্দুতে কলকাতায় প্রচলিত কথ্যভাষাকে অবিকৃতরূপেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের মতানুসারে হুতোমিভাষা অশালীন বা অসুন্দর হতে পারে। কিন্তু তা আড়ষ্ট বা হতবল নয়। গভীর ভাববহনের ক্ষমতা হুতোমীভাষায় দেখা যায় নি, কিন্তু লঘু চিন্তা ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রকাশে এর কার্যক্ষমতা সংশয়াতীত। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথ্যভাষার তেজ ও প্রাণশক্তিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ এই ভাষাকেই মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও স্বামী বিবেকানন্দ, দুজনেই খাঁটি কলকাতার লোক, একই অঞ্চলের

বাসিন্দা। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ এঁদেরই প্রতিবেশী, তাঁর নাটকে এই কলকাতিয়া ভাষার প্রাণ-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাই।) জনতার মুখের ভাষাকে সাহিত্যে চালান করে দেবার যে কৌশল কালীপ্রসন্নের আয়ত্তে ছিল, তা বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও যোগেশ বিদ্যানিধিরও ছিল।

হুতোমী ভাষার উদাহরণঃ

> "কলকেতা শহরে আমোদ শীগগির ফুরোয় না, বারোইয়ারি-পূজার প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী পচা গলা ধসা হয়ে থাকে—সে সব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে। সুতরাং টাটকা চড়ক টাট্‌কা-টাট্‌কাই শেষ করা গ্যালো।"
>
> আমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড় করে মেঘ ডাকবে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তোপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন—আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ করচে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।"

এই ছুটন্ত ভাষার থেকে প্রাণশক্তির যে তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে, তা পাঠকমনকে আলোকিত করে তোলে।

স্বামী বিবেকানন্দের হাতে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনে জনতা-ব্যবহৃত এই ভাষার প্রাণশক্তি ধরা পড়েছে। সামান্য উদাহরণেই এই অভিমতের পোষকতা হবে।

> "আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা সীমান্ত নেই। হরি হরি, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার উপরে ভেঁপু হলো, পরশু চামর হলো; আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রুপো বাঁধন হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্র গদাপদ্মশঙ্ক—আর শঙ্কগদাপদ্ম চক্র—"

কথ্যভাষার প্রাণস্পন্দন এখানে অনুভব করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি যে কত, তা গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হলো। ভাষা সম্পর্কে সকল প্রকার সংস্কারমুক্তি ও চলমান জীবনের প্রতি আস্থা এই গদ্যরীতিতে ধরা পড়েছে। "পরিব্রাজক" (১৯০৩) গ্রন্থে জাহাজে হাঙর-শিকারের যে সরস বর্ণনা বিবেকানন্দ দিয়েছেন, সেটি উদ্ধৃত করি।

> "সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখন দেখা যায় নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়েই। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাশটি জাহাজের পাছার উপর। সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ঝুঁকে হাঙর দেখচে। আমরা যখন

হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল।.. কিন্তু নেহাৎ হুতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান 'বাঘার গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড "থ্যাবড়ামুখো" চলে আসছে।...এবার সব চুপ। নোড়-চোড় না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্ চুপ—এইবার চিৎ হলো—ঐ যে আড়ে গিলেচে, চুপ্—গিলতে দাও। তখন "থ্যাবড়া" অবসর ক্রমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান! বিস্মিত "থ্যাবড়া", মুখ ঝেড়ে চাইল সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্।"

এই বর্ণনা এত জীবন্ত যে চোখের সামনে ঘটছে বলে মনে হয়। এখানে গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দের ভাষার উপর অসাধারণ দখল, পরিহাস-দক্ষতা ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথা ভাষার প্রাণশক্তি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তার প্রমাণ এখানে পাই। কেবল ক্রিয়াপদ বিশেষণ ও সর্বনামের চলিত রূপের ব্যবহার নয়, চলতি ইডিয়ম, দেশজ শব্দ, বিদেশী শব্দ, লাগসেই উপমা নির্দ্বিধায় তিনি প্রয়োগ করেছেন।

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ কথ্য বাংলা ভাষার প্রাণশক্তিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তার ফলে বাংলা গদ্যভাষার সম্ভাবনা দূর-বিস্তৃত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিশাল মূর্তির আড়ালে যে গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ রয়েছেন, তাঁকে আবিষ্কার করে বাঙালিমাত্রেই আনন্দিত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট বোম্বাই সহরে এক ধর্মনিষ্ঠ গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে কাশীনাথের জন্ম হয়। এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম উপকূলে গোয়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই পরিবার জীবিকাব্যপদেশে গোয়া ত্যাগ করিয়া বোম্বাই এর অনতিদূরে থানা নামক স্থানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে পরিবারটি বোম্বাইএ চলিয়া আসেন। কাশীনাথের পিতামহের নাম ছিল রামচন্দ্র তেলাঙ্। রামচন্দ্রের দুই পুত্রের নাম ছিল ত্রিম্বক্ ও বাপুভাই। কাশীনাথ এই বাপুভাই এর মধ্যম পুত্র। বাপুভাই এর অগ্রজ ত্রিম্বক্ নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথকে দত্তপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম হইয়া যায় কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ্।

বাল্যকালেই কাশীনাথ সবিশেষ মেধার পরিচয় দেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এর এল্‌ফিনষ্টোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঁচ বৎসর পরেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে অধ্যয়নের সময়েই তিনি ইংরাজী, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তেলাঙ্ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবৎসর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি এম, এ, ও এল, এল, বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সব পরীক্ষাগুলিতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বহু পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্ররূপে অধ্যয়ন কালে ব্যয় নির্বাহের জন্য তেলাঙ্ প্রথমে এলফিনষ্টোন হাইস্কুলে ও পরে এলফিনষ্টোন কলেজে সংস্কৃত পড়াইতেন। কাশীনাথের সংস্কৃত জ্ঞান কত গভীর ছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এম, এ, ও এল, এল, বি, পাশ করার পর বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তা কাশীনাথকে ৩০০্ টাকা বেতনে একটি সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। তৎকালে একজন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এই বেতন ও এই পদ যথেষ্ট লোভনীয় ছিল। কাশীনাথ এই পদের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া আপন-ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে মনস্থ করেন। শিক্ষানবিসি অন্তে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ বোম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ীরূপে যোগদান করেন। অচিরকালের মধ্যেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী বলিয়া পরিগণিত হন। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য হিন্দু আইন বিষয়ে তিনি তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। যে সব দুরূহ মামলায় তিনি কোন পক্ষে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না সেই সব ক্ষেত্রে অন্য আইনজীবীগণ এমন কি বিচারকেরাও পরামর্শের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তেলাঙ্ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিচারপতি থাকা কালেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তেলাঙ্-এর জীবনান্ত হয়।

বাল্যকাল হইতেই জনসেবা তথা দেশসেবা ও বিদ্যাচর্চা কাশীনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই জন্য সরকারী চাকুরীর প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তিনি আইন ব্যবসায়ীর স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করেন। আইন ব্যবসায়ে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অচির সংগঠিত বোম্বাই মিউনিসি-

পালটির যথেচ্ছাচার রোধ ও সুষ্ঠু পরিচালনের উদ্দেশ্যে করদাতৃসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার ফলে মিউনিসিপালিটি সংক্রান্ত একটি আইন বিধিবদ্ধ হয় ও মিউনিসিপালিটির পরিচালন ব্যবস্থা কয়েকজন মনোনীত ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত হয়। কাশীনাথ দীর্ঘকাল 'কাউন্সিলার' রূপে বোম্বাই মিউনিসিপালিটির (করপোরেশন) সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। কাশীনাথ এই স্বৈরাচারী শাসকের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিতে অগ্রণী হন। লর্ড লিটনের রেভিনিউ জুরিসডিক্সন এক্ট (১৮৭৬), লাইসেন্স এক্ট, ভারনাকুলার প্রেস এক্ট প্রভৃতির প্রতিবাদে তিনি বহু সভায় বক্তৃতা করেন ও পুস্তকাদি প্রচার করেন। বয়োবৃদ্ধ দেশপ্রেমিক দাদাভাই নৌরোজী ছিলেন কাশীনাথের রাজনৈতিক গুরু, ফিরোজা শা মেটা, মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি কাশীনাথের সহযোগী ছিলেন। ১৮৮৫—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালন করেন। ইহার পূর্বে তিনি দাদাভাই নৌরোজী প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার সেক্রেটারী পদেও কাজ করিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস) প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করিতে কাশীনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক। শাসনসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবটি কাশীনাথ দ্বারাই উত্থাপিত হয়। অপর একটি প্রস্তাব ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলুপ্তি বিষয়টির সমর্থনে কাশীনাথ একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসের পরবর্তী দুইটি অধিবেশনে অসুস্থতার জন্য তেলাঙ্ যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শাসনসংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এবারও তেলাঙ্ কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এই অধিবেশনে কাশীনাথ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তেলাঙ্ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। অতঃপর কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে যোগদান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে এই বৎসরের অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে কাশীনাথের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া দাদাভাই নৌরোজী বলেন যে কাশীনাথের মৃত্যু দেশের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি।

[It is our melancholy duty to record the loss of one of our greatest patriots, Justice Kashinath Trimbak Telang. It is a heavy loss to India; you all know what a high place he held in our estimation for his great ability, learning, eloquence, sound judgment, wise counsel and leadership. I have known him and worked with him for many years, and I have not known any one more earnest and devoted to the cause of country's welfare. He was one of the most active founders of this congress and was its first hard working Secretary in Bombay. From the very first he had taken a warm interest and active part in our work, and even after he became a Judge his sound advise was always at our dispesal.]

১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এই সভার সদস্যরূপে তিনি গভর্নমেণ্টকে বহু জনকল্যাণমূলক কর্ম করিতে অনুপ্রাণিত করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল বিলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনস্বার্থের বিরোধী কোন প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে কাশীনাথের তীব্র প্রতিবাদ ও যুক্তিজাল সরকারকে এই পন্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিত। দেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কার তেলাঙ্-এর জীবনের পরম ঈপ্সিত বিষয় ছিল। বোম্বাই প্রদেশে "ষ্টুডেণ্টস সায়েণ্টিফিক ও লিটারারী সোসাইটি" নামক সংস্থা অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিচালন করিত, তেলাঙ্ আজীবন এই সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহুকাল ধরিয়া তেলাঙ্ বোম্বাই-এর সরকারী আইন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সংস্কার করা হয়। ১৬ বৎসর কাল তেলাঙ্ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন, এক বৎসরের কিছু বেশী সময়ের জন্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চেন্সেলার) ছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। এই পদে আসীন থাকা কালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বোম্বে মিউনিসিপালিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাটি তিনি ও তাঁহার সহকর্মী সুহৃৎ ফিরোজা শা মেটাই প্রস্তুত করেন। শিক্ষা প্রসারে তাঁহার নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার তাঁহাকে "ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন ১৮৮২" এর সদস্য মনোনীত করেন।

এই কমিশন প্রত্যেকটি প্রদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি পৃথক প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রিপোর্টে প্রধানতঃ তেলাঙেরই মতামত প্রতিফলিত হয়, যদিও এই রিপোর্টটি তিনি রচনা করেন নাই। তেলাঙ্ অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার গভীরজ্ঞান ছিল তথাপি তিনি রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষার বদলে দেশে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা প্রচার আবশ্যক, অবশ্য প্রাচীন চতুষ্পাঠি প্রভৃতি গুলি রক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনের তিনি বিরোধিতা করেন নাই। তেলাঙ্ এই মত প্রকাশ করেন যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাই ভারতবাসির পক্ষে মঙ্গলকর হইবে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে গভর্নমেণ্ট শুধু সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন বাংগালা দেশে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে কাশীনাথ ত্রিম্বকের মতামতে রাজা রামমোহনের চিন্তারই প্রভাব লক্ষিত হয়। কাশীনাথ ইংরাজী শিক্ষার সংগে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত হইতে পরামর্শ দেন। কাশীনাথের মতামতেই উত্তরকালে সরকারের শিক্ষানীতি পরিচালিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও উপাচার্য হিসাবে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

রাজনীতিজ্ঞ, আইন ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদ রূপে কাশীনাথ তাঁহার জীবদ্দশায় একজন দিক্‌পালরূপে চিহ্নিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে নিজের রুচিমত বিষয়টি বাছিয়া লইয়া জীবন যাপনের সুবিধা থাকিলে তিনি আইন ও রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চাতেই সুখী হইতে পারিতেন। ভারতবিদ্যা সাধনার ক্ষেত্রে কাশীনাথ ত্রিম্বকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—।

ছাত্রাবস্থায় তেলাঙ্ অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যায়ন করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, আজীবন তিনি এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। মাত্র ২২ বৎসর বয়সের সময় তেলাঙ্ ইংরাজী ভাষায় একটি সভায় "রামায়ণ কি হোমরের দ্বারা প্রভাবিত?" এই নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (ওয়াজ রামায়ণ কপিড ফ্রম হোমার)। এই প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ভেবরের মত এই ছিল যে রামায়ণ ইলিয়ড্, অডিসির পরবর্তী রচনা, সীতা হরণ ও লঙ্কা আক্রমণ ঘটনা হোমরের ইলিয়িড কাব্যের হেলেন হরণ ও ট্রয় অবরোধ কাহিনীর অনুকরণে রামায়ণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি হইতে রামায়ণের জন্ম হইয়াছে, রামায়ণ খৃষ্টজন্মের পরবর্তী কালের রচনা।

কাশীনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ইহা পরিস্ফুট করেন যে গ্রীকেরা নানা বিভাগে হিন্দুদের নিকট ঋণী, সুতরাং রামায়ণের সীতা হরণ ও লঙ্কা আক্রমণ ঘটনাটি হোমরই রামায়ণ হইতে ধার করিয়াছেন ইহা অসম্ভব নহে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সনাতন হিন্দুধর্মের সাহিত্য ও শাস্ত্রকে অনেক সময় নিজেদের মতও বিশ্বাস অনুযায়ী সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন ইহার প্রমাণ আছে, সুতরাং দশরথ জাতক রামায়ণের নিকট ঋণী, রামায়ণ জাতকের নিকট ধার করা বস্তু নহে। জ্যোতিষিক ও ভৌগোলিক সাক্ষ্যদ্বারা তেলাঙ্ রামায়ণ যে খৃষ্ট পরবর্তী নহে ইহা প্রমাণ করেন। অতঃপর পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক এই বিষয়ে তেলাঙের মতবাদই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই রচনাটি একটি পুস্তিকারূপে ও পরে ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়(১)। ডাঃ লরিনজার নামে একজন জার্মান পণ্ডিত এইমত প্রকাশ করেন যে ভগবদ্গীতা বুদ্ধের পরবর্তী কালে রচিত। কাশীনাথ এই মতের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে নিউটেষ্টামেন্টের কোন কোন অংশের সহিত ভগবদ্গীতার ভাব সাদৃশ্য থাকায় পণ্ডিত প্রবর অনুমান করিয়াছেন যে বুদ্ধ পরবর্তীকালে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া কোন ব্রাহ্মণ গ্রীকদের নিকট নিউ টেষ্টামেন্টের ভাবগুলি ধার করিয়া ভগবদ্গীতা রচনা করিয়াছেন। এই ধারনা যুক্তিহীন বরং ইহাই সম্ভব যে কোন গ্রীক্ পণ্ডিত এদেশে আসিয়া ভগবদগীতা পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে ভাল অংশগুলি লইয়া নিউটেষ্টামেন্ট্ রচনা করিয়াছন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথের এই প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত ভগবদগীতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ গ্রন্থের ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট হয়। এই ভূমিকাটিতে জার্মান পণ্ডিতের মতটিই শুধু খণ্ডন করা হয় নাই উহাতে গীতার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব ও প্রতিপাদিত হয়(২)। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তেলাঙ্ ভর্তৃহরির নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক দুইটি টিকা হইতে উদ্ধৃতিসহ সম্পাদন করেন। এই সুসম্পাদিত গ্রন্থটি ব্যুল্লর্ ও কীলহর্ণ প্রবর্তিত বোম্বে সংস্কৃত সিরিজ গ্রন্থমালার নবম গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়(৩)। এই গ্রন্থটি অধিকতর সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তেলাঙ্ বিশাখ দত্ত রচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, এই পুস্তকটি বোম্বে সংস্কৃত সিরিজের ২৭ সংখ্যক পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়(৪)। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বারানসী, পুনা, কোলাপুর ও দক্ষিণ ভারত হইতে সংগৃহীত ৮ খানি পুঁথির সহায়তায় তেলাঙ্ ইহার শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কাশীনাথ বিশাখ দত্তের কাল ও এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। পরে পৃথক পৃথক প্রবন্ধে কাশীনাথ বান, সুবন্ধু, কুমারিল, ভর্তৃহরি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের কাল সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন(৫)। কাশীনাথের এই প্রবন্ধগুলি ও ভারতবিদ্যার অন্যান্য বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলি উত্তরকালে গবেষকদের বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছে(৬)। এই প্রবন্ধগুলি আইন ব্যবসায়ী কাশীনাথের সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ়

ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ তেলাঙ কৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ বিশ্বকুলপতি ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত সেক্রেড্ বুকস অফ্ দি ঈষ্ট গ্রন্থমালার অষ্টম খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়(৭)। অন্য পণ্ডিতদের লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা কার্য্যেও কাশীনাথের সমধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইত। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী পত্রিকায় তাঁহার লিখিত সমালোচনাগুলি বিদগ্ধ জনের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায়ও তিনি অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়(৮)।

কাশীনাথের মাতৃভাষা ছিল মারাঠি। স্বদেশপ্রেমিক কাশীনাথ তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেন, এই সময় শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয়গণ মারাঠি ভাষার চর্চা না করিয়া ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহাদের মনোযোগ ন্যস্ত করিতেন। কাশীনাথের ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কাশীনাথকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পটুত্বলাভ করিয়াও তেলাঙ মারাঠি ভাষার চর্চা করিতেন। স্বায়ত্ত্বশাসন সম্বন্ধে তিনি একটি ইংরাজী পুস্তক মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন (স্থানিক রাজ্য ব্যবস্থা, ১৮৮৫)। এই সময় লর্ড রিপনের শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন (লোকেল সেল্ফ গভর্নমেন্ট্) প্রবর্তিত হইতেছিল। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ সুষ্ঠুভাবে যাহাতে পৌরসভা, জেলা বোর্ড প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে কাশীনাথ একটি জার্মান ভাষার নাটক মারাঠিতে অনুবাদ করেন (শাহানা নেথন, ১৮৮৭)। উৎকৃষ্ট বিদেশী গ্রন্থের মারাঠি অনুবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই এ মহারাষ্ট্র ভাষা সম্বর্দ্ধক মণ্ডল নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইলে কাশীনাথ উহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার উৎসাহে বহু মারাঠি পণ্ডিত বিদেশী গ্রন্থের মারাঠি অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই কার্য্যের দ্বারা মারাঠি ভাষা সমৃদ্ধ হয় এবং এই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত মারাঠিরা মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার কেশরী পত্রে কাশীনাথের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের দিকে মহারাষ্ট্রীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন (কেশরী, ২৩-৯-৯১)। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য ও ইতিহাস কাশীনাথ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাশীনাথের লিখিত "গ্লিনিংগস্ ফ্রম মারাঠা ক্রনিকলস্" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে লিখিত "রাইজ অব্ মারাঠা পাওয়ার" গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায় রূপে সন্নিবিষ্ট হয়।

কাশীনাথ অতিশয় বিনয়ী ও মধুর স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন সর্বভূতে সমদর্শী এই মনীষী দেশের হিন্দু মুসলমান, পার্শী সকলেরই সমপরিমাণ শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তেলাঙের অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারতবাসী নহেন, ইউরোপীয় অনেক বন্ধু ও মর্মাহত হন। তেলাঙের মৃত্যুতে সুদূর বাঙলা দেশও শোকগ্রস্ত হয়। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান নেশন ও রেইস এণ্ড রায়ট্ পত্রে তেলাঙের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

(১) Note on Ramayana—Indian Antiquary, Sept., 1874. (Also Pub. as a pamphlet, Bombay, 1872).

(২) Bhagawadgita—Translated into Eng verse with notes and an introductory essay, Bombay, 1875.

(৩) The Nitisataka and Vairagyasataka of Bhartihari. Ed. with Notes—Bombay Sanskrit Series, 1, 1874, 2nd edn. 1885, 3rd edn. 1893.

(৪) Mudrarakshasa by Visakhdatta with commentary, introduction and explanatory notes —Bombay Sanskrit Series, No. 27, 1884.

(৫) (i) The date of Nyaya Kusumanjali—I.A., Oct., 1872.
(ii) The date of Sriharsa, I.A., March, 1873.
(iii) Kalidasa, Sri Harsha and Chand, I.A., March, 1874.
(iv) Ramayana older than Patanjali, I.A., April, 1874.
(v) A note on the Age of Madhusudan Saraswati—Journal of Royal Asiatic Soc., Bombay Branch, Vol. 8.
(vi) Life of Sankaracharya, Philosopher & Mystic, The Theosophist, Jan., 1880, May, 1880.
(vii) The date of Sankaracharya, I.A., April, 1884.
(viii) Punarvarma and Sankaracharya—J. B. B. R. A. S., Vol. XVII.
(ix) Subandhu and Kumarila—J. B. B. R. A. S., Vol. XVIII.

(৬) (i) Note on Gomutra, I.A., Oct., 1872.
(ii) Note on the Nyaya Kusumanjali, I.A., Nov., 1872.
(iii) The Parvati Parinaya of Bana, I.A., Aug., 1874.
(iv) Kalidasa and Sriharsa, I.A., March, 1875.
(v) The Sankarvijaya of Anandagiri, I.A., Oct., 1876.
(vi) Gleanings from the Sariraka Bhashya of Sankaracharya—J. B. B. R. A. S., 1890.

(৭) Bhagawadgita with Sanatsujatiya and Anugita, Eng. Trans. (Sacred Books of the East, Vol. VIII), Oxford, 1882.

(৮) (i) A new Chalukya Copperplate—J.B.B.R.A.S., Vol. X.
(ii) Three Kadamba Copperplates „ Vol. XII.
(iii) A new Sitara Copperplate, I.A., Feb., 1880.
(iv) The Copperplate grant of Pulikesin II, I.A, Dec., 1885.

[দ্রষ্টব্য : Telang's Legislative Speeches with Sir Raymond West's essay on his life—Ed. by D. W. Philgaonkar, Bombay, 1895; Select Writings and Speeches Vol. I & II, Gour Saraswat Brahmin Mitra Mandal, Bombay, (1916, 1927); A literary hiistory of India (K. T. Telang), Pp. 433—446, London, 1915; K. T. Telang by V. N. Naik, G. A. Natesan, Madras; Indian Judges—G. A. Natesan, Madras, 1932 (Pp. 254—204); Representative Indians—G. P. Pillai, London, 1897 (Pp. 267—277); K. T. Telang—Pub. by Telang Centenary Committee, Bombay, 1951, etc. etc.]

কলাকর্ষণ ঃ কয়েকটি প্রস্তাব

আনন্দ কুমারস্বামী

সাংপ্রতিক শিল্পচিন্তা দুটি প্রধান সরণীতে বিভক্ত, বিশুদ্ধ শিল্প এবং কারুশিল্প। সম্যক-রূপে না হলেও, সাধারণ রসিক এই দুটি শাখা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল। একটির বৈশিষ্ট্য যদি হয় আত্মগুণের শোভন প্রকাশ অপরটির তবে যত্নার্জিত নির্দেশের নির্ভুল অণুকরণ। আত্মগুণ-সম্বল বিশুদ্ধ শিল্প, তাই, স্বভাবত-ই যত্নার্জিত কারুকর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। এ সম্পর্কে নন্দন-তত্ত্বের স্পষ্ট অভিমত হল : শিল্পের সার্থকতা তার যদৃচ্ছপরিণতিতে নয়, সুমিত ভঙ্গিমায়। কি পেলাম তা নয়, কেমন করে পেলাম সেটাই শিল্পসম্পর্কে দ্রষ্টব্য। শিল্পাচার্য এবং নন্দন-তাত্ত্বিকগণ মনস্তাত্ত্বিক সূত্রে আর একটি অনুসিদ্ধান্তে এসেছেন : শিল্পজ্ঞান সম্পূর্ণ করতে হলে শুধু সৃষ্টিকেই নয়, স্রষ্টাকে ও জানা প্রয়োজন। এই উক্তিতে আধুনিক শিল্পীদেরও কেউ কেউ সানন্দে সম্মতি জানিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধশিল্পের এই স্তাবকগণ ব্যক্তিপ্রতিভার গুণমাহাত্ম্যে পঞ্চমুখ।

পক্ষান্তরে, অন্যমতে, প্রতিভাপূজো অবাঞ্ছিত। এবং নিছক আত্মগুণসম্বল শিল্প সাধা-রণ্যে সংবর্ধিত নয়, অপরিহার্য ও বলা চলে না।

এই সূত্র ধ'রেই আমরা একটি বিস্মৃতপ্রায় শিল্পচিন্তাকে স্মরণ করব : 'যে কোন কর্মের শৃঙ্খলিত সাহচার্যই হ'ল শিল্প। সুতরাং প্রতিমা নির্মাণ, মোটর তৈরী কিংবা উদ্যান রচনা সব কিছুই শিল্পকর্ম।' পশ্চিমে ক্যাথলিকরাই এই উক্তিটি স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেন। এর থেকে অনায়াসে অনুবর্তী সিদ্ধান্তে আসা চলে : 'যে কোন শোভনকর্মেই শিল্পমায়ার স্বর্ণ-ষষ্টির ছোঁয়া লাগবেই।' এ কথাটিই একটু ঘুরিয়ে পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন সন্ত টমাস। আসল কথা, জনজীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করাই শিল্পের লক্ষ্য। সুতরাং এই উক্তির পরিপ্রেক্ষায় আপতমাধুর্যকে নয়, পরিণামরমণীয়কে অবলম্বন করাই শিল্পানুরাগীর অবশ্যকর্তব্য। খারাপ খাবার সুস্বাদু হ'লেও যেহেতু পুষ্টিকর নয়, অতএব, অগ্রহণীয়। জীবনধর্মী ভাবালু উপন্যাস সুখপাঠ্য হ'লেও যেহেতু চিত্ত দৌর্বল্যের সহায়ক, অতএব, পঠনীয় নয়। উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই সাধারণ মানুষকে স্মরণ করে। কেন না, বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি তাঁদের উদ্দেশ্যেই লেখা।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা শিল্পচর্চায়। তথাপি লক্ষণীয়, শিল্পের প্রতি নির্মোহ ঔদাসীন্য সাধারণ্যেই বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ কোনো সৃষ্টিসামগ্রীর উদ্দেশ্য এবং পরিণতি অবগত না হ'লে, পারতপক্ষে সে সম্ভবনা না দেখলে, তার প্রতি ঔৎসুক্য অনুভব করে না। একথা স্বীকার করতে আজ কোন বাধা নেই, শিল্পমাত্র-ই উদ্দেশ্যযুক্ত এবং তার পরিণতি-প্রাপ্তিতেই শিল্পের কৈবল্যসিদ্ধি। অথচ সাধারণ্যে একথা সোচ্চার নয়, অপিচ, বিপরীত ধারণা বর্তমান। এবংবিধ ধারণার পিছনে শিক্ষিত সমাজের প্রতিক্রিয়া কার্যকর, একথা সহজেই অনুমান করা চলে। গোঁড়া ধার্মিকদের মধ্যে কেউ কেউ সোজাসুজি বলেছেন, জীবনে শিল্পের অস্তিত্ব বাহুল্যমাত্র, অতএব, পরিত্যাজ্য। বস্তুনিষ্ঠদের কাছে ব্যবহারিক শিল্পের আবেদন থাকলেও বিশুদ্ধশিল্প অকাজের ঢেকি ব'লেই বিবেচিত। শ্রমিক শ্রেণীর চোখে বিশুদ্ধ শিল্প হ'ল বিলাসীর ব্যসন, অতএব, ধিক্কৃত।

এ তাবৎ আলোচনায় দুটি মত স্পষ্ট। এক, জীবনে সর্ববিধ প্রেরণার উৎস শিল্প, সুতরাং, অত্যাবশ্যক। দুই, বিশুদ্ধ শিল্প জীবনের পক্ষে বাহুল্য, সুতরাং, পরিত্যাজ্য। বলার

কথা এই, যদিচ উভয় শিবির-ই শিল্প কথাটির প্রয়োগ করেছেন তথাপি তাঁদের শিল্পধারণায় আসমান-জমিন ফারাক। তবু, দুটি মতের উপর নির্ভর করে একটি সাধারণ প্রশ্ন তোলা যায়, জীবনের পক্ষে শিল্পের আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? থাকলে, কতখানি? এর সরাসরি উত্তর সম্ভব নয়। কেননা, প্রয়োজন এমন একটা জিনিষ যার সঙ্গে অভাব এবং মূল্যের সম্পর্ক ওতঃপ্রোত। বলা যায়, অভাবের গুরুত্ব অনুসারেই প্রয়োজন এবং মূল্যমান নিরূপিত হয়। মূল্য সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার ভিতর না গিয়েও এটুকু বলা হয় তো অসঙ্গত নয়, প্রয়োজনীয়-প্রস্তুতির জন্য আনুষঙ্গিক মূল্য কম হ'লে শিল্পসামগ্রীর মূল্যস্ফীতি কাজের কথা নয়। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মূল্যস্ফীতি কথাটিতো আপেক্ষিক। কেন না, গুণগত ঔৎকর্ষ বা শিল্পমান মূল্যনির্ধারণে অবান্তর নয়। উত্তরে বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিক মনে হ'লেও গুণ-মানের সার্থকতা, উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতে। শিল্পসৃষ্টিতে সাধারণের গ্রহণক্ষমতার প্রশ্নও মাঝে মাঝে উঠেছে। এবং হয়তো রুচিমান শিল্পরসিকের অসদ্ভাবে শিল্পোন্নতির বিঘ্নতা ও অপ্রতুল নয়। কিন্তু শিল্পী এবং শিল্পানুরাগীরা বাধ্য হয়েই তাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। আর, কখনো কখনো লোকপ্রিয়তার জন্য অল্পবিস্তর প্রচার পিয়াসা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে বিশুদ্ধশিল্পী এবং কারুকৃৎ এর মধ্যে। শিল্প সংগ্রহশালাকে ও এই অর্থে প্রচারস্থল বলা যেতে পারে। এখানে বিশুদ্ধশিল্পী বা কারুকৃৎ-এর নিদর্শনাবলীর প্রদর্শনের অন্তরালে সংগোপনে আর একটি ইচ্ছেও লালিত—আমি শিল্পসামগ্রীর বিক্রয় ইচ্ছার কথাই বলতে চাইছি। সকলের না হলেও, অনেকেরই লক্ষ্য লাভের দিকে। কিন্তু শিল্পসামগ্রী যদি সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে না হয় তবে শিল্পকার এবং শিল্পরসিক উভয়ের পক্ষেই তা বিপদের কথা। অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে কয়েকটি সাংপ্রতিক সমস্যাও জড়িত। এ প্রসঙ্গে ক্যারো সাহেবকে স্মরণ করা যেতে পারে : লাভের ইচ্ছে থাকলেও, সর্বদা শিল্পকারের পক্ষে লভ্যাংশ জোটে না; জুটলেও, তা পর্যাপ্ত নয়। অথচ, মনোমত লাভই তাদের জুটত যদি মধ্যস্থ কোন ভাগিদার না থাকত। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ক্যারো সাহেবের লক্ষ্য এখানে কারুশিল্পীদের প্রতি। একথা ঠিকই, তাঁদের ভিতর এখন বহু স্তরভেদ হয়েছে। ফলত, ভাগিদার অনেক। আর এটাই তাঁদের অসন্তোষের কারণ। অথচ, শ্রমবিভাজন শিল্পের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ, কেন না, উন্নতকলাকর্ষণের অনুকূল গুণগত উৎকর্ষতাকে এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বোধ হয় অর্থলুব্ধগণের পক্ষে এমত অবস্থা কাঙ্ক্ষণীয় নয়। শ্রমবিভাজনের মূলসূত্রই হচ্ছে গুণানুসারে কর্মবিভাজন এবং তদনুপাতে লভ্যাংশের বন্টন। অর্থাৎ পূর্বে যা একজনের পকেটস্থ হত, আজ তা বহুধাবিভক্ত। এই কারণে মুনাফাখোররা ক্ষুব্ধ। তাছাড়া গণসাধারণের শিল্পের প্রতি অকুণ্ঠ অসহযোগিতাও শিল্পীর আর্থিক অসঙ্গতির অন্যতর কারণ। শিল্পীর শ্রমসাধনার প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য দেখালেও শিল্পের তাৎক্ষণিক সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, মগ্ন হই গভীর রসসাগরে। অথচ, শিল্প এবং শিল্পী সাংপ্রতিক ধারণায় অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য। দুঃখের হলেও সত্য, ইদানীং শিল্পের প্রতি আসক্তি ক্রমবিলীয়মান। বিত্তবানের অঙ্গনে বিশুদ্ধ শিল্পের পথ প্রায় রুদ্ধ, সাধারণ্যেও আসক্তি প্রবল নয়। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং শিল্পী ও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। কেন না, আর্থিকপ্রসঙ্গ আজ তাকেও বিব্রত করে। আর শিল্পশ্রমিকদের তো কথাই নেই। ঘন্টা ধরেই ওদের কাজ এবং তদনুসারেই ওদের অর্থাগম। সুতরাং ভাবলে ভুল হবে না, অবসর মুহূর্তেও ওদের একমাত্র চিন্তা অর্থপ্রসঙ্গই। অথচ কি রসিক কি শ্রমিক, কারুপক্ষেই এ অবস্থা কাংখিত নয়। কর্মকালে নিষ্ঠাবান কর্মি এবং অবসর কালে চিন্তাশীল শুভার্থী হওয়াই শিল্প শ্রমিকের কর্তব্য। এবং এখানেই শিল্পবিজ্ঞান

ও নীতিবিজ্ঞান যুগলবন্দী, তাদের সহ অবস্থান এই জন্যেই কাঙ্ক্ষণীয়। নীতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন এবং এখানেই ঃ নীতিবিজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের শুভাশুভ বিচার করাই তার কাজ। শিল্পবিজ্ঞান ও মানুষের বিজ্ঞান। শিল্পবোধ এবং মনুষ্যত্ব অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ। ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, প্রস্তরযুগ থেকেই মানুষ সজ্ঞানে শিল্পচর্চা করে আসছে। এবং অদ্যাবধি এই বিস্তীর্ণ কালচঙ্ক্রমণে দুটি পথই আপাতত আলোকিত। এক, শিল্পের ব্যবহারিক দিক। দুই, তার আদর্শের দিক। এই ভাবে শিল্প একদিকে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের, অপর দিকে নীতিবিজ্ঞানের সহোদর। লক্ষণীয় সভ্যতার সুরুতেই উপরিযুক্ত বিভাজ্যের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হলেও তার স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা অক্ষম ছিলাম। ক্রমশ জন্ম হল নন্দনতত্ত্বের, সৃষ্টি হল মনোবিজ্ঞানের, রচনা হল তৎসংক্রান্ত গ্রন্থের। তারপর রহস্যের অবগুন্ঠন খুললাম, দেখলাম সলজ্জমানস সুন্দরীকে। এবং তখনই দেখা দিল কলাবিদ্যার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিজ্ঞানের দুর্নিবার অভিযান। ফলত, একদা যে অশ্বমেধের ঘোড়াটি যাত্রা সুরু করেছিল সংশয়ের দোর থেকে, এখন সে সগর্বে উপনীত হল বিজ্ঞানের বিজয় তোরণে। পূর্বাচার্যগণের সঙ্গে চিন্তার যোগসূত্র ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকল। বিশেষত, এ্যানাটমি নিয়ে সরল এক পার্থক্য প্রবল দূরত্ব এনে দিল উভয় পক্ষে। এটি কালবিবর্তনের ধারায় আরও প্রকট হয়ে উঠল।

শিল্পের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, বিষয়ের প্রকৃতির সঙ্গেই শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আকৃতির সঙ্গে নয়। আকৃতির সঙ্গে যেটুকু, বুঝতে হবে সেটি প্রকৃতির প্রকাশের জন্য। তাই প্রকৃতি শুধু বিষয়ের বোধক রূপেই নয়, কর্মের কারণরূপেও বরেণ্য। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সতত সম্ভব নয় সুতরাং সর্বস্বীকৃত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গ্রহণীয়। এই জন্য সূত্রসম্বল বীজগণিতও কলাবিদ্যার দোসর। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকটি বিদেশী ভাষা (প্রায় লুপ্ত হ'লেও শ্রমসাপেক্ষে শিক্ষণীয়) অধিগত হওয়া শিল্পকার এবং শিল্পরসিক উভয়ের কর্তব্য। ভাবপ্রধান শিল্পালোচনায় অনুবাদ অন্তরায়—এটি একটি উপলব্ধ সত্য। আর্টমুজিয়াম প্রসঙ্গেও কিছু বক্তব্য আছে। সাধারণত, মুাজিয়ামের কাজ অতীত অথচ প্রাজ্ঞজন কর্তৃক মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত সামগ্রীর সংরক্ষণ। আর্টমুাজিয়াম প্রসঙ্গে ও কথাটি প্রযোজ্য। মৃত অথচ মূল্যবান শিল্পের সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ-ই শিল্পসংগ্রহশালার কর্তব্য। কিন্তু লজ্জার হ'লেও বলতে দ্বিধা নেই, সাংপ্রতিক শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা আর্টমুাজিয়ামে কোনরকমে নিজেকে উপস্থিত করা। শিল্পের পক্ষে এটি আদৌ সুস্থ লক্ষণ নয়, অপিচ, সংক্রামক ব্যাধি-বিশেষ। নিরাপদ আশ্রয়দান-ই যেমন গৃহের কাজ, ঐতিহাসিক সম্পদের সংরক্ষণ ও তেমন মুাজিয়ামের কাজ এবং সমকালীন সামগ্রী কখনোই ঐতিহাসিক নয়। সুতরাং তার মুাজিয়াম-স্থিতি, আসলে প্রাণসত্তার মূলেই কুঠারাঘাত। শিল্পসামগ্রীর প্রকৃতস্থান রসিকজনের হৃদয়ে, আর্টমুাজিয়ামে কদাচ নয়। প্রদর্শন যে ধরণের-ই হ'ক, রসিকদৃষ্টি আকর্ষণ করা চাই। আর একথা অনস্বীকার্য, আর্টমুাজিয়াম এখনও সাধারণ শিল্পরসিকের গতায়াত-স্থল হ'য়ে ওঠে নি। ফলকথা, শিল্পসংগ্রহশালায় স্থান সংগ্রহ করাই শিল্পীর একমাত্র ইচ্ছে হয়ে দাঁড়ালে শিল্পী হিসাবে সে স্বধর্মভ্রষ্ট।

কলাকৈবল্যবাদিগণ কলাকর্ষণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে স্পষ্ট উক্তি উপস্থিত করেছেন ঃ 'আর্টের জন্যেই আর্ট,' অন্যরূপ কোন দায়ভাগ এর নেই। কিন্তু এ কথা যুক্তিসহ নয়, বরং বিচারবিভ্রাটের-ই নামান্তর। তাঁরা মুখে বলেন আর্টের কোন উদ্দেশ্য নেই অথচ তাঁরাই তার সংরক্ষণে তৎপর।

শিল্পের স্বকীয়স্বার্থে যাঁরা ঘোরবিরোধী তাঁরাও সুবিবেচক নন। তাঁদের মতে ভোগ-প্রাচুর্যের মধ্যেই কলাচর্চা সম্ভব। চিন্তা করলে দেখা যাবে এ উক্তি ও অর্বাচীন। উচ্চচিন্তার অজুহাতে কলাদেবী যদি সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপ ত্যাগ ক'রে বিলাসীর প্রাসাদকক্ষে ঠাঁই নেন, তবে বলতে ইচ্ছে ক'রে, তিনি দেবী নন, দাসী। এবং সে আর্টও আর্ট নয়, আর্টের ফ্যাশন। কেন না, বিলাসী-বন্দী কলা-ইতিহাস এমন কিছু গৌরবোজ্জ্বল নয়।

সংগোপনে, হয়তো সযত্নেও, প্রায় প্রতিটি শিল্পীর মনে একটি ইচ্ছে লালিত—আমি তাদের শিল্পনিষ্ঠার কথাই বলতে চাইছি। অথচ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রায়শই তাঁদের ধারণা যৌক্তিক নয়। 'মৎসদৃশ মহতের জন্যেই শিল্প'—এমনতর ভাব অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের আচার-আচরণে ফুটে ওঠে। অথচ শিল্পবিজ্ঞান কখন-ই বৈশেষিক বা আবশ্যিক নয়, বরং ঐচ্ছিক। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম পুরোহিত পল ভালেরির উক্তি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য : 'প্রতিটি কর্মের-ই ফলপ্রাপ্তি আছে এবং সে ফল পূর্বকৃত কর্মের-ই, অন্য কিছুর নয়। শিল্প-কর্মও যেহেতু একটি কর্ম, অতএব এরও ফলপ্রাপ্তি আছে। এবং সেটি শিল্পসম্পর্কিত-ই'। তিনি আরও বলেছেন : 'শিল্পী কলাকর্মে বৃত হয় তিনটি প্রেরণায়—অর্থ, যশ অথবা শিল্পের স্বকীয় স্বার্থে'।

এ বিষয়ে আমরাও একমত যে প্রতিটি শিল্পকর্মেরই ফলপ্রাপ্তি আছে। কিন্তু আপত্তি সেখানে, যেখানে এই ফলপ্রাপ্তিকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। আসলে শিল্পের ফলপ্রাপ্তি আরও একটি মহত্তর উদ্দেশ্যের প্রাগুপকারণ; এবং এই মহত্তর উদ্দেশ্যটি হল সুখ অন্বেষণ। শিল্পের সাধারণ লক্ষ্য মানুষের সুখ—আরিস্ততলের এই শিল্পমতটি মধ্যযুগের সর্ববিদ্যা সংগ্রাহকগণ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে। সুখবাদই যে মানুষের চরম লক্ষ্য এবিষয়ে অধিকাংশ দার্শনিকই আজ ঐকমত। এ বিষয়ে অভিজাত শ্রেণীর চিন্তা যতটা আদর্শনিষ্ঠ ততটা কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ নয়। বরং শাস্ত্র বচন তুলনায় বরেণ্য; সুখস্পৃহাই আমাদের জীবনকে ধারণ করে আছে, এর-ই অন্য নাম ধর্ম। বক্তব্য এই, এখানেও একটা সীমা আছে এবং তাই শিল্পের উৎস। দুর্দান্ত ঔদরিক বিনা কেই বা বলে খাদ্য গ্রহণ-ই জীবনের লক্ষ্য।

বস্তুত, অর্থ কিংবা যশ অথবা শিল্পের স্বকীয় স্বার্থ-প্রেরণা রূপে এদের কোনটাই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। অর্থাগম-ই যেখানে লক্ষ্য, বলাই বাহুল্য, শিল্পস্বার্থ সেখানে গৌণ; সুতরাং পর্যাপ্ত অর্থাগম এবং নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষণ শিল্পকারের পক্ষে ঈপ্সিত হলেও সতত সম্ভব নয়। যশ সম্পর্কে বক্তব্য, যদিচ শিল্পী মাত্র-ই যশঃপ্রার্থী এবং যশঃ ব্যক্তি-কেন্দ্রী তথাপি মহৎ শিল্পের সামান্য লক্ষণ সমবেত সহায়তা। এমন কি প্রকৃতিও এখানে নেপথ্যে নয়। অপিচ, কারু কারু মতে তিনিই হলেন যন্ত্রী আর বিশ্বকর্মার কুমারগণ হলেন যন্ত্র। তিনি যেমন চালান তাঁরা তেমন চলে। কুমারগণের পথ চলাতেই আনন্দ, পথের শেষে কি আছে তা কে জানে। কিন্তু আমরা জানি সেই পথের শেষেই ঘন আঁধারে শিল্পের ধ্রুব তারাটি জাজ্বল্যমান। সর্বশেষে শিল্পের স্বকীয় স্বার্থের প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে একটি তুলনীয় উপমা, ভাষা। ভাব বিনিময়ের মধুর মাধ্যম যেমন ভাষা, কলাকর্ষণও তেমন জাগতিক কার্যাবলীর সহায়ক প্রাগুপকারণ।

শিল্পের উৎপাদন ক্ষেত্রে জীবিকার সঙ্গে রুচির সংঘাত পরিণাম শোচনীয়। উৎপাদন বৃদ্ধিই যার একমাত্র লক্ষ্য, গুণগত উৎকর্ষতা সম্পর্কে নিস্পৃহ ঔদাস্য তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কেননা, এ বিষয়ে সে তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়। কিন্তু জীবিকার সঙ্গে রুচির সম্পর্ক স্থাপনে যে কর্মকার সমর্থ সে শুধু সানন্দে শিল্পকর্মে ব্যাপৃত থাকে না, গুণগত উৎকর্ষবিধান ও তার-পক্ষে সম্ভব। এবং এমত অবস্থাই শিল্পস্বার্থে শুভঙ্কর। অন্যথা, পারিপার্শ্বিকের চাপে

যদি শিল্পকারের শৈল্পিক সৌকুমার্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে তবে সন্দেহ নেই, সেটি শিল্পদেবতার ও প্রয়াণলগ্ন বলে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গসূত্রে প্লেটোকে স্মরণ করা যায় ঃ আকারে অধিক, পরিণামে রমণীয় অথচ কর্মে আনন্দ পেতে হলে জীবিকার সঙ্গে রুচির মেলন প্রয়োজন। যন্ত্রসভ্যতার অভিশাপে আজ এই অভিরুচি আত্মপ্রকাশে স্বত-ই কুণ্ঠিত।

কলাকর্ষণ প্রসঙ্গে কেন জানিনা প্রতিভার প্রসঙ্গও পারা হয়। শুনতে পাওয়া যায়, প্রতিভা নাকি কলাচর্চায় আবশ্যক অঙ্গ। অথচ এমন ভ্রান্তিমূলক ধারণা আর হয় না। পূর্ব আলোচনার সূত্রে ধরেই বলা যায় শিল্পমাত্রই জীবনঘনিষ্ঠ। সুতরাং অতীন্দ্রিয় প্রতিভার সঙ্গে তার সহ অবস্থান কুত্রাপি সম্ভব নয়, বরং অনভিপ্রেত। নিয়ত অনুশীলনের ফলে শিল্পী কতগুলি বিশেষগুণ আয়ত্ত করে। সম্ভবত তাকেই প্রতিভা বলে ভুল করা হয়। অথচ প্রতিভার দৌলতে মানব সমাজ কস্মিনকালেও কৃতার্থ নয়। বরং চিরকালই প্রতিভা শিল্পের পক্ষে শত্রু। কেন না, যে মানবিকতা শিল্পের মৌল লক্ষণ প্রতিভার পক্ষে তা পরিপন্থী। স্মরণীয়, জগতের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি সব-ই মানবিক, অতিমানবিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, মহৎ কথাটি তো আপেক্ষিক? ঈষৎ বক্র করে বলা যায়, মহৎ সৃষ্টি অর্থে নিশ্চয়ই এই নয়, যা মানুষের সমাজ থেকে বা স্বকাল থেকে পলাতক। সোজাসুজি, মহৎ সৃষ্টি হচ্ছে সেই অমৃত ফলটি যেটি একান্তই কলাকর্ষণের উপহার। বিশদ করে বলা যায়, এই ফলপ্রাপ্তির মৌলসর্ত একনিষ্ঠ শিল্প জিজ্ঞাসা; এবং এটি একমাত্র অপেশাদার শিল্পনবীশের পক্ষেই সম্ভব। মহৎ সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ্য,, স্রষ্টার বিচরণ স্থল শুধু স্বকালেই সীমায়িত নয়, অনাগত ভবিষ্যতেও। এবং পৃথ্বী যখন বিপুলা তখন মহৎ সৃষ্টির ব্যাপ্তি ও ব্যাপক। আর একথা কে অস্বীকার করবে, উত্তর-সুরীর উপর প্রভাব, পারতপক্ষে তৎ-কর্তৃক সাদরস্মরণ প্রতিটি মহৎ শিল্পীর আন্তর অভিলাষ। বলা প্রয়োজন, আর্টম্যুজিয়ামে মহৎ শিল্পের সংগ্রহ-ই বাঞ্ছনীয়।

শিল্প ও প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা চলে, প্রতিভা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রী, শিল্প সমবেতচেষ্টার ফলশ্রুতি। অলৌকিকত্ব প্রতিভার লক্ষণ, অসামাজিকত্ব এর চারিত্র।

অন্তে নিবেদন এই, শিল্পের সাংপ্রতিক অবক্ষয়ের কারণ শুধু সামাজিক অস্থিতি-ই নয়, লুব্ধ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও। আর, এই প্রলোভন প্রাবল্যের মূলে রয়েছে লাভের প্রবণতা। কি করে অধিক অর্থ উপার্জন করা যায় এই হচ্ছে শিল্পশ্রমিকের মনোবাসনা। অগ্রে রুটি রোজগার পরে ন্যায়নীতি—এই তাদের শ্লোগান। অথচ, শিল্পগুণবিযুক্ত শিল্পচেষ্টা সোনার পাথর বাটির মতই হাস্যকর। এর পরিণাম গোলন্দাজের গোলাবর্ষণের মতই প্রাণান্তকর; এর পরিণতি মানুষের মানুষিক সত্ত্বার বিলোপন। তবে তফাৎ এই, একটির ইচ্ছে অনন্যোপায় হয়ে আত্মরক্ষা, অপরটির জ্ঞাতসারে আত্মহত্যা।

অনুবাদক ঃ বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

কলকাতার প্রতিরক্ষা—১৭৪২

চণ্ডী লাহিড়ী

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, কিন্তু পশ্চাদপট স্বতন্ত্র। যে মারাঠাদের দেশপ্রেম ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নব নব অধ্যায় রচনা করেছে, যাদের স্বাদেশিকতার মন্ত্র বীজমন্ত্ররূপে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রভাত-সন্ধ্যায় উচ্চারিত হয়েছে ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে তারাই একদা "আক্রমণ" করেছিল বাংলা দেশ। কিন্তু কলকাতা কলকাতাই, আজ যেমন সম্ভাব্য বৃহত্তর যুদ্ধের পটভূমিকায় কলকাতাকে রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেদিনও মারাঠা-আক্রমণের ভয়ে উদ্বেগকাতর সহরবাসী ও কোম্পানীর কর্মচারীরা কলকাতাকে রক্ষার জন্য সামরিক-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

এখনকার জি, পি, ও, কাষ্টমস্ হাউস ইত্যাদি এলাকায় জুড়ে ছিল তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম। ১৭৪২ সালে এখানে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিনশো এবং ওর্মের বিবরণ অনুসারে, প্রাণের দায়ে ইংরেজরা দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে পাঁচশোজনের এক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন মারাঠা-খাল খননের উদ্যোগ শেষ পর্যায়ের। বেঙ্গল পাব্লিক কনসালটেসনের ফোর্ট উইলিয়ম সম্মর্কিত নথিতে (২০শে এপ্রিল, ১৭৪২) লেখা আছে বর্ধমান ও রাধানগর থেকে আমাদের মার্চেন্টরা এবং কাসিমবাজার থেকে সার ফান্সিস রাসেল ১৬ এপ্রিল যে বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় মারাঠারা যে-কোন সময় এই অঞ্চল আক্রমণ করতে পারে। কাজেই এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে ফোর্ট উইলিয়মের ক্যাপ্টেন কম্যান্ডাণ্ট উইলিয়ম হলকম্ব অবিলম্বে ক্যাপ্টেন জন লয়েড, ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড ফ্রেডারিক রীড এই দুজন গানার ও সার্ভেয়র জন আলিফজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা সহর পর্যবেক্ষণ করুন এবং কলকাতায় আক্রমণকারীদের সম্ভাব্য প্রবেশ রোধ করার জন্য তাঁর সুপারিশ লিখিতভাবে পেশ করুন।' ক্যাপ্টেন হলকম্ব দুদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিলেন। ওদিকে খবর এল মারাঠারা নবাব সৈন্যের প্রায় মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। অতএব কলকাতায় পৌঁছাতে দেরী নেই। হলকম্বের রিপোর্ট দ্রুত কার্যকরী করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল।

হলকম্ব তাঁর রিপোর্টে বললেন, কলকাতা সহরকে রক্ষা করতে হলে আরও উন্নত ধরণের সেনাবাহিনী গড়ে তোলা দরকার। সেটা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। আপাততঃ কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণস্থানে নিম্নোক্ত ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ক) শেঠদের বাগানবাড়ীর (বিডন স্কোয়ার) কাছে ছ'টি কামানের একটি ব্যাটারী বসাতে হবে। তার মধ্যে চারটি কামানের মুখ থাকবে পেরিণদের বাগানবাড়ী যাওয়ার পথের (চিৎপুর রোড) দিকে, বাকী দুটি কামানের মুখ থাকবে নদীর ধারে যাওয়ার পথে (নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট)।

(খ) চারিটি কামানের একটি ব্যাটারী বসাতে হবে অষ্টাগণের কাছে (সম্ভবতঃ বর্তমান কাশীপুর ব্রীজের সন্নিকটে। পূর্বনাম সুতানুটি পয়েন্ট)

(গ) জ্যাকসন ঘাটের কাছে তিনটি কামানের এক ব্যাটারী

(ঘ) ফাঁসীঘরের কাছে (লালবাজার) তিন কামানের ব্যাটারী পশ্চিম দিকে

(ঙ) পশ্চিম দিকে প্রবেশের যাবতীয় পথের মুখ দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দিতে হবে এবং দেওয়ালের ঠিক নিচে পরিখা খনন করতে হবে। ব্যাটারী যেখানে বসানো হবে তার ঠিক নিচেও পরিখা খনন করা অবশ্য প্রয়োজন।

(চ) গোলঘাট থেকে যে পথ ক্যাপ্টেন জ্যাকসনের বাড়ীর দিকে চলেছে তার মুখেও তিন কামানের একটি ব্যাটারী স্থাপন করা দরকার। (চিৎপুর রোড ও রতন সরকার স্ট্রীটের কাছে লালাবাবুর বাজারে)

(ছ) ক্যাপ্টেন লয়েডের বাড়ীর সামনে রাস্তায় তিনটি ও ঘাটের দিকে যাবার পথে আর একটি —মোট চার কামানের ব্যাটারী (অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট প্লেস ট্রেজারী বিল্ডিংস ও বিধানসভা ভবনের সংযোগস্থলে)

(জ) দুই কামানের একটি ব্যাটারী মিঃ মর্গানের বাড়ীর কাছে, চাল-গোলার সামনে স্থাপন করা হোক (বেণ্টিক স্টীট ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের যোগস্থলে)

এই যে যে সব ছোট ছোট পথ এই বড় রাস্তা থেকে বের হয়েছে সেগুলি পুরু মাটির দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হোক। প্রয়োজনবোধে ক্যাপ্টেন রীড ও ক্যাপ্টেন পেরেরার বাড়ী ও সন্নিহিত সাঁকো ভেঙে ফেলা যেতে পারে।

২২শে এপ্রিল তারিখেই কোম্পানীর কোর্ট উপরোক্ত সুপারিশ কার্যকরী করার আদেশ দিলেন এবং তৎসঙ্গে আরও লিখলেন

(ক) কেল্লায় বারুদের অবস্থা আশানুরূপ না থাকায়, কেল্লার প্রধান গানার (Gunner) অবিলম্বে লোকজন সংগ্রহ করে বারুদ প্রস্তুত করতে সুরু করুন এবং সেই বারুদের কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা করুন।

(খ) কেল্লার মাষ্টার-অব-আর্মস অতঃপর বাইরের কাউকে কোনপ্রকার অস্ত্র বিক্রয় করতে পারবেন না। পরন্তু প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি উপযুক্ত মূল্যে এখনই কেনার ব্যবস্থা করবেন। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বক্সী বরাদ্দ করবেন এবং এই ব্যয় "এক্সপেনসেস ফর্টিফাইং দি টাউন অব ক্যালকাটা" এই খাতে খাতায় লিখবেন।

(গ) কামানবাহী গাড়ীগুলি অকেজো হয়ে যাওয়ায় তাদের মেরামতী ও প্রয়োজনবোধে পুনর্নির্মাণ করার ব্যবস্থাও অবিলম্বে করা হোক।

আদেশ দিতে দেরী হল না বটে, কিন্তু যথোচিত তৎপরতার অভাব ঘটল। কারণ খবর এল মারাঠারা বর্ধমানের ফৌজদারের পাল্টা আঘাতে হটে যাচ্ছে। অতএব কোম্পানীর কোর্টে (১০ জুলাই ১৭৪২) আবার হলকম্বের রিপোর্ট নিয়ে চুলচেরা বিচার সুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এই অভিমত প্রকাশিত হল যে, পরিকল্পনাটি ব্যয়সাপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কিছু করা যায় কিনা সেই পথ নির্ধারণ করা হোক। আবার ডাক পড়ল হলকম্বের। হলকম্ব আবার সহরটি সার্ভে করলেন। বললেন—পাটনা থেকে মিঃ ফরেষ্টিকে আনিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করানো হোক। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কেল্লার দেওয়ালে প্যারাপেট বানিয়ে অন্ততঃ দশটি বড় কামান (সুইভেলগান) সজ্জিত করা চলতে পারে। কেল্লার অবস্থা ভাল নয়। সমগ্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। অসংখ্য ত্রুটি, শত্রুর সামান্যতম আঘাত পর্যন্ত এই কেল্লা সহ্য করতে পারবে না।

পাটনা থেকে ফরেষ্টি এলেন, সব কিছু পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন। ১লা নভেম্বর কোর্টের বৈঠকে পেশ করা হল সেই রিপোর্ট। বাধা দিলেন মেজর নাইবা। বললেন, এত ব্যয়সাপেক্ষ পরিকল্পনা প্রায় বিলাসিতার সামিল। তার চেয়ে বরং কেল্লার চারিদিকে পাকা

ইঁটের প্রাচীর গাঁথা হোক। ইঁটের আয়তন যদি ১২ বা ১৬ বর্গইঞ্চি করা হয় তাতে চুণের খরচ কম হবে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে টাওয়ার বানিয়ে সেখানে কামান বসালেই যথেষ্ট কাজ হবে।

মেজর নাইপের বক্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আর সম্ভব হল না। কারণ খবর এসে গেল, হুগলীর কেল্লা মারাঠারা দখল করেছে। কলকাতার কেল্লা রক্ষার জন্য কলকাতার কোর্ট যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তার হিসাব লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে প্রেরিত চিঠিগুলিতে পাওয়া যায়।

(ক) চারটি পানসি নদীতে রাখা হয়েছে গোপন সংবাদ আনবার জন্য। রাত্রে নগর পাহাড়া দেওয়ার জন্য কলকাতার চৌকীতে দুশো বক্সারী বসানো হয়েছে।

(খ) গানরুমে একশো লোক নিয়োগ করা হয়েছে। খাদ্যশস্যও মজুদ করা হয়েছে

(গ) ১২০টি মস্কট গান কেনা হল।

(ঘ) ৫০০ তলোয়ার কেনা হল। দাম প্রতিটির মাদ্রাজী দু'টাকা

(ঙ) মাদ্রাজ থেকে ৭৫০টি বড় কামান পাওয়া গেছে।

ফরেষ্টি কলকাতাকে সুরক্ষিত করার জন্য যে পরিকল্পনা দাখিল করেছিলেন তাতে কয়েকটি খাল ডোবা ভরাট করা, ও সাঁকো ভেঙ্গে ফেলা ছাড়াও প্রধান প্রস্তাব ছিল কেল্লার চারিদিকে প্রাচীর বসানো। তিনি ছোট, মাঝারী ও বড় এই তিন রকমের পরিকল্পনাই পেশ করেছিলেন, এবং ব্যয়ের হিসাবও দিয়েছিলেন।

প্রথম বড় পরিকল্পনায় ১৬ হাজার ফিট লম্বা ৩০ ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট চওড়া প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে

প্রতি কিউবিক ৩৫ মাদ্রাজী টাকা হিসাবে

	৩৫৩৪১১	মাদ্রাজী টাকা
বাড়ীঘর ভাঙ্গতে	১০০০০০	
	৪৫৩৪১১	টাকা

মাঝারী পরিকল্পনা, একই হিসাবে

	১৯১৬৯১	টাকা
বাড়ীঘর ভাঙ্গতে	৫০০০০	
	২৪১৬৯১	টাকা

ছোট পরিকল্পনা, একই হিসাবে

	১৪৭২২০	
বাড়ীঘর ভাঙ্গতে	১০০০০০	
	২৪৭২২০	মাদ্রাজী টাকা

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফরেষ্টি এই এষ্টিমেট দাখিল করেন। বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে এই ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য চিঠি লেখা হল।

অল্পদিনের মধ্যেই শোনা গেল মারাঠীরা এসে পড়েছে। যে-কোন সময় লুঠতরাজ সুরু হতে পারে। কলকাতার কেল্লা তো বিচলিত হলই, অসামরিক অধিবাসীরাও এবার প্রমাদ গুণলেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব করলেন, খাল খনন করা হোক। নগরের পশ্চিম দিকে তো গঙ্গা আছেই, উত্তর ও পশ্চিম দিকে খাল কেটে স্থলপথে 'শত্রুর আগমন রোধ করা হোক।

প্রায় পাঁচশো দেশী জওয়ান কেল্লায় গিয়ে সমর কৌশল, বিশেষতঃ কামান দাগার কায়দা দুরস্ত করতে লাগলেন।

মার্চ মাসে শোনা গেল তারা এসে গেছে। একেবারে শিয়রে। কাজেই কোম্পানী আর দ্বিধা করলেন না। অসামরিক ব্যবসায়ীরা পরিখা খননের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কোম্পানী তাতে সায় দিলেন। ব্যয় বহন করবে ব্যবসায়ীরা, কে কত চাঁদা দেবেন সেটী জমিদার স্থির করে দেবেন। তবে কাজ যাতে এখনই সুরু হয়ে যায় তজ্জন্য কোম্পানী ২৫ হাজার টাকা ধার দিতে রাজী। এই টাকা শ্রীবিষ্ণুদাস শেঠ, রামকিষেণ শেঠ, রাসবিহারী শেঠ ও উমিচাঁদ তিন মাসের মধ্যে আদায় করে দেবেন।

মোট সাত মাইল পরিখা খননের প্রস্তাব ছিল। যখন তিন মাইল শেষ হয়েছে তখন শোনা গেল মারাঠারা চলে গেছে। আর আক্রমণের ভয় নেই। অতএব খাল খনন বন্ধ হল, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও ধামাচাপা রইল।

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর
রামমোহন	বৌ ঠাকুরাণীর হাট ও		প্রথম
	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)		নবম
	ও		
	পরিত্রাণ (নাটক)		বিংশ
রামলোচন	গল্পগুচ্ছ	মধ্যবর্ত্তিনী	অষ্টাদশ
রামলোচন চক্রবর্তী	ঐ	শাস্তি	ঐ
রামলোচন রায়	গল্পগুচ্ছ	একরাত্রি	সপ্তদশ
রামসুন্দর	ঐ	দেনা পাওনা	পঞ্চদশ
রাসমণি	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
রাসমণি	ঐ	দান-প্রতিদান	সপ্তদশ
রুক্মিনী	বৌঠাকুরাণীর হাট		প্রথম
রুদ্রনারায়ণ বক্সী	ব্যঙ্গ কৌতুক	নূতন অবতার	সপ্তম
রোশনী	মালঞ্চ		দ্বাদশ
রোহিণী	রাজা		দশম
রেবতী	রাজা ও রাণী		প্রথম
রেবতী ভট্টাচার্য	তিনসঙ্গী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
লছমন	মুক্তধারা		চতুর্দশ
ললিত	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও উনবিশ
ললিত চক্রবর্ত্তী	গল্পগুচ্ছ	দুর্বুদ্ধি	দ্বাবিংশ
ললিত সিংহ	ঐ	রীতিমত নভেল	সপ্তদশ
ললিতা	গোরা		ষষ্ঠ
লক্ষ্মী	বাল্মীকি প্রতিভা		প্রথম
লক্ষ্যেশ্বর	ঋণশোধ		ত্রয়োদশ
লাবণ্য	শেষের কবিতা		সপ্তম
লাবণ্যলেখা	গল্পগুচ্ছ	রাজটিকা	দশম
লিলি গাঙ্গুলী	শেষের কবিতা		একবিংশ
লিসি	ঐ		দশম
লীলা	গোরা		ঐ
লীলা	বাঁশরি		ষষ্ঠ
লীলানন্দ স্বামী	চতুরঙ্গ		চতুর্বিংশ
লোকেশ্বরী	নটীর পূজা		সপ্তম

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
শচী	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয় প্রহসন	অষ্টাদশ
শচীন	বাঁশরি		সপ্তম
শচীন	চতুরঙ্গ		চতুর্বিংশ
শমিতা (সিসি)	শেষের কবিতা		সপ্তম
শর্মিলা	দুইবোন		দশম
শম্ভু	গল্পগুচ্ছ	শেষের রাত্রি	একাদশ
শম্ভুনাথ সেন	ঐ	অপরিচিতা	ত্রয়োবিংশ
শরৎ	ঐ	সমাপ্তি	অষ্টাদশ
শরৎ	ঐ	স্ত্রীর পত্র	ত্রয়োবিংশ
শরৎ	ঐ	আপদ	ঊনবিংশ
শশধরবাবু	শোধবোধ ও কর্মফল		সপ্তদশ দ্বাবিংশ
শশাঙ্ক	দুইবোন		একাদশ
শশিকলা	গল্পগুচ্ছ	দিদি	ঊনবিংশ
শশিভূষণ	ঐ	মেঘ ও রৌদ্র	ঐ
শশিভূষণ	ঐ	দান ও প্রতিদান	সপ্তদশ
শশিমুখি	গোরা		ষষ্ঠ
শশিশেখর	গল্পগুচ্ছ	কংকাল	
শশী	ঐ	দুর্বুদ্ধি	দ্বাবিংশ
শংকর	ঐ	গুপ্তধন	ঐ
শংকর	রাজা ও রাণী ও তপতী		প্রথম একবিংশ
শান্তা	মায়ার খেলা		প্রথম
শারদা শংকর	গল্পগুচ্ছ	জীবিত ও মৃত	সপ্তদশ
শিবচরণ	গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা		তৃতীয় ও ঊনবিংশ
শিবনাথ	গল্পগুচ্ছ	স্বর্ণমৃগ	সপ্তদশ
শিবনাথ পণ্ডিত	ঐ	গিন্নী	পঞ্চদশ
শিবতোষ	চতুরঙ্গ		সপ্তম
শিলাদিত্য	তপতী		একবিংশ
শিশির	গল্পগুচ্ছ	হৈমবতী	ত্রয়োবিংশ
শীতলা	ব্যঙ্গ-কৌতুক	স্বর্গীয়-প্রহসন	সপ্তম
শোভনলাল	শেষের কবিতা		দশম
শেখর	গল্পগুচ্ছ	জয় পরাজয়	সপ্তদশ
শেখর কবি	ঋণশোধ		দশম
শৈল		গৃহ প্রবেশ	সপ্তদশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
শৈলজা	নৌকাডুবি		পঞ্চম
শৈলবালা	গল্পগুচ্ছ	মধ্যবর্তিনী	অষ্টাদশ
শৈলবালা	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
শৈলবালা	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিরকুমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
শৈলেন	গল্পগুচ্ছ	চোরাইধন	চতুর্বিংশ
শৈলেন্দ্র	ঐ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
শ্যামা	শ্যামা		পঞ্চবিংশ
শ্যামাচরণ	গল্পগুচ্ছ	রাসমণির ছেলে	দ্বাবিংশ
শ্যামাপদ	ঐ	গুপ্তধন	ঐ
শ্যামাশংকরী	ঐ	প্রায়শ্চিত্ত	উনবিংশ
শ্যামাসুন্দরী	যোগাযোগ		নবম
শ্যামাসুন্দরী	ব্যঙ্গ কৌতুক	বশীকরণ	সপ্ত
শ্রীপতি	গল্পগুচ্ছ	পাত্র ও পাত্রী	ত্রয়োবিংশ
শ্রীপতি	গোড়ায় গলদ ও		তৃতীয় উনবিংশ
শ্রীপতি চাটুয্যে	গল্পগুচ্ছ	ত্যাগ	সপ্তদশ
শ্রীপতিচরণ	ঐ	জীবিত ও মৃত	ঐ
শ্রীবিলাস	চতুরঙ্গ		সপ্তম
শ্রীমতী	নটীর পূজা		অষ্টাদশ
শ্রীশ	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও চিবকমার সভা		চতুর্থ ও ষোড়শ
শ্রুতিভূষণ	ফাল্গুনী		দ্বাদশ
ষষ্ঠীচরণ	গল্পগুচ্ছ	মুক্তির উপায় (গল্প) ঐ (নাটক)	ষোড়শ ও ষড়বিংশ
ষোড়শী	গল্পগুচ্ছ	তপস্বিনী	ত্রয়োবিংশ
স্কন্দকিশোর	হাস্য-কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
সঞ্জয়	মুক্তধারা		চতুর্দশ
সঞ্জীব	অচলায়তন ও গুরু		একাদশ ও ত্রয়োদশ
সতীশ	গোরা		ষষ্ঠ
সতীশ	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
সতীশ	গল্পগুচ্ছ	জীবিত ও মৃত	সপ্তদশ
সতীশ	ঐ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
সতীশ	শোধবোধ		সপ্তদশ
	ও		ও
	কর্মফল		দ্বাবিংশ
সতীশ	গল্পগুচ্ছ	আপদ	উনবিংশ
সত্যবতী	ঐ	চিত্রকর	চতুর্বিংশ
সনাতন দত্ত	ঐ	ভাইফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
সনৎকুমার	ঐ	পাত্র ও পাত্রী	ঐ
সন্দীপ	ঘরে-বাইরে		অষ্টম
সরলা	মালঞ্চ		দ্বাদশ
সরস্বতী	বাল্মীকি প্রতিভা		প্রথম
সরোজ	গল্পগুচ্ছ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ
সাতকড়ি	গোরা		ষষ্ঠ
সাতুখুড়ো	হাস্য-কৌতুক	অভ্যর্থনা	ঐ
সাধুচরণ	ঐ	ঐ	ঐ
সিতাংশু মৌলী	গল্পগুচ্ছ	পয়লা নম্বর	ত্রয়োবিংশ
সিসি	শেষের কবিতা		দশম
সীতারাম	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (গল্প)		প্রথম
	ও		
	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)		নবম
	ও		
	পরিত্রাণ (নাটক)		বিংশ
সুকুমারী	শোধ-বোধ		সপ্তদশ
			ও
	ওকর্মফল		দ্বাবিংশ
সুখদা	গল্পগুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
সুচরিতা	গোরা		ষষ্ঠ
সুচেত সিংহ	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
সুজা	ঐ		ঐ
সুদর্শনা	অরূপ রতন		ত্রয়োদশ
	ও ,		ও
	রাজা		দশম
সুধা	গল্পগুচ্ছ	শুভদৃষ্টি	দ্বাবিংশ
সুধা	ডাকঘর		একাদশ
সুধামুখী (সুধো)	গল্পগুচ্ছ	মানভঞ্জন	বিংশ
সুধাংশু	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
সুধীর	গোরা		ষষ্ঠ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড
সুনেত্রা	গল্পগুচ্ছ	চোরাই ধন	চতুর্বিংশ
সুপ্রিয়	মালিনী		চতুর্থ
সুবর্ণ	রাজা ও অরূপ রতন		দশম ও ত্রয়োদশ
সুবলচন্দ্র	গল্পগুচ্ছ	ইচ্ছাপূরণ	বিংশ
সুবোধ	ঐ	ভাইফোঁটা	ত্রয়োবিংশ
সুবোধ	ঐ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
সুবোধ	যোগাযোগ		নবম
সুভদ্র	অচলায়তন ও গুরু		একাদশ ও ত্রয়োদশ
সুভাষিনী	গল্পগুচ্ছ	সুভা	সপ্তদশ
সুমন	মুক্তধারা		চতুর্দশ
সুমিত্রা	রাজা ও রানী ও তপতী		প্রথম ও একবিংশ
সুরঙ্গমা	রাজা ও অরূপরতন		দশম ও ত্রয়োদশ
সুরবালা	গল্পগুচ্ছ	একরাত্রি	সপ্তদশ
সুরমা	শেষের কবিতা		দশম
সুরমা	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট গল্প ও প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) ও পরিত্রাণ (নাটক)		প্রথম ও নবম ও বিংশ
সরেশ	চার অধ্যায়		ত্রয়োদশ
সুশীলচন্দ্র	গল্পগুচ্ছ	ইচ্ছা পূরণ	বিংশ
সুষমা	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
সুসীমা	ঐ		ঐ
সোণামণি	গল্পগুচ্ছ	অতিথি	বিংশ
সোমপাল	ঋণ শোধ		ত্রয়োদশ
সোমশংকর সিং	বাঁশরি		চতুর্বিংশ
সোমাচার্য	মালিনী		চতুর্থ
সোহিনী	তিনসঙ্গী	ল্যাবরেটরী	পঞ্চবিংশ
সৌরভী	গল্পগুচ্ছ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ

সাহিত্য সংবাদ

জার্মান প্রাণশক্তি ১৮৭১ সালে যখন নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের অবিভাবকত্বে নবজীবন লাভ করল তখন আয়রণ চ্যান্সেলার বিসমার্কের বজ্রমুষ্ঠিতে সেই নবলব্ধ মুক্ত তরণীর হাল শান্ত এবং সুস্থির। সে সময়ের জার্মান সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব স্তিমিত না হলেও সেই ধারা বেগবতী ছিল না কারণ জীর্ণ ভাবনা স্রোতের মাঝে তখন এখানে ওখানে চর জেগেছে। বিসমার্কের শঙ্কাকুল দৃষ্টি বারে বারে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পাতায় পাতায় ঘোরাফেরা করে আর তিনি রেহ্নিসের সেই বিতাড়িত ইহুদী সাংবাদিক কার্ল মার্কসের মুণ্ডপাত করেন। মার্কসের রচনায় বিদ্রোহের জ্বলন্ত ইংগিতের কথাগুলি স্মরণ করে লৌহমানব বিসমার্কের মন শঙ্কায় ভরে ওঠে আর অস্থির হয়ে নূতন নূতন আইনের সহায়তায় অর্ধমৃত সামন্ততন্ত্রের ধমনীতে নীলরক্তের সুষ্ঠু সূচীপ্রয়োগের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধ বিসমার্কের নিদ্রাভঙ্গ হয় এক অজানা আতঙ্কে, তিনি বিহ্বল হয়ে পুনরায় নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হন কিন্তু ঘুমের মাঝে তাঁর মনে হয় যেন এক বিশাল ক্ষুব্ধ জনতার চাপা গর্জন ক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে সবকিছু ভেঙে চুরমার করতে চাইছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটে চিন্তার বলীরেখা নিয়তই এলোমেলোভাবে ফুটে ওঠে, তিনি ভাবেন এঁরা কারা? এ কাদের কণ্ঠস্বর?

যদিও এঁদের ঠিক স্পষ্টরূপটি স্বচ্ছদৃষ্টির সীমারেখায় তিনি আনতে পারেননি, কিন্তু যাঁদের তিনি চিনেছেন তাঁদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে তাঁর মন আরও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা ওয়েলট্‌পলিটিক্‌ নামক রাজনীতির যে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছেন তার গতিরোধ করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নয় একথা চিন্তা করে বিসমার্ক মুহ্যমান। নব জার্মান সাম্রাজ্যের এই নূতন আলোড়নের কবল থেকে অতীতের সেই মহান ঐতিহ্যকে রক্ষার দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধ চ্যান্সেলার যখন প্রায় হতবুদ্ধি তখন প্রুশিয় নৃপতি দ্বিতীয় হ্বিলহেলম্‌ জার্মান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ১৮৯৮ সালে আরোহণ করেন। যুবক সম্রাট হ্বিলহেলম্‌ জনমতের চাপে বৃদ্ধ বিসমার্ককে পদচ্যুত করে তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটান, ফলে সমগ্র জার্মানীর প্রাণশক্তিতে তথাকথিত নবজাগরণের জোয়ার লাগল এবং কর্মচাঞ্চল্যে সে তখন হল দুর্বার। কিন্তু সেই জোয়ার যে জার্মানিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে সেকথা বিসমার্ক সম্ভবতঃ পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলেন। যন্ত্রযুগের আকস্মিক আঘাতে জার্মান সমাজের নীল-ভিত্তিপ্রস্তাবে চিড় খেয়ে তখন তিনটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, যন্ত্রের পেষণে যে দুটি শ্রেণী জন্ম নিয়েছে তাদের মধ্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একদিকে 'নীলরক্ত' ঐতিহ্যের পতাকাবাহীর দল অন্যদিকে আন্দোলনকারী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শ্রমিককুল। দ্বিতীয় হ্বিলহেলমের রাজ্যভার গ্রহণে জার্মানরা আশ্বস্ত হল বটে কিন্তু তারা হারাল এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ চিন্তানায়কের শুভাকাঙ্খা। লৌহমানব অটো এডুয়ার্ড লিওপোল্ড ফন্‌ বিসমার্ক তখন অবসরের শান্তিনীড়ে বসে বোধহয় আপনমনে অট্টহাস্য করলেন কারণ জার্মানি যে সর্বনাশা নীতির ফাঁদে পা দিয়েছে তার শেষচিত্র যে কি হবে তা বোধ হয় তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। আজ সকলেই স্বীকার করেন যে দুটি মহা-

যুদ্ধের ধ্বংসলীলা জার্মানীর কপালে জুটেছে তার বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংসাত্মক ওয়েলট্‌পলিটিকের জন্যই এবং সেই ওয়েলট্‌পলিটিকের মূলোৎপাটন বিসমার্ক করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর পতন ঘটেছিল, কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তিনি ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি বরং ইউরোপের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তানায়ক হিসাবে আজও তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

সমাজের কাঠামো যখন ভেঙেচুরে নূতন রূপ নেয় তখন তার প্রভাব সর্বস্তরেই বিস্তারিত হয়। ব্যক্তি, বস্তু, সাহিত্য, শিল্প এবং সংগীত কিছুই রেহাই পায় না। নূতন জার্মানির প্রাক্‌পত্তনিযুগের সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের রূপটি যখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে ঠিক তখনই এই সমাজ বিবর্তনের ফলে জার্মান সাহিত্যে প্রচলিত রীতিদুর্গের প্রাচীরে এক বিরাট ফাটল ধরল আর তারই মধ্য দিয়ে নূতন আলোর প্রক্ষেপণ ঘটল এবং জার্মাণীর নব্যসমাজ তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যের দুটি তির্যক রশ্মির দিকে তাকিয়ে রইল। জার্মান সমাজের এই বিশ্লেষাত্মক মানসিকতার একমাত্র লক্ষ্য হল যে সেই বিশেষ সাহিত্যরীতির ফসল প্রাণ-পদার্থমণ্ডিত কিনা। অবশ্য ইতিহাস আজ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেই রশ্মিদুটি কিছু অলীক ছিল না বরং তার প্রভাবে জার্মান সাহিত্যরীতিতে যে অতুলনীয় প্রয়োগধারার প্রবর্তন হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসনের অধিকারী। ন্যাচুরালিজম্‌ এবং ইম্প্রেসিনিজম্‌ এই দুটি বিশিষ্ট সাহিত্যরীতির প্রচলন ধীরে ধীরে রোমান্টিসিজমের মূলে কুঠারাঘাত করে জার্মান সাহিত্য-পাঠকদের মনে এক নূতনত্বের স্বাদ এনে দেয়।

জার্মান সাহিত্যে ন্যাচুরালিজম এবং ইম্প্রেসিনিজমের প্রথম যুগে দুজন সাহিত্যিকের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেটলেফ্‌ ফন্‌ লিলিয়েনক্রণ এবং থিওডোর ফন্‌টেন ছিলেন উত্তর জার্মানীর অধিবাসী। এঁরা যখন ইংগিতধর্মী সাহিত্য রচনায় নূতন নূতন দৃষ্টির চিহ্ন অঙ্কন করে চলেছেন তখন জার্মানির দক্ষিণপ্রান্তে সিলেশিয়ায় এক নূতন কবির উদাত্ত কণ্ঠ জার্মানির নব্য সমাজকে এক নূতন গান শোনাল যার সুর এবং ভাষা ইস্পাতশীতল স্পর্শের মত যন্ত্রণা নেই কিন্তু তীক্ষ্ম বেদনাবোধ আছে। তার নাটকের পাত্রপাত্রীগণ সমাজের নীচুতলার আশা-আকাঙ্খার কথা বলে যার ব্যঞ্জনা দর্শকের মনে কান্নাহাসির ঢেউ তোলে আর তাঁদের মধ্যে নবচেতনার সূক্ষ্ম জাল বোনে। ফনটেন এই নূতন কবির রচনার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে নূতন কবি **গেরহার্ট হাউপ্টমান** হবেন তাঁদের সৃষ্ট ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী।

গেরহার্ট হাউপ্টমান ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর জার্মানির সিলেশিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ওবার-সালজব্রুণ গ্রামে (বর্তমানে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) জন্মগ্রহণ করেন। হাউপ্ট-মানের পিতামহ সাধারণ শ্রমিক থেকে হোটেলের কর্মচারী হন, পরে তিনি নিজেই এক হোটে-লের মালিক হন এবং কালক্রমে হোটেলটির বেশ সুনাম হয়। হাউপ্টমানের বাল্যকাল সেই হোটেলকে ঘিরেই কাটে এবং রুক্ষ কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর পরিচয় ঘটে। মানু-ষের প্রতি সহানুভূতির বীজ হাউপ্টমানের মনে বপন করেন তাঁর স্নেহশীল পিতামহ। সে বীজমন্ত্র হাউপ্টমনের মনে এক অচিন রাগিনীর সুর তুলত তখন কিন্তু পরে তা মেঘমন্দ্র ধ্বনির রূপ গ্রহণ করে তাঁকে হতভাগ্যের কবিতে পরিণত করেছিল। আজীবন তিনি এক অস্থির তাড়নায় ছন্নছাড়াদের যে জীবনবেদ রচনা করে লেখনী সার্থক করেছেন তার সর্বাত্মক মূল্যায়ন সম্ভবত এখনও হয়নি।

ওবার-সালজব্রুণে কিছুদিন শিক্ষাগ্রহণের পর হাউপ্টমানের পিতা তাঁকে ব্রেস্‌লোর এক

বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার ক্লাসে ভর্তি করে দেন কিন্তু কৃষিবিদ্যা তাঁর ভাল লাগেনি কারণ হাউ-প্টমানের প্রকৃতি ছিল শিল্পীসুলভ তাই কৃষিবিদ্যার ক্লাস ত্যাগ করে তিনি শিল্পশিক্ষার ক্লাসে ভর্তি হন এবং দুই বৎসর (১৮৮০-১৮৮১) শিল্পচর্চা করেন পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও এক বৎসর অবস্থান করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালী ভ্রমণ করে হাউপ্টমান ১৮৮৪ সালে রোম নগরীতে কৃতী ভাস্করের প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-ভঙ্গের দরুন তিনি জার্মানিতে ফিরে কিছুদিন ড্রেসডেনে বসবাস করেন পরে বার্লিনে বাসা বাঁধেন এবং নাটক রচনার উগ্র বাসনা এইখানেই তাঁর মনে জাগে বার্লিনের অনতিদূরে এর্কনার নামক স্থলে আলোছায়া ঘেরা কুটিরের নিরালা ঘরে একান্তে ২৩ বৎসরের যুবক হাউপ্টমান চঞ্চল হয়ে পদচারণা করেন আর মনে মনে ভাবেন এবং সংশয়ান্বিত হন কারণ তখনও তিনি তাঁর শিল্পসাধনার নিশ্চিত মাধ্যম সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। ভাস্কর্য্য অথবা সাহিত্য, কোনটি তাঁর পক্ষে যথোপযুক্ত হবে সে বিষয়ে তিনি দ্বিধান্বিত। ভাস্কর্য্যে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা আছে বটে কিন্তু সাহিত্য তাঁর কাছে একান্তভাবে নূতন মাধ্যম। এই দোটানায় পড়ে যখন তাঁর শিল্পসত্ত্বা পথ খুঁজে পাচ্ছিল না তখন থিওডোর ফনটেনের শেষ উপন্যাস "ডার স্টেশলিন" পাঠ করে হাউপ্টমান পথের দিশা খুঁজে পেলেন এবং সাহিত্যকেই তিনি বেছে নিলেন শিল্পচর্চার মাধ্যমরূপে। ১৮৮৫ সালে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "প্রমেথিডেনলোস" জার্মান সাহিত্য-পাঠকের হাতে তুলে দিলেন কিন্তু তদানীন্তন পাঠকসমাজ হাউপ্টমানের রচনার প্রতি তেমন আকৃষ্ট হননি কারণ জার্মান পাঠকসমাজে দেশীয় সাহিত্যিকদের তেমন কদর ছিল না। সমকালীন সমাজে এক উৎকট মানসিকতার বিলাস ছিল, ফ্রান্স, রাশিয়া অথবা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশের সাহিত্যিকগণের রচনা তাঁদের কাছে আদর্শ রূপে পরিগণিত হত, সেই কারণেই বহু সার্থক জার্মান সাহিত্যিক বিদেশীদের ছদ্মনাম গ্রহণ করে তৎকালে লেখনী ধারণ করতেন।

জার্মান সাহিত্যে ইমপ্রেসিনিষ্টিক আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত যুগল লিলিয়েনক্রন ও ফনটেন্ মানসিকতার দিক থেকে কিঞ্চিৎ প্রাচীন পন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁরা জার্মানির নবজাগরণ বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন এবং ইবসেন, ডস্তয়েফস্কি ও বয়োর্নসন প্রভৃতির রচনা তাঁদের মনে ইমপ্রেসিনিজমের ঢেউ তোলে। ১৮৮০ সালের পর থেকে জার্মান সাহিত্য সাধনায় এক নূতন আঙ্গিকের অন্বেষণে ব্রতী হন এবং শ্রমিক সমাজের দুঃখ সুখের মধ্যে তাঁরা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের কাঁচা রসদের হদিশ পান। সাধারণ স্তরের লেখকগণ যখন সেই অতি পুরাতন আঙ্গিকের সাধনা করে জার্মান সাহিত্যে প্রচুর আবর্জনা জড় করছিলেন তখন মুষ্টিমেয় কয়েক-জন শক্তিশালী লেখক নূতন কিছু করবার চেষ্টায় ফরাসী শিল্পীদের অনুসৃত ইমপ্রেসিনিজমকে আঁকড়ে ধরেন। লিলিয়েনক্রন এবং ফনটেনের নূতন প্রচেষ্টা গতানুগতিক আঙ্গিকের মূলে কুঠারাঘাত করলেও তাঁদের সৃষ্টিতে হয়ত নূতন কোন পথের দিশা ছিল না যদিও তাঁদের আঙ্গিক পাশ্চাত্যের ভোগবিলাস এবং প্রতীচ্যের নিষ্কাম দর্শনতত্ত্বের মধ্যপথে বিচরণ করে এক অভূত-পূর্ব আত্মদর্শনের ব্যাখ্যাকরণে সাহিত্যের বাঁধা সড়ক ত্যাগ করে মেঠোপথে নেমে বনফুলের বৈচিত্র্য বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

ফনটেন্ যখন হাউপ্টমানের রচনার সংস্পর্শে এলেন তখন সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বুঝেছিলেন সিলেশিয়ার এই নূতন কবি জীবনের জয়গান রচনায় জার্মান সাহিত্যের অন্য-তম কর্ণধার রূপে পরিগণিত হবেন। ১৮৮৯ সালে যখন হাউপ্টমানের "ফোর সোনেন্ অফ্ গাঙ" (বিফোর ডন) অপ্রকাশ্যে অভিনীত হল তখন তাবৎ বিদগ্ধ দর্শকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে হাউপ্টমানের এই নাটকে নূতনত্ব আছে। সলেশিয়ার খনিঅঞ্চলের দরিদ্র শ্রমিকের

দুরবস্থা এবং তাদের কুৎসিত জীবনযাপন এমনভাবে হাউপ্টমান নাটকে উপস্থাপিত করেছেন যা অবলোকন করে দর্শকগণ অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। এমন বাস্তবমুখী নাটক জার্মান সাহিত্যে হাউপ্টমানের পূর্বে রচনা করবার সাহস অর্জন করতে কেউ সক্ষম হননি। জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের মত "ফোর সোনেন অফ্ গাঙ" নাটক জার্মান মানসে এক গভীর দাগ কেটে সমসাময়িক সাহিত্যিকগণেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করল। সকলেরই মনে তখন একটি মাত্র প্রশ্ন এই যে, হাউপ্টমানের লেখনী কি জার্মান সাহিত্যকে পথের নির্দেশ দিতে পারবে?

সমগ্র দেশ যখন সংশয়ে দোদুল্যমান তখন হাউপ্টমান তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক "ডাই হেব্বার" (দি উইভারস্) ১৮৯২ সালে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিষয়বস্তু হল ১৮৪২ সালের সিলেশিয়ায় স্থানীয় তন্তবায় সম্প্রদায়গণের অভ্যুদয়। হাউপ্টমান তাঁর এই নাটকে উক্ত তন্তুবায় সম্প্রদায়গণের অসহনীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অশিক্ষা এবং বুভুক্ষা তাঁদের কিভাবে নরপশু করে তুলেছে অথচ উপযুক্ত নেতার অভাবে সেই সম্ভাবনাময় বিদ্রোহ কিভাবে পন্ড হল প্রতিটি দৃশ্যে অতি সাধারণ কথপোকথনের সহায়তায় তার জ্বলন্ত চিত্র হাউপ্টমান নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করে সমাজসংস্কারের প্রতি যে দৃঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন তার তুলনা অতি অল্পই আছে। "ডাই হেব্বার" পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। বিয়োগান্ত রচনায় এই নূতন আঙ্গিকের আন্দোলনকে ন্যাচুরালিষ্টিক বলে অভিহিত করা হয় এবং এই আন্দোলনের বিপক্ষে যাঁরা গতানুগতিক নাট্যধারার পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে হাউপ্টমানের যুক্তি হল – "In cases where we cannot adapt life to the dramatic form of art, we should not adapt this form of art to life."

মিলনান্ত নাটক "ডার বিবারপেলৎস" (দি রিভার কোট) ১৮৯৪ সালে মঞ্চস্থ হয়। হাউপ্টমান পুনরায় ক্ষমতার পরিচয় দান করে জার্মান জাতিকে আশ্বস্ত করলেন। উক্ত নাটকের গল্পাংশে এক বিশিষ্ট বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটেছে। হিব্লহেলমিয়ান শাসনকালকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে মাদার ওলফ নামক এক জবরদস্ত রজকিনীকে নায়িকা করে তস্কর সম্প্রদায়ের সাহায্যে শাসককুলকে নাস্তানাবুদ করার কাহিনী হাউপ্টমান সুকৌশলে "ডার বিবারপেলৎস্" নাটকে পরিবেশন করেছেন। ১৮৯২ হতে ১৮৯৪ সালের মধ্যে তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক "হান্নেলেস্ হিম্মেলফার্ট" (হান্নেলে)। ইতিহাসের স্বল্পখ্যাত এক কাহিনীর ন্যাচুরালিস্টিক নাট্যরূপ, এ কাহিনীর নায়িকা এক রাজমিস্ত্রীর অভাগিনী কন্যা যে শীতার্ত জ্বালাময়ী ক্ষুধায় ক্ষিন্ন এবং প্রবল জ্বরে অচেতন। বিকারের ঘোরে শেষ মুহূর্তে সে স্বপ্ন দেখে স্বর্গের পরীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর দেবদূতেরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, অন্তিম দৃশ্যে প্রভু যীশু তার কপালে শীতল করস্পর্শদানে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাচ্ছেন। এই নাটকটি হাউপ্টমানের ভিন্নরীতি অনুশীলনের পরিচায়ক নয় বটে কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি সহানুভূতি যে তাঁর মনে তখন বাসা বেঁধেছে তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান।

১৮৯৪ সালের পর হাউপ্টমানের মানসিকতায় এক বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয়. ন্যাচুরালিস্টিক আঙ্গিক সাহিত্য সাধনার পক্ষে তাঁর কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র পরিসর বলে মনে হয় কিন্তু নূতন কোন আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন না, বরঞ্চ ওই আঙ্গিকেই হাউপ্টমান দুটি অপূর্ব নাটক রচনা করলেন। প্রথমটি "ফুয়রমান হেনশেল" (ড্রেম্যান হেনশেল) ১৮৯৯ সালে মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয়টি "রোজ বেন্ড্" (১৯০৩) দুটি নাটকেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তিনি প্রচন্ড কষাঘাত করেন। রোজ বেন্ড নাটকে এক সিলেশিয়ান কুমারীমাতার যৌনক্ষুধার অন্ত-

জর্বালার আলেখ্য সুনিপুণভাবে চিত্রিত।

মানবাত্মার বিশাল দিগন্তকিশরী পটভূমিকায় প্রতিনিয়ত যে আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের খেলা চলেছে তার যথাযথ চিত্রণে যে সহানুভূতি ও হৃদয়বৃত্তির প্রয়োজন হয় তা হাউপ্টমানের ছিল এবং মানবমনের অন্ধকার দিকে যে অসমতল বন্ধ্যাভূমি পড়ে আছে তার প্রতি তাঁর ছিল অসীম দরদ শুধু তাই নয় প্রকৃতির কিম্বদন্তীর প্রতীক এই মানবজাতির প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার স্নেহ। এই মহান হৃদয়বৃত্তির পরিচয় তাঁর "ডাই রাটেন" (দি র‍্যাটস্ ১৯১১) নাটকে বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট এবং ন্যাচুরালিস্টিক আঙ্গিকের অপর একটি সুষমাময় নিদর্শন। এক সাধারণ মানব চরিত্রের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে মানসিক দৈন্যতার ভয়াবহ আলেখ্য। এই দৈন্যতা হাউপ্টমানের কাছে ব্যঙ্গাত্মক বস্তু নয়, এ দৈন্য সমগ্র মানবগোষ্ঠীর লজ্জার বিষয় বলেই তিনি মনে করতেন।

হাউপ্টমান অনুসৃত বিচিত্র সাহিত্যরীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলে-ছেন যে তাঁর সাহিত্যরীতি সর্বাত্মকভাবে বৈপ্লবিক না হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহি-ত্যের জীর্ণ বাঁধাধরা প্রয়োগধারার মূলোচ্ছেদ করে যে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ কারণ হাউপ্টমান যে রীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তা হল বাস্তববোধের নিষ্ক-রুণ প্রকাশ। মানবমনের অন্ধকার কোণে যে হিংস্র জন্তুটি লুকিয়ে থাকে তার অনুসন্ধানেই হাউপ্টমান প্রথমদিকের ব্যাপৃত ছিলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ আমরা লাভ করেছি এক অপূর্ব বীজমন্ত্র যা আজকের এই বিষাদময় দিনগুলিতে হয়ত আমাদের আশার বাণী শোনাবে, তিনি বলেছেন মানুষ বিভ্রান্ত হবেই কিন্তু তাই বলে আমরা তাকে উপরে উঠে আসবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেব না এমন কথা নয় কারণ তার বিভ্রান্তি আমাদের আত্মশুদ্ধির দিগদর্শন যন্ত্র যা চলমান পথিকের একমাত্র অবলম্বন। মানুষের কৃতকর্ম বিশ্লেষণের কিম্বা বিচারের অধিকার মানুষের নেই কিন্তু ক্ষতিপূরণের অধিকার আছে এবং তারই দাবী গ্রহণযোগ্য যার ক্ষতিপূরণের যোগ্যতা আছে। মানুষের ভ্রান্তির প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়, যা প্রকাশ করা উচিত তা হল সহানুভূতি।

গেরহার্ট হাউপ্টমানের লেখনী কেবলমাত্র নাটক রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জার্মান সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অভ্রভেদী। "ডার কেৎসার ফন সোন্যা" (১৯১৮) এবং "দি আইল্যাণ্ড অব দি গ্রেট মাদার" (১৯২৪) প্রভৃতি উপন্যাস উচ্চস্তরের কিন্তু আটলান্টিস (১৯১২) উপন্যাস তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সৃষ্টি। সমালোচকগণ বলেন কাব্যের ক্ষেত্রে হাউপ্টমানের লেখনী বিশ্বস্ত এবং মর্য্যাদাব্যঞ্জক হলেও হৃদয়ের উত্তাপ সেখানে কম। তাঁর শেষ রচনা ডাই আট্রিডেন—টেট্রালিজি (দি টেট্রালজি অব দি আট্রিডস, প্রকাশকাল ১৯৪১—১৯৪৮) এক বিরাট সাহিত্যকর্ম যা তাঁর মহাপ্রয়াণের পরবর্তী দুই বৎসরে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পূর্ণ রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় সুতরাং এইখানেই এর ছেদ টানছি এবং সাহিত্য পাঠকের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন হাউপ্টমানের গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান করেন।

১৯১২ সালে গেরহার্ট হাউপ্টমান নোবেল লরিয়েট হন। বহু সম্মানের অধিকারী হয়েও তাঁর জীবনযাত্রা সহজ এবং অনাড়ম্বর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত হওয়ার পর ৮৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হাউপ্টমান দক্ষিণ সিলেশিয়ার আগেন্টেনডর্ফে তার ভিলায় ১৯৪৬ সালের ৮ জুন তারিখে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হন। যুদ্ধোত্তর কালের বেহি-সেবী দিনগুলিতে তাঁর শেষ সংবাদ হয়ত আমাদের মনে তেমন কোনও আলোড়ন আনতে সক্ষম

হয়নি কিন্তু তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর সমারোহের দিনে তাঁর নাম আবার আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

যাঁরা জীবনবেদের সার্থক রচয়িতা এবং মানব কল্যাণে যাঁদের জীবনপাত ঘটেছে তাদের ভাবনার প্রসাদ গ্রহণে আমরা নারাজ। হুইটম্যান, স্তলতয়, রবীন্দ্রনাথ এবং সর্বকনিষ্ঠ হাউপ্টমান আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি আছে দিক নির্দেশকারী বাণী আছে কিন্তু আমরা কোন পথে চালিত হচ্ছি। এই ধ্বংসের পথ থেকে আমাদের কে ফেরাবে। মৃত্যু যদি ঘটে এবং এই পৃথিবীতে আবার যদি কোনওদিন প্রাণের সঞ্চার হয় তাহলে আবার জীবনের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে কারণ হাউপ্টমানের বিশ্বাস—'ম্যান ইজ ম্যানস উইটনেস্ এ্যান্ড টেস্টমনি?

নূতন গ্রন্থ

দি আমেরিকান নিউজপেপারম্যান : বার্ণাড ট, হব্বইসবার্জার।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "শিকাগো হিস্ট্রি অব আমেরিকান সিভিলাই-জেশন" গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত "আমেরিকান নিউজ পেপারম্যান" গ্রন্থটি আমেরিকার সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি খসড়া-পুস্তক মাত্র। ১৬৯০ সাল হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্র-রাজ্যে যে বিবর্তন আমেরিকায় ঘটেছে তার কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা (অবিন্যস্তভাবে) হব্বাইসবার্জার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এত অল্প পরিসরে আমেরিকান সংবাদ পত্রের সেই বিশাল পটভূমিকা বিধৃত করা সহজ নয়। সুতরাং হব্বাইসবার্জার যে চেষ্টা করেছেন তার জন্য তিনি প্রশংসার্হ কারণ এই প্রকার গবেষণা গ্রন্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে বহু সময় লাগে এবং বহুজনের প্রচেষ্টায় তা সম্পূর্ণ হতে পারে।

আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রথম যুগে যখন একাধারে লেখক মুদ্রক সম্পাদক পরিচালক-গণের রাজত্ব অর্থাৎ এক একজন এক একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন তাঁদের ইতিহাস বেশ কৌতূহলো-দ্দীপক ভাবেই হব্বাইসবার্জার পরিবেশন করেছেন কিন্তু সেকালের ছাপাখানায় যে যান্ত্রিক ক্রমো-ন্নতি ঘটেছিল যার ফলে আজকের আমেরিকান ছাপাখানা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পেরেছে তার বিশেষ কোনও পরিচয় নেই।

কয়েকজন বিশেষ খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সম্পাদকের জীবনী সত্যই উপভোগ্য যেমন "সান" পত্রিকার বেঞ্জালিন এইচ ডে, হেরাণ্ডের জেমস গর্ডন বেনেট অথবা ওয়ার্ল্ড এবং পোস্ট-ডিসপ্যাচের পুলিৎজার প্রভৃতির কর্মকাণ্ডের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা সকল পাঠককেই আনন্দদান করবে। আবার গ্রন্থ হিসাবে আমেরিকান নিউজপেপারম্যান জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে।

The American Newspaperman : Bernard A. Weisberger, Chicago: University of Chicago Press (1961 X + 266 pp. $4.50.

অজিত দাস

চিত্র প্রদর্শনী

বর্তমানে কলকাতা শহরে শীতের সুরুতে প্রদর্শনীর মরশুম আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক শিল্প-কলার নানা বিচিত্র সম্ভার এখন থেকেই এখানে জমতে আরম্ভ করেছে। বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে প্রথম থেকেই যা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে শিল্পীরা চেতন বা অবচেতনের সংযোগ সুত্রে যে চিত্র সৃষ্টি সে বিষয়ে নজর দিয়েছেন সত্য, তবে বেশী জোর দিচ্ছেন ইচ্ছামত রং ঢেলে ফর্ম নিয়ে খেলা করার মধ্যে। কাগজে রং দিয়ে দেবার পরে সেটা কি ফর্ম নেবে সে বিষয়ে শিল্পী অপেক্ষা রং এবং জলের মর্জিই বেশী। দেখতে দেখতে লাল, সবুজ, নীল রংগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়তো-বা ফুলের রূপ নিলো—সেই রূপটাকেই শিল্পী ফুল বলেই চালিয়ে দিলেন। আমার কাছে বিস্ফোরণের রূপটার কথাও মনে হতে পারে। তবে সেখানেও এই এ্যাকসিডেনটাল শিল্পে শিল্পী পুরোপুরি রং ছড়িয়ে যাওয়ার ওপরে নিজেকে ছেড়ে দেননি। খানিকটা পরে ঘষামাজা করেছেন—অবশ্য রংটা কাগজে একটা ইচ্ছামত ফর্ম নেবার পরে। এ ছাড়াও মনে হয়েছে যে আধুনিক শিল্পকলা মনোবিশ্লেষণের এক্সরে প্লেট। তবে তাকে ছবি বলি কেন? চিত্র বলতে কি সুধুমাত্র অবচেতনের খেলা না বুদ্ধিবাদীর ফাঁস। সৌন্দর্য ও চিন্তা এই দুই যদি কেবলমাত্র এ্যাকসিডেনট্ হয় কিংবা অবচেতনের হস্তনির্মিত তা হলেও চিত্র কখন আংশিকভাবে সত্য। সহজভাবে সত্য হয়ে ওঠে না। চিত্র সৃষ্টিতে মন আর তার জগত বিশেষভাবে উদ্ভাসিত। সক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের মন ও তার বিভিন্ন রূপবৈচিত্রের প্রতিচ্ছবির চিত্র মুক্তি ঘটে তখনই যখন সে আপন মনো—জগতের বিপ্লবকে সার্থকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারে। প্রকৃতি তো শুধুমাত্র রং আর রেখার মোটা সরু সমন্বয় নয়। সেখানে যে চোখ দিয়ে দেখা তারও একটা বড় রকমের অংশ আছে। সকলের চোখে পাহাড়ী বর্ষা তার আনত নম্র সজলতা নিয়ে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। কিংবা হয়তো তারই চোখে বৈশাখের খরতাপে দগ্ধ তরুশাখার আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যের সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতি সর্বদাই সর্বত্রই সুন্দর। আমাদের মানসিক গঠন অনুসারে, আপন ক্ষমতার সাহায্যে আমরা প্রকৃতি থেকে সৌন্দর্য আহরণ করি। রং এবং তার বিভিন্ন সুর প্রকৃতির মর্মবাণীকে ঐকান্তিকভাবে পরিস্ফুট করেছে। সেই ঐকান্তিকতার সঙ্গে আমার মনোজগতের সংযোগমাত্র হলেই আমরা অভিভূত হই। সেই অনুভূতির বিভিন্ন সুরকে আবার তার মেজাজ অনুসারে চিত্রে মুক্তি দেওয়া হয়। যদিও দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির রংবাহারই আমার চিত্রমুক্তির মূল সুর তা হলেও চিত্রে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গে মূলের তফাৎ থাকছে অনেক। চর্মচক্ষে যে রং প্রথমে দেখা হয় সেই রং যখন আমার মনের ভেতর থেকে আমার মানসিক গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিশ্রুত হয়ে চিত্রে প্রকাশ পায়, তখন প্রথম দেখা যে পাহাড়ী সবুজ সে শুধুমাত্র সবুজই কিন্তু সেই সবুজ তখন আর রং মাত্র না হয়ে আরও বড় কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে। তাহলে চিত্র সৃষ্টিতে চেতনতার সঙ্গে অবচেতনেরও মিশ্রণ বর্তমান। তবে অবচেতনের অংশকে বড় করে দেখা হলেও প্রকৃত সত্য নিরূপণে শুধুমাত্র অবচেতনই প্রধান এই কথাও ভুল। কারণ অবচেতনের অতলে কি রূপ আছে তা তার চেতনার আবরণমুক্ত স্বাধীন সঞ্চরণশীল অনুভূতিতে

প্রকাশ পায়। সেখানে সেই আবরণমুক্ত অবচেতনই প্রধান হলে চিত্র সৃষ্টি একদিকে হয়তো বিচিত্র মনোবিশ্লেষণের সহায়ক হবে, কিন্তু সত্য নিরূপণে সৌন্দর্যমণ্ডনের কথাটিকে আমাদের নতুন-ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু সেই অবচেতনের আলোড়নের মধ্যে যে রূপটি উঠে এলো তাকে আমার চেতন মনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মার্জিত পরিশ্রুত না করলে চিত্র কথার প্রয়োজন কি? চিত্রকথন আমার মনোজগতের কথা। সত্যই যে এই চিত্রকথনে অবচেতনবাদের এক বিশেষ অংশ বর্তমান। কিন্তু শুধুমাত্র অবচেতনবাদ সেখানে প্রধান একথা কোন সময়েই মানতে রাজী নই। প্রকৃতি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার সূত্র যে মুহূর্তে অবচেতনের অন্তরালে অন্তর্হিত হলো, সেই মুহূর্ত থেকে সেই অভিজ্ঞতা তার আরও পূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত—গুহায়িত নানা বিচিত্র রূপের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমার চেতন মনের দরজায় আঘাত করে। তখন তাকে তার গোড়ার রূপের সঙ্গে মিল খুঁজতে হলে দৌড় লাগাতে হবে অনেকখানি। কিন্তু শিল্পীর অতন্দ্র পাহারার চেতনতা তাকে তার মার্জিত বেশভূষায় ভূষিত করে চিত্রে মুক্তি দিলেন। সেখানে অবচেতনের বিরাট গহ্বর থেকে তার যে রূপটি শিল্পীর কাছে ধরা পড়ল—সেই রূপটি ছাড়াও চেতনতায় পরিশ্রুত রূপটিকে শিল্পী চিত্রে মুক্তি দেন। তাই শুধুমাত্র অবচেতনে যা বলেছে তাই এঁকে চলেছে—এই বক্তব্য থাকলে তাকে চিত্র না বলে মনোবিশ্লেষণ যাঁরা করেন তাঁদের সহায়ক এক্সরে প্লেট্‌ বলাই ভালো। তবে এ কথাও ঠিক নয় যে চর্মচক্ষে যা দেখেছি তাকেই নকল করে কাগজে রং দিলাম—এই পদ্ধতিতে নকলনবিশী হবে, কিন্তু শিল্পীর কাজ সেখানে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আবার চেতনতার পাহারা বসিয়ে যতটুকু আমার চোখে ধরা পড়ল—সেই রংটুকুকেই, তার আদলকেই প্রকাশ করলাম, সেই প্রকাশও পরিশ্রুত, মার্জিত নয়। কারণ সেই প্রকাশে আমার ব্যক্তিত্ব অপ্রকাশিত। মানুষের যে ব্যক্তিত্ব তার বিভিন্ন কাজে প্রকাশ পায় তার গঠনের মধ্যে চেতনার প্রয়োগ যেমন বৈজ্ঞানিক তেমন অবচেতনের বিচিত্রতাও সেখানে সংযোজিত। উভয়ের সার্থক সংমিশ্রণই উপযুক্ত সার্থক চিত্ররূপে প্রকাশ পায়। এখানে তর্ক তোলা যায় যে কোনটি কতখানি প্রকাশ পাবে, সে বিষয়ে কি কোন বাঁধাধরা রূপ নির্দেশ আছে? সেখানে একটিমাত্র কথাই বলা যেতে পারে যে, শিল্পী তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই মিশ্রণকে পরিমার্জিত পরিশ্রুত করেই পরিবেশন করবেন। সেখানে কোন নির্দিষ্ট নেই। সেখানে একমাত্র শিল্পীর আত্ম-জিজ্ঞাসাই মানদণ্ড। তাঁর মনোগঠনের বিচিত্র রূপ তাঁকে যে নির্দেশ দেবে, তাই তাঁর রূপ নির্দেশ। নোনাধরা দেওয়ালে জলের ছোপ লেগে অদ্ভুদ সমস্ত বিচিত্র ফর্ম হয়েছে—এমন সব পুরোনো দেওয়াল মানুষ সর্বত্রই দেখছে—কিন্তু সেগুলো যে সর্বদাই শিল্প সৃষ্টি হয়েছে একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। তবে সেই নোনাধরা দেওয়ালের সেই বিচিত্র রূপকে কোন শিল্পী তাঁর আপন খেয়ালে যখন চেতনতার তুলি বুলিয়ে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করবেন, তখনই সেগুলি চিত্র সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করতে পারে। সেই রকম অবচেতনের কত না ভাব কত না বিচিত্র কল্পনা মানুষকে প্রতিনিয়তই প্রকৃতি—সংযোগহেতু রূপ বিকাশে সহায়তা করছে। কিন্তু সেখানে গ্রহণ ও বর্জন এই দুইয়ের পালা বদলের মধ্যে শিল্পী সযত্ন মাল্যবন্ধনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছেন। সৌন্দর্য কথাটির মধ্যে আমার ও দর্শকের মধ্যে যে সংযোগ এই সংযোগের সূত্রটিই মুখ্য। চিত্র সৃষ্টি এবং চিত্র দর্শনে আনন্দ এই দুইয়ের সংযোগ সৌন্দর্য। শিল্পী যে অর্থে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে নিবিষ্ট হলেন, দর্শক ঠিক সেই একই অনুভূতিতে অভিষিক্ত নাও হতে পারেন। কেননা সেখানে ব্যক্তিবিশেষ অনুসারে বিশেষ মানসিক গঠনই দায়ী। ঋতু বৈচিত্রে শিল্পী যে অনুভূতি তাঁর অবচেতনের আড়োলনের মধ্য থেকে আহরণ করলেন সেই অনুভূতিটিই যে প্রাথমিক সত্য তা নাও হতে পারে। কেননা যিনি দেখছেন তিনিও তাঁর বিচিত্র মনোগঠনের

বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে চিত্র দর্শনে আনন্দ পাচ্ছেন। সেখানে শিল্পী ও দর্শক উভয়েই সেই অবচেতনের মধ্য থেকেই আপন অভিজ্ঞতার রূপটিকে খুঁজে চলেছেন। সেখানে যদি শিল্পী নির্দেশিত রূপে দর্শক অভিষিক্ত হন তাহলে তো ভালই, আর যদি তিনি সেই রূপদর্শন থেকে আহরণ করেন অন্য কোন অনুভূতি তা হলেও ক্ষতি নেই। কারণ চিত্রদর্শনে আনন্দ অনুভূতির জন্মই হলো প্রধান—সেখানে আনন্দ পাওয়াটাই হলো আসল কথা। তাই একথা কোন সময়েই জোর করে বলা যায় না যে শিল্পী ও দর্শক উভয়েরই অভিজ্ঞতা একই হবে এবং উভয়েই একই অনুভূতির স্তরে বিচরণ করবেন। সেখানে বিচিত্রতা আছে এবং থাকবেই। এই একই বিষয়-দর্শনে বিচিত্র অনুভূতি আছে বলেই—চিত্র কথন এত বিচিত্র এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী।

নিখিল বিশ্বাস

পথ প্রদর্শনী

২২শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী অবধি সাদার স্ট্রীটের দেওয়ালে একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কিংবা খোলা রাস্তার দেওয়ালে এই জাতীয় প্রদর্শনীর রেওয়াজ আমাদের দেশে সম্প্রতি প্রচলিত হলেও ফরাসী, ইতালি, হল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে । বছর তিনেক আগে প্রকাশ কর্মকার এবং পরে নিখিল বিশ্বাস স্ট্রীট এক্জিবিসানের আয়োজন করেছিলেন। এবারের শিল্পী মদন সরকার তাঁর ৪৭ খানা ছবি নিয়ে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে বলে আমার বিশ্বাস।

কেননা একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে আধুনিক চিত্রকলা বা মডার্ন আর্ট প্রচলিত কথা অনুযায়ী যতই দুর্বোধ্য হউক না কেন এর বিশেষ আবেদন রসিক মনকে অবশ্যই নাড়া দিয়ে থাকে। শিল্পী মদন সরকার, কিন্তু আধুনিক মারপ্যাঁচের ধারে-কাছেও ঘেঁষেন নি যা একান্তভাবে একটি স্ট্রীট এক্জিবিশনে আশা করেছিলাম। জল-রং এবং কার্বণ পেন্সিলে আঁকা ছবিগুলো নিতান্তই সাধারণ মনে হয়েছিল। গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করার মত মৌল-প্রতিভা শিল্পীর নেই। তবুও জল-রংয়ের ল্যান্ডস্কেপগুলোর মধ্যে যে স্বল্প রং তিনি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ প্রায় সাদা-কালোর মাধ্যমে বস্তির কোন বিশেষ দৃশ্যকে যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর একটা বিশেষ ধরণের কৃতিত্ব বলতে হবে। কার্বণ পেন্সিলের স্কেচ দেখে এ কথাই মনে হয় যে, বিভিন্ন রংয়ের ব্যবহারের সৃষ্ট একটা ছবির এফেক্ট্ থেকে এগুলোর 'এফেক্ট্' কোন অংশে কম নয়। রেখার বলিষ্ঠতা থেকে শিল্পীমনের একটা সজীব এবং সবুজ আভাষ লক্ষ্য করেছিলাম।

আধুনিক চিত্রশিল্পীগণ যে পদ্ধতিতেই ছবি আঁকুন না কেন তাঁদের মূলত দৃষ্টিভঙ্গী হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করা। কিন্তু মদন সরকারের মধ্যে এই জাতীয় প্রচেষ্টার অভাব আমাকে হতাশ করলেও তাঁর এই প্রদর্শনীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

গোপাল কর্মকার

আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

সাহিত্য কথাটির মধ্যে একটি সহিতত্বের ভাব আছে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগ। লেখকের মনের সঙ্গে পাঠকের মনের সংযোগ। ভাবের সঙ্গে ভাষার সংযোগ। এই সংযোগটি যখন আনন্দের দ্বারা বিধৃত হয়, তখনই তা হয়ে উঠে সার্থক। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের জন্য। মানুষের সমগ্র জীবনটি তার আশা-আনন্দ-বেদনা-দ্বন্দ নিয়ে সাহিত্যে প্রতিফলিত। সাহিত্যের উপজীব্য যেমন মানব-জীবন—তেমনি জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সামাজিক বিবর্তনের ফলে। চলমান পৃথিবী, পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের নানা স্তর। সে পরিবর্তন যেমন দ্রুত আবার তেমনই জটিল ও গভীর। শিল্প-সাহিত্যেও এ অভিজ্ঞতা সক্রিয়। সেখানে বরং ব্যাপারটা আরও অসরল, কারণ শিল্প-সাহিত্যের নিজস্ব স্বভাব ও ঐতিহ্যের গুণে অভিজ্ঞতা বিশেষ রূপ ধারণ করে।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্বে কবি চেতনার নির্বাধ প্রাধান্যই বোধ হয় ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই বোধ হয় ইহা বলা চলে যে আদি যুগের অধিকাংশ সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল অবকাশ-রঞ্জনী, আর তাই মন্ময়তাই ছিল এই সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ক্রমশঃ এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মানুষের আত্মস্বাতন্ত্রে। অভিমান যত বড়ই হোক না কেন, সমাজ মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করার উপায় তার নেই। তাই দেখা গেছে, যুগে যুগে সমাজ চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। জীবন ও সাহিত্য দ্বন্দ্বের মন্দাক্রান্তা সুর প্রথম ধাক্কা খেল প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ফলে। সযত্ন লালিত ভাব ভাবনাগুলো একই সঙ্গে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। এর মূলে ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি অর্থনীতির সমগ্র রূপকে বদলে দিতে লাগল, মানুষের শিল্প সাহিত্য ধর্ম দর্শন সম্বন্ধীয় চিরকালীন ধারণাগুলোও ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ তাণ্ডব লীলার ভিতর দিয়ে অতি ভীষণ অভিজ্ঞতা নিয়ে এগিয়ে এসে আবার একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় মানুষ ভীত-ত্রস্ত হয়ে প্রহর গুণছে। আর একদিকে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে আপন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এগিয়ে চলেছে। আজকের জগৎ দুই বিপরীত শক্তির সম্মুখীন। একদিকে ধ্বংসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশঙ্কা আর একদিকে নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা। সভ্যতার এক হস্তে সুধা আর অপর হস্তে বিষভাণ্ড। একদিকে ধ্বংসের প্রচণ্ডতা আর একদিকে সৃষ্টির আবেগ। বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহিত্য কৃতী আলোচনা করলে আমরা জীবনের এই দুই প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই। তাই একদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য দলীয় রাজনীতির কণ্ডুয়ন, নয়ত বিকৃত যৌনাচারের প্রতিবিম্ব অথবা বিকৃত অপরাধ প্রবণতার উষ্ণ প্রস্রবণ। যে প্রচণ্ড মত্ততা আজ মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেই ভীষণ মত্ততাই সাহিত্য সূর্যকে রাহুগ্রস্ত করে তুলেছে। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল মনীষীই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তথা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত। অনেকের মতে তাই পৃথিবীর সৃজনী

প্রতিভা বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠবে এ তো শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে। এ বক্তব্য সত্য বটে, কিন্তু অর্ধ সত্য। দুনিয়ায় দুই শক্তির মত সাহিত্যেরও দুটি ভাগ হয়ে গেছে। শুধু এলিয়ট কামুর রোমন্থনই নয় নব জাগ্রত দেশগুলির যে যৎসামান্য পরিচয় আমাদের দেশে এসে পেঁছয়, তাতে দেখতে পাচ্ছি আইসল্যাণ্ডের মত প্রায় অখ্যাত অজ্ঞাত দেশে 'ল্যাকস্‌নেস্‌' সৃষ্টি করেছেন "স্বাধীনতা," অস্তিত্ববাদী স্বার্থের ঘটছে রূপান্তর, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে পাচ্ছি এহরেনবুর্গ, মলোকভ, লিওনিদভ-এর মত ঔপন্যাসিকদের, সুদূর কিউবায় পাবলো মেরুদা, মধ্যপ্রাচ্যে আদিম হিকমৎ প্রমুখ কবিদের। সুতরাং বন্ধ্যাত্বের প্রশ্ন অর্ধসত্য। আসলে সে সমাজ সভ্যতা জীর্ণ জরতী হয়ে সৃজনী ক্ষমতা হারিয়েছে, সেই সমাজের সঙ্গে যাঁরা নাড়ী যোগ করেছেন বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা ভঙ্গীর নতুন বোতলে দেউলে জীবনের বাতিল করা পুরানো পচুই ভরছেন, তার নেশা ছাড়তে চাইছেন। বাংলা সাহিত্যও যে প্রভাবের বাইরে যেতে পারেনি। এখানেও অতি সাম্প্রতিককালের ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় সেই জরতী জীবনের প্রতিভাস। অবশ্য এর পাশাপাশি সুস্থ ধারাও প্রবাহিত হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ তার সমাজ, তার জীবন, তার সমস্যা আর আশা আনন্দ দুঃখ-বেদনাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আশাবাদী দৃষ্টিতে দেখলে বলতেই হবে যেমন জীবনের তেমন সাহিত্যের এ এক সন্ধিক্ষণ। এর মধ্য দিয়ে নতুন ধারা প্রবলতর হয়ে যেদিন স্বরূপে নতুন শক্তিতে দেখা দেবে, সেইদিন হবে সাহিত্যের ইতিহাসের রূপান্তর।

অধুনা সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে একটি অভিযোগের কথা। সেটি হচ্ছে, বর্তমান জগৎ জুড়ে চলেছে সংস্কৃতি সংকট তাই বুঝি, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, বিদেশে শেক্সপীয়ার, বালজাক, জোলা, টলষ্টয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। আসুন এই অভিযোগটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্।

পৃথিবীর বর্ত্তমান সংকটের স্বরূপটি কি ? তা হল সাংস্কৃতিতে জীবনের প্রতি আস্থাহীনতার প্রকাশ। সমগ্র জীবনবোধই যেন ধাক্কা খেয়ে গেছে। বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে, সাহিত্যে জীবনের জয়গান আর ধ্বনিত হচ্ছে না, পরিবর্ত্তে দেখতে পাচ্ছি শিল্পে সাহিত্যে বিকৃত জীবন ও জীবনদৃষ্টির অভিব্যক্তি। যেমন ফরাসী দেশে জাঁপল সার্ত্রর-এর অস্তিত্ববাদ, আলবেয়র ক্যেমুর জীবন বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গী, বৃটিশ কবি টি, এস, এলিয়টের লেখাতেও এই জীবন বিমুখ, হতাশাবাদী মতবাদের অভিব্যক্তি।

মূলতঃ এ সংকট বর্ত্তমান কালের সভ্যতারই সকংট। দুটি প্রধান বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে পৃথিবীতে যে অশান্তি, অস্থৈর্য্য দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতিতে তারই প্রভাব পড়েছে। এই সংকটের আর এক কারণ সচেতন ভাবে স্বার্থ-সংশিলষ্ট মহল থেকে এই সব সংস্কৃতিকে বিহ্বলভাবে অভিনন্দিত করা হচ্ছে। এতে সাহিত্যের সুস্থ চেতনা বিনষ্ট হচ্ছে। স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্য-জগতেও তার প্রভাব পড়েছে। কারণ, দুনিয়ার অস্থৈর্য্য হতাশা আর অশান্তি সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার সাহিত্য, সংস্কৃতি তারই অচেতন কিংবা সচেতন বাহক হয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি ও হতাশাকে, জীবন বিমুখীনতাকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তুলছে। সাম্প্রতিক কালের কাব্যে, কথা সাহিত্যে তারই চক্রাবর্ত্ত চলেছে।

সামাজিক সমস্যা, আশা হতাশা সাহিত্যে স্বভাবতঃই বিম্বিত হবে, কিন্তু যে হেতু সাহিত্য অচেতন অনন্য নির্ভর দর্পণ নয়, যে হেতু তার রূপকারকে একটি চেতন সংস্কার পথে

বাহিত হয়ে র‍ূপায়িত হ'তে হয়, স‍ুতরাং স্রষ্টার, সাহিত্যিকের দ‍ৃষ্টিভঙ্গী এ ক্ষেত্রে অনিবার্য্য-ভাবে ব্যঞ্জিত হয়। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আলালের ঘরের দ‍ুলাল থেকে আধ‍ুনিক কাল পর্য্যন্ত কথা সাহিত্যে সামাজিক সমস্যা প্রবল ভাবেই স্থান লাভ করেছে। আজকে সমস্যা দাঁড়িয়েছে অন্যত্র। জীবনের সমস্যাকে স্বীকার করে বশ্যতা স্বীকার, অথবা অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অপরাজেয় জীবনের জয়গান।

কী করবেন সাহিত্যিক? সাহিত্যের তা হলে কোন পথ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়? সাহিত্য যদি অকারণ, ম‍ূল্যহীন লীলা বিলাপের উপকরণ না হয়, তবে স্বভাবতঃই সমাজ ও জীবনের প্রিয় বোধ সাহিত্যে বর্জিত হতে পারে না—একথা বোধ হয় আজকের ও আগামী দিনের সাহিত্যিকরা স্বীকার না করে পারবেন না।

বাংলা সাহিত্যের একটা য‍ুগ গেছে, যাকে আমরা বলতে পারি স্বর্ণয‍ুগ রবীন্দ্রনাথে যার সর্বোত্তম দীপ্তি ও সমাপ্তি। ঊনিশ শতক থেকে রবীন্দ্রয‍ুগ পর্য্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স‍ুনির্দিষ্ট ধারা পেয়েছি—যা আমাদের র‍ুচি বোধকে মননশক্তিকে, উন্নত করেছে। এই সাহিত্য কৃতীতে জীবন সম্পর্কে একটি স‍ুনির্দিষ্ট, ত্র‍ুটিহীন না হলেও স‍ুস্থ ও একটানা একটি দ‍ৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সেবকদের মধ্যে সেই দ‍ৃষ্টিভঙ্গীর নয়ন দেখা যাচ্ছে।

জীবন সম্বন্ধে একটি দ‍ৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবই সাহিত্যকে অন্তঃসার শ‍ূন্য করে তোলে। সাহিত্য শ‍ুধ‍ু অবসর বিনোদনের সামগ্রী হলে তা নিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন হত না। সে সম্বন্ধে ব‍ৃহত্তর গ‍ুর‍ুত্ব আরোপ করা হয় বলেই সাহিত্য নিয়ে আমাদের এত উৎসাহ, উৎকন্ঠা ও আশা। সাহিত্যকে অনেকে বলেছেন মানব মনের নির্মাতা। অবশ্য তার দ্বারা সাহিত্যের রস-কষহীন গ‍ুর‍ু সদ‍ৃশ স্থান অধিকার করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং জীবনের রসে জারিত হয়ে সাহিত্যের কথায় ভাণ্ডার উপছে পড়বে, ব‍ৃহত্তর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করবে মানব মনকে। যাই হোক সংকটের যন্ত্রনার মধ্য দিয়েই নতুন স‍ৃষ্টির উন্বোধন হয়। আজকের বাংলা সাহিত্যের সংকট কেটে যাবে-এ বিশ্বাস আমাদের অন্তরের বিশ্বাস। শ‍ুধ‍ু তার জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের, প্রয়োজন একটি আত্মিক চেতনার, যার দ্বারা বাইরের সমস্ত অভিজ্ঞতা অন্তরের আনন্দ রসে অভিসিক্ত হয়ে উঠবে। জীবনে জীবন যোগ হয়ে উঠবে। সেই প্রতীক্ষাই আমরা করব।

সঞ্জীবকুমার বস‍ু

'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' প্রসঙ্গে

বিগত আশ্বিন, ১৩৬৯ সংখ্যার 'সমকালী'নে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' প্রবন্ধটি গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাষ্ট্রভাষা থেকে স‍ুর‍ু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বাহন কি হবে তা নিয়ে বহ‍ু আলোচনা, বাদ-প্রতিবাদ, এমনকি নানা বিতণ্ডার অবতারণা হয়ে গেছে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির‍ূপে জাতীয় অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ভাষণ দানের

পর থেকে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হবে কি না এই নিয়ে বহু বিতর্ক সংবাদ পত্রসমূহকে সরবিত করে রেখেছিল। তৎকালীন উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইংরেজীর সপক্ষে বহু যুক্তি প্রয়োগ করেন। ইতিমধ্যে দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। সংবাদপত্রগুলিও পৃথক হয় গিয়ে দুই গোষ্ঠীতে চিহ্নিত হ'লো, 'সমকালীন পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যায় বিভিন্ন লেখকেরা নানাভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। পুনরায় এ জাতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করার পশ্চাতে হয়তো এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে আলোচনার ধারাটিকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা থাকতে পারে। যাই হোক এই প্রবন্ধটির জন্যে পাঠক হিসেবে আমি শ্রীযুক্ত রায় এবং সম্পাদক মহাশয় উভয়কে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' শিরোনামাটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে। এককালে মেকলে সাহেব ইংরেজীভাষাকে শিক্ষার প্রায় সর্বস্তরে সরকারী আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলাভাষাকেও মাধ্যমিক শিক্ষার মহল পর্যন্ত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে একারণেই অর্থাৎ ইংরেজীভাষার মুখপাত্র ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ লাভ ঘটেছে। কথাটাকে উড়িয়ে দেবার জো নেই। স্বীকার করে নিচ্ছি বিদেশীদের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিসাধন হতো না। সংস্কৃতের কুক্ষিগত হয়ে চিরদিন অবহেলিত হয়ে থাকতে হ'তো। কিন্তু এর জন্যেই কি চিরকাল ইংরেজীকে আমাদের শিক্ষার বাহন করে রেখে সেই ঋণ শুধতে হবে।! এ প্রশ্ন আজ অনেকেই তুলছেন। একসময়ে ইংরেজী ভাষাকে বরদাস্ত করা আমাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখনো নিয়ম বহাল রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গ অনেকটা জুড়ে আছে প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন নানা কারণে ইংরেজীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল একথা প্রবন্ধকার বলেছেন।

কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে কবিগুরু স্বয়ং শিক্ষার নানা স্তরে মাতৃ-ভাষাকেই বাহন করবার জন্য সুপারিশ করেছেন যদিও তাঁর নিজস্ব এলাকাতেই তা চালু করতে পারেন নি। সে যাই হোক, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দীর মাধ্যমে করবার প্রচেষ্টা চলেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী-প্রেমিক কর্তা ব্যক্তিদের তরফ থেকে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজী বজায় থাকে—হয়তো প্রধানমন্ত্রীর জন্যেই। যদি একথা বলা হয় যে হিন্দীর আধিপত্যবিস্তারে বাধা দেবার জন্যেই ইংরেজীভাষাকে সযত্নে লালন করা হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গতিপথে তাহলে এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র হিন্দী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে অপর ভাষাকে মুখ্যভাষা ক'রে রাখা অপপ্রয়াসের নামান্তর। বিশ্বভারতী বা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-যার কথাই বলা হোক না কেন, যদি বাণিজ্যিক বুদ্ধি না থাকে তাহলে এই বিদেশী ভাষাকে গুরু আদরে পালন করার কোন প্রয়োজন নেই। একথা অনস্বীকার্য যে আজ ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে মাত্র লাঠি-সড়কি নিয়ে 'ইংরেজী হঠাও' বললেই সে হটে যাবে না। আবার জোর ক'রে হিন্দীর বোমা চাপিয়ে দিতে চাইলেই সবাই তা মাথা পেতে নেবে না। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে ভাববে নিজের প্রদেশ বাসী ছাত্রের কথা যাদের ঐকান্তিক প্রযত্নে স্বদেশের নাম বিদেশের কাছে উজ্জ্বল হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিকতার যে বীজ হিন্দী-প্রেমিকরা ছড়িয়েছেন তার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখবার দায়-দায়িত্ব এসে গেছে বাঙালীদেরই পরে। কাজেই "আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী" হবার চেষ্টা ক'রে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা সুবিধে হবে তা ভাববার বিষয়।

উচ্চশিক্ষার প্রসংগে সহজেই ইংরেজী ভাষার কথা মনে আসে। একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে ইংরেজীতে যারা প্রগলভ হতে পারলো না তারা উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গনে অন্ত্যজ ব'লে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হবে। দেশবিদেশের জ্ঞানচর্চার কথা পড়বার, জানবার পাসপোর্ট সে পেল না। একারণেই রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন, "মাতৃভাষা বাঙলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দন্ড দিতে হইবে? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না?" (শিক্ষার বাহন)

ইংরেজীভাষাকে আমরা দীর্ঘদিন উচ্চশিক্ষার বাহন করে রেখেছি। তাতে আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার যে তৃপ্তিকর অংকে পেঁাছে গেছে এমন অবিশ্বাস্য কথা কেউ বলবেন না। অথচ এই ভাষাকে আমাদের নিত্যসংগী করলে পদে পদে হেঁাচট খেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র। কিন্তু আত্ম-প্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।" (ছাত্র সম্ভাষণ)

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে বাংলার এবং সেই সঙ্গে কলকাতার সুদিন এসেছিল একথা শ্রীযুক্ত রায় উল্লেখ করেছেন। তার কারণও নিশ্চয় আছে। ইংরেজেরা এদেশে বণিক থেকে যখন রাজা হলো তখন তাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই শহর কলকাতা। কাজেই এদেশকে বিশেষ করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নানা শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্দির। বৃটিশ ভারতের রাজধানীও কলকাতা ছিল বহুকাল আর বাংলার মানচিত্রও বেশ বড়ো ছিল—বাংলা বিহারের অংশ, আসাম, উড়িষ্যার অংশ বাংলার শাসনাধীনে ছিল বলে শুনেছি। তাছাড়া কোম্পানীর আমলেও বড়ো কেল্লা, বড়ো বড়ো পল্টন বাংলাদেশেই ছিল। যে কারণেই হোক, এদেশে বাংগালীরা ইংরেজের প্রসাদ লাভ করেছেন সবচেয়ে বেশি। তার ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী থেকে বাংগালীরা সহজেই দরবারে উচ্চপদ পেয়েছেন। যেহেতু বাংলাদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল তৎকালীন নালন্দা, সেই হেতু অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও বাধ্য হয়ে এরাজ্যে আসতেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনধীত বা অজ্ঞাত জ্ঞান আহরণ করা মাত্র। তা যে-কোন রাজ্যে বা যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন!

প্রবন্ধের শেষাংশে শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন, "ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার বোধ, আইনের শাসন, মিলিটারির উপর সিভিলের, শ্রেষ্ঠতা, অথরিটির উপর যুক্তির শ্রেষ্ঠতা।"

কথাগুলি নির্বিবাদে মেনে নেবার মতো। শ্রীযুক্ত রায় পন্ডিত ব্যক্তি একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেই একটি প্রশ্ন সবিনয়ে তুলতে চাই—পৃথিবীর বহু দেশের মুখ্যভাষা ইংরেজী নয়, তাই বলে কি একথা মেনে নিতে হবে সে সব দেশের গ্রন্থসমূহ থেকে শ্রীযুক্ত রায়ের কথিত বক্তব্য অনুধাবন করা যায় না? না তাঁদের শিক্ষা ও বোধের মান নিম্নতর? ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র, শাসন ও শৃঙ্খলা—এ সম্বন্ধে রুশ দেশের মানুষের ফ্রান্সের জনগণের ধারণা কি ইংরেজদের থেকে কম আছে? যদি এঁদের তুলনায় হীনতর মনে না করা হয় তাহলে একথা প্রমাণিত হবে যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যম ছাড়াও উচ্চতর ধ্যান-ধারণা জন্মাতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দোষ করলো কোথায়? ইংরেজীকে নির্বাসন দেবার কথা কখনোই ওঠে নি, বরং একথা বহুবার বলা হয়েছে এই ভাষাকে আমরা বর্জন করবো না গল্পের দুয়োরাণীর মতো।

আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সতোন বোস নানা আলোচনাসভায় বলেছেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে যে আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে তা যে দৃঢ়ভিত্তির পরে দাঁড়িয়ে নেই সে কথা

যেন আমরা ভেবে দেখি। প্রসংগক্রমে একদিন তিনি বলেছিলেন যে ফ্রান্সে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর সংগে দেখা করার পরই তিনি বললেন, যদি তাঁর কাছে কাজ করতে হয় তবে অধ্যাপক বোসকে ফরাসী ভাষা শিখে নিতে হবে। জর্মনীতেও এক অবস্থা। এখন কেন, আগেকার দিনেও যাঁরা জর্মনী বা ফ্রান্স বা অন্যত্র গেছেন বিদ্যাচর্চার জন্যে, তাঁরা সেদেশের কাজ-চালানো গোছের ভাষা শিখে যেতেন। তাই যদি হবে, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা আসবেন তাঁরা কেন এদেশের ভাষা শিখে আসবেন না। অধ্যাপক বোসের কাছে যাঁরা বিজ্ঞান পড়তে আসবেন নিজের গরজে, তাঁরা অবশ্যই বাংলা শিখে নেবেন। অধ্যাপক সি· ভি· রামন, ডাঃ ভাবা, অধ্যাপক শিশির মিত্র প্রভৃতির কাছে যাঁরা ছাত্র হয়ে আসবেন তাঁরা এঁদের ভাষা শিখে নিলে অবশ্যই নৈকট্য অনুভব করবেন এবং কাজেরও সুবিধে হবে।

ইংলণ্ডে যখন ল্যাটিন ভাষার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি, তখন কি ইংরেজরা তা শেখেন নি? ভারতের নালন্দার কথা ধরা যাক। সেখানে যাঁরা পড়তে আসতেন তাঁরা কি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রচলিত ভাষা শিখে নিতেন না? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি তেমন গুণপনা থাকে যার জন্যে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম, তাহলে তার টানেই ভারতের এবং বহির্ভারতের ছেলেরা বাংলাভাষা মোটামুটি শিখে নেবে।

আমার সহপাঠিদের বেশ কয়েকজন ছিলেন অবাংগালী এবং কয়েকজন বহির্ভারতীয়। অবাংগালীরা মোটামুটি বাংলা বুঝতে পারতেন, অল্প আয়াসেই তাঁরা শিখে নিলেন, আর অভারতীয়দের সে কি উদ্যম! আমি নিজে অ, আ, ক, খ শিখিয়েছি কয়েকজনকে—মাস ছয়েকের মধ্যেই কথা বুঝতে পারলেন তাঁরা। ফলে মাষ্টারমশাইরাও অনেক সময় বাংলাতে বলতেন পঠনীয় বস্তু। বলাবাহুল্য বৈজ্ঞানিক বা বাংলায় অপ্রচলিত শব্দ ইংরেজী ভাষাতেই রাখতেন। তিন বছর বাদে অবঙ্গভাষী ভায়েরা দিব্যি ওস্তাদ—আমাদের সংগে বাংলা ছাড়া কথা নেই—বাংলা সিনেমা, গান, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বুঝতে, পড়তে এমনকি লিখতেও বেশ সড়গড়। অনেক মাষ্টারমশাই ভালভাবে ইংরেজী বলতে পারতেন না, তাঁদেরও বেশ সুবিধে হলো।

অনেকে মনে করেন নানা রাজ্যে নানা ভাষা থাকলে ভারতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে—এ ধারণা অসত্য বলে মনে হয়।

প্রায় মাস দেড়েক হলো অধ্যাপক সত্যেন বোস আবার রাশিয়া ঘুরে এলেন—বললেন সে দেশের নানা অংশে নানা ভাষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করবার জন্যে নিজের ভাষা ভাল জানলেই যথেষ্ট। তবে একটি সর্বজনীন ভাষাও আছে। কিন্তু তাকে জোর করে সর্বত্র চাপানো হয় নি। ভারতেও কেন তেমন হওয়া সম্ভব নয়? ইংরেজীকে হটানোর প্রশ্ন তো ওঠেই না, বরং আমাদের দেশের ছেলেরা যদি রুশ, জর্মন, ফরাসী, জাপানী ভাষা শেখে তো আরো ভালো।

কিছুদিন আগে জাপানে গিয়ে জাপানীভাষায় সবকিছু করবার সার্থক প্রচেষ্টা দেখে এত ভাল লাগলো তা বলে বোঝানো যায় না। এমনকি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনও হলো ঐ ভাষার মাধ্যমে। বলা বাহুল্য বহু শব্দ ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনীর রয়ে গেছে তাঁদের রচিত গ্রন্থে। তাতে কিছু ক্ষতি নেই। 'হাইড্রোজেন' শব্দটা যদি ইংরেজী হয় তাহলেও রুশ বিজ্ঞানে ঐ শব্দটিই প্রচলিত। কতগুলি কথা আছে যা সমগ্র বিশ্বে এক—তা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দেশ তা করেন নি। এই ব্যবস্থা মেনে নিলে বাংলা তার নিজস্ব ভাষাকে পাটরাণী করলে ক্ষতি কোথায়? আর একথা সত্য যে বাংলায় উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক লেখা হবে যদি এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবেই। এপ্রসংগে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য, "শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয়

কী উপায়ে। শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তাহার কেয়ারি করিবে, কিম্বা আগাছাও নয় যে মাঠে মাঠে নিজের পুলকে তাহা কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।" (শিক্ষার বাহন)

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকরের বক্তব্যকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা আমার নেই, তা সত্ত্বেও সবিনয়ে এবং সসংকোচে বংগসরস্বতীর সাধক অন্নদাশংকরকে অনুরোধ করবো "ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত" প্রবন্ধে তিনি যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা কতদূর অমূলক তার পুনর্বিচার করতে।

অমিয়কুমার মজুমদার

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে

ইংরেজী মাধ্যম যে কী পরিমাণ ক্ষতি করে আমি তার ভুক্তভোগী। কিছুদিন আগেও আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলুম।

বছর দশেক হলো আমার মত ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। কেন, তার কারণ বলতে গেলে পুঁথি লিখতে হয়। সব চেয়ে বড় কারণ, আমাদের নেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে দেশ আর মধ্যযুগে ফিরে যাবে না, আধুনিক যুগেই থাকবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা দেশ আবার পৌরাণিক যুগে ফিরে যাবে। যদি না আমরা আধুনিকতার বনিয়াদ মজবুৎ করি।

হতে পারে আমার এই আশঙ্কা ভুল। কিন্তু এই আশঙ্কা যতদিন দূর না হয়েছে ততদিন আমার চিন্তাধারা ইংরেজী শিক্ষারই অনুকূল হবে। তা বলে আমি যুক্তিহীনভাবে গতানুগতিকের পক্ষে নই। নিচের দিকে বাংলা মাধ্যম ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। উপরের দিকেও ক্রমে ক্রমে হবে। কিন্তু কতক ছেলে যদি ইংরেজী মাধ্যমেই পড়তে চায় সে সুযোগ তাদের দিতে হবে।

অন্নদাশংকর রায়

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়। নীলরতন ধর। বিশ্বভারতী। ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ মালার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে পুস্তকখানি সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এরূপ একটি পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে জনসাধারণের মনের সংযোগ সাধনের যে পবিত্র কর্তব্য বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে তারই ফলে এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক পুস্তক সাধারণ্যে প্রচার করা সম্ভব হয়েছে।

পুস্তকখানি লেখকের প্রায় ২৫ বৎসরকালব্যাপী গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল। লেখক ভারতবর্ষের বিভিন্ন কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে যেমন কাজ করেছেন, তেমনি কৃষিকার্যে উন্নত বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণ করেছেন। ফলে পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে। তিনি শুধু জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় নিয়েই তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা এবং এই সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মাটীর প্রকৃতি অনুযায়ী জমির শস্য খাদ্য কি হওয়া উচিত। সার প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি দেখিয়েছেন জৈবপদার্থের ব্যবহার ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার উভয়ই জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উভয় জাতীয় সারের পারস্পরিক প্রয়োজন ও ব্যবহারের তারতম্য সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষকের জ্ঞান নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, এমনকি অতি আধুনিক পাশ্চাত্য কৃষি-বিদ্যাবিদদের গবেষণার ফল আমাদের অধিগম্য করেছেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের মাটীকে কৃষিযোগ্য করার উপায় ও জমিতে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি অনেক ভুল ধারণার নিরসন করে প্রচুর নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন,—পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান এবং এই সকল দেশে সারের অভাব হলেও শস্য উৎপাদন সম্ভব। তার প্রধান কারণ এই যে, সহজলভ্য সংযুক্ত নাইট্রোজেন এবং ফসফেট গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা শীতপ্রধান দেশের জমিতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ও ফসফেট অপেক্ষা অধিক। অথচ ভারতবর্ষে শস্য উৎপাদনের হার অন্যান্য বহুদেশ অপেক্ষা কম। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশের কৃষকগণ কোনও প্রকার সারই ব্যবহার করেন না। উন্নতিশীল জাতিরা জৈবপদার্থ জমিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। —সকল জাতীয় জৈব পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করলে ফসল ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।

তিনি দেখিয়েছেন—গোবর, মাতগুড়, খড়, পাতা, কুচরীপানা অথবা শহরের আবর্জনার সঙ্গে ক্ষারকীয় ধাতুমলচূর্ণ মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করার সময় ক্ষারকীয় ধাতুমল সৃষ্ট হয়; এতে চুন, ফসফেট, সিলিকেট, ভ্যানেডিয়াম, লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামঘটিত পদার্থ থাকে। অথচ সারের পক্ষে

প্রয়োজনীয় এই পদার্থটিকে আমরা এখনও ব্যবহার করি না। তিনি লিখেছেন,—অস্থিচূর্ণে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে। অস্থিতে সংযুক্ত নাইট্রোজেন থাকে। ধাতুমল ও অস্থিচূর্ণ এই দুই দ্রব্য জমির উর্বরতা বর্ধক ও শস্য উৎপাদনের সহায়ক। ভারতবর্ষ মৃত জন্তুর অস্থি বিদেশে বিক্রয় করে। অস্থি বিদেশে রপ্তানি করা অতিশয় গর্হিত কার্য। তিনি দুঃখের সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবহারের জন্য মাতগুড় পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মাতগুড় 'পাওয়ার অ্যালকহলে' পরিণত করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের বহু লোকের ধারণা সিন্ধ্রির ন্যায় কৃত্রিম সারের কারখানা আরও কয়েকটা স্থাপন করলে ভারতবর্ষের খাদ্যাভার দূর হবে। লেখকের মতে এ ধারণা ভুল। পৃথিবীর শতকরা কেবলমাত্র তিন ভাগ খাদ্য কৃত্রিম সংযুক্ত নাইট্রোজেনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়ে থাকে, অবশিষ্ট ৯৭ ভাগ খাদ্যই জমির সংযুক্ত নাইট্রোজেন থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং জমিতে এই ধরনের কৃত্রিম সার প্রয়োগ অপেক্ষা অল্পায়াসে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতিসাধন সহজসাধ্য।

জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহার সম্পর্কে তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—আমাদের দেশে অনেকস্থলে ট্রাক্টর চালনা করে জমি গভীরভাবে কর্ষণ করা হচ্ছে। এতে উর্বর জমির সংযুক্ত নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটরূপে পরিণত হয়ে ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। গভীর কর্ষণে জমির উর্বরতা সহজে নষ্ট হতে পারে। জমির উর্বরতা অধিককাল স্থায়ী করার জন্য পৃথিবীর বহু স্থানে ভূমিকর্ষণের গভীরতা হ্রাস করা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভূমিকর্ষণের গভীরতা হ্রাস করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই খাদ্যাভাব। অধিকাংশ লোকই অস্বচ্ছল। স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা দারিদ্র্য-পীড়িত লোকের সংখ্যার এক অষ্টমাংশ। অথচ পৃথিবীতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় লোকসংখ্যা অনুযায়ী সমানভাবে ভাগ করে দিলে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব লোপ পাবে এবং প্রত্যেক অধিবাসী প্রায় ৩২০০ ক্যালোরির খাদ্য দৈনিক আহার করতে পারবে। পৃথিবীর জনগণের মধ্যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ভাগ করে দিলে কারও জীবজ প্রোটীন বা ভিটামিনের অভাব হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীতে এই নীতি এখনও গৃহীত হয় নি। শুধু তাই নয়, অগ্রসর জাতিগুলি অভাব-গ্রস্ত জাতিগুলিকে খাদ্যোৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে না। এই প্রসঙ্গে লেখক অধ্যাপক লর্ড বয়েডওর যিনি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালক ছিলেন তার আবেদন উধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন,—"বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জাতিপুঞ্জ অভাব ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইউরোপীয় জাতিরা সৈন্যের সাহায্যে এই অভিযান রোধ করতে পারে অথবা এই সকল দেশকে কলকারখানা প্রস্তুত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করে সাহায্য করতে পারে। তারা যদি এই সব দেশকে সাহায্যের পরিবর্তে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তবে অবশেষে ইউরোপীয় জাতিরাই পরাভূত ও ধ্বংস হবে। সুতরাং অনুন্নত জাতিগণের উন্নতির চেষ্টা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য।"

আমাদের দেশে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে লেখক যে তথ্যবহুল ও জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তা পাঠ করে বাংলার কৃষিজীবীরা প্রচুর শিক্ষা লাভ করবেন। এমনকি সরকারী কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রের যাঁরা পরিচালক তাঁরাও এই বই পড়ে উপকৃত হবেন।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

টুই টুই।। শৈলেন ঘোষ প্রণীত, শিশু সাহিত্য বিতান, ৭৯।৫ বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম—দুই টাকা

সম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বহু ক্ষেত্র হয়তো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সম্পর্কে উজ্জ্বল হয়েছে; উপন্যাস গল্প ছাড়া রম্যরচনা, ভ্রমণ, কবিতা, ঐতিহাসিক পুস্তক প্রভৃতির সমাদর বিশেষ করে চোখে পড়ছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকের বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্য বিতানটি ক্রমাবনতির দিকেই প্রসারিত। এই বিভাগে যেমন পরীক্ষামূলক লেখকের অভাব তেমনি পাঠকের উপেক্ষাও চোখে পড়ে। নিতান্ত কিছু অপাঠ্য রহস্য পুস্তক আর পুরনো বিলেতি বইয়ের অনুবাদকে উপজীব্য করেই শিশু সাহিত্য যেন টিমটিমে বাতি জ্বালিয়ে ধুঁকছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত সাহিত্যের এই বিভাগটি বিশেষ ভাবে আলো জেলেছিল; রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকুমার রায় পর্যন্ত প্রতিটি লেখকের স্নেহ-স্পর্শে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য শিশু কিশোরদের জন্য রচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশবিভাগ স্বাধীনতা প্রভৃতির পর নৈরাশ্যপীড়িত সাহিত্যিকরা যেন বিমুখ হয়েছেন ছোটদের জন্য রচনায়। চতুর্দিকের অভাব-অনটন, জীবন সমস্যা থেকে কেউ আর কিশোরদের সামনে শান্তি প্রীতি সুন্দরের জয়গান করতে পারেন নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নগণ্য কিশোর সাহিত্যে আমাদের ক্লিষ্ট জীবনবোধই বিধৃত হয়েছে—ভবিষ্যতের জাতির পিতা যারা তাদের জন্য সামান্য আনন্দকেও সকলে ছড়াতে অপারগ হয়েছেন। এই অনিশ্চয়তা কতকাল স্থায়ী হবে যখন এ-রকম একটি দুশ্চিন্তা মনে দানা বাঁধছিল তখনই একটি কিশোরদের জন্য রচিত উপন্যাস মনে আশা আনল। বইখানির নাম টুই টুই।

টুই টুইর লেখক শৈলেন ঘোষ শুধু ছোটদের জন্য লিখতে বসেন নি—বরঞ্চ মনে হয় তিনি তাদের মধ্যে বসে তাদের মতো করে যেন গল্প পরিবেশন করছেন। তার এই প্রচেষ্টা শুধু সৎ নয়, নিষ্ঠার অঙ্গীকারে একাগ্র। যার ফলে টুই টুই-র শান্ত আর চুমকি আমাদের ঘরের যে কোনো ছেলে মেয়ের চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। রূপ কথার ঢঙে গল্পটি লেখা কিন্তু রূপকথা শুধু এখানে প্রতীকী হয়ে দাঁড়িয়েছে—শান্তিকামী আগামী পৃথিবীর দিকে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লেখক তার ছোট্ট পাঠকদের সামনে পাখির যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন তা অনবদ্য। নিষ্ঠুরতার চরিত্র রাজা, নিষ্ঠুর হয়ে যাবার জন্য তার জীবনের ট্র্যাজেডিতে ফ্যান্টাসী ব্যবহার এত স্বচ্ছ যা কখনো মিথ্যে বলে মনে হয় না। ছোটদের কল্পনার পাখা এ-সব ইমাজিনেশনে মুখে ভাসতে ভাসতে এক অপূর্ব স্বাদে ভরে ওঠে।

চুমকি আর শান্ত ভাই-বোন। ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্ক, একের প্রতি অন্যের দুঃখ, শোক কর্তব্যবোধ প্রতিটি মুহূর্তে রসের আস্বাদন দেবে। শৈলেন ঘোষ কেবল নিষ্ঠাশীল শিশু-সাহিত্যিক, একথা আর এ বইটি পড়ে বলা উচিৎ নয়—উপরন্তু এই বললেই ভাল শোনাবে যে প্রায় মৃত ছোটদের সাহিত্যে তিনি এক নতুন শক্তির মতো।

বই বা লেখকের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও টুই টুই শিশু সাহিত্যে একটি অনন্য গ্রন্থ। বইটির মনোরম দুরঙে ছাপা, প্রতিটি ছবি চোখকে টেনে রাখে। এ-রকম ছাপা বই এখনো খুব দুর্লভ বাংলা দেশে। ছবিগুলোর জন্যও বিমল দাস বা সুবোধ দাশগুপ্ত উভয়েই লেখককে তার গল্পটি সহজে বলতে সাহায্য করেছেন। সুতরাং ছোটরা তো বটেই, এমন কি আমার মতো পাঠকও ওদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অজয় দাশগুপ্ত

সোনালী ডানার চিল।। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ ৬নং বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। —দাম—২ টাকা।

যখন কবিতার এই রকম দশা চলেছে তখন কবিতা গ্রন্থের প্রকাশে অন্যান্য কবিতানুরাগীর মত আজিও যে খুসী হয়েছি তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অরুণবাবুর এই কবিতাগ্রন্থটিকে তাই স্বাগত জানাই। অরুণবাবু দীর্ঘকাল কবিতা লিখে আসছেন সুতরাং তাঁর এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ সুসংগত ও প্রত্যাশিত। কিন্তু দীর্ঘদিন কবিতা চর্চার পর যে পরিণতি কবির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা চলে, তার অনুপস্থিতি এই গ্রন্থে সুপ্রকট ও বেদনাদায়ক। বক্তব্যের অ-বিচিত্র বৃত্তে তাঁর কবিতাগুলি বিধৃত। মাঝে মাঝে কিছু কিছু বৈচিত্র দেখা গেলেও তা স্থায়িত্বলাভ করতে সক্ষম হয়নি। যেমন প্রেয়সী, কবিতার প্রথম চার লাইন বা চিরকালের গল্প— কবিতার কটা লাইন মনে বেশ নিবিড় অনুভূতির সঞ্চার করে, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই অনুভূতির স্বাদ ক্রমেই ক্ষীয়মান হয়ে আসতে থাকে। অথচ একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে কবিতা হচ্ছে স্বকীয় অভিজ্ঞতার অনুভব-সংবন্ধ ভাষারূপ। কবিতার সার্থকতার আর একটি লক্ষণ হচ্ছে রূপকল্পের সার্থক প্রয়োগ। অরুণবাবু কয়েক স্থানে কিছু ভাল রূপকল্প সৃজনে সফল হয়েছেন। যেমন—

দিনের কারখানায় তালা পড়ল,
এবার রাত্রির প্রহরী হেঁকে উঠবে
অন্ধকারের লাঠি উঁচিয়ে।
তারার বাতি জ্বলছে ঃ
পাহারাদারের আলো।

আবার স্থানে, স্থানে অতিপুরাতন বহু ব্যবহৃত রূপকল্পের পুনরাবৃত্তিতে কবিকর্মকে অসফলও করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকে মিল হীন কবিতার সংগে সংগে অরুণবাবু ছন্দোবন্ধ কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর ছন্দের হাত সুসংবন্ধ হলেও দু-একটি স্থানে ছন্দোপতন শ্রবণকে পীড়িত করে। যেমন—নজরুলের জন্মদিনে কবিতাটির শেষ স্তবকের তৃতীয় লাইন। কবিতাটি যদি ধ্বনিপ্রধান ছন্দে লিখিত হয়েছে বলে স্বীকার করি তবে ঐ লাইনটিতে স্পষ্ট ছন্দপতন লক্ষ্য করা যায়। আর কবিতাটি তানপ্রধান ছন্দে লিখিত বলে যদি স্বীকার করা যায় তবে অনেক আগেই ছন্দপতন হয়েছে দেখা যায়। তবে এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও এই কবিতা-গ্রন্থটি একদিকে থেকে প্রশংসনীয়। যখন চারদিকে অবক্ষয়ের বিকৃতির গ্লানি সাহিত্যে আসনলাভ করছে তখন আশা-বাদী কবিতা নিঃসন্দেহে আনন্দের সঞ্চার করে। গ্রন্থের নামকরণেই এই আশাবাদ সুস্পষ্ট। এদিকে থেকে কবিমনের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। আসন্ন ও চিরকালের গল্প কবিতাদুটি এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অংকণ শিল্পী চারু খানের। কিছু দিন যাবৎ তাঁর প্রচ্ছদ দেখে হতাশ হচ্ছিলুম এই প্রচ্ছদের আবির্ভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলুম। এই সুরুচিসম্পন্ন প্রচ্ছদের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। মোটকথা, সব মিলিয়ে এই গ্রন্থটি সকলের ভাল লাগবে এবং সেজন্য গ্রন্থটির প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

'd. No. C3597 Phone : 23-5155 Jan. '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Feb. '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমরায়োজনে চাই সোনা

কোথায় দিতে হবে:—

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে আপনি যে সোনা, অলঙ্কার ও অর্থদান করতে চান, নিম্নলিখিত দান-গ্রহণকারী ব্যাঙ্কে তা জমা দিতে পারেন:

—বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কলিকাতা, নূতন দিল্লী, নাগপুর ও কানপুরস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অফিস সমূহ; ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে কোন অফিস অথবা এর সহযোগী ব্যাঙ্কসমূহ, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, বিকানীর, জয়পুর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, সৌরাষ্ট্র ও পাতিয়ালার ষ্টেট ব্যাঙ্ক সমূহ।

নগদ টাকা বা চেকের দান নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলিতে দেওয়া যেতে পারে:

—সমস্ত রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক

—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল এ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, দেবকরণ নানজি ব্যাঙ্কিং কোং এবং জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা। এর জন্য ব্যাঙ্ক কোন কমিশন নেয়না। নগদ বা চেকে যত টাকা দেওয়া হয় তত টাকাই জমা করে নেওয়া হয়।

যে কোন পোষ্ট অফিস থেকে এক টাকা বা তার বেশী পাঠানো যায়। মনি অর্ডার পাঠানোর জন্য কোন কমিশন নেওয়া হয় না।

আমাদের সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার এখনই সময়

আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। সদা সতর্ক থাকুন, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন—**কারণ এটা আপনাদেরই যুদ্ধ**। যা করার **এখনই** করুন। জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুন ● সমস্ত রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং সব রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন ● খাদ্য ও বস্ত্র মূল্যবান জিনিষ। এগুলির অপচয় করবেন না ● সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান। ঘণ্টা বা দিন হিসেবে সময়ের পরিমাপ করবেন না, আপনি কতটুকু কাজ করলেন সেই অনুযায়ী সময়ের পরিমাপ করুন ● আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। সব সময়ে সব জিনিষ শৃঙ্খলার সঙ্গে করুন।

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

দশম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' উনসত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্র ॥

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

X-100
MOTOR OIL
X100
2T
SHELL
ROTELLA
OIL
FOR DIESELS
a winner every time...
you can be sure of SHELL

মাঘ তেরশ' উনসত্তর

দশম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

স ম কা লী ন

সার্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভারত বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। ভারতবিদ্যার একটি শাখা হিসাবে জোন্স, হোরেস্ হেমান্ উইলসন, হেনরী টমাস কোলব্রুক প্রভৃতি মণীষীরা সংস্কৃতভাষা চর্চার সহিত ভারতের পুরাতত্ত্ব চর্চা করিতে থাকেন। ইহাদের পর কলিকাতা মিন্টের পদস্থ কর্মচারী ও এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেমস্ প্রিন্সেপ ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অশোকলিপি গুলির পাঠোদ্ধার করতঃ ভারতের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম্ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবিভাগের ইঞ্জিনীয়ার রূপে ভারতে আসিয়া জেমস প্রিন্সেপের সংস্পর্শে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রৌঢ় প্রিন্সেপ্ ও তরুণ কানিং হামের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব ও গবেষণা সংক্রান্ত অবিরত আলাপ আলোচনার ফলে কানিংহাম ভারতের প্রত্নসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হন। প্রিন্সেপের সাহচর্যে অল্পকালের মধ্যেই তীক্ষ্ণধী কানিংহাম ভারতের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান অর্জন করেন যে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কাশ্মীরে প্রাপ্ত একটি রোমক মুদ্রা সম্বন্ধে প্রচলিত তথ্যকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় জেমস্ প্রিন্সেপের সাহচর্য কানিংহাম্ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারেন নাই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রিন্সেপ পরলোক গমন করেন।

আলেকজাণ্ডার কানিং হাম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডের ওয়েস্টমিনস্টার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এলেন কানিংহাম ব্যক্তিগত জীবনে

ছিলেন একজন কবি, স্থপতির কর্ম করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আলেকজাণ্ডার কার্নিংহাম লণ্ডনের ক্রাইষ্ট হস্‌পিটাল নামক শিক্ষায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি ও তাঁহার এক ভ্রাতা পিতৃবন্ধু স্বনামধন্য সার ওয়াল্টার স্কটের চেষ্টায় সমরশিক্ষার্থী ছাত্র রূপে সৈন্যবিভাগে গৃহীত হন। বিভিন্ন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সাভান্তে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্স বিভাগের দ্বিতীয় লেপ্টনান্টের পদ লাভ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতে আসিয়া কলিকাতায় বাস কালেই তিনি জেমস প্রিন্সেপের সহিত পরিচিত হন। সামরিক বিভাগের কর্মচারী রূপে কানিংহামের জীবন বৈচিত্র্যময় ছিল। ১৮৩৬ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের দেহরক্ষী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতেই কানিংহামের বিবাহ হয়। তাহার পত্নী এলিশিফ ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ হুইশের কন্যা। বিবাহের পরই কানিংহাম অযোধ্যার রাজার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র নিযুক্ত হন। লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কালে তাঁহাকে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিতে আহ্বান করা হয়। বিদ্রোহ দমিত হইলে তাঁহাকে মধ্যভারতে সামরিক কার্যে নিযুক্ত রাখা হয়। ১৮৪৪-৪৫ এই একবৎসর তিনি গোয়ালিয়র ষ্টেটে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়রের কাজ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে পাঞ্জাব প্রদেশ যাইতে হয়। প্রথম শিখ যুদ্ধের অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ইংরাজের অধিকার ভুক্ত হইলে সার জন লরেন্স উহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি কাংড়া ও কুলু উপত্যকা অধিকার করার ভার কার্ণিংহামের উপর অর্পণ করেন। অপূর্ব সামরিক প্রতিভা দেখাইয়া কানিংহাম এই অঞ্চল অধিকার করেন। ইহার পর তিনি সরকারী নির্দেশে কাশ্মীরের লাডক্ ও তিব্বতের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দেন। বাওহালপুর ষ্টেটও রাজপুতানার বীকানীর ষ্টেটের ও তিনি সীমানা চিহ্নিত করিয়া দেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯) কানিংহাম সামরিক ফিল্ড ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। শান্তিস্থাপিত হইলে তিনি গোয়ালিয়র প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় পূর্তবিভাগের অধিকর্তার কার্যে যোগদান করেন অতঃপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহামকে মুলতানে বদলী করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি লেপ্টন্যান্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হন। এই বৎসরেই ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলে কানিংহামকে বার্মায় চীফ ইঞ্জিনীয়ার রূপে প্রেরণ করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ্ ইঞ্জিনীয়রের কার্যে যোগদান করেন, এই সময়ে তিনি মেজর জেনারেলের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

সরকারী পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব পূর্ণ পদে এমন কি একান্তভাবে সামরিক কার্যে নিযুক্ত থাকা কালেও কানিংহাম ভারতীয় পুরাতত্ত্ব চর্চায় কোন সময়েও বিরত থাকেন নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে ও দায়িত্বে তিনি সারনাথের ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যসমূহের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্বে কোন ঐতিহাসিক সারনাথের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করেন নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সরকারীকার্যে কাশ্মীরযাত্রার সুযোগে কানিংহাম তথাকার মন্দিরসমূহ উত্তম রূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে গবেষণা মূলক এই রচনাটি ঐতিহাসিকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র ষ্টেটে পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ থাকাকালে কানিংহাম ভুপালরাজ্যের সাঁচী ও মধ্যপ্রদে-

শের আরও কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ নিজ দায়িত্বে খনন করেন। এই খননের বিবরণ লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই বিষয়ে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয় (দি ভীল্সা টোপস্ঃ অব্ বুধিষ্ট মনুমেন্টস্ অব্ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়াঃ কমপ্যারাজিং ব্রিফ হিষ্টোরিক্যাল স্কেচ্ অব্ দি রাইজ্, প্রোগ্রেস্ এ্যাণ্ড ডিক্লাইন অব বুদ্ধিজিম উইথ ৩৩ প্লেটস, পি পি ৩৬৮, ১৮৫৪) এই পুস্তকটি পুরাতত্ত্বের ভিত্তিতে লিখিত ইতিহাস পুস্তক হিসাবে বিদ্বজ্জনের অভিনন্দন লাভ করে। এই গ্রন্থে স্তম্ভ ও বেষ্ঠনী গাত্রে খোদিত লিপি মালার পাঠোদ্ধার ও তাহাদের ইংরাজী অনুবাদে কানিংহামের নৈপুণ্য ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম রচিত "লাদক, ফিজিক্যাল, ষ্টাটিস্টিক্যাল এ্যাণ্ড হিষ্টোরিক্যাল" নামীয় পুস্তক সরকারী ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। লাড্ক সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যসমৃদ্ধ এই পুস্তকটির উপযোগিতা শতাধিক বর্ষ পরে ও হ্রাস পায় নাই।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কানিংহাম বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি কলিকাতার ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং লণ্ডনের মুদ্রাতত্ত্ব সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কয়েন্স অব্ ইণ্ডিয়া পুস্তকটি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগের মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কানিংহাম একজন পথিকৃৎ বলিয়া বিবেচিত হন। কানিংহামের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের বহু পূর্ব হইতেই ভারতে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বস্তু উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে কানিংহাম কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবে সুসংবদ্ধরূপে কার্যধারা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি সর্বস্তরের ঔদাসীন্য কানিংহামের মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল, এ যাবৎ এই বিষয়ে যে সামান্য অগ্রগতি হইয়াছিল তাহা প্রিন্সেপ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় প্রত্ন—প্রেমিকদের ব্যক্তিগত সাধনার দান—কানিংহাম ইহা পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এর নিকট ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করেন। লর্ড ক্যানিং সহানুভূতির সহিত এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তন করিতে সম্মত হন। তিনি কানিংহামকেই এই বিভাগের দায়িত্ব লইতে আহ্বান জানান। অতঃপর কানিংহাম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক পদ গ্রহণ করিলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হয়। গতপূর্ব বৎসর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারত সরকার বিশেষ ডাক টিকিট বাহির করেন। পুরাতত্ত্ব সমীক্ষকের পদলাভ করিয়া কানিংহাম সামরিক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কার্যভার গ্রহণ করিয়া কানিংহাম পাঞ্জাব, এবং যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের পুরাকীর্তিগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিস্তৃত প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তুত করেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই চারিবৎসরের রিপোর্ট দুইখণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিলোপ সাধন করা হইলে আলেকজাণ্ডার কানিং হাম্ স্বদেশে প্রত্যাবির্তন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কানিংহামের সুবিখ্যাত পুস্তক "এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়া, ভ্যলুম ওয়ান, বুদ্ধিষ্ট পিরিয়ড" ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ও চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বিবরণীর ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগুলির বর্ত-

মান সংস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহার সমকালীন সময় পর্যন্ত গবেষণা লব্ধ তথ্যগুলি দ্বারা কানিংহাম তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ব্যাপকতর গবেষণার ফলে এই পুস্তকে প্রকটিত কানিংহামের কোন কোন সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হইলেও এই পুস্তকের মর্যাদা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতের ইতিহাস জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই পুস্তকটি বর্তমানেও একটি অপরিহার্য আকর গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কানিংহামের কালে অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে ভারতে গমনাগমন ব্যবস্থা অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, ইহা সত্ত্বেও অতি দুর্গম অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহে কানিং হাম যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময় জনক।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করেন। এই বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ পদ গ্রহণের অনুরোধ পাইয়া কানিংহাম ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে পুনরায় ভারতে আসিয়া এই কর্মভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়সে কানিংহাম এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৮৫ এই পঞ্চদশ বর্ষকাল বৃদ্ধ কানিংহাম ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশিলা হইতে পূর্বভারতের বাঙ্গলার গৌড় পর্যন্ত ভূভাগ যুব জনোচিত উৎসাহ ও সামর্থ্য সহ একাধিক বার পরিক্রমণ করিয়া বহু অজ্ঞাত পুরাবৃত্ত ও স্থান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবৃহৎ আকারে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত বিভাগীয় রিপোর্টের ১৩টি খণ্ডে কানিংহাম কর্তৃক পরিদৃষ্ট স্থান সমূহের তাঁহারই লিখিত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকী ১১টি খণ্ডে রিপোর্ট কানিংহামের সহকর্মিরা তাঁহারই নির্দেশ মত রচনা করিয়াছিলেন। কানিংহাম লিখিত রিপোর্ট গুলিতে পাঁচ শতাধিক স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, অনেক স্থলে গুরুত্বপূর্ণ একই স্থান বার বার পরিদৃষ্ট হওয়ায় একই স্থানের বিবরণ একাধিক রিপোর্টের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কানিংহাম রচিত এই রিপোর্টগুলির কোন কোনটিতে ভারতীয় মুদ্রার আলোচনাও স্থান পাইয়াছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় মুদ্রাতত্ত্বকে কানিংহাম সবিশেষ মর্যাদা দিতেন। কানিংহামের সময়ে রচিত এই ২৪ খণ্ড রিপোর্ট ভারতের ইতিহাস চর্চার পক্ষে অপরিহার্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে এই রিপোর্টগুলির ভিত্তিতেই অনুসন্ধানের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, এমন কি রিপোর্টের ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটি গুলিও গবেষকদের সত্য নির্ণয়ে প্রভূত সহায়তা দান করিয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীর বিংশ ত্রিংশ দশকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ও প্রাচীনতা প্রতিপাদনের কৃতিত্ব ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থার সার জন মার্শাল, মার্টিমার হইলার, আর্নেষ্টম্যাকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার, দয়ারাম সাহনী প্রভৃতির প্রাপ্য। কিন্তু বর্তমানে একথা অনেকেই জানেন না যে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ইরাবতী নদী সংলগ্ন হরাপ্পা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি বিচিত্র "ছাপ" আবিষ্কার করেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় রিপোর্টের পঞ্চমখণ্ডে (১৮৭৫) কানিংহাম এই অঞ্চলের অতি প্রাচীনতা ও প্রত্নদ্রব্য সমৃদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং কানিংহামকে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম রচিত "করপাস ইনিস্‌ক্রিপ্‌সনাম ইণ্ডিকারাম ভল্যুম ১" কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে এযাবৎ আবিষ্কৃত অশোকলিপিগুলির ফটো চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভরাহুত সম্বন্ধে কানিংহামের আর একটি সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হয় (দি স্তূপ অ্যাট্‌ ভরাহুত) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অব্দ সম্বন্ধে তিনি আরও একটি

পুস্তক প্রকাশ করেন (দি বুক অব্ ইণ্ডিয়ান এরাস)। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে কানিংহাম পুরাতত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। অবসর গ্রহণের কিছু কাল পূর্বে দূর অঞ্চলে হস্তি-পৃষ্ঠে ভ্রমণের সময় তিনি ভূপতিত হন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। অর্থাভাব ও সরকারী ঔদাসীন্যের জন্য কানিংহামের ক্ষমতা পরিমিত ছিল। পুরাতত্ব সমৃদ্ধ স্থানগুলি তিনি ইচ্ছামত খনন করিতে পারেন নাই। নিজ দায়িত্বে ও কোন কোন সময়ে নিজ অর্থব্যয়ে তিনি কোন কোন স্থানে খনন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক স্থান সমূহ খননের কাজ সরকারী উদ্যোগে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে লর্ড কার্জনের শাসন কালে আরম্ভ করা হয়। এই খনন কার্যে কানিংহামের রিপোর্টগুলি উত্তরকালের কর্মকর্তাদের প্রভূত সহায়তা দান করিয়াছিল।

অবসর গ্রহণের পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কানিংহামের সুবিখ্যাত পুস্তক "মহাবোধি অর্ দি গ্রেট বুধিষ্ট টেম্পল্ আণ্ডার দি বোধি ট্রি অ্যাট্ গয়া" ৩১ খানি চিত্র সহ প্রকাশিত হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধ গয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তী, সাঁচী, মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতির স্থানগুলির প্রাচীন গৌরবের কথা কানিংহামই সর্বপ্রথম লোক লোচনের গোচরীভূত করেন।

কানিংহাম তাঁহার দীর্ঘ ভারত বাস কালে বহু প্রত্নদ্রব্য বিশেষতঃ প্রাচীন মুদ্রা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিভিন্ন বিভাগকে তিনি বহু প্রত্নদ্রব্য বিশেষভাবে ভরাহুত ও সাঁচীর নগরতোরণ, স্তম্ভ, বেষ্ঠনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহ ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে জাহাজে করিয়া ইংল্যাণ্ডে প্রেরণের সময় জাহাজ ডুবির ফলে চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিছু প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার নিকট ছিল—ঐগুলি তিনি সঙ্গে করিয়া ইংল্যাণ্ডে লইয়া যান। এইগুলি তিনি ক্রয়মূল্যে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে দান করেন। এইগুলি সযত্নে বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর সাউথ কেনসিংটনে কানিংহামদীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কানিংহাম বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সি এস্ আই (১৮৭১), সি আই ই ('১৮৭৮), কে, সি, এস, আই (১৮৮৭) প্রভৃতি উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মনোরম ব্যক্তিত্বশালী কানিংহামের অগণিত বন্ধু, ভক্ত ও শিষ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি ও অধ্যবসায় সম্পন্ন পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক চেষ্টায় যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময় জনক। আমরা উচ্চশিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝি সেই হিসাবে কানিংহামকে উচ্চ শিক্ষিত মোটেই বলা চলে না। জীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন কি উচ্চ শিক্ষাও লাভ করেন নাই। নিজের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং এই বিদ্যার পরিধিকে বহুদূর সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কানিংহাম ভারতের পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বহু সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করিয়া যান, ইহাঁদের মধ্যে জেমস্ বারগেস্, জে, ডি, বেগ্লার; এ, সি, এল্ কারলেলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে বাংলার প্রভাব

চণ্ডী লাহিড়ী

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৫ বৎসর কেটে গেল। এতদিনের মন দেওয়ার পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে পারস্পরিক ঋণ কতখানি। আমরা কতখানি গ্রহণ করেছি, তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি, ভালই জানি। তরু দত্ত বা সরোজিনীর বিদেশী ভাষাশ্রিত কবিতার সাফল্যে আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, অক্সফোর্ডে ভারতীয় অধ্যাপককে অধ্যাপনা করতে দেখে বা সিবিল সার্বিসে ভারতীয়কে প্রথম স্থান অধিকার করতে দেখে নিজেদের দ্বিজোত্তম সাহেব ভেবে বিদেশী পুচ্ছ উচ্চে তুলে নেচেছি। কিন্তু অপর সরিক। কতখানি গ্রহণ করেছে তার হিসাব নেওয়া হয়নি। একটি বৃহৎ গবেষণার ক্ষেত্র এখনও অকর্ষিত রয়ে গেছে। স্মরণ রাখা দরকার, অপর সরিক কেবল ইংরেজ নয়, ফরাসী জার্মানী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও রাশিয়ানদের সঙ্গেও আদান প্রদান বড় কম হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে, বেড়েই চলবে।

ভারতীয় সাহিত্যে, অন্তত বঙ্গ সাহিত্যে ইংরেজ প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী ফরাসী বা জার্মন সাহিত্যে ভারতের প্রভাব কতখানি তার পরিমাপ করার কোন চেষ্টা হয় নি।

ভারতের প্রতি ইংরেজদের অত্যুৎসাহী দৃষ্টিপাত প্রথম ঘটে পলাশী যুদ্ধের কিছু দিন পরেই, সিরাজের পরিত্যক্ত রাজকোষের অর্থ ও দুর্নীতিদুষ্ট ব্যবসায়ের রন্ধ্রপথে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার সামান্য অবস্থা থেকে রাতারাতি নবাবে পরিণত হন। ও দেশে বলত নাবুব বা নাবব। এইসব হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচি ও ধরাকে সরাজ্ঞান করার চেষ্টা বিশ্বের সবদেশের মত ইংলণ্ডেও ঘটল। হঠাৎ নবাবদের চালচলন ও বহ্বাস্ফোটভাব বিলেতের কমেডিয়ান ও নাট্যকারদের দৃষ্টির আকর্ষণ করল।

১৭৭২ সালে স্যামুয়েল ফুট লিখলেন নাটক—দি নাবব। ফুট তাঁর স্মৃতিকথায় সমসাময়িক ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজদের আচরণ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের প্রভাব সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন।

"এই সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বহু কর্মচারীর বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তারা অতিসামান্য পদ আশ্রয় করে নগণ্য অবস্থা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছে । শুধু এখানেই শেষ নয়। জনসাধারণ, বিশেষতঃ সমাজের অভিজাত মহলের ক্ষোভের আরও কারণ এই যে, ভারতফেরৎ এইসব ইংরেজ নিছক অর্থের জোরে ও ব্যয়বহুল সমারোহের আয়োজন করে বহু বনেদী পরিবারকে পার্লামেন্টের আসন থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। তাই নয়, গ্রামাঞ্চলে আড়ম্বড়পূর্ণ প্রাসাদ বানিয়ে বর্ণাঢ্য জীবনযাপন প্রণালীর মধ্য দিয়ে বহু বনেদী ঐতিহ্যময় পরিবারের দীপ্তি ম্লান করে দেয়।"

হঠাৎ নবাবদের জীবনধারা ফুট প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৭৭২ সালে তাঁর 'দি নাবব' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। 'দি নাবব" নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র সার ম্যাথু মাইট। নাটকে তাঁর পিতা একজন মাখনওয়ালা। তিনি নিজে ইষ্ট ইন্ডিজে গিয়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছেন। নাট্যকার এই হঠাৎ বড়লোকটির বিলাসী জীবনযাপন ও

ভণ্ডামীর প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। নাটক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়ল নাটকের প্রধান চরিত্র সার ম্যাথু আর কেউ নয়, ইনি অমুক লোক। সেই অমুক ব্যক্তিটি সত্যিই ভারতথেকে প্রভূত অর্থ কামিয়ে ফিরে এসেছিলেন, এবং কাকতালীয়বৎ তাঁর পিতাও ছিলেন মাখনওয়ালা। নাট্যকার সত্যই তাঁকে অবলম্বন করেই নাটক লিখেছিলেন কিনা জোর করে বলা যায়না কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করা শক্ত। অচিরে ঐ ভদ্রলোকের কাণেও কথাটা উঠল। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিজনবর্গ গেলেন ক্ষেপে। ওক গাছের ডাণ্ডা হাতে করে তাঁদেরই একজন অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন হাজির হলেন নাট্যকারের দরজায়।

নাট্যকার হিউ ফুট তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং পরিশেষে জানালেন,—ব্যঙ্গ-নাট্যকার রূপেই তাঁর জন-পরিচিতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা অশালীন আচরণ করেছেন তাঁদের অবলম্বন করে সাধারণভাবে যদি তিনি নাটক লিখে থাকেন তবে অন্যায় কিছু হয়নি, বরং জনসাধারণ তাঁর কাছে এই ধরণের সত্যউন্মোচনকর্ম আশা করে থাকে।

এটা হল হেষ্টিংস-পূর্ব যুগের ঘটনা। এর পরেই ভারতে নন্দকুমারের ফাঁসি এবং বিলেতের পার্লমেন্টে এডমণ্ড বার্ক কর্তৃক কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন পর্ব। হেষ্টিংসের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত পরোক্ষ। যেখানে প্রত্যক্ষ সেখানেও বাস্তববর্জিত ভাববিলাসিতা প্রশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু এসব থেকে অন্ততঃ একটি বিষয়ের উপলব্ধি সম্যক হতে পারে—

তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরেজমনে ভারত সম্পর্কিত ধারণা কেমন ছিল সেটা জানা যায়। ধরা যাক কাউপারের কবিতার নিম্নোক্ত ছত্র—

The Brahmin kindles on his own bare head
The sacred fire, self-torturing his trade!
His voluntary pains, severe and long
Would give a barbarous air to British song.
No grand enquisitor could worse invent
Than he contrives to suffer, well-content.

প্রার্থনারত ভারতীয়দের সৌম্য শান্ত মূর্তি তিনি দেখেছেন এবং তার সঙ্গে উপমিত করেছেন লণ্ডন সহরের

The villas with which London stands begirt
Like a swarth Indian with his belt of beads.

পোপের একটি কবিতায় সতীদাহের কথা উল্লেখ আছে, সতীদাহ সম্পর্কে পোপের যে কিছু ধারনা ছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। লেডী মেরী মন্টেগু ছিলেন পোপের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁকে পোপ ১৭১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের এক পত্রে জানিয়েছেন যে জজ হার্ভে ও সারা ড্রু নামক এক প্রেমিক দম্পতি আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছে। তাদের সমাধিস্তম্ভের জন্য কবি দুছত্র কবিতা লিখেছেন। এই কবিতায় প্রেমিক প্রেমিকার যুগল-মৃত্যুর সঙ্গে পোপ সতীদাহের উপমা দিয়েছেন

When Eastern lovers feed their funeral fire
On the same pile the faithful pair expire.

ইওরোপের ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জন্ম ১৭৪৬ সালে। হ্যারোতে থাকতেই আয়ত্ব করেছিলেন আরবী ও হিব্রু। ১৭৮৩ সালে কলকাতায় আসেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হয়ে। কলকাতায় পৌঁছবার আগেই তিনি শিখেছিলেন গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মন, স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ, আবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষা। আর কলকাতায় পা দিয়েই সুরু করেন সংস্কৃত চর্চা এবং অচিরে নির্বাচিত হন সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৭৮৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এশিয়াটিক রিসার্চ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ শেষ করেন। কলকাতায় আসার আগেই আরবী সাহিত্যের ভাব আহরণ করে তিনি ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখেছিলেন পরে কলকাতায় সুরু করলেন ভারতীয় পুরাণাদি আহরণ ও স্বীকরণ। ভারতীয় পুরাণাদির বিভিন্ন চরিত্র বহুবার তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।

কামদেব, দুর্গা, ভবানী, ইন্দ্র, সূর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী ও গঙ্গাকে অবলম্বন করে তিনি ইংরেজীতে রচনা করেছেন স্তোত্র সূর্যকে অবলম্বন করে তাঁর যে কবিতা তাতে সঞ্জীবিত হয়েছে ভারতীয় ভক্তিরস —

Fountain of living light
That o'ver all nature streams
Of this vast microcosm both nerves
Whose swift and subtil beams
Eluding mortal sight,
Pervade, attract, sustain, th' effulgent whole
Unite, impel, dialate, calcine,
Give to gold its weight and blaze
Dart from the diamond many limid rays
Condense, protrude, transform, concoct, refine
The sparkling daughters of the mine.

সার উইলিয়ম জোন্সের কথায় প্রসঙ্গত মেকলের নাম মনে পড়ে। অবশ্য বিপরীত কারণে। ভারতের বহু ক্ষতিসাধনের হোতা মেকলে ছিলেন জোন্সের সমসাময়িক। জোন্স যখন বেদ-পুরাণাদি পাঠকরে ভারত-তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে রত, মেকলে সে সময় কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটিয়েছেন। ভারতকে, তার চিত্তের মহৎ ঐশ্বর্যকে উপলব্ধির কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎখাত করে পশ্চিমী শিক্ষার ধারা প্রবর্ত্তনের মূল্যে তাঁর ভারতপ্রেম কণামাত্রও ছিল না, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল পূর্ণমাত্রায়। বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অতি অশোভন——॥ "বিদেশী পদাশ্রিত থাকায় উপযোগী দৈহিক গঠন ও মানসিক গড়নের দিক থেকে বাঙ্গালীর মত এমন যোগ্য জাতি বিশ্বের কোথাও নেই।"

ভারতাশ্রিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে হার্টলি-হাউসের নাম প্রথমেই স্মর্ত্তব্য। কেম্ব্রিজ হিষ্টরী অব ইংলিশ লিটারেচরের মতে—ভারত থেকে ইংলণ্ডের বন্ধুদের জন্য প্রথম মহিলা লিখিত জার্নাল হল এই গ্রন্থ। ভারতস্থ ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে পত্রালাপের আকারে জনৈক মহিলা নাকি এই ব্যঙ্গ-গ্রন্থটি রচনা করেন। বৃটেনের মধ্যবিত্ত সমা-

জের কন্যারা ভারতের প্রাচুর্য ও বিলাসবহুল সামাজিক পরিবেশে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে কী রকম চালে চলেন তারই বিবরণ এই গ্রন্থ। বিলেতে থাকাকালে ইওরোপীয় কালচারের বিশেষ কিছু আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিকে ভারতে পদার্পণের সংগে সংগেই ইংরেজ যুবকরা তাদের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মোহিত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে নবাব-নন্দিনীর মত বিলাসিতা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যের কথা তারা ভাবতে পারে না। "কলকাতায় মেমসাহেবদের বিবেচনাবোধ বলে কোন কিছু নেই। এক বেলায় বাজারে গিয়ে চার পাঁচ হাজার পাউণ্ড খরচ করে আসার কথাও শোনা যায়। যদি কোন স্বামীকে বলা হয় যে তোমার স্ত্রীকে অমুক দোকানে প্রবেশ করতে দেখলাম তো স্বামী বেচারীর মুখ তৎক্ষণাৎ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়।"

থ্যাকারে ও কিপলিং দুজনেই এদেশে জন্মেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁদের অবদান স্বীকৃত হলেও তাঁদের ভারতপ্রেম সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারের বাবা ডাঃ টমাস থ্যাকারে প্রথম ভারতে আসেন। পুত্র উইলিয়ম বিয়ে করেন কলকাতায় শ্রীমতী এমিলিয়া রিচমণ্ড ওয়েবকে। তার ছেলেদের অনেকেই এই ভারতের মাটিতেই মারা যায়। ভারতের সংগে তাঁর সুদীর্ঘ দিনের সম্পর্ক কিন্তু ভারতপ্রীতির কোন লক্ষণ কোথাও নেই। তবু যখন "দি নিউকামস্" পড়তে বসি, ফিরে যাই পুরানো দিনের কলকাতার সাহেব পাড়ায়।

কিপ্‌লিং তো সোজা কথায় ঘোষণা করেছিলেন, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। সেজন্য নিন্দিত হয়েছেন কম নয়। কিন্তু কলকাতায় উৎপত্তি সম্পর্কে লঘুসুরে যে কবিতা তিনি রচনা করেছেন সেটা একালেও সত্য—

Chance-directed, chance-erected, laid and built
On the silt.
Palace, myre, hovel—poverty and pride, side by side,
And above the packed and pestilential town
Death looked down."

ঐশ্বর্য ও দারিদ্র প্রাসাদ ও বস্তির বিচিত্র সহাবস্থান—এই হল কলকাতা, তার সেকাল ও একালের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট। আমাদের ঠুনকো সম্ভ্রমবোধে আঘাত দিলেও কিপলিং অসত্য উক্তি করেননি।

প্রথিতযশাদের অন্যতম বিশপ হেবারের বহু কবিতা কেবল যে ভারতে অবস্থানকালে রচিত এমন নয়, পরন্তু বিষয়বস্তু ভারত থেকে আহৃত। গঙ্গায় নৌকাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় লেখা কবিতাগুলি একদা বহুলপরিমাণে আলোচিত হয়েছে। কলকাতার নিজস্ব সন্ধ্যা, ঝিঁঝির ডাক, পেঁচকের কর্কশ চীৎকার চৌকিদারের হাঁক কিছুই তাঁর কাব্যে বাদ পড়েনি।

শ্রীমতী এমা রবার্টস সেকালীন অর্থে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, কিন্তু হাফ-কাষ্ট নন। একপুরুষ পূর্বেই তাঁদের পরিবার ভারতবাসী হয়। এমা ভারতকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর কাব্যে ভারতবাসীর আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, উন্নাসিক অনুকম্পা পরোক্ষেও আত্মপ্রকাশ করেনি কোথাও। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে নীলকর চাষীদের, শ্রীমতী ষ্টোর আঙ্কল টমস কেবিনে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দুঃখজর্জর জীবনের মর্মবেদনা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্রীমতী এমা রবার্টসের একটি কবিতায় ততোধিক নিষ্ঠায় মূর্ত হয়েছে ভারতের সদ্যো-বিধবার দুঃখ। সতীদাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভারতীয় রমণীদের সাহচর্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, তাই সতীর

বিলাপ কবিতায় অতি রূঢ় সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। মৃত স্বামীর চিতায় আবদ্ধ অসহায় সতী, সহস্র সামাজিক নাগপাশে আবদ্ধ তার জীবন—তবু, মৃত্যু একমাত্র নিয়তি জেনেও সতীর কণ্ঠে একবার উচ্চারিত হল বিদ্রোহ।

"Think not accursed priests, that I will lend
My sanction to those most unholy rites,
And though you funeral pile I may ascend,
It is not that your stern command affrights.
My lofty soul,—it is because these hands
Are all too weak to break my sex's bands."

এমা রবার্টস্, বঙ্গদেশে বাস করেন নি, উত্তর ভারত ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। কিন্তু তিনি কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন সর্বভারতীয় পশ্চাদপট নির্বাচন করেছিলেন যে তাঁর নামোল্লেখ না করলে অশোভন হবে।

সেকালের কলকাতাবাসী ইংরেজদের অনেকেই সমসাময়িক নগরজীবনের কথা লিখেছেন। কিন্তু হেণ্ডারসন সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যিনি "বেঙ্গলী" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দেওয়ার কারণও উল্লেখ করেছেন—

"সোনার বাংলা, আমি
তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

এটা রবীন্দ্রনাথের বহু আগে হেণ্ডারসন লিখেছেন, অবশ্য তাঁর ভাষায়।

বাংলার সমরসাহিত্যের গৌরচন্দ্রিকা

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

সাজিল আগরি ভুঞা দক্ষিণ হাজরা
আট হাজার ঢালি সঙ্গে যেন খসে তারা
পাঞ্জা পাইক সাজিল কোমরে ঘাগর
গলায় ওড়ের মালা হাতে ধনুশর

* * *

সাজিল হাথির পিঠে বঙ্গমিঞা কাজী
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ গাজী।

ধর্ম মঙ্গল ঃ রূপরাম চক্রবর্তী

বাংলার সাহিত্যশরীরের সর্বাঙ্গে এখনও যৌবনশ্রী প্রতীক্ষিত। এখনো, কিশোরীর লঘুচাপল্যে যেমন তার স্বভাবস্বাচ্ছন্দ্য, যুবতীর যুক্তিগাম্ভীর্যে ততটা নয়। এবং আর একটু এগিয়ে, ভাবালুতায় প্লুত হওয়া যেমন মজ্জাগত, তর্কতৎপরতায় তেমন নয়। ফলত, কোমলকান্ত পদাবলীর প্রতুলপর্যাপ্তি। অথচ, বজ্রনির্ঘোষের বড়ই অভাব। একতারার একতান হয়তো অবিরত। কিন্তু, রুদ্রবীণার সপ্তসুরের ঐকতান অশ্রুত। জানি, উৎসন্ধানে ঐতিহাসিক হয় তো হাজির হবেন আর্য-অনার্য সংঘর্ষে। প্রমাণ করতে চাইবেন, যদিও যুক্তিনিষ্ঠ আর্যরা অনার্য বাংলায় ঢুকে পড়েছিল তবু নির্ভেজাল আর্যামি বাংলায় কোনকালেই আমল পায় নি। ভাবালুতা মিশে আছে তার প্রাণে, মিশে আছে তার রক্তের সঙ্গে। দোয়ার্কি ভৌগোলিকতনার একটু চরায় সুর তুলবেন, শস্যশ্যামলা পলল মাটিতে, প্রকৃতি-ই যেখানে জীবনধারণের প্রকৃত সহচরী, সংগ্রাম-এষণা সেখানে আসবে কোথা থেকে। এবং পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, সেই স্বর্ণালী অতীতের স্মৃতি-তর্পণে সাধারণমানুষ যত তৃপ্ত বাস্তবরূঢ়তার সম্মুখে দাঁড়াতে তেমন নয়। এমত অবস্থা হয় তো একটি মুমূর্ষু জাতির পক্ষেই সম্ভব। হয় তো নয়। এ কথা কিন্তু সূর্যের আলোর মতই সত্যি, সাবেককালের সেই গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধানের কাহিনী-কথনে কেবল চিত্তরঞ্জনই দেশবন্ধু নন, অনেকেই। আসলে, আর্য-আক্রমণে বাঙ্গালীর সেই যে মেরুদণ্ড বেঁকেছিল আর তা সোজা হয় নি। সহ্য করতে বাধ্য হলেও আর্য সান্নিধ্যকে সে স্বাগত জানায় নি কোনদিনই। এবং অন্যদিকে বৈদিক সংস্কৃতিতেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া। গোড়ায় শ্রুতিতে কাকপারাবতাদির সঙ্গে বাঙ্গালীর তুলনা কিম্বা স্মৃতিতে অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গে গমন নিষেধ এই মনোভাবেরই প্রতিফলন। বস্তুত, উন্নততর সংস্কৃতি নিম্নতর সংস্কৃতিকে গ্রাস করে এই সাধারণ সর্ত স্বীকার করলেও বলতে বাধা আছে, আর্যসংস্কৃতি অনার্য বাংলার প্রাক্তন সংস্কৃতির তুলনায় গরীয়ান। অনার্য রাক্ষস সভ্যতার যে উজ্জ্বল চিত্র রামায়ণে বিধৃত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্মেলন বাঙ্গালীর ঘটেছিল কি না না জেনেও বলা চলে সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্তের সংক্ষেপিত রূপবিবর্তন হল তামিল। রাক্ষস সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র দক্ষিণাবর্তের এই অঞ্চলের সঙ্গে অতীব প্রাচীন কাল থেকেই তাম্রলিপ্ত সংযোগ রক্ষা করে আসছে। আসলে, নির্বিচারে বৈদিক ধারাকে গ্রহণ না করে বাঙ্গালী তার আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে আর্যভাবকে চন্দনচর্চিত করেছিল। তবু, বাংলার বৃহত্তর সমাজের অন্তস্তলে অন্তঃশীল ফল্গুর মত একটি অপমানিত বিদ্রোহী ধারা বরাবরই সক্রিয় ছিল।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধসংঘর্ষে সেই ধারাটিই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বেগবাহিনী হয়ে প্লাবিত করল বাংলার উদার জনপদ। মনে হয়, বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মে আত্মসমর্পণে বাঙ্গালীর যতটা ছিল মাহাত্ম্যমুগ্ধতা তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছিল তার দ্রোহী মানসিকতা। তাই, যখন ইসলাম সংস্কৃতির কল্লোল শোনা গেল বাংলার সীমান্তে, তখনই, স্বল্পসময়ের মধ্যেই বাঙ্গালী ভোল পাল্টালো।

তারপর আবার বৈষ্ণব এবং হিন্দুধারার প্লাবন। বাঙ্গালী পুনর্মুষিক হল। অবশ্য পূর্ববাংলায় একটি বিশেষ কারণে মুসলমান আধিক্য রয়েই গেল [মুজতব আলী কল্পিত বহিরাগত মুসলমান প্রভাবে নয়]। সুতরাং অত্যুক্তি নয়, বাঙ্গালী আশৈশব সংগ্রামী। যেহেতু সাহিত্যই সমাজের দর্পণ তাই সাজঘরের এই রূপশয্যার আলেখ্যটি, প্রকারে নিম্নস্তরের হলেও যা পরিমাণে নয়, সযত্নেই রক্ষিত হল। পুনরুক্তি করে বলতে চাই, অধুনা সার্থক সমর সাহিত্য বলতে যা বুঝি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তার পদধ্বনি শোনা গেলেও পদার্পণ কোনকালেই ঘটে নি। অবস্থা এমনই, দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বীররস বলতে যা বুঝি তা-ও দুর্লভ। এমন কি শাক্ত পদাবলী যার লক্ষ্য হওয়া উচিত শক্তিস্তুতি স্ব-ভাব গুণে প্রায়শই বাৎসল্যরসের আধার। অবশ্য, অবিমিশ্র রসস্থিতি সাহিত্যে সম্ভব নয়, প্রার্থিতও নয়। তবু মৌল লক্ষ্য হারিয়ে ফেলা রস ব্যাভিচারেরই সামিল, অতএব নিন্দার্হ। অথচ বলতে বাধা কি, শক্তির চেয়ে শাক্তকবি ভক্তিপ্রিয়-ই বেশি [সম্ভবত দ্রাবিড় সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্তির ফলেই]। তাই কালীকরালীও এখানে কালার মুরলী শুনে মুগ্ধ হয়, আধারাধা-আধাকৃষ্ণের রূপ ধরে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ক্ষাত্রশক্তির এই নিদারুণ ব্যর্থতায় প্রাচীন বাংলায় সমর সাহিত্যে সম্পূর্ণতা তো দূরের কথা, দানাবেঁধে ওঠাও সম্ভব হয় নি। কেন না, তাৎক্ষণিক বীরত্বের আলোয় ব্যক্তিজীবন আলোকিত হলেও, চিন্তাজগতে তার প্রতিক্রিয়া হতে গেলে নিদেন পক্ষে যে অবসরের প্রয়োজন বাঙ্গালীর মানসিকতা স্ব-কারণেই তা কোনদিনই পায় নি। সুতরাং ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ যাদের আগমন এবং নিগমন ঘটেছে বাংলার বীরাঙ্গনে, তাদেরই বীর্যকথা কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার সমর সাহিত্য।

বাংলা ভাষার উৎসভূমি চর্যাপদ থেকেই যাত্রা সুরু করি। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের ভিতর এগুলি রচিত। চর্যাপদে বৌদ্ধ এবং শৈব সিদ্ধাচার্যদের সাধনার সংকেত লুকিয়ে আছে সুতরাং এর আবেদন মূলত আন্তরিক। তথাপি স্বীকার্য, বহিরাঙ্গিক ঘটনাও অন্তপ্রকৃতিতে অন্বিত। এরই চিত্র ফুটে উঠেছে জলদস্যুর হানায় হৃতসর্বস্ব কবির কন্ঠে ঃ বাজ-নাব পাড়ী প'উয়া খালে বাহিউ অদয় দঙ্গলে দেশ লুড়িউ। বাজ নাও পাড়ি দিয়ে ওরা এখন পদ্ম খালে চলল। ওরা, নিঠুর লুঠেরা, দেশ লুঠ করে নিল। এই মর্মস্পর্শী নিবেদনটিকে মল্লার রাগে মূর্ত করে তুলতে হবে ইতি রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ভুসুকুর।

এরপরই আর্য ক্ষেমীশ্বরের চন্ডকৌশিক নাটকটির কথা। মহীপালদেব কর্ণাট আক্রমণ করলেন, কর্ণাটলক্ষ্মীকে হরণ করলেন—এই ঘটনাটিকে উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে চন্ডকৌশিক। দেবভাষায় লেখা হলেও বাঙ্গালীর বীরত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকটি বাংলার সমর সাহিত্যের প্রাণপ্রেরণা। এরপরই তন্ত্র সাহিত্যের উল্লেখ করতে পারি। এ বিষয়ে বলার কথা এই, নবসৃষ্ট নয়, পুরাতনের সংক্ষেপিত রূপকরণেই বাঙ্গালীর ভারতজোড়া খ্যাতি। তন্ত্র সাহিত্যের এই সংক্ষেপিত রূপের নাম নিবন্ধ। অশ্বঘোষ নাগার্জুনের কল্লোল বাংলায় এসে পৌছেছিল ইসলাম-যুগে। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সে ধারা অব্যহত ছিল। এটির প্রচার ও প্রসার আসলে শৈব-সাহিত্যের সাযুজ্যে। এই ধারাটির আদিতে আছেন মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য। অজ্ঞাত

কুলশীল হলেও নিবন্ধ নির্দেশে তাঁর বাঙ্গালীত্ব স্পষ্ট। তাঁর কাম্যযন্ত্রোদ্ধারের আবিষ্কর্তা শ্রদ্ধেয় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাঁকে বাঙ্গালী বলেই সনাক্ত করেছেন। কাম্যযন্ত্রোদ্ধারের যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে সেটি ১২৯৭ শকাব্দে লেখা হয়। সুতরাং সহজেই অনুমেয় মূল রচয়িতা তারও পূর্ববর্তী। এর পরই উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ হল কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার। এটি ব্রহ্মানন্দের শাক্ত তরঙ্গিনী থেকে গৃহীত। বাংলার তন্ত্র নিবন্ধাবলীর ভিতর এটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। নিবন্ধ-নির্দেশ মনে হয় কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যের সমসাময়িক [হান্টার সাহেব ষ্ট্যাটিশটিক্যাল একাউন্টে একে নির্বিচারে অষ্টাদশ শতকীয় বলে খালাস হয়েছেন]। তন্ত্রসার মুখ্যত তন্ত্রাচার, গুহ্যাচার, হোমবিধি নিয়ে আলোচনা করেছে। এক সময়ে বাংলার শাক্তদের ঘরে ঘরে এই গ্রন্থটি রামায়ণ মহাভারতের মত পঠিত হয়েছে।

দেবদেবীর মূর্তিকল্পনায় ও বাঙ্গালীর শক্তিসাধনার স্বাক্ষর নিহত। শক্তি স্তুতিতেই গড়ে উঠেছে কালী, তারা, ষোড়শী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং জগদ্ধাত্রী। লৌকিক ধারায় মনসা, মঙ্গলচণ্ডী এবং শীতলার বন্দনায় সেই শক্তিস্তুতিই ধ্যেয়। প্রথম ধারাটি সর্বাংশে না হলেও, মূলত বৈদিক সুতরাং, অধিকার ব্রাহ্মণ্য। দ্বিতীয়টির আবেদন নামমাহাত্ম্যেই সাধারণ্যে। উপরি-উল্লিখিত দ্বৈতপথের একটি বামাচারের শরণ নিল, নিত্য সঙ্গ যার মদ। অপরটি অভিচারের দিকে সরে গেল। বগলা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তার রূপকল্পনা এই অভিচার থেকেই। বাংলার মঙ্গলচণ্ডী কাব্য মুখর হয়ে আছে এই সব দেবীর স্তুতি কীর্তনে। কান পাতলে এই সব দেবী মাহাত্ম্যের মধ্য থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে তৎকালীন সমাজসত্য। কখনো সরল ভাবে কখনো বক্রভাবে যা ফুটে আছে প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে।

প্রথমেই সূর্যপূজার গানের কথা বলব। লক্ষণীয়, বাঙ্গালীর সূর্য বন্দনা ঠিক বৈদিক ধারা অনুসারী নয়। না হওয়াও বিস্ময়ের নয়। কেননা, যে কোন প্রাচীন সভ্যতাতেই সূর্য-চন্দ্র বায়ু পূজিত। সুতরাং আর্যোত্তর যুগ থেকেই সূর্যবন্দনার যে ধারাটি বাংলায় চলে আসছে সূর্যপূজার গানে সেই ধারার প্রকাশই সম্ভবত সমধিক। সূর্যবন্দনা আসলে শক্তিবন্দনাই। বেদ সেটি মনে রেখেছে, বাঙ্গালী পারে নি। বৈদিক ঋষির মত সে-ও দেখেছে নবারুণে জবাকুসুমের রক্তরাগরঞ্জন। সে-ও বলেছে ঃ সূর্য ওঠে কোন কোন বর্ণ। সূর্য ওঠে আগুন বর্ণ ।। সূর্য ওঠে কোন কোন বর্ণ। সূর্য ওঠে রক্তবর্ণ।। সূর্য ওঠে কোন কোন বর্ণ। সূর্য ওঠে তাম্বুল বর্ণ।। তারপর সূর্য উঠলে তাকে সে স্নান করিয়েছে ঃ সোনার বাটিতে রয়েছে অগুরু-চন্দন (বৈদিক ঋষি চন্দন পাবেন কোথায় ?) আর রূপার বাটিতে তেল ভরা। সামনে রয়েছে দুধের পুকুর। সেখানে সূর্য-ঠাকুর স্নান করবেন। স্নান করা হলে গা মুছবেন অতএব স্বর্গের তাঁতির ছেলে গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে মুনি কুমার। সে আহ্নিকে সাহায্য করবে। তারপর ? তারপর সূর্য ঠাকু-রের বিয়ে। ঘটকালি করছেন বাঙ্গালী মেয়েরা, তাঁদের ব্রত কথায়। পাত্র, সূর্য। পাত্রী, চন্দ্রকলা।

প্রথম দৃশ্য

বাসরঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য। কুঞ্জের ভিতর ক্রমশ সকাল হচ্ছে।

চন্দ্রকলা (সনিশ্বাসে) ঃ কাউয়ায় করে কলমল, কোকিল করে ধ্বনি !
তোমার দেশে যাব সূর্য মা বলিব কারে ?

সূর্য ঃ আমার মা তোমার শাশুড়ী, মা বলিও তারে।

চন্দ্রকলা ঃ তোমার দেশে যাব সূর্য বাপ বলিব কারে ?

সূর্য ঃ আমার বাপ তোমার শ্বশুড়, বাপ বলিও তারে।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরের পালা এক সময় শেষ হল। চন্দ্রকলা আশ্বস্ত হলেন। সূর্য তখন বউকে নিয়ে নিজের বাড়ি চললেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সূর্যের বাড়ির সামনের দিক। বৈতালিকরা গান ধরেছে —

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।....
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বিয়া করতে চায়।

পড়শি ঃ বিয়া করলেন সূর্যঠাকুর দানে পাইলেন কি?
বৈতালিক ঃ হাতীও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।....

আর্যঋষিরা কিন্তু এসব কথার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। এমনভাবেই সে শক্তিকে আবরণ এবং আভরণযুক্ত করেছে যে তাকে ভেদ করে শক্তি-স্বরূপ অবলোকন করাই অনেক সময়ে মুস্কিল হয়ে পড়ে। পৌরাণিক নিষ্ঠা এবং লৌকিক অভাবে এগুলির অবস্থা ত্রিশঙ্কুবৎ। অবশ্য পাশাপাশি ব্রতকথার আর একটি শাখায়, বীরব্রত-কথায়, বাঙ্গালীনারী তার মনস্কাম অকপটেই ব্যক্ত করেছে। সেখানে লক্ষ্মণের মত সংগ্রামী দেওর তার অভিপ্রেয়, রামের মত যুদ্ধরত স্বামীর নিরাপদে গৃহগমন তার পরমপ্রার্থনা। তার কামনা ঃ পাকাপাণ মর্তমান আমার স্বামী নারায়ণ যখন যাবেন রণে নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে। তার সংকল্পঃ রণে এয়োব্রত ক'রে যেন হই স্বামীর সো, যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো। পূর্ববাংলার থুয়াব্রততে অন্যভাবে এ কথাটির পুনরুক্তি করা হয়েছেঃ আকালে ভাতন্তি হইও, সকালে সুতন্তি হইও, রণে আয়ো হইও, জনে সায়তি হইও। কেননা, সে শুধু লজ্জাবতী লতাই নয়, প্রয়োজনে রণচণ্ডীও। পূর্ববাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের একটি ওজস্বী উক্তি মনে পড়ে যায়ঃ দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই আঁকে বইসা দইভাত খাই।

পরবর্তী প্রসঙ্গও মেয়েলীব্রতকথার মত না লৌকিক, না বিশুদ্ধ—আমি গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতির গানগুলির কথা বলছি। ময়নামতির গানে ভবানী দাস যে বিচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেছেন তার থেকে জানা যায় ময়নামতির ছেলেই হলেন গোবিন্দ চন্দ্র। ময়নামতি 'ঊনশত'টি রাজবাড়ির মালিক ছিলেন। ছেলেও কম যান না। তিনি চল্লিশজন রাজাকে কর দিতে বাধ্য করতেন। তিনি যখন সাজসাজ রবে ডাকদিতেন তখন একডাকে বাসত্তর লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হত। বাষট্টি হাজার উজীর, চৌষট্টি হাজার শিকদার এবং বিরাশি হাজার ঢালী মুহূর্তে উপস্থিত হত। তাঁর বত্রিশ কাহন নাওএর নাকাধ্যক্ষরা সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পররাজ্য আক্রমণের লক্ষ্য ছিল পররাজার মাটি তারপর তার বেটি। গোবিন্দচন্দ্রের মাটি এবং বেটি জয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে ওঠে অদুনা-পদুনা উপাখ্যান। গায়ক লক্ষ্মণ দাসের নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উড়িষ্যা জয়ের কাহিনী কীর্তন স্মরণীয় ঃ দশদিন লড়াই কৈল উড়ুয়া রাজার সনে। চৌদ্দ বেড়ি মনিষা কাটিলাম একদিনে ॥ চৌদ্দ পোয়ন মনিষ্য কাটি সাতশত লস্কর। হস্তি-ঘোড়া কাটিলাম তিষট্টি হাজর ॥ জুধ্যেতে হারিয়া নির্প গেল পলাইয়া। তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া ।। গৌরবে বহুবচন আছে অনেক কিন্তু তাকে উপেক্ষা করেও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের শক্তিমত্তাটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

এবার একে একে চণ্ডীকাব্য, ধর্মরাজ্যের গীতাবলী এবং মঙ্গলকাব্যের সমরপ্রসঙ্গ সং-

ক্ষেপে উল্লেখ করব। প্রথমেই মাধবাচার্যের চণ্ডীর কথা। কাব্যটিতে ব্রাহ্মণ পাইক, চামার পাইক, নট পাইক এবং বিশ্বাস পাইকদের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এ'দের মধ্যে অনেকেই অস্ত্রচালনায় নিপুণ এবং দেহে বলশালী ছিলেন। কালকেতুর বল ও সাহস একজন উ'চুদরের সৈনিকের সমান ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতেও সমরপ্রসঙ্গ নানাস্থলে উত্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী প্রসঙ্গ ধর্মরাজের গীতাবলী। গীতিকারদের মধ্যে সীতারাম দাস তো বটেই, মাণিক গাঙ্গুলীতেও সমরসঙ্গীত সোচ্চারে গীত হয়েছে। লাউ সেন গৌড়েশ্বর কর্তৃক কামরূপ জয়ে নিযুক্ত হয়েছেন। ডোম জাতীয় কালু সর্দার লাউ সেনের প্রধান সেনাপতি। লাউ সেনের আদেশে কালু সর্দার কামরূপ আক্রমণ করলেন। কামরূপের রাজা কর্পূরধলকে পরাজিত করে তিনি প্রভুর সঙ্গে তখন মিলিত হলেন—এই কাহিনী আশ্রয় করেই সীতারামের গান। কাহিনী-কথনেই অনুমেয়, রণদামামা এর মূল সুর ধ'রে রেখেছে।

শিঙা, নাকাড়া এবং ঢোলের আওয়াজে চারদিক সচকিত হয়েছে। রাজশ্যালক রণসাজে সজ্জিত হয়ে আছেন। তিনি অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য সমভিব্যহারে চললেন সমরাঙ্গনে। সমরাঙ্গনে তূর্যনাদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হল। কামান, বন্দুক এবং জম্বুরা থেকে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। সৈনিকরা হাতে হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে যূথে যূথে চলল মরণকে বরণ করে নিতে—সংক্ষেপে সীতারামের একটি সমর সঙ্গীতের এই হল সারকথা। এরপরই ঘনরামের ধর্মমঙ্গল। আরম্ভেই ইছাই ঘোষের যুদ্ধসাজের বর্ণনা। ইছাই ঘোষের রাজধানী ঢেকুর। তিনি পরাক্রান্ত রাজা। গৌড়েশ্বরের নয়লক্ষ সৈন্য ইছাই ঘোষ বারবার পরাজিত করেছেন। একটি যুদ্ধবর্ণনার কিছু অংশের চিত্রঃ শরগুলি বর্ষণ করা হয়েছে। সহর্ষে সেগুলি উর্দ্ধচারী। দিবস দিশাহারা। আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। বাতাস স্বজন বিয়োগ ক্রন্দনাতুর। মাঝে মাঝে গোলার দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ। গোলাবিদ্ধ হয়ে একটি সৈনিক আহত হয়েছে। সে তার ভাইকে বলছেঃ আমি নিশায় নিধন রণে তাই পিতামাতা এবং বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছিনা। আমি মারা যাব কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। তাদের বল, সম্মুখ সমরে শত্রুরাশির সংহার ক'রে আমি বীরের মত প্রাণ দিয়েছি।

চণ্ডী ও মঙ্গলকাব্যগুলির পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতকথার বাংলা রূপও স্মরণীয়। কেননা, এগুলি মূল রামায়ণ ও মহাভারতের সমরকথায় তো সমৃদ্ধ-ই পরন্তু অনুবাদকগণের সমকালের দ্বারাও বহুলভাবে আক্রান্ত। বাঙালী কবিগণের স্বকপোলকল্পিত রসসাগরে স্নাত বাংলা রামায়ণী ও মহাভারতী কথার সঙ্গে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কাব্যের তাই আসমান জমিন ফারাক। রামায়ণী কথার গোড়ায় আছেন সর্বজনপ্রিয় কৃত্তিবাস। তারপর একে একে এগিয়ে এলেন কবিচন্দ্র, ঘনশ্যাম দাস, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, অদ্ভুতাচার্য, দ্বিজভবানী, জগদ্রাম, রঘুনন্দন এবং রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এইভাবে রামায়ণীকথার একটি ধারা মোটামুটি শেষ হল। অপর দিকে মহাভারতকে আশ্রয় ক'রে প্রথমে এলেন সঞ্জয়। তারপর একে একে দ্বিজ অভিরাম, ঘনশ্যাম দাস, রাজেন্দ্র দাস, কাশীরাম দাস, গঙ্গাদাস সেন, চন্দ্রদাস মণ্ডল, বিশারদ, দ্বিজ শ্রীনাথ বাসুদেবাচার্য, নন্দরাম দাস, সারল কবি, কৃষ্ণানন্দ বসু, দ্বিজ কৃষ্ণরাম এবং লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে এসে আমরা থামতে পারি। বলা বাহুল্য, দুটি তালিকার কোনটি-ই সম্পূর্ণ নয়। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে দুজনের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে—কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস। বস্তুত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত প্রতিবাঙালীর আদরের সামগ্রী। কিছু দিন আগেও এরা ছিল বাঙালীর শয়ন-স্বপন-জাগরণের নিত্যসাথী।

এরপরই যার কথা উল্লেখ করব তিনি, রায়গুণাকর ভরতচন্দ্র, প্রাচীন বাংলার উজ্জ্বলতম

রস-নাগর। ঐন্দ্রজালিক শক্তি নিয়ে অন্নদামঙ্গলের পাতায় পাতায় শব্দাম্বিত প্রয়োগে, শব্দে শব্দে সংঘর্ষে তিনি যে চকমকি আগুন জ্বালিয়েছেন ক্ষণিকের হলেও সে আগুনের আলোয় প্রতাপ-মোগল যুদ্ধের প্রাণবন্তরূপটি প্রমূর্ত। মোগলেরা প্রতাপাদিত্যের দুর্গ অধিকার করেছে। দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতাপ ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসৈন্যের উপর। সমর বর্ণনায় মগ্ন হলেন ভারতচন্দ্র মুখর হল অন্নদা মঙ্গল ঃ

ঘোড়ায় ঘোড়ায়
গজে গজে
সোয়ারে সোয়ারে
মালে মালে
যুজে পায় পায়
শুণ্ডে শুণ্ডে
খর তরবারে
মুণ্ডে মুণ্ডে॥

এহেন রণাঙ্গনে সকলেই দিকভ্রান্ত। কারু গায়ে তীর বিঁধছে, লুটিয়ে পড়ছে। কেউ গোলায় উড়ছে, কেউ গুলিতে মরছে আর কেউ বা আগুনে পুড়ছে। কামানের ধুমে তম রণ-ভূমে আত্মপর নাহি শুঝে। প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতক জুড়েই সক্রিয় ছিলেন ভারতচন্দ্র। তাঁর অন্নদামঙ্গল শুধু উৎকৃষ্ট কাব্যই নয়, ঐতিহাসিক দলিল ও।

বর্গী এল দেশে। বাংলা সাহিত্য সজাগ হল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গঙ্গারাম তাঁর মহারাষ্ট্র পুরাণে এ বিষয়ে আলো ফেললেনঃ বর্গীরা সীমান্তে উপনীত। ভাস্করপন্ত নবাব আলিবর্দীকে জানিয়েছেন, চৌথাই চাই, নচেৎ যুদ্ধ। নবাব ভীত হয়ে জমাদারদের কাছ থেকে চৌথাই বাবদ কর চেয়ে পাঠিয়েছেন। সর্দাররা কিন্তু অবিচল। তাদের কণ্ঠ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার উদ্গীত হলঃ অর্থ সংগ্রহ করব ঠিকই তবে তা বর্গীতোষণের জন্য নয়, বিনাশনের জন্য—আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে, দেশে যেন আইস্তে না পারে।

বাংলার সমর সাহিত্যের গৌরচন্দ্রিকার পালা, আরম্ভের আরম্ভ, এখানেই শেষ হল। শেষ হল সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালানোর আগে প্রভাতের সলতে পাকানোর খেলা। ভারতচন্দ্রে যদি হয় উষার অরুণালোক, তাহলে মাইকেলে মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডতেজ আর সুনিশ্চিতভাবেই রক্তিম রবিরশ্মিতে প্রদোষের সংকেত।

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ও হাস্যরস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

হাস্যরস অত্যন্ত কঠিন রস।' সভ্যতার সকল পর্যায়ে ইহাকে দেখা যায় না এবং ঠিকমত পাক না পাইলে ইহা নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়। লঘু, গুরু, প্রসন্ন বিষণ্ণ জীবনের সকল প্রকার প্রচ্ছন্নতার ভিতর কৌতুকের উপাদান লুকাইয়া থাকে। দুর্লভ প্রতিভাই একমাত্র গভীর গহন হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যোগ্যতম ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশিত করিতে পারে। হিউমার অথবা হাস্যরস সভ্যতার প্রথম যুগে আবির্ভূত হয় নাই। ইহার উৎপাদন ও আস্বাদনের জন্য পরিণত রুচির প্রয়োজন। মানবের আবির্ভাবও মানবসভ্যতার উৎপত্তির সহিত শৃঙ্গাররসের জন্ম হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু জীবনের মধ্যে জটিলতা না আসিলে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় না। সামাজিকরূপে মানবের অন্যতম বিকাশ হইয়াছে হাস্যের মধ্যে। যাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন, তাহারাও হাস্যে অভিভূত হয়। যাহারা শ্রবণশক্তিহীন তাহারাও হাস্যে আপ্লুত হয়। মানব সভ্যতার গতি কোন পথ অবলম্বন করিতেছে তাহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে হাস্যরস। হাস্য সমকালীন মানবের রুচি, চিন্তাধারা ও ভাবের অগ্রগতি সূচনা করে। নির্মল হাস্য যাহাকে হিউমার বা হাস্যরস এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে তাহা সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির সূচক। অ্যারিস্ততল এর ট্রিটিজ অন পোয়েট্রি যদি আজও বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে হয়ত সমসাময়িককালের রহস্য ও বিদ্রূপপ্রিয়তা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাইত এবং সভ্যতার বিবর্তন কোন ক্রমকে অনুসরণ করিতেছে সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু চিত্ত সজাগ হইয়া উঠিত। সিডনি স্মিথ বলিয়াছেন যে সভ্যতার বিবর্তনের ও ক্রমোন্নতির সহিত হাস্যেরও ক্রমোন্নতি হয়। ১ হাস্যরস সৃষ্টির উপযোগী-সমাজ কিরূপ হইবে এ বিষয়েও পাশ্চাত্য মণীষীগণ সুস্পষ্ট সংকেত করিয়াছেন। ভারতীয় আলংকারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজশেখর "কবিচর্যা" ও কবিসমাজ নিবন্ধ দুইটিতে কবির পরিবেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে পরিবেশের স্থায়িত্বের প্রতিই কেবল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ২ অবসর ও বিরাম হাস্যকে সৃষ্টি করে। আদিম বর্বরতার যুগে যখন জীবন সংগ্রামেই মানুষ কেবল নিযুক্ত থাকিত, তখন হাস্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত, হাস্য ছিল বিজয়ীর আত্মতুষ্টির বাহ্য প্রকাশ। আজও মানুষে মানুষে কলহ, বিবাদ বিসংবাদ হানাহানি চলিতেছে, রাজনীতি সাহিত্য ও জীবন—সর্বত্র এই জটিলতার ও সংগ্রামের ছবি। এখনও হাস্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, বিজয়ের গর্ব প্রভৃতি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সুসভ্য মানব ক্রমে তাহাদিগের অসৎপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং প্রবৃত্তির নিরোধের জন্য মানবতা অনুকম্পা প্রভৃতি ভাব হাস্যের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। হাস্য এজন্য ক্রমে নির্মলতর হইতেছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এমন একটি পর্য্যায়ে হয়ত আসিবে যখন হোমারের ভাষায় "দেবতার হাস্যের ন্যায় পবিত্র হাস্যে" ধরাতল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসকে বিচার করিলে যুগভেদে তাহার প্রকাশভেদ লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক সংযোগ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সহিত ভারতীয় জীবনের জটিলতাবৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা গিয়াছে এবং হাস্যের মধ্যে তীক্ষ্ণতা বিদ্রূপ প্রভৃতি প্রধান হইয়াছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে সামাজিক স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ফলরূপে নির্মল, মার্জিত ও বিদগ্ধজনোচিত হাস্যের প্রকাশ হইয়াছে কাব্যে ও নাটকে। হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্তীকাল হইতে

ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া, মোগল আক্রমণের সহিত তাহা অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে; এই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে কেবলমাত্র প্রহসনই সৃষ্ট হইয়াছে। বিবর্তনের যে অধ্যায়ে যথার্থ হাস্যরস সৃষ্ট হইতে পারে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ-বশতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে সেই অধ্যায়ের আবৃত্তি হইতে পারে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে হিউমার বলিতে যে শ্রেণীর হাস্যরসের প্রকাশ বৈচিত্র্য দেখা যায়, সংস্কৃতে কালিদাস, হাল, শূদ্রক, অমরু প্রভৃতি মুষ্টিমেয় লেখকের রচনার বাহিরে অপর কোথাও তাহার প্রকাশ হয় নাই। সামাজিক জীবনে বিশেষ কোন জটিলতা না থাকার অনিবার্য্য ফলরূপে একমাত্র বিদূষকই হাস্যর উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে। সমাজের সকল শ্রেণীর জনকে সমানভাবে হাস্যের উপাদানে পরিণত করা হয় নাই। সামাজিকের ভেদও হাসরসের প্রকাশে ভেদ আনয়ন করিয়াছে। হাস্যরস সৃষ্টির নিমিত্ত যে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশের প্রয়োজন তাহাও সংস্কৃত সাহিত্যে অংশত অনুপস্থিত। নানাপ্রকার রূপক ও সাঙ্কেতিক উপাদান, অলৌকিক কাহিনী প্রভৃতি ভারতীয় পাঠকের চিত্তকে ভাবালু ও রহস্যপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। আলঙ্কারিকগণ নবরসের ভেদ ও অগণ্য উপভেদ স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ যাহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীর ও শৃঙ্গাররস। আকস্মিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ইতস্ততঃ হাস্য, অদভুত ও ভয়ানকরসের প্রাদু-র্ভাব ঘটিয়াছে। নাটক, প্রকরণ প্রভৃতিরসাধারণ পরিবশেও এই আদর্শবাদী রহস্যপ্রিয় ভাবালু মনের পরিপোষক। এজন্য বিশুদ্ধ হাস্য সংস্কৃতে দানা বাঁধিতে পারে নাই। হাস্যরসসৃষ্টির অন্তরায়রূপে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে পারি—যেমন পৌরাণিক আখ্যানগুলির প্রভাব, অদৃষ্ট ও ভাগ্যের ফলবত্তায় অধিক বিশ্বাস ও তাহার ফলে যুক্তিশীলতার হ্রাস, দিব্য অথবা সেই শ্রেণীর অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তির প্রতি প্রবণতা ও একই শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কন।

প্রহসন ও ভাণ হাস্যরসের প্রতি সংবেদন জানাইলেও তাহা বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর নহে। এবং প্রহসন ও ভাণের মধ্যে অতি অল্প অংশই বাঁচিয়া থাকায় ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ভারতীয় জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিতে তাহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং নাটকীয় শিল্পরূপে তাহারা সার্থক হয় নাই। মধ্যবিত্ত জীবন হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ ভূমি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীভেদের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বর্তমানকালের ন্যায় কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এজন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব না থাকায় হাস্য সৃষ্ট হইতে পারে না। সামাজিক ঐক্যের অভাবও হাস্যরসের অপরিপুষ্টির অন্যতম কারণ। সামাজিক সংঘাত ও জটিলতা, জীবনে নানাপ্রকার অসঙ্গতির সৃষ্টি করে এবং তাহা হইতে হাস্যের সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ রচিত হয়—ইহা সত্য। অপরদিকে তেমনি সামাজিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা নানাবিধ সামাজিক অকল্যাণেরও সৃষ্টি করে। ভারতীয় চিন্তা-ধারার আদর্শবাদ ও ধর্মনিষ্ঠা যেমন সামাজিক অসঙ্গতিকে অস্বীকার করিবার মত চিত্তের উন্নতি দান করিয়াছে তেমনভাবে হাস্যরসের বিকাশের পক্ষে আংশিক প্রতিবন্ধকও হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে যথার্থ হাস্যরসের অভাব যথার্থ করুণরসের অভাবের দ্বারাও ব্যাখ্যা করা যায়। ইউরোপে যে অর্থে ও যে ভাবে হাসরসের বা করুণরসের প্রকাশ দেখা গিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা দেখা যায় নাই। ভারতীয় জীবনে রাজনৈতিক বিপ্লব ছাড়া অপর কোন সংঘাত আসে নাই। এজন্য হাস্যও করুণ যথাযথভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। করুণরস ভাবালুতার মাধ্যমে সংযম হারাইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শবাদ, নৈতিক বিচার ভঙ্গী মানব জীবনের অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে দেয় নাই। 'অসৎ'কে সংস্কৃত সাহিত্যের

রসবেত্তাগণ পরিপূর্ণ 'অসৎ' অথবা 'সৎ'কে পরিপূর্ণ 'সৎরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সদসৎ এই উভয়াত্মক মানবজীবনের যে বিচিত্র জটিলরূপ তাহা বাস্তববুদ্ধিতে লক্ষ্য করেন নাই। এজন্য ট্র্যাজেডি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিচ্ছেদেরই নামান্তর, কমেডি মিলনেরই রূপ। কিন্তু আত্মার যে পীড়ন হইতে ট্র্যাজেডি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সংস্কৃতে প্রায় বিরল। চরমদুঃখেও ভারতীয়গণ ঊর্ধ্ব আকাশের নিঃসীমতায় সান্ত্বনার বাণী খুঁজিয়া পাইয়াছে, গভীর আনন্দেও তাহা বিধাতার দান মনে করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শের অপর পারমার্থিক মূল্য থাকিলেও যথার্থ হাস্যরসের সৃষ্টিতে যে স্বচ্ছন্দ প্রয়োজন তাহা ইহাতে নাই। শ্রীযুক্তসুশীল-কুমার দে এজন্য বলিয়াছেন — "There was nothing wrong with the Indian genius which could achieve brilliant success in poetry, drama and certain forms of fiction, but there was something wrong in thc way in which the Indian literary mind evolved and the Indian author was expected to behave....In this distinct clearage between life and literature, between art and experience, there could be no breezy Contagion of wit and humour as an over-spreading or distinct stylistic quality."

হাস্যরসপ্রধান রচনার সার্থকতা কোথায় এবং তাহার লক্ষ্য কি এ বিষয়ে যথেষ্ঠ আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যথার্থ হাস্যরসাত্মক রচনার অভাব থাকিলেও যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কম নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই প্রকারের হইতে পারে —প্রথমে, সামাজিক জীবনের পুষ্টিবিধান তাহার লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে অথবা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আনন্দদানই তাহার লক্ষ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আনন্দকে উপেয় বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার স্বরূপ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। আনন্দের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ান্তর নিরপেক্ষ। কিন্তু সকলযুগের সাহিত্যেই একটী প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে সাংসারিক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করিবার জন্য কাব্য কতদূর সহায়ক সেই বিচারের মানদণ্ডে কাব্যকে বিচার করিবার। কাব্যের উদ্দেশ্য সৎ অথবা অসৎ অথবা কাব্যের সহিত নীতিবোধের কি সম্পর্ক এ সকলপ্রশ্ন এজন্য স্বভাবতঃই উদিত হয়। অসৎ কাব্য মানুষের চিত্তবৃত্তিকে অবনত করিতে পারে এই শঙ্কায় আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ।" অসৎকাব্য যে বর্জন করা উচিত এ বিষয়ে রাজশেখরও বলিয়াছেন "অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্যমিত্যপরে।" কাব্য অসৎ হইলে তাহা আর কাব্য থাকিবে না, সুতরাং অসৎকাব্যেরও যথার্থ লক্ষ্য হইতেছে 'সৎ'। সমাজের অশুভগুলির চিত্র প্রকাশ করিয়া সহৃদয় জনসমাজ যাহাতে তাহার প্রতি উন্মুখ না হয় ইহাই তথাকথিত অসৎবিষয়াত্মক কাব্যের উদ্দেশ্য। কুট্টনীমতম, সময়মাতৃকা প্রভৃতি এই অর্থে উদ্দেশ্যমূলক কাব্য। লোকচিত্তে কবির ও কাব্যের কিরূপ প্রবলপ্রভাব তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে রাজশেখর বলিয়াছেন— "কবি রচনায়ত্তা লোকযাত্রা। সাচ নিঃশ্রেয়সমূলম্," কিন্তু সমাজজীবনে কাব্যের প্রভাব যাহাই হউক না কেন আনন্দদানই কাব্যের উদ্দেশ্য ইহা স্বীকার করিলে ও কাব্যপাঠজনিত আনন্দে সমাজের কতদূর মঙ্গল হয় এ প্রশ্ন অবান্তর বলিয়া মনে হয়। কাব্যকে যাঁহারা উপদেষ্টার আসনে বসাইয়া থাকেন ধনঞ্জয়ের মতে তাঁহারা অল্পবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের অভিমতে "লোক যদি সাহিত্য শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোন চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারির ভার লয় নাই।" আলংকারিক

সম্প্রদায়ের নিকট একটি সত্য অজ্ঞাত ছিল না যে সংসাররূপ বিষবৃক্ষের ফল যে কাব্য তাহার সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান "রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবৎ" প্রভৃতি উক্তি ইহার সাক্ষ্য দেয়। ধর্মার্থকাম প্রভৃতি বর্গের সঙ্গে কাব্যকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। রুদ্রট তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে এজন্য বলিয়াছেন "ননু কাব্যেন ক্রিয়তে সরসানামবগমশ্চতুর্বর্গে। লঘু মৃদু চ নীরসেভ্যস্তে ত্রষ্যন্তি শাস্ত্রেভ্যঃ।" ৪ লেখকের কবির বা নাট্যকারের চিত্তের দুইরূপ—একদিকে তাঁহার মধ্যে যেমন নব নব সৃজনকারী প্রতিভার অস্তিত্ব, অপরদিকে তেমনি সমাজ সচেতন বিচারকের সত্তা। কবিচিত্তের যে কোন ভাবকেই সাহিত্যে রূপ দেওয়া হয় না। গ্রহণ ও বর্জন নীতি অনুসারে সর্বসাধারণে যাহা প্রকাশযোগ্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত তাহাকেই সাহিত্যে মূর্ত করিয়া তুলা হয়। সুতরাং বিষয়বস্তুর গ্রহণ ও বর্জন এবং যথাযথ রূপায়ণ ইহারা অলক্ষ্যে সৌন্দর্য্য, প্রয়োজনবোধ ও নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত। সাহিত্যের ফলশ্রুতিও অলক্ষ্যভাবে নীতি-বোধ, সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত। (৫) সংস্কৃত সাহিত্যে আর্টফর আর্টস সেক্ শ্রেণীর মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধনঞ্জয়ের দশরূপকেই কেবলমাত্র ইহার প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য যে উচ্চশ্রেণীর নৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কোথায়? কাব্য যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়-প্রকার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইবে এই উদ্দেশ্যে বামন অন্যত্র বলিয়াছেন "কাব্যং সদ্দৃষ্টাদৃষ্টার্থং প্রীতিকীর্তিহেতুকত্বাৎ।....দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ অদৃষ্টপ্রয়োজনম্, কীর্তিহেতুত্বাৎ।" এখানে প্রশ্ন উঠে হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যের স্রষ্টা কিরূপে সমাজসংস্কারের আদর্শ, নীতি, উপদেশ প্রভৃতি ভাব তাঁহার কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিবেন। কারণ, বিশেষ অভিপ্রায়ের প্রকাশকরূপে নিয়োজিত করার দরুণ ব্যঙ্গ-সাহিত্য, সাধারণতঃ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ৬ কবির অথবা লেখকের মধ্যে যেমন রসাস্বাদনে সমর্থ রসিক সত্তা রহিয়াছে, তেমনি মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতাও রহিয়াছে। লেখক যেমনভাবে আপনাতে সামাজিকবুদ্ধি আরোপিত করিয়া রসাস্বাদ করিবেন, তেমনভাবে সৃজনকারী চিত্ত লইয়া সৃষ্টিও করিবেন। ক্রোশে বলিয়াছেন যে স্রষ্টার মধ্যে "টেস্‌ট্‌" অর্থাৎ আস্বাদনের ক্ষমতা ও জিনিয়াস্ অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষমতা সমানভাবে বর্তমান থাকে। ৭ অলঙ্কারশাস্ত্রে অন্যত্র বলা হইয়াছে —"কবির্হি সামাজিকতুল্য এব।" ব্যঙ্গরচনার স্রষ্টা বিচার ও সমীক্ষা মূলক মনোভাব লইয়া জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এজন্য তাহার মধ্যে সমাজ সচেতনতা প্রবল। অস্‌কার ওয়াইল্ড্ শিল্পীর সত্তার এই দ্বৈধরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজ-জীবন যে ক্ষেত্রে বিপর্যাস্ত, সে ক্ষেত্রে স্রষ্টার মধ্যে এই সমাজসচেতনতা প্রবল হইয়া ওঠে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনায় এই সচেতনতা যত প্রবল হইয়া উঠে অন্য ক্ষেত্রে সেরূপ হয়না। রসোত্তীর্ণ কাব্যে, যেমন কালিদাস, সেক্‌স্‌পীয়ার, ভবভূতি, প্রভৃতির রচনাতে কবির এই সমাজ সচেতন-সত্তা অবলুপ্ত। কিন্তু যেস্থলে সমাজসচেতনতা প্রবল সেস্থলে রসাস্বাদের পরবর্তী কালে সামাজিকের চিত্তে অবস্থান্তর স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ স্রষ্টাও সহৃদয় উভয়ের মধ্যেই দ্বৈধরূপ জাগ্রত থাকে। এই সমাজসচেতনতা দণ্ডীর কাব্যে ততদূর প্রবল নহে, যতদূর প্রবল তাহা হরিভদ্রসূরির "ধূর্ত্তাখ্যানম্" গ্রন্থে বা মত্তবিলাসপ্রহসনম নামক প্রহসনে। এখানে প্রশ্ন এই যে চিত্তের কোন বিশেষ অবস্থায় সহৃদয়ের চিত্তেও লেখকের ন্যায় পারিপার্শ্বিক সচেতনতা প্রবল হয়? রসা-ভাসে যেরূপ ভ্রান্তিতেও রসাস্বাদন হইবার পর আভাসত্বের জ্ঞান হয়, প্রহসন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও রসাস্বাদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে কাব্যের অন্তর্নিহিত উপদেশবিষয়ে চিত্ত সচেতন হইয়া

থাকে। ক্রোশের ভাষায় এই দুইটি ক্ষণকে এসথেটিক মোমেণ্ট ও ইনটেলেক্‌টিভ মোমেণ্ট নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে হাস্যরসের আস্বাদনে সহৃদয়ের চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি জাগ্রত থাকে, সুতরাং প্রহসন প্রভৃতি পাঠের সময়ে কি এই ভেদবুদ্ধি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিবে না? প্রহসনে রস সৃষ্টির ধারা বিশ্লেষণ করিলে সহৃদয়ের চিত্তে যে ভেদজ্ঞান জাগ্রত থাকে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, এই ক্ষেত্রে পাঠকের চিত্তও সর্বদাই কাব্যের ফল বিষয়ে উন্মুখ হইয়া থাকে। এজন্য ব্যঙ্গ সাহিত্য কান্তা সম্মিতভাবে অশুভনিবৃত্তির পথ সুগম না করিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে অশুভের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দিবে। কুট্টনীমতম কাব্য পাঠের ফলে সমাজে বারাঙ্গনা ধূর্ত প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জনের প্রভাব হইতে শিষ্টজন সতর্ক হইবে এইরূপ আশা পোষণ করিয়াই ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন —

"কাব্যমিদং শৃণুতে যঃ সম্যক্ কাব্যার্থপালনেনাসৌ।
নো বঞ্চতে কদাচিদ্ বিটবেশ্যাধূকুট্টনীভিরিতি ।।

জগতের অনেক সাহিত্য এমনকি রামায়ণ মহাভারতকেও বিচার করিলে দেখা যায় যে, আপাততঃ সমাজের মঙ্গলকর কিছুই সেখানে নাই। সুতরাং বিদ্রূপাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য। যথার্থভাবে হিতকারক হইবে কিনা এপ্রশ্ন বিচার যথার্থ কাব্যতনির্ণয়ের অনুকূল নহে। কাব্য যে কান্তাসম্মিতভাবে উপদেশ দান করে এ যুক্তি দুর্বল। সুতরাং যথাযথ কাব্য কি এবং প্রাচীন ও নবীন উভয় মতবাদের কিরূপে এক্ষেত্রে সমন্বয় হইতে পারে ইহার উত্তরে সুসাহিত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়— "যেমন সভ্যসমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই মঙ্গলের জন্যই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।" হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গলসাধন —সে সমাজেরই হোক অথবা ব্যক্তিরই হোক।

হাস্যরস প্রধান রচনা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ত্রুটি বা ব্যক্তিবিশেষের ত্রুটিকে সংশোধন করে। এজন্য তীব্রব্যঙ্গযুক্ত রচনা সমাজের ব্যক্তিবিশেষের, অথবা জাতিবিশেষের অনেক ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। হাস্যের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সংবেদন রহিয়াছে যাহা মানুষের নিভৃত স্থানে আঘাত দিয়া তাহাকে আপনার বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলে। সহস্র সংস্কারক সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টায় যাহা করিতে পারেন না একজন বিদ্রূপাত্মক লেখক কেবলমাত্র তাঁহার বিদ্রূপের মধ্য দিয়াই তাহা করিতে পারেন। হাস্যরসিকের উদ্দেশ্য এবং কর্ম অনেক সময়েই অনাদৃত হয়। কিন্তু হাস্যরসিক জীবনের ক্ষুদ্রতা লইয়া বিদ্রূপ করেন না; তাঁহার বিদ্রূপ সামাজিক জীবনে মানবের অযোগ্যতার প্রতি। হাস্য সেই ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় যে ক্ষেত্রে উহা পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তাশীল ভাবালুতাকে জাগাইয়া তুলে। জর্জ মেরিডিথের ভাষায় বলিতে গেলে—"The saterist is a moral agent, often a social scavenger, working on a storage of bile.....The aim and business of the Comic poet are misunderstood, his meaning is not seized nor his point of view taken, when he is accused of dishonouring our nature and being hostile to sentiment, tending to spitefulness and making an unfair use of laughter. Those who detect irony in comedy do so because they choose to see it in life. Poverty, says the satirist, has nothing harder in itself than that it makes men ridiculous.

But poverty is never ridiculous to Comic perception until it attempts to make it conceal its bareness in a forlorn attempt at decency or foolishly to rival ostentation (p. 86-67).''

১. Civilization, according to Sydney Smith, improves the humour of the body into the humour of the mind, and this improvement results from an increased demand for humour.... Meredith requires for the Comic poet a cultured Society with quick perceptions, a Community without giddiness, a period free from feverish emotion and a reasonable equality between the senes (Elementary sketches of Moral Philosophy. p. 184.

২। কাব্যমীমাংসা, দশমঅধ্যায় পৃঃ ৪৯ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ।

৩। ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ ভবেৎ।......বেদাবিদ্যেতিহাসানামাখ্যান পরিকল্পনম্। বিনোদ—জননং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি (নাট্যশাস্ত্র ১·১১; ১. ১১৬—১১৭)।ধ্বন্যালোক লোচনেও বলা হইয়াছে তথাপি প্রীতিরেব প্রধানম্ প্রাধান্যেনান এবোক্তঃ (লোচনটীকা পৃঃ ১২)

৪। নট্যশাস্ত্র, প্রথম অধ্যায়, ৮—১৩ শ্লোক।

৫। নাট্যশাস্ত্রে অপর একস্থলে বলা হইয়াছে যে যাহারা জাগতিক জীবনের দুঃখের গুরুভারে অত্যন্ত পীড়িত তাহাদিগকে আনন্দদান এবং তাহাদের চিত্তের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্তই নাট্যাভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে—দুঃখার্ত্তানাং শ্রমার্ত্তানাং শোকার্ত্তানাং তপশ্বিনাম্ বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ ,ভবিষ্যতি (অধ্যায় ১১১—১২)

৬। তুলনীয়—সাহিত্যকে কোনো একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে শঙ্কীর্ণ করে তোলা অনিবার্য্য.........

সাহিত্য সমাজকে শিক্ষার ভার নেয়না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো (প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৩৫ প্রমথ চৌধুরী)

৭। কাব্যস্য বিরচনকালে প্রতিপত্তিকালে চ প্রাপকসত্তায়ং তেষামনাণিতম্বাচ্চ ....(নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতী-টীকা দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা, ২৯৪—২৯৫)

সাহিত্য সংবাদ

মৃত্যু মানুষকে যেমন বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে তেমনি মৃত্যুই মানুষের একমাত্র বন্ধু, যে দুঃখময় জীবনযাত্রার অবসান ঘটায়। কিন্তু অকালমৃত্যু? বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মৃত্যু তার হিমশীতল করস্পর্শে, কখন কার জীবনের উত্তাপটুকু নিঃশেষে মুছে নেবে তা যদি মানুষের জানা থাকত তাহলে অকালমৃত্যু হয়ত এত শোকাবহ হয়ে মানুষকে মর্মাহত করতে সক্ষম হত না। কিন্তু বেদনা অথবা শোকেরও প্রয়োজন আছে, কারণ সাহিত্যের ইতিহাস এমন কথাই বলে যে তাবৎ পৃথিবীর অমর সাহিত্যসমূহের উদ্ভব তীক্ষ্ন শোকের অথবা বেদনার অভিব্যক্তি থেকেই। অকালমৃত্যুর বেদনায় যখনই কোন কবির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে তখনই তাঁর লেখনী কোনও অমরকাব্যের সূচনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

শোকের গভীরতা পরিমাপ করার মত কোনও বিজ্ঞান আছে কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু শোক যে কত হৃদয়বিদারক হতে পারে তার এমন একটি দৃষ্টান্ত আছে যা তুলনারহিত। আদি কবির শোকাভিভূত হওয়ার ইতিহাস কত না করুণ, ক্রৌঞ্চ-মিথুনের অকালমৃত্যুতে আদি-কবির আত্মা কি পরিমাণ হাহাকার করে উঠেছিল এবং বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি যে মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মূলে যে হৃদয়বৃত্তি ছিল তা নিঃসন্দেহে সহানুভূতি, যার অভাব আজ আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করছি। মানুষ আজ ইট, কাঠ, পাথরের ব্যঞ্জনায় মুখর কিন্তু কত যে স্বর্ণহৃদয় বিস্মৃতি-কুয়াশার অন্তরালে মিলিয়ে গেল তার সন্ধান (এই যন্ত্রময় যন্ত্রণার যুগে) করার সময় মানুষের কই? কবিরা আজ স্পুট্‌নিকের জয়গান রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিন্তু সংস্কৃতির ভিত যাঁরা দৃঢ় করার প্রচেষ্টায় আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের যশোগান শোনানোর সুপ্রবৃত্তির দৈন্যতা যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এটা প্রগতি কি পশ্চাৎগতি তার বিচারে সময় হয়ত এখনও আছে।

একদা প্রাক-তিরিশের সাহিত্য জগতে যে উল্কাপাত ঘটেছিল সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে হয়ত কোনও চমক নেই কিন্তু সেদিন যে অকালমৃত্যু ঘটেছিল তা কোনও বিশেষ দেশের জাতীয় দুর্ঘটনা নয়, সেই অকালমৃত্যু সাহিত্য জগতের শোকাবহ ঘটনা। সে ইতিহাসের ছিন্নপত্র থেকে কিছু কথা শোনাবার প্রয়োজন আছে কারণ সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপাঠকের মধ্যে যে আত্মিক যোগ আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই স্মৃতি রোমন্থন। এ কোনও শ্রদ্ধাঞ্জলি অথবা স্তুতিবাদ নয়, এ হল অকাল বসন্তে ফুল ফোটানোর বেদনাময় কাহিনী। এ বন্ধুর পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য হাসিকান্নার দিনগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য কত প্রাণইতো আসে যায় কিন্তু যে জীবন অন্যকে আনন্দ দেবার কাজে ব্রতী থাকা কালে অকস্মাৎ চিরনিদ্রার দেশে পাড়ি দেয় তাকে আমরা বিস্মৃতির অঙ্কে স্থান দিই কি করে? টমাস ক্লেটন উলফ এমনই এক সাহিত্যসাধক যাঁর অকালমৃত্যুতে সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে। বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের মাঝে টমাস উলফ যেন আরো অনেক দূরের অখ্যাত কোনও নক্ষত্র যার আলো এ পৃথিবীর বুকে কখনও পড়ে, কখনও পড়ে না।

টমাস উলফের সাহিত্য সাধনার আয়ুষ্কাল মাত্র নয় বৎসর। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে সৎসাহিত্য সৃষ্টির যে ভূমিকা তিনি রচনা করে গেছেন তা নিয়ে আজও বাক-বিতণ্ডার অন্ত নেই অনেকেই তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছেন কিন্তু উলফের সমগ্র সৃষ্টির মাধুর্য্যকে নস্যাৎ করবার মত ব্যক্তিত্বের দেখা আজও মেলেনি। কঠোর সমালোচনার পর সকলেই স্বীকার করেছেন যে বৃহৎ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টি মহৎ এবং শিল্পাশ্রয়ী। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরও যে প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায় তা হল উলফের সৃষ্টির শ্রেণীবিচার। যে রচনা প্রসাদ-গুণে সমৃদ্ধ অথচ যার কোন ব্যকরণ নেই সে রচনা কোন শ্রেণীতে স্থানলাভ করবে তা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়েছে কিন্তু কোনও মীমাংসা হয়নি হওয়ারও কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না কারণ পনেরশত পৃষ্ঠার উপন্যাস পাঠের পর মনে হয় এ উপন্যাসে দর্শন, মনস্তত্ত্ব অথবা নাটকীয় মুহূর্ত কোথায় কিম্বা এত শব্দবহুল বাকধারার নির্ঝর থাকা সত্ত্বেও এ উপন্যাস উলফের আত্মগর্বের ইতিহাস। তাঁর রচনা পাঠ করে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের মনে হয়েছিল এমন অসার পদার্থ সমালোচনার অযোগ্য কিন্তু বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও উলফের পাঠকের অভাব ছিল না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা হল, নোবল লরিয়েট সিনক্লেয়ার লুইস যখন এক বক্তৃতা প্রদানকালে সমসাময়িক আমেরিকান সাহিত্য সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উলফের সৃষ্টির প্রতি আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তখন কিন্তু কেউ বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি অথচ উল-ফের বিরুদ্ধ সমালোচকের অভাব নেই।

কয়েক বৎসর পূর্বে অপর এক নোবল লরিয়েট উলিয়ম ফকনার যখন আধুনিক আমে-রিকান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে লুইসের প্রশংসার প্রতিধ্বনি করে বললেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নিয়মাবলীর অনুসারী না হয়ে নূতন কিছু সৃষ্টির প্রেরণায় কোনও সাহিত্যিক যদি উদ্বুদ্ধ হন সে ত আনন্দের কথা—যেমন উলফের রচনা যা আজও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়কিন্তু তাঁর রচনা পাঠ করে যে পরিমাণ আনন্দলাভ করা যায় তার বিনিময়ে সেই সৃষ্টিকে মহৎ সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করলে ক্ষতি কি? এ বিষয়ে ফকনারের মত খণ্ডন করার যুক্তি সম্ভবতঃ নেই কারণ যদি কোনও শিল্পকর্মে কঠোর ব্যকরণের অভাব থাকে অথচ সেই শিল্প রসিকজনের কাছে আনন্দদায়ক হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ এবং এমন শিল্পকর্ম নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। তাই যখন দেখি ফকনার আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যিকদের তালিকা প্রক-রণকালে সর্বাগ্রে টমাস ক্লেটন উলফের নাম উল্লেখ করেছেন তখন বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ থাকে না। সেই তালিকায় দ্বিতীয় নাম হল উইলিয়ম ফকনার।

অতলান্তিক মহাসাগরের কূলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নর্থ ক্যারোলাইনার ক্ষুদ্র-তম সহর এ্যাশেভিলে তখন শীতের মরসুম। ১৯০০ সালের ৩রা অক্টোবর, ক্ষুদ্র এ্যাশেভিল শুভ্র তুষারের আস্তরণে নির্জীব কিন্তু বিচিত্র ধ্বনি শব্দের আনুকূল্যে বোঝা যায় যে প্রাণের উত্তাপ কিছু ক্ষীণ নয়। ক্ষীণ ত নয়ই বরঞ্চ নূতন প্রাণের পদসঞ্চারের আনন্দবার্তা কোনও এক প্রস্তর খোদাইকারী মিঃ ডাবলিউ ও উলফকে হর্ষমিশ্রিত বিমর্ষতায় উদ্বেল করে তুলেছে। আজ আর কাজে মন লাগছে না তাঁর; ছেনি হাতুড়ী একপাশে রেখে দিয়ে তিনি দূরে তাকিয়ে আছেন তুষারে ঢাকা ফার গাছগুলোর দিকে। নানারকম চিন্তার বর্ণালী তাঁর মানসপটে বুদ্বুদের মত চকিতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি জানিয়ে দিল যে এ পৃথিবীতে একটি নূতন প্রাণের জন্ম হল, এখন থেকে এ পৃথিবীর সবকিছুতেই যার সমান অধিকার।

(আগামীবারে সমাপ্য)

নূতন গ্রন্থ

ফ্লাওয়ার ফর মিসেস হ্যারিস : পল গ্যালিকো।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে, কিন্তু গত বৎসরে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে তাইই এখন পাওয়া যায়। পল গ্যালিকো এক আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মনোজ্ঞ কাহিনী উপন্যাসটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। মিসেস হ্যারিস তার অন্যতম চরিত্র চিত্রণ।

মিসেস এডা হ্যারিস, পাতলা গড়নের ছোটখাট মানুষ চুলে পাক ধরেছে কিন্তু আপেলের মত লাল গালের ঠিক উপরেই দুষ্টুমিভরা ছোট ছোট চোখদুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে। অক্লান্ত পরিশ্রমের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে, দারিদ্রের ভ্রূকুটি তাঁর অভিশাপ। মিসেস হ্যারিস লণ্ডনে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করেন। আত্মীয় বান্ধব বলতে একমাত্র মিসেস বাটারফিল্ড ছাড়া আর কেউই নেই। লণ্ডনের কয়েকটি পরিবারে মিসেস হ্যারিস কাজ করেন সকলেই তাঁকে ভালবাসে। সুখ দুঃখের অবিমিশ্র অনুভূতিতে মিসেস হ্যারিসের দিনগুলি কোন রকমে কাটছিল কিন্তু হঠাৎ একটি অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর মনে এক দুরাকাঙ্খার বীজ বপন করার ফলে তাঁর জীবন যাত্রার ধারা বদলে গেল।

তাঁর অন্যতম মনিব লেডি ডন্টের আলমারীতে একটি পোষাক তাঁকে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করলেন এ পোষাক তাঁর চাইই, অনুসন্ধানে জানলেন পোষাকটি খৃস্টিয়ান দিওরের তৈরী, মূল্য চারশ পাউণ্ড। মিসেস হ্যারিস প্রথমে দমে গেলেন বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন, তিনি ভুলে গেলেন যে চারশ পাউণ্ড মূল্যের পোষাক পরিধান করা তাঁর শোভা পায় না। সুরু হল অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। ধীরে ধীরে যখন প্রয়োজন মত অর্থ অর্জন করে মিসেস হ্যারিস প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করছেন ঠিক তখনই উপন্যাসের আরম্ভ।

প্যারিসে পদার্পণ করে মিসেস হ্যারিস, উদ্দাম অথচ কৃত্রিম জীবনযাত্রার স্রোতে ভাসমান কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের জীবনের কৃত্রিম সমস্যার সমাধানে মিসেস হ্যারিস নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। তারপর কেমন করে সব কিছুর সমাধান করে সেই পোষাক যার নাম টেম্পটেশন, পরিধান করে লণ্ডনে ফিরলেন সে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। কিন্তু পোষাকটি মিসেস হ্যারিসের ভোগে লাগল না কারণ একজন অভিনেত্রী সেটিকে অসাবধানবশতঃ পুড়িয়ে ফেলে।

উপন্যাসটির অন্যতম মাধুর্য্য হল, সামান্য গল্পাংশের মাধ্যমে অসীম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ এবং ছোট ছোট ঘটনার অবকাশে কয়েকটি চরিত্রের সার্থক আত্মপ্রকাশ। প্যারিসের কৃত্রিম জীবনবোধের মূলে মিসেস হ্যারিসের সহানুভূতিসূচক বিদ্রূপ রীতিমত উপভোগ্য। অপর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সমগ্র রচনাশৈলীর মধ্যে কোনও কৃত্রিম বিদগ্ধতার আস্ফালন নেই। সরল ও সরস সংলাপ এবং সহজ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটি জটিল মুহূর্তের প্রতিফলন উপন্যাসটির ভারসাম্য রক্ষা করছে।

Flowers for Mrs. Harris: Paul Galico. The Hearst Corporation.

অজিত দাস

রবীন্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী

তপতী মৈত্র

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলী খণ্ড
হরকুমার	গল্পগুচ্ছ	মেঘ ও রৌদ্র	উনবিংশ
হরকুমার	ঐ	মাল্যদান	দ্বাবিংশ
হরচন্দ্র	ঐ	ব্যবধান	পঞ্চদশ
হরমোহন	ঐ	দেনাপাওনা	
হরমোহন বসু	ঐ	পণরক্ষা	দ্বাবিংশ
হরলাল	ঐ	মাস্টারমশাই	ঐ
হরশংকর	হাস্য কৌতুক	খ্যাতির বিড়ম্বনা	ষষ্ঠ
হরসুন্দরী		মধ্যবর্ত্তিনী	অষ্টাদশ
হরিচরণ	হাস্য কৌতুক	আশ্রম পীড়া	ষষ্ঠ
হরিদাস	ঐ	চিন্তাশীল	ঐ
হরিহাস	গল্পগুচ্ছ	হালদার গোষ্ঠী	ত্রয়োবিংশ
হরিনাথ	ঐ	দুর্বুদ্ধি	দ্বাবিংশ
হরিমতি	ঐ	ডিক্টেটিভ	একবিংশ
হরিমতি	ঐ	নামঞ্জুর গল্প	চতুর্বিংশ
হরিমোহন	চতুরঙ্গ		সপ্তম
হরিমোহিনী	গোরা		ষষ্ঠ
হরিশ	গল্পগুচ্ছ	অপরিচিতা	ত্রয়োবিংশ
হরিশচন্দ্র হালদার	ঐ	দর্পহরণ	দ্বাবিংশ
হরিহর	ঐ	উলুখড়ের বিপদ	ঐ
হরিহর	হাস্য কৌতুক	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ষষ্ঠ
হরিহর	গল্পগুচ্ছ	গুপ্তধন	দ্বাবিংশ
হরিহর মুখুজ্যে	ঐ	ত্যাগ	সপ্তদশ
হরেন	গল্পগুচ্ছ	পয়লানম্বর	ত্রয়োবিংশ
হরেন	শোধ বোধ ও কর্মফল		সপ্তদশ ও দ্বাবিংশ
হলা মালী	মালঞ্চ		দ্বাদশ
হাজরা	গল্পগুচ্ছ	ফেল	দ্বাবিংশ
হারাধন	হাস্য কৌতুক	রোগের পীড়া	ষষ্ঠ
হারাণ বাবু	গোরা		ঐ
হারাণ ডাক্তার	গল্পগুচ্ছ	নিশীথে	উনবিংশ
হাসি	রাজর্ষি		দ্বিতীয়
হিমাংশুমালী	গল্পগুচ্ছ	ব্যবধান	পঞ্চদশ

চরিত্রের নাম	গ্রন্থের নাম	গল্পের নাম	রবীন্দ্র-রচনাবলী খণ্ড
হিমি		গৃহ প্রবেশ (নাটক)	সপ্তদশ
		ও	ও
		শেষের রাত্রি (গল্প)	ত্রয়োবিংশ
হীরা সিং	গল্পগুচ্ছ	শুভদৃষ্টি	দ্বাবিংশ
হেমনলিনী	নৌকাডুবি		পঞ্চম
হেমন্ত	গল্পগুচ্ছ	ত্যাগ	সপ্তদশ
হেমন্ত	দুইবোন		একাদশ
হেমশশী	গল্পগুচ্ছ	বিচারক	উনবিংশ
হেমাঙ্গিনী	ঐ	দৃষ্টিদান	একবিংশ
হৈমন্তী	ঐ	হৈমন্তী	ত্রয়োবিংশ
হৈমবতী	ঐ	মুক্তির উপায় (গল্প)	ষোড়শ
			ও
		ঐ (নাটক)	ষড়বিংশ

সমাপ্ত

‘বিজ্ঞান ও সাহিত্য’ প্রসঙ্গে

গত কার্তিক সংখ্যা সমকালীনে শ্রীযুক্ত হিরণ্যপ্রিয় আমার লিখিত ‘বিজ্ঞান ও সাহিত্য’ প্রবন্ধের উপরে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁর মতামতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও মনে হয় তিনি প্রবন্ধটির একটি বিশেষ বাক্যের ক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা বা বক্তব্যকে সম্যকরূপে অনুসরণ করতে পারেন নি, অথবা আমি আমার বক্তব্য পরিবেশনে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছি। সে যাই হোক, আমার বক্তব্যটি ছিল এই—‘পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে স্বতন্ত্র করে রাখার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে; একের সংগে অন্যের বিরোধ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে·····।” একথার মধ্যে আমি বলতে চেয়েছি যে বিদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিক্রম এত স্বতন্ত্র পর্যায়ের যে একটি শাখার ছাত্র অপর বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ থাকেন।

একথা সত্য টেকনলজির ক্লাসে সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি পঠনের ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্যে কেবল নয়,, আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু তার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যতদূর জানি বিজ্ঞানের ছাত্ররা ক্লাসে সাহিত্য পাঠের ন্যূনতম সুযোগ লাভ করেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যদি টেকনলজিভুক্ত করা যায় তাহলে বলবো সেখানেও এ সুযোগ নেই। বাণিজ্য শাখার স্নাতকোত্তর ছাত্ররাও এতে বঞ্চিত। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাসের প্রথম দু-বছরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এম এস সি (টেক) ক্লাসে অর্থনীতি, এবং ঐ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সব শাখাতে ছাত্রসমাজের অতি নগণ্য অংশ বর্তমান। কাজেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা (বিজ্ঞানের) কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকেন।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সমাজ সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সত্যি, কিন্তু আমাদের দেশে সেই পরিবর্তনের ধারা অতি ক্ষীণ। অবশ্য শ্রীযুক্ত হিরণ্যপ্রিয় তাঁর আলোচনার শেষের দিকে এর উল্লেখ করেছেন এবং এমনকি প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থনও জানিয়েছেন। বাংলাভাষায় জন-প্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কাল খুব সাম্প্রতিক নয়, তবে বাংলায় সাহিত্যচর্চার বয়সের তুলনায় তা নিঃসন্দেহে অল্প। এ'রা সহজেই প্রশ্ন তুলতে পারেন এই শুভ প্রচেষ্টাতে ক-জন সাহিত্যের ছাত্র উৎসাহিত হয়েছেন? বাংলা দেশের সাময়িক পত্রিকাসমূহের কর্মধারা অনুসরণ করলে কথাটি প্রাঞ্জলিত হবে। দেশে অনেক সাময়িক পত্র-পত্রিকা আছে। কটি পত্রিকায় বিজ্ঞা-নের প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়? দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের নানা বার্তা পৌছে দেবার কাজে কটি সম্পাদক অগ্রসর হয়েছেন- সম্প্রতি যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রি-কায় রবিবারের সাময়িকী পৃষ্ঠায় কিছু কিছু জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু? অনেক সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরা তাঁদের পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-বার্তা (বৈদেশিক দূতাবাস থেকে প্রেরিত বৈজ্ঞানিক সংবাদের টুকরো) ছেপে যেন দায় পালন করেন। এইভাবে বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে অবহেলিত হয়ে রয়েছে অন্ততঃ আমাদের দেশে। বৈজ্ঞানিক উপন্যাস (কথাটা হয়তো শুদ্ধ নয়, তাহলেও এর অর্থ বোধহয় অপরিষ্কার নয়) মাঝে মাঝে বসুমতী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকাশকেরা

কতটা শ্রদ্ধা এবং উৎসাহের সংগে তা প্রকাশ করতে অগ্রণী হন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বাংলাভাষায় জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পত্রিকা একটি, তাছাড়া বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাকে কেন্দ্র করে আরো দু-তিনটি পত্রিকা আছে। প্রথমটি হচ্ছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। এর দাম বেশি নয়, কিন্তু এর প্রচার-সংখ্যা প্রকাশ করলে লজ্জা পাবার সম্ভাবনা।

আলোচনার মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত হিরণ্যপ্রিয় বলেছেন বিজ্ঞান মানুষের সংগে প্রকৃতির বিরোধ ঘটিয়েছে। এটি সাহিত্যিকের অভিযোগ। প্রকৃতি তার অন্তর্নিহিত রহস্য সর্বদা সংগোপনে রাখতে চায় একথা আমাদের যুগ যুগ ধরে শুনিয়েছেন কাল্পনিকেরা, সাহিত্যসৃষ্টি-কারেরা। প্রকৃতিকে দুর্জ্ঞেয় তারাই বলেছেন এবং কল্পনা করেছেন এর রহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়া বাঞ্ছনীয় তা না হলে তাঁদের সৃষ্ট কল্পলোক, রূপকথার রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এসব সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক মানুষ সাহিত্যিকের কল্পলোকের মায়াজাল ছিন্ন করে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে মানুষের সংগে তার সম্পর্ক নিবিড়তর করে তুলেছেন—আজ মানুষ প্রকৃতির অন্তরে লুক্কায়িত অজস্র রত্ন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে—এতে বিরোধের সূত্রপাত কোথায় ?

মানুষের সংগে মানুষের যে বিরোধ সৃষ্টির কথা সমালোচক উল্লেখ করেছেন তা মেনে নেওয়া গেলেও মানুষের সংগে নিজের আত্মার বিরোধ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান—এতবড়ো অভি-যোগ স্বীকার করা চলে না। অবশ্য তিনি তাঁর বক্তব্যকে যথেষ্ট প্রাঞ্জল করবার প্রয়াস পান নি। একথা সত্যি বিজ্ঞানের যে সব সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার সংগে আত্মার বিরোধ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা গেলেও একে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে না। নিউটনের বিজ্ঞান আমূল বদলে গেল আইনষ্টাইনের গবেষণার ফলে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দেশ ও কাল নিয়ে যেসব তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তার স্পন্দন অনুভব করা গেল আইনষ্টাইনের দেশ—কাল—আপেক্ষিকতত্ত্বের মধ্যে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞানের রথ স্থাবর নয়, জংগম। কাজেই আগামীদিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্যাস-সিক্ত মানুষ নব নব উদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্বের ভেলাতে চড়ে আত্মার সংগে তার নিজের সম্পর্ক আরো গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবে না তা-ও কেউ সজোরে বলতে পারেন না।

বাস্তববাদী সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচক সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, "এদেশে সাহিত্যে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব এখনো তত উৎকট হয় নি। বাস্তববাদী সাহিত্য সাম্যবাদী দেশে প্রসারলাভ করেছে কিন্তু তাতে রসোত্তীর্ণ অংশ কতখানি তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।" এখানে তিনি বাস্তববাদী সাহিত্য বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার হয় নি। যেহেতু যন্ত্রবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবার পরই তিনি এই প্রসংগ টেনেছেন তাহলে কি বুঝবো বিজ্ঞানের প্রভাব পুষ্ট সাহিত্যকে তিনি বাস্তববাদী সাহিত্য বলেছেন? তাই যদি হয় তবে তা কি কেবল মাত্র সাম্য-বাদী দেশে প্রসার লাভ করেছে? এই সাম্যবাদী দেশ কথাটিও প্রাঞ্জল নয়। তাহলে কি ধরে নেবো সমালোচক এতে সোবিয়েত রাশিয়া এবং কম্যুনিজম আদর্শে বিশ্বাসী দেশের কথাই বুঝিয়েছেন? তবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হবে—পাশ্চাত্যের বা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কি বাস্তব-বাদী সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটে নি? অবশ্য যদি বাস্তববাদী অর্থে কম্যুনিজমের আদর্শ বহন-কারী সাহিত্য বোঝায়, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

হিরণ্যপ্রিয়বাবুর আর একটি উক্তি এখানে পুনরায় তুলে ধরবো। সেটি হচ্ছে "যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে মানুষ ক্রমেই উৎপাদন যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে পড়ছে, সমাজ-জীবনে

বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, দুঃখ বেদনার পরিমাণ বেড়ে চলেছে....ইত্যাদি।" এক কথায় তিনি যাবতীয় অশান্তির দায়-দায়িত্ব এই বোবা যন্ত্রবিজ্ঞানের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা কি সর্বাংশে সত্যি? যন্ত্রবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক উন্নতির বহুপূর্বেও কি বিরোধ, যুদ্ধ, হিংসা-দ্বেষের ঘূর্ণাবর্ত সমাজজীবনকে কলুষিত করে নি? দুর্বল কি নিপীড়িত হয় নি, মানুষের দুঃখ বেদনার পরিমাণ কি কোন অংশে কম ছিল? অপ্রাপ্তি এবং অতৃপ্তির জ্বালা তখনো কি ছিল না? যুদ্ধের এবং হিংসার উন্মত্ততা এবং হলাহল কি সমাজ জীবনকে বারে বারে বিশৃঙ্খল করে নি? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যখন এর সত্যতা সহজেই অনুভব করা যায় তখন কেবলমাত্র যন্ত্র বিজ্ঞানের পরে সব দোষ আরোপ করবার এই স্পৃহা কেন? সবচেয়ে দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর মুক্তধারা এবং রক্তকরবী নাটকে যন্ত্রকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে পাঠক সাধারণ তাকে বিভীষিকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না।

আমাদের সাহিত্যিকেরা আজ এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেচেন। আশংকা হয় তাঁদের বিজ্ঞান-বিমুখতা বজায় থাকলে অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ থাকলে এবং পুরাতন সংস্কারের দুর্বল দিকটির প্রতিও অন্ধ মমত্ব অপরিবর্তনীয় হলে, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরোধ ক্রমশই বেড়ে চলবে, যেহেতু এই ঐক্যসাধনে সক্ষম একমাত্র সাহিত্যিকের লেখনী। একারণেই সমগ্র সাহিত্যিকদের একথা পুনরায় ভেবে দেখবার লগ্ন সমুপস্থিত।

অমিয়কুমার মজুমদার

'বিজ্ঞান ও সাহিত্য' প্রসঙ্গে

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার বিষয়ে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচকরা অনুধাবন করবেন বলেই বিশ্বাস করি। অমিয়বাবু আসল চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের অসংখ্য পত্রপত্রিকার শুধুমাত্র কয়েকটিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে কিন্তু আরো দুঃখের বিষয় সমসাময়িক সাহিত্য সমালোচকেরা নতুন কোন লেখকের প্রথম গল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে ভালোবাসলেও সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর কোন উল্লেখ করেন না। এই অভিযোগ থেকে খ্যাতনামা পত্রিকাগুলোকেও বাদ দেওয়া যায় না। বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও রম্যরচনা লেখার পর অনেক সমালোচক ও সাহিত্যের প্রবন্ধ লেখকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে তাঁরা এগুলোকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন না, তাঁদের মতে এগুলো বিশেষ ফিচার মাত্র। ফিচার—এই ইংরেজি কথাটির ওপর আমার আস্থা নেই যদিও কথাটি সাম্প্রতিককালে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাহিত্য আজকাল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও পত্রিকার সংকীর্ণ বন্দরে আবদ্ধ হয়ে আছে বলেই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে না কিংবা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও প্রকাশের পথ পাওয়া যাচ্ছে না।

এপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদেরও দায়িত্ব আছে। দুরূহ শব্দ কন্টকিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে এধরণের প্রবন্ধ আগ্রহের চেয়ে বিরক্তিই উৎপাদন করবে। বিজ্ঞানকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। ছোটদের পত্রিকা থেকেই এ কাজ শুরু করা দরকার। কিন্তু খ্যাতনামা ছোটদের পত্রিকাও ভূতপ্রেত ও রূপকথার গল্পে ভর্তি।

এবার বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রসংগে মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে 'মানুষের আত্মার বিরোধ সৃষ্টি করেছে—একথা অমিয়বাবু মানতে চান নি। সাহিত্য বিবর্তনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ ও ফ্রয়েডী মনস্তত্ব দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। একালের সাহিত্যে একালের সমাজের প্রতিফলন হয়েছে, সে যে পরিমাণেই হোক না কেন। আজকের সমাজে বেদনা দুঃখ বেশী বিকৃত জীবন, অন্তঃসারশূন্য মানবমন আর যৌনক্ষুধা প্রসারিত। এইসব যন্ত্রবিজ্ঞানের জন্যে অনেকাংশে দায়ী তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ নিজের সম্বন্ধে মহত্ববোধ খুইয়েছে। পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসাও তাও ফ্রয়েডের বিচারালয়ে বিচার করা হয়। অর্থনৈতিক কারণ যাই হোক না কেন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যৌথপরিবার প্রথা সবদেশেই ভেঙ্গে পড়েছে এবং এদেশেও তার শুরু হয়েছে।

এই সঙ্গে ধর্মের কথাটাও ধরতে হবে। খ্যাতনামা দার্শনিক হোয়াইহেড বলেছেন যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধর্মপ্রবণতা কমে আসে। একথা সকলেরই জানা আছে যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকট বিরোধ দেখা যাওয়ায় মধ্যযুগের ইউরোপে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে লজ্জিত হতে হয়েছে। আজ বিজ্ঞান জয়লাভ করেছে, সেজন্যে ধর্মের সঙ্গে তার কোন বিরোধ প্রত্যক্ষ করি না সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার সংঘাত কোথায় তা স্পষ্ট বুঝতে পারি না। একথা আলোচনায় আমার গ্যেটের ফাউস্ট-এর কথা মনে পড়েছে, সেখানে শয়তান মানুষকে সবকিছু দিতে চাইছে, সর্বশক্তির বিনিময়ে সে চাইছে মানুষের আত্মা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূর্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিলো, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েছে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এই জন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।' কিন্তু সাহিত্য মানুষ সম্বন্ধে মহত্ববোধ আর জাগ্রত করছে না বলেই মনে হচ্ছে, বাস্তববাদী সাহিত্য সম্বন্ধে তাই আমি সংশয় প্রকাশ করেছি। কম্যুনিজমের আদর্শবহনকারী বাস্তববাদী সাহিত্য যা সাম্যবাদী দেশে প্রসারলাভ করেছে তাতে রসোত্তীর্ণ অংশ সামান্যই। ক্ষেতখামার ও কলকারখানার নিখুত বর্ণনাই যদি সাহিত্য হয় তাহলে সব সাংবাদিকই বড় সাহিত্যিক। আরেকধরনের বাস্তবাদী সাহিত্য হচ্ছে বিকলাঙ্গ জীবনযাত্রা ও অসুস্থ মনোবিকলনের চিত্রণ। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব ব্যর্থ বলে এধরণের চিন্তাধারায় সবদেশের সাহিত্যেই প্রসার লাভ করেছে। জেমস জয়েস, কাফকা প্রভৃতি সাহিত্যিকের প্রভাব বহুদূর প্রসারিত কিন্তু এই প্রভাবযুক্ত সাহিত্য গণচেতনা কোথাও জাগায় নি, পাঠকদেরও বিরক্তি এসেছে, লেখককে শক্তিশালী বলে স্বীকার করে নিলেও এধরণের লেখা পড়ে লোকে আরো অসহায় বোধ করছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির আগে পৃথিবীতে দুঃখ বেদনা ছিলো মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ ছিলো। কিন্তু এত উৎকট ছিলো না, এত সর্বগ্রাসীও ছিলো না তার প্রভাব, মানুষের সঙ্গে তার নিজের বা আত্মার সংঘাতও দেখা দেয় নি। যন্ত্রবিজ্ঞান মানুষের জৈবিক প্রয়োজনগুলোকে যান্ত্রিক করে তুলেছে, সামাজিক সম্পর্কে জটিলতা এনেছে। খ্যাতনামা নগর বিজ্ঞানী লুই হামফোর্ড তাঁর টেকনিকস এণ্ড সিভিলাইজেশান্ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন যে যন্ত্রের স্বৈরাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব নয়। যন্ত্রবিজ্ঞানের সুফল সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কুফল হচ্ছে মানুষের আত্মিক ব্যাপারে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা এথেকেই মুক্তির পথ দেখিয়েছেন মানুষকে যুগে যুগে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' তাই যন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রক্তকরবীরও তাই। রক্তকরবীর নায়িকা নন্দিনী যক্ষপুরীর কারাগার, তার যান্ত্রিক জীবন সমস্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলো তার প্রাণবন্যা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে বলেছেন, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মতো একটা ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।' এটা একালের মানুষের কথা, যে মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবাধীন হয়ে মানুষের সম্বন্ধে মহত্ত্ববোধ হারিয়েছে। সাহিত্য এই মহত্ত্ববোধ পুনরায় জাগ্রত করতে পারে, দুর্বল ঘাসের প্রাণকে আবার ছড়িয়ে দিতে পারে মরুভূমির দিকে দিকে।

অমিয়বাবুর শেষ কথা আমারও শেষ কথা। তাঁর অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ।

হিরণ্ময়

বাংলা উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র : নববিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব কিভাবে হোল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বা তার জন্ম হোল কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করতে হলে তার আগে জানা দরকার কোনো দেশের সাহিত্যে কিভাবে উপন্যাসের উৎপত্তি হয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা না করেও স্বল্প কথায় সূত্রানুসরণ করে বলা চলে,—এই পৃথিবীর নরনারীর জীবনাচরণের প্রতি তীক্ষ্ন কৌতূহল, আধিভৌতিকতার একান্ত স্বীকৃতি, ও জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে এ জীবনের মূল্যায়ন ও সমালোচনা—এই সমস্ত ধারা গল্পকে এক বিশিষ্ট পথে পরিচালিত করে নিয়ে যায় আর গল্প যে রূপ ধরে দেখা দেয় তার নামই উপন্যাস। এই উপন্যাস আবির্ভূত হওয়ার জন্য একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের প্রয়োজন, তা হোল : ছাপাখানা, পত্রপত্রিকা, ছাপানো বই, জনশিক্ষার বহুল বিস্তার ও বিস্তৃত পাঠকসমাজ—যে পাঠক-বর্গ জীবনের বিচিত্র দিক সম্পর্কে সচেতন। যে দেশে যে কালে এ জাতীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এবং উপরিলিখিত মানসিক প্রবণতাগুলি দেখা দিয়েছে সেখানেই উপন্যাস অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ বাহন রূপে না দেখা দিয়ে পারে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাই, শ্রুতিসাহিত্যরূপে রূপকথা উপকথার প্রচলন ছিল। মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকা, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বাঙা-লীর গল্পরসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করত। মৈমনসিংহগীতিকায় প্রবল জীবনাবেগচঞ্চল, এক দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি চিত্রিত হয়েছে। জনজীবনের প্রতি কৌতূহল, দেব-নির্ভরতা-যুক্ত মনের স্বচ্ছন্দলীলা, সমাজের অসঙ্গতির প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি ও ব্যঙ্গশরক্ষেপ—এসব আধুনিক মনোভঙ্গী (বা স্বচ্ছ মুক্ত মানবদৃষ্টি) তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে গল্পকে এক পরিণামমুখী করে তুলছিল।

ঊনিশ শতকে য়ুরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড অভিঘাতে মধ্যযুগীয় সামাজিক জড়তা, নির্বি-কার আত্মকেন্দ্রিকতা, কূপমণ্ডূকতা, স্থিতিশীলতা আমূল আলোড়িত হয়ে উঠল। সমাজ সচল, সক্রিয় ও জটিল হয়ে উঠল। সমাজে নিত্য নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। বাঙালী সে সম্বন্ধে সচেতন হোল। এই সমস্যা সচেতন সক্রিয় প্রতিক্রিয়া থেকে বিদেশী প্রদর্শিত লেখ্য

গদ্যরূপকে বরণ করে নিল, জাতীয় চেতনার সর্বাত্মক ব্যাপ্ত আধার হিসেবে সংবাদপত্রকে অঙ্গীকার করে নিল। এই সাময়িক ও সংবাদপত্রের প্রবর্তনের পর হতে বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ অবাধ হোল। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশন করে সাময়িকপত্র সম-সাময়িক বাংলা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে তাকে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী ও সর্বসাধারণের উপভোগ্য রসসৃষ্টির বাহন করে তুললো।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যা কিছু রচিত হয়েছে তা সব শিক্ষামূলক বা প্রচারমূলক কিংবা বিতণ্ডামূলক। মুদ্রণ যন্ত্র, মুদ্রিত গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, ব্যবহারিক গদ্যভাষা একদিকে, অন্যদিকে সমাজসচেতনতা, শিক্ষাবিস্তার উপন্যাসসৃষ্টির উপযোগী পরিবেশটিকে ক্রমেই গড়ে তুলছিল। তবে এখনও কিছুকাল বাকী আছে বুঝা যায়। এখনও মৌলিক সৃষ্টির উপযোগী জীবনভূমি গড়ে উঠেনি। এখনও সাহিত্যিক সৃষ্টির উপযোগী মসৃণ সাবলীল সৌন্দর্য্যপূর্ণ কলাকুশল স্থিতিস্থাপক বাংলা গদ্য গড়ে উঠে নি।

কিন্তু গল্পরসের পরিতৃপ্তি হওয়া চাই। তাই ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী থেকে অনুবাদ চল্ল। ইতিহাসমালা, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, তোতা ইতিহাস, রাজাবলী, পুরুষপরীক্ষা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র,—ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থমালার এই বইগুলি; বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কথামালা (ঈশপের গল্প অবলম্বনে) ভ্রান্তিবিলাস (কমেডি অব এররস-এর স্বাধীন অনুবাদ); তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, রামগতি ন্যায়রত্নের অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের দশকুমার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেলিমেকস, নীলমণি বসাকের নরনারী, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের রবিনসন ক্রুসোর জীবনচরিত (রবিনসন), বৃহৎকথা ২ খণ্ড (কথাসরিৎ সাগরের অনুবাদ—আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ), ক্রীলফের নীতি গল্প, হংসরূপী রাজপুত্র, ছোট কৈলাশ বড় কৈলাশ, জাহানিয়ার চরিত্র, নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবনবৃত্তান্ত, সুশীলার উপাখ্যান (মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের এই বইগুলি)। এই বইগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গল্পরসের প্রবণতা কোনদিকে চলেছে —নীতিগল্প ও রূপকথা থেকে সজীব নারী চরিত্র রচনায় (নরনারী), ঐতিহাসিক জীবনবৃত্তান্তের প্রতি আকর্ষণ হৃদয়রসে জারিত করে প্রাচীন সাহিত্যের কাহিনীকে সঞ্জীবিত করে তোলা (শকুন্তলা, সীতার বনবাস)।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিক্ষা বাংলা ও বাঙ্গালীর চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। আমরা চোখ মেলে তাকাই—নতুন দৃষ্টিতে সব কিছু বুঝতে, জানতে ও চিনতে শিখি—নতুন জীবনের স্বপ্নে মশগুল হই। কল্পনার পাখা মেলে পাশ্চাত্যের সেই জীবনাদর্শলোকে উধাও হন মধুসূদন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য যুবকেরা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিতপ্রজ্ঞা মহাপুরুষ দেশসংগঠনের ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনশিক্ষার বহুল বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বিধবাবিবাহ আইনপ্রবর্তন, কৌলীন্যপ্রথা উৎসাদন ও বহুবিবাহের বিরোধিতা করে নতুন সমাজকে গড়ে তুলতে চাইলেন। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে দেশে স্বদেশী ভাব গড়ে উঠতে লাগল। সিপাহীবিদ্রোহ, নীলহাঙ্গামা, হিন্দুমেলা দেশে জাতীয়তাবোধ জানাতে লাগল। কল্পনার আদর্শজগৎ থেকে দৃষ্টি দেশের মাটিতে প্রসারিত হোল। পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যুক্তিবাদ ও ভোগবাদ —অনুযায়ী আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে দেখবার ও রূপ দেবার চেষ্টা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সমকালীন বাংলাদেশে পরিবার সমাজ ও

সাধারণ আচার আচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দুরপনেয় সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার প্রতি পর্য্যায়ে জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধে এর নিদর্শন মিলবে।

এর আগেই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় ও রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য লেখকের গদ্যরচনায় সমাজ সমালোচনার মনোভাব দেখা দিয়েছিল। এই মনোভাব সমাজের টুকরো টুকরো ছবি ব্যঙ্গ কটাক্ষের খোঁচায় তুলে ধরেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস (১৮২৩) কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), দূতীবিলাস (১৮২৫), নবিবিবিবিলাস (১৮৩০) এবং পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা'য় (১৮৬২) এই সমাজ-ব্যঙ্গ চিত্র দেখা দিয়েছে। এরই পরিণত রূপ "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮) উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যায়, আর এক ধাপ এগোলেই উপন্যাসের রাজ্যে পেঁছে যাবে বাংলা সাহিত্য। হানা ক্যাথেরীন মুলেনের "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"ও (১৮৫২) ধর্মপ্রচারনার জন্য যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। তবে উপন্যাসের দিন ঘনিয়ে এসেছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন, কুলীনকুলসর্বস্ব ইত্যাদি নাট্যরচনার প্রযুক্তিতে সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্ররূপায়ণের আদর্শ তথা জীবনকে তন্ময় ভাবে দেখবার অভ্যাস বাংলার লেখক সমাজে গড়ে উঠে। মানবজীবনের পটভূমিরূপে প্রকৃতিকে দেখার যে একটি বিশেষ দৃষ্টি তাও প্রকাশ পেয়েছে লেখকদের মধ্যে। ঈশ্বরগুপ্তের পদ্যে, মধুসূদনের কাব্যে, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে এর পরিচয় মিলে। এমনকি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিতের পাতায় এর প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সেক্সপীয়রের রচনা জীবনদর্শনের দিকনির্দেশ করে। এভাবে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান ও অনুষংগগুলি বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজে দেখা দেয়। কিন্তু তবু উপন্যাস সৃষ্টি হোত না, অন্ততঃ স্বাভাবিক বিকাশের পথে উদ্ভব হোত না এত তাড়াতাড়ি, যদি না আমাদের লেখকদের চোখের সামনে পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শ থাকত। একদিকে মনে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের স্বপ্ন ও কল্পনা; অন্যদিকে বাস্তব সমাজজীবনকে দেখা, প্রকৃতিকে দেখা, ব্যঙ্গ দৃষ্টি, চরিত্র সংলাপের মাধ্যমে জীবনচিত্র রচনার প্রচেষ্টা—এসব মিলিয়ে উপন্যাসের রূপসৃষ্টির সম্ভাবনা একান্ত হয়ে ওঠে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা ও তার আলোচনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে তাঁর ভাবকল্পনার সানুরাগ স্পর্শ মিলে তাঁর "ঐতিহাসিক উপন্যাসে"র (১৮৫৭) গল্পকে সম্ভব করে তুলেছে। ডক্টর সুকুমার সেন এর অন্তবর্তী একটি গল্প "অংগুরী বিনিময়" বিশ্লেষণ করে উপন্যাসের নীহারিকারূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এর গল্পের গ্রহণে উপন্যাসোচিত পরিণতিবোধ ও সমস্যাসচেতনতা আছে, দুর্বল হলেও অখণ্ড জীবনবোধের প্রেরণাও আছে।

কিন্তু এখনও বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হোল না। অহল্যা যেমন রামচন্দ্রের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায়, বা রূপকথার গল্পের রাজপুত্র সিংহের কংকাল কাঠামোয় প্রাণসঞ্চার করে তেমনি যে সাহিত্যিক প্রতিভা বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখে তার অপেক্ষা করছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আমাদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ করল।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনেই ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ সাধুরঞ্জনে অনেক গদ্য-পদ্য রচনা লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনের শেষে 'রাজমোহনস ওয়াইফ' লেখেন (১৮৬৪)। এতে উপন্যাসসাহিত্যকে বরণ করবার আভাস পেলাম। ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে ইংরেজীতে সাহিত্যরচনার গতানুগতিক প্রয়াস তিনি করেছিলেন। পরে

কিন্তু তিনি এ বইটিকে একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন— গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেও প্রবৃত্তি হয়নি, এতেই বুঝতে পারা যায়, তিনি তাঁর পূর্ব মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন।

তৎকালীন কোঁৎপন্থী হিতবাদী দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। যাতে অধিক সংখ্যক লোকের হিত হয় তার সাধন তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কর্মজীবনে তিনি দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। এর থেকে তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রেরণার নির্দেশ দিয়েছেন "জাতীয় জীবনে যুগসংকট—সেই সংকটে মানবপ্রভৃতি ও মানবইতিহাসের অনুধ্যান: হইতেই পূর্ণমনুষ্যত্বের ধারণা; সেই মনুষ্যত্ব সাধনার জাতির স্বধর্ম-রক্ষার আবশ্যকতাবোধ, এবং তজ্জন্য স্বজাতিপ্রীতি হইতেই সাহিত্যের প্রেরণালাভ—বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তগহনের এই ঘটনাপরম্পরা স্মরণ রাখিয়া বঙ্কিমসাহিত্যের শিল্পশালায় প্রবেশ করিতে হইবে।"

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তাঁর দেশ ও কালে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দেশকালপাত্র সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। পৃথিবীর অনেক বিশিষ্ট উপন্যাসিকই ছিলেন কর্মী পুরুষ—সারভেন্টিস, র‍্যাবনে, হার্ডি। অর্থাৎ তাঁরা বাস্তব জীবনে কর্মীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, এরই অতিক্ষেপ উপন্যাসে ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কর্মীর ভূমিকাটি তাই স্মর্তব্য। তিনি মননশীল ব্যক্তি ছিলেন—বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ জাতীয় প্রবন্ধরাজি তার নিদর্শন। সমাজসচেতনতাও তাঁর ছিল—সমাজের অসংগতি, ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁর শাণিত কটাক্ষ "লোকরহস্যের" পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনন, সমাজ সচেতনতা, কর্মীর যথার্থ কর্মরূপের অভীপ্সা সমাজের ছোটখাট চিত্রকে অবলম্বন করে গল্পকথার টুকরো রূপে এখানে দেখা দিয়েছে। এবার তাঁর ইতিহাসের প্রতি ঔৎসুক্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঐতিহ্যসচেতনতা সেকালের নব্যশিক্ষিত যুবকদের রোমান্টিক তৃষাকে পরিতৃপ্ত করেও দেশকালপাত্রের অখণ্ড ধ্যানের মূলে বিরাজ করছে। এপর্যন্ত পৌঁছে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদাহরণ দেখেও যে "যুগলাঙ্গুরীয়" লিখতে পারবেন না একথা ভাবতে পারি না। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ লিখবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটা মানসিক অবসাদ দেখা দিয়েছিল, এরকম অনুমান করেছেন প্রমথনাথ বিশী (ভূমিকা কমলাকান্তের দপ্তর)। এই মানসিক অবসাদকালে দুর্বলতার ক্ষণিক ছিদ্রপথে তাঁর অন্তরতম প্রাথমিক কল্পনাশক্তি ও গল্পরসের পরিচয় "যুগলাঙ্গুরীয়"তে পাওয়া যাবে, এ আশা আমরা করতে পারি। "বঙ্গদর্শন" যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন আমরা তাই চমকে উঠব না। কেননা, এহেন ব্যক্তির এজাতীয় একখানা মুখপত্র একান্ত দরকার ও অবশ্যম্ভাবী। মননচেতনা, রাজমোহনস্ ওয়াইফের গল্পরসপ্রবণতা, দেশ ও কালের বুকে কর্মীর যথার্থ কর্মরূপের অভীপ্সা বঙ্গদর্শনের প্রশস্ত বক্ষ ছাড়া কোথায় আপনাকে প্রসারিত ও উদ্ঘাটিত করতে পারবে? এসবই উপন্যাসিকের গুণ বা লক্ষণ; কিন্তু এই লক্ষণগুলি থাকলেই একজন বড় উপন্যাসিক জন্ম নেবেন একথা বলা যায়না। তিনি ওয়াল্টার স্কট, জর্জ এলিয়ট, ডিফেন্স, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং প্রমুখের উপন্যাস নিশ্চয় পড়েছিলেন। আর সেক্সপীয়ারের নাটকগুলির উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এসব থেকে কল্পনার ঐশ্বর্য্য ও কবিত্বের পরিচয় লাভ করেছিলেন। কবিতা ও কাব্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ সাহিত্যজীবনের গোড়াতেই প্রকাশ পেয়েছিল। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন, তার সুস্পষ্ট অঙ্কুর আছে—তাঁর প্রথমজীবনের কবিতাগুলিতে। সুতরাং তাঁর মনের মূলকেন্দ্রে কবিত্বের সোনার কাঠি বিরাজ করছিল। এই কবিত্বের সোনার কাঠি মনন ও বিবিধ বিষয়ে চিন্তা, ঐতিহ্য ও সমাজ সচেতনতা সমস্তকে কিভাবে রসমধুর পরমরমণীয়

রূপ প্রদান করতে পারে তার জ্বলন্ত নিদর্শন "কমলাকান্তের দপ্তর।" এর পরের ধাপেই আমরা উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনিবার্য্যরূপেই লাভ করি ।

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

কবিতার রূপচর্যা প্রসঙ্গে

শব্দ এবং ধ্বনির রাজ্যই কবিতার রাজ্য। এর একপ্রান্ত সংগীতের দিগন্তে প্রসারিত অন্যপ্রান্ত চিত্রকলার ডার্করুমে। আক্ষরিক সমষ্টির যে অর্থ কবিতা তারই বাহক, কবিতার সামগ্রিক চেহারায় শব্দ এবং ধ্বনির বিচিত্র সমারোহ—অর্থের উজ্জ্বল উপস্থিতি পাঠকের ঘুমন্ত বোধকে মুহূর্তমাত্র স্পর্শ করে এবং জয় করে। অর্থাৎ কবিতার প্রভাবে পাঠক সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। পাঠকের মনের সেই বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে হৃদয়ের দুটি উপ্ত বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে। একটির রস—উপলব্ধির পুণ্য গগনে সুরের আকারে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যটির রূপ—প্রতিফলিত হয় ডার্করুমে রক্ষিত অ্যাসিড প্লেটের নেগেটিভের ওপর।

রূপকার কবি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কবিতার রূপ চর্চায় তন্ময় হয়ে থাকে। একথা বললে অনেকে স্বভাবতই একটু তির্যক ভংগীতে অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে মনে মনে বক্তব্যের বিরুদ্ধে মত পোষণ করবেন। অবশ্য যদি শুধুমাত্র কবিতার শরীরের ওপর রূপকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, যদি তার অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্পর্শমণি শরীরের বহিরাঙ্গের ভূষণমাত্র হয় যদি রসোত্তীর্ণ উপলব্ধির আকাশে পাঠককে বিহ্বল করে, দিকভ্রান্ত করে। তবে আমিও একথাই বলব যে কবিতার শরীর—তার রূপ-সৌন্দর্য ব্যতিরেকেই পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখুক, তার মনের অঙ্গনে ভাব-ভাবনার সপ্তডিঙ্গা অনায়াসে বিচরণ করুক।

কিন্তু কোন সৎ কবির কাছে কবিতার শরীর এবং মন. একের রূপারোপ এবং অন্যের সাধনা—এ দুটিই সম্ভব।

রূপকারের দক্ষতায় কবিতার শরীরী সত্বা এবং ঋষির তন্ময়তায় তার অশরীরী আত্মা, পাঠকের দায়িত্বে তার সশ্রদ্ধ পাঠ এবং সহৃদয় বিচরণ—কবিতার জগত মোটামুটি এই। কিন্তু, সমস্ত কাব্য পিপাসার মূলে, যখন পর্যন্ত মন আক্ষরিক হয়নি তখন থেকেই হৃদয় সঞ্জাত কতকগুলি মানবীয় কল্পনা, দুর্বলতা পাঠক, তথা লেখক উভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলাফেরা করে। এই যাতায়াতের পথ বিচিত্র। কোথাও এর সমৃদ্ধি অযত্ন তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ পান করায়, কোথাও এর উষরতা প্রশান্তকে পিপাসার্ত করে তোলে চঞ্চল করে তোলে।

তবে কি এই উপলব্ধির গতিপথ আমাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞাত থাকবে? এই তর্কের প্রত্যুত্তরে বলা যেতে পারে, দিকচক্রকালে রামধনুর রং বদলানোর দায়িত্ব প্রকৃতির আপন হাতে, বুদ্ধির আলো এখনো অতদূরে পৌঁছোয় নি।

সংগীতের রাজ্য বলতে কবিতার গীতাংশ নয়, কাব্যের গীতিময়তার ইংগিত। গীতিময়তার দিকে রচয়িতাকে দৃষ্টি রাখতে হয়না, এ তার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ বলে ধরে নিতে পারি। রচনার উচ্চারণে শ্রুতির আরাম, এ বোধ হয়ত সাহিত্যের বোধ নয়, প্রাক সাহিত্য পৃথিবীর গীতিময় বিহঙ্গ-কাকলির মন্ত্রশক্তির বোধ। রচনার শরীরে এই স্বাভাবিক একটি রং রূপকারের দক্ষতাকে আজকের পৃথিবীতে হয়ত হেয়ই করে তুলবে (অনেকে এই ধারণাই

পোষণ করেন) কিন্তু তন্ময় পাঠকের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তিতে পেঁৗছে দেবে, এ বিষয়ে আমি আজকের পৃথিবীর নাগরিক হয়েও নিঃসন্দেহ।

এাবারে চিত্রময়তার প্রসঙ্গে যদি বলি কবিতাপাঠে পাঠকের হৃদয়ের নেগেটিভে প্রতিভাত রূপকল্প, বুদ্ধি এবং মননের মহামিলনই রসের উৎপত্তি এবং এই রসসৃষ্টির মহান দায়িত্বই কবির, তবে কি অতিশয়োক্তি হবে? ভাষা চিত্র এবং ভাবনার পরিভাষা মাত্র। এ দুয়ের অব্যক্ত এবং অদৃশ্য উপস্থিতি ভাষ্যকার কবি অথবা লেখক। যদি বলি ব্যঞ্জনার রূপ আছে, যদি বলি ভাবনার নিঃসীম আলোর চেহারা আছে, তবে অনেকেই একটু বিব্রত হবেন, কিন্তু যখন সত্যই নিমজ্জিত রস আহরণে আমরা বিমুগ্ধ হই তখন কি আমাদের দৃষ্টিপথ মহাশূন্য বিরাজমান, না, সেই মহাশূন্যের চন্দ্রাতপে বিন্দু বিন্দু গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটতে দেখি?

প্রসাধন, পারিপাট্য এবং পরিণতত্ব কবিতায় এই তিন সর্তের আলোচনায় এসে দাঁড়ালে দেখব, কবিতার চেহারা কেমন হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ এক একটি অক্ষর, মূল বক্তব্য, ভাবরস, এবং ছিন্ন-চিত্র সমাবেশ সমগ্র কবিতাটি পাঠকের কাছে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে। শব্দ চয়ন, ধ্বনি, উপমা, অর্থ বিশ্লেষণ এবং গ্রন্থণা—যদি একটি পরিণত পরিমণ্ডলের অবতারণা করতে সক্ষম হয় তবে প্রথমাংশেই রসপিপাসু কিছুটা আনন্দিত হতে পারে। আমি কোন অবস্থাতেই একথা বলছি না যে উল্লিখিত সর্তগুলি যে কবিতায় বিদ্যমান নয়, তা কবিতা পদবাচ্য নয়। তবে একটি কথা বলা চলে যে পরিমণ্ডল বলতে শুধুমাত্র 'অ্যাটমোস্‌ফিয়ারে'র বঙ্গানুবাদ করলে চলবে না—কারণ অন্যান্য শর্ত নিরপেক্ষ পরিমণ্ডল শুধু মাত্র রসসৃষ্টির ক্যানভাস মাত্র।

আজকাল কিছু কিছু কবিতায় শুধুমাত্র প্রচুর অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টিতে ভারাক্রান্ত কিছু পরিবেশ রচনার যে চেষ্টা করা হচ্ছে মনে হয় সেই অনুপাতে অন্যান্য কর্তব্যের দিকে কবির দৃষ্টি সমানুপাতিক সন্নিবিষ্ট নয়। তাই বহু কবিতা সামঞ্জস্য-হীনতা দোষে দুষ্ট। আত্ম চৈতন্যে সজাগ লেখনী অনায়াসে এহেন অপবাদের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু ছন্দ, মাত্রা প্রভৃতি বিষয়েও আমরা আজ সম্পূর্ণ উদাসীন। দেখছি, অনেক ক্ষেত্রে কবিতায় এ-সবের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও লেখক যেন সচেষ্ট ভাবেই এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। ফলে, কবিতায় স্বাভাবিকতা হয়ত একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে যদি রচয়িতার দৃষ্টি নিজের পূর্ব-আহৃত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে না থেকে সঞ্জাত বেদনার দিকে একটুও আলোকপাত করত তবে রচিত কবিতা শুষ্ক, নিরস হতে পারত না।

ভাস্কর জানে কোন পাথরে কোন কাজ সুন্দর হয়ে উঠবে, তাই তাকে সমান্তরাল প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি ছেড়ে ছুটতে হয়েছে পর্বতের গুহায়। সমুদ্রের বিভীষিকায়। চিত্রকর প্রকৃতির কাছ থেকে তার পাত্রে রং মেশানো শিখেছে, তাকে সর্বদা রূপরচনায় ব্যস্ত থেকেও রং এর ভুলচুকে সজাগ থাকতে হয়েছে। এমনকি ময়রার কাছেও তার বিভিন্ন মিষ্টান্নের জন্য বিভিন্ন পাকের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। নারী জানে তাকে অর্চনায়, অভিসারে—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রসাধনে সাজতে হয়। এবং কবিকেও জানতে হয় এসবের সমস্ত সর্তগুলো তাকে একা, পৃথিবীতে তার হাতে দায়িত্বের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

'একটি ছত্রে আমি হাসি কান্নায় তছনছ হয়ে যেতে পারি'—একদিন আমার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন। এবং তার পরেই বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের কারণ কবিরা পাঠক

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন।'

আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু সে প্রতিবাদের মধ্যে তেমন জোর ছিল না। জোর থাকার কারণ, হয়ত আমিও বিশ্বাস করি, যদিও রসগ্রহণের জন্য সচেষ্ট পাঠক প্রয়োজন, রসস্রষ্টাও তার আপন সুখ দুঃখেই নিমজ্জিত—নির্লিপ্ত নয়। কান্নায় বিজড়িত সংলাপ তাই অব্যক্ত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত বক্তব্য তাই প্রগলভতায় অস্পষ্ট। যেখানে আত্ম বিসর্জনের মুহূর্তে আত্ম-চৈতন্যের শুভ্র স্পর্শে পরিশোধিত সেখানেই পাঠক এবং কবির, স্রষ্ঠা এবং রসগ্রহীতায় পরস্পর মহামিলনে সম্মুখ।

যদি আংগিকের প্রশ্ন তুলি তবে বলব কবিতায় শরীরও মানুষের মত প্রসাধনের অপেক্ষা রাখে, এবং তার রুচি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তার সেই নিবিড়-বেদনা-ঘন সংবেদনশীলতা অথবা হাস্যোকরোজ্জল উজ্জলতা কালিদাসের আমল থেকে আমাদের বর্তমান আমল পর্যন্ত প্রবহমান। টেকনিকের প্রশ্ন, এক্সপেরিমেন্টের অবকাশে সব সময়েই থাকবে, কিন্তু টেস্ট টিউবে পুণঃ পুণঃ বিস্ফোরণ ঘটাতেও যদি বৈজ্ঞানিক সাবধান না হয় তবে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই মানুষ জোট বাঁধবে।

প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে বিক্ষত মানুষ যদি চিত্তবিমোদনের জন্য অথবা আপন মানসিকতায় অনুরূপ কোন কবিকে খুঁজতে কবিতা পড়েন তবে, তাতে আপত্তির প্রশ্ন ওঠেনা, এমন কি পাঠক দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর তার মনমতো কাউকেও খুঁজে না পেতে পারেন। কিন্তু কবিরা যেন কাব্যমন্দিরের চাবিকাঠি আত্ম অহংকারে হারিয়ে না বসেন। কারণ, এমন দিনও তো আসতে পারে, সেদিন একজন রসিকের জন্যও দুয়ার খোলা রাখতে হতে পারে। এবং সবশেষে আমরা যেন মনে রাখি কবিতা উজ্জল, কবিতা ছন্দু ঃ অন্ধকার অথবা ছায়াচ্ছন্ন প্রলাপ মাত্র নয়।

শান্তি লাহিড়ী

গীতিকবি মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে বহু কীর্তি এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী হয়েও আজ পর্যন্ত বহু বিতর্কিত একটি শিল্প-ব্যক্তিত্ব। অথচ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে তিনি প্রথম এবং একক মহাকবি; প্রথম এবং প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ সনেট রচয়িতা; প্রথম এবং অদ্বিতীয় পত্রকাব্য-প্রণেতা; বাংলা কাব্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। প্রথম না হলেও একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এবং অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন স্রষ্টা। এবং সব মিলিয়ে আমাদের সাহিত্যে অতৃতীয় সাহিত্য-পুরুষ। তবু তার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনার শেষ নেই। আবির্ভাব লগ্নে জগবন্ধু ভদ্রের "ছুছুন্দরী বধ কাব্য" রচনা থেকে শুরু করে বালক রবীন্দ্রনাথের সুতীব্র কঠোর সমালোচনা (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং সর্বশেষ একালের কবি-পণ্ডিতের তাঁর বাংলা-ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রশ্ন—এ সমস্তই ছাপার অক্ষরে তার বিরুদ্ধ দলিল হয়েছে।

অন্য দিকে এই একই কবি ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সমকলীন মনীষীদের অজস্র উজ্জ্বল উক্তি, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক অভিনন্দন পত্র, ঋষি বঙ্কিমের শ্রদ্ধানত উক্তি এবং সর্বশেষে কবি সমালোচক রসবেত্তা আচার্য মোহিতলালের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যবিশ্লেষণ-এ সব আমাদের যুগপৎ মনে পড়ে।

একই কবি সম্পর্কে এমন অজস্র বিরুদ্ধ সমালোচনার সমাবেশের কারণ হিসাবে, আমার মনে হয়, সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রায় প্রস্তুতিপর্বহীন আকস্মিক আবির্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত কলাসিদ্ধি এর জন্য প্রথমতঃ দায়ী। কিন্তু মাইকেলের সাহিত্য-জীবন কি সত্য সত্যই প্রস্তুতিহীন? কালবৈশাখীর ও যে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব থাকে—আমরা তা জানি না। আর জানি না বলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই প্রতিভাময় যুগন্ধর কবি পুরুষের ও প্রোজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যমুখর জীবনচর্যার অন্তরালে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে অনায়াসেই জানতে পারব—তাঁর আপাতঃ ইয়ং বেঙ্গলী কালাপাহাড়ী জীবন ধারার গভীরে রয়েছে—সেই প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস। বহিঃস্বভাবে বিলাসী এবং উচ্ছৃংখল জীবনাচরণের মর্মমূলে "তাঁর সারস্বত চেতনা ধ্যানী যোগীর মতই ছিল সুস্থির অতন্দ্র।" মহাকবি হবার মহত্তর তপস্যায়—সংযম কৃচ্ছ্রতার আলোকে যেন উজ্জ্বল পবিত্র একটি তীব্র তন্ময়তা। বাল্য কাল থেকেই তাঁর একনিষ্ঠ জ্ঞান তপস্যা তার ভবিষ্যৎ কবি-সিদ্ধির পথকে করেছিল অবারিত। তাছাড়া, বিশেষ করে কবি মানসের মর্মমূলে জননী জাহ্নবী চরিত্রের প্রভাব, বিশপস কলেজে তাঁর পঠন পাঠনের ইতিহাস এবং মান্দ্রাজ-প্রবাসে তাঁর জ্ঞানান্বেষণের ইতিবৃত্ত যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে একথাটি সহজেই প্রতিভাত হবে যে বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের আবির্ভাব মোটেই প্রস্তুতিহীন নয়। যদিও প্রত্যক্ষ গোচর নয় এবং তাঁর সাহিত্য জীবন ছিল অতি স্বল্পকাল স্থায়ী (১৮৫৯—১৮৬২ এবং পরে আর এক বছর ১৮৬৬—চতুর্দশপদী রচনার কাল।)

অনেক সময় তাঁর অতি মাত্রিক জীবনাচরণের জন্য তাঁর সাহিত্য-জীবনের পিছনে আমাদের দৃষ্টি প্রায়ই প্রসারিত হতে পারে না। এবং এই কারণেই তাঁকে ভুল বোঝা খুবই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই প্রথাসিদ্ধ দেশে তথাকথিত প্রথাবিরুদ্ধ জীবনাচরণ অনেকেই খুব সহজভাবে নিতে পারেন নি। তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ, বিদেশিনী পত্নীলাভ এবং অতিরিক্ত পানাসক্তি প্রভৃতি ব্যক্তি চরিত্রের এই সব অতিচারিতা এবং অমিতচারিতা এই সনাতন দেশে তাঁর বিস্ময়কর শিল্পসিদ্ধিতেও আবিষ্ট করে রেখেছে। সহজভাবে পারিনি তার মহৎ সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে। কবির আদি জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তো স্পষ্ট করেই তাঁর পরধর্ম গ্রহণ তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট ও ব্যর্থতার মূল বলে উল্লেখ করেছেন।

এবং তৃতীয়তঃ কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন নি কবি—তাই তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তিতে অনেকেই আমরা দ্বিধাহীন। যেটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অসম্ভব। শিল্পী কবি সাহিত্যিক কেউই পূর্ণ নন; ত্রুটি-বিচ্যুতি অপূর্ণতা কিছু থাকবেই। এবং যুগে যুগে তার নব নব মূল্যায়নে এসব ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ ও নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মাইকেলের ভাগ্যে নিন্দা প্রশংসা দুটোই জুটেছে বেশী মাত্রায়। তাঁর প্রতিভার অমিত ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ও এর জন্য দায়ী।

তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী সাহিত্য জীবনে যেন একই সঙ্গে 'উষার আনন্দচ্ছটা এবং গোধূলির অস্তরাগ এসে মিশে গেছে। উদয়-দীপ্তির সঙ্গেই যেন শেষ বেলাকার সন্ধ্যারতির ম্লান অস্পষ্টতা। আর এই স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য জীবনে খ্যাতি ও কীর্তির উত্তুঙ্গ মুখরতা অনেকের কাছেই ছিল সেদিন অপ্রত্যাশিত। তাই সাহেব মাইকেল বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়। এই আবেগেই কেউ চড়াসুরে তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছেন অকৃপণ প্রশস্তি, কেউ বা হতচকিত বিপন্ন বিস্ময়ে নিন্দায় হয়ে উঠেছেন পঞ্চমুখ।

"উপমা যদি দিতেই হয় তবে বলিব যে মধুসূদনের প্রতিভার উপমান সূর্য বা চন্দ্র বা অত্যুজ্জ্বল কোনো গ্রহনক্ষত্র নয়, তাহা উল্কা।—বলেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন। বস্তুতঃপক্ষে মাইকেল-প্রতিভার এই বিশেষ স্বরূপের জন্যই আজপর্যন্ত তিনি আমাদের সাহিত্যে বহু বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিটি বস্তুর জন্ম, বৃদ্ধি এবং পরিণতি যেখানে জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতি সবটাই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর—সেখানে আমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে না। জীবনের মূল্যায়ন হয় সহজ। আমাদের সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই ধরা যাক ঃ—তিনি যেন সহস্রদল পদ্ম— ; একটি একটি করে তার পাপড়ি খুলেছে এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এবং পূর্ণের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন।—একটি সুষম ছন্দে জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতি নিয়ে সে জীবন পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে আলোর আঙিনায়। কিন্তু মাইকেলের জীবন অন্য ধাতুতে গড়া—; সেখানেও ছন্দ রয়েছে—কিন্তু সে ছন্দ একসঙ্গে ভাঙার ও গড়ার ছন্দ। সে যেন দ্রুতলয়ের ঝাপতাল উল্কার প্রলয়দীপ্ত পুচ্ছের চোখ ঝলসানো বিদ্যুদ্দীপ্তি। আবেগ অভীপ্সা আনন্দ প্রজ্ঞা যন্ত্রণা ব্যর্থতা আঘাত অন্ধতা সব মিলিয়ে যে একটি বিশেষ যুগ বাংলার মর্মমূলে নবজন্মের স্বীকৃতিতে স্পন্দিত হয়ে উঠ-ছিল—তারই অন্য নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যুগ প্রেরণার সম্যক প্রতিফলন আমরা দেখতে পারি মাইকেলের জীবনে ও কাব্যে, যুগপৎ সেই প্রেরণার শক্তির ও দুর্বলতার স্বাক্ষর। বাংলার নবজাগৃতির সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি মাইকেলের বিচার করতে বসি তাহলেই মনে হয়, তাঁর সৃষ্টির সম্যক মূল্যায়ণ হবে সম্ভব। অযথা নিন্দা প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে সত্যভ্রষ্ট হব না।

এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আলোচনা করব ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মশায়ের "গীতিকবি শ্রীমধুসূদন" বইখানি। একটি সদা জাগ্রত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনি মাইকেলের কাব্য সাহিত্যের নবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো—যে তিনি একটি বিশেষ

দৃষ্টিকোণ থেকে মাইকেল প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারায় মাইকেলের স্থান কোথায়, পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরীদের সঙ্গে তুলনা করে কী তাঁর দান—কোথায় তাঁর ত্রুটি ও দুর্বলতা—সবই তিনি যুক্তির এবং ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তার বিচার স্থাপনে উচ্ছ্বাসহীন অথচ সহানুভূতিশীল, অর্থাৎ যে সহানুভূতিশীলতা সমালোচকের কাছে অবশ্য প্রত্যাশিত তা থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হন নি। অথচ আবেগের প্রবাহে তিনি কোথাও ভাবাতিরেকে সামান্য অতিশয়োক্তি ও করেন নি। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ অথচ মর্মানুসারী।

আবেগহীন একটি সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে তিনি পূর্বাপর ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে মাইকেলের গীতিপ্রাণতার উৎসসন্ধান করেছেন। তবে তাঁর এই ধরণের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মাইকেল প্রতিভার বিচার পূর্ণায়ত হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে বর্তমান সমালোচকের জিজ্ঞাসা রয়েছে। যেহেতু মাইকেল একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের কবি,—ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বাণীকার—,জীবনে ও কাব্যে তিনি ধারণ করে আছেন সেই সমগ্র যুগকে; তার অমৃত হলাহল দুইই, তাঁর বিচার বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে কেবল মাত্র ইতিহাসের দর্পণে। তিনি গীতি কবি, তিনি মহাকবি, তিনি নাট্যকার, তিনি সনেটের স্রষ্টা, তিনি প্রহসনকার,——তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা। কিন্তু এহো বাহ্য। তিনি আরো অনেক কিছু। সেই অনেক কিছুর সন্ধানই যথার্থ মধুসূদনের মূল্যায়ণ। মাইকেলকে কেবলমাত্র গীতি কবি, মহাকবি বা নাট্যকার হিসাবে বিশেষ করে দেখলে তাঁর সত্যিকার পরিচয় যেন খণ্ডিত হয় বলে আমার ধারণা। অবশ্য সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে এধরণের আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

অবশ্য ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর বইয়ের অনেক জায়গায়ই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা প্রসারিত করেছেন। সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণে যুগবিচার যে কতটা প্রয়োজনীয় এসম্পর্কে তিনি সর্বদাই সচেতন। গ্রন্থের ভূমিকা অংশটিতে এর অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য মশায় তার বক্তব্য উপস্থাপনায় প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল, ঋজু ও সাবলীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাসত্ত্বেও তিনি বিস্ময়কর ভাবে পূর্বপক্ষকে আক্রমণে তীব্র—তীব্র হয়ে উঠেছেন—,কখনো বা দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত স্থাপনে আশ্চর্যভাবে সত্যান্বেষার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বসূরী সমালোচকদের কোনো কোনো বহুপ্রচলিত মতবাদকে তিনি নূতনতর যুক্তি ও বিশ্লেষণে পুনর্বিচারের প্রয়াসী হয়েছেন। যদিও আদর্শ সমালোচকের মতই পূর্বপক্ষ উল্লেখ করে সুস্থির যুক্তিসমারোহে প্রকৃত তথ্যের উপস্থাপনায় ও উদ্ঘাটনে কেবল মাত্র বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং মতবাদে প্রায়শঃই তিনি মধ্যপথ-বাহী, তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নিদারুণভাবে কঠিন ও নির্মম।

প্রসঙ্গান্তরে ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ডাঃ ভট্টাচার্যের অনেক মন্তব্য খাঁটি সত্য হলেও জননন্দিত হতে পারে নি। এবং বাংলা সাহিত্যের বহুকাল-পোষিত কিছু কিছু সিদ্ধান্তের প্রতিকূলেও রায় দিয়েছেন। যেমন "অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী হইতেই আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।" এই প্রসঙ্গে তিনি মধুসূদন এবং বিহারীলাল সম্পর্কে একটি তুলনামূলক তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন নানা দিক দিয়ে সেটি উল্লেখ্য।

ভূমিকা বাদ দিয়ে বইয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। ভূমিকায় লেখক মাইকেলের কবি ধর্ম ও গীতি কবিতার সঙ্গে তার যোগ কোথায়, বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতার ধারার মাইকেলের

সঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সংযোগ কোথায়,—কোথায় মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিকাব্যের প্রভাব ও উক্ত দুই কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারা নিয়ে একটি নিবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আলোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীরাঙ্গনা কাব্যের এবং তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলী। কবির প্রাতিস্বিক প্রতিভাতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ও ডাঃ ভট্টাচার্য প্রায় সর্বত্রই স্থান কাল ও পাত্রের পথ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন—অর্থাৎ কোথাও তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে চ্যুত হন নি। ভূমিকা অংশে তিনি ইতিহাসের ধারাটি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কেবলমাত্র মাইকেলকে বিচার করেন নি তিনি ভারতচন্দ্রের ও ভানু সিংহের পদাবলীর ও নব মূল্যায়ণে ব্রতী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর জন্ম বৃদ্ধি পরিণতির সার্থক ঐতিহাসিক বিচার করেছেন এই অধ্যায়ে। এবং মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার সঙ্গে জাতীয় পুনর্জাগরণের সম্পর্ক কোথায়, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে বা এর কী পার্থক্য—সে সম্বন্ধেও আপন সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন। ব্রজাঙ্গনার প্রতিটি ত্রুটি বিচ্যুতিও তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ভট্টাচার্যের তথ্যনিষ্ঠা আরো বিস্ময়কর। ওভিদের জীবন ও কাব্য (Heroic Epistles) সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেছেন। ওভিদের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের এবং দুজনের বিভিন্ন পত্রাবলীর মধ্যে ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়ে উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি ওভিদের কাছে মাইকেলের ঋণের পরিমাণ ও নির্দেশ করেছেন। ডাঃ ভট্টাচার্যের প্রভূত পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা এই অধ্যায়ের বহু আলোচনায় ভাস্বর হয়ে আছে। তবু মনে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মধুসূদনের প্রতি ঠিক সুবিচার করেন নি। ভারতীয় সনাতন ধর্মের রক্ষণশীল দৃষ্টি রেনেসাঁস এর কবি চেতনাকে পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করার পথে অন্তরায় হয়েছে। নাট্য কাব্য, গীতি কবিতা এবং আখ্যায়িকা এই তিনের সার্থকতম ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে বীরাঙ্গনা কাব্যে। সার্থকতম সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু তিনি বলেছেন, "বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের গম্ভীর ও কোমল ভাবের একত্র সম্মেলন হইয়াছে।" পূর্বসূরীদের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মশায়ও এ বিষয়ে একমত। কিন্তু তিনি বিশেষ কতগুলি চরিত্র সম্পর্কে নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাদিগের প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেম নহে, নিতান্ত দেহাশ্রয়ী প্রেম—রূপযৌবনের অঞ্জলি দিয়াই প্রেমিকাগণ প্রেমিককে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে····। বিশেষ করে "সোমের প্রতি তারা" পত্রিকা প্রসঙ্গে ডাঃ ভট্টাচার্যের উক্তি "ইহা শাশ্বত আদিম জৈব লালসারই অভিব্যক্তি মাত্র।···· ইহা কেবল অকল্যাণকরই নহে, ইহা কুৎসিত ও নারকীয়।" লক্ষণের প্রতি সূর্পনখা এবং পুরুরবার প্রতি উর্বশী পত্রিকার মধ্য দিয়াও ইতালীয় কবি ওভিদের কয়েকটি পত্রিকার অনুযায়ী লালসার চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে।—ডাঃ ভট্টাচার্যের ২য় অভিযোগ "বীরাঙ্গনা কাব্যের গঠনে কিছু ঐক্য দেখা গেলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ইহাতে ঐক্য নাই। প্রথমতঃ সমস্ত পত্রিকায় প্রেমই একমাত্র উপজীব্য তাহা নহে।" এবং "নরনারীর প্রেম সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াও যে সকল পত্রিকা রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ও প্রেমের স্বরূপের দিক হইতে নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে।" এবং তৃতীয় অভিযোগ—নামকরণ অসার্থক। "বীরঙ্গনা বলিলে বীর নারী যেমন বুঝায়, বীরের পত্নী ও বুঝায়। কিন্তু এই কাব্যে বীর নারী যেমন নাই, তেমনি সকলে বীরের পত্নীও নহে।

অবশ্য তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, "ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তথাপি ইহাদের মধ্যে মধুসূদনের যুগমানস একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই।"

আমাদের মনে হয়, আরো একটু গভীরে দৃষ্টিপাত করলে ধরা পড়বে "মধুসূদনের যুগমানস একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া" তো যায়ই নি বরং যুগমানসের ও নবজাগৃতির সার্থক বাণীকার মধুসূদন এখানে নারীজাতির সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিরই গান গেয়েছেন। এখানে নব-জাগৃতির প্রধান লক্ষ্যগুলি স্মরণীয় —মানবতাবাদ, ঐহিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবাদ ও তীব্র মর্ত্যপ্রেমই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উজ্জ্বল ঘোষণা ছিল। একথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে বইটি বঙ্গকুলচূড় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম কাব্য-শিরে শিরোমণি রূপে স্থাপিত করে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি যথেষ্ট অর্থবহ। একান্ত আত্ম-সচেতন রেনেসাঁসের কবি জেনে শুনেই বইটিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

নারীকেন্দ্রিক সেদিনের সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের পথে রামমোহন বিদ্যাসাগরের সার্থকতম উত্তরসূরী মধুসূদন। বীরাঙ্গনাকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের পথে আর এক দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে যদি মেনে নেয়া যায়—তাহলে বীরাঙ্গনা কাব্যে ঐক্য আবিস্কার ও অনেক সহজ হয় এবং নারীর (সর্বস্তরের) স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কাব্য বলে মেনে নিলে নামকরণও অসার্থক মনে হবে না।

আমার তো মনে হয় বাংলা সাহিত্যে বীরাঙ্গনার তারা চরিত্র চোখের বালির **বিনোদিনী** ও চন্দ্রশেখরের **শৈবলিনীর** পূর্বজা। এবং সূর্পনখা কৃষ্ণকান্তের উইলের—রোহিনীর। বাংলা সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের, অসামাজিক প্রেম সম্পর্কের প্রথম স্বীকৃতি বীরাঙ্গনার তারার পত্রে। নীতিগতভাবে বা সামাজিক দিক থেকে তারা সোমের মিলন অনভিপ্রেত ও অন্যায় বলে স্বীকার করেও নারীমনের এই আকৃতি, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ও মুক্তি কামনা কি বৃহত্তর জীবন সত্যের অনুকূলে নয়?

উর্বশী এবং সূর্পনখার প্রেম পত্র দুটিকে যদি আমরা আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখব আপাত ঘৃণ্য লালসা চিত্রের অন্তরালে আর এক গভীরতর জীবনসত্য প্রতি-ভাত। বারাঙ্গনা বা বিধবার স্বাভাবিক ভাবে সমাজের এক জন হয়ে সংসার বাঁধবার ইচ্ছা এমন কিছু অপরাধ নয়। বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় চরিত্রহীনের **সাবিত্রী**, কপালকুন্ডলার **মতিবিবি**, রাজসিংহের **জেবউন্নেসার** বা কৃষ্ণকান্তের উইলের **রোহিনী**। পদক্ষতধ্বনি কি বীরাঙ্গনার উর্ব-শীর ও সূর্পনখা চরিত্রের তথাকথিত নির্লজ্জ প্রেমনিবেদনের পেছনে শুনতে পারছি না?

হয়তো মহাভারতের মূল চরিত্রের সঙ্গে বীরাঙ্গনার ভানুমতী বা দুঃশলার চরিত্রের খুব মিল নেই—,মহাকাব্যোচিত চরিত্রের বিশালতা তাদের নেই—কিন্তু এই পত্র দুটিকেও যদি আমরা কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই প্রেমের দলিল হিসাবে গ্রহণ করি যেখানে অর্থ কীর্তি মান অপমানের প্রশ্ন একান্তভাবে বিসর্জিত 'সমাজ সংসার মিছে সব—মিছে এ জীবনের কলরব', কেবল মুখোমুখি দুইজনের হৃদয় সত্য হিসাবে দেখতে চেষ্টা করি তাহলে কি এখানেও জীবন-রহস্যের বিদ্যুৎ আমাদের চকিত করবে না? আমার তো মনে হয় মধুসূদনের তাই কাম্য ছিল। প্রেমের বহুবিচিত্র লীলারহস্য—বহুবর্ণ প্রেমের বর্ণাঢ্য দ্যুতি জীবন সত্যের নিরিখে আবিস্কার করার প্রয়াসেই তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা। এই কাব্যেই প্রথম আমরা বারাঙ্গনার প্রেম, বিবাহিতের প্রেম, প্রভৃতি প্রেম সম্পর্কের বিচিত্র পরিচয় পাই। নারীর সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও আত্মোপলব্ধির সূচনা এখান থেকেই শুরু হয়। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ, অথবা

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনে প্রণয়ন কোনো একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা মাত্র নয়। এগুলি সবই নবজাগৃতির সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির সোপন মাত্র। এই দিক থেকে বীরাঙ্গনা কাব্য সমগ্র নারী সত্তার উজ্জীবনের চিহ্নবহনকারী যুগকাব্য।

নারীর ও নিজের একটি বিশিষ্ট স্বাধীন সত্তা আছে—সেও একজন মানুষ—কেবলমাত্র নারী নয়—এই ঘোষণায়ই তো বীরাঙ্গনার প্রতিটি নারী চরিত্র মুখর। এই দিক থেকে বীরাঙ্গনার নায়িকারা বীরের স্ত্রী হোক বা না হোক বীরাঙ্গনা তারা প্রত্যেকেই—; আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণায় তারা একান্তভাবে মানবিক হয়েও স্বমহিমায় ভাস্বর। এই বহুধা ব্যাপ্ত বিস্মিত জীবন প্রবাহে তারাও সমভাবে অংশভাক—এই আত্মোপলব্ধির বাণীই তো এখানে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হয়ে সোচ্চার। নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠতম কাব্য হিসাবে এখানেই তো বীরাঙ্গনার সার্থকতা। •

অবশ্য একথাও এখানে উল্লেখ্য যে বীরাঙ্গনা কাব্যের কোনো কোনো চরিত্র চিত্রণে কিছু ত্রুটি ও পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মশায় সে সব ত্রুটির দিকে স্পষ্ট অংগুলি নির্দেশ করেছেন। এবং উপরোক্ত তারা উর্বশী প্রভৃতি চরিত্রগুলি সম্পর্কেও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সংগে আমি একমত না হয়েও তাঁর নির্ভীক স্পষ্টোক্তি এবং ত্রুটিহীন নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তাপদ্ধতি শ্রদ্ধানত চিত্তে স্বীকার করি।

—এরপরে তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে চতুর্দশ পদী কবিতাবলী সম্পর্কে আলোচনা। জন্মলগ্ন থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে সনেটের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এখানেও তাঁর প্রখর ঐতিহাসিক দৃষ্টি সমানভাবে জাগ্রত। বাংলা সনেটের ইতিহাসে মধুসূদনের দানের পরিমাণ, কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, দুর্বলতা, কী তাঁর বিশেষ অবদান, তাঁর ভাব ভাষা ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি প্রতিটি প্রযুক্ত ও প্রকরণ সম্বন্ধে রয়েছে পাণ্ডিত্য পূর্ণ অথচ আন্তরিক বিস্তৃত বিচার। মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকের মত অধ্যাপক মশায়ও স্বীকার করে লিখেছেন, "চতুর্দশপদী কবিতাবলী তাঁহার অস্তমিত প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি মাত্র।" আরো মন্তব্য করেছেন, "ইহার বিষয়, ভাব, রচনাগুণ ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে মধুসূদনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন মনে করা যাইবে না।" —এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতা সম্পর্কেও লেখকের সুস্পষ্ট অভিমত স্মরণযোগ্য : "রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি চতুর্দশপদী পয়ার মাত্র হইয়াছে—সনেটও যেমন হয় নাই—তেমনি মধুসূদনের কবিতার গুণও লাভ করিতে পারে নাই।" মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে, বলাবাহুল্য, এই মন্তব্যের সংগে অনেকেই একমত হবেন না। তবু এই ধরণের বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট মন্তব্য এই গ্রন্থের বহু জায়গায় পাওয়া যাবে। এবং সর্বত্রই তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর। অবশ্য তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ ও দৃষ্টিভংগী অনুসারে।

সমগ্রভাবে বিচার করলে বইটিতে কোনো কোনো আলোচনা কিছুটা একাডেমিক হয়ে উঠলেও ভাষার চমৎকারিত্বে ও প্রবহমানতায়; তথ্যের সমারোহে, যুক্তির নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতায় এবং সর্বোপরি একটি সম্ভ্রমপূর্ণ আন্তরিকতার আভিজাত্যে প্রতিটি আলোচনাই সুখপাঠ্য।

গীতিকবি শ্রীমধুসূদন। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। সৃষ্টি প্রকাশনী। কলকাতা। মূল্য ৫. টাকা॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্র ॥

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দশম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৬৯

সমকালীন প্রবন্ধের মাসিক পত্র ॥

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। **উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ-পত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। **কথাবার্তা**—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাষিক ১·৫০

৩। **বসুন্ধরা**—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। **শ্রমিক বার্তা**—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। **পশ্চিমবাংলা**—নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০।

৬। **মগরেবী বংগাল**—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

গ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং
কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

Statement in Form IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its publication	Monthly.
3.	Printer's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Publisher.

Dated, 1st March, 1963. (Sd.) A. G. SENGUPTA,

জয়লাভের প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করুন

জয়লাভের পক্ষে আপনার কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতিটি অধিবাসীর পূর্ণোদ্যমে কাজ করা দরকার—এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য, জাতির সম্পদ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং প্রতিটি সীমান্তে আঘাত করার শক্তি প্রচণ্ডতর ক'রে তোলার জন্য বর্ত্তমানে আরও বেশী কাজ করা প্রয়োজন।

উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়াবার জন্য ঢালাই কারখানায়, লেদে, মেসিন শপে, বিপুল শিল্প কারখানাগুলিতে প্রত্যেকটি কর্ম্মীর প্রাণপণে কাজ করতে হবে। সীমান্তে প্রহরারত সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের এবং জাতির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যেন অবিরাম স্রোতের মতো চলতে থাকে।

প্রত্যেকেই আমরা এক একজন সৈনিক

উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে
প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করার কাজে

যাঁহাদের নিদ্রা হয় না

যাঁহাদের নিদ্রা হয় না তাঁহাদের পক্ষে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল পরম হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের ক্লান্তি দূর করে ও সুনিদ্রা আনয়ন করে

মহাভৃঙ্গরাজ

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

দশম বর্ষ ১১/১২ সংখ্যা
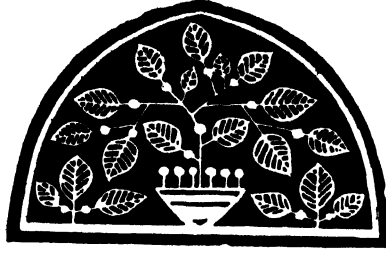
ফাল্গুন-চৈত্র তেরশ' উনসত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্র ॥

সূচীপত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ফাল্গুন-চৈত্র
তেরশ' উনসত্তর

দশম বর্ষ
১১/১২ সংখ্যা

স ম কা লী ন

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর কাব্যপ্রবাহ

অমিয়কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেও নিজ রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন যাঁরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁদের মধ্যে সেরা কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবি ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেনের চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট হলেও প্রতিভাস্ফুরণে বা কাব্যসাধনায় তাঁদের মধ্যে কোন তুলনা চলে না একথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহলেও একথা দুঃখের যে ১৯৫৮ বা ১৯৫৯ সালে কবির জন্মশতবর্ষে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়নি। প্রশ্ন উঠবে শুধু দেবেন্দ্রনাথ কেন, বঙ্গদেশে বহু কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাহলে তাঁদেরও জন্মশতবর্ষ উৎসব পালন করা উচিত। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু একথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না যে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যকলা প্রকৃত উচ্চমানের।

পূর্বসূরী বিহারীলাল কবির কাব্যজগতের অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেও তাঁর কাব্যের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রচনার এক বিশেষ পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। বিহারীলাল উদাসীন রোমান্টিক কবি আর দেবেন্দ্রনাথ "গার্হস্থ্য রোমান্টিক কবি।" দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি এবং তাঁর কবিতায় মাইকেল মধুসূদনের ক্লাসিক রীতির সাথে বিহারীলালের রোমান্টিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন "বিহারীলালের মত দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা ভাবুক নহেন এবং ইহার কবিতার বিষয়ও নিরাবিল ভাবনির্ভর ও বস্তুনিরপেক্ষ নয়। রোমান্টিক কবি বলিয়াই নারীপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে মুখ্য স্থান পাইয়াছে। বিহারীলালের অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল বৈদান্তিক গোছের। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসিক।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২য়)

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির এক বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে। একথা সত্যি যে দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে কোন সমতা দৃষ্ট হয় না, তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় না প্রগাঢ় চিন্তার ছাপ, তেমনি তা বিচার বিশ্লেষহীন। এর ফলে তাঁর কবি কল্পনা নানাস্থানে, নানা পর্দায় ছড়িয়ে আছে বিচ্ছিন্ন ভাবে। তাঁর কল্পনা দুরন্ত প্রবাহী এবং অনেক-স্থলে অসংযতও বটে। তবুও তা বঙ্গ সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল যথাযথই বলেছেন, "মনে হয় তাঁহার কবিতাগুলি যেন আপনারাই আপনাদিগকে লিখিয়াছে! ভাবানুভূতির সারল্য, অতি সহজ সৌন্দর্যবোধ, বায়ুর স্পর্শমাত্র জলের হিল্লোল কম্পনে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কবি-হৃদয়ের বিক্ষেপ—তাঁহার রচনায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়।"

আধুনিককালে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা অতি-রোমান্টিকতার দোষে দুষ্ট বলে গণ্য হবে, একথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে কুন্ঠা নেই যে তিনিই "কথ্য-ভাষার শব্দের যোগানে সম-সাময়িক কাব্যরীতির কাঠিন্য ভাঙিয়া দিয়া কাব্যকলায় শক্তি সঞ্চার করিলেন।" এই দুরূহ কর্মের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

যদিও আমরা মেনে নিই যে কবির চেয়ে তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল্য অধিকতর, তাহলেও আলোচ্য প্রবন্ধে কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের কালে তাঁর নিজস্ব পরিচয় কিঞ্চিৎ দেওয়া এক প্রয়োজনীয় অংগ বলে মনে হয়।

১৮৫৮ সালে যুক্তপ্রদেশের গাজিপুরে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৭২ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন, ১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় ১১শ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে ইংরেজীতে ২য় বিভাগের অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে এলাহা-বাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় এম এ পাশ করেন ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ১৮৯৪ সাল থেকে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন। ওকালতি করলেও তাঁর কাব্য-চর্চা কখনো ব্যাহত হয়নি। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল আমরণ তা অটুট ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম কেমন ছিল একথা অনেকের মনে ওঠা স্বাভাবিক। কবি নিজে বহুবার তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী!
সারা সন্ধ্যা সারানিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি!
নগনা দোলনা কোলে মদনা রাহিকা দোলে
কবিচিত্তে কল্পনার অলকা উঘারি —
আমি সে অমৃত-বিষ পান করি অহর্নিশ
সংসারের ব্রজবনে বিপিনবিহারী

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলবালা'। ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে অবস্থান কালে তাঁর তিনখানি ছোট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমটির নাম বলা হলো, আর দুটি হচ্ছে "ঊর্মিলা" ও "নির্ঝরিণী।"

দেবেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি:

ভালো লাগার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। রসদৃষ্টি এবং রসতন্ময়তা তাঁর কাব্যকলার প্রধান সম্পদ এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাঁর রচনায় সমাসোক্তি এবং সম্বোধনের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়—এটি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে দেশবিদেশের কাব্যকাহিনীর ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এ জাতীয় রচনা আরম্ভ করেন মাইকেল মধুসূদন সর্বপ্রথম। দেবেন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদনকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। প্যারান্থিসিসের ব্যবহারেও তাঁর কাব্যগুরুর প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের প্রভাবও কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথের ছায়াও কিছুমাত্রায় আছে। সনেট রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাতে সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর কাব্যসাধনায় মধুসূদনের প্রভাবের কথা সম্বন্ধে বলেছেন, "দেখুন, আমি পুরাতন স্কুলের —মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র স্কুলের কবি।....মাইকেলই আমার গুরু। ইংরাজী কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে আমি বড় পছন্দ করি।"

দেবেন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতি: কবি বিহারীলাল থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাবের সৃষ্টি হতে থাকে। বাস্তবকে অস্বীকার করবার স্পৃহা ধীরে ধীরে অপসৃত হ'য়ে দৈনন্দিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার সংগে মুখোমুখি হবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কবি-সাহিত্যিকের চিন্তাজগতে নতুন ভাবের জোয়ার সৃষ্টির সাথে সাথে সূত্রপাত হয় আধুনিকতার। বিহারীলাল এবং সমসাময়িক কবিদের রচনায় যুগের এই নবোদ্ভুত সুরের প্রভাব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। তাঁদের উত্তরসূরীদের কাব্যে এই দুর ক্রমান্বয়ে গাঢ়তর, গভীরতর হতে থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পরে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হচ্ছিল, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। এর ফলে কবি কল্পনায় এক নতুন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সৃষ্টি হ'লো। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর কল্পোলোকে গড়ে তুলেছেন এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনোজগৎ—যা প্রকৃতই দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল পৃথক পর্যায়ের। যুগ তার প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে প্রতিহত হয়ে এসেছে। প্রায় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে মানুষের সমাজ, ইতিহাস ও অদৃষ্টকে উপেক্ষা করে এক ভাবতান্ত্রিক জগতের সৃষ্টি করেছেন। বস্তুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন বাস্তবকে। দেশ ও কালের সমস্যা নাড়া দিতে পারেনি তাঁর স্বপ্নে ভরা জগতকে। দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যপিপাসু একথা সত্যি, তবে সেই পিপাসা মাইকেলের মত মস্তিষ্কঘটিত নয়, তা ভাবাবেগজনিত। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যেমন ধ্যানতন্ময়তার নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তার তেমন নিদর্শন মেলে না, বরং নেশার মত্ততা যেন ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। তাঁর রচনায় রূপতৃষ্ণার যে উদ্দামতা প্রকাশ পেয়েছে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায় কীট্‌সের কবিতায়। তবে প্রধান বৈষম্য হচ্ছে কীট্‌সের সৌন্দর্যপিপাসা বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে নয়, বরং তাকে আশ্রয় করেই সজ্ঞানভাবে বেড়ে উঠেছে। একারণেই কীট্‌সের কাব্য দেবেন্দ্রনাথের মত আবেগসর্বস্ব নয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্যে রূপতৃষ্ণা অতৃপ্তির জারকে সিক্ত হয়ে, গভীরতর হয়ে উঠেছে; দেবেন্দ্রনাথে তার হদিস নেই। দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাস ভাবাবেগ বিহ্বল। ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে তিনি বলে উঠেছেন

> "দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
> দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন"

কবি সমালোচক মোহিতলাল এ প্রসংগে বলেছেন, "এই 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন"

তাঁহার কল্পনালোকে অদ্ভুত হইয়াই রহিল, ইহার রহস্যই তাঁহার কবি শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বাংলাকাব্যে এক অপূর্ব গীতিভঙ্গি রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার কবিতায় আর্টের সংযম নাই, কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে—আবেগের তীব্র অনুরণনে ভাবোচ্ছ্বাস ঘনীভূত হইয়া ভাষায় ও ঝংকারে মূর্তিমান হইয়াছে। তাঁহার প্রাণ পাত্রে সামান্য জলমাত্র ঢালিলেও তাহা মধু-মদিরায় পরিণত হয়। তাঁহার কাব্যে যেন সর্বত্র আনন্দের একটি উচ্চহাসি আছে, এই হাসি সম্বন্ধে তাঁহারই ভাষায় বলা যায়—

"অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চহাসি"

রচনাপ্রকাশঃ 'ফুলবালা' কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্য। একে গীতিকাব্য বললে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে। এর পরে প্রকাশিত 'ঊর্মিলা' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসানো হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি।"

১২৯৫ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় 'অদ্ভুত রোদন' ও 'অদ্ভুত সুখ' নামে দু'টি কবিতা। এ দুটিই খুব সম্ভবত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা। এর পরে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯৭ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতে সুরু করেন। ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর হরশিঙ্গার মুদ্রিত হয়। তখন থেকে নিয়মিত ভাবে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভারতী'তে এবং 'সাহিত্যে' দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার যেন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। কবিতাগুলি একেবারে নূতন ঢঙের! কবির ঘর গৃহস্থলীর কথা, স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মত মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মধুময় হৃদয়খানির নানা ভাবের ছবি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে আমরা দেখিতে লাগিলাম—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।"

১২৯৮ সালে 'সাধনায়' এবং ১২৯৯ সালে 'নব্যভারতে' ও তিনি কয়েকটি কবিতা দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালে তাঁর 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কবি সমাজে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। প্রদীপ, পুণ্য, জাহ্নবী, বাণী, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী সবুজপত্র প্রভৃতি মাসিক পত্র অলংকৃত করেছে তাঁর কবিতাবলী।

১৩০৮ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন এলাহাবাদ থেকে। দেবেন্দ্রনাথ 'কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে প্রথম বছরের প্রবাসীতে কয়েকটি রসরচনা পরিবেশন করেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নতুন ক'রে সম্পাদনা আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকায় 'প্রবাসী'র সমলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন "আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙ্গালীর কবিও ধন্য। স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোক মঞ্জরী হইতে তাঁহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝংকার হইতে তাহার রহস্যকথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন, তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাঁহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া

প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"

প্রথম বর্ষের প্রবাসীতে দেবেন্দ্রনাথ "কুম্ভীর" নামে একটি গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—নির্ঝরিণী, হরিমঙ্গল, দগ্ধকচু, শেফালীগুচ্ছ, পারিজাত-গুচ্ছ জ্ঞানদামঙ্গল, অপূর্ব নৈবেদ্য, অপূর্ব শিশুমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গৌরাঙ্গমঙ্গল, অপূর্ব বীরাঙ্গনা, শ্যামামঙ্গল জগদ্ধাত্রীমঙ্গল, গোলাপ গুচ্ছ, কার্ত্তিক-মঙ্গল, গণেশ-মঙ্গল, খৃষ্টমঙ্গল, অপূর্ব ব্রজঙ্গনা। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের নাম আগেই বলা হয়েছে।

কবিতা পাঠঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কবির সৌন্দর্য পিপাসা শান্ত ছিল না, এমনকি আত্মকর্তৃত্বও ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

দাও, দাও, বিদায় চুম্বন!
জীবনের রত্নাগার একেবারে ক'রে খালি
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছে ডালি
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন
সূর্যকান্ত মণিসম অধর-প্রবালে মম
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!
দাও, দাও বিদায় চুম্বন!
দাও চিত্ত মণিবন্ধে রাখিব বন্ধন বাঁধি!
চিরবিরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী

উপমার ঘটা, ভাষার অত্যুজ্জ্বল ছটা দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও সর্বত্র তা স্থির থাকেনি। কাব্যরস আস্বাদনে সৌন্দর্যই তাঁর হৃদয়কে আকর্ষণ করেছিল, ক্রমে এই সৌন্দর্য সাধনা তাঁর দৃষ্টি করেছে প্রসারিত। মোহিতলালের কথায়—"সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার হইয়াছে, সৌন্দর্য-দৃষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে, তখন প্রীতি আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়াছে—ক্রমে এই প্রীতির আধিপত্যে কল্পনার আংশিক পরাজয় ঘটিয়াছে এবং পরিশেষে ভক্তি-সাগর-সঙ্গমে কল্পনা স্রোতস্বিনীর আকুল কলনাদ স্তব্ধ হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে এই পারম্পর্য অনুধাবন করলেই কবির সমগ্র রচনাবলীকে বিভক্ত করা যায়। প্রথমস্তরে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি, কেবল আকুলতা সমগ্র কবিতার মধ্যে এক তীব্র ঝংকার তুলেছে—

"এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে!
পাটল অধরে তার
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
আমি ক্ষুদ্র, বাঙ্গলার কবি।

এর পরের পর্যায়ের কবিতার মধ্যে প্রথমেই 'দাও দাও একটি চুম্বন' কবিতার উল্লেখ করতে হয়। কবির অন্তরে এখন অসহ্য পুলক। যাকে লাভ করবার তীব্র প্রয়োজন ছিল সে অবশেষে স্থান নিয়েছে হৃদয়ে, এখন নিজের মনের গভীরে ডুব দিলেই সুখের সায়র মিলবে।

"দাও, দাও একটি চুম্বন
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে

দুর্জ্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন!"

এ সব কবিতা ইন্দ্রিয় লালসা সিক্ত বটে, তবে তার মধ্যে পাঁকের গন্ধ নেই। দেবেন্দ্রনাথের এ জাতীয় কবিতায় হাস্নুহানার তীব্র সৌগন্ধ আছে এবং তা হৃদয়কে ঘ্রাণমণ্ডিত করে। সৌন্দর্য বিলাস কবিকে বর্ণ-বিলাসীও ক'রে তুলেছে। 'অশোক ফুল' কবিতায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

"কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন?
আবীর, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত?
কোথায় নুরির কণ্ঠ আরক্ত-বরণ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ, লোহিতে রঞ্জিত?"

কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে এই কটি চরণের মধ্য দিয়ে—

আগে একটি চুম্বন পেলে
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত,
কটির কিঙ্কিনী বাজিয়া উঠিত,
সরমে ভরমে নূপুর কাঁদিত
পদতলে রুনুঝুনু!

ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য পিপাসার তীব্রতা অপসৃত হয়ে প্রীতি-কল্পনার লীলা আসন্ন করে দিয়েছে। রূপের মধ্যে অরূপের স্পৃহা অনুভব করার জন্যে কবির মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নারী-বিষয়ক কবিতায় এই প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের সঙ্গে ভাবকল্পনার মিলনে নারী বিষয়ক কবিতাগুলি অপূর্ব রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'দীপ হস্তে যুবতী' কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ তুলে ধরছি—

"তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্ত্তা আনি মরমে মরমে,
ঢালি দিলে কবি-কর্ণে, অশোক-সুন্দরি!
দিবসের পাপ-চিন্তা, কলুষ সরমে,
হেরি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছে বিস্মরি!
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি!
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি!"

দেবেন্দ্রনাথের 'পরশমণি' এবং হেমচন্দ্রের 'পরশমণি' কবিতাদ্বয়ে দুই কবির বিচিত্র মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্রের কবিতাটির কথা সকলেরই জানা। চক্ষুকেই তিনি পরশমণি বলে উল্লেখ করেছেন, আর দেবেন্দ্রনাথ—

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি!
প্রেমই পরশমণি যাদুকর স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী!

কবি যে কেবলমাত্র কল্পলোকে অধিষ্ঠিত থাকতেন তা নয়, বাস্তবের জন্মভূমির প্রতিও তাঁর দরদ কম ছিল না। 'মা' কবিতায় সেই কথাই তিনি বলেছেন। নানা দেশে ঘুরেছেন, নানা তীর্থ দর্শন করেছেন, কিন্তু মাতৃভূমির স্পর্শ স্বর্গ সুখতুল্য। কবি বলেন—

"তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চির দুঃখী জানকীর দুঃখে;
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগন্ধমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব্ব-তীর্থ সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!"

এ কবিতার ভাবের সংগে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সাদৃশ্য অতিমাত্রায় বর্তমান তা বলা বাহুল্য। 'শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী' কবিতায় দেবন্দ্রেনাথ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অনুসরণ করতে গিয়েও সফল হন নি—

"চমকিল বিদ্যুৎ সহসা!
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি;
এ যে সেই সতত-সরসা
ভুবন মোহিনী ধনী রূপসী বরষা।"

নিছক সৌন্দর্য-পিপাসা থেকে কবি যখন প্রীতি—অনুভূতির রাজ্যে অবতরণ করলেন তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল নতুন অনুভবের জগৎ। উপলব্ধি করলেন বিধবার জীবনের সকরুণতা, বাসর-সজ্জার আনন্দ মুখর পরিবেশে তার হাসির অভিনয়, সাশ্রুনয়নে অনুভব করলেন 'নীরব বিদায়ের' চিত্র। ব্যথিত কবি বলে উঠলেন—

"বিধবার পাণ্ডুমুখে তিলমাত্র বসি সুখে
আবার করিস পলায়ন
হায়রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়!"
সিক্ত করে কবির নয়ন!"

শুধু কবির নয়ন কেন, 'মলিন হাসি' কবিতা পাঠে পাঠকের চক্ষুও অশ্রু সিক্ত হ'য়ে ওঠে। এ কোন কবি! পূর্বেকার ভাবোন্মাদ কবির চিহ্ন তো এখানে নেই।

'অদ্ভুত রোদন' কবিতায় কবি বাঙালী-প্রাণের আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। কবি দেশাত্মবোধক কোন কবিতা লেখেন নি তা সত্য, কিন্তু আলোচ্য কবিতা এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে যে দেবেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বাংলার কবি। বাঙালীর জীবনের হাসি-কান্না, গভীর অনুভূতি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে।

এর পর কবির রচনায় ভাঁটা পড়ে। এ অনিবার্য পরিণতিকে রোধ করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। যৌবনের দীপ্ত আবেগে আর্টের সংযম তিনি শেখেন নি, তাই শেষ বয়সে নানা বিপর্যয়ে তাঁর রচনারীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। কল্পনা-স্রোত রুদ্ধগতি হবার সাথে সাথেই তাঁকে বাধ্য হয়ে ভক্তির জগতে আশ্রয় নিতে হ'লো। তাঁর ভক্তিরসাত্মক কাব্য কখনোই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। কারণ তিনি তো তাকে লালন করতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন একে অবলম্বন ক'রে শান্তি লাভ করতে। তথাপিও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে কবির প্রতিভার শেষ স্বাক্ষর কিছু আছে।

শেষের দিকের আধ্যাত্মিক রস সিক্ত কবিতা পাঠকসাধারণ আগ্রহ ভরে গ্রহণ করলেন না। তা ছাড়া কতগুলো ব্যক্তিভাবসর্বস্ব কবিতা রচনাও করেছিলেন—তাও আদৃত হয় নি। এ

সম্বন্ধে কবি নিজেও অবহিত ছিলেন। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেছেন সখেদে, "আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আরও একটি কারণে বোধহয় লোকে আমার বর্তমান কবিতা অপছন্দ করে, তাহা আমার কোন কোন কবিতার ব্যক্তিগত ভাব। আমি ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছি ও লিখিতেছি বটে; কিন্তু লোকে সেগুলি নিছক ব্যক্তিগত বলিয়া লয় কেন? আমি যে সকল মহিলা কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি, তাঁহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় মনে করা ভুল। আমি তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই জন্য এই সকল কবিতাতেও মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিনী ভগবানের সৌন্দর্য বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারি না।"

রোগ তার আক্রমণ তীব্রতর করে। সৌন্দর্যবিলাসী কবি দেবেন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে দেরাদুন শহরে ২১শে নভেম্বর ১৯২০ সালে। পেছনে রেখে গেলেন কবিতার মালা আর 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'।

একথা সত্যি নানা ভাবের, বিচিত্রতর কল্পনার প্রবাহে তাঁর কাব্য বিজড়িত। তবুও বলবো তিনি মানুষের কবি, গৃহস্থ-সমাজের কবি। মাটির মানুষের নানা অনুভূতি স্পন্দিত হয়েছে তাঁর কাব্যে, বিচিত্র রাগিনীর ঝংকার তুলেছে তারা। এই বিশিষ্টতাই তাঁর কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখবে বাংলা সাহিত্যের জগতে।

তথ্য পঞ্জী ঃ

(১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন
(২) আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার
(৩) সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৪) "মনীষা মন্দিরে" ঃ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ, ১৩২১

অর্থনীতিবিদ্ রাণাড়ে

অরুণ সান্যাল

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুপ্রাচীন, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস অর্বাচীন। অন্ততঃ য়ুরোপে এই চিন্তার সূত্রপাতের অনেক পরে আমাদের দেশে এই চিন্তার শুরু। অর্থনৈতিক আলোচনার ও সমালোচনার এই ইতিহাসের সূচনায় যাঁদের নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে তাঁদের মধ্যে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে অন্যতম; সম্ভবত প্রথম পুরুষ। ভারতবর্ষের পরম সৌভাগ্য যে পরাধীনতার শৃঙ্খলের ঝনঝনার মধ্যেও একজনের স্বাধীন চিন্তার অনুরণন অনুভূত হয়েছিল সেই সময়ে, যাঁর চিন্তার যাথার্থে ও সাহসিকতায় আগামী দিনের বহু চিন্তাবিদ্, বহু অর্থনীতিবিদ্ তাঁদের চলার পথের পাথেয় পেয়েছেন।

১৮৯১ সালের পুণায় প্রথম শিল্প-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় যখন রাণাড়ে উচ্চারণ করেছিলেন,—"দি হোল কান্ট্রি ইজ লুকিং আপ উইথ উইষ্টফুল আইজ ফর এ ষ্টেটস্ম্যান হু উইল গাইড ইটস্ ডিস্টিনিস্ ইন দিস গ্রেট স্ট্রাগল এণ্ড হেল্প ইউ টু উইন দি রেস অফ লাইফ এণ্ড রিভাইভড্ হেলথ এণ্ড ন্যাশনাল ওয়েলবিয়িং।" সেদিন দেশবাসী বুঝতে না পারলেও আজকে আমরা অনুভব করছি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের মধ্যেই সেই ষ্টেটস্ম্যানকে অজান্তে আবিষ্কার করেছিল। কারণ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ নির্দেশ না থাকলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতি অন্তত কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত হত—একথা অনস্বীকার্য। আধুনিককালের একজন অর্থনীতিবিদ এ প্রসঙ্গ স্মরণ করেই সম্ভবত একাধিক অর্থে রাণাড়েকে ভারতের প্রথম অর্থনীতিবিদ্ বলে স্বীকার করেছেন।[১]

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক চিন্তার অগ্রদূত রাণাড়ে অর্ধশতাব্দীরও বেশী আগে লিখে গেলেও, বর্তমানকালের পরিকল্পিত অর্থনীতিক মাধ্যমে অগ্রসৃত ভারতবর্ষের বহু অর্থনীতিবিদ ও ছাত্রের কাছে তাঁর রচনা প্রেরণার উৎসমুখ, এবং এই কারণেই তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ধ্রুপদী চিন্তা স্তরে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভাবা হচ্ছে তা অনেকাংশেই রাণাড়ের চিন্তা ব্যাপ্ত করেছিল; পুরোপুরিভাবে না হলেও বীজাকারে—একথা সম্ভবত মিথ্যা নয়। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধেও এ সত্য স্বীকৃত।

প্রাগ্রসর ভারতবর্ষের উন্নীত ও অগ্রসৃত শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে আজও যিনি আপন চিন্তা-মননের মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন, অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় যাঁকে অস্বীকার করে এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব—মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়।

প্রবাদ আছে, রাম না হতেই রামায়ণ রচনা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তব সমস্যার উদ্ভব না হতেই সমাধান উদ্ভূত হয়েছে এমন কথা শোনা যায় না। আমরা আদি যুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পেশছেছি। এই চলার পথে সমস্যা দেখা দিয়েছে আগে, সমাধানের চেষ্টা হয়েছে তারপরে। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা এই বক্তব্যের যাথার্থ উপলব্ধি করতে পারি। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসও এই একই পথযাত্রী। প্রথমে বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়, তারপর মানুষ সেই সমস্যার যথাশক্তি সমাধান করে এবং সমাধানের সূত্রগুলো গৃহীত হলে, কি কি কারণে তা গৃহীত হল—সেইগুলো বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা তত্ত্ব (থিয়োরী) গড়ে উঠতে দেখি। কারণ "থিয়োরী ইজ এনলারজড্

প্রাক্‌টিস্‌।" প্রসঙ্গত য়ুরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়।

মার্কেণ্টাইলিষ্ট দলের এক জাতি ভিত্তিক রাজ্যের (এ ষ্ট্রং নেশান ষ্টেট) পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল কতকগুলো সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যবসাবিরোধী, ব্যক্তিগত লাভের লক্ষ্যমুখী, ছোট ছোট রাজার রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব যে দারুণ সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তারই সমাধান খুঁজতে গিয়ে মার্কেণ্টাইলিষ্ট দল এক জাতিভিত্তিক রাজ্যের উপযোগী কর-ব্যবস্থা, বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ সঞ্চয় ও ব্যবহার বিধি প্রবর্তন করা ও অন্যান্য সরকারী নীতির প্রচলন করে। এই প্রচলিত নীতি ও নীতিসম্মত তত্ত্বের মধ্যেই সেই সব সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ফিজিওক্রাটসদের আলোচনা এবং স্বনামধন্য ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডম্‌ স্মিথের আলোচনা প্রচলিত গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগ না হতে পেরেই নোতুন চিন্তা পথে অগ্রসর হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীতেও আমাদের অর্থনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে বসে কোন আকস্মিকতাকে স্থান দেননি। আমাদের বর্তমান পথচলার পেছনে আছে সুদূর ও বিগত অতীতের অভিজ্ঞতা এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ সাধনার ইতিহাস। আর এমনি করেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভিন্নমুখী নানা তত্ত্বের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে ও উঠছে।

এই ইতিকথা আলোচনা প্রসঙ্গেই অধ্যাপক জেমস্‌ কেলক দেখিয়েছেন। কেমন করে আজকের নানা সমস্যাক্রান্ত পৃথিবী বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সমস্যাচ্ছন্ন পৃথিবীর অনেক দেশই ক্রমে ক্রমে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করে নিচ্ছে।৩

বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পেই যে এক এক দেশে এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের ও নীতির জন্ম হয়েছে একথা অন্যান্য দেশ সম্পর্কে যেমন সত্য, ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তেমনি সত্য। ইংরেজ শাসনের ফলে তৎকালীন ভারতবর্ষে যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়—সেগুলো কয়েকজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং সেই দৃষ্ট সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে তাঁরা যে গভীর তথ্যনিষ্ঠ চিন্তার উদ্ভাবন করেন, তাই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের সূচনা করেছে। একথা বলা সঙ্গত।

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ নয়,—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ। অনেক প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের অধিকারী হয়েও চরমতম দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত। একদিকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতিবর্ণ বৈষম্য; অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের সীমাহীন শোষণ নীতি, ভারতকে দীনতার অন্ধ গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল—সে গহ্বরে জৈবিক জীবন যাপনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতেই সাধারণ ভারতবাসী তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করত। এই অন্তহীন দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত জাতির অগ্রণী হিসেবে যাঁরা মুক্তির পথ চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা সবাই যে দেশকে প্রথমেই দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা মুক্ত করতে ব্রতী হবেন—একথা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। তাই অর্থনীতিবিদ কেলকের মতে, "দি রাইজ এণ্ড প্রগ্রেস অফ ইকনমিক থট ইন ইণ্ডিয়া ইজ ক্লোসলি এসোসিয়েটেড উইথ দি ডিসায়ার টু সল্ভ দি প্রবলেম অফ ইণ্ডিয়ান পভার্টি।"

দরিদ্র ভারতবাসী বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির বিচারে দীন হলেও আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে দান রেখেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সর্ব-অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি লাভের চিন্তাই হচ্ছে তার সাহিত্য ও দর্শনের প্রধানতম চিন্তা। আজকের অর্থনৈতিক গণ্ডীবদ্ধ বৈষয়িক জীবনের

আধুনিক চিন্তার নিরিখে বিচার করলে এই বহু বিস্তৃত চিন্তার ক্ষেত্রটি একটু সঙ্কুচিত করে এনে বলা চলে এই অকল্যাণ হচ্ছে দারিদ্র্যজাত অকল্যাণ। ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে এই অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। "পুটিং ইট পজেটিভলি উই মাইট সে দ্যাট ইণ্ডিয়ান ইকনমিকস্ সেটস্ আউট বাই বিয়িং এ স্টাডি অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইন ইটস্ মেটিরিয়াল আস্পেকটস্ রাণাড়ে এই দারিদ্র্য মুক্তির চিন্তা দিয়েই তাঁর অর্থনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।৪

বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে রাণাড়ে বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের উৎসমুখ নির্ধারণ করতে গিয়ে যে সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলোকে পর পর সাজিয়ে দিলে নীচের কারণ-গুলো পাওয়া সম্ভব। যেমন :

(১) শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা;
(২) মূলধনের অভাব ও মূলধন নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু উপায়ের অভাব;
(৩) কয়েকটি বিশেষ অংশে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও তার ফলে জমির শতধাবিভক্ত অবস্থা;
(৪) উচ্চাঙ্গ ও স্বাধীন অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালী (ব্যবসা, শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) গ্রহণে অনিচ্ছা।

বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষের বর্তমান যে সমস্ত সমস্যা আধুনিককালের অর্থনীতিবিদদের চিন্তান্বিত করে তুলেছে তাদের মধ্যে এগুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি মনে আসে সেটি হল রাণাড়ের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও সূক্ষ্মতা—যা না থাকলে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনগ্রসর ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি বহুদিন লালিত, বহু সংস্কারবিজড়িত গভীর মূল সমস্যার স্বরূপকে এমন সুন্দরভাবে আবিষ্কার করা হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু এইটুকু বললেই রাণাড়ের বলিষ্ঠ চিন্তার স্বরূপদর্শন সম্পূর্ণ হয় না; কেননা শুধুমাত্র সমস্যার রূপ উদ্ঘাটন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তা সমাধানের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করেছেন। কোন অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকের এলোমেলো চিন্তা নয়, অভিজ্ঞ লোকের সুপরিকল্পিত মনন দিয়েই তা করতে চেয়েছেন ও করেছেন। একথা বলা সঙ্গত যে ভারতবর্ষের বহুদিনের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত সমাধান করতে হলে তাকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখেই বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। শাস্ত্রোদ্ধৃত কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ তা পুরোপুরি সম্ভব হবে না, এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। একথা বলার মত বলিষ্ঠতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি যে সমস্ত সমাধানের কথা বলেছেন, তা তাঁর কল্পনাপ্রসূত নয়,—রীতিমত সমাজ-তথ্য, ঐতিহাসিক-তথ্য, ভিত্তিক।৫

ভারতের বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের পথে অগ্রসর হতে গিয়েই রাণাড়ে তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রিত নীতির বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। কারণ তৎকালীন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের নিজস্ব সমস্যাগুলোকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে, ৬ (যা ভারতবর্ষের নিজস্ব পটভূমিতে বিশেষভাবে বিচার্য) য়ুরোপে প্রচলিত রিকার্ডো, বেন্থাম প্রভৃতি অর্থনীতি-বিদদের প্রবর্তিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে সমাধান করতে ব্যস্ত হওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত ফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। এই জাতীয় দ্বন্দ্বই তৎকালীন নোতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল—যা বিশেষভাবে ভারতের সমস্যা সমাধানের অনুকূল। বলা বাহুল্য, রাণাড়ে এই নোতুন তত্ত্ব-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও মনে রাখা দরকার রাণাড়ে অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন কোন মৌলিক তত্ত্বের (র্যাডিক্যাল থিয়োরী) জন্ম দেননি—যা

অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় সম্পদ। কিন্তু মৌলিক কোন তত্ত্বের সৃষ্টি না করলেও। রাণাড়ে মৌলিক চিন্তার ছাপ রাখতে পেরেছেন—এইখানেই রাণাড়ের বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা অর্থনীতির সত্য যদি পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের সত্যের মত বিমূর্ত বা সর্বজনীন হত তবে তা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যায় সুপ্রযুক্ত হতে পারত, কিন্তু রাণাড়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে এই কথাই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা অর্থনীতির সত্য কতকগুলি অনুমানের ওপর নির্ভরশীল, যে অনুমানগুলি কোন একটি বিশেষ স্থান-কাল কেন্দ্রিক। সুতরাং সেই বিশেষ স্থান-কালের স্থিতাবস্থাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব সত্য বলে গৃহীত হবে, পরিবর্তিত ও চলিষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় তা সত্য নাও হতে পারে। রাণাড়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রায় বারোটি ৭ অনুমানের একটি তালিকা নির্ধারিত করে দেখিয়েছেন যে এই অনুমানগুলি একটি পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিক কাঠামোর পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রাণাড়ে দৃঢ়ভাবে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অনুমান ভিত্তিক সত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এই অনুমানগুলি যদি স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে নির্বিশেষ সত্য হয়, তবে এই অনুমান ভিত্তিক যে কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্বের যে কোন অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রযোজ্য; কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিম য়ুরোপের অর্থনীতিবিদেরা এই জাতীয় অনুমান-ভিত্তিক কোন বিশ্বজনীন অর্থনীতিক তত্ত্ব সম্পর্কে যে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাই নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে নাকচ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি দেখিয়েছেন যে বিশেষভাবে ভারতের ক্ষেত্রে এই অনুমানগুলোই সত্য নয়। সুতরাং এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে যে তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তাও ভারতীয় সমস্যা সমাধানে কোনভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। আরো একটু বিস্তৃতভাবে এ প্রসঙ্গ আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, যে রাণাড়েকে একাধিক অর্থে ভারতবর্ষের প্রথম অর্থনীতিবিদ বলা চলে। বলতে পারার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আমরা দেখি তিনি প্রথম ভারতীয় অর্থনীতিক যিনি বুঝেছিলেন যে কোন অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচার করতে হলে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাবিদ হিসেবে দাদাভাই নৌরজী, তেলাংগ প্রভৃতি মনীষীরা বিভিন্ন সময় সরকারের কর্মপদ্ধতি, রীতিনীতি এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেও, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন--যা রাণাড়ের চিন্তাবিরোধী। শুধু তাই নয় তাঁর সমাময়িক সমালোচকেরা যখন কেবলই বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলশ্রুতি হিসেবেই জাতীয় জীবনের দুর্বলতা ও অনগ্রসরতাকে বিচার করার চেষ্টা করছেন তখন রাণাড়ে জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সমস্যার মূলের প্রতিই সংকেত করেছেন, তাকে এড়িয়ে যাননি। দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতা না থাকলে ও উদারতা না থাকলে তা হত না।

অনেকে যখন "ড্রেন থিয়োরী"র সাহায্যে দেশীয় অর্থনৈতিক অনুন্নতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন কিংবা বিদেশীদের উপস্থিতিই সর্বাংগীন ক্ষতির কারণ হিসেবে নির্দেশ করছেন, তখন রাণাড়ে দেশবাসীর অনুৎপাদক স্বর্ণ-সঞ্চয় তথা জাতীয় সম্পদ সঞ্চয় পদ্ধতিকেই অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। (যদিও একথা সত্য যে শিল্পোন্নয়নের অভাবে জনসাধারণের স্বর্ণসঞ্চয় ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না, রাণাড়ে এই দিকটি লক্ষ্য করেননি),

তবুও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী রাণাড়ে তাই অন্যান্য ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের অনেক ওপরে আপন স্থান গ্রহণ করেছেন।

এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে হলে শিক্ষা-দীক্ষার যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি থাকা দরকার তা রাণাড়ের ছিল, কারণ তিনি তৎকালীন যে সমস্ত য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ তাঁদের আলোচনা নিয়ে বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

ভারতীয় সমস্যা সমাধান করতে হলে য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব যে কার্যকরী হবে না—এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রাণাড়ে, তাই য়ুরোপের এতদিনের প্রচলিত অবাধ বাণিজ্য নীতি (লেস-এ-ফেয়ার) যে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে সুপ্রযুক্ত নয়, এ কথা ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। এবং ক্রমে য়ুরোপে যে নোতুন অর্থনৈতিক চিন্তা, যা ব্যষ্টির কল্যাণ নয়, সমষ্টির কল্যাণের চিন্তায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল তারই প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেন ভারতীয় চিন্তার অগ্রনায়ক রাণাড়ে। এবং ভারতীয় সমস্যার কথা স্মরণে রেখেই তিনি 'জার্মাণ' হিসটোরিক্যাল স্কুল' নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন অনুমান নির্ভর অর্থনৈতিক তত্ত্ব, যা বিশ্বজনীন বলে ঘোষিত, তা সমাজ-ব্যবস্থাহীন অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সত্য হলেও ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। কারণ ভারতের—

(১) অর্থনৈতিক জীবনে নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল না কেননা তা পরিবার ও জাতি-বর্ণ নিয়ন্ত্রিত;
(২) ভারতবাসী শুধুমাত্র সম্পদ আহরণকে জীবনের একমাত্র পরমার্থ বলে গ্রহণ করে না;
(৩) অর্থনীতি—পূর্ণ প্রতিযোগিতা নির্ভর নয়, প্রচলিত রীতি নিয়ন্ত্রিত;
(৪) মূলধন ও শ্রম—জঙ্গমও নয়, ক্রিয়াশীলও নয়;
(৫) পারিশ্রমিক ও লাভ—স্থিতি স্থাপকতাহীন, স্থির;
(৬) জনসংখ্যা—বৈজ্ঞানিক উপায় নিয়ন্ত্রিত নয়, প্রকৃতি ও দৈবী নির্ভর;
(৭) উৎপাদন প্রায় অপরিবর্তিত।

সুতরাং এই রকম অর্থনৈতিক অবস্থানির্ভর আমাদের দেশে যে য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল চিন্তা অচল—এ সত্য অনস্বীকার্য। এবং অনস্বীকার্য বলেই অবাধ-বাণিজ্য নীতি ও অচল। এই অচল নীতির বিরুদ্ধে রাণাড়ে প্রমুখ মনীষীরা যে সচলনীতি গ্রহণ করেছিলেন তার মূল কথা হল সমষ্টির কল্যাণ রাখে না, ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা নয়। এই সমষ্টি-কল্যাণ সৃষ্টির দায়িত্ব তাই ব্যক্তি প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না—এ দায়িত্ব নিতে হবে সক্রিয়ভাবে সরকারকে বা রাজ্যকে। এবং নিজের এই বক্তব্যের সমর্থনেই য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, য়ুরোপে ও বিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব—অবাধ বাণিজ্য-নীতি—এর স্থান গ্রহণ করেছে নোতুন দিনের নোতুন চিন্তা. "দ্যাট দেয়ার ইজ এ ডিসাইডেড, রিয়্যাকসন ইন য়ুরোপ এগেনষ্ট লেস-এ-ফেয়ার সিস্টেম।" প্রসঙ্গত, তিনি ইংল্যাণ্ডের ১৮৭০-১৮৮০ সালের অবস্থা বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে সেখানে গোঁড়া অর্থনীতি তাঁর এতদিনের অধিকৃত যোগ্য স্থানটি হারিয়েছে,—যদিও ভারতবর্ষের অবস্থার কোন পরিবর্তনই তখনও পর্যন্ত সূচিত হয়নি। ভারতের এই অচল অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্তন প্রয়োজন—এ কথা বুঝেই তিনি জার্মান, ফরাসী, আমেরিকান ও ইটালিয়ান অর্থনীতিবিদদের আলোচানার সারমর্ম গ্রহণ করে অবাধ বাণিজ্য নীতির অসারতা প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছিলেন। এই নামোল্লেখের ক্ষেত্রে

তিনি এমন কয়েকজনকে বাদ দিয়েছিলেন, যাঁরা এই বিশেষ চিন্তা অন্যতম প্রধান বললেও অত্যুক্তি হয় না, যেমন কার্লাইল ও রাস্কিন। সম্ভবত এ'দের সাহিত্যিক প্রতিভাই রাণাড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং তিনি নামোল্লেখ করেননি "ষ্টেট সোসালিষ্ট"দের যাঁরা অনেক আগেই অর্থনৈতিক কার্য-কলাপে রাজ্যের অগ্রাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাইহোক, রাণাড়ে য়ুরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে বিচারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, উনিশ শতকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা—অভিনব ও অমূল্য। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে রক্ষণমূলক নীতি (প্রটেক্শনিজম্) এবং অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ছিল স্বীকৃত। কারণ আগেই ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, রাণাড়ের বিচারশীল বুদ্ধিতে সেই অবস্থায় এই নীতিই ছিল বিশেষভাবে গ্রহণীয়। এবং এইখানেই জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে রাণাড়ের অসামান্য সাফল্য। কিন্তু এ কথা ঠিক যে রাণাড়ে কোন চরম-নীতি স্বীকার করেননি—যা শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী রাজ্য (টোলিটারিয়ান ষ্টেট) প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় কারণ, স্বৈরাচারী রাজ্য—রাজনৈতিক কিংবা শিল্পতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিরোধী।

(১) J. C. Coyagee: Ranade's Work as an Economist. Indian Journal of Economics, January 1942.
(২) Bhabatosh Dutt (Ripon College): The Background of Ranade's Economics. Indian Journal of Economics. January 1942.
(৩) James Kelock: Ranade and After: A study of the Development of Economic thought in India. Indian Journol of Economics, January 1942.
(৪) Ranade: Land Law Reform and Agricultural Banks, 1883.
(৫) D. G. Carve: Ronade and Economic Planning. Ind. Jour. of Eco., January 1942.
(৬) Bhabatosh Dutt:
(৭) Ranade: Indian Political Economy, 1892.

বিলেতের সাহেব-নবাব

চণ্ডী লাহিড়ী

বিলেতের হঠাৎ-নবাবদের কথা বলেছি। সৎপথে অর্থোপার্জন করে তাঁরা কেউ নবাব হননি। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবকে অপসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা একে একে নবাব হতে সুরু করলেন।

যে ক্লাইভ একদা বার্ষিক পাঁচ পাউণ্ড মাহিনায় কলকাতায় চাকরী নিয়ে আসে, কালক্রমে সেই হয় 'ওয়েলদিয়েষ্ট অব হিজ ম্যাজেষ্টিস্ সবজেক্টস্।' সিরাজের পর একদিন মীরজাফরেরও পতন হল, মীরকাসেম লাভ করলেন সিংহাসন।

১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন।

ইতিমধ্যে ডাচরা পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছে চুঁচুড়া থেকে। ১৭৬০ সালে লেঃ কর্ণেল আয়ার কুট ফরাসী সেনাপতি লালীকে ওয়াণ্ডিওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে বাসনা ডুপ্লের মনে জেগেছিল তাও শেষ হল একদিন। ক্লাইভের তখন পোয়াবারো। তিনি তখন কিং-মেকার। এই সময়ের অবস্থা তিনি পরবর্তীকালে পার্লামেণ্টে আত্মদোষস্খালন চেষ্টায় বলেছিলেন—"পলাশী-যুদ্ধের জয়লাভ আমায় কোন অবস্থায় বসিয়েছিল ভেবে দেখুন। আমার খেয়াল-খুসির উপর একজন বড় নবাবজাদা নির্ভরশীল। সে দেশের সেরা ধনীরা আমার মুখের একটুকরো হাসির জন্য রেষারেষিতে ব্যস্ত, কোষাগারের দ্বার কেবল আমার জন্যই উন্মুক্ত। ডাইনে ও বামে আমার দুপাশে কেবল স্তূপীকৃত সোনা ও মণি-মাণিক্য।"

মীরজাফর নিজেকে নিরাপদ করার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে খুলে দিয়েছিলেন তোষাখানার দ্বার। তার থেকেই নবাবীয়ানার সূচনা। কে কত টাকা পেয়েছিলেন তার তালিকা এই রকম।

গভর্ণর ড্রেক ৩১৫০০, ক্লাইভ ২১১,৫০০, ওয়াটস্ ১১৭,০০০, কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০, ম্যানিংহ্যাম ২৭০০০, বীচার ২৭০০০, বোড্ডাম, ম্যাকেট ও কোলেট প্রত্যেকে ১১৩৬৭, এমিয়ট ও পার্কস ১১৩৬৬, ওয়ালশ ৫৬২৫০, স্ক্র্যাফটন ২২৫০০, লুসিংটন ৫৬২৫, গ্র্যাণ্ট ১১২৫০ পাউণ্ড।

বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন ইওরোপের সেভেন ইয়ার্স ওয়ার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়েম হয়। ওদিকে কর্ণাটকেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্রাট শাহ-আলম এলাহাবাদে কোম্পানীর ছত্রছায়ায় দিনাতিপাত করতে লাগলেন। মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষোভে-আক্রোশে খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে সুরু করল লুঠতরাজ। উত্তরে আফগান ও পাঠানরা বিলুপ্ত হল আত্মঘাতী কলহে। দক্ষিণে হায়দরআলী ও টিপু ফরাসীদের উস্কানীতে ইংরেজ-আশ্রিত কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ও হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে। এক-কথায় বাংলা ও বিহারের বাইরে তখন চলছে অরাজকতা। অসংখ্য সামন্ত নৃপতি। প্রত্যেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই কলহের সুযোগ নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ভাগ্যান্বেষীরা ভারতে এসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে। কেউ সেনাদল পরিত্যাগী, কেউ জাহাজী নাবিক, কেউবা বোম্বেটে জলদস্যু, কেউ নিছক ব্যবসায়ীরূপে এদেশে আসে ও দেশীয় নৃপতিদের সেবা করে অর্থ সঞ্চয় করে। মারাঠা-নৃপতি মহাদজী সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে-

ছিলেন পেরোঁ নামক এক অখ্যাত নাবিক। ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ থেকে পলাতক এক আইরিশম্যান পরবর্তীকালে জেনারেল জর্জ টমাস নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এমনকি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা যখন যে সামন্তের কাছ থেকে অধিক অর্থ পেতেন তারই দলে যোগ দিতেন। তাছাড়া ছোট ছোট পেশাদার বাহিনী গঠন করে অনেকেই সামন্তদের কাছে নিজ বাহিনীকে ভাড়া খাটাতেন। দ্য-ব্যয়নি, রেনল্ড, পেড্রো ম্যাডাক ও ওয়াল্টার, রেনহার্ড প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে এই ইতিহাস।

পলাশী যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যদিও কোম্পানীর কর্মচারীদের বেপরোয়া নবাবীয়ানার সূচনা, তবু শাসন-ব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েমী করতে ও দেশীয় ধনীদের দুর্বলতা ও কোম্পানীর আইন মাফিক পাওনা ফাঁকি দেওয়ার রন্ধ্রগুলি বুঝে নিতে সময় লেগেছিল আরও কয়েক বৎসর। হোসম্যান তাঁর "নাবুবস্ ইন ইংলণ্ড" গ্রন্থে সাহেব-নবাবদের বসন্তকাল হিসাবে ১৭৬২ থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত গণ্য করেছেন।

ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, তাঁরা পরিশ্রম করেছেন, বিপদের ঝুঁকিও নিয়েছেন অল্পাধিক। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের নবাব হওয়ার জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়নি। কর্মচারীরা যে মাহিনা পেতেন তাতে বিলাসিতা দূরের কথা দুবেলা ভালমত অন্ন সংস্থান হওয়াও বোধকরি সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উপহার বা নজরানা না পেলে এবং তৎসহ কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসরকারী বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ না থাকলে হয়তো কেউ ভারতে সে সময় আসতেই চাইতোনা 'অবাধ সুযোগ' বলেছি এজন্য যে, কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টররা বেসরকারী বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিলেও ভারতস্থ কর্মচারীরা, এমনকি খোদ গভর্ণর পর্যন্ত বেসরকারী বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। একমাত্র দেশীয় কর্মচারীদের "উপরি" আয়ের কোন সুযোগ কোম্পানী দেয়নি।

ধনী হওয়ার এই সহজ অথচ নিশ্চিত পন্থাটি যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন প্রতিযোগিতা পড়ে গেল চাকুরী নেওয়ার। যে-কোন চাকরী, যত কম বেতনেই হোকনা—কেবল ভারতে যাওয়ার সুযোগ পেলেই হল। প্রয়োজন হলে ঘুষ দিতেও বাকী। পাব্লিক এডভার্টাইজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হত—

WRITERS PLACE TO BENGAL WANTED

A Writers place to Bengal, for which One Thousand Guinas will be given. There is not a third person in this business and the Money is ready to be paid down, without any written negotiation.

এই পত্রিকাতেই একস্থানে মন্তব্য করা হয়েছে যে "গত বৎসর প্রতি রাইটারশিপ দুই থেকে তিন হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় হয়েছে, কিন্তু জনৈক ডিরেক্টরের ফেভ্যুরিট সুলতানো একটি রাইটারের পদ মাত্র পাঁচশো টাকায় বেচেছেন।"

এতক্ষণ যা আলোচনা হল তা থেকে বিলেতের সাধারণ মানুষ বাংলা তথা ভারতকে কোন দৃষ্টিতে দেখতে পলাশী যুদ্ধের পর অভ্যস্ত হয়েছিল সেটা অনুমান করা যায়। আর অর্থগৃধ্নু ইংরেজ যেমন ছিল, উদার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন সাধারণ মানুষের টনক নড়ল। অচিরে বিলেতের সাধারণ মানুষ বেশ উপলব্ধি করল যে, ভারত থেকে যে সম্পদ আহরণ করা হয় তাতে উপকৃত হয় কেবল কোম্পানীর মালিক ও কর্মচারীরাই। সাধারণ মানুষের সেই সম্পদে কোন অধিকার থাকে না।

স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হল। পার্লামেন্টেও কোম্পানীর কার্যকলাপের সমালোচনা সুরু হল। ১৭৬৬ সালে লর্ড চ্যাথাম কোম্পানী পরিচালনা-ব্যবস্থা পার্লামেন্টের তদারকীতে আনার জন্য বিল প্রস্তুত করলেন। কোম্পানী বেগতিক দেখে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিসম্পাদন করল। এর ফলে সরকার প্রতি বৎসর কোম্পানীর কাছ থেকে ৪০০০০০ পাউণ্ড রাজস্ব পাওয়ার অধিকারী হলেন।

কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেল না। জনসাধারণ নামক যে মানবপুঞ্জ দুর্বোধ্য অথচ অপ্রতিরোধ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে থাকে সব দেশে তাদের মুখ বন্ধ করতে কবে কোন রাজশক্তি সক্ষম হয়েছে! কোম্পানীর কর্মচারীরা তো নগণ্য। জনসাধারণের মৃদুগুঞ্জন ও কটু-সমালোচনার সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ ধরল সংবাদপত্রগুলি। হঠাৎ-ধনী ইংরেজ-নবাবচরিত্র নিয়ে থিয়েটারে কমেডিয়ানরা মস্করা করতে সুরু করলেন, বিশেষ বিশেষ নবাবের নামে নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল, আলোচনাকে আরও মুখরোচক করে তোলার জন্য কোন কোন হঠাৎ-নবাবের নামে "হীন বংশোদ্ভব" বলেও কুৎসা রটনা করা হল।

"Worthy off spring of a barber .
Squeez'd twixt powder-puffs and leather'..

সার টমাস রামবোল্ড সাধারণ অবস্থায় চাকরী সুরু করে পরবর্তীকালে মাদ্রাজে গভর্ণর হয়েছিলেন। দেশে যখন নবাব হয়ে ফিরলেন তখন গুজব রটল, তিনি নাকি আগে ছিলেন জুতো-পালিশওলা, এখন নবাব। তাঁর নামে ছড়া কাটা সুরু হল,

"When Mackreth served in Arthur's crew
He said to Rumbold "Black my shoe"
He humbly answered "yea, Bob,"
But when returned from India's land
And grown too proud to brook command,
His stern reply was "Na-bob." .

পয়সা হলেই মানুষ মর্যাদা চায়। বড়বাজারের লোহাকারবারী চায় রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হতে, সিমেণ্টের চোরাকারবারী চায় বিধানসভার সদস্যপদ। আর পয়সা হলেই সেটা প্রতিবেশীদের পরোক্ষে জানানো, অর্থাৎ চমকে দিয়ে সম্ভ্রম সৃষ্টিরও চেষ্টাও থাকে। বিলেতেও তাই। বড়লোক হয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চেষ্টা করতেন নিজ দেশে "বাবুই"রূপে পরিচিত হতে এবং পার্লামেন্টের সদস্য হতে। পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সাধু-অসাধু সর্ববিধ পন্থাই তাঁরা নির্দ্বিধায় অবলম্বন করতেন। এইভাবে ক্লাইভ, রামবোল্ড, সাইক্স, ও কুখ্যাত কুসীদজীবী বেনফিল্ড কেবল যে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেছিলেন তাই নয়, নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার মতলবে বহু সদস্যের ভোট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩০জন ইংরেজ-নবাব পার্লামেন্টের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

আর সম্পত্তি কিনে 'ভদ্রলোক' সাজার ঘটনাও অনেক ঘটেছে। বারওয়েল নবাব হয়ে দেশে ফিরেই কিনে ফেললেন এক বিরাট জমিদারী। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বাড়ী ও জমিদারীর দাম এক লক্ষ টাকা। বারওয়েল তাই দিলেন। হেষ্টিংসের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু এবং কাউন্সিলের সভ্য। দেশে ফিরে তাঁর মেজাজের পরিবর্তন ঘটে। কখনো কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হলে দেরী করে যেতেন, এবং প্রতিবশীদের সহ্য করতে পারতেন না। আগে হ্যালিফ্যাক্সের বাগান বাড়ীতে সবারই প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন মালিক বারওয়েল বাড়ীর চাকরদের হুকুম দিলেন সব প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিতে। ফল দাঁড়ালো এই যে তাঁর সমবয়স্করা সবাই তাঁকে এড়িয়ে

চলতে লাগল এবং পাড়ার ছেলেরা তাঁকে পথে সাজ-গোজ করে চলতে দেখলেই শিস্ দিয়ে বা শেয়াল-ডাক ডেকে উপহাস করত।

আর এক নব্যবাবু হলেন মেজর চার্লস মারশাক্। দেশে ফিরেই তিনি লর্ড ক্যাডোগানের কাভারশ্যাম এষ্টেট কিনে ফেলেন। তিনিও তাঁর বাগান-বাড়ীতে "সাধারণের প্রবেশ নিষেধ" লটকেছিলেন, আগে কাভারশ্যাম এষ্টেটে যে সব দাস-দাসী চাকরী করত, নতুন প্রভু সর্বাগ্রে তাদের বরখাস্ত করলেন। নিয়োগ করলেন নতুন দাস-দাসী।

বৃদ্ধা ফরাসী দাসী, সুইস ভ্যালেট, ব্ল্যাকবয়, জেণ্টু কোচম্যান, মুলাটটো ফুটম্যান, নিগ্রো বাটলার। তাদের মুখের ভাষাও বেশ উঁচু জাতের। অনেক সন্ধানের পর মাঝে মাঝে দু-এক স্থানে ইংরেজী শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সেও কেবল ভুল করার জন্যই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তারা তাদের প্রভু মিঃ মারশাককে খাঁটি ইষ্ট ইণ্ডিয়াম্যান বলে অভিহিত করে। কিন্তু মেজর মারশাক এর বদলে তারা উচ্চারণ করে মেজর ম্যাসাকার। আর 'ইম্প্রুভমেণ্ট' কথাটির বদলে ব্যবহার করে "ডিভাস্টেসন্।"

বিলেতের তদানীন্তন ইংরেজ-সমাজ নিঃশব্দে সব কিছু হজম করেনি। আইনে এই অর্থোপার্জনের জন্য শাস্তিবিধান করা হয়নি বটে, কিন্তু সমাজ ক্ষমা করেনি। হঠাৎ-নবাবরা ধীরে ধীরে প্রায় "একঘরে" হয়ে গিয়েছিলেন। অসংখ্য কবিতা ও নাটকে তাদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল। গ্রামের অখ্যাত কবি ছড়া বানিয়েছিলেন। তাদের নিন্দা করে। ১৭৭৩ সালে প্রকাশিত "দি নবাব অব এশিয়াটিক প্লাণ্ডারাস" নামে ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ব্যঙ্গ-কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মাত্র দুটি ছত্রে নবাব-চরিত্র সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

It is a strong symptom they Forgot to feel
Their breasts arc stone, their minds as hard as steel.

অনেক সময় নাচের আসরে কোন মহিলা যদি কাউকে "হঠাৎ নবাব" বলে বুঝতে পারতেন তবে তার সঙ্গে নাচতে অস্বীকৃত হতেন।

নাচের আসরে প্রকাশ্যে মহিলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অধিক অপমান পুরুষের জীবনে আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা ঘটেছিল আঠারো শতকে। কাজেই রুচি ছিল অধঃপতিত। যে কোন ধনীকে লোকসমক্ষে হেয় প্রমাণ করার জন্য পাড়ার লোক তার জন্মসূত্র সন্ধান করে অপবাদ রটাতে দ্বিধা করতো না। আগেই বলেছি সার হিউ ফুট তাঁর নায়ক সার ম্যাথুকে জন্মসূত্রে দইওয়ালার পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন ছড়ায় দেখা যায় কাউকে মুচির ছেলে কাউকে দাসীগর্ভজাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাউণ্টেস অব ইয়ার মাউথের নামে গুজব রটানো হয়েছিল মেছুনীর কন্যা বলে ও লর্ড কোর্টনে কে বলা হয়েছিল তিনি একজন ফরাসী ভ্যালেটের (চাকর) সন্তান। টাউন এণ্ড কাণ্ট্রি ম্যাগাজিনে ১৭৭১ সালে "এক নবাবের স্মৃতিকথা" শিরোনামা দিয়ে এক কাল্পনিক নবাবের নামে যা মিথ্যা অথচ মুখরোচক গল্প বানানো হয়েছিল। রচনাতেই বলা হয়েছিল—আমাদের নায়কের পিতা ছিলেন নাপিত। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরের কাজ নিয়ে তিনি জীবন সুরু করেন ও পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডিরেক্টরের সুনজরে পড়ে রাইটারের পদ পান। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ ইংলণ্ডে সেদিন পর্যন্ত পিতৃ-পরিচয় তুলে গালি দেওয়া অবাধে চলেছিল। ইংরেজ-নবাবদের প্রতি এই সামাজিক ঘৃণা অন্ততঃ ভারতের প্রতি বৃটিশ জনসমাজের সহানুভূতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ডাঃ ভাও দাজী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮২১ খৃষ্টাব্দে গোয়ার নিকট মান্দ্রা গ্রামে এক দরিদ্র গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাও দাজী জন্মগ্রহণ করেন। ভাও দাজীর পিতার সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, কৃষিলব্ধ আয় হইতে কায়ক্লেশে তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি উত্তম কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের প্রশস্তি মূলক কবিতা রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু অর্থ উপার্জন করিতেন। বাল্যকালেই ভাও দাজীর বিশেষ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার পিতা ইহাতে বিশেষ হৃষ্ট বোধ করেন ও বিদ্যা শিক্ষা দানের নিমিত্ত ভাওদাজীকে বোম্বাই শহরে লইয়া আসেন; এই সময়ে ভাও দাজীর বয়স ছিল আট বৎসর। কিছুকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে ১৮ মাস কাল অধ্যয়নের পর দারিদ্র্যের জন্য তিনি কলেজ ত্যাগ করেন ও বোম্বাই এর এলফিনষ্টোন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে শিশুহত্যার কুফল সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া ভাও দাজী ৬০০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। এই সময়ে গুজরাটের কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু বিশেষতঃ কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হইত। ভাও দাজীর প্রবন্ধটি এই কুপ্রথা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই ভাওদাজী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, শিক্ষকতা কালে তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর ভাও দাজী স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এই দুই বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন কীর্তি সমন্বিত স্থানগুলি পরিদর্শন ও তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা ভাও দাজীর অতিশয় প্রিয় কর্ম ছিল। এই রূপ একটি স্থানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ই· পেরির সহিত পরিচয় লাভ করেন। ভাও দাজীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে শিক্ষকতা ত্যাগ করাইয়া বোম্বাই-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করিতে প্ররোচিত করেন। মিঃ পেরির সহায়তায় ভাও দাজী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পর অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই কলেজের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বল্পকাল মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কার্য করিয়া ডাঃ ভাও দাজী বোম্বাই শহরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ভেষজ ও শল্য উভয়বিধ চিকিৎসাতেই ভাও দাজী সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যেই তিনি বোম্বাই শহরে ও প্রদেশে চিকিৎসা জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার কিছুদিন পর তিনি নিজ ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, এখানে তিনি বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার ভ্রাতাও একজন চিকিৎসক ছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনায় তিনিও অগ্রজের সহযোগিতা করিতেন। শিক্ষকতা কালে সংস্কৃত চর্চার সময় ভাও দাজী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় পুঁথি পড়িতে পড়িতে তিনি কুষ্ঠরোগ প্রতিষেধক একটি ভেষজের সন্ধান পান। এই সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর তিনি কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক একটি ঔষধ আবিষ্কার করেন। কুষ্ঠরোগের

প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসকদের একটি বোর্ড ডাঃ ভাও দাজীর আবিষ্কৃত ঔষধটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ঔষধটি সন্তোষজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অতপর বোম্বাই-এর জামসেদজী জিজাভাই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ভার ভাও দাজীর উপর অর্পণ করা হয়। বোম্বাই এর চিকিৎসক বোর্ড ভাওদাজী কর্তৃক আবিষ্কৃত ভেষজের গুণাবলী সম্বন্ধে তদানীন্তন ভারত সচিবকে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ভারত সচিব ডিউক অফ্ আর গাইল রিপোর্টটি পাইয়া ভাওদাজীকে তাঁহার আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভাওদাজী এই ঔষধটি আরও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আজীবন পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলেন, ঔষধটিকে সর্বক্ষেত্রে অমোঘ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে এই সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ঔষধটির ব্যাপক ও অবাধ প্রচার তাঁহার অভীষ্ট ছিল, দীর্ঘকালীন রোগভোগ ও মৃত্যুর জন্য ভাওদাজী এই ঔষধটি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া উহা সর্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া যাহাতে পারেন নাই। ডাঃ ভাওদাজী বোম্বাই শহর ও প্রদেশে সকল রকম জনহিতকর কার্যে নিজ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা স্থাপনের বহু পূর্বেই তিনি নাওরোজী ফার্দুনজীর সহযোগিতায় বোম্বাই এসোসিয়েশন নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এই এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জনগণের অভাব অভিযোগ প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি বৃটিশ পার্লামেণ্টের ও গোচরীভূত করা হইত। ভাওদাজী সাতিশয় তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিলে তিনি সর্বদাই দুর্বলের পক্ষ লইয়া প্রবলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন। একবার একজন দরিদ্র দরজীর নামে একজন ইংরাজ মিথ্যা অভিযোগ আনায় ইংরাজ বিচারক তাহাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন। দরজী নির্দোষ ইহা জানিয়া ভাওদাজী তাহার পক্ষালম্বন করিয়া উচ্চতর আদালতে অভিযোগ করেন। উচ্চতর আদালতের বিচারে দরজীর নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ায় সে শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বিচারক উচ্চতর আদালতের নিন্দাভাজন হন। আর একবার ভাওদাজী অনুরূপ উপায়ে একজন ধনী ও দুষ্ট মোহান্তের কোপানল হইতে একজন সত্যভাষী সাংবাদিককে রক্ষা করেন। বলাবাহুল্য দরিদ্র ও অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করিতে গিয়া ভাওদাজী অনেক সময়ে নিজের সুনাম ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতেন, ইহাতে তাঁহার অর্থনাশও হইত।

যৌবনকাল হইতেই বিভিন্ন পুরাকীর্তি পূর্ণ স্থানসমূহে ভ্রমণ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন ভাওদাজীর ব্যসন ছিল। চিকিৎসক বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করার পর প্রত্ন দ্রব্য ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, ভারতের নানা স্থানে এই সব দ্রব্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন। ভগবানলাল ইন্দ্রজী নামে একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ভাওদাজীর গবেষণা কার্যে সহায়তা করিতেন। ভাওদাজী এই যুবককে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাঁহার সকল সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বহন করিতেন, ভাওদাজীর সাহায্যপুষ্ট ভগবানলাল উত্তরকালে ভারতবিদ্যা-চর্চারক্ষেত্রে একজন দিকপাল বলিয়া পরিগণিত হন। ভাওদাজী শেষজীবনে যখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সেই সময় তিনি সংবাদ পান যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভগবানলাল নেপালের কোন স্থানে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাওদাজীর নির্দেশেই ভগবানলাল প্রত্নানুসন্ধানকার্যে নেপালে প্রেরিত হন। ভগবানলালের পীড়ার সংবাদ পাইয়াই ভাওদাজী তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ ইউরোপীয় সুহৃদকে ডাকিয়া পাঠান ও যে কোন উপায়ে ভগবানলালের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাইতে অনুরোধ জানান। বন্ধুটি জানান যে নেপালের কোন দুরূহ দুর্গম স্থানে ভগবানলাল আছেন তাহা সঠিক জানা না থাকায় এইরূপ কোন সাহায্য অসম্ভব। ভাওদাজী তাঁহাকে বলেন

যে নেপালের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে দিয়া নেপালময় তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া ভগবানলালকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করাইতে হইবে ইহার জন্য তিনি সর্বস্ব ব্যয় করিতে পরাম্মুখ নহেন—তবে এই কার্য শুধু নেপালস্থ ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের মাধ্যমেই সম্ভব এই জন্যই তিনি ইউরোপীয় বন্ধুটির সহায়তা চান। ইউরোপীয় বন্ধুটি নিরুপায় হইয়া নেপালস্থ রেসিডেণ্টের শরণাপন্ন হন ও এই অনুসন্ধানের সাফল্যের সহিত ডাঃ ভাওদাজীর জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত বলিয়া জানান। অতঃপর রেসিডেণ্ট নেপালের অরণ্য-পর্বত মন্থন করিয়া পীড়িত ভগবানলালের সন্ধান করিয়া তাঁহার চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে ভাওদাজীকে এই সংবাদ জ্ঞাত করা হইলে তিনি নিরুদ্বিগ্ন হন, তাঁহার রোগেরও কিঞ্চিৎ উপশম হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় গুরুশিষ্যে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই. ভগবানলালের বোম্বাই প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ভাওদাজী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কীর্তিমান চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতা ও জনসেবকরূপে ডাঃ ভাওদাজী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ভাওদাজী মৃত্যুর প্রায় শতবর্ষ পরেও বিদ্বৎ সমাজে ভারতবাসিদের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রবর্তক ও দিকপালরূপে একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী হইয়া আছেন।

প্রথম জীবনেই ভাওদাজী স্বাধীনভাবে সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ করেন, সংস্কৃত চর্চা করিতে করিতে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। বোম্বাই প্রদেশের অজন্তা গুহাস্থিত লিপিগুলির তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক যখন অজন্তা গুহা পরিদর্শন করিতে যান তখন সরকারী অনুরোধে ডাঃ ভাওদাজীকে তাঁহার সংগী হইতে হয়। ভাওদাজীর পাণ্ডিত্যে লর্ড নর্থব্রুক এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে ভাওদাজীর দীর্ঘস্থায়ী পীড়াকালে তিনি ভাওদাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন যেন তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যহ তাঁহাকে (বড়লাটকে) সংবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ভাওদাজীর ভ্রাতা বড়লাটকে প্রত্যহ ভাওদাজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। জুনাগড় পর্বত গাত্রে শকক্ষত্রপ রুদ্র দমন ও সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপির যথাযথ পাঠ ও অনুবাদ, কাথিয়াবাড় সন্নিহিত জাসদানের স্তম্ভ লিপি, অমরনাথ মন্দির লিপি, আনাম কোণ্ডার রুদ্রদমন লিপি, ভিটরিলাট লিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার ও যথাযথ মর্মোদ্ঘাটন ভাওদাজী বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি হইতে দেবনাগরী লিপি প্রবর্তনের পূর্বে সংস্কৃত সংখ্যা সঠিক কিভাবে লিখিত হইত এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভাওদাজীর। প্রাচীন লিপি বিশারদ জেমস প্রিন্সেপ ও এ কার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনকালে গুপ্তাব্দ নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল, ঐতিহাসিকেরা ইহা পূর্বে জানিতেন না। জেমস প্রিন্সেপ জুনাগড় লিপিগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় ভাওদাজী এইগুলির পাঠোদ্ধার করেন ও গুপ্তেরা যে নিজেদের নামে অব্দ প্রচলিত করেন তাহা আবিষ্কার করেন। ভাওদাজী গুপ্ত অব্দ আবিষ্কারের সংগে সংগে ও বল্লভাব্দেরও সঠিক কাল নির্ণয় করেন। জাসদান লিপি হইতেও তিনি কয়েকজন গুপ্ত-রাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। দাজী কর্তৃক অজন্তা গুহার লিপিগুলি পাঠোদ্ধারের ফলে ভারতের বহু রাজবংশের ইতিহাসের উপাদান আবিষ্কৃত হয়। টলেমির ভারত বিবরণে টাইয়াস্ টেনস নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে, কোন একটি লিপিতে উল্লিখিত চাস্তানা নামক স্থানটিই টলেমি বর্ণিত স্থান—দাজী ইহাই প্রমাণিত করেন। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের ন্যায় প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধারেও ভাওদাজী বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। শকযুগের মুদ্রাগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার দ্বারা শকক্ষত্রপগণ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য তিনি সুধিমণ্ডলীর গোচরীভূত

করেন। প্রাচীন লিপি ও প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ব্যতীত ভাওদাজী কালিদাস, হেমাদ্রি, হেমচন্দ্র, মাধব ও সায়নাচার্য, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভট্টোৎপল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইঁহাদের বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাওদাজী রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহসভাপতি ছিলেন, তাঁহার রচিত ১৭টি প্রবন্ধ এই সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়, বাকী ৩টি প্রবন্ধ লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়, তিনি এই সোসাইটি ও আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসির মধ্যে ভাওদাজীই সর্বপ্রথম বোম্বাই-এর শেরিফ নিযুক্ত হন (১৮৬৯-১৮৭১)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া উদ্যানস্থিত পুরাবস্তু সংগ্রহশালাটি ভাওদাজীর যত্নেই স্থাপিত হয়।

কুষ্ঠরোগ প্রতিষেধক ঔষধটিকে অমোঘ করিবার উদ্দেশ্যে ভাওদাজী বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলেন—গবেষণা রত থাকা অবস্থাতেই তিনি অকস্মাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া পড়েন দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ভাওদাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে বোম্বাই-এ পরলোকগমন করেন।

ভাওদাজীর মৃত্যুর পর এই সর্বজনপ্রিয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি ভাওদাজী কর্তৃক সংগৃহীত ৩১১টি পুঁথি পেটিকা তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার হস্তে অর্পণ করেন।

দুঃখের বিষয় ভাওদাজীর রচনার পরিমাণ অতি অল্প, অল্প হইলেও ভারত-বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অল্প নহে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ভাওদাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে যদিও ভাওদাজী অল্পই লিখিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই অল্প সংখ্যক রচনাই অন্যের লিখিত হাজার পৃষ্ঠা অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে।*

ডাঃ ভাওদাজীর মৃত্যুর পর বোম্বাই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর মহাশয় মন্তব্য করেন যে, গত ২০০০ হাজার বৎসরের ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব লইয়া যিনিই আলোচনা করিতে যাইবেন তাঁহাকেই ডাঃ ভাওদাজীর প্রবন্ধগুলি পড়িতে হইবে।†

ডাঃ ভাওদাজী কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া লিটারারী রিমেনস্ অফ ভাওদাজী নামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় (১)।

* "I always look upon Dr. Bhan Daj as a man who has done excellent work in life and though he has written little, the little he has written is worth thousands of pages written by others"—Prof. F. MaxMueller (1881).

† "No one who wishes to writes a paper on the antiquities of the last two thousand years can do so without referring to Dr. Bhaw Daji's writings" Dr. R. G. Bhandarkar in the Annual Meeting of the Bombay Royal Asiatic Society held on 23-1-1875.

(১) The Literary Remains of Dr. Bhan Daji—Ed. by Ramchandra Ghosa, Prelace by Dr. Thibant, Calcutta, 1888.

CONTENTS

(1) On the Sanskrit Poet Kalidasa.
(2) Ajanta Inscriptions.
(3) Facsimile, Transcript and Translation of the Sah or Rudradaman inscription on a rock of Junagarh also one of Samudragurota on the northern face of the rock with some brief remarks on Sah, Gupta and Ballavi dynasties.
(4) Facsimile, Transcript and Translation with remarks on an inscription on a stone pillar at Jasdan in Kathiwar.
(5) A brief summary on Indian chronology from the first century of the christian era to 12th century.
(6) The inroads of Scythians to India.
(7) Merutunga Theravali or genealogical and succession tables by Merutunga—a Jaina Pandit.
(8) Notes on the age and works of Hemadri.
(9) Notes on Mukundaraja, the oldest Maratha author.
(10) Facimile, Transcript and translation of inscription in the Amarnath Temple of Kalyan.
(11) Brief notes on Hemachandra or Hemacharya.
(12) Brief notes of Madhava and Sayana.
(13) Report on Photographic copies of inscriptions in Dharwar and Mysore.
(14) Discovery of completes Mss. copies of Bana's Harsacharita.
(15) Report on some Hindu coins.
(16) Transcript and translation of King Rudradeva's inscription at Anamkonda.
(17) Revised Translation of Inscription on the Bhitari Lat.
(18) Revised Inscription on the Delhi Iron Pillar.
(19) Brief Notes on the ages and autheaticity of the works of Aryabhatta, Baraha Mihir, Bhattotipala and Bhaskaracharya.
(20) The ancient Sanskrit numerals in the cave inscriptions on the Sah coins correctly made out with remarks on the era of Salivahana and Vikramaditya.

হাস্য ও করুণরসের পারস্পরিক সম্পর্ক

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

যে কোন শ্রেণীর মহাকবির রচনায় একটি মাত্র রসকেই অঙ্গীরূপে দেখা যায়। সুতরাং সেই অঙ্গী রসের সহিত অন্যান্য অপ্রধান রসের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহা কাব্য সমালোচকগণের পক্ষে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। সমগ্র কাব্যের বা সাহিত্যের মধ্যে একটি রস প্রধানভাবে অনুভূত হইলেও অন্যান্য রসের উপস্থিতি কোনকাব্যেই অস্বীকার করা যায় না, এবং অঙ্গরসের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি কোন কবিরই অভিপ্রেত নহে। এজন্য যে কোনপ্রকারের সাহিত্যসৃষ্টিতে বিভিন্ন রসের এরূপে সমাবেশ করা উচিত যাহাতে অঙ্গীরসের আস্বাদনে কোন বিঘ্ন না ঘটে এবং অঙ্গরসগুলিরও যথাযথ স্ফূরণ হয়।

সংস্কৃত কাব্যে যে আটটি বা নয়টি রস স্বীকৃত হইয়া থাকে তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত অপরটির সহাবস্থান সম্ভব নহে। কয়েকটি রস পরস্পর একই আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না। আবার এমন কতকগুলি রস রহিয়াছে যেমন বীভৎস ভয়ানক প্রভৃতি যাহাদের পরস্পর অবিরাম অভিব্যক্তি চিত্তে উদ্বেগের সঞ্চার করে। ভরত সর্বপ্রথম রসগুলির পরিগণনা করেন, তাহার পর আনন্দবর্দ্ধন অপূর্ব যুক্তি পরম্পরার মাধ্যমে রসবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করিয়া রসবিরোধের প্রতীকারের উপায়ও নির্দেশ করেন। সাহিত্যদর্পণে রসগুলির মধ্যে কোনটি কাহার বিরোধী তাহা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

> "আদ্যঃ করুণ বীভৎস রৌদ্রবীরভয়ানকৈঃ।
> ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যো বিরোধভাক্।
> করুণো হাস্যশৃঙ্গার রসাভ্যামপি তাদৃশঃ ।।
> রৌদ্রস্তু হাস্যশৃঙ্গার ভয়ানক রসৈরপি।
> ভয়ানকেন শান্তেন তথা বীররসঃ স্মৃতঃ।
> শৃঙ্গার বীররৌদ্রাখ্যহাস্যশান্তৈ র্ভয়ানকঃ।
> শান্তস্তু বীরশৃঙ্গার রৌদ্রহাস্যভয়ানকৈঃ ।।
> শৃঙ্গারেণ চ বীভৎস ইত্যাখ্যাতা বিরোধিতা ।।"

বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, রৌদ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও রৌদ্র, রৌদ্র ও করুণ, এবং শৃঙ্গার ও অদ্ভুত ইহারা পরস্পর অবিরোধী এবং ইহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব। কিন্তু শৃঙ্গার ও বীভৎস, বীর ও ভয়ানক, শান্ত ও রৌদ্র এবং শৃঙ্গার ও শান্ত ইহারা পরস্পর বাধ্যবাধকভাবের হওয়ায় ইহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধী রসগুলিকে আনন্দবর্ধন দুইটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়ৈক্যের বিরোধী এবং কতকগুলি নৈরন্তর্য্যবিরোধী। যে দুইটি রস পরস্পর একই আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না তাহাদের আশ্রয়ৈক্যবিরোধী রস নামে অভিহিত করা হয়। যেমন বীর ও ভয়ানক এই দুইটি রসের মধ্যে কাব্যের বা নাটকের যে পাত্র বীররসের আশ্রয় তাহাই ভয়ানকরসের আশ্রয় হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই সময়ে বীর ও ভীরু হয় না। উভয়রসের আশ্রয়ের ভেদ কল্পনা করিলে এই জাতীয় বিরোধ নিবৃত্ত হয়। কাব্যের নায়ক যদি বীর রসের আশ্রয় হন তবে প্রতিনায়কে ভয়ানকরস স্থাপন করিয়া বিরোধের অবসান

করা যায়। শান্ত ও শৃঙ্গার রসের বিরোধকে নৈরন্তর্য্যবিরোধী রসের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে একই আশ্রয়ে এই দুই রসের উদ্যাম সম্ভব, কিন্তু দোষ-মুক্ত হইলেও এই দুই রসের অভিব্যক্তির মধ্যে যদি অন্য রসের অবস্থিতি কল্পনা না করা হয় তাহা হইলে বাধ্যবাধকজ্ঞান জাগ্রত হইয়া সহৃদয় কাব্য রসিক বা সামাজিকের মনে প্রতীতির বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। কিন্তু যদি কোনকাব্যে এইরূপ নৈরন্তর্য্য বিরোধী রসের অভিব্যক্তি দেখাইতে হয় তাহা হইলে অবিরোধী একটি তৃতীয় রসের দ্বারা ইহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে হইবে। এজন্য শান্ত ও শৃঙ্গাররসের অন্তরালে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিলে বিরোধ বর্জন করা সহজ হইবে। আলোচ্য উদাহরণটিকে বিচার করিলে এই মন্তব্যের যথার্থতা সহজেই অনুমিত হইবে—

"সুরাঙ্গনাভিরাশ্লিষ্টা ব্যোম্নি বীরা বিমানগ্যাঃ।
বিলোকন্তে নিজান্ দেহান ফেরুনারীভিরাবৃতান্ ।।" ড়ড় জজজ

অর্থাৎ, দেহত্যাগের পর দিব্য বিমানে সুরাঙ্গনাগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বীরগণ দেখিল যে তাহাদের মরদেহ রণক্ষেত্রে শৃগালীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থলে সুরাঙ্গনা ও শবরীর এই আলম্বন দুইটি যথাক্রমে শৃঙ্গার ও বীভৎসরসের জনক এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বীরসদ্বয়ের মধ্যে স্বর্গলাভরূপ বীররস নিবেশিত হইয়াছে। বাধ্যবাধকরসদুইটির মধ্যে বীররসের নিবেশের ফলে পূর্ব্ববর্তী রসদ্বয়ের চর্বণার মধ্যে ইহার চর্বণা ও আস্বাদন চিত্তে জাগ্রত থাকায় বিরোধীরসের জ্ঞান উদিত হইতে পারে না। রসের মধ্যে একটি অঙ্গী (প্রধান) ও অপরটি অঙ্গ (অপ্রধান) হইলে অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তব-জগতে যেরূপ দেহ ও দেহীর মধ্যে বিরোধ সম্ভব হয়না এক্ষেত্রেও সেইরূপ। এখানে প্রশ্ন উঠে যে একটি রস অঙ্গী হইলেও অঙ্গরসগুলি যদি পরস্পর প্রবল বিরোধী হয় তাহা হইলে ত বিরোধ নিবৃত্ত হইবে না। অল্পরাজের রসরত্নপ্রদীপিকাতে এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়া একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলা হইয়াছে যে রাজার নিকটে দণ্ডায়মান দুই শত্রুর মধ্যে যেমন কোন বিরোধ থাকে না, প্রধান রসের সমীপে অঙ্গরসেরও সেইরূপ কোন প্রাধান্য থাকে না। উদা-হরণ স্বরূপে নাগানন্দ নাটকে হাস্যরসের সহিত যুক্ত অঙ্গীশৃঙ্গাররস শেখরকের বৃত্তান্ত হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ঃ কিন্তু তাহার বিরোধী বৈরাগ্য ও শান্তভাবের পরিপোষক নাগাস্থি-দর্শনজাত শান্তরস মিত্রাবসু ও মলয়বতীর প্রবেশ এবং "সংসর্গাদ্ভিঃ সমন্তাৎ" প্রভৃতি উক্তির মাধ্যমে ব্যভিচার ক্রোধের দ্বারা উপচিত বীররসের দ্বারা ব্যবহিত। রসবিরোধের অপর উদা-হরণ হইতে দেখান যাইতে পারে,—যেমন,

"চুম্বনসক্তঃ মোহস্যাঃ দশনং চ্যুতমূলমাত্মনো বদনাৎ
জিহ্বামূলপ্রাপ্তং খাডিতি কৃত্বা নিরষ্ঠীবৎ।"

এই শ্লোকের অর্থ বীভৎসরসের সৃষ্টি করিতেছে। কোন নায়ক (অথবা বৃদ্ধ) রমণীর অধর চুম্বনে উদ্যত হইলে তাহার দন্ত সহসা পতিত হইয়া গেল। এবং সে ফট্ এই শব্দ করিয়া চ্যুত দন্তটিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিল। এই উদাহরণে বিরোধী বীভৎস রস হাস্যরসের সহিত মিলিত হইয়া হাস্যরসকে পরিপুষ্ট হইতে দেয় নাই। এবং বিরোধ নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন অবিরোধী রসকেও উপস্থিত করা হয় নাই। রসসমূহের অন্তর্লীন এই বিরোধ লইয়া আলো-চনার উদ্দেশ্য হাস্য ও করুণের যথার্থস্বরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলা। শৃঙ্গার হইতে হাস্যরসের জন্ম হয় ইহা আচার্য্য ভরতের সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং শৃঙ্গার ও হাস্যের কোন বিরোধ নাই। এই অবিরোধের কারণ দেখাইতে গিয়া ভরত বলিয়াছেন যে শৃঙ্গার ও হাস্য

একই প্রকার চিত্তভূমি সম্পন্ন। চিত্তের সকশ্রেণীর অবস্থাকে উপাধি নামে অভিহিত। শৃঙ্গার রসে চিত্তের যেরূপ বিকাশ হয় হাস্যেও সেইরূপ বিকাশ হয়। এজন্য সাহিত্যরত্নাকরে বলা হইয়াছে "যস্য যস্য" রসস্য শৃঙ্গারকার্য্য বিকাশ হেতুকতা তস্য তস্য শৃঙ্গারাবিরোধিতা ভবতি।" কাব্যার্থের অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া চিত্তে যে আনন্দ স্ফুরণ হয় আলঙ্কারিকগণ তাহার চারিপ্রকার অবস্থাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই চারিটি অবস্থাকে যথাক্রমে বিকাশ, বিস্তর, ক্ষোভ এবং বিক্ষেপ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কুসুমের যেরূপ কোরক অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে সংলক্ষ্যক্রমে বর্ণে, গন্ধে, মনোহররূপে বিকাশ হয় বিভাবঅনুভাব প্রভৃতির দ্বারা স্থায়িভাবও ক্রমে পরিবর্ধিত হইতে হইতে চিত্তের সকল মালিন্য অপসারিত করিয়া আনন্দময় বিকাশের সূচনা করে। শৃঙ্গার রস হইতে এই বিকাশ সম্পন্ন হয়। সমুদ্রবক্ষে বাত্যাবেগের দ্বারা যেরূপ প্রবল তরঙ্গসংক্ষোভের সৃষ্টি হয় করুণ রসেও সহৃদয় পাঠকের মনোরাজ্যে সেইরূপ প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, করুণ রস হইতে এই বিক্ষেপের জন্ম হয়। পাদপের যেরূপে ক্রমে অঙ্কুর হইতে সুবৃহৎ মহীরুহে বিস্তৃতি লাভ হয় বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহও সেইরূপে চিত্তের বিস্তৃতি সম্পাদন করে। বীভৎসরস চিত্তবৃত্তির মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ক্ষোভ ও বিক্ষেপ এই দুই অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও বৈসাদৃশ্য অনেক রহিয়াছে। করুণরসজনিত বিক্ষেপে কেবলমাত্র আলোড়নের সৃষ্টি হয় কিন্তু বীভৎসরসজনিত ক্ষোভে চিত্তের মৌলিক অবস্থার মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়া যায়, অর্থাৎ পাঠক বা সামাজিকের হৃদয়ের মূল বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থানে সম্পূর্ণ বিরোধী অপর একটি ভাব প্রাধান্য বিস্তার করে। রসসমূহের বিরোধ ও অবিরোধ চিত্তের বিকাশ, বিস্তর প্রভৃতি অবস্থায় ঐক্য অথবা অনৈক্য হইতে সৃষ্ট হয়। হাস্যরস যেরূপ শৃঙ্গার রসের অনুগামী সেইরূপ হাস্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে করুণ। হাস্য ও করুণের বিরোধিতার মূল কারণ হাস্যের মধ্যেই নিহিত। হাস্যের পশ্চাতে রহিয়াছে কৌতূহল ও কৌতূহলজনিত গভীর মনোনিবেশ। এই মনোনিবেশ অসঙ্গতকারণে সংলগ্ন হইয়াছে এইরূপ বোধ হইলেই দৃশ্য বস্ত সম্বন্ধে উপহাসজ্ঞান জাগ্রত হয়, করুণ রসে দুঃখ শোক প্রিয়জনবিচ্ছেদ প্রভৃতির মধ্যে কোন কৌতূহল নাই বরং ভীতির ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। হাস্যের মধ্যে প্রথমে মনোনিবেশের গাম্ভীর্য, শেষে অপ্রাপ্তির শূন্যতা ও লঘুতা বোধ। পক্ষান্তরে করুণরসের মধ্যে প্রথমেই দুঃখের প্রবল আঘাত, এবং শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপী গাম্ভীর্য ও বিমূঢ়তা। সুতরাং হাস্য ও করুণ স্বভাবতঃ বিপরীতধর্মী। হাস্য ও করুণকে বিপরীতধর্মী বলিবার তাৎপর্য এই যে তাহারা পরস্পর পৃথক ভাবাপন্ন হওয়ায় দুইটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারার সূচক। যে ব্যক্তি হাস্য করিতেছে সে সেইমুহূর্তেই ক্রন্দন করিতে পারে না। চিত্তের স্বাভাবিক লঘুতার পরিচায়ক হাস্য, করুণ রস চিত্তের ব্যাপ্তির। হাস্য করুণের এই বিরুদ্ধ ধর্মিতা পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকগণও স্বীকার করিয়াছেন ম্যাকডগল বলিয়াছেন "লাফটার ইজ দি এ্যান্টিডোট টু সিমপ্যাথি" লর্ড বায়রণ একদা বলিয়াছিলেন। এ্যান্ড ইফ আই লাফ অ্যাট এনি মরটাল থিং টিট ইজ দ্যাট আই মে নট উইপ" এই প্রসঙ্গে ইহাও আমাদের জানা প্রয়োজন যে রসবিরোধ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বস্তুতঃ স্থায়িভাবেরই বিরোধ কারণ অলৌকিক আনন্দময় রসাস্বাদের মধ্যে বিরোধ কিরূপে সম্ভব হইবে? আস্বাদ মূলতঃ অখণ্ডরূপ। কিন্ত হাস্য ও করুণের মধ্যে যথার্থই বিরোধ আছে কিনা তাহা আমাদের বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। হাঁসি ও কান্না উহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত,— যেন একই বস্তুর এপিঠ ও ওপিঠ। সংসারে যাহা করুণ তাহাই আবার হাস্যাস্পদ। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে জীবনের প্রতি ঘটনার মধ্যেই কিছু না কিছু অসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহারা একাধারে যেমন

হাস্যোদ্দীপক, তেমনি করুণ। এই সকল অসঙ্গতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহাদের যথার্থ রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই সকল দৃশ্যকে "নিবিড় করে সাজিয়ে গড়ে তোলতেই" শিল্পীর বাহাদুরি। সকলপ্রকার অসঙ্গতিই একাধারে তাহাদের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা লইয়া আমাদের চিত্তে যেমন হাস্যের উদ্রেক করে, তেমনভাবে হৃদয়ের গভীরতন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সহানুভূতি ও অনুকম্পাকেও জাগ্রত করে। বিকৃতিদর্শন যেমন হাস্যের কারণ তেমন ভাবে অশ্রুরও কারণ। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক কি? ইহার উত্তরে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি— "অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুকবোধ হয়। গভীরতরস্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখবোধ হয়। স্থূল কথাটা এই যে অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।" হাস্য এবং করুণ এই উভয়বিধ অনুভূতিই অসঙ্গতি হইতে জাত—একটি চিত্তের গভীর-স্তরে আঘাত করে অপরটি অগভীরস্তরে, একটিতে পরিহাস আত্মাভিমান প্রভৃতি ভাব প্রবল, অপরটিতে সহানুভূতি কারুণ্য প্রভৃতি, সুতরাং এক্ষেত্রে কেবল মাত্রারই বিরোধ ভাবের বিরোধ নহে। নিছক হাসি তারল্যের পরিচায়ক, অশ্রু কারুণ্যের উৎস—ইহাদের মধ্যবর্তীস্থলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের স্থান। সুতরাং যাহা বিশুদ্ধ হাস্য তাহার পশ্চাতে সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। হাস্য ও করুণকে পরস্পর বিরোধী বলিলে হাস্যের মধ্যে এই সহানুভূতিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ হাস্য রসের সৃষ্টি হইতে গেলে প্রয়োজন সহৃদয়ের যিনি অস-ঙ্গতির পশ্চাতে যে অসহায়তা ও সারল্য তাহাকে সমবেদনার দ্বারা আপনরূপে অনুভব করি-বেন। উচ্চ সাহিত্য সেই স্থলেই সৃষ্ট হয় যেক্ষেত্রে হাস্য ও করুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। যেমন বাংলা সাহিত্যের "ঠাকুরদা" গল্প। হাস্য যেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে উহা নীচপাত্র প্রযুক্ত ভাঁড়ামি, রঙ্গরস প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে সেখানে তাহা আমাদের চিত্তের লঘুতার প্রতি সংবেদন জানায় না। হাস্যরস কেবলই নীচপাত্রের দ্বারা প্রযুক্ত এই কথা বলিলে তাহার যথার্থ রূপের বিশ্লেষণ হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরের চরিত্রের অসঙ্গতি দেখিয়া যে অবজ্ঞামিশ্রিত হাসিতে অভিভূত হন, বিশুদ্ধ হাস্যে সেই অবজ্ঞাজনিত আত্মোৎকর্মবোধ থাকে না। জীবনেক অপূর্ব মমতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভূত ভবিষ্যদ্ ও বর্তমান এই তিন কালে প্রসারিত মানবের বিরাট সত্তাকে এবং নিয়তির সহস্র আঘাতে চূর্ণ মানবের সকল ব্যর্থতাকে—এক পটভূমিকায় গভীর সহানুভূতির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, যে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের বোধ হয় হাস্যের পশ্চাতে তাহাই বর্তমান, সুখ দুঃখ হাসি ও কান্না পাপ-পুণ্য, সঙ্গতি ও অসঙ্গতি ইহারা সহানুভূতির ভাবরসে আর্দ্র হইয়া যেরূপ ধারণ করে তাহাতে হাস্যরসের মধ্যে কোন জ্বালা অথবা আক্রোশ থাকে না। ফলে হাস্য ও করুণ এই উভয়রসেই উদাসীন নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। হাস্য ও করুণে এজন্য বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। পেটার এজন্য সেই হাস্যকেই যথার্থ হাস্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন যাহা.... ব্লেন্ডস্ উইথ টিয়ারস্, এ্যান্ড ইভ্ন উইথ দি সাবলিটিস অফ দি ইমাজিনেশন, এ্যান্ড হুইচ ইন ইটস মোষ্ট এক্সকুইসাইট মোটিভস ইজ ওয়ান উইথ পিটি...."

হাস্যরসে যে সহৃদয়তার আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা ঠিক করুণ রস নহে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হাস্যরসের প্রতিটি রচনার মধ্যেই এই করুণ রসের দ্যোতনা থাকে। ইংরাজীতে হিউমার বলিতে যা, বুঝায় সংস্কৃতে সেই ভাবের দ্যোতক প্রতিশব্দ নাই বলিলেও চলে। হাস্য-রসকে তত্ত্বদৃষ্টিতে হিউমার এর প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিলেও যথার্থ হাস্যরস বর্তমান সংস্কৃত সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি

উইট্ শ্রেণীর। পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখা দেখা যায় ল্যাম্ব এর এসেজ অব ইলিআ এই হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। হাস্যও করুণ সেখানে অপূর্ব সুন্দর ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ডিকেন্স এর রচনায় হাস্যরস করুণরসের আধিক্যে আপন বৈশিষ্ট্যকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুইণবার্ন এজন্য ডিকেন্সএর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"মাস্টার ইন্ দি কনটারমিনাস প্রভিন্সেস্ অব্ লাফ্-টার এ্যাণ্ড অব্ টিয়ারস্" হাস্য ও করুণ ইহারা সমভাবে মিশ্রিতনা হইলে যে উৎকৃষ্ট যে উৎকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্ট হয় না এই সত্য আলঙ্কারিকগণের জানা থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের রচনায় ইহা প্রতিফলিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সামাজিক জীবনে সংঘাতের অভাবই বোধহয় ইহার কারণ। আলঙ্করিক সম্প্রদায় হাস্যকে করুণ-রসের অনুভাবরূপে প্রদর্শন করাইয়া হয়ত হাস্য ও করুণের গূঢ় সংযোগটিকেই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। হাস্যরসাশ্রিত রচনার ক্ষমতাসকলের থাকে না এবং সকল যুগেও ইহা দেখা যায় না। ৭ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ও যুগন্ধর প্রতিভার মধ্যেই ইহার পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যায়। শকুন্তলা নাটকে বিদূষক হাস্যরসের বিভাব। তাহার সামান্য উপস্থিতি হইতেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পঞ্চমাঙ্কে অন্তঃপুরিকাগণের হস্তে তাহার পীড়ন এবং ষষ্ঠ অঙ্কে মাতলির হস্তে তাহার লাঞ্ছনা ইহারা মিলিতভাবে হাস্যের উদ্রেক করিলেও তাহাতে এই ক্ষাত্রধর্মবিমুখ ঔদারিক ও স্বল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণের প্রতি পাঠকচিত্ত অবজ্ঞায় ও উপহাসে পূর্ণ হইয়া উঠে না, বরং সহানুভূতিময় উদার অনুকম্পার ভাব উদ্রিক্ত হইয়া মনকে আর্দ্র করিয়া দেয়। পুনরায় মালবিকাগ্নি মিত্র নাটকে প্রথমত দ্বিতীয় অঙ্ক হরদাসও গণদত্তের কলহে উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। হরদাসও গণদত্তের কলহে উভয়েই রাজদরবারে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি পাদনের নিমিত্ত উৎসুক। দেবীধারিনী পরিব্রাজিকা কৈশিকী ও মহারাজ অগ্নিমিত্র স্বয়ং বিচারকের আসন অধিকার করিয়াছেন। হরদত্ত ও গণদাস উভয়ে স্ব স্ব অভিযোগ বিবৃত করিলেন। আচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব শিষ্যের শিক্ষার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে এজন্য গণদাসকে তাঁহার শিষ্যা মালবিকাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। মালবিকা উপস্থিত হইয়া অপূর্ব নৃত্য কৌশলের সহিত চতুস্পদা 'ছলিক গাণ' আরম্ভ করিল। নাট্যকারের প্রয়োজন রাজার সম্মুখে মালবিকার উপস্থিত করা—সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর আর অপর আচার্য্যের শিক্ষাকৌশল দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এজন্য হরদত্ত আসিয়া তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য দেখাইবার প্রার্থনা করিলে রাজা বাহিরে নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া বলিলেন ননু পর্য্যুৎসুকা এব বয়ম। এমন সময়ে বিদূষক বলিয়া উঠিল যে ভোজনের বেলা উপস্থিত অতএব শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন স্থগিত থাকুক, আপনবক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে হরদত্তকেই বিদূষক প্রশ্ন করিলেন "হরদত্ত কি, ভণসি? এই পরিস্থিতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম হাস্য বর্তমান তাহা কেবলমাত্র রসিক পাঠকেরই অনুভব গম্য। নাট্যকারের নিকট হরদত্তের শিক্ষা কৌশল দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই, রাজারও প্রয়োজন নাই, বিদূষকেরও নাই। অথচ স্বীয় কৌশল প্রদর্শন করিতে না পারিলে গণদাসের নিকট হরদত্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সমস্ত শক্তিতে সে এই আত্মা-বমানাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ঘটনাচক্র এমনভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে তাহার স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই, এজন্য সুতীব্র ক্ষোভ ও নিরুদ্ধ হাতাশার সহিত যে অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহকে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল "অস্তি চানস্য বচনাবকাশোহত্র?" তাহার এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনি করুণ। নাটকের বৃহত্তর প্রয়োজনের নিকট তাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার করুণ অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় পাঠকের চিত্ত সহানু-ভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠে। এই হাস্য একাধারে যেমন সূক্ষ্ম অনুভূতিগ্রাহ্য অপরদিকে তেমনি

প্রাণস্পর্শী। ইহাতে যেমন বুদ্ধির প্রতি আবেদন রহিয়াছে তেমনভাবে ইহা অনুভবের মধ্যে প্রাণস্পন্দনও আনিয়া দেয়। কালিদাসের রসকল্পনায় সকল দৈন্য ও অসঙ্গতিই এই নির্লিপ্ত মধুর হাস্যের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে ইহাই লক্ষণীয় যে হাস্যের উপাদান এক্ষেত্রেও সেই নীচপাত্র,—এক্ষেত্রেও বিদূষকের রং তামাসা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, মস্করা, ভাঁড়ামি, নির্বোধশিক্ষকের কলহ প্রভৃতি হাস্যের উপাদান। শিক্ষিত অশিক্ষিত বিদ্বান, উচ্চপাত্র, নীচপাত্র-নির্বিশেষে সকলেই ইহাতে অবিলম্বে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু কালিদাসের ন্যায় শক্তিমান কলাশিল্পীর হস্তে পড়িয়া ইহারা সম্মিলিতভাবে উচ্চাঙ্গের ধ্বনিকাব্যের অঙ্গভূত হইয়া গিয়াছে। প্রবলকাব্যবিচারশক্তি ও উদার সহানুভূতির যাদুদণ্ডস্পর্শে এই সমস্ত স্থূল উপাদানই সাহিত্যের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং রসবিরোধের কোন প্রশ্নই যেমন এক্ষেত্রে উদিত হয় না, তেমন নীচপাত্র আলম্বন বিভাবের স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হইবার প্রশ্নও এক্ষেত্রে উদিত হয় না। অধ্যাপক হডাসন এজন্য বলিয়াছেন যে যেখানে সত্যসত্যই হাস্যরস সৃষ্ট হইবে সেখানে রসোদ্দীপক বস্তুর তুচ্ছতা রসাস্বাদকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করিবে না, ২ অথবা রসের আস্বাদনের সময়ে ক্রূরতা বা বিস্বাদের কোন ভাব থাকিবে না। খাঁটি হাস্যরসের উৎপত্তি সেখানেই হয় সেখানে মানুষের সর্বপ্রকার নির্বুদ্ধিতা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও দৈন্যে অবিচলিত থাকিয়া লেখক তাহাতে সহানুভূতির মৃদু আলোকপাত করেন। এজন্য প্রকৃত হাস্যরস সকলপ্রকার নীচতা হইতে মুক্ত। ইহাতে সে সহৃদয়তা আছে তাহা ঠিক করুণ নহে, কিন্তু করুণের বিরোধীও নহে—করুণের বেশের দ্বারা আর্দ্র। জীবনকে দূর হইতে দেখিলে তাহার অসঙ্গতি চিত্তে কারুণ্যের উদ্রেক করে; কিন্তু সেখানে কারুণ্য অশ্রুতে অবমিত হয় না। সব ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া বিবর্তনশীল সত্তার যে আনন্দরূপ তাহাই হাস্য ও করুণকে উদ্রিক্ত করিয়া স্বর্গীয় হাস্যে পরিণত হয়। অপরাধী দীর্ঘকাল কারাবাসের অবসানে অতীত জীবনের ভ্রান্তি স্মরণ করিয়া হাস্য করে। সহস্র অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ মানবাত্মা যেন ঐ হাস্যের মধ্যে মূর্ত হইয়া প্রকাশপায়। কালবিবর্তনের সহিত অর্জিত মানবজীবনসম্পর্কে যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি—তাহাই বিশুদ্ধ হাস্যের মধ্যে বর্তমান। ইহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কোন অসঙ্গতি নাই। সুতরাং হাস্য ও করুণের মধ্যে মৌলিক বিরোধ বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতীয়মান মাত্র, বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। সুতরাং ষ্টীফেন লীককের রসগ্রাহী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গ সমাপন করিতেছি —

"Humour, in its highest form, no longer excites our laughter, no longer appeals to our Comic sense, no longer depends upon the acid of wit.... Such is the highest "humour". It represents an outlook upon life, a retrospeet as it were, in which is contrasted the fever and fret of our earthly lot with its short comings, its lost illusions and its inevitable end. Thus does life, if we look at it from sufficient distance, dissolve itself into humour seen through an indefinite vista it ends in a smile.... Our Universe ends thus with one vast silent unappreciated joke (Humour ch. xi. p. 286-288).

২. "Much depends upon spirit and treatment. But we are at least safe in saying that when our laughter is stirred it shall be by no unworthy subjects, that it shall not pantake of cruelty, and that it shall leave no bad taste in the mouth"—(The Study of Literature p. 207).

"There is no reason why a Tragedy must be as Laughterless as the House of Roswersholm, and equally no reason why it should not. Only one rule remains about Humourin Tragedy, that it must not clash with the tone of the whole (Tragedy p. 153)."

সাহিত্য সংবাদ

উডফিন স্ট্রীটের যে বাড়ীটিতে টমাস উলফ, এ পৃথিবীর মুক্ত বায়ুর আস্বাদ প্রথম গ্রহণ করেন তার ক্রমিক সংখ্যা হল বিরানব্বই। উলফ পরিবারের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যে সূত্রগুলি অদ্যাবধি লাভ করা গেছে তা অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায় যে টমাসের মাতৃপক্ষের বংশ-গৌরব উল্লেখযোগ্য কিন্তু পিতৃপক্ষ সম্বন্ধে আপাততঃ তেমন কিছু উল্লেখ করার মত নেই কারণ এখনও অনুসন্ধান চলেছে। টমাসের মা, জুলিয়া এলিজাবেথ (ওয়েস্টাল) উলফ, মিশ্রিত পেন্সিলভানিয়া—জার্ম্মান, ইংরাজ এবং স্কচ—আইরিশ বংশোদ্ভূত। টমাসের পিতামহ জেকব উলফের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে পালাটিনেটের যে জার্ম্মান বংশটি ১৭২২ সালে, উইলিয়ম এণ্ড সারা জাহাজের যাত্রী হয়ে নূতন মহাদেশ আমেরিকায় উপনীত হন, সেই বংশের জর্জ্জ উলফ এবং হান্স বার্নহার্ট উলফ সম্ভবতঃ জেকবের পূর্ব্বপুরুষ। জেকব উলফের পঞ্চম সন্তান উইলিয়ম অলিভার উলফ প্রস্তর খোদাইকারীর পেশা গ্রহণ করেন। এবং র‍্যাশোভিল সহরে মার্ব্বেল প্রস্তর খোদাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন। উইলিয়মের তৃতীয় পত্নী জুলিয়া এলিজাবেথ কালক্রমে আটটি সন্তানের মাতৃত্বলাভ করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ লেসলী শিশুকালেই কলেরা রোগে প্রাণ হারায় তারপর ইফি, ফ্রাঙ্ক, ম্যাবেল, যমজ ভ্রাতৃদ্বয় গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড এবং বেঞ্জামিন হ্যারিস, ফ্রেড এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ টমাস। টমাসের বয়সের সংগে অন্যান্য ভাইবোনের বয়সের তফাৎ এত বেশী ছিল যে সকলেই তাদের এই ছোট্ট ভাইটিকে বেবী বলে তাদের আদর করত। পরবর্তী জীবনে এই আদরের আড়ম্বর টমাসের জীবনে এক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

টমাসের বাবা উইলিয়ম উলফ মানুষ হিসাবে মন্দ ছিলেন না, তাঁর স্মৃতিশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল এবং কাব্যের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল অপরিসীম। ছন্দময় কাব্য তাঁকে আকর্ষণ করত নিবিড়ভাবে, গ্রে সাহেবের এলিজি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং গৃহে অবস্থানকালে প্রায়ই সেক্সপীয়র আবৃত্তি করতেন। তাঁর স্নেহময় হৃদয়ের জন্য সন্তানগণ সকলেই তাঁকে ঘিরে থাকত। অপর একটি গুণের জন্য উডফিন স্ট্রীটের সকল শিশুরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত কারণ উইলিয়ম ছিলেন অপূর্ব্ব কথক, তাঁর গল্প বলার ভংগী ছিল অনুকরণীয়। সংসারে কোনও অসচ্ছলতা ছিল না কিন্তু মাঝে মাঝে মতানৈক্যের ফলে মাতা পিতার দ্বন্দ্বে সন্তানরা কষ্ট-ভোগ করত। ক্রমশঃ সংসারে এমন জটিলতার সৃষ্টি হল যে শ্রীমতী উলফ, কন্যা ম্যাবেলকে উডফিন স্ট্রীটের বাড়ীতে রেখে আটচল্লিশ নম্বর স্প্রুস স্ট্রীটের বাড়ীতে চলে এলেন, টমাসের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র। ম্যাবেল, উডফিল স্ট্রীটে থাকল বাবার পরিচর্য্যার জন্য।

টমাসের গৃহ শিক্ষিকা নিযুক্ত হলেন মার্গারেট বর্যাটস্ এবং অরেঞ্জ স্ট্রীটের পাবলিক স্কুলে তাঁকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়, এখানে ছয় বৎসর পাঠ গ্রহণ করার পর অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি পাঠভ্যাস সুরু করেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী উলফ উৎকট বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং প্রতি শীতের মরসুমে তিনি স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন

টমাস সর্ব্বদাই মায়ের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু এই ভ্রমণের ফলে তাঁর পড়াশুনায় কোনও ব্যাঘাত জন্মাত না কারণ শ্রীমতী উলফ তাঁকে স্বয়ং শিক্ষাদান করতেন কিম্বা স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিতেন। এইভাবে ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৩ সালের ব্যবধানে টমাস নিউঅরলিস, সেণ্ট পিটার্স বার্গ, জ্যাকসনেভিল, সেণ্ট আগস্টিন, ডেটোনা ,পামবীচ—ফ্লোরিডা নক্সভিল টেনেসী—হটস্প্রিংস্, আরাকানসাস এবং ওয়াশিংটন ডি. সি. প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করার সুযোগ লাভ করেন। এই দেশভ্রমণের প্রভাব টমাসের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং উত্তর জীবনে টমাস চঞ্চল হয়ে মাঝে মাঝে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন সম্ভবতঃ পূর্ব্বজীবনের সেই অভিজ্ঞতার সুখস্মৃতির পুনরান্বেষণে।

যখন নর্থ স্টেট ফিটিং স্কুলের উদ্বোধন হয় তখন টমাসকে সেখানে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয় এবং এর চার বৎসর পর তিনি নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। বস্তুতঃ নর্থ স্টেট স্কুলেই টমাসের সাহিত্য সাধনার হাতে খড়ি হয়। সেই সময়ে ইণ্ডিপেনডেণ্ট ম্যাগাজিন সেক্সপীয়রের জন্ম-ত্রিশতবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। টমাস "সেক্সপীয়র দি ম্যান" নামক প্রবন্ধটি রচনা করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি লাভ করেন এবং প্রবন্ধ পাঠের প্রতিযোগিতাতেও জয়লাভ করেন অথচ টমাসের বাক্‌ভঙ্গীতে তোৎলামির ভাব বেশ প্রকট ছিল। এই বিচিত্র বাক্‌ভঙ্গীর অধিকারী হয়েও টমাস বেশ ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন এবং বহু বিতর্ক সভায় যোগদান করেছিলেন। ডায়ালেক্টিক লিটারারী সোসাইটির বিতর্ক সভার অন্যতম অংশ গ্রহণকারী টমাস পরে ফ্রেসহ্যাম ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি হন। ছাত্র হিসাবে টমাস প্রথম শ্রেণীর ছিলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকা যখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে টমাস তখন ষোল বৎসর বয়স্ক এক উদ্দাম তরুণ, চঞ্চলতা তাঁর অহঙ্কার। এই সময়ে টমাস ২১ বৎসর বয়স্ক যুবতী ক্লারা পলের প্রণয়ে এ পৃথিবীর সব কিছুরই মধ্যে আনন্দের আভাষ পান কিন্তু টমাসের মা একথা বিশ্বাসই করতে চান নি যে তাঁর বেবী তখন এক চঞ্চল তরুণ।

টমাস বাবার আদেশ মত চ্যাপেল হিল কলেজে যোগদান করেন ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, উলফ পরিবারে তখন ঝড়ের পূর্ব্বাভাস, একদিন প্রকাশ পেল যে উইলিয় উলফ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়েছেন। সংসারের বিশৃঙ্খলার কোন প্রভাব টমাসের মনে ছায়া-পাত করতে পারে নি কারণ শ্রীমতী উলফ তাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠটিকে স্নেহের আঁচলে সর্ব্বদাই আড়াল করে রাখতেন। চ্যাপেল হিল কলেজে টমাসের ছাত্রজীবন বিশেষ আনন্দময় ছিল, "টার হিল" পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে টমাসকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন যে টমাস তাঁর বিচিত্র বাক্‌ভঙ্গীর সাহায্যে সকলকেই আনন্দ দিতে সক্ষম হতেন। "স্টার হিল" পত্রিকার সম্পাদনার প্রাক্কালে টমাসের মধ্যে সাহিত্য সাধনার বীজ ক্রমশঃ আলো হাওয়ার সংস্পর্শে এসে অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমে তিনি "ক্যারোলাইনা ম্যাগাজিন" পত্রিকার সহ সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গল্প এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হত। টমাসের জীবনে যে তিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছে তাঁদের একজন হলেন প্রফেসার ফ্রেডেরিক এটচ কচ্, তিনি যখন চ্যাপেল হি'ল কলেজে যোগদান করেন তখন কলেজের কোনও নাট্যসংস্থা ছিল না। প্রফেসর কচ্ একজন উৎসাহী সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন, প্রথমেই তিনি ক্যারোলাইনা প্লেমেকার্স নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠন করলেন। নাটক রচনা এবং অভিনয় শিক্ষাদান এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ১৯১৯ সালের ১৪ এবং ১৫ই মার্চ্চে টমাসের "দি রিটার্ণ অব বাক্ গ্যাভিন, এ ট্রাজেডি অব দি মাউণ্টেন পিপল" নামক নাটকটি চ্যাপেল হিল হাইস্কুরেল প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত

হয়। টমাস নায়ক বাক্ গ্যাভিনের চরিত্র অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

এরপর "ডেফার্ড পেমেণ্ট," "দি থার্ড নাইট," "এ মাউণ্টেন অব সুপার ন্যাচারাল" এবং "কনসার্নিং অনেস্ট বব" প্রভৃতি নাটক টমাস কর্তৃক রচিত হয় এর মধ্যে "ডফার্ড পেমেণ্ট" নাটকটি ক্যারোলাইনা ম্যাগাজিনে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকগুলি কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করলেও পরে টমাসের কাছে এগুলির কোনও আবেদন ছিল না। তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে চয়নে বৈপরীত্য ঘটলেও, নাটক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লেখনী ক্রমশ এক সার্থক পরিণতির পথে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয় এবং আধুনিক আমেরিকান গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করে। টমাসের যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে তখন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯২১ সালের মে মাসের শেষে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার পর দেখা যায়, টমাস কয়েকটি নাটক সমাপ্ত করেছেন এবং এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হল "ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি," সমালোচকদের মতে এই নাটকটিই টমাসের একমাত্র সক্ষম সৃষ্টি কিন্তু নিউইয়র্কের থিয়েটার গিল্ড নাটকটি মঞ্চস্থ না করে যখন টমাসের কাছে ফেরৎ পাঠায় তখন তাঁর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

থিয়েটার গিল্ডের বিচারে নাটকটি হয়ত তখন অভিনয়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি কিন্তু এমন নয় যে তাতে কোনও সারবস্তু ছিল না। টমাস ভগ্নোদ্যম না হয়ে বহু জায়গায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন প্রযোজকই এই নূতন লেখককে বিশেষ আমল দিতে চাইলেন না। অতঃপর টমাস শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতে মনস্থ করেন এবং নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওয়াশিংটন স্কোয়ার কলেজে ইংরাজি ভাষার নির্দেশকের পদটি লাভ করেন, বাৎসরিক বেতন ১৮০০ ডলার। বসন্তকালীন অধিবেশন সুরু হওয়ার পর ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী টমাস নিউইয়র্কে উপস্থিত হন এবং শিক্ষকতা সুরু করেন। শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। দিনে শিক্ষকতা এবং রাত্রে লেখনী চালনা এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম। টমাস শিক্ষকতার কাজে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন এবং যতকাল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন সকলেই তাঁকে স্নেহদান করেছেন বা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে তাঁকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা বলেছেন যে সে সময় তাঁর মধ্যে এমন একটা শক্তির আবির্ভাব হত যা তাঁকে অস্থির করে তুলত এবং সাহিত্যকর্মের মধ্যে তার প্রকাশ না ঘটলে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন এবং মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তেন। এই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন এবং সময়ে অসময়ে তাঁর মনে হত তিনি হয়ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই অবরুদ্ধ শক্তির তাড়নায় তিনি উদ্বেল হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে যে আত্মপ্রত্যয় তাঁর মাঝে ধূমায়িত হচ্ছিল তার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯২৬ সালে এবং সেই প্রত্যয়ের স্রোতে পুঞ্জীভূত হয়ে তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি "লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল" উপন্যাসের মধ্যে প্রস্তরভূত হয়।

টমাস প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে। ল্যাঙ্কেস্টারিয়া জাহাজে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যখন তিনি পাড়ি দেন তখন তাঁর পুঁজি মাত্র চারশ ডলার এবং ভাঙাচোরা সুটকেসে একটি অসমাপ্ত নাটকের পাণ্ডুলিপি, প্রথমে নাটকটির নাম ছিল "দি হাউস" পরে "ম্যানার হাউস" নামে পরিচিত হয়। এই সমুদ্র যাত্রায় টমাস "এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড" নামক একটি খাপছাড়া প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসে ইউরোপে যখন অর্থের অনটনে তাঁর অবস্থা বেশ মনোগ্রাহী নয় তখন "লগ অব এ ভয়েজ দ্যাট ওয়াজ নেভর মেড" উপনামে উক্তরচনাটি এ্যাসিভিলের সিটিজেন কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন এবং ১৯ জুলাইয়ের সিটিজেন কাগজে "লণ্ডন টাওয়ার" নামে একটি ছোট নিবন্ধ প্রকাশিত হয়; সম্ভবতঃ

এই নিবন্ধটি সমগ্র প্রবন্ধের অংশমাত্র। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে টমাসের পক্ষে আর ইউরোপে অবস্থান করা সম্ভব হল না এবং অলিম্পিক জাহাজে দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সমুদ্র-যাত্রায় টমাসের জীবনে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে যা তাঁর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ অন্য-পথে পরিচালিত করে। অলিম্পিক জাহাজে শ্রীমতী এলিন বার্ণস্টাইন নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে হঠাৎ টমাসের পরিচয়ের ফলে টমাসের জীবনে এক অসম প্রেমের আবির্ভাব হয় যার সুদূর প্রসারী ফল হল ঔপন্যাসিক টমাস উলফের আত্মপ্রকাশ।

১৯২৫ সালের কথা টমাস উলফ তখন অস্থির এবং খামখেয়ালী যুবক, উদ্দামতা তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। টমাসের চঞ্চলতার অন্যতম কারণ হল "ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি" এবং "দি ম্যানার হাউস" নাটক দুটি থিয়েটারের মালিকেরা সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছেন সুতরাং নাট্যকার হিসাবে তাঁকে কৃত্রিম বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেই স্থিতাবস্থার শেষ কোথায় এই চিন্তাতেই তিনি জর্জ্জরিত। এমনই এক মহেন্দ্রক্ষণে টমাসের জীবনে শ্রীমতী বার্ণস্টাইনের উদয় হয় এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে টমাসের জীবন যাত্রা ও তাঁর মানসিক গতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। শ্রীমতী এলিন বার্ণস্টাইন টমাসের অস্থির জীবনের স্থির ধ্রুবতারা। এলিনের সঙ্গ এবং সাহচর্য্য টমাসের জীবনে ভারসাম্য এনে দেয় এবং তাঁকে দৃঢ়চেতা পুরুষে পরিণত করে। সার্থক লেখক হিসাবে টমাসকে পাঠকসমাজে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পিছনে এলিনের যে অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তা আদর্শস্থানীয়, কেবল তাই নয় টমাসকে জ্ঞানী এবং স্থিতধী যুবকে পরিণত করার মূলে ছিল এলিনের অসীম প্রেমময়তা। তাঁর সাহচার্য্য ব্যতিরেকে টমাসের মহৎ সৃষ্টি "লুক হোমওয়ার্ড এ্যাঞ্জেল" বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভবনা সুদূরে পরাহত ছিল। এত কিছু পাওয়া সত্ত্বেও টমাস ১৯৩১ সালে এলিনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন।

নিউইয়র্ক বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে টমাস পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন ২৩ জুন ১৯২৬ সালে। প্যারিসে পৌঁছে টমাস হঠাৎ উপন্যাস লেখার কথা চিন্তা করেন। ফ্রান্সে দশদিন অতিবাহিত করার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে এলিনের সঙ্গে মিলিত হন। তখনই এলিন জানতে পারেন যে টমাস উপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন। তারপর তাঁরা দুজনে লেক কাণ্ট্রির ইল্কলে সহরে বসবাস সুরু করেন। লেক কাণ্ট্রির মুগ্ধকর পরিবেশ টমানসর অস্থিরতায় প্রশান্তি আনে এবং জুলাইয়ের এক গরমদিনে এক সবুজ পাহাড়ের কোলে বসে টমাস তাঁর জীবনবেদ রচনায় মগ্ন হলেন, এলিন উৎসুক নয়নে অনাগত দিনের অন্যতম কথাসাহিত্যিকের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। পাছে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় সেজন্য এলিন সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন! কয়েকদিন অবিশ্রান্ত লেখনী চালনার পর টমাস বেলজিয়ামের দিকে পা বাড়ালেন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায়, ভাগ্যচক্রের নির্দ্দেশে অপর এক ব্যক্তি-ত্ত্বের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল। মেস জয়েস সপরিবারে ওয়াটারলু পরিদর্শনে বেরিয়ে-ছেন এবং একই মোটরবাসে টমাসও চললেন ওয়াটারলুর পথে। এই সাক্ষাৎ টমাসের জীবনের অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, জয়েসের দিক নির্দ্দেশকারী কথপোকথন টমাসের মনে অমৃতের স্বাদ বহন করে আনে, উলেসিস হয় তাঁর আকর গ্রন্থ। উলেসিসের প্রভাব টমাসের মানসপটে আজীবন প্রজ্বলিত থাকে এবং স্বচ্ছন্দগতি গদ্যের রচনায় বিশেষ সাহায্য করে।

১৯২৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর টমাস নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁর একমাত্র সাধনা হল অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা, প্রায় মধ্যরাত্র থেকে ভোর ছয়টা অবধি ঝড়ের বেগে লিখে চলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের রচনা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে দৃঢ় সঙ্কল্প ও গতির

প্রতিযোগিতায়, তারপর একদিন এলিন জানতে পারলেন যে টমাস আপাততঃ লেখনী চালনা বন্ধ করেছেন এবং ১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে "লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল" উপন্যাস সমাপ্ত হয়। উপন্যাসটির নামকরণ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বহু আলোচনার পর তিনি মিলটনের "লিসিডাস" কাব্যের একটি পঙ্‌ক্তি থেকে থেকে "লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল" নামটি মনোনীত করেন এবং পান্ডুলিপিটি টাইপ করিয়ে এক কপি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন জেমস মুনের কাছে সমালোচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। জেমস মুন উপন্যাসটির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন এবং যথাসাধ্য পরামর্শদানে সাহায্য করেন। কিন্তু প্রকাশনার ব্যাপারে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হল। বহু প্রকাশক উপন্যাসটি প্রকাশ করতে রাজী হলেন না, টমাস উদ্বিগ্ন হয়ে প্রকাশকদের দরজায় ধর্ণা দিতে লাগলেন কিন্তু কোন সুফল ফলল না। মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে টমাস বিশ্রাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তারপর চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পুনরায় বিদেশ যাত্রা করলেন। টমাস যখন ভিয়েনায় তখন এলিনের কাছ থেকে এক কেবল্‌গ্রাম পেলেন। এলিন আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন যে পুস্তকপ্রকাশক স্ক্রিবনার প্রতিষ্ঠানের অনত্যম সম্পাদক ম্যাক্সওয়েল পার্কিন্স পান্ডুলিপিটি পাঠ করেছেন এবং উপন্যাসটির সম্ভবনার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই পার্কিন্স উপন্যাসটির কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করতে চান সুতরাং টমাসের উপস্থিতির প্রকান্ত প্রয়োজন।

তারপর চলল অমানুষিক পরিশ্রম. টমাস এবং পার্কিনস্ দুজনেই উপন্যাসটির সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হলেন। পার্কিনস্ যেমন যেমন বলেন টমাস তেমনভাবে সংস্কার করতে লাগলেন এবং জুন মাসের প্রথমদিকে আমূল সংস্কৃত পান্ডুলিপিটি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হ'ল। টমাস এক চিঠিতে ভগ্নী ম্যাবেলকে লিখে জানালেন যে প্রায় এক লক্ষ কথা বর্জ্জন করতে হয়েছে এবং এমন কয়েকটি পরিচ্ছেদ বাদ পড়েছে যা অত্যান্ত বেদনাদায়ক। আরও বলেছেন যে পার্কিন্সের সাহায্য ব্যতিরেকে উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ অসম্ভব ছিল। যতই প্রকাশনার দিন এগিয়ে আসতে থাকল টমাসের দুশ্চিন্তার মাত্রা সীমা ছাড়াবার উপক্রম হল কারণ "লুক হোমওয়ার্ড. এ্যাঞ্জেল" নিছক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। সাধারণ আমেরিকান পরিবারে সুখ দুঃখের যে খেলা নিয়তই চলেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে সুচারু গদ্যের মাধ্যমে। টমাসের দুশ্চিন্তার অপর একটি কারণ হল তাঁর পরিবারের স্বজনরা উপন্যাসটি কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তাঁদের চরিত্রের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা কি তাঁদের মনঃপুত হবে? যদিও উপন্যাসে তাঁদের নাম বদল করা হয়েছে কিন্তু মা, ম্যাবেল, ইফি কি কি নিজেদের চিনতে পেরে রাগান্বিত হবেন না? এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় টমাস অস্থির হয়ে ওঠেন আর এলিনের স্নেহছায়ায় শান্তির আশ্রয় খোঁজেন।

অবশেষে লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল" ছাপাখানার কবল থেকে মুক্ত হল। ১৮ই অক্টোবর ১৯২৯ সাল তারিখটি টমাসের জীবনে শ্রেষ্ঠদিন কারণ ওই দিনেই স্ক্রিবনার প্রতিষ্ঠান উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন। বিরাট উপন্যাস. পাঠক সমাজ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করে কিন্তু নামপত্রের অজ্ঞাতনামা লেখক টমাস উলফের নাম পাঠক মনে কেমন দাগ কেটেছিল আজ তা একটা কৌতূহলের বিষয় বটে। পার্কিনস্ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে এ উপন্যাস পাঠক-সমাজ গ্রহণ করবেই কারণ নগ্ন সত্যের যে ছবি টমাস এঁকেছেন তার আবেদন শাশ্বত। উপন্যাসটির প্রকাশনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই বহু পত্র পত্রিকায় এর সমালোচনা বেরুল অবশ্য অধিকাংশই বিরূপ মন্তব্যে পরিপূর্ণ কিন্তু আঘাত এল মায়ের কাজ থেকে। তিনি কয়েকটি পাতা পড়ে ম্যাবেলকে বললেন. টমাসের এমন লেখা উচিত হয়নি। কিন্ত এত বিরূপতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করল এবং নভেম্বর মাসে মোট ২৬০০ কপি বিক্রীত

হল। প্রথম সংস্করণে ৫৫৪০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু পার্কিন্স উপন্যাসটির সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দ্বিতীয় মুদ্রণের আদেশ দিলেন। "লুক হোমেওয়ার্ড এ্যাঞ্জেল" কোন শ্রেণীর উপন্যাস তার বিচার পাঠকসমাজ করেছেন এবং যার ফলে টমাসের জীবনে এসেছে সাফল্য।

১৯২৯ সালে টমাস গাগেনহাইম ফেলোসিপের জন্য আবেদন করেন এবং ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এলিনের সঙ্গে টমাসের মতান্তর ঘটে। এই বৃত্তির প্রয়োজন টমাসের পক্ষে যদিও অপরিহার্য্য ছিল কিন্তু এলিনের তা মনঃপূত হয়নি। উলফ পরিবারে তখন আর্থিক অসচ্ছলতা বিশেষভাবে প্রকট, এ্যাশেভিলের ব্যাঙ্কগুলি হঠাৎ দরজা বন্ধ করে দেয় ১৯২৯ সালে, কারণ ওয়াল স্ট্রীটের বিরাট পতন। গাগেনহাইম ফেলোসিপ গ্রহণ করে টমাস যখন বিদেশ যাত্রা করল তখন এলিনের আর কোন আশাই রইল না।

পরবর্ত্তী উপন্যাস "অব টাইম এণ্ড দি রিভার" নিয়ে পার্কিন্স ও টমাসের মধ্যে প্রচুর বাক বিতণ্ডা হয়। টমাসের ইচ্ছা ছিল তিনি যেমনভাবে উপন্যাসটি লিখেছেন ঠিক তেমনটি যেন পাঠকের কাছে পেঁৗছায় কিন্তু অভিজ্ঞ সম্পাদক পার্কিনস্ তা হতে দিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে যোগ-বিয়োগের সাহায্যে উপন্যাসটিকে একটি পরিচ্ছন্নতার রূপ দান করলেন। টমাসের এই ব্যাপারটি মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না, মাঝে মাঝে ক্ষীণ আপত্তি জানালেও পার্কিনন্স্ দৃঢ় মন নিয়ে উপন্যাসটির সংস্কার করছিলেন, তারপর হঠাৎ একদিন টমাস মারমুখী হয়ে পার্কিন্সের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করলেন, টমাসের বক্তব্য হল, তিনি যা লিখেছেন তাই-ই পাঠকের কাছে নিবেদন করা হোক, পার্কিন্স্ বললেন তা হয় না। "অব টাইম এণ্ড দি রিভার ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখে প্রকাশিত হবার জন্য যখন সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা তখন পার্কিনস্ ইল দ্য ফ্রান্স নামক জাহাজের একটি টিকেট টমাসের জন্য কিনে রাখলেন কারণ প্রথম উপন্যাস প্রকাশনার আগে টমাসের মানসিক অস্থিরতা দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সুতরাং সেই অস্থিরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে টমাসের বিদেশ যাত্রা অতি আবশ্যক। মার্চের ২ তারিখে টমাস সারা পৃথিবীর উদ্বেগ মাথায় নিয়ে ফ্রান্সের পথে যাত্রা করলেন কিন্তু প্যারিসে পেঁৗছে তাঁর অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেল কিন্তু যখন তিনি পার্কিন্স্ প্রেরিত কেবলগ্রামে সুখবর পেলেন তখন আশ্বস্ত হলেন। "অব টাইম এণ্ড দি রিভার" আমেরিকায় বিপুল সম্বর্ধনার সঙ্গে পাঠক সমাজ গ্রহণ করেছে এবং পত্র-পত্রিকার সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল উপন্যাসটির প্রশংসায়, পার্কিন্স আবার খবর পাঠালেন, সুখবর পেয়ে টমাস পার্কিন্সকে জানালেন যে তাঁর মত বন্ধু আর কেউ নেই।

"অব টাইম এ্যাণ্ড দি রিভার" উপন্যাসের বিরাট সাফল্যের পর টমাস একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন সংকলটির নাম "ফ্রম ডেথ টু মর্ণিং"। টমাস জানতেন যে পাঠক সমাজ বইটি সমাদর করবে না এবং প্রকৃতপক্ষে তাইই ঘটেছিল কেবল তাই নয় বেশ বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হল পত্র-পত্রিকায়। গল্প গ্রন্থটির প্রকাশনার তারিখ হল ১৯৩৫ সালের ১৪ই নভেম্বর। টমাসের রচনার এত বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত যে লেখনী ত্যাগ করবেন, কিন্তু অস্বাভাবিক মনোবলের সাহায্যে সে দুর্বলতা মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হন। কিন্তু এবারের সমালোচনা তাঁকে মোটেই হতোদ্যম করতে পারেনি কারণ "অব টাইম এ্যাণ্ড দি রিভার" উপন্যাসের সাফল্যের রেশ তখন তাঁর মনে উদ্দীপনার আগুন জেবলে দিয়েছে। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন সর্বাপেক্ষা আনন্দোজ্জ্বল।

এরপর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "দি স্টোরি অব এ নভেল" পুনরায় বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হল। পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটি টমাস কিভাবে রচনা করেছেন তারই কাহিনী এই বইটিতে বিন্যস্ত করেছেন। কোনও সমালোচক এমন উক্তিও করলেন যে পার্কিন্সের সাহায্য

ব্যতিরেকে টমাস একটি উপন্যাসও রচনা করতে সক্ষম হতেন না। অবশ্য এই বিরূপভাব টমাসকে খুব বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি কারণ "অব টাইম এ্যান্ড দি রিভার" তখন বেস্ট সেলারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ৪০,০০০ হাজার কপি বিক্রীত হয়েছে সেকালে, কিন্তু এটি জনপ্রিয়তার লক্ষণ। এই উপন্যাস টমাসকে কিছু অর্থও এনে দেয় এবং সমালোচকদের প্রশংসায় তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন। টমাসকে, সমালোচকরা হুইটম্যান, মেলভিল, থরো প্রভৃতি সাহিত্যরথীর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করতেও দ্বিধা করেননি। বিরাট সাফল্যের যে অবসাদ এসেছিল তা দূর করবার জন্য টমাস বের্লিনে হাজির হলেন। ১৯৩৬ সালের বের্লিন জাঁকজমকে পূর্ণ কিন্তু সকল আনন্দের ঠিক অপর দিকে তখন কালো ছায়া ফেলে হিটলারের নাৎসী পার্টি অত্যাচারের রাজত্ব শাসন করছে। টমাস যখন উৎসবমুখরিত বের্লিনে উপস্থিত হলেন তখন অলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসেছে। নিগ্রো দৌড় বীর জেসী ওয়েন্স আমেরিকার পক্ষ থেকে অলিম্পিকে যোগাদন করেছিলেন। ওয়েন্স যখন একটির পর একটি স্বর্ণপদক লাভ করছেন তখন আমেরিকার দর্শকবৃন্দ উচ্ছ্বসিত উল্লাসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন, টমাস রাজদূতদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে প্রাণপণে ওয়েন্সকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিলেন। সেখানে হিটলারও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য প্রতিযোগীকে হিটলার স্বয়ং পদক বিতরণ করেছিলেন, কিন্তু ওয়েন্সকে তিনি দেননি কারণ নাৎসী আমলে আর্যেতর জাতিদের অর্ধমানব অথবা পশু হিসাবে গণ্য করা হত। সুতরাং ওয়েন্সের সাফল্যে রাজ-পুরুষদের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কে এত উল্লাস প্রকাশ করছে তা জানবার জন্য যখন হিটলার পিছন ফিরে তাকালেন তখনও টমাস উল্লসিত হয়ে হাত নাড়ছেন, হঠাৎ টমাস দেখলেন হিটলারের ক্রোধেভরা দুটি চোখ, যাতে ঘৃণা উপচিয়ে পড়ছে এবং প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে যে একটি পশুর সাফল্যে মানুষের উল্লসিত হবার কি আছে। গেস্টাপো খোঁজ নিয়ে জানল যে ওই দুর্ব্বিনীত ছোকরাটি আর কেউ নয়, টমাস উলফ স্বয়ং "অব টাইম এ্যান্ড দি রিভার" উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। উপন্যাসটি জার্মানিতে তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বের্লিনে থাকাকালীন থিয়া ফোয়েলকার নাম্নী এক জার্মান মহিলার সঙ্গে টমাসের আলাপ হয়। এই মহিলা শিল্পীটির প্রতি টমাস আকৃষ্ট হন, কিন্তু থিয়া টমাসকে বেশীদিন ধরে রাখতে অক্ষম হলেন এবং কয়েকদিন পরেই দেশে ফিরে এলেন। নিউইয়র্কে ফিরে টমাস এক চিঠি লিখলেন পার্কিন্সের কাছে, তিনি আর স্ক্রিবনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতে চান না এবং স্বভাবতঃই পার্কিন্সের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান। তারপর সুরু হল তুমুল সংগ্রাম, স্ক্রিবনারের কবল থেকে টমাস যখন রেহাই গেলেন তখন এক বিরাট পাণ্ডুলিপি পরিসমাপ্তির পথে, সেটা ১৯৩৭ সালের কথা। আপাততঃ পাণ্ডুলিপিটির পরিচয় "দি অক্টোবর ফেয়ার।" টমাস চাইলেন তাঁর আগামী উপন্যাসগুলির প্রকাশক হোক অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে, হাউটন মিফিন কোম্পানী এগিয়ে এলেন, কিন্তু পুনরায় বিরোধ বাঁধল মিফিনের সঙ্গে ক্রমে তা কলহে পরিণত হল। এমন সময়ে হার্পারস প্রতিষ্ঠান টমাসকে এক লোভনীয় সুযোগ দিলেন, তাঁরা অঙ্গীকার করলেন যে পরবর্তী উপন্যাসগুলির জন্য টমাসকে দশ হাজার ডলার অগ্রিম দাদন দিতে রাজী আছেন। টমাস সুযোগটি গ্রহণ করলেন। অতঃপর সেই বিরাট পাণ্ডুলিপি নিজেই সংস্কার করতে সুরু করলেন, অবশ্য পার্কিন্সের অভাব টমাস অহরহ বোধ করতেন।

পারডিউ বক্তৃতামালার উদ্বোধন দিবসে টমাস বললেন, সাধারণতঃ যে সকল সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন তাঁরা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁর বয়স মাত্র ৩৭, পারডিউ বক্তৃতা-মালার পক্ষে নিতান্তই অল্প কারণ তাঁর সাহিত্য জীবন মাত্র নয় বৎসরের সুতরাং এই স্বল্প

দিনের মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যেতে পারে? জীবনের কতটুকুই বা তিনি জেনেছেন যাকে ভিত্তি করে বক্তৃতা দেওয়া যায়? কিন্তু বক্তৃতা তাঁকে দিতে হল। সে বক্তৃতা যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন এবং তাঁরা সকলেই আজও স্বীকার করেন এমন বক্তৃতা তাঁরা অল্পই শুনেছেন। তারপর সুরু হল টমাসের যাযাবরবৃত্তি, ঝড়ের বেগে তিনি আজ এখানে কাল ওখানে এবং যেখানে খুশী গেলেন, কিন্তু অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল ৪ঠা জুলাই টমাস, প্রিন্সেস্ ক্যাথলীন জাহাজে আরোহণ করে ভ্যাঙ্কুভারের দিকে যাত্রা করলেন। স্বভাববশতঃ সকলের সংগেই আলাপ করলেন জাহাজে, কিন্তু তখন কি জানতেন যে এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা হবে। জাহাজে এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে টমাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অথবা নিউমোনিয়া হয় এবং ভ্যাঙ্কুভারের এক হোটেলে বিনা চিকিৎসায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং সিয়াটলে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গীন অবস্থা। জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু জেমস স্টিভেনস সাক্ষ্যাত করতে এসে টমাসের অবস্থা বুঝতে পেরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং ডাঃ ই, সি, রুজ তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন যে, রোগীর চিকিৎসা হাসপাতালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু টমাসের হাসপাতাল ভীতি লক্ষ্য করে ফারলনসের নার্সিং-হোমে তাঁকে স্থানান্তরিত করেন।

ফারলনসে টমাস ক্রমশঃ নিউমোনিয়ার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেলেন, কিন্তু সামান্য জ্বর লেগেই থাকল ঔষধ পথ্য এবং বিশ্রাম সব কিছুই যথাযথভাবে পালন করা হল, কিন্তু সেই সামান্য জ্বর টমাসকে আর কিছুতেই ছাড়ে না। চিকিৎসা শাস্ত্রে যত রকম পরীক্ষা আছে তা করা হল এবং একটি এক্স-রে ছবিতে দেখা গেল টমাসের ডান ফুসফুসে একটি কালো দাগ রয়েছে। অবস্থা বিবেচনা করতে গিয়ে ডঃ রুজ এবং ডঃ ওয়াটসের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিল, টমাস ডঃ ওপাটসের চিকিৎসাধীনে থাকতে মনস্থ করলেন, ডঃ রুজ বলেছিলেন ওই কালো দাগটি সম্ভবতঃ যক্ষ্মার আক্রমণ থেকেই হয়েছে, কিন্তু টমাসের সে কথা বিশ্বাস হয়নি কারণ ডঃ ওয়াটস বলেছিলেন ওটা নিউমোনিয়াই। চিকিৎসার কোন ত্রুটি রইল না কিন্তু টমাস সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারলেন না অন্য একটি উপসর্গ তাঁকে প্রায় মৃতপ্রায় করে তুলল, অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। মাবেল ছোট ভাইটির কাতরতা সহ্য করতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কারণ টমাস মাঝে মাঝে সব কিছু ভুলে গিয়ে অপরিচিতের মত তাকিয়ে থাকেন তারপর হঠাৎ ম্যাবেলকে চিনতে পেরে শিশুর মত হাসি তাঁর মুখে ফুটে ওঠে।

তারপর একদিন চিকিৎসকেরা ম্যাবেলকে যখন জানালেন যে টমাসের মস্তিষ্কে সম্ভবতঃ টিউমার কিম্বা স্ফোটক জাতীয় কিছু হয়েছে এবং অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন তখন ম্যাবেল বুঝলেন টমাস হয়ত আর বাঁচবেন না। জনস্‌ হপকিন্স হাসপাতালের ডাঃ ড্যাণ্ডি তখন মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচারের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি ১২ই সেপ্টেম্বর অস্ত্রোপচার করার জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু হায় তখন আর কোন উপায় নেই কারণ টমাসের মস্তিষ্কে টিউমার কিম্বা অন্য কিছুই হয়নি যা হয়েছিল তা অস্ত্রোপচার শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং চিকিৎসকেরা কল্পনাও করতে পারেন নি। টমাসের মস্তিষ্ক তখন কোটি কোটি যক্ষ্মার জীবাণুর আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত। অস্ত্রোপচারের পর মাত্র তিনদিন টমাস আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে ১৯৩৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক কুয়াসাভরা সকালে নিঃশব্দে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় পেলেন।

শ্রীমতী উলফ তাঁর এই দুরন্ত দামাল ছেলেটির জন্য মনের কোণে যে স্থান রেখেছিলেন তার আর বয়োবৃদ্ধি হয়নি টমাস তাঁর কাছে শিশুই ছিলেন তাই যখন টমাস তাঁর এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন তখন শ্রীমতী উলফ ম্যাবেলকে বলেছিলেন ও! মাই বেবী ইজ

গন।" টমাসকে এ্যাশেভিলের রিভারসাইড সিমেট্রিতে সমাধিস্থ করা হয়।

টমাসের মৃত্যুর পর সেই বিরাট পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় ম্যাক্সওয়েল পার্কিন্সের কাছে আসে। টমাসের শেষ ইচ্ছা ছিল যে পার্কিন্স যেন তাঁর উপন্যাসের প্রকাশক হন। পার্কিন্স সেই পাণ্ডুলিপি থেকে তিনটি বৃহৎ উপন্যাস প্রকাশ করেন। "দি ওয়েভ এণ্ড দি রক" ১৯৩৯ সালে প্রাকাশিত হয়। "ইউ কাণ্ড গো হোম এগেন" ১৯৪০ সালে এবং "দি হিলস্ বিয়ণ্ড" ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে "ওয়েস্টার্ণ জার্নাল" এবং একটি ডায়েরি, স্ক্রিবনার প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেন।

স্ক্রুস স্ট্রীটের ৪৮ নম্বর বাড়ী, যেটিতে উলফ পরিবার বসবাস করতেন শ্রীমতী উলফ তার নাম দিয়েছিলেন "ওণ্ড কেণ্টাকি হোম।" সেই ভিক্টোরীয়া আমলের বাড়ীটি এখন সাধারণের তীর্থক্ষেত্র, টমাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য ওই বাড়ীটিকে টমাস উলফ মেমোরিয়ালে পরিণত করা করা হয়েছে। রিভার সাইড সমাধিক্ষেত্রে যেখানে টমাসকে সমাধিস্থ করা হয়েছে তারই অনতিদূরে রয়েছে ও হেনরীর সমাধি। টমাসের সমাধি প্রস্তরে যে পরিচয়টি লেখা আছে তাহল এই—

TOM
SON OF
W. O. AND JULIA WOLFF
A BELOVED AMERICAN AUTHOR
OCT. 3, 1900—SEPT. 15 1938.

"Death bent to touch his chosen son with mercy, love and pity, and put the seal of honour on him."

অজিত দাস

জন্মশতবার্ষিকী ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য

সজীব রাষ্ট্র নিজের চিন্তানায়কদের সম্মান করে থাকে এবং তার দ্বারাই নিজের সম্মান ও সার্থকতা প্রমাণ করে। স্বতন্ত্র ভারতরাষ্ট্র রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক পালন করে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য করেছে এতে আনন্দিত হবার কারণ আছে। কেননা, নৈতিক মূল্যমান যখন অধোগামী তখন কর্তব্যপালন ও প্রশংসনীয় সুলক্ষণ। যেটুকু না করলে মনুষ্যনামের অধিকারীও হওয়া যায় না, সেটুকুও যখন মানুষ করতে চায় না—তখন যারা সেটুকু করছে তারা প্রশংসনীয় বই কি! বলা বাহুল্য যে এতটুকুতে কর্তব্যপালন হলেও তা সমাধা হয় না। উৎসবের আয়োজন যদি ঝলমলে সভামণ্ডপে সযত্নভূষিত বাগ্মীদের বাগবৈভবপ্রদর্শন মাত্রে পর্যবসিত হয়, মনোগ্রাহ্য চিন্তাসম্পদ যদি আহৃত না হয়, তাহলে সে উৎসব নামেই সার্থক, যথার্থ অর্থে নয়,—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গতানুগতিক জীবনকে নবীনতার রসায়নে উজ্জীবিত করার প্রয়োজনেই উৎসবকল্পনার প্রারম্ভ। তাই উৎসবের সেই সার্থকতা অবশ্যই অনুসন্ধেয়।

আমরা ১৯৬১ থেকে আজ পর্যন্ত তিনটি জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছি। মহাকবি, মতিলাল ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এ সবের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের ঋণ স্বীকৃত হয়েছে। আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছি—কবির কবিত্বসম্পদে, রাজনৈতিকের দূরদর্শিতায় এবং স্বামীর বলিষ্ঠ আদর্শবাদে আমরা রাষ্ট্রগতভাবে উপকৃত এ'দের প্রত্যেকেই পরাধীন ভারতের গৌরব প্রমাণিত করেছেন কায়মনোবাক্যে, বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতের মর্যাদা, নবীনযুগকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে আকর্ষণ করেছেন, খুলে দিয়েছেন অনেক সিংহদ্বার। পরাধীন ভারতকে আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রতা পাবার যোগ্য ও স্বতন্ত্র ভারতের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছেন এই ভারতসাধকেরা। এ'দের ঋণ শ্রদ্ধায় স্মরণীয়, স্মৃতি সগৌরবে পালনীয়, চিন্তাসম্পদ সযত্নে অনুধাবনীয়—এতে সংশয়াবকাশ নেই।

কিন্তু আগেই বলেছি যে যেটুকু আমরা করেছি সেটুকু ন্যূনতম। ওটুকু না করলে আমরা নিজেদের সভ্য বলে পরিচয় দিতে পারতাম না। সেই পরিচয়কে যথার্থ করে তুলতে হলে এর পরেও আমাদের কর্তব্য থেকে যায়—আর সুদীর্ঘকাল থেকে কর্তব্যের এই মহদংশটুকু না করার ফলে আমরা রাষ্ট্রগতভাবে পিছিয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমরা আমাদের উপকারীদের ভুলে যাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজা রামমোহনকে—এ'দের তিনি বলেছিলেন ভারতসাধক—আমরা বর্তমান ভারতের প্রধান নায়ক হিসেবে জানি না। কবির সে আক্ষেপ অনেকাংশে আজও সত্য। কবিকেই কি আমরা জেনেছি? চিন্তাসম্পদে যাঁরা জাতির উত্তমর্ণ তাঁদের ঋণশোধের পদ্ধতি কি আমরা স্বীকার করেছি?

মহতের প্রতি এ ঋণকে শাস্ত্র বলেছেন জ্ঞানঋণ। আর জ্ঞানের পূর্ণতাতেই সে ঋণের পরিশোধ হয়। বিদ্যাকে যুগপৎ ব্রহ্মার মানসকন্যা ও প্রেয়সীরূপে পৌরাণিক কল্পনার মূলে সত্য আছে। বিদ্যা উত্তমা নারীর মত অর্জনীয়া তো বটেই আবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মতই

সুপাত্রে প্রতিপাদনীয়া। এই সূত্র ধরেই জ্ঞানের উপযোগিতা চারটি অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে—অর্জন, অভ্যাস, প্রদান ও প্রয়োগ। জ্ঞানমাত্রের পূর্ণতা ততক্ষণ হতেই পারে না যতক্ষণ তাকে এই চার প্রকারে উপযোগী প্রমাণিত না করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রদান ও প্রয়োগেই বিদ্যার পার্যন্তিক সফলতা আর অর্জন ও অভ্যাস এরই ভূমিকা। এই চতুরঙ্গের পূর্ণতা না পেলে বিদ্যা কেবল নামের শেষে শব্দমাত্র সংযোজনেই চরিতার্থ—বন্ধ্যাত্ব খণ্ডিত না হওয়ায় নির্বীজ।

যদি রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের কবি ও দার্শনিকের মতো কাব্য লিখে এবং নিজের চিন্তাকে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেই মাত্র ক্ষান্ত হতেন তাহলে তাঁদের নাম ও কৃতি আজ অনুসন্ধানের বিষয় হত। সে যুগে আমরা কবিকে ও দার্শনিককে আন্তরিক সম্মান দিয়েছি তাই তাঁদের কাব্য ও দর্শন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের বিষয় হয়ে যুগে যুগে বহু যোগ্য টীকাকারের দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে। কিন্তু পরাধীন ভারতে কাব্য লেখার মহত্তম দায় স্বীকার করেই কবির চরিতার্থতা সম্ভব ছিল না, কবিকে স্বয়ং প্রচারব্যবস্থাও করতে হয়েছে এবং বহু কবি উপযুক্ত প্রচার ব্যবস্থার অভাবে মাত্র একশো বছরেই বিস্মৃত প্রায়। বিশেষত অসংখ্য নবীন চিন্তাধারার প্রবর্তকদের আমরা ভুলেই যেতাম যদি না তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বিচারকে দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা করে যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দ যদি রামকৃষ্ণমিশন স্থাপনা করে নিজের চিন্তাধারাকে দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে হয়ত আমরা তাঁকে ভুলেই যেতাম। যেমন প্রায় ভুলতে বসেছি স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনাগুলি। পরাধীনতার উপর দোষ চাপিয়ে পরাধীন ভারত নিজের সহনীয় সন্তানদের ভুলে যাওয়ার একটা যুক্তি দেখাতে পারত কিন্তু স্বতন্ত্র ভারতকে ভাবতেই হবে যে কবি ও দার্শনিকদের কাব্য ও চিন্তাকে কী ভাবে নিখিল রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়।

জন্মশতবার্ষিকী সমারোহের সঙ্গে পালন করলেও এ ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের ভাবতে হবে যে বিশ্বভারতী ও রামকৃষ্ণ মিশন না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতিরা যেন আমাদের বোধ ও চিন্তার বিকাশে সহায়ক থাকেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে ১৯৬৩ সালে মধ্যপ্রদেশের এম. এ: বি. এ ক্লাশের সাধারণ ছাত্রছাত্রী বিবেকানন্দকে জানে না, জানলেও নাম মাত্রই। অথচ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যেক প্রদেশেই মন্ত্রীরা ও শিক্ষাধিকর্তারা ভারতবর্ষের ভাগ্যনির্মাণে বিবেকানন্দের প্রভাবকে অনস্বীকার্য ঘোষণা করেছেন। যদি তাই হয়ে থাকে তো সে সত্যকে প্রমাণিত করার দায় তাদের স্বীকার করা কর্তব্য; নতুবা তাদের উক্তি মিথ্যাশ্রিত ও শূন্যগর্ভ নয় কি?

গায়কের সব বড় শাস্তি শ্রোতার অভাব। গায়কের গানের প্রশংসা করে তাকে গাইতে বলার পর যদি দেখা যায় যে শ্রোতা নেই তাহলে প্রশংসাকারী মিথ্যাবাদী ও গায়ক অপমানিত হয়। মহাপুরুষের চিন্তাকে দেশের সর্বত্র প্রচারিত করার ব্যবস্থা না করে কেবল মৌলিক স্তুতিবাদে আমরা তাঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখিয়েছি ভাবা আত্মপ্রবঞ্চনা।

রাষ্ট্রের বর্তমান সংকটকালে আমরা খুঁজে খুঁজে বিবেকানন্দের ওজোদীপ্ত বাণী স্মরণ করছি এবং লোককে স্মরণ করতে বলছি—অথচ এই সব বাণী যদি আগের থেকেই রাষ্ট্রগতভাবে প্রচারিত হয়ে আসত তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক চেতনা বেশি শক্তিশালী হতে পারত। এ আমরা করিনি, অথচ করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চিন্তা-নায়কদের চিন্তাধারা শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। আমরা মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চিন্তাকে যুবজনের অনুধাবনীয় মেনে নিয়েছি অথচ বিবেকানন্দের চিন্তাকে সে সম্মান দিইনি। বলবার

উদ্দেশ্য এ নয় যে রাসেল অপাঠ্য, বলতে চাই বিবেকানন্দ এবং ঐ জাতীয় ভারতীয় মনীষীও পাঠ্য। রাষ্ট্রের সকল চিন্তানায়কের চিন্তার আলোচনায় রাষ্ট্রীয় চিন্তাশক্তি সম্মানবোধের ভিত্তি পেয়ে প্রশস্ত হবার সুযোগ পায়। সে সুযোগ পরাধীন ভারতে ছিল না, তাই বিবেকানন্দ সমকালীন শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন —

"The ideal of all education, all training should be man-making. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, asseiniliation of ideas".

সে শিক্ষা ছিল নঞর্থক। স্বতন্ত্রভারতের শিক্ষাধারায় পরিবর্তন হলেও, আমরা একথা কি বলতে পারি যে ভারতের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বর্তমানে আর নেগেটিভ নয়, পূর্ণত পজেটিভ? তাই যদি হত তাহলে বিবেকানন্দকে জানতে এখনও রামকৃষ্ণমিশনের দ্বারস্থ কেন হতে হয়? কেন প্রত্যেক ভারতীয় যুবক শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয় না?

স্বরাষ্ট্রের চিন্তানায়কদের উপেক্ষা আত্মঘাতী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এ উপেক্ষা সম্ভবই নয়। ব্যক্তি ও সমাজ, পরস্পরবিরোধী নয় পরস্পরের পরিপূরক, পূর্ণতাতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। আর যাঁদের চিন্তা এ তত্ত্বের প্রকাশে সার্থক তাঁদের ব্যাপক পরিচয় রাষ্ট্রের কল্যাণে আবশ্যিক। নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা সেই শ্রেণীর চিন্তানায়ক যাঁরা ভারতবর্ষের অখন্ডতাকে স্বানুভবের ভিত্তিতে শুধু প্রত্যক্ষই করেননি জীবন দিয়ে প্রমাণিত করেছেন। তাই এঁরা প্রদেশবিশেষের নন, সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সম্পদ।

ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এক ভাষায় গ্রথিত চিন্তাকে ছড়িয়ে দেবার বাস্তব বাধা অবশ্যই আছে। তবে যে সব মনীষীর কথা আলোচিত হল তাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠেই না। এঁরা নিজেরাই সর্বভারতবোধ্য ইংরাজিতে অজস্র লিখেছেন, অন্য ভাষায় অনূদিতও হয়েছেন। তা ছাড়া, প্রয়োজন হলে অনুবাদের দায় রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই এখানেও অনুবাদ আবশ্যক। সর্বপ্রান্তের চিন্তার উত্তরাধিকার পেলে ভারতের প্রত্যেক সন্তান ঔদার্যে ও চরিত্রে শক্তিশালী হবে একথা আজ আর নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষায় এই ব্যবস্থা সংযোজিত হলে সে শিক্ষাকে সদর্থক বলা চলবে যার বর্ণনায় বিবেকানন্দ বলেছেন "We have had a negative education all along from our boyhood. We have only learnt that we are nobodies. Seldom are we given to understand that great men were ever born in our country. Nothing positive has been taught to us.........We have learnt only weakness".

সচ্চিন্তা ও সদ্ভাবের উপাদান প্রগতির পক্ষে মৌলিক। উন্নাসিক নাস্তিকাবুদ্ধিতে platitude বললেও এর সত্য অনুধাবনীয়। বিবেকানন্দের চিন্তাকে সারা ভারতের সম্পদে পরিণত করার দায়িত্ব আজ তাই রাষ্ট্রকে নিতে হবে। আর ভারতের এ মহাসৌভাগ্য যে কেবল বিবেকানন্দই নন এমন বহুমণীষী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছেন যাঁদের চিন্তা আমাদের জীবনে রসায়নের কাছ করবে। তাঁদের সঙ্গে ভারতীয়মাত্রের পরিচয়সাধনের পথ আজ লোক কল্যাণকারী রাষ্ট্রকে প্রশস্ত করতে হবে, নতুবা একদিকে যেমন রাষ্ট্রকর্ণধারদের ভাবোচ্ছ্বাস নিরর্থক অপরদিকে তেমনই ভারতীয়ের ব্যক্তিত্ব কুন্ঠিত, জ্ঞান অপূর্ণ এবং দৃষ্টি একদেশদর্শী হতে বাধ্য। জন্মশতবার্ষিকী পালনেরমূলে এই কর্তব্যবোধ রাষ্ট্রগতভাবে স্বীকৃতহওয়া উচিত।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

মধ্যযুগের শিল্পকলার প্রকৃতি

Art is the imitation of Nature in her manner of operation: Art is the principle of manufacture.—St. Thomas Aquinas.

শিল্পের রসোপলব্ধির জন্য রসিক-নয়নে এক বিশেষ মায়া কাজলের প্রয়োজন যার অন্য নাম শিল্পের ভাষা। এরই নিরিখে শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণিত। বলাবাহুল্য, শিল্পের প্রকৃতি নির্ণয়ের চাবিকাঠিও এখানেই। এবং আধুনিক শিল্পরসিকগণ শিল্পভাষার আলোকে এই অবধি স্বীকার করতে প্রস্তুত, ভারতীয় শিল্পকলা এবং মধ্যযুগের শিল্পকলা প্রকৃতি অনুসারে কদাপি সমপাল্লায় তুলনীয় নয়; এবং হয়তো বা দর্শনীয়ও নয়। কেন না, ভারতীয়-শিল্পে অবশ্যদ্রষ্টব্য যেখানে তার প্রকাশ ভঙ্গিমা, মধ্যযুগের শিল্পে সেখানে কর্ম-এষণা। বলা প্রয়োজন, মধ্যযুগের শিল্পবিচারে প্রায়শ-ই শিল্পরসিকগণ বিমূঢ়। এ প্রসঙ্গে মোটামুটি তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত। প্রথম মতটি প্রগতিবাদী গ্রুপ্ থেকে উচ্চারিত। এঁরা শিল্পচিন্তায় আত্যন্তিক পরিবর্তন-পিয়াসী, অতএব মধ্যযুগীয় ব্যাপারে স্বভাবত-ই বীতশ্রদ্ধ; এটি নেহাৎ প্রাথমিক প্রয়াস বলেই এঁরা খালাস। দ্বিতীয় শিবিরের মত ও তথৈবচ। তাঁরা বললেন : মধ্যযুগের শিল্প বর্বর-শিল্প; শৈল্পিক ভারসাম্য অবধি তাদের অনায়াত্ত। বিদগ্ধগোষ্ঠী কিন্তু বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যে দেখতে পান স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল, অনুভব করেন ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহতের ইঙ্গিত। এমনকি, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যও তাঁরা পেয়ে যান মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যে। বলাবাহুল্য, সৌন্দর্যসন্দর্শনহেতু কিছু পরিমাণ আবেগোক্তিও উপর্যুক্ত চিন্তায় সঞ্চারিত।

প্রগতিপন্থীদের যুক্তি, যেহেতু মধ্যযুগীয় শিল্পে অ্যানাটমি-জ্ঞান অকল্পনীয় অতএব এটি বর্বর-শিল্প; আর একদল কৃপা করে বড় জোর বললেন, প্রাথমিক প্রচেষ্টার বেশি আর কিছু নয়। অথচ মধ্যযুগীয় শিল্পে, অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে, অ্যানাটমি-চিন্তা অকল্পনীয় ছিল না। এমনকি বললে ভুল হয় না, শিল্পের নবজাগরণের ফলে কেতাবী-কলায় কান্তি-বিদ্যার উপর যে জোর আরোপ করা হয়েছে তা মধ্যযুগের এক শিল্প-দার্শনিকের মনে বেশ কয়েক শতক পূর্বেই ঠাঁই নিয়েছিল, যখন শুনি : 'হু ক্যান থিং অব্ নাথিং নোব্‌লার দ্যান বডি' সত্যিই, কান্তি-চিন্তার চেয়ে মনোরম চিন্তা আর কি হতে পারে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিপ্রকামীদের চিন্তা এতই দ্রুত চালের, যে পিছনে তাকাবার ফুরসুৎ তাঁদের নেই। অস্বীকার করব না, বিদগ্ধ গোষ্ঠি-এর যুৎসই জবাব দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দৃষ্টি বহুলপরিমাণে আকোচালিত, অতএব, সত্যসন্ধানে তাঁরা ব্যর্থকাম। কেননা, রাম না হ'তে রামায়ণ সম্ভব হলেও নান্দনিক বিনা নন্দনতত্ত্ব সম্ভব নয়। আর মোটে দুশো বছরও হয় নি, নান্দনিক নামক নন্দনটি সবে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে যাত্রারম্ভ করেছে। তাছাড়া, এ কথা কে অস্বীকার করবে সাধারণ শিল্পদৃষ্টি এবং নন্দন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আসমান-জমিন ফারাক। লজ্জার হ'লেও স্বীকার করব, শিল্পের ক্ষেত্রে তথাকথিত শিক্ষিতজনের মুখেই আমরা অদ্যাপি ঝাল খাই।

কেননা, আমাদের বিশ্বাস একমাত্র শিক্ষিতজন-ই নিরপেক্ষ শিল্পবিশ্লেষণে সক্ষম, অশিক্ষিতগণ সাধারণ কেবল আভরুচি-বিষয়েই আগ্রহী অতএব তাঁদের জ্ঞান সার্বিক নয়। অথচ এমন অমৃত ভাষণ আর হয় না। অশিক্ষিতগণ সাধারণ কলাকৈবল্যে আস্থাহীন বলে কদাপি জীবনবিমুখ নয়। অপিচ, তাঁদের নিকট মহত্তর জীবনের মাধ্যম হ'ল শিল্পচর্চা। শিল্পকে তাঁরা বলেছেন ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।

আজকের মত প্রথানুগ ইস্থেটিক্‌চিন্তা হয়তো মধ্যযুগে দুর্লভ ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য-সন্দর্শনের শৈল্পিক অনুভূতি এখনকার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। সে যুগের চিত্রগুলিই আমার এ কথা প্রমাণ করবে। নির্মোহভাবে রসিকতা হয় তো সম্ভব, করুণরস সৃষ্টি ও হয় তো দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু আবেগ সৃষ্টি? নৈব নৈব চ। এ রসে আগে শিল্পীকে নিজেই রসিক হতে হবে। যেহেতু কালব্যবধান সত্ত্বেও দ্রষ্টার মনে অদ্যাপি মধ্যযুগীয়-শিল্প আবেগ জাগরণে সমর্থ, অতএব, অনুমান অসংগত নয়, শিল্পীও একদা রসিক ছিলেন, অর্থাৎ আবেগ পরবশ ছিলেন। এমনকি আবেগক্রিয়াই যদি শিল্পকলার দ্রষ্টব্য হয়, তবে স্বীকার করতে হয়, মধ্যযুগের শিল্পীরা নন্দনতত্ত্বের অন্দরমহলে অজ্ঞাতসারেই প্রবেশ করেছিলেন। অপিচ, তার সাম্প্রতিক রূপের সম্প্রসারণ ঘটেছিল মধ্যযুগে। উপমা দিয়ে বলা যায়, উত্তরে উপনীত হবার জন্যই যেমন আংকিকের ক্ষেত্রবিশেষে বহু-বিস্তার আঁকজোক, তেমনই শিল্প নামক লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যই মধ্যযুগের শিল্পীদের এই প্রচেষ্টা। অবশ্য আংকিকের প্রচেষ্টা সজ্ঞানে, মধ্যযুগীয় শিল্পীদের অজ্ঞানে। বলাই বাহুল্য, সাম্প্রতিক শিল্পের বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সে দৃষ্টি-ভঙ্গির যোজনদূর ব্যবধান।

মধ্যযুগীয় ধারণায় শিল্প এবং শিল্পকর্ম পৃথক। এই ধারণা অনুযায়ী শিল্প হ'ল একপ্রকার জ্ঞান যা রূপকল্পনার সঙ্গে অভিন্ন। কল্পনা যখন বাস্তবে রূপায়িত হয় তখনই হয় তা শিল্পকর্ম। শিল্পীর অন্তরে শিল্পের অধিষ্ঠান, তার বহিঃপ্রকাশ কর্মে। অথচ, অধুনা আমরা শিল্পকর্ম এবং শিল্পকে অভিন্ন জ্ঞান করি; শিল্পসামগ্রীকে এর ফলশ্রুতি বিবেচনা করি। সে যুগে শিল্পে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক এ ধরণের প্রকারভেদ করা হত না। যেহেতু কর্ম-করণই ছিল শিল্পের একৈব লক্ষ্য, অতএব, তার সহায়তা এবং অনুগতাই ছিল শিল্পের কর্তব্য। উত্তম-অধমের নৈতিক খড়্গ তখনও তেমন প্রচণ্ড ছিল না। অবশ্য 'যেন-তেন-প্রকারেণ' হবারও উপায় ছিল না। কেননা, ওর-ই মধ্যে একটি পরিমিতির প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। তাই শিল্পকে নতুন করে শৃঙ্খল পরানো বাহুল্যমাত্র। মধ্যযুগের শিল্পকলা, কিন্তু তাই বলে নির্দোষ নয়, অন্ততঃ আধুনিক দৃষ্টিতে। অভিযোগ নয়, একটি অসংগতির কথা উল্লেখ করব। শিল্পের সম্পূর্ণতা জ্ঞান ও কর্মের দ্বৈতসংযোগে—এ বিষয়ে আজ আর মতান্তর দেখা যায় না। অথচ সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয়, মধ্যযুগের শিল্পে কর্মৈষণা থাকলেও জ্ঞানস্পৃহা অনুপস্থিত। ফলত, মধ্যযুগের শিল্পনিদর্শন খাণ্ডিক, সম্পূর্ণ নয়। তরবারির তীক্ষ্ণতাই তাঁদের নিকট লোভনীয় ছিল, তার ঝলসিত রূপ নয়, অথচ এই দৃষ্টিটুকু থাকলে অনায়াসেই তরবারিটি বীরের ভূষণ হয়ে উঠত। এখানেই মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে এখনকার শিল্পের তফাৎ—বিশুদ্ধ শিল্প ও ব্যবহারিক শিল্পের মিশ্রণের প্রয়োজনও এখানেই।

মধ্যযুগের শিল্পে সৌন্দর্যদর্শন যেমন ঠাঁই পায়নি তেমনি অন্ত্যজ ছিল মনস্তাত্ত্বিক শিল্পব্যাখ্যা। কেননা, প্রত্যক্ষকর্মে উভয়-ই অচল। একটি সম্পূর্ণ কর্মের বিভিন্ন অংশের ভিতর সুষম ছন্দ আনয়ন-ই ছিল তাঁদের অভীপ্সা। অনেকে সেই জন্য সন্দেহ করেছেন, মধ্য-যুগের এই কর্মপ্রধান শিল্পচিন্তার পিছনে গণিতশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কর্ম-

কাণ্ডের সুমিতি-ই সম্ভবত তাঁদের এমত ধারণার কারণ। সন্ত্ বোনাভেঞ্চার অবশ্য মধ্যযুগের শিল্পকলায় যন্ত্রশিল্পের ঊষালোক দেখতে পেয়েছেন।

আজকের যন্ত্রযুগে দাঁড়িয়ে কর্মকাণ্ডের নিন্দক হওয়া হাস্যকর। আর একথাও তো ঠিক শিল্পে বিভাজন ক্রিয়ার ফলে স্তরভেদে একশ্রেণীর শিল্পীও আছেন (যাদের আমরা মজুর বলি) কর্ম সম্পাদনেই যাঁরা সন্তুষ্ট, সৌন্দর্য অন্বেষণে তৎপর নয়। এবং এ কথাও হয়তো অসংগত নয়, সে চেষ্টা হবে তাদের নিকট অনধিকারচর্চা। কেননা, যে মিস্ত্রীর কাজ ইট গাঁথা সে যদি নক্সা করণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তবে মূল উদ্দেশ্য ভণ্ডুল ছাড়া আর কিছু হবে না। কাজেই নিছক্ কর্মকাণ্ড কাম্য না হলেও শিল্পাঙ্গনে তা একেবারে অস্পৃশ্যও নয়। আসলে শিল্পী কোন বিশেষ ধরণের জীব নয়। অপিচ, প্রতিটি মানুষ-ই এক বিশেষ ধরণের শিল্পী। কেউ বিশুদ্ধ শিল্পে, কেউবা ব্যবহারিক শিল্পে আত্ম-প্রবণ। এ নিয়ে বিবাদ ক'রে লাভ নেই, শ্রেষ্ঠত্বের বিচারও নিরর্থক।

মধ্যযুগের শিল্পপ্রসঙ্গে বলা যায়, আজকের মত শিল্পসামগ্রীর সংরক্ষণের প্রশ্ন তখন উঠত না। অবশ্য ব্যতিক্রম যাদের ছিল তাদের কথা পৃথক। সে যুগের শিল্পের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা কখনই একক নয়, সমবেত। স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা সংঘস্পৃহা-ই তাঁদের কাম্য ছিল। এইজন্য যাঁরা স্ব-তন্ত্র চিন্তা শিল্পকলায় ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা সাধারণ্যে নিন্দিত হতেন।

শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষণ করতেন সাধারণ মানুষেই, ব্যক্তিবিশেষে নয়। প্রায়শই এতদ্‌কর্মে যাঁরাই ছিলেন রক্ষক তাঁরাই হতেন ভক্ষক। তাঁরাই আবার বিচারক। ফলত, গুণগত গৌরবে শিল্পী নির্ণিত হত না। যার উচিত ছিল জুতো সেলাই করা বীরবিক্রমে সেই হয়তো চণ্ডী পাঠ করত। কেননা, তার কাঙ্ক্ষিত ছিল গুণরক্ষণ নয়, কর্মসম্পাদন। আধুনিক শিল্পকলায় অন্যতম দ্রষ্টব্য হল শিল্পীর মানস-অভিব্যক্তি, কিন্তু মধ্যযুগের শিল্পকলায় এটি অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। আসলে, সূক্ষ্মরসবোধের নিদারুণ অভাব সমগ্র মধ্যযুগীয় শিল্পে ছেয়ে আছে।

যে নিবেদনটি নিয়ে প্রস্তাবনার সূত্রপাত সেখানেই আবার ফিরে যাই—আমি শিল্পের ভাষার কথাই বলছি। 'ক্যালকুলাস,' এমীলি ম্যালে যাকে খৃষ্টীয় রূপকরূপে বর্ণনা করেছেন, আসলে, কোন ধর্ম বা ভাষা বিশেষের সম্পত্তি নয়। অপিচ, সার্বত্রিক বোধগম্যতার জন্য এর আবেদন বিশ্বজনীন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে বিশ্বের সকল স্পর্শকাতর মনকেই ক্যালকুলাস সমভাবে নাড়া দেবে। আসলে, বিশ্বজনীন শৈল্পিক ঐক্য ওখানে নিহিত-ও নয়। শিল্পকলায় যেটিকে সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে সেটি মনুষ্যত্বকে প্রকাশ এবং ওখানেই আমরা স্থান-কাল-ভেদ সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ। অবশ্য শিল্পভাষায় পারঙ্গমতা ব্যতীত এই একতা সতত অনুভূত হয় না। পারঙ্গমতা কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম। মধ্যযুগের য়ুরোপে সর্বত্র ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল বলেই আজ যেমন তা সেখানে সুপ্রচলিত নয়, থাকবে এমন আশাও অন্যায়, তেমনি আজকের সাধারণ শিল্পরসিক মধ্যযুগের শিল্প ভাষায় নিপুণ হবেন এমন আশা অহৈতুক। তবু শ্রমসাপেক্ষ এ কর্ম সমাধান করলে শিল্পসমালোচক লাভবানই হবেন। কেননা, এই শিল্প-ভাষার ভিতর-ই সুপ্ত রয়েছে মধ্যযুগের প্রাণসত্তা; খৃষ্টীয় ঔদার্যের বীজও লুক্কায়িত ওখানেই। সন্ত অগাস্টাইনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তখন-ই তাঁরা বলতে পারবেন : ত্রিকালবিস্তৃত প্রজ্ঞালোকের মৃদুস্পর্শেই আমরা জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত করব, উদ্ঘাটন করব সুন্দর-রহস্য এবং উপভোগ করব সেই সচ্চিদানন্দকে যা শুধু মধ্যযুগের শিল্পই নয়, লোকায়তশিল্পে, ভারতীয় শিল্পেও প্রাপণীয়।

অনুবাদ : **বীরেন ভট্টাচার্য** **আনন্দ কুমারস্বামী**

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জগত

মানুষের প্রেম তার বিভিন্ন ,ছলাকলা, তার রূপমাধুরীর সম্পদ যা আমার জীবনের সংগে আত্মার সংগে সংযুক্ত—অবনীন্দ্রনাথ তারই শিল্পী। প্রকৃতির রস মাধুর্য্য যা মানুষের সীমাবন্ধতাকে মুক্ত করে অসীম আনন্দে অভিষিক্ত করে অবনীন্দ্রনাথ তারই শিল্পী। কালো আকাশের গায়ে কাঁচা সোনার রং যে কি মোহিনী মায়ার আসর জমায় তা অবনীন্দ্রনাথের আসর জমানো রং বাহার, তুলির ফুলঝুরি না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অবনীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক—চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর প্রকৃতি এবং মানুষের অন্তরংগ আবেশ বিভোর মুহূর্তগুলির প্রতি যে স্বচ্ছ সহৃদয়তার দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া গেল তাতে একটি কথাই এখানে বলা যেতে পারে যে তিনি আবেগ ময়তার শিল্পী, তিনি অমাদের অতীব অন্তরংগ শিল্পী। চিত্রে কারুকার্য্যতার মূল্য আছে স্বীকার করি—কিন্তু সেই মূল্যায়ন করার পথে সৌন্দর্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায় না। শিল্প যদি শুধুমাত্র মণ্ডনমূল্যতে বিচার করার দরকার হয় তবে শুষ্ক তর্ক—ছাড়া তা থেকে আর কিছুই লাভ হবে না। মণ্ডল মূল্যের ওপরে শিল্পীর আত্মার প্রতিষ্ঠা, সেই প্রতিষ্ঠার আলোতে শিল্পী অন্তর বাহির এক অনবদ্য রূপকলায় সমাহিত করেন। যদি শিল্প কারুকার্যই প্রধান হয় তবে—চিত্র শুধুমাত্র টেকনিকপ্রধান হতে বাধ্য—তখন ভাবের ঘরে পড়ে ফাঁকি। তাই ছোট খাটো টানটোনে, পল তোলা সূক্ষ্ম অনুভূতির আবেশ মধু মনোরম লালের টানে মন নিয়ে যায় কোন এক বিহ্বল ক্লান্ত দ্বিপ্রহরের নির্জনতায়—যেখানে ফুল্লরার ভালবাসা, কালকেতুর লৌহদেহ, খৈয়ামের উদাসী সুর। আরব্যরজনীর এই-প্রেম—সব কিছু ঐকান্তিকতায় সমাহিত, প্রশান্তিতে মগ্ন। শুচি স্নিগ্ধ আলপনার বিরহীর আত্মজিজ্ঞাসা, প্রেমিকের মধুর বিরহ অবিশ্বাস্য রং এর প্রবাহে লীন। কালো আকাশের গায়ে একফোঁটা চাঁদের ইংগিত, নীচে প্রেমবন্ধ, আশংখায় ভীত মানুষের মগ্নতা কি অপরূপ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছোট খাটো রং এর টান, ধ্বনির সৃষ্টির মত। লীন পুচ্ছ তাড়নায় ময়ূরের কেকারব রং আর রেখা বন্ধনীতে উচ্চকিত। মণ্ডন শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ মুঘল কলম—এ একেবারে জারীন্ কলম। যে কলম অবনীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তা যেন বর্ণনায়, অলংকরণে, ভাববৈচিত্রে, রস সংবন্ধতায় এক অপরূপ ঐক্য এনেছে। ভারত শিল্পে প্রাচী এবং প্রতীচী উভয়েই এক মাল্যবন্ধনে অবনীন্দ্রনাথের জারীন কলমে নীত। রেখার বলিষ্ঠতায় প্রাচ্যের বিশ্বাস এবং ভাববিহ্বলতায় রং এর মনোহারিত্বে প্রতীচীর বিন্যাস এক হয়েছে অবনীনাথের সার্থক সৃষ্টিতে। অবনীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সে যুগে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। সেই শূন্যের কোঠায় পুরো নম্বর শিল্পীদের পাইয়ে দিলেন। রাজা রবি বর্মার ছবির যুগে, জার্মান ওলিওগ্রাফ্ বাজার ছেয়ে ছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ছবি যেন সাহেব মেমদের গায়ে রাম সীতার পোষাক চড়িয়ে যাত্রার সং-এর ঢং নিয়েছিল। তার না ছিল জাত, না ছিল কৌলিন্য। অবনীন্দ্রনাথ সেই যাত্রার আসরে এসে একবার আগাগোড়া সব পালাটাই দিলেন বদল করে। জাতে উঠলাম আমরা, কৌলিন্যও ফিরে পেলাম। যাত্রার রং বদল ঘটে গেল। যাত্রাটা হয়ে উঠলো এক কাব্য গাথার অপরূপ প্রকাশ। গেঁয়ো ভাবটা কেটে গিয়ে আদত শিল্প চেতনার কথাই মুখ্য হয়ে উঠলো। ছাত্র নিয়ে জমিয়ে তুললেন জোঁড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা। সৃষ্টি হলো কত অপরূপ রং বাহার, বিচিত্র আলোর রোশনাই, ছন্দের যাদুকরী নাচ। বাঈজী নেচে গেল। তলায় সিঁদুরের প্রলেপ, ওপরে নক্সাদার চাদর, লঘু ছন্দে কখন যেন যাদুমন্ত্রে ফুটে উঠলো গনেশের মূর্ত্তি, চাদরের ভোল তুলে ফেলতেই। এ যেন সেই যাদু। জলে রং মিশিয়ে, রংয়ে জলে মিশিয়ে, কাগজ ভিজিয়ে রং আর রেখার ফুল-

ঝুরি উড়িয়ে মন উড়িয়ে নিল—সেই সিন্ধবাদের সাত সাগরের পার করে, লায়লা মজনুর অরবী বাঁকা তলোয়ারের দেশে। ঘরের কোণে সিঁদুর কৌট, মায়ের চুল আঁচড়াবার নক্সাদার চিরুণী, কালো নাপতীনির ঝাঞ্জা পাতাদিয়ে ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের পায়ে আলতা দেওয়া কোনটাই বাদ গেল না অবনীন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখের কাছে। হায় সে দিন কি আর ফিরবে, যে দিন অম্বুরী তামাকের সেই গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দিলখুশ হাসির উচ্ছ্বাসে সমস্ত শিল্প জগতটা মৌতাতে খানদানী করে রেখেছিল। অবনীন্দ্রনাথ যে এর প্রাণ ছিলেন। জারীন কলমের এক এক খোঁচায় মর্ত্যের মানুষ যেত স্বর্গের অপ্সরীর বাড়ীতে চাঁদনীরাতে গান শুনতে আর স্বর্গের অধিবাসীরা পাত পাতত গেরস্থের নিঝুম দুপুরের আলস্য মাখানো আবেগ বিহ্বলতায়। সে দিন আর নেই। বাদশাহী আমল সত্যি সত্যিই শেষ হলো অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর। যে রং আর তুলের টানটোনের জোয়ার তিনি এনেছিলেন—তার মূল্যায়ন এখনও হয়নি। এই আজকের আধুনিক ছবি আঁকিয়েদের অনেকের টিকি বাঁধা আছে, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দার উদারতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথ না জন্মালে ভারতশিল্প আজ কোথা থেকে কি হতো তা বলা মুস্কিল। উত্তর কিংবা পশ্চিমভারতের আঁকিয়েদের আজকে চিত্ত-ছটফটানি নিমেষেই ঠাণ্ডা হতো অবনীন্দ্রনাথ না জন্মালে। এই শিল্পগুরুকে স্মরণ করে আধুনিক শিল্পীরা যেন এক বার সেই সৌগন্ধ সৃষ্টিকারী মৌতাতের আমেজ নেবার চেষ্টা করেন—তা হলেই আমাদের অর্ধেক কাজ হবে। ছোট ছবি—অতি সূক্ষ্ম তুলির আকর্ষণী ক্ষমতা, পারশিক কল্যামের কারুকার্য আর মনোহরণ প্রাচ্যের জল ধোয়ার যাদু সমস্ত মিলে অবনীন্দ্রনাথ একক এবং নিঃসঙ্গ। তাঁর ছাত্রেরাও তাঁর সেই সম্পদের অধিকারী নয়। তিনি শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন পালাগান গেয়েছেন—যে পালাগানের তিনিই অধিকারী, তিনিই নায়ক, তিনিই বাজানদার তিনই সূত্রধার। যে ছবি সব সময়েই দেখা দরকার, যে ছবি সবসময়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে—সেই ছবি দেখার সুযোগ যাঁরা করেছেন—সেই রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোক্তাদেরও অভিনন্দন জানাই। তবে একথাও বলি—সর্বদা এই ছবি চোখের সামনে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁরা সত্যই ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

নিখিল বিশ্বাস

স মা লো চ না

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী॥ বাঙ্গালা বিভাগ ॥ ১৯৫৯-৬০ সম্পাদক—বি, কেশবন; সহকারী সম্পাদক—সুনীলবিহারী ঘোষ, অশোককুমার বিশ্বাস। (দাম—৭·৫০ নয়া পয়সা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের (স্টেটব্যুরো অব্ এডুকেশন্‌স্) উদ্যোগে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত বাংলা গ্রন্থসমূহের যে তালিকাটি 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' বাংলা বিভাগ, ১৯৫৯-৬০—এই নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, নানা কারণে তার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হবে। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালে এই গ্রন্থমালার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের অনেকেই এই গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫৯-'৬০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের এই তালিকা ও নির্ঘণ্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করে সহঃ সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত সুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অশোককুমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব দূর করেছেন। অশেষ পরিশ্রমে সংকলিত এই বিরাট পুস্তকতালিকার বিন্যাসপদ্ধতি, বর্গীকরণ, বিভাগীয় শ্রেণী-নির্দেশ, গ্রন্থ-গ্রন্থকার-প্রকাশক প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন সতর্ক গবেষণার গৌরব দাবি করতে পারে।

৪৩৪ পৃষ্ঠায় লাইনো হরফে মুদ্রিত এই 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী'টি রেফারেন্স বই হিসেবে যে অতিশয় মূল্যবান হয়েছে, তা' এর আদ্যন্ত অনুধাবন করলে বোঝা যাবে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকে যাঁরা গোটা জাতির মনঃপ্রকর্ষের পরিচয় পেতে চান, তাঁরা এই তালিকার পৃষ্ঠার মধ্যে তার একটা সংক্ষিপ্ত সূচী দেখতে পাবেন এবং অধিকতর সংবাদ জানবার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বারপ্রান্তে হানা দেবার জন্য ঔৎসুক্য বোধ করবেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেছেন, "শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ?" এই গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যেও নানা হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শোনা যায়। এর মধ্যে বহু মানুষের চিন্তা, মনন, আবেগ, অনুভূতি, শ্রমনিষ্ঠা অক্ষরীভূত বাক্‌রূপে বিরাজ করছে, এর পত্রমর্মরের মধ্যে বহু মানুষের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে।

এই নিখুঁত তালিকাটি যথাসময়ে প্রকাশ ক'রে সহকারী সম্পাদকদ্বয় সাধারণ, অসাধারণ, রসিক, গবেষক—সমস্ত পাঠক-পাঠিকার অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ঐরাবতী চালচলন ক্রমেই যে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ আয়ত্ত করছে, এতেও দেশবাসী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হবেন। সরকারীর লাল ফিতার বজ্র-আঁটুনি আর একটু শিথিল হলে এরকম হিতকর কাজে তরুণের দল উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের মনন ও গবেষণাকে তালিকাবদ্ধ ক'রে স্থায়িত্ব দেবার জন্য ভারতসরকারকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণা পরিষদ (মিনিষ্ট্রি অব সায়েণ্টিফিক রিচার্চ এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাফেয়ার্স) ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি সংকলনের যে ভার গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রণোদনায় ১৯৫৪ সালের লোকসভায় গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত "ডেলিভারি অব বুক্‌স্ এ্যাণ্ড নিউজপেপার্স্ এ্যাক্ট্" অনুসারে ভারতের চারটি

প্রধান গ্রন্থাগারে (কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের কন্নেমারা গ্রন্থাগার, বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় তথ্য গ্রন্থাগার) ভারতের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের একখানি ক'রে দেবার নির্দেশ গৃহীত হয়েছে। অসমীয়া, ইংরেজী, উর্দু, ওড়িয়া, কান্নাড়া, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী, মালায়ালম, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের তালিকা প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। এরই নাম 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' বা ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি। ১৯৫৮ সাল থেকে এই গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। এ বিষয়ে বাঙলাদেশের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত যাবতীয় বাংলা বইয়ের তালিকাপঞ্জী প্রকাশের ভার নিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের বাংলা বইয়ের বিস্তৃত তালিকা 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা বিভাগ' এই নামে ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবিভাগের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমান তালিকাটি ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা বইয়ের নির্দেশকরূপে সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরির জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের (বাংলা) উৎসাহী সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অশোককুমার বিশ্বাসের দ্বারা নিপুণভাবে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল।

এই তালিকায় 'ডিউই' দশমিক বর্গীকরণ এবং ডাঃ রঙ্গনাথন প্রবর্তিত 'কোলোন' বর্গীকরণ—এই দুই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। ফলে যে-কোন পাঠক গ্রন্থের বর্গসংখ্যা ধরে সহজেই তার জাতিকুল ও হাঁড়ির খবর টেনে আনতে পারবেন। যেমন—গ্রন্থটি কোন বর্গের, কবে প্রকাশিত, মূল্য, প্রকাশক, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, রূপগুণ (কত সেণ্টিমিটার, বাঁধানো কিনা ইত্যাদি) ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হয়েছে। তালিকাটি 'ডিউই' বর্গ হিসেবে দশটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত—(১) সাধারণ বিষয়, (২) দর্শন, (৩) ধর্ম, (৪) সমাজবিজ্ঞান, (৫) ভাষাতত্ত্ব, (৬) বিজ্ঞান, (৭) ব্যবহারিক বিজ্ঞান (প্রযুক্তি বিদ্যা), (৮) ললিতকলা, (৯) সাহিত্য, (১০) ইতিহাস। এর মধ্যে প্রত্যেক বিভাগেই নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ানুসারী উপবিভাগ আছে। যেমন দর্শন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মনোবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, প্রাচীন দর্শন, ভারতীয় দর্শন, আধুনিক দর্শন প্রভৃতি নানা দার্শনিক শাখা-প্রশাখা। এইভাবে প্রতি বিভাগের উপবিভাগগুলি দশমিক পর্যায়ে সজ্জিত হওয়াতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা গ্রন্থের নামধাম ও নম্বর খুঁজে পাবেন। গ্রন্থপঞ্জীর নির্ঘণ্টে যাবতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বর্ণানুক্রমিক তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। সর্বশেষে প্রকাশকের নাম-ঠিকানা উল্লিখিত হওয়ায় গ্রন্থ সন্ধান ও ক্রয়েরও খুব সুবিধে হয়েছে। যাঁরা কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশুনো করেন বা নানা প্রকার গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা এই তালিকা থেকে খুব সহজেই কার্যোদ্ধার করতে পারবেন। এখন আর ইনডেক্স ক্যাবিনেটের পায়রার খোপের পাশে অপেক্ষমান জনতার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না—এই গ্রন্থপঞ্জী দেখেই গ্রন্থের নামধাম বার করা সহজ হবে।

এত বড় জটিল গ্রন্থটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করার জন্য সহকারী সম্পাদকদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থের কলেবরের অনুপাতে এর মূল্যকে (টাঃ ৭·৫০ নঃ পঃ) মোটেই দুর্মূল্য বলা যায় না। অবশ্য এ রকম জটিল ব্যাপারে দুটো একটা ছাপার ভুল থাকা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যেমন গ্রন্থপঞ্জীর ১২৬ পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্র সেনের 'রঙ্গমতী' কাব্য ভ্রমক্রমে 'রাঙ্গামাটি' ছাপা হয়েছে। মূল তালিকাটি বোধহয় রোমান অক্ষরে লেখা হয়েছিল, পরে তার বাংলা লিপান্তরীকরণের সময় 'রঙ্গমতী' 'রাঙ্গামাটি' হয়ে গেছে। সে যাই হোক, ছাপাখানার 'দেবতাদেব' এরকম দুটো-একটা ভুলচুক ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Regd. No. C3597 March & April '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN